

চতুর্থ ভাগ ।
শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সরকার কর্তৃক
 সম্পাদিত ।

চতুর্থ বৎসরের লেখকগণের নাম ।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত বেনোয়ারিলাল গোস্বামী
উমেশচন্দ্র গুপ্ত	ব্রজেননাথ বিদ্যাবাসী
কানাইলাল মিত্র	মনোমোহন চক্রবর্তী
কামিনীকুমার দাস	মহেন্দ্রনাথ মিত্র
কালীপ্রসন্ন দত্ত	মুক্তকেশী দেবী
কুলচন্দ্র দে	বভীক্ষনাথ মুখোপাধ্যায়
নন্দাচরণ সরকার	ব্রহ্মনাথ দে
গিবিজ্ঞাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী	রজনীকান্ত গুপ্ত
গিবিজ্ঞাপ্রসন্ন বসু	রামদাস হাজরা
গোপালচন্দ্র চৌধুরী	রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী
গোবিন্দচন্দ্র দাস	শরচ্চন্দ্র গোস্বামী
চন্দ্রনাথ বসু	শব্দচন্দ্র মজুমদার
চন্দ্রমোহন সেন	শশীভূষণ দে
চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ	শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়
জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্য
জয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সত্যীশচন্দ্র বার
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	সারদাপ্রসাদ স্মৃতিভীষ (বিদ্যাবিনোদ)
দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	সিক্বেল বাব
দেবকী বাগ্‌তি	হরচন্দ্র চৌধুরী
নবীনচন্দ্র সেন	হরিচরণ বাব
নিমাইচাঁদ শীল	হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়	হাবাণচন্দ্র রক্ষিত
পাঁচকড়ি বোহ	হাবাধন মুখোপাধ্যায়
প্রকাশচন্দ্র বসু	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ছবীকেশ শাস্ত্রী

ও সম্পাদক ।

কলিকাতা,
 ৫৩ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, অপূর্ণ কার্যালয় হইতে
 শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।
 শকাব্দা ১২৯৫ ।
 মূল্য ৬ মতিন টাকা মাত্র ।

সূচিপত্র ।

সূচ্য ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
আধ্যাত্মিক অর্থ		৭৯ নাটকের গল্প—(১) জিবুলে	৫৭০
আধ্যাত্মিকতার কর্ম কাণ্ড	৪৯৮	" (২) পূর্ণচন্দ্র	৬৩৮
আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান কাণ্ড	১৮০	" (৩) চন্দ্রহাস	৬৭১
আনাম (শিল্প)	৫৫৩	মাদৌজীবন	৬৬০
ইউরোপে দর্শন ও ধর্মপ্রচার	১৬১, ৩৪৮	পশুপতি	৭২১
ঔপন্যাস	৪৬	পাণিপথের যুদ্ধ	২১ ২৬৫
ঔপন্যাস	৭৪০	পাতঞ্জল যোগসূত্র	১৩৩, ২৩২, ২৬১, ৩২৯
কংগ্রেস	৪৪২		৩৮৯, ৫১৩, ৫৭৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৭০৫
কল্যাণ	১৬৪	পূর্ণচন্দ্র (নাটকের গল্প)	৬৩৮
কপালকুণ্ডলা	৬১৫	পৌণ্ডলিকতা	১০৭
কর্ণেল অলকট	৭০৩	প্রাচীন কলিকাতার দুই একটি চিত্র	৬৬৪
কাবের কৌকিল	৪০৫	বনিবে না	৬৬৯
কৃষ্ণবিহারী	৫৫২	বাইবেলের কথা	২৭২
কুমারী শিবপূজা	৬৫৪	বাল্যবিবাহ	১৭
কুমারগবেষ বাজবংশ	৩৭৫	বিজয় বনস্তের কথোপকথন	১৭
কুমারমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৭	সিন্ধু বচন	২৫২
কৃষ্ণ ভক্তি	৫৫২	বিলাতী জুয়াচুরি	৩২৫
ক্রাউনেব কথা	৬৬	বৈদেশিক সভ্যতা	৪৯
কুরুক্ষেত্রের সম্বন্ধ	৫৫০	বৈদেশিক দর্শন	৪২৬, ৪৪৯
ক্যাবিরিড	২৪৯, ২৫১	ভক্তমাল হইতে চন্দ্রহাস	৬২৫
চন্দ্রহাস (নাটকের গল্প)	৬৯১	ভক্তিসাধন	৬৪৮
চন্দ্রহাস (ভক্তমাল হইতে)	৬৯৫	ভারতে ইংরাজ	৫০৩
চৈতন্য সংহিতা	৫৯১	ভোলাদাদার ব্রাহ্মণভোজন	৬২০
জিবুলে (নাটকের গল্প)	৫৭০	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৬৪০
জীবন ও বয়স	৫৫১	মার্ভার্ডে	২৬৭
জৈন ধর্মোদ্দেশ্য	৭২	মিলিবে না	৬৭০
জাটক (স্মৃতিকাল)	৫৬৬	মিসর	১৪৭

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা
মূৰ্খ	৭৫৪	পদা ।	
বোম্বাইয়ের দস্যবাদের বিদেশী জরগকারী	৬৯৮		
মৈথিল ভাষা	৪৮৯	আগমনী	
ব্রহ্ম পতিতের কথা	৪৭৬	উঃ স	
বঙ্গবাসীদিগের সেভোগণের সভা	৪১২	ই সে : বাগী	
বাগিনী (উপভাস)	৫৯৪	কে আছে আমার	১২
রাজশক্তি ও সংবাদপত্র	৫০৭	কে কাহার প্রাণবিক	৪৬
লর্ড ক্যানিংয়ের বীরতা	৫২৩	গঙ্গা	৭
লীলা (উপভাস)	৬৭৫	গঙ্গা স্তব	৭১
শারীরিক হুতি	৪৬৬	জীবন সমস্তা	৬
শুধুই রহস্ত	৪১৫	ভূমি আর আমি	৩
প্রেরণা, নি বহুবিমানি	৫৫২	হুর্ণোৎসবে আশা	১
অভাব ও অভ্যাস	৪১	প্রাণেব প্রাণনা	২
সংস্কারের চোর	২৭	বিজয়া দশমী	১২৯
সুতা	৮৯	ভালবাসা বাসি	৩৮৫
সুন্দরী স্ত্রী	৫৮৬	রক্তা বাইরের চিঠি	৮৫
দে কালের দারোগার কাহিনী	৭৫১	শারদীয় শক্তি পূজা	৯৮
হিন্দুধর্মের সংস্কার	২৯৫	শিকার	৫১৮
হিন্দুধর্মের সংস্কার	২১৭	শিশু মহারাজ	৪৮৩
হিন্দুর নবজীবন	৪৫৮	ঐশ্বরী রাধিকা নিকুঞ্জ	৬২৭
হিন্দু বিবাহ	১৯৩	অশ্বানে শিব	২৩০
হিন্দুবিবাহের ব্যবস্থা (মদ্রব বিধান	২৭৩	অশ্বানে শিব	৩৬০
হুগলনীর)	৪৫৮	দবী লম্বাদ	৫৪৮
হিন্দুহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র	১৭১	সেই হুন্দাবন	৬৫৭

জীবন ।

৪র্থ ভাগ

প্রাবণ ১২৯৪ ।

{ ১ম সংখ্যা ।

প্রাণের প্রার্থনা ।

(১)

ছবস্ত্র দিনে প্রকট দিগম্বর,
ভূতনাথ ভকতির ভগবান,
আশ্চর্য্য সুনন্দর সত্য স্বরূপে
সবদে মহেশ সুবর্তমান ।

(২)

সংকল্পে শিব সংসার ওভঙ্কর,
জ্যোতির্ময় জগন্নাথ জগজ্ঞান,
যোগীন্দ্র জীবন্ত অগস্ত সত্যেব
সুশাস্ত প্রশাস্ত নিত্য নিদান ।

(৩)

আনন্দময় আজন্ম আত্মারাম,
চিরজীব চিদানন্দ চিবস্তন,
চিন্ময় স্বরূপ সংগে সাক্ষাৎ
ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ নিত্য নিরঞ্জন ।

(৪)

ওঙ্কার প্রাণ বিজ্ঞান বিলোকিত
নিবন্ধি নির্ঝিকল্প নির্ঝিকাব,
অনন্ত অপার ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত,
চিবস্তন চৈতন্য চমৎকাব ।

(৫)

স্বতন্ত্র প্রভু নিষ্কাম নিষ্কলঙ্ক,
নিবস্তব নিত্য সূত্রে নিমগন,
সম্পূর্ণ শাস্ত্রত সর্বাপ সুনন্দর,
প্রকৃতি বিহুতি বিচিত্র ভূষণ ।

(৬)

প্রকট হৈলা প্রকৃতি প্রয়োজনে,
প্রেমিকের প্রাণ-ভব প্রার্থনায়,
প্রকট হইলা লাভন্য সমুদ্র
ত্ৰিপতি শরব শকতি সহায় ।

(৭)

বীরেন্দ্র বসী বৈষম্য বিবজ্জিত,
পবাকান্ত পবমেশ পবস্তপ,
পরম পুরুষ পবব্রহ্ম অবতাব
এস বৈষ্ণবের বিজ্ঞান বান্ধব ।

(৮)

দাসস্য দাস হবস্ত হরচারণ,
দেহি দেহি দীন জনে দয়াময়,
মন্মথ মোহন শ্রীপদ পরম
সুগল উজ্জল রাগ রদাশ্রয় ।

পানিপতের যুদ্ধ ।

(পণ্ডিত কাশীরাজের গ্রন্থ হইতে)

৩।

গণেশ পণ্ডিত নামে একজন সদাশিবের সংবাদ-লেখক নবাব^১সুজাব শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিল। সামান্য ব্যক্তি বলিয়া সে নবাবের দরবারে যাইতে পাইত না, যে কোন কার্য থাকিত, আমার (পণ্ডিত কাশীরাজ) দ্বারা নির্বাহিত হইত। এই ব্যক্তির দ্বাৰায় ভাও স্বহস্ত আমাকে সর্বদাই পত্র লিখিতেন এবং নবাবসুজা ও প্রধান উজিবের মধ্যস্থতায় সন্ধি স্থাপন করিয়া দিতে নিতান্ত অমুবোধ করিতেন। এক্ষণে তিনি লিখিলেন, যে আপনাকে ও সৈন্যগণকে বাঁচাইতে পাবিলে যে কোন সৰ্ত্তে সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন এবং মধ্যস্থগণের উপর বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন। তিনি স্বজাতির প্রার্থা অনুসারে শর্ত-সূচক এক মুষ্টি জাফ্বান এবং একখণ্ড লিখিত সন্ধি পত্র পাঠাইলেন, এবং নবাবসুজাব সহিত বন্ধুতা-সূচক বিনিময় জন্য একটি সূবর্ণ খচিত উষ্ণীয়ও পাঠাইলেন। নবাব সুজাও উপঢৌকন প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে সন্ধি বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

নবাব সুজা এই সন্ধি কার্য লইয়া অনেকবার আমাকে প্রধান উজিবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। উজিবও ভাওয়ের প্রস্তাবে অমত ছিলেন না এবং ছবানী শাহের নিকট কথা উত্থাপন করিলেন। শাহ বলিলেন, “দেখ আমার এ বিষয়ে কিছুই বক্তব্য নাই। আমি কেবল আমার স্বদেশী বোহিলা ও অন্যান্য মুসলমানগণের অমুবোধে তাঁহাদিগকে মহাবাহীয শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছি। যুদ্ধের সমস্ত নাবকতা জামাব থাকিবে বটে, কিন্তু সন্ধি কবা না করা সম্বন্ধে, হিন্দুস্থানী সর্দারেরা যে কপ অভিক্রটি হয়, কবিতো পাবেন, আমার আপত্তি নাই।”

হার্ফিজ বহমত, ছানী খাঁ বঙ্গশ ঐক্যতি সকলেই সন্ধি স্থাপনের অভিলাস প্রকাশ করিলেন, কিন্তু নজীবুদ্দৌলার অমতে কেহই সন্ধি স্থাপনে অমুমোদন কবিতো স্বীকৃত হইলেন না। নবাব সুজা নজীবকে বুঝাইবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিলেন। আমি গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, এবং সন্ধি স্থাপনে অন্যান্য সর্দারগণের সহিত

এক মত হইবার জন্য নানা তর্ক বিতর্ক কবিলাম । নজীব প্রত্যুত্তর কবিলেন, “নবাব সুজাব পিতাকে আমি মকব্বির বলিয়া জানিতাম, তাহাকেও ঐ প্রকার মনে কবি, কিন্তু তিনি এখনও অপবিগত বয়স্ক, সংসাবানভিদ্ধ, তিনি উপস্থিত বিষয় তলিয়া বুঝিতছেন না । এ কেবল প্রতাবণা মাত্র । যখন বিপক্ষ ক্ষীণ-বল ও পরাজয়োগুণ হয়, এমন বিষয়ই নাই যে সে পবিত্র্যাগ কবিতে ইতস্তত কবে, এমন শফর্তই নাই যাহা কবিতে ভয় কবে । কিন্তু শফর্ত কেবল বাক্য মাত্র, শৃঙ্খল নয়, যে চিবকাণ বন্ধ কবিতে পাবিবে । শত্রুকে এতদূর বিপদে পাতিত কবিয়া যদি এখন পলাইতে অবসব দেও, সে কি প্রথম বল সক্ষমের সুবিধা পাইবা মাত্র, নষ্ট সম্মান ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে যত্নবান হইবে না ? এখন সমস্ত দক্ষিণাত্য আমাদেব কবতলস্থ বলিলেও হয়, এমন সুবিধা সমাগম আব কবে হইবে । একবার চেষ্টা কবিয়া এই মহাবাহুব্রুকপী কণ্টক উচ্ছেদ করা যাউক । নবাব সুজাকে ধৈর্য্যাবলম্বন কবিতে বলুন, আমি স্বয়ং তাহাব নিকট উপস্থিত হইয়া বর্তব্য বিষয়ে পরামর্শ কবিতেছি ।” আমি প্রত্যাগমন কবিয়া প্রভুকে সকল কথা জানাইলাম, এবং বলিলাম আপনি নিশ্চয় জাহ্নন নজীব সন্ধি স্থাপনে কখনই সঙ্গত হইবেন না ।

তখন বাত্রি দিগ্রহব । নজীব তৎক্ষণাৎ ছরানী শাহেব নিকট উপস্থিত হইয়া আমাব সহিত বথোপকথন আলুপুর্কিক নিবেদন কবিয়া বলিতে লাগিলেন, “বোধ হইতেছে সমস্ত সর্দাবগণই মহাবাহুব্রুকপীযগণেব সহিত সন্ধি স্থাপনে তৎপর হইয়াছে, কিন্তু আমাব বিবেচনায ইহা নিতান্ত অযুক্তি । মহাবাহুব্রুকপীযেবা উত্তর ভারতেব কণ্টক স্বরূপ । যদি তাহাবা প্রতিবোধ না কবে তো, এই সাম্রাজ্য মহাশযেবই হস্তগত, যখন ইচ্ছা এইণ কবিতে পাবেন । আপনাব বিবেচনায যাহা সিদ্ধ হয় ককন । আমি সৈনিক বৈ নয়, যে পক্ষ জয়ী হউক, তাহাবই সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্বক মিলিত হইতে গাবি ।” ছরানী শাহ প্রত্যুত্তর কবিলেন “তুমি যথার্থই বলিতেছ, আমি তোমাব পরামর্শ যুক্তি-সম্পন্ন বুঝিতেছি এবং তদ্বিপৰীত কোন কথা শুনিব না । নবাব সুজা বালক ও অনভিদ্ধ । মহাবাহুব্রুকপীযেবা চতুর্ব, তাহাদেব মিথ্যা অনুতাপেব উপব কিছুতেই নির্ভব করা যায় না । প্রথম হইতে আমি এ বিষয়েব ভাব তোমাব উপব রাখিয়াছি ।

তোমার যেমন সন্ধিবেচনা হয় কব। আমার যে রূপ পদ, তাহাতে আমার সকলকার কথাই শুনিতে হইবে, কিন্তু আমি তোমার পবামর্শেব বিপরীতে কোন কার্য করিব না।”

পবদিন নজীব নবাব সুজাব শিবিরে আসিলে, অনেক বাতি পর্যন্ত পবামর্শ হইল, কিন্তু কিছু স্থিৰ হইল না। এ দিকে সদাশিবেব শিবিরে একপ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, যে সৈনিকেবা শস্যেব জন্য পানিপত নগর লুণ্ঠন কবিল, কিন্তু যাহা প্রাপ্ত হইল, তাহাতে এতাদৃশ বহু সংখ্যক লোকেব কি হইবে? অবশেষে মহাবাষ্ট্রীয় সদ্ধাবেবা ও সৈনিকেবা মিলিত হইয়া সদাশিবেব শিবির বেষ্টন কবিয়া চীংকাব কবিয়া বলিতে লাগিল, “আমাদিগকে আব কষ্টে ধ্বংশ হইতে দিবেন না, একবার সাদ্য মত বিপক্ষ-গণকে আক্রমণ কৰিতে অল্পমতি দিউন, পবে ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটবে।” ভাও প্রত্যাভব কবিলেন, “ভাল তাহাই হউক, তোমরা যেক্ষণ কবিতে সংকল্প কব, আমি তাহাতেই সম্মত আছি।” অবশেষে স্থিৰীকৃত হইল, যে প্রত্যয়ে পবিধা পবিত্যাগ পূৰ্ব্বক যাত্রা কবিয়া সম্মুখে তোপ সংবক্ষণ পূৰ্ব্বক বিপক্ষকে আক্রমণ কবা যাইবে। সকলেই প্রাণ পণে যুদ্ধ কবিতে প্রতিজ্ঞা কবিল, এবং প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ীকৃত কবিবাব মানসে স্বদেশাচাৰাণ্যিক গবম্পবে তাদুল বিনিময় কবিল।

ঐ ঘোব বিপদ কালে ভাও স্বহস্তে এক পানি পত্র গিথিয়া একজন নিতান্ত বিখন্ত ভূত্যেব দ্বাৰা আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পত্রেব মর্শ্ব এই “পাত্র পূর্ণ হইয়াছে, আব এক বিন্দুবও স্থান নাই। যদি কিছু কবিতে পারেন তো, এই বেলা ককন, না হয় স্পষ্ট জবাব দিউন। ইহাব পব আব লিখিবাব বা জানিবাব অবসব থাকিবে না।” বাত্রি ৩টার সময় পাত্র পৌছিল। আমি নবাব সুজাব নিকট উপস্থিত ছিলাম, পত্র পাঠ কবিয়া ঠাহাকে শুনাইলাম। পত্র বাহককে জিজ্ঞাসা কবায় সে মহাবাষ্ট্র শিবিরে যাহা কিছু ঘটয়াছিল, বিস্তারিত নিবেদন কবিল। এমন সময়ে নবাবেব হরকরা আসিয়া সংবাদ দিল যে মহাবাষ্ট্রিয়েবা তোপ সম্মুখে বাখিষা শিবিত্যাগ কবিয়া ধাবমান হইতেছে। শুনিবা মাত্র নবাব ছবানী শাহেব শিবিরে উপস্থিত হইয়া প্রহরী খোজাগণকে বলিলেন, শীঘ্র শাহকে জাগবিত কব, নিতান্ত আবশ্যকীয় কাথ্য আছে। শাহ তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া

সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। নবাব উত্তর কবিলেন, “মহাশয় এখন বিস্তারিত নিবেদন করিবাব সময় নাই, শীঘ্র অস্বাভোহণ কবিয়া সৈন্য গণকে সশস্ত্র সজ্জীভূত হইতে আদেশ কখন।” শিবির দ্বাবে অলুক্ষণ অনেক গুলি অশ্ব সজ্জীভূত কৈত। শাহ একটাব উপর আবোহণ কবিয়া সৈন্যগণকে সশস্ত্র সজ্জীভূত ত আদেশ কবিতে কবিতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অগ্রসব হইলেন। শাহ বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সংবাদ বোখায় পাইলেন; নবাব আমাব নাম য শাহ তৎক্ষণাৎ একটা উট পাঠাইয়া আমাকে লইয়া গেলেন। আমি আম কবিলে শাহ বিস্তারিত বিবরণ নিবেদন কবিতে অলুমতি কবিলেন। বলিলাম মহাশয় শিবির পবিত্যাগ কবিয়া ধাবমান হইয়াছে, থাক হঠবা মাত্র আক্রমণ কবিবে। ঠিক সেই সগয়ে কয়েকজন বানী অস্বাভোহী সৈনিক সেই খান দিবা চানিয়া যাঠেছিল, তাহাদেব অশ্বে নন্দব্য ছিল, জিজ্ঞাসা কবায় বলিল যে মহাশয় শিবির পলায়ন বিতেছে, তাহাদেব শিবির লুণ্ঠন কবিয়া ঐ দ্রব্য সকল তাহাবা হস্তগত বৈয়াছে। শাহ আনাব দিকে চাহিয়া বলিলেন এ কি? আমি বলিলাম শয় অলক্ষণ পবেই আমবা কথাব সত্যাসত্য প্রমাণীকৃত হইবে। আমাব শেষ না হইতেই, মহাশয় শিবির প্রায় দেড় ক্রোশ অগ্রসব হইয়া আসিয়া তোপ গুলিকে এক সাবি কবিয়া একেবাবে গোলা চালাইতে আবস্ত বিল। জুবানী শাহ অশ্বোপরি বসিয়াই পাবস্যা ফুলিয়া হুকায তামাকু ইতেছিলেন, ভোপেব শব্দ শুনিয়া নবাবকে বলিলেন “হঁ দেখিতেছি তোমাব সতাই বলিয়াছে।” তিনি তৎক্ষণাৎ উজিব এবং সর্দাবগণকে ডাকাইয়া নৈন্নোক্ত প্রকায সেনা সন্নিবেশ কবিতে আদেশ কবিলেন বথা—শাহ পছন্দ। স্বসৈন্যে নজীবুদ্দৌলাব বাম পার্শ্বে অবস্থিত হইল, উজীব স্বসৈন্যে সর্বাধ্য অবস্থিত হইলেন, বব খোবদাব খাঁ অন্যান্য সর্দাব গণ সহিত স্বসৈন্যে ফিজবহমত খাঁব দক্ষিণ ভাগে বহিলেন; আহমদ খাঁ বঙ্গশ সকলেব ক্ষিণে বহিলেন। সেনা সন্নিবেশ হইলে বণবাদ্য বাদিত হইতে আদিষ্ট হইল। ক্রমে বস্ত-নির্দেশ-সন্তব আলোক হইলে দেখা গেল মহাশয় শিবির পতাকা একল তোপ সম্মুখে বাখিয়া ধীবে ধীবে নিযমিত রূপে অগ্রসব হইতেছে। বাণী শাহ সৈন্য শ্রেণীব সম্মুখ দিয়া গমন কবিয়া সমস্ত সেনা নিবেশ ষ্টেফে ব্যবেক্ষণ কবিলেন তৎপরে পূর্ব কথিত কুজ শিবিরেব সম্মুখে আপন অবস্থান

নির্ধারণ করিলেন। এক্ষণে ঐ ক্ষুদ্র শিবির মুসলমান সৈন্যে শ্রেণীব পশ্চাত্তানে অবস্থিত। এই স্থানে থাকিয়া যুদ্ধ আবস্ত কবিত্তে আদেশ কবিলেন।

মহাবাহুঈ সেনা পূৰ্ণ মুখে ধাবিত। তাহাদেব শ্রেণী নিম্নোক্তপ্রকারে সন্নিবেশিত ছিল। যথা সকলেব বামভাগে ইব্রাহিম খাঁ গাদী—তাহাব পর ক্রমান্বয়ে আশ্বাজী গইকুখাড়, সুদেব পাটেল, সদাশিব স্বয়ং বিশ্বাস বাওয়েব সহিত, যশবন্তবাও পুয়াব, শমশেব বাহাছুব, মলহব বাও, জওজী সিন্ধিয়া ইত্যাদি। সমস্ত তোপ স্ততর নল প্রভৃতি সেনা শ্রেণীব সম্মুখে অবস্থিত ছিল।

মুসলমান সৈন্য পশ্চিম মুখে অবস্থিত। বাম দিক হইতে গণনা কবিয়া দেখিলে নিম্নোক্ত প্রকারে সন্নিবেশিত, যথা—ক্রমান্বয়ে শাহ পছন্দ খাঁ, নজী বুন্দোলা, সুজাউন্দোলা, উজীৰ সাবুন্নী খাঁ, আহম্মদ খাঁ, বঙ্গশ, হাফিজ বহমত খাঁ, ছদী খাঁ, আমীব বেগ খাঁ, পারস্য ও মোগল সদ্দাব গণ, ববখোদাব খাঁ। ইহাদেবও সম্মুখে সমস্ত তোপ এবং বকেট। উষ্ট্রাবোহী জম্মুকধারীগণ এবং পাবস্য দেশীয়বন্দুক ধারীগণতোপেব পশ্চাতে অবস্থিতি কবিত্তে লাগিলেন।

উভয় পক্ষীয় সৈন্য শ্রেণী বক্র ভাবে অবস্থিত হওয়ায় বব খোবদাব খাঁ, আমীব বেগ এবং ছদী খাঁ, এই তিন জন অপব পক্ষীয় ইব্রাহিম খাঁ গাদীব সন্নিকট হইয়াছিল। নিম্ন লিখিত চিত্রে উভয় পক্ষীয় সেনা সন্নিবেশ স্পষ্ট বিদিত হইবে।

মহাবাহুঈ শিবির	[] ক্ষুদ্র শিবির	উজীর বঙ্গশ বহমত	৯	শাহ পছন্দ খাঁ	৮	জওজী সিন্ধিয়া
			৮	নজীব	৭	মলহব বাও
			৭	নবাব সুজা	৬	শমশেব বাহাছুব
			৬	বক্র পাৰস্য মোগল সৈন্য	৫	যশবন্ত বাও
			৫		৪	সদাশিব ও বিশ্বাস বাও
			৪		৩	সুদেব পাটেল
			৩		২	আশ্বাজী গৈকুখাড়
			২	আমীব বেগ	১	ইব্রাহিম খাঁ গাদী
			১	ববখোদাব খাঁ		

১৫৬১ শালের ৭ ই জানুয়ারি সূর্যোদয় কাল হইতে বন্দুক, তোপ, বোম প্রভৃতি অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল, কিন্তু মুসলমান সৈন্যের অধিক ক্ষতি হইল না । ক্যারগ উভয় পক্ষই পবম্পাবেব নিকটবর্তী হইতে ছিল, এবং মহারাষ্ট্রদিগেব বৃহৎ তোপ সকলেব সহজে মুখ পরিবর্তন করিতে না পাবায়, তৎবর্ষিত গোলা মুসলমান সৈন্যেব উপব দিয়া চলিয়া প্রায় এক ক্রোশ পশ্চাতে পড়িতে লাগিল । এদিকে উজীরের বেজিমেণ্ট ভিন্ন অন্য মুসলমান বেব বিভাগ হইতে তোপ অত্যন্ত মাত্র চলিতে ছিল ।

উভয় পক্ষীৰ সেনা ক্রমে অধিক নিকট বর্তী হইতেছে, ইতি মধ্যে ইব্রাহিম খাঁ গাদী অশ্ব পৃষ্ঠে ভাওয়েব নিকস্থ হইয়া নমস্কার পূর্বক বলিতে লাগিল ‘মহাশয় রীতিমত বেতন প্রদানেব জন্য অনুবোধ কবায় আপনি আমাব প্রতি অনেক দিন হইতে অসন্তুষ্ট আছেন । এমাসে আপনাব ধন লুণ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া আমবা এক পরসাও বেতন পাই নাই । সে কথা এখন যাউক । অন্য আমি আপনাকে দেখাইব যে আমবা অনুপযুক্ত হইয়া এতদিন বেতন গ্রহণ কবি নাই ।’ এই বলিয়া তিনি অশ্ব সঞ্চালনে আপন সেনাংশে উপস্থিত হইয়া পতাকা অগ্রসব কবিতে আদেশ করিলেন । এবং ববখোবদাব খাঁ ও আমীর খাঁ তাঁহাব পার্শ্বাক্রমণ কবিতে না পাবে, এজন্য দুই ব্যাটেলিয়ান সৈন্য বাখিয়া স্বহস্তে একটা নিশান লইয়া অবশিষ্ট ৭ ব্যাটেলিয়ান সমভিব্যাহাবে বন্দুকের উপব ব্যাষোনেট চড়াইয় হাফিজ বহমত ও ছুঁদি খাঁৰ সেনা বিভাগ ঘোবভব রূপে আক্রমণ কবিলেন । বোহিলাবা প্রভূত সাহস সহকাবে ঐ আক্রমণ প্রতিবোধ করিতে লাগিল, উভয় পক্ষের হাতা হাতী কাটা কাটি হইতে লাগিল । প্রায় ৮ হাজাব বোহিলা এই আক্রমণে হত ও আহত হইল এবং তাহাদেব অবস্থা এক্রপ শোচনীৰ হইয়া উঠিল যে প্রথম আক্রমণেব পব উহাদেব সেনাপতি গণেব নিকট ৬ শত বা এক সহস্রাধিক সেনা তিষ্ঠিতে পারিল না । হাফিজ বহমত খাঁ পীড়িত হইয়া পালকিতে ছিলেন, বেগতিক দেখিয়া বাহকগণকে পালকি ছুঁদি খাঁৰ নিকট লইয়া যাইতে অন্তমতি কবিলেন, যে তৎসমীপে প্রাণত্যাগ কবিবেন । এদিকে ছুঁদি খাঁও হাফিজ রহমত খাঁৰ অনুসন্ধান কবিতেছিল । বস্তুত, এত বিশৃঙ্খল গোলমাল হইয়া ছিল, যে কে কোথায় কিছুই ঠিক ছিল না । তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া ঐ যুদ্ধ হয় । ইব্রাহিম খাঁ ৬ টা ব্যাটেলিয়ান উদ্ধার

হইল আর সে স্থল শবীবের নানা স্থানে ববধাব শুলে আহত ও একস্থানে বন্ধুকে গুলিতে বিন্ধ হইয়া ছিল। তাহার অবশিষ্ট দুই ব্যাটেলিয়ান, যাহাবা পার্শ্ব বক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল, তুমুল যুদ্ধ কবিতা ছবানী সেনাব বাবংবাব গতি বোধ কবিতা ছিল। আত্মসী নৈকোযাড ইত্ৰাহিমের বথেষ্ট সাহাব্য করিতা ছিলেন। তাহাবও সর্ব শবীব ক্ষত বিন্ধ হইয়া ছিল।

মধ্য ভাগে, পদাশিব এবং বিশ্বাস বাও নিজ পাবগা সৈন্য লইয়া প্রাধান উজিবের সেনা বিভাগ আক্রমণ কবিলেন। মহাবাহুবীষেবা ১০ হাজাব মুসলমান অশ্বাবোহী, ৭ হাজাব পাবন্য বন্দুধী এবং ১ হাজাব জুঘূর্ক বাহী উষ্ট্র ভেদ কবিতা চনিয়া গেল এবং তিন হাজাবেরও অধিক শত্রু হত ও আহত কবিল। উজীবের ভাতুপুত্র আতাই খাঁ, যে গোবিন্দ পণ্ডিতকে জয় কবিতা অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়াছিল, এই আক্রমণে প্রাণ হারাইল। উজীবের সেনা পদানোমুখ হইল, কিন্তু উজিব স্বয়ং ৩ বা ৪ হাজার অশ্বাবোহী এবং ৬৫টি জঘ্রুক লইয়া—স্থিব পদে অবস্থিত কবিতা লাগিলেন। তিনি সর্ব শবীবে কবচাচ্ছাদন ববিতা পদাতী বেষে যুদ্ধ কবিতা লাগিলেন।

ইহাব পবেই নবাব সজাব সেনা বিভাগ। দুটি বাশিতে চাবিদিগ অন্ধকার হওয়ায় কোথায় কি হইতেছে তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। হঠাৎ ঐ দিকে মল্লয কোলাহল ও অশ্বের হেঁচল হইল ওনিয়া, কাবণ অবদাবণ জন্য আমাকে পাঠাইলেন। আমি দেখিতাম, উজিবের সৈনিকগণ তাহাকে পরিত্যাগ কবিতা পলাইতেছে, দেখিয়া বাগ ও ছাংথে অদীব হইয়া তিনি গালাগালি দিতেছেন আর বলিতেছেন, “তাইগণ আমাদের দেশ অনেক দুবে অবস্থিত, কোথায় পলাইতেছে?” বিন্ধ তাহার আদেশ কেহই কণপাত ববিতা না। আমাকে দেখিয়া বলিলেন ‘শত্রু পুত্র সজা উদ্বোলাব নিকট গিয়া বল যে এই মুহূর্তে তিনি আমার সহায়তা না কবিলে আমার বক্ষা নাই।’ আমি নবাবকে এই সংবাদ জানাফলে, তিনি বলিলেন, যে শত্রু অতি নিকট, আমার সৈন্য আক্রমণ কবা বিশেষ সম্ভব, আমি এ সমবে কোন দিকে সৈন্য চালনা করিলে, শত্রুরা আমাদের বাহ ভেদ কবিলে, তাহা হইলে সমত সৈন্যের বিশেষ অমঙ্গল ঘটবে।

নবাব সজাব সেনা বিভাগে কেবল মাত্র ২ হাজার অশ্বাবোহী, ১ হাজার

বন্দুকী, ২০টা তোপ এবং কতকগুলি ছোট কামান ছিল । কিন্তু তাহারা সম্মিলিত হইয়া এমন সাহস-চিহ্ন দেখাইতে লাগিল, যে শত্রুরা উহাদিগকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল না । বরং তাহারা নিকটে আসিয়া আক্রমণ কবির তাব প্রকাশ করিল, কিন্তু আক্রমণ করিল না ।

নবাবের বামভাগে নজীবুদ্দৌলা ৮ হাজার রোহিলা পদাতি এবং ৬ হাজার অশ্বারোহী লইয়া অবস্থান করিতে ছিল । ইহাদের সঙ্গে কতকগুলি বিলদাব সৈন্য ছিল । ইহারা বানুকা খনন করিয়া বক্ষা-প্রাচীর নিৰ্ম্মাণ করিত । এইরূপ একটা প্রাচীর প্রস্তুত হইলে সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া তাহার আশ্রয় লইল । ইতিমধ্যে বিলদারেরা বন্দুকের গুলি পৌঁছিবার অল্পপথ অগ্রসর হইয়া আর একটা প্রাচীর প্রস্তুত করিতে লাগিল । এই প্রকারে এই সেনা-বিভাগ বানুকা-প্রাচীরের আশ্রয়ে ক্রমাগত অগ্নি অগ্নি প্রায় ক্রোশেক অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল । বিপক্ষ-সেনার গুলি এখানে কদাচিৎ পৌঁছিতে পাবিত । নজীব এখন আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, “আমাকে এখন প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে হইবে । আজিকার যুদ্ধে ফলাফলে আমিই সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থবুদ্ধ, আর সকলে কেবল দর্শক বৈত নয় ।” বস্তুতঃ নজীব অসাধারণ কশ্মিরী ও ক্ষমতাশালী পুরুষ । জঙ্গলী সিন্ধিয়াব সহিত তাহার তুমুল সংগ্রাম বাধিল । উভয়ের মধ্যে বহুকাল হইতে ভয়ানক শত্রুতা বিদ্যমান ছিল । বোহিলাদের সহিত অনেক বোম হাউই ছিল, তাহারা এককালে দ্বি-সহস্র হাউই ছাড়িতে আরম্ভ করিল । উভাদেব ভয়ঙ্কর ধ্বনিতে বিপক্ষের অস্ত্র সকল ভীত হইতে লাগিল এবং এতদধিক প্রাণ হানি হইতে লাগিল, যে তাহারা বোহিলাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল না । বিশেষতঃ নজীবের দক্ষিণ পাশ্বে সাহ পছন্দ খাঁ অবস্থান করিতে ছিল, এবং ঐ সাহসী ও অভিজ্ঞ ছুবানী সর্দার এমন কোশলে অগ্রসর হইতে লাগিল, যে, মহাবাহীয়েরা ইহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিল না ।

এই প্রকারে দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত সংগ্রাম চলিতে লাগিল । মুসলমানদের হত ও আহতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছিল বটে, কিন্তু মোটের উপর মহাবাহীয়েদিগের জয়লাভ বোধ হইতে লাগিল ।

প্রায় দ্বি-প্রহরের সময় ছুবানী সাহ সংবাদ পাইলেন, যে বোহিলা এবং উজীবের সেনাবিভাগ সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপর্য্যস্ত হইয়াছে । তৎক্ষণাৎ

তিনি নিম্নকটি * নামক সেনা-পুঞ্জ হইতে দুই হাজার বীরপুরুষকে আহ্বান করিয়া তন্মধ্যে পঞ্চাশত বীরকে আদেশ কবিলেন, তাহাদের যে সকল পলায়িত সৈন্য শিবিরে আশ্রয় লইয়াছে। সকলকে বলপূর্বক যুদ্ধে পুনঃ প্রেরণ করে, এবং অবশিষ্ট ১৫ শত বীরকে আদেশ 'কবিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ কবিয়া তাহারা পলায়িতগণকে বধে পুনঃ প্রেরণ কবে, আর কেহ অস্বীকার কবিলে তাহাব প্রাণ বধ কবে। এই প্রকারে অনেক সেনা সংগ্রহ কবিয়া ছবানী সাহ ৪০০০ হাজার লোক দক্ষিণ পার্শ্ব বক্ষার্থ এবং আর দশ হাজার লোক উজীরের সহায়তার জন্য পাঠাইলেন, এবং উজীরকে আদেশ করিলেন যে নিক্ষিপ্ত তববাবি হস্তে পাশাপাশি কবিয়া পূর্ণবেগে বিপক্ষকে আক্রমণ করা ইউক। আর সাহ পছন্দ খাঁ ও নজীবুদ্দৌলাকে অনুমতি কবিলেন যে, উজীর যতবার আক্রমণ কবিবেন, উহারা ততবার বিপক্ষ সেনার পার্শ্ব আক্রমণ কবে। বেলা ১টার সময় ঐ সকল সেনা উজীরের নিকট পৌঁছিলে তিনি অস্বাবোহনে সাহেব অনুমতি মত দেখানে সদাশিব স্বয়ং সেনাপতিত্ব কবিতৈছিলেন, সেই সেনাবিভাগ আক্রমণ কবিলেন। সাহ পছন্দ খাঁ এবং নজীবুদ্দৌলাও একবারে পার্শ্ব আক্রমণ করিলে ব্যাপার বিষম হইয়া উঠিল। প্রায় ১ ঘণ্টা কাল হাতাহাতী ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল, পবম্পর পরস্পরের প্রতি তববাবি, শূল, টাঙ্গি এবং ছোরা প্রভৃতি প্রয়োগ কবিতে লাগিল। বেলা ২টা এবং ৩টার মধ্যে বিশ্বাস বাও আহত হইয়া অস্ব হইতে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইলেন, তৎসংবাদ শ্রবণে তাও তাহাকে আপন হস্তীর উপর উঠাইয়া লইতে অনুমতি কবিলেন। আরও এক ঘণ্টা কাল সদাশিব অস্বাবোহনে ঘোবতর যুদ্ধ কবিলেন, কিন্তু তৎপবে হঠাৎ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াব ন্যায় সমস্ত মহারাষ্ট্র সেনা একবারে পশ্চাৎদিকে পলাইতে আবন্ত কবিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের মৃত দেহে আবৃত হইয়া গেল। বিজয়ী পক্ষ ভয়ঙ্কররূপে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল, আত্ম সমর্পণ করিয়াও কেহ নিস্তার পাইল না। চারিদিকে ১০।১২ ক্রোশ পথ পর্যন্ত ছবানীরা পবাক্তিতগণকে তাড়াইয়া চলিল, কত

* ইহাৰা এক দল অস্বাবোহী, ছবানী সাহের নিজ আদেশ প্রতিপালন কবিতার জন্য নিযুক্ত থাকিত। ইহাদের পরিচ্ছদ ও অস্ত্র বিশেষ প্রকার থাকায় ঐ নামে অভিহিত হইয়াছিল।

লোক প্রাণে মবিল ইয়ত্তা কবা ছুড়র । কথিত আছে, বালক বনিতা সমেত মহাবাহু শিবিরে যে ৫ লক্ষ লোক ছিল তাহার অধিকাংশই হত বা বন্দি হইয়াছিল । বাহাবা পলায়ন দ্বাবা মুসলমান হস্তে নিস্তার পাইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ গ্রাম্য কৃষকদিগের হস্তে প্রাণ হাবাইল । মহাবাহু সর্দার অন্তর্জীমানকেশর অনুচর সহিত পলায়ন করিতেছিলেন, ফরোখ নগবেব কুম্ভকোবা তাহাদের প্রাণ বধ করিল ।

মহারাষ্ট্র-শিবির লুণ্ঠন করিয়া যে কত দ্রব্য মিলিল তাহার ইয়ত্তা নাই । এক একজন মুসলমান অশ্বারোহী ৮।১০ টা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে মহামূল্য লুণ্ঠিত দ্রব্য বাহিব কবিয়া লইয়া যাইতে লাগিল । অশ্বগুলোকে মেঘপালের ত্রায তাড়াইবা লইয়া যাইতে দেখা গেল । বহুসংখ্যক হস্তীও লুণ্ঠিত হইয়াছিল ।

প্রায় ৪০ হাজাব লোক বন্দি হইল, ইহাদের মধ্যে ৬।৭ হাজাব লোক নবাব সুজাব শিবিরে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল । তিনি ছবানীদিগের নির্ভূবাচরণ হইতে বক্ষা কবিবাব অভিপ্রায়ে আপন লোক নিযুক্ত বাধিয়াছিলেন । যে সকল চর্ভাগাবা ছবানীদের হস্তে পড়িল তাহাদের প্রায় সকলেই প্রাণ হাবাইল । ছবানীবা উগ্রহাস কবিয়া বলিতে লাগিল যে গৃহ হইতে যাত্রা কালে তাহাদের মাতা, পত্নী, ভগ্নীগণ অনুবোধ করিয়াছে যে, শত্রু পবাক্ষ পূর্বক তাহাদের প্রত্যেকেব নামে জনকত পাষণ্ডকে হত্যা কবিয়া জৈম্ব সমীপে তাহাদের জন্য পুণ্য সঞ্চয় কবিতে হইবে । এই প্রকাবে নহস্ত সহস্ত লোক মৃত্যু প্রাপ্ত হইল । কেবল ছবানী এবং তাহার প্রধান সর্দাবদিগের শিবির ভিন্ন আব সকল ছবানী শিবিরেব সম্মুখে নবমুণ্ডেব জপ দৃষ্ট হইতে হইল ।

যুদ্ধ অবসান হইলে, প্রধান সর্দাবেবা ছবানী সাহকে মাজল্য নজব প্রদান কবিল । সাহ যুদ্ধক্ষেত্র অন্ন মাত্র পবিদর্শন করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন কবিলেন । প্রধান প্রধান সর্দারেরাও আপন আপন শিবিরে গেল । অধঃ শ্রেণীস্থ সর্দাবেরা ও সৈনিক পুরুষেরা স্বৈচ্ছামত বিপক্ষেব পশ্চাদমুসরণ বা লুণ্ঠন কার্যে ব্যাপৃত রহিল ।

নিশা শেষে বরখোবদার খাঁর কএকজন ছরানী সৈনিক মাতঙ্গোপরি বিশ্বাস রাওব মৃত দেহ দেখিতে পাইয়া, ততী ও অলঙ্কার অপহরণপূর্বক দেহ মাত্র নবাব সুজা উর্দোলাব নিকট উপস্থিত করিল । নবাব উহাদের ২ হাজাব টাকা পুবদার দিয়া বিদায় করিলেন এবং মৃত দেহ যত্নেব সহিত বাগিতে আজ্ঞা

করিলেন। স্বজাফুলি নামে নবাবের একজন অহুচর ইব্রাহীম খাঁ গান্ধীকে জীবিত বন্দি কবিতা ছিল। ইব্রাহীমের সর্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত। নবাব শুনিয়া তাহাকে সম্বন্ধে ও গোপনে রাখিতে এবং তাহার ক্ষত স্থানে ঔষধি লেপন কবিত্তে অমুমতি করিলেন।

পর দিন দুরানী সাহেব অমুমতিক্রমে বিশ্বাস বাওয়ের দেহ তঁং শিবিরে নীত হইল। সেখানকার বড় ছোট সকলেই দেখিবাব জন্য উপস্থিত। মৃত পুরুষের সৌন্দর্য্য দর্শন কবিতা সকলেই মুগ্ধ হইল। মৃত্যুতে উহার মুখশ্রীব কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, যেন সূপ্তাবস্থা বোধ হইতে লাগিল। উহার ঘাড়ে এক তরবারির আঘাত এবং বাম চক্ষের উপর এক অত্যন্ত মাত্র তীব্র আঘাত ছিল এবং অবশিষ্ট অঙ্গ-বস্ত্রের উপর শোণিতের দাগ মাত্রও ছিল না। ঐ দেহ দেখিয়া দুরানীরা একত্র হইয়া এই বলিয়া চিৎকার কবিত্তে লাগিল, যে “ঐটা পাষাণাধিপতির দেহ, আমবা উহাকে শুদ্ধ কবিতা তৃণভূষণ্য কাবুলে লইয়া যাইব।” এ কাবণ এই দেহ ববখোবদার খাঁর শিবিরে মতিলাল নামক তাঁহার ক্ষত্রিয়জাতির দেওয়ানের তাঁবুর নিকট রক্ষিত হইল।

নবাব স্বজাউদ্দৌল। এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উজিবকে সঙ্গে কবিতা সাহেব নিকট উপস্থিত হইয়া বলিত্তে লাগিলেন “মহাশয়, বিপক্ষের জীবনাবধি তাহার সহিত শত্রুতা। হিন্দুস্থানের ব্যবহাব এই, যে জয়লাভের পর সর্দারগণের মৃত দেহ—তাহাদের জাতি ও ধর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, অমপন আপন ধর্ম্মবিধি অনুসারে সংকৃত হইবার জন্য সম্মতবের হস্তে অর্পিত হইয়া থাকে। একরূপ আচরণে জয়ীদিগের যশ লাভ হয়, বিপরীত আচরণে মহতী নিন্দা। আপনি এদেশে অল্প দিন মাত্র আছেন, কিন্তু আমি এবং অন্যান্য হিন্দুস্থানী সর্দারেরা এদেশের স্থায়ী অধিবাসী, ভবিষ্যতেও আমাদের মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ব্যবহার করিত্তে হইবে, এখন অন্যায় আচরণ কবিলে সে কথা চিরকাল মনে জাগরুক থাকিবে। অতএব আমাদিগের অহুবোধ, যে, মৃত দেহ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রত্যর্পণ করা যাউক, তাহারা দেশান্তরায়ী সংকার করুক।” নজীবুদ্দৌল। প্রভৃতি সমস্ত হিন্দুস্থানী সর্দারেরাও ঐ প্রকার অহুরোধ করিত্তে লাগিল। প্রায় দুই দিন এই কথার আন্দোলন চলিত্তে লাগিল। এই কার্য্যোপলক্ষে নজীরের উকিল মেঘরাজের সহিত আমাকে বরখোরদার খাঁর এবং মতিলালের তাঁবুতে যাইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় বা-

আমি একাকী গেলাম। মতিলাল আমাকে জিজ্ঞাসা করিল ‘আপনি কি কেবল ঐ মৃত দেহ লইতে আসিয়াছেন না আবও কিছু কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন।’ আমি বলিলাম “যাহা কিছু করিতে হয় বলুন, আমি প্রস্তুত।” মতিলাল আমাকে দুইটি গুপ্ত তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। একটাব মধ্যে ভাউয়েব উকিল রাজা বাবু পণ্ডিতকে আহত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। তাহাব সহিত অল্পক্ষণ কথা বার্তাব পব দ্বিতীয় গুপ্ত তাঁবুর মধ্যে গিয়া দেখি, জঙ্গুজী সিদ্ধিয়া বসিয়া আছে। তাহার বয়স্ক্রম ২০ বৎসর মাত্র, বাহ্যতে বন্ধু ও শূলের আঘাত লাগাতে উহা ফিঙ্গা বন্ধ রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া মস্তক হেট করিয়া বহিল। আমি তদৃষ্টে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, ‘মহাশয় আপনি লজ্জিত হইতেছেন কেন, মনুষ্যের চেষ্টা ও সাহসে যতদূর সম্ভব, আপনি সমস্তই করিয়াছেন, এবং আপনার এই দিনেব বীরত্ব মনুষ্য মাত্রেব স্মৃতি পথে বিদ্যমান থাকিবে।’ তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন। “সত্য বটে, ভাগ্যের সহিত বিবাদ করিতে কেহই সমর্থ নহে। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার মৃত্যু শ্রেয়ঃ ছিল, কিন্তু অদৃষ্ট বশত এখানে আনীত হইয়াছি। এই লোকেরা আমার নিকট মুক্তি মূল্য চাহিতেছে উহাদের প্রার্থিত অর্থ প্রদান করাও আমার পক্ষে হুঙ্কর নহে: কিন্তু এই স্থানে এই সময়ে উহা সংগ্রহ নিতান্ত অসম্ভব। আপনি আমার পিতাব বন্ধু ছিলেন, এবং নবাব সুলজাব পবিবাববর্গেব সহিত আমার পরিবাবেবও চিবকাল বন্ধুতা ছিল, আমার পিতা তাহাদেব অনেক উপকারও করিয়া ছিলেন। যদি নবাব বাহাছব আমার মুক্তিব জন্য আপাততঃ অর্থ প্রদান করেন তাহা হইলে ঐ উপকার আমি কখন ভুলিব না।” আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম যে নবাব কখনই পরাস্থ হইবেন না এবং কত টাকা দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলাম। মতিলাল বলিল যে ৭ লক্ষ টাকাব দাবি হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় কিছু কমে মিটিতে পারে। আমি প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম নজী-বুদৌলা নবাবেব সহিত উপবিষ্ট আছে। যে কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলাম তাহাব সমুদয় নবাবেকে নিবেদন করিলাম। কিন্তু জানিতাম যে নজীবের সহিত জঙ্গুজীব ও তৎপরিবারের চিবশক্রতা আছে, পাছে নজীব জানিতে পারে যে জঙ্গুজী জীবিত ধৃত হইয়াছে, একারণ সে কথাব কোন উল্লেখ না করিয়া শিবিরান্তরে প্রস্থান করিলাম। আমার মুখ দেখিয়া নজীবের সন্দেহ হইল।

সে নবাবকে বলিল, মহাশয় কাশিবাজের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে তাঁহাব আরও কিছু বলিবার আছে, আমার সম্মুখে বলিতে পাবিতেছে না । নবাব সূজা বলিলেন, যে তত্ত্বতষেব মধ্যে গোপন কিছুই নাই এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা নিবেদন কবিত্তে আদেশ করিলেন এবং গঙ্গাব নামে শপথ কবাইলেন, যে নজীব উপস্থিত আছে বলিয়া কোন কথা গোপন কবিব না । কাজেই আমাকে সমস্ত কথা বলিতে হইল । নজীব আত্মগোপনে বিশেষ সমর্থ ছিল, বলিল যে শত্রুকে একপ অবস্থায় উদ্ধার কৰা মহাপুরুষেব নিতান্ত কৰ্ত্তব্য ও উপযোগী বটে, আরও বলিল, মহাশয় জঙ্গু-জীব মুক্তি মূল্য নিৰ্দ্ধারণ ককন আমি তাহাব অৰ্দ্ধেক নিজ হইতে দিব । বাহিবে এইকপ ব্যক্ত কবিয়া ক্রিয়ৎক্ষণ পবে বিদায় গ্রহণপূৰ্ব্বক নজীব প্রধান উজীরেব নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় কথা বলিল ।

যেমন নজীব সন্ধিয়াব বংশ উন্মুলনে কৃতসংকল্প, তেমনি ওদিকে উজীর বলি খাঁও ববথোবদাব খাঁও সহিত মহতী শক্ততা ছিল । উজীর এই গোপনীয় কার্য্যে লিপ্ত থাকাব ব্যপদেশে ববথোবদাব খাঁও অনিষ্ট সাধনেব সূচি পাাইলেন । উভয়ে মিলিয়া তৎক্ষণাৎ ছবানী সাহেব নিকট গিয়া সব কথা জানাইলেন । সাহ, ববথোবদাব খাঁকে ডাকাইয়া জঙ্গুজীকে গোপন বাখাব কথা জিজ্ঞাসা কবিলে, ববথোবদাব “ কিছুই জানি না ” বলিয়া একবাবে অস্বীকাৰ কবিল, উজীর বলি ঐ কথা প্রমাণ কৰাইবাব জন্য আমাকে ডাকাইলেন, কিন্তু ববথোবদাব খাঁ তখনও অস্বীকাৰ কবিত্তে লাগিল । অতএব ছবানী সাহ নিমকটী সেনাকে উক্ত সরদাবেব শিবাবে থানাতল্লাসী কবিত্তে আদেশ কবিলেন । অন্য উপায় না দেখিয়া ববথোরদাব খাঁ তৎক্ষণাৎ স্নানচৰ-গগকে গোপনে সাহেব সেনা পৌছিবাব পূৰ্বেই মহাবাহু বন্দিদ্বয়কে বধ কবিয়া দেহ প্রোথিত কবিবাব অনুমতি পাঠাইল । ছৰ্ভাগ্যদেবেব প্রাণ এইরূপে বিনষ্ট হইল ।

ইব্রাহীম খাঁ গাদী নবাবসূজাব শিবাবে বন্দি ছিল, নবাব তাহাকে গোপনে লক্ষণে প্রেরণ কবিবাব মানস করিষাছিলেন, কিন্তু ছবানী সাহেব অনুচবেবা অবগত হইয়া সংবাদ করিলে, সাহনবাবকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন তিনি প্রথমতঃ অস্বীকার করিষাছিলেন । কিন্তু পরিশেষে সাহেব অনুবোধ ও গোসামুদী এড়াইতে না পাবিয়া স্বীকাৰ কবিলেন । বোধ হয় পূৰ্বেই ষড়যন্ত্র

ছিল, কথা স্বীকার করিবা মাত্র বহুসংখ্যক ছবানী সেনা নবাবের শিবিরে
বেষ্টন পূর্বক এই বলিয়া চিৎকার কবিত্তে লাগিল “ইব্রাহীম খাঁ আমাদের
পরম শত্রু, আমাদের জাতীয় বহুলোক হত্যা কবিলেছে, উহাকে আমাদের
হস্তে অর্পণ কবা ইউক, নতুবা কে উহার অভয় দাতা দেখাইয়া দেও, আমরা
তাহাকে আক্রমণ কবিব ।” নবাব সুজাউদ্দৌলা পার্শ্বস্থিত তববাবিতে হস্ত
ক্ষেপণ করিয়া বলিলেন “এই আমি, এখানে উপস্থিত আছি ।” ব্যাপার
শুণ্যতব হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া উজীর বলি খাঁ নবাবকে জনান্তিকে এই
বলিয়া বুঝাইলেন, যে ইব্রাহীমকে ১ সপ্তাহের জন্য তাহাব উজীরেব নিকট
রাখা ইউক, তৎপবে তাহাকে নিবাপদে প্রত্যর্পণ কবিলার অঙ্গীকার কবিলেন ।
নবাব প্রতারণা সন্দেহ কবিয়া প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই, কিন্তু বলি
খাঁ কোবাণেব শপথ পূর্বক বলিল, যে ইব্রাহীমের কোন বিপদ হইবে না ।
সুতরাং নবাব ইব্রাহীমকে আনাইয়া উজীরের হস্তে সমর্পণ কবিলেন ।

আহম্মদ সাহ ইব্রাহীমকে আনাইয়া অপমান-হুচক বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন,
“তো’রমত সাহসী বীবেব একি দশা ঘটয়াছে ?” ইব্রাহীম প্রত্যুত্তর কবিল,
‘মহাশয়, অদৃষ্টের উপর কাহাবও হাত নাই, আমার প্রভু হত হইয়াছেন,
‘এবং আমিও আহত ও বন্দি, যদি বাঁচিয়া উঠি, আব আপনাব সবকাবে ভৃত্য
নিযুক্ত কবেন তো সদাশিবের জন্ত যে প্রকার উৎসাহ দেখাইয়াছি, আপনাব
জন্তও সেইরূপ দেখাইব ।’ সাহ উহাকে বলি খাঁব তত্ত্বাবধাবণে থাকিতে
অনুমতি কবিলেন ।

ইব্রাহীমের উপর ভয়ানক নিষ্ঠুর ব্যবহার হইতে লাগিল । অবশেষে
ছবানীবা তাহাব আহত স্থানে বিষ প্রয়োগ কবায় সপ্তম দিনে তাহার মৃত্যু
হইল ।

যুদ্ধের পবদিন, আহম্মদ সাহ মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক অশ্বারো-
হণে রণভূমি পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন । ঐম্মে মৃতদেহের ৩২ টা স্তম্ভ
দেখিলেন; হতভাগারা পশ্চাত্তরের নিকট থাকিয়া যুদ্ধ কবিত্তে করিতে নিধন
প্রাপ্ত হইয়াছিল । তান্ত্রিক মহাবাহু পবিখা এবং পানিপতের চতুষ্পার্শ্বস্থ জঙ্গলা-
বৃত ভূমি মৃতদেহে পবিপূর্ণ । সাহ পানিপত নগবে প্রবেশ কবিলেন এবং বু-
আলি কলন্দেব (ফকীর) দরগাহ দেখিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন কবিলেন ।

নবাব সুজাউদ্দৌলা শতাধিক পাণ্ডবাহক ভিত্তি সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে

মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিগণের বিশেষতঃ সদাশিব বাও ভাওয়েব মৃতদেহ অন্বেষণ করিবার জন্য অনেকানেক দেহ ধোত কবাইলেন । তাঁহাকে এই কার্যে সহায়তা কবিবার মানসে তিনি সেনাধর পণ্ডিত ও গণেশ পণ্ডিত নামক মহারাষ্ট্রীয় উকিলদ্বয় এবং আর কএক জন মহারাষ্ট্রীয় বন্দিকে (ইহাবা প্রায় সকল মহারাষ্ট্রীয় প্রধান পুরুষদিগকে চিনিত) সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন । তাহারা যশবজ্জাবাও গোবার, পাল যদুব পুত্র, এবং অন্যান্য ব্যক্তির মৃত দেহ পাইল ।

পবদিন ভাওয়েব দেহ পুজানুকূলে অন্বেষণের জন্য অনুমতি হইলে, সম্বাদ আসিল, যে ১৫ জোশ দূবে একটা কবন্ধ পাওয়া গিয়াছে, উহাকে ভাওয়েব দেহেব ন্যায় বোধ হইতেছে । নবাব সূজা তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়া শব ধোত কবাইলেন । ঐ শবেব নিকট তিন চাবি শত টাকা মূল্যেব কএকটা উৎকৃষ্ট মুক্তা পতিত থাকায় উহা যে কোন প্রধান পুরুষেব দেহ তাহাতে স্মার সন্দেহ রহিল না । সেমাধর পণ্ডিত এবং মহারাষ্ট্রীয় বন্দীগণ ঐ মুক্তা দেখিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে বলিল, ঐ দেহসদাশিবেয়ই বটে । অধিকন্তু তাহাবা জানিত সদাশিবেব শরীবে কয়েকটা চিহ্ন ছিল; ঐ শবদেহেও সেইচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে । যথা (১) তাহার উরু দেশে মুদ্রাব পরিমাণ একটা ক্ষত চিহ্ন (২) পৃষ্ঠে এক কুঠাবাঘাত চিহ্ন—ইহা সদাশিব মজাফর খাঁব হস্ত হইতে পাইয়া ছিলেন, (৩) পদমূলে সৌভাগ্য ব্যঞ্জক পদ্ম মুখ চিহ্ন । সকলে জ্ঞাত ছিল না যে সদাশিব প্রত্যহ সূর্য্য সমীপে ১২০০ বাবশত বার প্রণাম কবিতেন, তজ্জনিত চিহ্নও ঐ শব দেহের হস্তে ও জানুদেশে লক্ষিত হইতে ছিল । হত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৩৫।৩৬ বৎসর । একজন দুরানী কিঞ্চিৎ দূবে দণ্ডায়মান থাকিয়া হাস্য কবিতো ছিল, আমি দেখিয়া নবাবকে নিবেদন করিলাম যে বোধ হয় ঐ ব্যক্তি এই মৃত দেহ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাত থাকিতে পাবে । তাহাকে জিজ্ঞাসা কবায় সে এইরূপ বলিল “ আমি যুদ্ধকালে অনেকবাব এই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি ; ইনি অত্যন্তম অশ্বে আবোহণ করিয়াছিলেন । যুদ্ধকালে দুইটা অশ্ব তাহার নিম্নে হত হইয়াছে, অবশেষে অনেকগুলি আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় ইনি তৃতীয় অশ্ব হইতে অবতরণ কবিতো বাধ্য হইয়াছিলেন । ঐ সময়েই মহারাষ্ট্র সেনা চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল, কিন্তু তখনও এইব্যক্তিব মনঃ-চ্যুতি ঘটে নাই । ইহাব পরিচ্ছদ উত্তম ছিল । তাহাতে হীবক জড়িত ছিল ।

ইনি একটা ছোট শূণ্য হস্তে ক্রমে পাছু হটিতে লাগিলেন । কিন্তু তখনও মুখে সাহসেব লক্ষণ বিদ্যমান । আমবা কএকজন অলঙ্কারলোভে ইহাকে অনুকরণ কবিলাম, পবে বেটন কবিষা জিজ্ঞাসিলাম “তুমি কে ? কোন প্রধান সর্দার বা স্বয়ং ভাউ ? আবও বলিলাম, তোমাব ভয় নাই, তোমাকে মানিব না, যেখানে বদা, সেইখানে লইয়া যাইব । এ ব্যক্তি কোন প্রত্যাশাব না কবায় আমার এক জন সঙ্গী ক্রোধাক্ত হইয়া ইহাকে শূলে বিদ্ধ কবিল, এ ব্যক্তিও তাহাব প্রতি শূল নিক্ষেপ কবিল, স্তম্ভবাৎ আমবা ইহাব মতক ছেদন কবিলাম । কিন্তু মৃত্যুব পূর্বে এ আমাদের দুই তিন জনকে আহত কবিয়াছে । ইহাব মণ্ড আব এক জনেব নিকট আছে ।” এই শেষ বথা সত্য নহে, কাবণ ইহা এই নিকট হইতে পবে মুণ্ড বাহিব হইয়াছিল ।

বালা-বিবাহ ।

বিজয় ও বসন্তের কথোপকথন ।

বিজয়।—দেখ বসন্ত, বালা-বিবাহ-প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত থাকাতো যে আমাদের কত দূর পর্যন্ত অনিষ্ট সাধন হইতেছে তাহা বলা যায় না । এষ্ট প্রথাব বশবর্তী হইয়াই আমবা হীনবীর্য হইয়া পড়িতেছি । পাঠ্যাবস্থাধ বিবাহ হইলে, বালকদের মন নারী-প্রেমেব দিকে প্রদাবিত হয় । তাহাবা নানা প্রকাব স্মৃতিব আশ্বাদন পাষ, বিলাসিতা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ কবে, কত প্রকাব শকেব লহবী তাহাদের মনোমধ্যে খেলিতে থাকে । এই সমুদায় পূর্ণ কবিবাব জন্যই তাহাবা ব্যতিব্যস্ত হয়, লেখা পডাব দিকে আব তাহাদের মন থাকে না । বিশেষতঃ অল্প বয়সে স্ত্রী-সন্তোষ কবিগে শবীব দুর্বল ও মস্তিষ্ক তেজো-হীন হইয়া পড়ে । কেহ কেহ বলেন, কি স্ত্রী কি পুৰুষ যৌবনাবস্থাব উপনীত হইলেই তাহাদিগকে বৈবাহিক হস্ত্রে বন্ধন করা উচিত । স্বভাবই বিবাহেব সময় নিদিষ্ট কবিয়া দিয়াছেন । খোদাব উপব আবাব খোদকাবী কেন ? কিন্তু এই যুক্তিটা সর্মাচীন নহে । প্রকৃতিব নিকট হইতে আমবা সকল বিষয়ে উপদেশ লইতে পারি না । পণ্ড, পক্ষী বেকপ কার্য কবে, জ্ঞান-সম্পন্ন মনুষ্য কি তাহাব অনুকরণ কবিতো পাবে ? পৃথিবীব অসভ্য লোকদিগের মধ্যে কোন কোন দাঁশব বৃত্তি দেখা গিয়া থাকে এবং প্রাচীন ইতিহাস পাঠেও

আমরা অবগত হই যে, আদিম মনুষ্যাগণ প্রথমে পশুদেব মত ব্যবহার করিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, মনুষ্য যত সভ্য ও উন্নত হইতে থাকে তত পার্শ্ব আচরণ সকল একে একে পবিত্যাগ করে। এইরূপে স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলনে অনেক উন্নত ভাব লক্ষিত হইতেছে। সে দিন নব্য-ভাবতে একটি উদাহরণী দৃষ্টান্ত দেখিলাম। দৃষ্টান্তটি এই :—কঠিন সামগ্রী চিবাইবার জন্য আমরা দস্ত পাইয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া দস্ত উঠিতে উঠিতে শিশুকে কঠিন জিনিষ খাইতে দেওয়া কি উচিত? বরং ইহাই কি বিহিত নহে যে, যতদিন শিশুর দস্ত কোমল থাকে ততদিন যাহাতে সে কোন কঠিন দ্রব্য ব্যবহার করিতে না পারে তৎপক্ষে যত্নবান হইতে হইবে? সেইরূপ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, যৌবনে প্রাপ্ত হই তাহাদিগকে বৈবাহিক সূত্রে বন্ধন করা উচিত নহে। এ গিনন হইতে মন্দ ফলই ফলিয়া থাকে—যুবক ও যুবতী তেজোহীন হইয়া পড়ে। তাহাদের যে সম্ভান জন্মে তাহা অপরিণত ও বীর্যহীন হয়।

বসন্ত।—ভাই বিজয়। তুমি যাহা বলিলে তাহা যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় বটে। তোমার কথায় অনেক সাব আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল দিক না দেখিয়া কোন বিষয় স্থির করা উচিত নহে। তুমি বলিলে যে আমাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকিতে আমরা হীনবীর্য হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু এ নালিশ আজ কালই শুনা যাইতেছে। ৩০৪০ বৎসব পূর্বে ত ইহা শুনা যায় নাই। সে সময়ের স্ত্রী-পুরুষগণ বিলক্ষণ বর্ধিত ছিল। কিন্তু তখনও বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল। আমরা বিবেচনা কর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীই সমবিক অনিষ্টের কারণ। বালকগণ অসময়ে আহাৰ করিয়া বিদ্যা লগে গমন করে, পৰীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য যৎপর্বোনাশি পবিশ্রম করে, এই জন্যই আমাদের বালকগণ তেজোহীন হইয়া পড়ে। ইহাব উপর বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের জনবায়ু ভাল নহে। তুমিও দেখিয়াছ চতুর্পাঠ্য ছাত্রগণ কেমন মনের আনন্দে থাকিত। তাহাদের শরীরে দৌর্য্য দেথা যাইত না। আমাদের মধ্যে রুশক ও মজুবদারদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও প্রতীয়মান হইবে যে, তাহাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত সত্ত্বেও তাহারা কেমন বর্ধিত। পৰীক্ষা-রূপ বিভীষিকা তাহাদের ভয় দেখায় না, মানসিক পবিশ্রম তাহাদের নাই, অল্প শারীরিক পবিশ্রম আছে; এই জন্যই তাহারা স্বাস্থ্য-সুখ অশ্রুত করে। আমাদের বালকদের মধ্যে যৎপর্বোনাশি মানসিক পবিশ্রম আছে, অল্প

কোনকপ শবীবের চাণনা নাই । এই নিমিত্তই তাহারা ক্ষীণকায় হইতেছে । তুমি বলিলে, যে, পাঠ্যাবস্থা বিবাহ হইলে বালকের মন নাবীপ্রেমের দিকে প্রধাবিত হয় । এ আশঙ্কায় কোন কাবণ নাই । কারণ বালকগণ পবীক্ষা দিব্যবজনা এত বাস্তব হয় যে, কোন বাধাই তাহাদিগকে সে উৎসাহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না । আমাব বিবেচনায় এ কঠোর পবিশ্রম হইতে বালকদের মন যদি কিয়ৎপরিমাণে বমনীয় বিশুদ্ধ প্রেমালাপে ব্যথিত হয়, তাহা তাহাদের পক্ষে কল্যাণপ্রদ । ইহাতে তাহাদের জীবন মধুময় হয় এবং কঠোর পবিশ্রম তাহাদের পক্ষে ভাববহ বলিয়া বোধ হয় না । তুমি যে শিশুর কোমল দস্তের তুলনাটীর উল্লেখ করিলে তাহা শুনিতে যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু বল দেখি, দাঁত উঠিলে শিশু কি ক্রমে ক্রমে ভাত খাইতে অভ্যাস করে না ? অন্নপ্রাশন সংস্কারটা কেন হইয়া থাকে ? শিশুর ভাত খাইতে দেওয়াই তাহাব উদ্দেশ্য । অন্নপ্রাশন হইতেই শিশু অল্প অল্প কবিতা ভাত খাইয়া থাকে । ইহাতে ত তাহাব কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না । বরং ভক্ত লোকের বাটীর শিশুর অনেক দিন পর্যন্ত দুধ পান করিতে দেখা যায় । ছঃখীদের মধ্যে তাহাও ঘটে না—তাহাদের শিশুরা শীঘ্রই ভাত খাইতে আরম্ভ করে, অথচ তাহাদের দন্ত কেমন কঠিন তাহারা কেমন বলিষ্ঠ । অবশ্য দাঁত উঠিয়াছে বলিয়া যে শিশু দস্তের দ্বারা সুপাবি ভাঙ্গিবে, আমি একথা বলিতেছি না, তবে তাহার পক্ষে যাহা উপযোগী তাহাই তাহাকে দেওয়া উচিত । সেইরূপ যৌবনের প্রাবল্যে, নব-নাবীর দগ্ধিলন অনিষ্টজনক হইতে পারে না । তবে, অতিরিক্ত স্ত্রী-সম্বোগ হইতে যে মন্দ ফল ফলিয়া থাকে তাহা কে না স্বীকার করিবে ?

বিজয়।—ভাই বসন্ত ! তোমাব কথায় আমি সাধ দিতে পারি না । আমি একথা স্বীকার করি যে অসময়ে তাহাব ও অতিবিক্ত পবিশ্রমের দরুন আমাদের বালকগণ দুর্বল হইয়া পড়ে । ইহা যাহাতে সংশোধিত হইতে পারে, তৎপক্ষে অভিভাবকদের যত্নবান হওয়া উচিত । যাহাতে তাহাবা ব্যায়াম-চর্চা করে তৎপক্ষে উৎসাহ প্রদান করা উচিত । আমি দেখিয়াছি, বালকগণ খেলা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের অভিভাবকগণ তৎপক্ষে বাধা দিয়া থাকেন । ইহা অতীব অন্যায় । বালকেরা যে দৌড়াদৌড়ী করিয়া 'হাড় ডুহ' " নুন কোট " প্রভৃতি খেলা করিয়া থাকে, ইহা একপ্রকার

ব্যায়ামের কার্য। হাঁহাতে বাধা দেওয়া উচিত নহে। তবে, অতিবিক্ত
 কিছুই ভাল নহে। ভূমি ৩০।৪০ বৎসরের পূর্ববাব বথাব উল্লেখ করিলে,
 কিন্তু অন্যান্য কাবণ বশতঃ তখনকার লোক বলিষ্ঠ থাকিত। কিন্তু, তাই
 বলিয়া অন্য বয়সে স্ত্রী-সম্বোগে যে অনিষ্ট হয় না তাহা কে স্বীকার করিবে ?
 এ ব্যবহারটা না থাকিলে তখনবাব লোক আরো অধিক বলিষ্ঠ হইত।
 স্ত্রী-সম্বোগে যে শরীর দুর্বল ও মস্তিষ্ক তেজোহীন হইয়া পড়ে তাহা কি
 ভূমি অস্বীকার করিতে পার ? একবার প্রাচীন কালের কথা আলোচনা
 কর। প্রাচীন আর্য্যদেব মধ্যে কিরূপ পদ্ধতি ছিল বিবেচনা কর দেখি।
 যে সময়ে দ্বিগুণ অনুন্ন দ্বাদশ বৎসর গুব-গৃহে থাকিয়া শাস্ত্র আলোচনা
 করিত। স্মৃতলাং ১৫।৩০ বৎসর বয়সে তাহারা বিবাহ হুতে বদ্ধ হইত। স্ত্রী-
 যৌবনদেবও যে অধিক বয়সে বিবাহ হইত তাহাবও অনেক পেরাণ দেওয়া
 যায়। কাবণ একরূপ একটি নিদিষ্ট ছিল যে, যত দিন কন্যা পতি-মর্যাদা
 বুঝিতে না পারিবে, তত দিন তাহাকে বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। পুরাক-
 কালের স্মরণ-প্রথা হইতে সহজেই সিদ্ধান্ত হয় যে, তখন বয়স্করণ অধিক
 বয়সে গর্ভবীতা হইত।

বাল্য-বিবাহ হইতে আব একটা বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। আমাদের
 যুবকগণের উপর অল্প বয়সে সংসারের ভার নিপতিত হওয়াতে তাহারা লেখা
 পড়া উন্নতি করিতে পারে না। তাহাদিগকে শীঘ্র বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া
 কোন একটি সামান্য চাকরি স্বীকার করিতে হয়। ইংবাজদের দিকে একবার
 দৃষ্টিপাত কর। তাহারা উপায়ক্ষম না হইলে, বিবাহ করে না। স্মৃতলাং অল্প
 বয়সে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। তাহারা জ্ঞান লাভ করিতে
 বিলক্ষণ সময় পায়। আব ইহা কি অস্বীকার যাইতে পারে যে ইংবাজদের
 মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই বলিয়া, তাহারা কি বল-বীর্য্যে, কি বিদ্যাশ,
 সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে ?

বসন্ত।—ভাই বিজয় ! স্ত্রী-সম্বোগে যে শরীর দুর্বল হয় তাহাও আমি
 অস্বীকার করি না। আমিও পূর্বে বলিয়াছি যে অতিবিক্ত কিছুই ভাল
 নহে। জীব-প্রবাহের মধ্যে ভগবানের কোণাল দেখা উচিত। পিতা-মাতার
 বলবীর্য্য ক্ষয় না হইলে সন্তান উৎপত্তি হয় না। পুরুষ উদ্ধবেতা হইয়া
 থাকুক এবং স্ত্রী দুর্গাবী হইয়া কাশ, শ্বাসন করুক, দেখিবে তাহারা কেমন

বলিষ্ঠ হইবে । পুণ্যেব চল্লিশ বৎসবে এবং বর্গ ব ৫০ বৎসবে বিবাহ হউক, দেখিবে, তাহাদেব মিলনে যে সকল সম্ভান উৎপত্তি হইবে তাহাবা বিলুপ্ত বলশালী হইয়া মনের আনন্দে বিরাজ কবিবে । তাই বলিয়া কি, এত অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত ? ইংবাজদেব মধ্যে এ প্রকাব বিবাহ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু, তাহা হইতে কি উত্তম ফল ফলিতেছে ? আমি স্বীকার কবি যে, ইংরাজেবা অল্পবয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ কবিত্তে বাধ্য হয় না । কিন্তু, অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হওয়াতে, কি পুরুষ কি স্ত্রী তাহাদেব মধ্যে যে ঘোব অত্যাচার হইতেছে, তাহা কি তুমি অস্বীকার কবিত্তে পাব ? সে দিন অধ্যাপক মোক্ষমুলাব সাহেব য়েং মালাবাবিকে লিখিয়াছিলেন “ বাল্য-বিবাহ বহিত কবিবাব চেষ্টা কব তাহাতে আমাব কোন আগতি নাই ; কিন্তু, সাবধান, ইউরোপেব প্রথা যেন অলুকাবণ কবা না হয়—অর্থাৎ অধিক বয়স পর্য্যন্ত কি পুরুষ কি স্ত্রী অবিবাহিত থাকাত্তে, ইউরোপে য়ে অনিষ্ট হইতেছে, তাহা যেন ভারতবর্ষে দেখিত্তে না হয় । ” ফল কথা এই যে, কেবল শারীরিক উন্নতিব দিকে লক্ষ্য কবিলে চলিবে না । চবিত্ত্রকে পবিত্ত্র রাখা কৰ্ত্তব্য । বদি আমাদেব বালকগণ ব্যভিচার দোষেই লিপ্ত হইল তাহা হইলে আর তাহাদিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত বাখিবাব ফল কি ? এই জন্যই বিবেচক ব্যক্তিগণ তাহাদেব সম্ভানদিগকে যৌবনেব প্রারম্ভেই বিবাহ দিয়া থাকেন ।

তুমি য়ে বলিলে, অল্প বয়সে সংসাবেব ভাব বহন কবিত্তে হয় বলিয়া বালকদেব উন্নতিব পক্ষে ব্যাঘাত হয়—এ কথাটি অতি অল্প বালকেব পক্ষেই বটে । যাহাবা সম্পন্ন নহেন, তাহাবা তাহাদেব বালকদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিত্তে সক্ষম হয়েন না । ইহা গৃহস্থেব অবস্থা উপর নির্ভব কবে—বিবাহ হওয়া না হওয়ার উপব নহে । আমাদেব কেবল স্ত্রী লইয়াই সংসাব নহে । পিতা-মাতা ও ভাই-ভগ্নীব ভবণ-পোষণেব জন্য অনেক বালককে বিদ্যালয় ত্যাগ কবিয়া চাকরী চেষ্টা কবিত্তে হয় । আবাব, অল্প বয়সে বিবাহ হওয়াতে কোন কোন বালকেব স্তুবিবাও হইয়া যায় । কন্যাব পিতা সম্পন্ন হইলে তিনি তাহাব জামাতাকে উত্তমরূপে লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন । আব, কোন কোন বালক যদি বিদ্যালয় ত্যাগ কবিত্তে বাধ্য হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? যাহারা অধিক পড়িল, তাহাব না হয় উকিল ও ডাক্তার হইল । আব যাহাবা অল্প পড়িল,

তাহারা না হয় কেবাণীগিবি স্বীকাৰ কৰিল। কেবল অৰ্থাগমেৰে ত'বতম্য মাত্ৰ শিক্ষা সম্বন্ধে ত এ উভয় দলেৰ মণ্যে কোন প্ৰভেদ দেখি না। যাহাবা অধিক কাল বিদ্যালয়ে থাকেন, তাহাবা পৰীক্ষা দিবাব অহুবোধে অধিক মুগ্ধ কৰেন এবং তাহাব ফল স্বৰূপ উত্তম চাকৰী প্ৰাপ্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহাদেব প্ৰকৃত শিক্ষা হয় কই ? ববং ইহা দেখা যায় যে যাহাবা একপ শিক্ষা লাভ কৰিয়া সমধিক অৰ্থ উপাৰ্জন কৰেন, তাঁহাদেব মণ্যে অনেকেই অত্যাচাৰী হইয়া পড়েন। আৰাব যাহাবা অল্প পড়িয়া বিদ্যালয় ত্যাগ কৰিতে বাধ্য হইয়াছেন তাঁহাদেব মণ্যেও অনেককে নিজ চেষ্টায় উন্নতি লাভ কৰিতে দেখা গিয়াছে, এবং বলিতে কি, কেহ কেহ, কি বিদ্যায় কি চৰিত্ৰে, সমাজেৰ শীৰ্ষস্থান পৰ্য্যন্ত অধিকাৰ কৰিয়াছেন।

বিজয়।—তাই বসন্ত ! তুমি বলিলে যে বালক ও বালিকাদেব চৰিত্ৰ পবিত্ৰ বাখিবাব জন্য বাল্য-বিবাহ বাঞ্ছনীয়। একথাটী শুনিতে বড় ভাল। কিন্তু পবিত্ৰতা কাহাকে বলে তাহা একবাৰ বিবেচনা কৰা উচিত। অতিবিক্ত ইন্দ্ৰিয়-সন্তোষ আমাব বিবেচনাৰ অপবিত্ৰ। চিত্তকে সংযত বাখা কৰ্ত্তব্য, নতুবা কি পুৰুষ, কি স্ত্ৰী, কেহই পবিত্ৰ ভাব গ্ৰহণ কৰিতে পাবে না। বাল্য-বিবাহ, পবিত্ৰ ভাব পোষণেৰ পক্ষে বিষম অন্তৰায়। কোথায় বালক বালিকাৰ মন নানা প্ৰকাৰ সম্ভাবে পৰিপূৰ্ণ থাকিবে, না, তাহাদেব মনকে দাম্পত্য-প্ৰণ-দেব দিকে লইয়া যাওয়া হয়। আৰ ইহাও নিশ্চয় জানিবে যে, বালক ও বালিকাৰ মন একটা নূতন স্বেৰেৰ আশ্বাদন পাইয়া, ইন্দ্ৰিয়-সন্তোষেৰ দিকে অধিক পৰিমাণে বত হয়। ইহা কি অনিষ্টজনক নহে ? ইহাকে কি ব্যাভিচাৰ বলা যায় না ? আমাদেব সমাজে সতীত্ব ধৰ্ম্মেৰ বড় গোবব। হিন্দু-ৰমণী সতী বলিয়া সৰ্ব্বত্ৰ গোববাসিতা। কিন্তু, আমবা যাহাকে সতীত্ব বলি, ইহা কি প্ৰকৃত সতীত্ব ? আপনাৰ মানসিক বলে যে আত্ম-সংযম কৰিতে না পাবিল তাহাকে কি সতী বলা যায় ? ৰমণীকে কঠোৰ শাসনে বাখিলাম, গৃহেৰ মণ্যে তাহাকে কষ্ট কৰিলাম, যদ্যপি কাহাবো কখন পদ স্পৰ্শিত হইল, তাহাকে ব্যাভিচাৰিণী বলিয়া সমাজ হইতে বাহিব কৰিয়া দিলাম, একপে সতীত্ব বাখা গোৱবেৰ বিষয় নহে। ৰমণীকে পবিত্ৰ বাখিবাব জন্য আমবা এইৰূপে ব্যস্ত, কিন্তু পুৰুষদেব সম্বন্ধে আমবা কি কৰিয়া থাকি ? হিন্দু-সমাজে, পুৰুষ পৰমেশ্বৰ স্বৰূপ সে কিছুতেই কল্পিত হয় না। সে নানা কপ ব্যাভিচাৰ কৰক

হিন্দু-সমাজ তাহাকে অপবাদী বলিয়া দণ্ড করিবে না । বরং হিন্দু-সমাজের ইহাই নীতি যে, স্বামী হাজার মন্দ হউক, স্ত্রী ব তাহাবই প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হইবে ; যে না করিবে, সে প্রকৃত সতী নহে । একপ নীতি হইতে কি প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেম আশা করা যাইতে পারে ? বমলী কঠোর শাসনের অধীন হইল, আব পুরুষ নির্ভয়ে সমাজের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ।

বসন্ত ।—ভাই বিজয় ? তেমার কথাগুলি বড় উচুদবেব সন্দেহ নাই । যে বমলী আপনাকে আপনি বক্ষা করিতে পারে, সেই যে প্রকৃত রূপে বক্ষিতা একথা কে না স্বীকাব করিবে ? কি পুরুষ কি স্ত্রী, আত্ম-সংযম যে উভষেব পক্ষেই গোববেব বিষয় তাহা আমি স্বীকাব করি । কিন্তু লোকেব কি সহজে আত্ম-সংযম শিক্ষা হইয়া থাকে ? বালক ও বালিকাকে উত্তম রূপে নীতি-শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তাহাদিগকে শাসনে রাখিতে হইবে, তবেত তাহাবা ধর্ম-বলে বলীয়ান হইতে পারিবে ? কেবল বালক বালিকা কেন ? মনুষ্য মাত্রেই দুর্বল । সামান্য প্রলোভন তাহাকে বিপদগামী করিতে পারে ; অতএব প্রলোভন হইতে দূবে থাকা কর্তব্য । প্রলোভনকে অতিক্রম করা ঈশ্বরীয়েব কার্য সন্দেহ নাই । কিন্তু, একপ পবাক্রম ক'জন দেখাইতে পারে ? বালা-বিবাহ যে বালক-বালিকার চরিত্র পবিত্র বাথে তাহাতে সন্দেহ নাই । তুমি বল যে বালা-বিবাহ বালক বালিকাব কাম-প্রবৃত্তি উত্তেজিত করে । কিন্তু তুমি কি ইহা অবগত নহ যে, কত বালক গণিকালয়ে গমন কবত অত্যাচাবেব একশেষ করিয়া থাকে এবং ইহাও অপ্ৰকাশ নহে যে, কত বালক পবম্পব অস্বাভাবিক ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে । এই সকল অত্যাচার হইতে বক্ষা করিব ব জন্য, বালা-বিবাহেব প্রয়োজন । তুমি কি জাননা যে বালকগণ গোবনেব প্রাবন্তেই প্রণয়-বিষয়ক নাটক ও উপন্যাস পাঠ কবিষা নূতন বসে রসিক হইয়া উঠে । তাহাদেব উত্তেজিত মনকে শাস্ত কবা আবশ্যক । বিদুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয়ই তৎপক্ষে উপযোগী । বালক ও বালিকা সং যত থাকে ইহা প্রার্থনীয় । কিন্তু যে ব্যভিচারেব কথা উল্লেখ কবিলাম, তাহা অপেক্ষা স্বামী ও স্ত্রীর সম্মিলন কি বাঞ্ছনীয় নহে ?

বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার এই প্রকাব কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহাদের প্রাচীন অধ্যাপক রামচন্দ্র দেখা দিলেন । বালা-বিবাহ লইয়া যে তর্ক চলিতেছিল তাহাব শ্রীমাংসাব ভাব অধ্যাপক মহাশযেব

উপর অর্পিত হইল। অধ্যাপক বামচন্দ্র তাঁহার অভিপ্রায় এই কণে ব্যক্ত করিলেন।

আমাদের সমাজেব বর্তমান অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য কৰা উচিত। আমাদেব বাল্য-বিবাহ-পদ্ধতি সহিত ইংলণ্ড ও আমেরিকাৰ প্রচলিত প্রণালীৰ তুলনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, হিন্দু সমাজ অনেক অংশে পবিত্র ভাব রক্ষা কবিত্তে সক্ষম হইয়াছে। মেং মালাবারিৰ আন্দোলন সম্বন্ধে, পঞ্জাবের শিক্ষা বিভাগেব ডাইবেক্টাৰ মেং ইবেটসন সাহেব য়ে মন্তব্য প্রকাশ কবিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি উল্লেখ কবিয়াছেন যে, পঞ্জাবের যে ২ অঞ্চলে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত সেই সেই অঞ্চলে বমণী ঘটিত ব্যতিচার অল্প; কিন্তু যে যে অঞ্চলে অধিক বয়সে বিবাহেব প্রথা প্রচলিত সেই ২ অঞ্চলে ব্যতিচার প্রবল। অধ্যাপক মোক্ষমুলাব এসম্বন্ধে মেং মালাবারিকে যে রূপ সতর্ক কবিয়া দিয়াছেন তাহা তোমরা অবগত আছ। বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকাত্তে যে বঙ্গবাসীগণ বীৰ্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছে একথা বলা যায় না। উত্তর-পশ্চিম দেশে মাদ্রাজে ও দক্ষিণাত্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে কিন্তু সে সকল প্রদেশের লোক বিলক্ষণ বলশালী। এসম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। জাবনানি যাহা পবাত্ৰমে ইউরোপের শীর্ষস্থান অধিকার কবিত্তেছে, সে দেশে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত। অবশ্য শিশুদিগকে বিবাহ হুত্রে আবদ্ধ কৰা উচিত নহে। যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে বালক-বালিকাদিগকে বিবাহ দেওয়া উচিত। কেহ কেহ বলেন যে, যৌবনেব প্রারম্ভে বিবাহ দিলে ক্ষতি হয় না, যদ্যপি একপ নিয়মই করা যায় যাহাতে ঋতুকালের পূর্বে এব কন্যা একত্রিত হইতে না পাবে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে একপ নিয়ম আছে যে দ্বিতীয়-বিবাহের পূর্বে কন্যাকে স্বামি-গৃহে পাঠান হয় না। এ নিয়মটি উত্তম বটে। কিন্তু ইহার দ্বারা বাল্য-বিবাহ ঘটিত দোষ নিবারণ হইলেও আব একটা অন্তরায় আছে। আমাদের সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকাত্তে শিশু-বিবাহ হইতে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বাগিকাদের বৈধব্য দশা অতিশয় শোচনীয়। যৌবনেব হৃদপাত হইলেই যে পুত্র-কন্যাকে বিবাহহুত্রে বদ্ধ করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই বটে। কিন্তু আমাদের সমাজেব বর্তমান অবস্থায় আমরা আমাদের বালক-বালিকা 'চবিত্র পবিত্র

লিপিতে পারি বই ? যৌবন-প্রাপ্ত বালকগণ একত্রিত হইয়া যে কত কাঁব তাহার নির্ণয় কে করে ? তাহাদের মধ্যে কত অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব সংঘটিত হয় এবং বলিতে কি, তাহারা বালিকাগণকেও প্রলোভন কার্য্যে কলুষিত করিয়া থাকে। অনেকে, বেশ্যালাগেও গমন করিয়া থাকে। অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া যে, আমবা বালক-বালিকাদের মনকে প্রেমের দিকে আকর্ষণ করি, তাহা সত্য নহে। পূর্ব হইতেই তাহাদের মন সে দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে। বিশেষত কিছু অধিক বয়স্ক ব্যক্তিব সহবাসে বালকদের মনের ভাব বিচলিত হইয়া পড়ে। বলিতে কি, যাহারা বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করেন, তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিব প্রণীত প্রণয়-ঘটিত নাটক ও উপন্যাস পাঠে বালক-বালিকাদের মন বিশেষ রূপে কলুষিত হইয়া থাকে। অসময়ে কিম্বা অতিবিক্ত ইন্দ্রিয় ভোগের দ্বারা যাহাতে শরীর ভয় না হয়, তৎপক্ষে সতর্ক থাকা অতীব বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু পুত্র-কন্যাদের অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিলে, সে ফল পাওয়া যায় কই ? স্ত্রী সহবাস জনিত যে মন্দ ফল ফলিয়া থাকে, অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ও বেশ্যা-বৃত্তি যে তাহা অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট সংসাধিত করিয়া থাকে। বলিতে কি, কোন কোন যুবকের অত্যাচারে পাড়ার বালিকাগণকে ভাল বাখা যে কঠিন হইয়া উঠে। এত সকল পর্যালোচনা করিলে, প্রতীয়মান হইবে যে, যৌবনের পাব্যন্তই পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত।

প্রাচীন কালে অধিক বয়সে বিবাহ দিবার নিয়ম ছিল বটে। কিন্তু সে সময়ের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করা উচিত। যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার পূর্বে দ্বিজকে অন্তঃ ১২ বৎসর গুরু গৃহে বাস করত বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইত। এই কএক বৎসর বালককে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইত। বালকের মনে কোন মন্দ ভাব আসিতে পারিত না। কেবল ধর্ম্মের দিকেই তাহার মন প্রধাবিত হইত। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর ছাত্র তাহার ইচ্ছামুসাবে সংসার আশ্রয় প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন, অথবা অন্যান্য আশ্রম অবলম্বন পক্ষেও তাহার কোন বাধা ছিল না। এ দিকে কন্যাও তাহার পিতা কর্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং মাতা কর্তৃক গৃহ কার্য্যে শিক্ষালাভ করিতেন। কন্যাও যে অধিক বয়সে বিবাহ হইত, তাহার প্রমাণ আছে। প্রাচীন বাল্যবিবাহে ইহা লিখিত আছে যে, যে পর্য্যন্ত কন্যা পতি সে বা

করিতে সক্ষম না হইবে, ও পতি-মর্যাদা বুঝিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত পিতার উচিত নহে, যে তাহাকে বিবাহ-দ্বন্দ্বের বন্ধ করেন। এ প্রকার সুশিক্ষা-প্রাপ্ত বালক ও বালিকাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না দিলে, কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বর্তমান সময়ে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা বর্জিত বিদ্যাভ্যাগ উল্লিখিত পদ্ধতির উপযোগী হইতে পারে না।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি আছে। তাহা ব্যারাম চর্চা। এক একটি স্থান নির্দিষ্ট আছে যেখানে বালক ও যুবকগণ ব্যারাম চর্চা করিয়া থাকে। ইহার প্রতি তাহাদের এরূপ আকর্ষণ, যে তাহারা আমোদ প্রমোদ ভাগ্য কবিতা এই ব্যাপারেই রত থাকে। সুতরাং কুন্ডাব তাহাদের মনকে অধিকার করিতে পাবে না। এই পদ্ধতিটি বঙ্গদেশে প্রবর্তিত হওয়া উচিত।

বর্তমান সময়ে প্রাচীন কালের পদ্ধতি অল্পসারে বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু যতদূর সম্ভব তাহাদের মনকে ধর্মভাবে অনুব্রজিত করা কর্তব্য। এই নিমিত্ত প্রত্যেক পল্লীতে এক একটি ধর্ম-শিক্ষালয় সংস্থাপিত হওয়া উচিত। এই শিক্ষালয়ে সুপণ্ডিতজনগণ কর্তৃক ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইবে এবং বালকগণ নিয়মমত ধর্ম উপদেশ শ্রবণ করিবে। লোকেব মনে ধর্ম ভাব উদ্দীপন করিবার আর একটি উপায় আছে। ইহা কথকতা। এতদ্বারা কি দ্রী কি পুণ্য, কি বালক কি বৃদ্ধ, সকলেরই উপকার হইবার সম্ভাবনা। প্রত্যেক পল্লীতে ধর্ম শিক্ষালয় সংস্থাপিত না হইতে পাবে। কিন্তু কথকতা যাহাতে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া সকলেরই উচিত। এতদর্থে পল্লীস্থ সকলের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলে কথক মহাশয়ের ব্যয় সংকুলন হইতে পারিবে। কথক মহাশয় পর্য্যাক্রম্যে গৃহস্থের বাটীতে শাস্ত্র হইতে উত্তম উত্তম বিষয় ব্যাখ্যা করিবেন। গৃহস্থের নিজ বাটীর লোক এবং প্রতিবাসীগণ একত্রিত হইয়া ধর্ম কথা সকল শ্রবণ করিবেন। লোকেব মনে ধর্মভাব উদ্দীপন করিবার পক্ষে কথকতা একটি প্রকৃষ্ট উপায় এবং তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া সকলের বিশেষ কর্তব্য। 'ব্যারাম চর্চা' এবং উল্লিখিত প্রণালী অল্পসারে ধর্ম-শিক্ষা প্রদত্ত হইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইবে যদি অভিজ্ঞ-বিশ্বাস-বালক বালিকগণকে উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাইতে না পারেন। যে ব্যক্তি নিজে বাস্তবিকরূপে কি প্রকারে তাহার সম্ভাবনাকে সচরিত্র দেখিবার আশা করিতে

পাবে ? পল্লীর মধ্যে বাঁহারা জানী ও কৃতবিদ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করা উচিত । কারণ, শোক তাঁহাদেরই অল্পকরণ করিয়া থাকে । কল কথা এই, সম্ভাব্য গণকে অশিক্ষা প্রদান করিলে ও তাহাদের সমক্ষে উত্তম দৃষ্টান্ত ধারণ করিলে, যে অচ্যুত কল ফলিবার সম্ভাবনা তৎপক্ষে সন্দেহ নাই । আমার বিবেচনার বাহা সমুচিত তাহা তোমাদের সমক্ষে বিবৃত করিলাম । তোমরা যে উত্তম বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাক, ইহা দেখিয়া সুখী হইলাম ।

সাহেব চোর ।

বাক্সালী ব ন্যার সাহেবদিগের মধ্যেও চোবের অভাব নাই । কিন্তু বাক্সালীতে এবং সাহেবে যেমন বলবীর্য্যে এবং বুদ্ধি-কৌশলে প্রভূত প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তেমন বাক্সালী এবং সাহেব চোরেও বিলক্ষণ প্রভেদ আছে । বাক্সালীর মধ্যে আরই অতি হীন জাতীর লোকে দল্ল্য বৃত্তি করে, কিন্তু সাহেবদিগের মধ্যে তাহা নহে । বাক্সালী চোর কদাচিত্ লেখা পড়া জানে । আমি দীর্ঘকাল পুলিশ আমলা ছিলাম এবং বহু চোব ডাকাইত আমি দেখিয়াছি, কিন্তু এই শ্রেণীর লোক আমার এমন একজনও স্মরণ হয় না, বাঁহাকে নাম দত্তথত কবিত্তে পারিত্তে কিছা অন্যরূপ লেখা পড়া জানিত্তে দেখিয়াছি । কিন্তু সাহেব চোব সম্বন্ধে সে কথা খাটে না । আমি অবশ্যই বিলাত যাই নাই এবং সাহেবদিগের সহিত আমার এমন গতিবিধি কিছা সংসর্গ করা হয় নাই বন্ধারা সাহেবদিগের সকল বিষয়ে তাহাদের সাধারণ স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমি অভিমত প্রকাশ করিত্তে পারি, কিছা আমার অভিমত বিশুদ্ধ বলিয়া পবিশ্রীত হইতে পারে । কেবল আমি বলিয়া নহে আমার ন্যার অনেক বঙ্গবাসীরই সাহেবদিগের ভিতরেব কথা জানিবার এক মাত্র উপার তাহা-দিগের নিজের লিখিত পুস্তক সকল । যে এক মুন্ডিভরা বাক্সালী ইংলণ্ডে যাইয়া সেই স্থানে বাস করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অবশ্যই প্রামাণ্য । বটে—কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য, যে বিলাত ফেরত বাবুরা অতি যুবা বয়সে কেবল বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত, ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন । স্বীয় কার্য

সাদনের নিমিত্ত দিবানাত্র ব্যস্ত ছিলেন। ইংলণ্ডের সমস্ত দৃশ্য দেগিতে গিয়া অধিবাসিদিগের সহিত সংসর্গ কবিত্তে অতি অল্প সময় ব্যয় করিতে পারিবাঁছিলেন। পবীক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত বিলাত গিয়াছেন, যাহাতে সেই পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন তাহাতেই আশাব নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া অহিনিশি লিপ্ত ছিলেন এবং পবীক্ষা দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বিশেষত তাহাদের ইংলণ্ডে বাসাবস্থায় তাঁহারা কেবল বিদ্যার্থী এবং পণ্ডিত মণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত থাকিতেন। সজ্জন এবং সচ্চবিত্রাৰ্ণিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য বকমেব ইংলণ্ডের অধিবাসিগণের সহিত আলাপ পবিচয় কবিবার আবশ্যক বিদ্যা সাবকাশ হইত না। অতএব ইহাঁদের মনে ইংলণ্ডের কেবল ভাল ভিন্ন মন্দ চিত্র অঙ্কিত হয় নাই এবং তাঁহাদের বিশ্বাস্বে তাঁহাদের অধ্যাপক এবং শিক্ষকদিগের ন্যায় এবং সেই সকল অধ্যাপক এবং শিক্ষকের স্ত্রী কন্যা ভগিনী প্রভৃতির ন্যায় ইংলণ্ডের সকল নবনাবীত ধার্মিক, নিরুদ্যম এবং পবিত্রা স্ত্রতাং আমাদেব বিলাত যাত্রীদিগের মুখে শুনিতে হইলে, কেবল ইংলণ্ড নহে সমুদায় ইউরোপ-খণ্ডই পৃথিবীর স্বর্গীয় ভাগ বোধ হইবে! ফল কথা তাঁহা নহে, দৰ্পণেব যেমন এক দিক উজ্জ্বল এবং আব এক দিক মলিন থাকে, ইউরোপীয় সমাজেবও সেইকপ ছই দিব আছে, কিন্তু সেই বিভিন্ৰতা আমাদেব স্বদেশেব অবস্থা দৃষ্টে পবিমাণ কবিত্তে পারা যায় না। আমাদেব মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ বলিয়া একটা কথা আছে বটে কিন্তু সেই প্রভেদ অল্পযাযী সাহেবদিগের ভাল মন্দেব বিবেচনা কবা অসাধ্য। ইউরোপ খণ্ডেব ভাল মাল্লযেবা খুবই ভাল এবং মন্দ লোক এমনই মন্দ, যে তাঁহা আমবা বুঝিবা উঠিতে পারি না। আকৃতি প্রকৃতি, ধন, বিদ্যা বুদ্ধি—প্রভৃতি সকল বিষয়ে এই বিভিন্ৰতাৰ সীমা নাই। শুণিলে আমাদেব স্তম্ভিত হইতে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে সাহেবদিগের কথা জানিবার জন্য, তাঁহাদের পুস্তকই আমাদেব প্রধান উপায়। তত্ত্বিন কলিকাতা নগরেব রাস্তা ঘাটে যে অল্প বিস্তৰ ইউরোপবাসীদিগকে আমবা দেখিতে পাই, তাঁহাতেই আমবা বুঝিতে পারি, যে ইতর সাহেব এক ভয়ানক জীব। তথাপি ইহারা ইউরোপেব ইতৰ লোকেব যথার্থ আদর্শ নহে। ইহাদের অপেক্ষা যে আরও কত পবিমাণে অপকৃষ্ট মনুষ্যা আছে, তাঁহা আমাদেব জানিবার উপায় নাই, কেবল অনুমানেব উপরে নিভব করিয়া মনকে প্রবোধ দিতে হয়। তাই বলিতেছি যে বাঙ্গালী

চোবের সহিত সাহেব চোবের তুলনা হইতে পাবে না । আদৌ শারীরিক বলবর্গ্য সম্বন্ধে সকল শ্রেণীবই বিশেষত নিম্ন শ্রেণীব সাহেবেরা যে আত্মদিগেব অপেক্ষা শত শত পৰিমাণে উৎকৃষ্ট, তাহা আর এক্ষণে বাঙ্গালীদিগেব চক্ষে আঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না । সকলে যাহা জানে তাহাব পুনর-
ল্লেখ কবা কেবল সময় নষ্ট কবা ভিন্ন নহে ; তথাপি পাঠক বৃন্দেব মনোবঞ্চেব নিমিত্ত আমি এই স্থানে একটি দৃষ্টান্ত বিবৃত করিব ।

সাহেবদিগেব প্রথম আমলে যখন তাঁহাদেব লৌহ কিম্বা কলেব জাহাজ সৃষ্টি হয় নাই, কেবল কাঠে জাহাজ নির্মিত এবং বাতাসেব দ্বাৰা চালিত হইত, তখন এক থানা মানোয়াব অর্থাৎ বৃন্দেব জাহাজ বঙ্গ সাগৰ হইতে কলিকাতায় আসিতে জোয়াবেব প্রতীক্ষা কৰিয়া সাগৰ দ্বীপেব ধাবে নৌদেব কৰিয়াছিল । জাহাজ থানা বহু দিন ধৰিয়া জলে জলে ভ্রমণ কৰিবার পবে ভূমিৰ নিবট উপস্থিত হওয়াতে মানোয়াবেব কয়েক জন নাবিক সুন্দৰ বনেব মনোহৰ দৃশ্য দেখিয়া তাহাব মধ্যে যাইয়া ভ্রমণ কৰাব নিমিত্ত কৰ্ত্তা সাহেবেব নিকট অনুমতি প্রার্থনা কবিল, তিনি তাহাদিগকে দুই ঘণ্টাব বিদায় দিলেন । তদনুযায়ী ৭।৮ জন নাবিক এক থানা ডিম্বি কৰিয়া দ্বীপেব কূলে আসিল এবং সেই স্থানে এক বৃন্দেব সহিত নৌকা থানা বন্ধন কৰিয়া জঙ্গলেব মধ্যে প্রবেশ কবিল । এখন অপেক্ষা তখন জঙ্গল অত্যন্ত গভীৰ ছিল । আবাদেব জনা মনুষ্যে হস্ত ক্ষেপণ করে নাই সুতবাং ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তু যে তাহাতে অধিক সংখ্যায় ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পাবে । লোকেবা ইতস্তত ভ্রমণ কৰাব পবে হঠাৎ এক ব্যাঘ্র তাহাদেব সম্মুখে উপস্থিত হইল । জন্মে তাহারা ব্যাঘ্র কিম্বা ব্যাঘ্রেৰ চিত্র দেখে নাই, অতএব ইহা যে ব্যাঘ্র তাহা তাহাবা বৃত্তিতে পাবিল না । জন্তুটা অতি সুন্দৰ দেখিয়া তাহা ধৰিয়া জাহাজে লইয়া যাইতে ব্যস্ত হইল । ইতিমধ্যে ব্যাঘ্র নিজমূৰ্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যদিগকে আক্রমণ কবিল । লোকেব! নধ-হস্তে জাহাজ হইতে আসিয়া-
ছিল কোনও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আইসে নাই । জন্তুটা তাহাদিগকে আক্রমণ কৰিল দেখিয়া তাহারা হাঁসিতে হাঁসিতে কেবল মৃষ্টাঘাতের দ্বারা ব্যাঘ্রকে মারিয়া আপনাদিগকে রক্ষা কৰিতে লাগিল । ব্যাঘ্র তাহাদেব সকলকে তাহাব দন্ত ও নখ দ্বারা কত ক্ষত বিক্ষত কবিল, কিন্তু বীর পুরুষেব তাহাতে ভ্রক্ষেপও করিল না । কি প্রকারে জন্তুটা হস্তগত কৰিবে কেবল তাহা

দিকেই তাহাদের লক্ষ্য । এইরূপে বহুক্ষণ ঘোরতর সংগ্রামের পরে নাবিকেবা কেবল শরীবের বলে এবং সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সেই সুন্দরবনের হুমা বাঘটাকে মুঠাঘাতে দাবা বধ করিয়া, কল্পনে তাহা কষ্টে তুলিয়া উল্লাসের সহিত হ-র-রা হ-র-রা দিতে দিতে জলের ধারে লইয়া উপ-হিত হইল । কর্তা কাপ্তান সাহেব উহাদিগেব সেই জয়ধ্বনি শুনিয়া দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেন, যে নাবিকেবা এক বাঘ শীকার করিয়া আনিতেছে । তাহাবা জাহাজে আবোহণ করিলে পর দেখিলেন যে সকলের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত প্রবাহিত হইতেছে । কাপ্তেনকে সেলাম করিয়া তাহারা তাঁহাকে এই জন্তটা উপঢৌকন দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিল । সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে যেজন্ত তাহারা মাঝিয়া আনিয়াছে, তাহাব নাম তাহারা জানে কি না ? নাবিকেরা “না” বলিয়া উত্তর করাত্তে তিনি বলিলেন যে ইহাই ভারতবর্ষের বাঘ । এই নাম উচ্চারিত হইবা মাত্র তাহাদের সাহস অস্তিত্ব হইয়া ভয়ে শরীর কম্পিত হইতে লাগিল । পরে কাপ্তান সাহেব উহাদিগকে দুই তিন মাসের চিকিৎসায় আবোগ্য কবিত্তে সমর্থ হইয়াছিলেন । বলুন দেখি, ইহা কি মনুষ্যের না অমুষ্যের কার্য্য ! মনুষ্যেব হইলে বাঙ্গালী মনুষ্যের দ্বারা এই কার্য্য কখনও সম্ভব হয় না । যে বীর জাতি প্রথমে পলাসী, তৎপরে আমাই, তাহাব পরে মহারাজপুর পণিয়ার, তৎপবে মুদকী, সোত্রা-রান ও গুজরাট যুদ্ধ জয় কবিয়া এবং অবশেষে বহু সংখ্যক বিত্রোহী সিপাহী সৈন্য দমন করিয়া এই বৃহৎ সম্রাজ্য অপেক্ষাকৃত অতি অল্প সময়ের মধ্যে করতলস্থ করিয়াছে, ইহা তাহাদেরই কার্য্য, অন্যেব দ্বারা সম্পা-দিত হইতে পারে না । এক একটা কীর্ত্তি শুনিলে মনুষ্য-জীবন ধন্য বলিয়া মনে উল্লাসের উদ্ভব হয় ।

ভাল কথাই কি আকর্ষণ দেখুন, কোন কথার প্রসঙ্গে আমি কি কথা বলিতে এত সময় ক্ষয় করিলাম । চোরের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া সাহেব নিপের বলবীর্য্যের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না । সে যাহা হউক এই ক্ষণে সাহেব চোর যে কত নির্দয় এবং প্রাণ নষ্ট করিবার যে স্থলে কোনও আবশ্যক নাই, সে স্থলে তাহারা যে ঐরূপ কুকার্য্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা কোধ করে না, তাহার এক দৃষ্টান্ত দেখাইব । রুসিয়া দেশের এক গ্রামে এক গৃহে একটি পুরুষ ও তাহার স্ত্রী ও তাহাদের একটি যুবতী কন্যা বাস

করিত। এক রুসিয়ার দৃষ্টান্তে ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপ খণ্ডের গ্রাম সকল দেশের নিম্ন শ্রেণীর চরিত্র বৃদ্ধা যাইতে পারে, কারণ ইহাদের সকলের স্বভাবই এক ছাঁচে গঠিত বলিলে বলা যাইতে পারে। ঐ গৃহস্থ নিতান্ত দরিদ্র ছিল না, পবিত্রম করিয়া যে কিছু উপার্জন করিত তদ্বারা তাহাদের সকলের সচ্ছন্দে দিন পাত হইত। গ্রামেব কিঞ্চিৎ দূরে সপ্তাহের মধ্যে এক দিন এক স্থানে এক হাট হইত এবং সপ্তাহেব আবশ্যকীয় জব্বাদি সংগ্রহ করার নিমিত্ত সেই গ্রামের অধিবাসীরা সেই হাটে যাইত। ইহারই এক হাটের দিন ঐ গৃহস্থেব জীপুত্ব দুই জনে তাহাদের কন্যাকে গৃহে বাখিয়া হাট করিতে গিয়া ছিল। পিতা মাতা গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইবাব পরে কন্যা গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া গৃহস্থানী এক কার্যে ব্যাপৃত হইল। এই স্থানে বিব্রত কৰা আবশ্যক, যে গ্রামেব অধিবাসীদিগের গৃহ সকল সহর কিম্বা নগরের গৃহেব ত্রায় এক স্থানে সংলগ্ন ছিল না। গৃহ সমস্ত পরস্পর ব্যবধানে ছিল। কিন্তু এই গৃহস্থের গৃহখানা অন্যান্য গৃহ হইতে অধিক দূরে সংস্থাপিত ছিল। সুতরাং ইহাতে কি হইতেছে, না হইতেছে, তাহা প্রতিবেশী সহজে দেখিতে কিম্বা জানিতে পারিত না। দ্বার বন্ধ করিবাব কিছু কাল পরে কত্কা শুনিতে পাইল, যেন কে তাহাকে ডাকিয়া দ্বার খুলিতে বলিতেছে। দ্বার মোচন করিবা মাত্র এক জন অপরিচিত কদাকার এবং মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র ধারী মল্লয়া কন্যাকে ঠেলিয়া বল পূর্বক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কন্যাব হস্ত হইতে দ্বাবের চাবি কাড়িয়া লইয়া পুনবাব দ্বাবেব তালা বন্ধ করিয়া চাবিটা আপনার পকেটেব মধ্যে বাখিল এবং পোষাকেব ভিতর হইতে এক খানা লম্বা চক্চকে ছুরি বাহির করিয়া কন্যাকে দেখাইয়া বলিল, যে কন্যা তাহার কথার অবাধ্য হইয়া কার্য্য করিলে কিম্বা চীৎকার করিলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গে ছুরি বসাইয়া তাহাকে বধ করিয়া ফেলিবে। এই ব্যাপার দেখিয়া কন্যা যে ভয়ে অস্তিত হইল, তাহা আর বলিতে হইবে না। সে নির্বাক হইয়া এক স্থানে থাড়া হইয়া কাঁপিতে লাগিল এবং চোর ব্যাটা যাহা কিছু তাহাকে করিতে বলে, তাহাই সে কলের পুত্তলিকার ন্যায় করিতে লাগিল। প্রথমে গৃহেব মধ্যে যে সকল আহাৰ্য্য বস্তু ছিল তাহা ঐ ব্যক্তি উদরস্থ করিয়া, পরে বাস্তবিক ভাঙ্গিয়া টাকা কড়ি এবং অন্যান্য মূল্যবান

দ্রব্য সাহা পাইল, তাহা হস্তগত করিলে কন্যা বিবেচনা করিল, যে এখন সে চর্নিষা যাইবে এবং তাহার নিস্তার হইবে, কিন্তু কন্যাব ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।

দ্রব্য সকল হস্তগত করিয়া চোর কন্যার নিকট আসিয়া কহিল, যে কন্যাকে গৃহমধ্যে ছাড়িয়া দিয়া কিম্বা জীবিত রাখিয়া গেলে, গৃহস্থানী প্রত্যাগমন করিলে, সে তাহাকে সকল কথা বলিয়া দিবে এবং তাহা হইলে পুলিশের অনুসন্ধান দ্বারা তাহাকে ধৃত করিয়া দণ্ডনীয় করিবে। এই স্থানে বলা আবশ্যক, যে রুসিয়াব পুলিশ বড় পরাক্রান্ত এবং চোর ধরিতে বড় মজবুত। তাহার উপরে চোরেব শাস্তি অতি ভয়ানক। ফাটক এবং নির্কাসন তাহা আড়হই, তদতিবিক্ত নাউট নামক এক ভয়ঙ্কর শাস্তি আছে। আমাদেব বেজাঘাতেব স্থলে রুসিয়াব নাউট। উহা নাকি চন্দ্রের এবং শোণ পাটের বস্তু দ্বারা নির্মিত হয় এবং উহাৰ আঘাত এমনই বেদনা-দায়ক যে কয়েক ন্যায় বলবান 'মল্লধাও' ইহাৰ কয়েক আঘাতে মুর্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। দ্রব্য বলিল যে “তোমাকে জীবিত রাখিয়া গেলে অগাধ নিশ্চেষ্ট নাউট খাইতে হইবে, অতএব তোমাকে মাঝিয়া যাইব, তবে তুমি অতি নয়তাবে আমাৰ আজ্ঞা সকল পালন করিছ। সেই জন্য তোমাৰ প্রতি আমাৰ দয়া হইয়াছে, তোমাকে অধিক কষ্ট দিব না। তুমি বল যে তুমি কোন প্রকাৰে মৰিতে ইচ্ছা কব, আমি তোমাকে সেই প্রকাৰে মাঝিব। তুমি শীঘ্র বল, বিলম্ব হইতেছে।” যুবতী ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, কিন্তু সে পাপাত্ম্যাব কিছুতেই দয়া হইল না। অবশেষে সে বলিল যে ‘বুঝিবাছি যে তুমি ছুবিৰ আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না, তোমাকে ফাঁসি দিয়া মাঝিব, তাহা হইলেই তোমাৰ কম যত্নগা হইবে’। এই বলিয়া সে এক গাছা শোণের দড়ি সংগ্রহ করিয়া তাহার এক আগাৰ একটা ফাঁস করিয়া অপর আগা সেই ছুবিৰ মধ্য স্থানে শক্ত করিয়া বান্ধিল। পরন্তু বসিবার একটা কাঠের টুল ঘবেব মধ্য স্থলে আনিয়া মুদ্রাবের ন্যায় আর একটা কাঠ লইয়া সেই টুলেব উপরে দণ্ডায়মান হইল এবং সেই অবস্থায় মাথার উপরে দুই হস্ত প্রসাৰণ করত মুদ্রাবের দ্বারা আঘাত করিয়া ছাদেৰ একটা কড়িকাঠের মধ্যে খুব জোৰে সেই ছুরি খান বসাইয়া দিল। ছুবিৰ অর্দ্ধ ভাগেব অধিক কড়ি কাঠের মধ্যে প্রবেশ করিল পরে তাহা শক্ত হইয়া বসিয়াছে কি না এবং তাহারে এ কন্যাব শব্দাৰেব ভাব অনায়াসে

ঝুলিতে পাবিবে কি না, তাহাব পরীক্ষা করা বনিমিত্ত সে দড়িৰ ফাঁসটো তাহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যে গলাইয়া দিয়া সজোরে তাহা টানিয়া দেখিতে লাগিল। মনে কবিযাছিল, যে দড়িটা পরীক্ষায় ঠিকিলে সে ঐ মেয়েটাকে টুলেব উপরে উঠাইয়া তাহাব গলায় ফাঁসী দিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় বিপরীত ফল ঘটিয়া উঠিল। পরীক্ষা করিতে কবিত্তে হঠাৎ তাহাব পদতলেব টুলটা সবিয়া কিঞ্চিৎ দূরে ভূমিতে কাত হইয়া পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাব শবীবও অবলম্বন অভাবে মাধ্যাকর্ষণেব নিয়মে ভূমিতে পড়িয়া যাইত কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্তটা দড়িৰ ফাঁসেব মধ্যে থাকাতে, হস্তখানাৰ ফাঁসী লাগিযা, তাহাব শবীব ঝুলিতে এবং নতন দড়িৰ শক্ত পাক নিবন্ধন বন্ বন্ কবিয়া ঘুরিতে লাগিল। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার হওয়া বনিমিত্ত দড়ি ছিঁড়িয়া ভূমিতে পড়িতে অথবা পারের দ্বাৰা টুলটা টানিয়া পুনৰাধ পদতলে আনিতে সে চেষ্টা করিতে আৰম্ভ কবিল। কিন্তু তাহাব হিতে বিপরীত হইল। কাবণ, সে যত অধিক বল প্রয়োগ কবিত্তে লাগিল, ততই দৃঢ় রূপে তাহা হস্তেব ফাঁস চৰ্শ্বেব মধ্যে বসিতে লাগিল এবং কতক্ষণ পবে তাহাব পক্ষ অঙ্গুলিব মাথাতে রক্ত জমাতে যন্ত্রণা অনহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে সে তাহাব আপন চেষ্টা নিফল দেখিয়া যুবতীকে প্রথমে ক্রত বাক্যে টুল থানা টানিয়া দিতে কহিল, ক্রমে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ কবিল এবং অন্তে কাকুতি মিনতীও করিল কিন্তু কিছুই হইল না। কাবণ মেয়েটি তখনও পক্ষহীন। তাহাকে বধ কবিবে শুনিয়া তাহাব প্রথম হইতেই জ্ঞান লোপ হইয়াছিল এবং এমনই তাহার হতবুদ্ধি হইয়াছিল যে যদিও এই ছুরাঙ্গার সমস্ত কার্য তাহাব চক্ষের উপরে নিরক্ষাহিত হইতেছিল, তথাপি সে তাহা কিছুই বুঝিতে পাবে নাই। ভবে তাহাব বাকবোধ পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল। চোব ব্যাটার কাকুতি মিনতি তাহাব কণ কুহবে প্রবেশিয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহাব কার্য কবিবাব কিযা কথা কহিবাব শক্তি, কিছুমাত্র ছিল না। বোধ হয়, ইহা সেই যুবতীর প্রাণ রক্ষাব একটি মহত্পায় স্বরূপ হইয়াছিল কাবণ যুবতীব কার্য করার শক্তি থাকিলে সে নিরোধতা বশত কিযা ভয়ে, ছুরাঙ্গাব কথা মতে তাহার পাথের নিকট টুল আনিয়া দিত, আর চোর মুক্ত হইয়া তাহাকে বধ করিতে ছাড়িত না। সে যাহা হউক এইরূপে কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত হইলে পরে

গৃহস্থেবা প্রত্যাগমন করিল এবং কন্যার কোন উত্তর না পাইয়া কবীট ভাঙ্গিয়া গৃহস্থে প্রবেশ করিয়া দুই জনের সে অবস্থা দেখিয়া অবাক হইল। পুলিশ কর্মচারীরা দুর্বৃত্তকে একজন পুৰাতন বদমাএস বলিয়া জানিতে পারিয়া দণ্ডের নিমিত্ত রাজদ্বারে অর্পণ করিল।

ইহা ত হইল ইউরোপের ঘটনা কিন্তু অদ্য ৩৫।৩৬ বৎসব পূর্বে আমাদের কলিকাতা নগরে যে এক ঘটনা হইছিল তাহাও কম লোমহর্ষণ কাণ্ড নহে। ইহা সকলেই জানেন, যে কলে কৃত্রিম বরফ প্রস্তুত করিবার প্রাণালী আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ভাবতবর্ষের সাহেবদিগের বিলাস ভোগের নিমিত্ত আমেরিকা খণ্ডের ক্যানোডা প্রদেশ হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া কলিকাতায় স্বাভাবিক বরফ আনিত এবং বাব মাস সেই বরফ বক্ষা করিয়া বাখিবার জন্য এইখানে যে স্থানে ছোট আদালতের নিমিত্ত নূতন প্রসাদ হইয়াছে তাহার ঠিক পশ্চিম ধাৰে বরফ গুদাম নামে এক গৃহ লিখিত হয় এবং তাহাতে বরফ গুদামে দুই এক জন কর্তা সাহেবও মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় একবার বরফ গুদামে অনেক টাকা জমা হইয়া ছিল। কি কারণে বলিতে পারি না, সেই টাকা ব্যাঙ্কে চালান করিতে কয়েক দিবস শৈথিল্য করা হয়। কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, কেবল একজন সাহেবেই অসুস্থতা। সেই সাহেবটি বরফ গুদামে বাস করিতেন, সেই স্থানে তাঁহার পীড়া হয় এবং পীড়িতাবস্থায় সেইখানেই ছিলেন। পীড়া শীঘ্র আবাম না হওয়াতে এক দিবস টাকাগুলি হঠাৎ ব্যাঙ্কে চালান করা হইল, তাহার পর দিবস প্রাতে সেই পীড়িত সাহেবেব খানসামা সাহেবেব কামবায় যাইয়া দেখে যে সাহেবকে কে খুন করিয়া গিয়াছে, দেহটা পালঙ্ক হইতে নামাইয়া ঘবেব কোণে চিত করিয়া রাখিয়াছে; পালঙ্কেব বিছানায় এবং ঘবেব স্থানে স্থানে বক্তে আচ্ছাদিত। এই সংবাদ প্রচাৰ হওয়া নাত্র, সাহেব মহাশয় খুব একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল এবং দোষী ব্যক্তিদিগকে আবিষ্কার করার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা আবিস্ত হইল। তখন ল সাহেব কলিকাতায় পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। প্রথম দিবস মৃত সাহেবেব খানসামা খিদমদগার প্রভৃতি দেশীয় লোকের উপরে সন্দেহ হয় কিন্তু সকল অবস্থা অনুধাবন করিয়া দেখা যাবে, এই কার্য যে কোন দেশীয় লোক দ্বারা হয় নাই, সাহেবেব দ্বারা হইয়াছে, তাহাই স্থির হইল। কারণ মৃত শরীরেব এবং

বৃক্ষব অভ্যন্তরিক অবস্থা দৃষ্টে সকলেবই প্রতীকমান হইল যে বিনা যুদ্ধে হত্যাকারী ব্যক্তি হত্যার প্রাণ নষ্ট করিতে পারে নাই বরং বিলক্ষণ প্রমাণদ্বষ্টে হইল যে, মৃত সাহেবটি আপনাব প্রাণ বাঁচাইবাব জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই কপ সংগ্রাম সাহেবেব সহিত বাঙ্গালীর সম্ভব পায় না অতএব পুলিশ কর্মচারীবা দেশী ভৃত্যদিগেব উপরে শোভা সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কোন সাহেব কর্তৃক এই খন হইল তাহাব অনুধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন । সাহেবকে কি কাবণে বধ করা হইল, তাহাব ও কোন দ্রষ্টব্য কাবণ বুঝিতে পারিল না; কাবণ খুনের সঙ্গে ববফ গুদামে কোন দ্রব্য অপহৃত হয় নাই এবং সাহেবটিও বিলাত হঠতে নবাগত, এবং তাঁহাব সহিত কাহাবও কোন বিবাদ বিসম্বাদ ছিল বলিয়া কেহ জানে না, অতএব বিনা কাবণে হঠাৎ একপ খুন হইতে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল । কলিকাতা সাহেব মণ্ডলীর মধ্যে এই ব্যাপারে অত্যন্ত আশঙ্কা উপস্থিত হইল । প্রত্যেক সাহেবেব মনে ভয় হইল যে এই নবঘাতক ধৃত না হইলে প্রায়শ পাইয়া পুনরায় আর এক জনেব প্রতিও ঐ কপ ব্যবহার করিবে । তখন বড় লাট সাহেবেবা বংসবেব অধিক ভাগই কলিকাতায় কাটাইতেন, সিমলা সবাতু কিম্বা দারজিলিংগর নাম কেহ জানিত না, জানিলেও ঐ সকলে যাওয়ার অবশ্যকতা বিলাসভোগী সাহেবদিগেব মনে উদ্ভূত হয় নাই । আমাব ঠিক স্মরণ নাই কিন্তু বোগ হয় মহা পবাক্রান্ত লর্ড ডেলহোর্সীই সেই সময়ে ভারতবর্ষের গবর্নর জেনেবেল ও বঙ্গদেশেব গবর্নর ছিলেন । বাঙ্গালার লেফটেনেন্ট গবর্নরেব পদ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে ভাবতবর্ষেব বড় লাট বাঙ্গালাবও ছোট লাট হইতেন এবং যদিও তাঁহাব অধীনে বাঙ্গালাব জন্য তেপুটী গবর্নর খ্যাতিতে এক জন উচ্চ কর্মচারী ছিল তথাপি প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালী বেহাব এবং উড়িষ্যাব মূল শাসন ভাব বড় লাটেব উপবেই ন্যস্ত ছিল—। গবর্নর জেনেবেল এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ অবগত হইয়া মৃত সাহেবেব প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কঠিন ছকুম প্রচার করিলেন যে কলিকাতাব পুলিশ কর্মচারীবা হত্যাকারী ব্যক্তিকে আবিষ্কার করিয়া দণ্ডনীয় কবিত্তে অসমর্থ হইলে, তাহাদের সকলকে তিনি কর্তৃত্ব্যত করিবেন । কলিকাতাব সাহেবমণ্ডলীর মধ্যেও এই বিষয় সম্বন্ধে যাব পব নাই সহানুভূতি উদ্ভূত হইল এবং সাহেবেবা সকলে পুলিশের সাহায্য করিতে কৃত সংকল্প হইলেন ।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে এই সময় ল সাহেব কলিকাতার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন। তিনি ইত্যথ্রে শান্তিপুৰেব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখনও বোধ হয় কলিকাতার নূতন পুলিশের সৃষ্টি হয় নাই পুৰাতন চৌকীদারী পুলিশ ছিল এবং নূতন পুলিশ হইয়া থাকিলেও তাহা অতি অল্প দিনেব সৃষ্টি এবং বৰ্ত্তমানেব ন্যায্য তখন পৃথক পৃথক কার্যেব জন্য পৃথক পৃথক বকমেব সুশিক্ষিত অধিক সংখ্যাব কর্মচারী ছিল না সুতরাং এই হত্যাকাণ্ডেব দণ্ডেব গুরুতব ভাব এক মাত্র ল সাহেবেব স্বন্ধেই পতিত হইবাছিল। ল সাহেব বিবেচনা কবিলেন যে বক গুদামেব সাহেবকে বধ কবার কার্যে কোন ভদ্র সাহেবেব যোগ থাকিলেও তাহার সহিত অবশ্যই দুই এক জন ইতব গোবা লিপ্ত ছিল এবং বধেব কার্যটা সেই ইতব গোবা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, অতএব তাহাকে ধরিতে পাবিলেই সমুদায় কথা প্রচাবিত হইবে। তজ্জন্য তিনি লাগ-বাজার, কসাইটোলা, চান্দনী প্রভৃতিস্থে সকল স্থানে জাহাজী এবং ইতব গোবাদিগেব থাকিবাৰ নিষিদ্ধ হোটেল এবং বাসা-বড়ী সকল সংস্থাপিত আছে, তাহাব মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান কবিত্তে আবস্ত কবিলেন। এ দিকে গবর্ণমেন্ট এবং বক গুদামেব কর্তৃপক্ষবা যে ব্যক্তি এই বিষয়ে যথার্থ সংবাদ দিতে পাবিবে তাহাকে অনেকটাকা পুৰস্কাৰ দিবেন বলিয়া স্থানে স্থানে ঘোষণা পত্ৰ লটকাইয়া দিলেন। এইরূপ কয়েক দিন চেষ্টাব পরে ল সাহেব একজন হোটেলওয়ালাৰ নিকট কথায় কথায় শুনিতে পাইলেন যে হত্যাকাণ্ডেব দুই এক দিবস পূর্বে সে দুই জন গোবাকে তাহাব হোটেলেব এক নিৰ্জ্জন কোণে বসিয়া অনেক গোপনে পৰামর্শ কবিত্তে দেখিয়াছিল। কিন্তু কি বিষয়ে তাহাবা পৰামর্শ কবিত্তেছিল, তাহা সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে নাই এবং জানেও না। উহাব দুই ব্যক্তিব মধ্যে এক ব্যক্তি তাহাব হোটলে বাস কবিত, দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্য স্থানেব অধিবাসী। তাহাব হোটলে যে ব্যক্তি বাস কবিত, সে সেই দিবস ধবিয়া আমেবিকা যাত্রী এক জাহাজে নাবিকেব কর্ম লইয়া সেই জাহাজে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিৰ সংবাদ অর্থাৎ সে কোন হোটলে থাকে কিম্বা কি কার্য কবে তাহা সে অবগত নহে। ল সাহেব এই সংবাদ পাইয়া অনেক অনুসন্ধানের পরে এক ব্যক্তিকে সন্দেহ কবিয়া ধৃত কবেন এবং হোটেলওয়ালাও তাহাকে চিনিল। প্রথমে সে ইহাব কিছুই জানে না বলিয়া প্রকাশ কবে কিন্তু সাহেব বোধ হয় অগ্রে

তাহাকে কিঞ্চিৎ যত্ন দিয়া পবে অনেক প্রলোভন দেখানতে সে স্বীকাৰ কবিল যে ঘটনাব ছই তিন দিবস পূৰ্বে বৰফ ক্ৰয় কৰিতে যাইয়া বৰফগুদামেৰ ঘৰে ঘৰে বেড়াইয়া তাহাতে কয়েকটা লোহাব সিন্ধুক দেখিয়া তাহার মধ্যে তাহার অনেক টাকা থাকার বিষয় সন্দেহ হইয়াছিল। ইহা বলিবার আবশ্যক নাই, যে কলিকাতার সকল স্থানেই কি ইতর কি ভক্ত সকল প্রকাৰ সাহেবেব অবাবিত ছায়। প্রহৰীবা অপবিচিত সাহেব দেখিলে কিছু বলে না স্ততবাং তাহাবা যেখানে ইচ্ছাপদাৰ্পণ কৰিতে পাবে। এই সাহেব তাহাব পৰ দিবস পুনৰায় বৰফগুদামে যাইয়া অনুসন্ধান কৰিয়া কত টাকা মৌজুদ আছে এবং কে কোন স্থানে শয়ন কৰে ইত্যাদি তাহাব আবশ্যকীয় সমুদায় তথ্য অবগত হইল এবং টাকা অপহৰণ কৰাব মানসে যডযন্ত কৰিয়া এক জন সজ্জীয় চেষ্টায় বাহিব হইল। অবশেষ এস বেবী নামক এক আমেৰিকান যুবক নাবিকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে বেবী তাহাব সহকাৰী হইতে সম্মত হইল। ইহাদেব এক পৰামৰ্শেৰ সময় লো সাহেবেব সংবাদদাতা হোটেলওয়ালো তাহাদিগকে দেখিয়াছিল। পৰ দিবস প্ৰাতে পুনৰায় সেই চোব বৰফগুদামে যাইয়া টাকা পূৰ্ণবৎ সেট স্থানে থাকিতে দেখিয়া আইসে। সন্ধ্যাব সময় বেবীৰ সহিত একত্ৰ হইয়া ছই জনে অধিকবাড্ৰে জানালা দিয়া বৰফগুদামের ভিতর প্ৰবেশ কৰে। প্ৰধান ব্যক্তিৰ নিকট তালো কুলুপ খুলিবাৰ ইচ্ছাতের শলকা ও দ্বাৰ ও জানালা ভাঙ্গিবাৰ কৰাত ও বেতী ও ছইজনেব কোমবে নাবিকেৰ ছুৰী ভিন্ন আৰ কোন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ছিল না। কিন্তু গৃহ মধ্যে প্ৰবেশ কৰিয়া ইহাবা বাহা দেখিল তাহাতে তাহাবা অত্যন্ত নৈবাশ হইল। কাৰণ দেখিল যে প্ৰাতে যে যে স্থানে সিন্ধুক ছিল সেখানে তাহা নাই বাবান্দায় খোলা পড়িয়া বহিয়াছে, ইহাতে তাহাবা অনুভব কবিল, যে মুক্তা সকল দিনেব মধ্যেই স্থানান্তৰিত কৰা হইয়াছে। এইকপ নিবাস্থাস হইয়া প্ৰধান চোর বেবীৰ হাত ধৰিয়া প্ৰস্থান কৰিতে উদ্যত হইল কিন্তু বেবী তাহা না গুনিয়া যে ঘৰে পাড়িত সাহেবটি শয়ন কৰিয়াছিল তাহাতে প্ৰবেশ কবিল দেখিয়া সে বাহিৰে দাঁড়াইয়া বেবীৰ প্ৰত্যাগমনেব জন্য অপেক্ষা কৰিতে লাগিল। ভেৰী ঘৰেব মধ্যে প্ৰবেশ কবিলে পবে ঐ ব্যক্তি বাহিৰ হইতে গুনিতে পাইল যেমন ঘৰেব ভিতবে কেহ হাতাহাতি কৰিহেছে কিন্তু কি হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিল না এবং ঘৰে প্ৰবেশ কৰিতেও সাহস কবিল না।

কিঞ্চৎকাল পবে বেবী ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে অতি ব্যস্ত ভাবে বাহিৰে আসিয়া তাহাব সঙ্গীকে “চল” বলিয়া সযোজন কৰিল। সঙ্গী দেখিল যে বেবী উম্মাদেব প্ৰায় হইয়াছে, সে বেবীৰ হস্ত ধৰিতে তাহা সিক্ত বোধ হওয়াতে মনে কবিল যে শবীৰেৰ ঘৰ্ম্ম দ্বাৰা তাহাব বস্ত্ৰ ভিজিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বৰফ শুদাম হইতে নিষ্ক্ৰান্ত হইলে পবে পথেৰ প্ৰদীপে আলোতে দেখিল যে বেবীৰ পোষাক ও শবীৰ বস্ত্ৰে বক্ত ময়। বেবীকে ইহাব কাৰণ জিজ্ঞাসা কৰাতে কহিল যে সে ঐ ব্যাটাকে খুন কৰিয়া আসিয়াছে এবং শীঘ্ৰ নদীতে ফাইয়া বন্ধ ধুইয়া ফেলিতে চাইল। যদিও সে স্থান হইতে নদী অনতি দূৰ ছিল তথাপি নদী ধাবেৰ বাস্তাব বহু দেশী এবং সাহেব প্ৰহৰী থাকে বিশেষ গোৰা নাৰিকোৰা অনেক বাজি পৰ্য্যন্ত সেই বাস্তা দিয়া গতিবিধি কৰে অৱিকল্প ঘাটে ঘাটে সহস্ৰাদিক দেশা নৌকা ও জাহাজ লাগান আছে জানিয়া সেই অবস্থায় তাহাকে লইয়া নদীধাবে বাস্তাব বাস্তা বিয় বোধ কৰিলাম। অতএব তাহাকে দাশদিবৰ মধ্য দিয়া পবে মেঙ্গেলেন প্ৰভৃতি ছোট ছোট গলি অতিক্ৰম কৰিয়া ধমতলাৰ পশ্চিম দিকে এক জলেৰ প্ৰণালীৰ নিকট উপস্থিত হইলাম এবং প্ৰণালীৰ মध्ये বেবীৰ শবীৰ ও বস্ত্ৰ ধৌত কৰিয়া তাহাব কামাল যাহাতে অত্যন্ত বক্ত লাগিয়াছিল তদ্বাৰা তাহাব ছুৰীখানা বেঠন কৰিয়া প্ৰণালীৰ মध्ये নিক্ষেপ কৰা হইল। তদন্তৰ বেবী সেই আৰ্দ্ৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিয়া সঙ্গীৰ সহিত বিদাৰ হইয়া জাহাজে চলিয়া গিয়াছে। তাহাব পবে বেবীৰ সহিত তাহাব আৰ সাক্ষাৎ হয় নাই, শুনিয়াছে যে বেবীৰ জাহাজ তাহাব পৰ দিবসেই পৰমিট মুক্ত হইয়া কলিকাতা বন্দৰ হইতে বওয়ানা হইয়া গিয়াছে। ল সাহেব ঐ ব্যক্তিৰ কথা পৰীক্ষা কৰায় নিমিত্ত তৎক্ষণাত তাহাকে লইয়া সেই প্ৰণালী আৱেষণ কৰিলেন এবং তাহাব মध्ये বেবীৰ ছুৰী ও কামাল প্ৰাপ্ত হইলেন। অতএব তাহাৰ কথায় প্ৰতি আৰ কোন সন্দেহ না থাকোঁতে গুনি অনুসন্ধান কৰিয়া জানিলেন যে তাহাৰ দুই দিবস পূৰ্বে একখানা জাহাজ থূলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা এখনও ডায়মণ্ড-হাৰবাৰ পাব হইয়া সমুদ্রে যায় নাই।

বৰ্ত্তমান সময়ৰ বিদ্যুৎদ্বাৰা চালিত বিশ্বব্যাপী ইলেকট্ৰিক টেলিগ্ৰাফৰ পূৰ্বে ফেপ্ৰকাৰ টেলিগ্ৰাফ ছিল, তাহা কি আমাৰ যুবা পাঠকগণ অবগত আছেন? তাহা সাহেবেৰা সিমাফোৰ টেলিগ্ৰাফ বলিয়া অভিহিত কৰি-

তেন্ন। স্থানে স্থানে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবধানে একটা উচ্চ স্তম্ভের উপরে একটা দীর্ঘকাষ্ঠের মাস্তুলেব গাত্রে ছিদ্র করিয়া কয়েকখানা তক্তা এমন ভাবে লাগান থাকিত যে তাহা স্তম্ভেব মধ্য হইতে দড়ি দ্বারা টানিলে মাস্তুলেব উভয় ধাৰে ঐ সকল তক্তা উঠিত ও নামিত এবং সেই তক্তা শুদীৰ্ঘ উঠা নামাব পৰিমাণেই কথাব এবং অক্ষবেব ইঙ্গিত হইত। ইহাব একটা কলিকাতায় এক্ষেত্রে ঘবেব চাদেব উপবে, দ্বিতীয়টি কেল্লাব দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে স্তম্ভেব উপব হইতে গোলা পড়িলে এইক্ষণে দুই প্রহৰ এক ঘণ্টাব তোপ-ধ্বনি হয় সেই স্তম্ভেব উপবে এবং ঐ কপ ক্রমাশয়ে দক্ষিণ দিকে ডায়মণ্ড হাববাব পর্য্যন্ত কতকগুলি স্তম্ভ ছিল এবং উহাদেব দ্বাবাই তখন জাহাজেব সংবাদ আসিত এবং যাইত। এই টেলিগ্রাফে দিবস ভিন্ন বাত্রে কোন কাৰ্য্য হইত না এবং এখন যেমন ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফেব দ্বারা চক্ষের পলক মধ্যে সহস্র ক্রোশ হইতে সংবাদ আইসে তখন তাহা হইত না। কলাগাছিয়া হইতে কলিকাতায় পুৰাতন টেলিগ্রাফেব দ্বাবা সংবাদ আসিতে অন্তত তিন চাৰি ঘণ্টাব কমে হইত না। কিন্তু এত বিলম্ব হইলেও সেই ধীর গতি টেলিগ্রাফেব দ্বাবা অনেক উপকাৰ হইত। বেবীৰ জাহাজ কলাগাছিয়া পার হইয়া যায় নাই শুনিবা ল সাহেব সেইস্থানে তিনি না পৌছছিলে জাহাজ সমুদ্রে যাঠিতে না পাবে এবং জাহাজ হইতে কোন নাবিক তীবে আসিতে না পাবে তদ্বিষয়ে ডায়মণ্ড হাববাবেব জল পুলিশের বৰ্ত্তা সাহেবেব নিকট টেলিগ্রাফেব সংবাদ পাঠাইয়া নিজে তাঁহাব সংবাদ দাতা চোব ও কয়েক জন সাহেব পুলিশ কর্মচারীব সমভিব্যাহাবে এক দ্রুতগামী নৌকায় বেবীকে ধবিবাব নিমিত্ত ডায়মণ্ড হাববাব মুখে যাত্রা কবিলেন। যথা সময়ে তাঁহাব নৌকা জাহাজেব নিকট উপস্থিত হইলে, জাহাজেব সমুদায় নাবিক কি জন্ত পুলিশেব নৌকা জাহাজে আসিতেছে তাহাব কৌতুক দেখিবাব নিমিত্ত জাহাজেব ধাবে আসিয়া খাড়া হইল কিন্তু বেবীই বুঝিতে পাবিল যে তাহাব অদৃষ্টে আগুণ লাগিয়াছে, অতএব সে অন্যান্য নাবিকেব নায় জাহাজেব ধাবে না আসিয়া গুপ্ত ভাবে জাহাজেব পিছাড়ায কাছি অবলম্বন কবিয়া হাইলেব পাখোঁ নামিয়া সেই স্থানে সমস্ত শবীব ডুবাঁইবা কেবল মাথাটা জাগাইয়া বহিল; ভাবিল যে কেহ আর সেই থানে তাহাকে অন্বেষণ কবিবে না। কিন্তু পুলিশের কর্মচারীরা জাহাজেব কাপ্তেন সাহেবেব সাহায্যে তাহাকে তাহাব

শুণ্ড স্থানে আবিষ্কার করিয়া জল হইতে টানিয়া তুলিল এবং তাহার সঙ্গী লোক তাহাকে তৎক্ষণাৎ বেরী বলিয়া সনাক্ত কবাত্তে ল সাহেব তাহাকে হাতকড়ি দিতে উদ্যত হইলে সে তাচ্ছল্য ভাবে বলিয়া উঠিল যে “অনর্থক কেন কষ্ট পাও, আমি খুন কবিয়াছি, ইচ্ছা কবিলে আমাব * * * ফাঁসী দিয়া আমাকে ঝুলাইতে পাব, “Now hang me by my * * * ।” তদনন্তর কলিকাতায় আনিত হইলে সে প্রধান মাজিস্ট্রেটের সমক্ষে যে একবার করিয়াছিল তাহার স্থূল মর্শ্ব আমাব এই রূপ স্বরণ হইতেছে। “আমি আমেরিকাবে দেশেব এক ভদ্র লোকের সন্তান, আমাব বয়স ২০ বৎসরের অধিক নহে কিন্তু স্বদেশে নরহত্যা ও চুবি প্রভৃতি কুকার্য্য কবায় আনাব পিতামাতাব ও পুলিশেব দোবাত্তে আমি এক জাহাজেব নাবিক হইয়া ভাবতবর্ষে পলায়ন কবিয়া আসিয়াছিলাম। পবন্ত এখানে আমাব চিত্ত স্থিৰ না হওয়াতে অন্য স্থানে যাইয়া অদৃষ্ট পবীক্ষা কবাব নিমিত্ত পুনরায় এক জাহাজেব নাবিক হইয়া কলিকাতা পবিত্যাগ কবিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ইতমধ্যে জাহাজ খুলিবাব অনেক পূর্বে এই ব্যক্তি আমাব নিকট আসিয়া ববক গুদামে চুবি কবিগে অনেক টাকা পাইবাব প্রলোভন দেখাইয়া আমাকে সেই কার্য্য কবিতে সন্মত কবে। বহু ধমেক কথা শুনিয়া আমাব আশা হইয়াছিল যে তাহা হস্তগত কবিতে পাবিলে, আমি পুনরায় স্বদেশে যাইয়া আমাব পিতামাতাব স্বাধীন হইয়া সচ্ছন্দে থাকিতে পাবিব এবং যেহেতু জাহাজেও লাভ কলিকাতা হইতে খুলিয়া যাইবে অতএব চুবিব পবে কলিকাতাব পুলিশও আমাকে ধবিতে পাবিবে না। এই সকল কথা ভাবিয়া আমাব মনে অত্যন্ত সুখের আশা হইয়াছিল অতএব যখন ববক গুদামেব সকল ঘব অন্বেষণ কবিয়া দেখিলাম যে কিছুই পাইলাম না, তখন নৈরাশে আমাব অনন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল। একবার ভাবিলাম যে আমাব সঙ্গীকে হত্যা কবি কিন্তু পরক্ষণে একটা ধরের সন্মুখে আসিয়া তাহাতে প্রবেশ কবিলাম এবং থাঠের উপবে একজন পুরুষ শয়ন কবিয়া আছে দেখিয়া তাহার মশারি উঠাইয়া তাহার বক্ষস্থলে এক চপেটাঘাত কবিলাম। কি কারণে আমি ঐ রূপ কার্য্য কবিলাম তাহা আমি এখনও আপনি ভাল কবিয়া বুঝিতে পাবি নাই, কিন্তু মানুষ দেখিয়া তাহাকে আমাব মারিতে ইচ্ছা হইল এবং আমি সেই বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার শরীবে

হস্তক্ষেপ করিলাম। কিন্তু সেই পুরুষটি পীড়িত হইলেও তাহার নায়ুতে একলো স্যাকসন জাতীর শোণিত বহিতেছিল, অতএব আমার আঘাত প্রাপ্ত হইবামাত্র সে লক্ষ দিয়া উঠিয়া আমাকে ধরিতে চেষ্টা করিতে আমি আমার ছুরীর দ্বারা তাহাকে সাজ্জাতিক কয়েকটা আঘাত করিলে সে শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি বোধ করি যে পীড়ার গতিকে তাহার কায়িক দুর্বলতা না থাকিলে আমি তাহাকে পরাজয় করিতে পারিতাম না। সে যাহা হউক খাটের উপর অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল দেখিয়া আমি তাহাকে নামাইয়া ঘরের এক কোণে রাখিলাম এবং বাহাতে পুনরায় জীবন প্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য আরও দুই এক ছুরীব আঘাতে তাহার প্রাণ সংহার কবিলাম। তদন্তর যে যে কার্য্য কবিয়াছিলাম তাহা আমার সহকারীর বর্ণনাতেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং তদ্বিবরে আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই। মোট কথা এই যে আমার সঙ্গী এই হত্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দোষী।’

স সাহেবের খুব প্রশংসা ও পদ বৃদ্ধি এবং বেরীর কঁাসীর হুকুম হইল। কিন্তু মনুষ্যের হৃদয়ের এমনই গতি যে বেরীর অল্প বয়স দেখিয়া এবং বোধ হয় বাঙ্গালীর সম্মুখে একজন সাহেবের কঁাসীর হুকুম প্রচারিত হওয়ার ভয়ে কলিকাতায় বহুতর পাজী ও সাহেবেরা একত্র হইয়া তাহাকে কমা করিতে কিম্বা কঁাসীর পবিতর্কে যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ রাখিতে লাগি সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই দুরাচার নরঘাতকের প্রতি অন্যায় সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া সুপ্রিম কোর্টের দণ্ডাজ্ঞার প্রতি হস্তক্ষেপ করিলেন না। বেরীর কলিকাতায় কঁাসী হইল।

স্বভাব ও অভ্যাস ।

(হিন্দুজাতির পক্ষে)

একদা স্বভাব ও অভ্যাস লইয়া আমাদের মধ্যে বড় একটা গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। আমরা সহজ বুঝিতে দুইএর এইরূপ অর্থ করি। যেটা বাহার পেশার স্বভাব, সেইটাই তাহার স্বভাব। যেটা পুনঃ পুনঃ কার্য্য ও বৈধর্ম্য-

বৃত্তি লব্ধ হয়, তাহাই অভ্যাস। মনুষ্যের স্বভাব হাস্য প্রবলতা কিন্তু অভ্যাসদ্বারা হাস্যকে সম্বরণ ও দমন করা যায়। তবেই কোন একটা কার্যফলকে প্রকৃত স্বভাব বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি না। একটা বালকের স্বভাব অমনোযোগিতা ও আলস্য। কিন্তু শিক্ষা, যত্ন ও অভ্যাস দ্বারা তাহাকে মনোযোগী ও পরিশ্রমী করা যাইতে পারে। এটা একটা বড় সত্য কথা যে শিশু ও বালকের স্বভাব অনেকটা কুল ও পিতৃ মাতৃ পবনস্ব আগত ও লব্ধ। তাহা না হইলেই বা একটা বালক সাক্ষাৎ স্বভাব সম্বন্ধে অন্য একটীর অনুরূপ হয় না কেন? কতকগুলি বৃত্তি অভ্যাস দ্বারা শাসিত ও চালিত হয়, আব কতকগুলি হয় না। একটা অলস বালককে অনায়াসেই পরিশ্রমী করিতে পারা যায়, কিন্তু একটা নির্লোভ বালককে বুদ্ধিমান করে কাহার সাধ্য? ইচ্ছাতে আব ও বোধ হইতেছে যে কতকগুলি বৃত্তি আন্তরিক ও অভ্যাস সাপেক্ষ নয়, অন্য কতকগুলি বাহ্যিক ও অভ্যাস দ্বারা বশীকৃত ও পোষিত হয়। একটা বালক স্বভাব কবি—বাল্যকালেই গৃহেব কোণে বসিয়া কবিতা রচনার মগ্ন, আব একটাব হৃদয়ে হযত বিন্দু মাদ্র রস ও কবিত্ব নাই—কেবল নীরস ও কঠোবতাময়।

স্বাভাবিক যাহা তাহাসমস্তই সুন্দর—স্বভাবের সুখমা বর্ণনাভীত, স্ত্রীজাতিব লজ্জাশীলতা, ধীরতা, নম্রতা ও কোমলতা স্বভাব। যে রমণীতে এইগুলির অভাব আছে তাহাতে স্বাভাবিকতার অভাব আছে—অতএব তিনি প্রকৃত রমণী পদ হইতে কিঞ্চিৎ স্ফলিত হইলেন। ইহাতে এতগুলি পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান আছে তিনি আদর্শ-রমণী, তিনিই বমণী বহু, তিনি স্বভাবের শোভা। যে বমণীতে এগুলির একটাও নাই তাহাতে রমণীর বমণীষ বিন্দু মাত্র নাই। পুরুষের স্বভাব, সাহস, ধৈর্য, বীর্য ও প্রত্যাংগন মতিত্ব। এগুলি যে পুরুষে নাই, তাহাকে পুরুষ বলা বিড়ম্বনা, কাবণ তিনি পুরুষের স্বাভাবিক গুণের আধাব নন। শিশুর হাসিতে স্বাভাবিকতা আছে বলিয়াই তাহাতে এত মধুরিমা ও সরলতা আছে—সেই জন্য সে হাসি এত প্রীতিকর ও সুখপ্রদ। যে সেই হাসি হাসিতে পারে, জানিব তাহার মন বাস্তবিক নির্মল, নিষ্কলঙ্ক ও বিমল আনন্দে পরিপ্লুত। শিশুর নয়নে মাধুরী, জ্যোতি ও আকর্ষণশক্তি আছে বলিয়াই যিনি নিজের নয়নে শিশুর নয়নের ছায়া দর্শাইতে পারেন, তিনিই আনন্দ সাগরে ভাসমান বলিয়া বোধ হয়।

যে লোক শৈশবকালের বাহ্যিক ও আন্তরিক সৌন্দর্য ও কোমলতা বরাবর রক্ষা করিতে পারেন তাহার দেহ সচ্ছন্দ, মন প্রকৃত ও হৃদয় প্রশস্ত হয় । সকল লোকেরই হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটি স্বভাবজাত বৃত্তি আছে, যাহা দ্বারা লোক পাপ করিলে অনুতাপ করে, ছুঃখের পরে অনুশোচনা করে । কেহ কেহ বলেন এটা সংস্কার জনিত, কেহ কেহ বলেন এটা একটি অভ্যাসলব্ধ ধন; কিন্তু আমরা ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করি । আমাদের জীবনের সংস্কারই প্রকৃতি; অসং কার্য বিকৃত মাত্র । কেন না পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে পাপের প্রতি আন্তরিক বিবাগ ও বিতৃষ্ণা জন্মে—কিন্তু পুণ্যকর্মের পক্ষে তাহা হয় না । সংস্কারের অনুষ্ঠান সর্ব সময়ে সর্বত্র ও আজীবন সম্ভব ও কঠিন—ইহার প্রতি বিবাগ নাই বিতৃষ্ণা নাই । ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আমরা স্বতঃই বৃদ্ধ হই, শিশুর কোমলতা ও সরলতায় যে স্বাভাবিকতা আছে তাহাতে পাপের স্পর্শ, কুরুচির কলঙ্ক নাই । এই রূপে আবার বিপরীত যুক্তি অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হয় যে, যে কার্যের পৌনপুনিক অনুষ্ঠান কখন না কখন স্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত জন্মে তাহাই পাপ । আর যে কার্যের অনুষ্ঠান, যে কার্যের যুক্তি চিবকালই সমভাবে আদরণীয় ও প্রীতিদায়ক তাহাই পুণ্য ও সং । এক্ষণে দেখা যাউক স্বভাব সময়ে সময়ে অভ্যাসের দ্বারা অনুশাসিত হইয়াও কিক্রমে নিজের সৌন্দর্য্য-ছটা ও রূপের শোভা বিস্তার করিতেছে । অভ্যাসের বল স্বভাবের রূপের হ্রাস করিতে পারে না ও প্রচ্ছন্ন রাখিতে ও পারেন না । “চাকাই মলমলে খেসারিব ডালেব ন্যার” সে রূপের আভা বাহির হইয়া পড়িবে—কোন মতে তাহার হ্রাস হয় না ।

সাব উইলিয়ম জোন্সের বাল্য শিক্ষক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে ঐ বালকটিকে যদিও নির্জন প্রান্তরে একাকী রাখিয়া আসা যায়, তাহা হইলেও সে এক মহৎ লোক হইবে । দান্তবিক স্বাভাবিক গুণাবলী কদাচ প্রচ্ছন্ন থাকে না । সে গুণের জ্যোতিঃ অন্যের উত্তেজনা ও সাহায্য ব্যতিরেকে দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ হয় । প্রতিভা-সম্পন্ন বালকের শিক্ষার আবশ্যক করে না—তাহার প্রতিভার কিরণ লোকের চক্ষুর উপর পড়িবেই; কিন্তু এই মাত্র প্রভেদ উপস্থিত হয় যে, স্বভাবত যে কিরণটার গতি একদিকে অভ্যাস ও শিক্ষা দ্বারা তাহার গতি অন্য দিকে ফিরান বাহতে পারে । দেখ

ক্লম স্বভাবত যে নির্দোষ ও প্রতিভাশালী নয়, তাহাকে সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও বুদ্ধিমান ক'বা যায় না। আর যদিও চেষ্টার ও অভ্যাসে কিঞ্চিৎ সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু ইহাতে তাহাব অন্যান্য গুণেব ব্যত্যয় ও বিপর্যয় ঘটতে পারে। স্বভাব অভ্যাস শাসিত হইলে ইহার তেজ অন্তর হইতে প্রকাশ পায়—কিছুতেই ইহার সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র মলিন করা যায় না।

এইরূপ তর্কে অনেকটা অদৃষ্টবাদেব আভাস আসিয়া পড়িতেছে কিন্তু বাস্তবিক এরূপ হয় কেন ? জোন্সের গুরু যে কথাটা বলিয়াছিলেন তাহাতে কিঞ্চিৎ অন্ত্যাক্রির ছটা আছে। তাহা এইরূপ; মানুষের যে কোন কার্য্যই তিনটা তত্ত্বদ্বারা শাসিত হয়—অদৃষ্ট, কাল ও পুরুষকার। অর্থাৎ শুদ্ধ অদৃষ্টেব সাহায্যে, কিম্বা শুদ্ধ কালের গতিতে কিম্বা শুদ্ধ পুরুষকারের সাহায্যে কার্য্য হয় না। কোথাও দুইটির কোথাও বা তিনটির সমাবেশ আবশ্যক। জোন্সের শিক্ষক বলিতে পারিতেন না যে তিনি দ্বাদশ বর্ষ বয়সে আদালতে বিচারপতি হইবেন—কিম্বা তিনি যদ্যপি গুণের পরিচয় না দিয়া মরিয়া যান তাহা হইলে তাঁহার যশোরাশি বিক্ষিপ্ত হইবে ও প্রতিভাব বিকাশ হইবে। ভবিষ্যদ্বাণী বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে—তাই বলিতে-ছিলাম কাল ও পুরুষকার এই দুইটা অদৃষ্টের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করে—ইহাতে শিক্ষার আবশ্যক করে না বা অভ্যাসের প্রয়োজন কবে না। পুরুষকার ও অদৃষ্ট ও কালের সাহায্যেই লোকে বড় লোক হইয়াগিয়াছে—মহত্ব শিক্ষা সাপেক্ষ নয়, তাহা হইলে আব পার্শ্বত্যা Arago ফ্রেঙ্কদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান পাইত না। এই সমস্ত কারণবশতঃ আমরা কাল ও পুরুষ-কারকে তাদৃশ প্রয়োজনীয় মনে কবি না বলিয়া অদৃষ্টকেই প্রাধান্য দিয়া থাকি। বাস্তবিক অদৃষ্টবশেই শিশু ও বালকের যে যে কার্য্যাবলীর প্রকাশ তাহাই তাহার সৃষ্টাব। কালক্রমে অদৃষ্ট কাল ও পুরুষকাবের সহিত যুক্ত হইয়া যে যে কার্য্যাবলী সংঘটিত হয় তাহাই মানুষের পরিণত অবস্থার পরিচায়ক। তবেই অদৃষ্টই প্রধান, পুরুষ একটা কারণ মাত্র—কালটা একটা গোণতত্ত্ব কিন্তু অদৃষ্টের সহিত সংগৃষ্ট ও সংশ্লিষ্ট। এই সত্বকে ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন—

নচসাং তানি যশ্মাপি নিবধন্তি ধনঞ্জয় ।

উদাসীন বলসীনমসক্তং তেবু কর্ণবু ॥

মহাধ্যক্ষের প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরং ।
হেতুনানেন কৌন্তের জগদ্বিগ্নিবর্ত্ততে ॥

অপিচ,

তদ্বাদ্ব্যমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব ।
জিহ্বাশত্রুন্ তুঙ্ক বাজ্য সমৃদ্ধং ॥
মমৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্বমেব ।
নির্মিত্ত মাত্রং ভব সব্যসচিন্ ॥

স্বভাবটা কতকটা অভ্যাসের দ্বারা সংগঠিত হয় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে নয় । অভ্যাস একটি বাহ্যিক শক্তি যাহা স্বভাবকে অনেকাংশে ভাবান্তরিত ও রূপান্তরিত করে । কিন্তু তাহার আভিযোয় ব্যর্থ হয় না । এইরূপে এক মতে অভ্যাসটাও কতকটা স্বভাবের দাস । মনুষ্য বাল্যকালে অশিক্ষা-গ্রস্ত হইলে তাহার স্বভাবানুযায়ী কার্য করে—ইহার অবশ্য কতকগুলি সং ও উদ্দেশ্য যুক্ত ও কতকগুলি অসং ও উদ্দেশ্য-বিহীন । এইরূপ স্বভাবানুযায়ী কার্য কবিত্তে কবিত্তে কালক্রমে তাহার ক্রমশ এই কার্য কলাপ অনেকাংশে অভ্যস্ত হইয়া যায়—তখন সে স্বভাবের সৌন্দর্য্য কোমলতা কমনীয়তা অনুভব করিতে পারে । কিন্তু যে স্থলে অভ্যাস স্বভাবের দাস হইয়া মানব চবিত্তের বিচিত্রতা উৎফুল্লতা ও স্বাধীনতা সম্পাদন করে তাহার ন্যায় সুন্দর ও আশ্চর্য্য প্রণালী আর নাই । যে স্থানে স্বাভাবিক রমণীয়তার ও বৈচিত্র্যেব হাস সেই স্থানেই মানসিক সুখ ও স্বচ্ছন্দতার অভাব । বাহ্যিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হইয়া স্বভাবের অনুকরণ করিয়া অর্থে বিতৃষ্ণ হইয়া বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত না হইয়া যে শুদ্ধ স্বাভাবিক নিয়মে, স্বভাবের উদ্দমতায় উপর নির্ভর করিয়া, সুভাব সুন্দরপ্রদেশ অবস্থিতি করিয়া সুাভাবিক সৌন্দর্য্য স্পর্শে চলিয়া সুভাবের গতিতে চালিত হইয়া অবস্থিতি করে, তাহারই সুখ ও স্বচ্ছন্দ অধিক । যে দেশে সুাভাবিকতা অধিক সেই দেশ সর্বকালে সুখদায়ী ও সর্বদা সুস্থ্যকর । যে দেশে সুাভাবিক নিয়মে চালিত হয়, সে দেশে বোগ শোক কম । যে সংসারে সুাভাবিক প্রথার প্রচলন তাহাতে শান্তির লক্ষণ অধিক । যে গৃহে লোকে সুাভাবিক নিয়মে চলে তাহা সভ্যতা বিগর্হিত কার্যের আবাস স্থান হইলে ও সূর্ণ । যে সুভাবজাত ফলমূলাদি আহার করে তাহার অভাব বড় কম—অভাব কম হইলেই সুখ বেশী । যিনি আবার

সংসার ধর্ম ত্যাগ কবিরা সূতাব সৌন্দর্যের গুণ গ্রহণ পূর্বক কালাতিপাত করেন
নৈ পরম পুরুষ ।

উপন্যাস ।

উপন্যাস-বিচারে হুইট বিষয় প্রতিই সমান দৃষ্টি রাখিতে হয়—উপন্যাসের উদ্দেশ্য ও উপন্যাসের শিল্প-নৈপুণ্য (art) । আমরা বর্তমান অবস্থায় উপন্যাসের উদ্দেশ্য বা বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাই ।

উপন্যাসের উদ্দেশ্য যদি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়, তবে আব তাহা পৃথক করিয়া ভাবিতে হইবে কেন ? সব উপন্যাসের যখন উদ্দেশ্য একই হইল, তখন উপন্যাস-বিচারে সে উদ্দেশ্য নূতন কবিরা ভাবিবাব আবশ্যকতা কি ? বিচার ত ভুলনা ধারা ? তবে যাহা সকল গ্রন্থেই এক, বিচারকালে সেটি ত ভাবিবারই দরকার নাই—এইরূপ প্রশ্ন সহসা মনে উঠিতে পাবে । সৌন্দর্য্য সৃষ্টি যে উপন্যাসের উদ্দেশ্য, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না । কিন্তু এই বলি যে, ‘সৌন্দর্য্য’ এইখানে ইহাব বিন্দুত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । কথার অর্থ অইয়া কলহ করিতে গেলে, অনেক কথা বলিতে হয়, আমরা এখানে সেরূপ করিতে প্রস্তুত নহি । স্বীকার কবিয়া লইলাম যে, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই সকল প্রকার চরিত্রের, সকল প্রকার উপন্যাসের উদ্দেশ্য । এই সৌন্দর্য্য যখন একটা গুণ তখন ইহার বিভাগ অসম্ভব ; সুতরাং স্বীকার কবি সকল প্রকার উপন্যাসেরই উদ্দেশ্য একই প্রকার । কিন্তু এই গুণটি অবশ্য কোনও কিছুগত এবং এই কোনও কিছু সহিত যোগেই ইহাকে সৃষ্টি করিতে হইবে, তবে সেই সৃষ্টি পদার্থটির প্রকার ভেদ থাকা সম্বন্ধে তর্ক না থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাস বা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য বা বিষয় আছে, এ কথাও নির্দিষ্টবাদে বলা যাইতে পাবে । ফলত ইহাই প্রকৃত কথা । উপরের কথা ভুল না হইলেও হয় অতি স্থূল, নহিলে অতি স্থূন । শুদ্ধ সে কথা বলিলে এক প্রকার কিছুই বলা হয় না ।

বিবিধ প্রকার ভাবাধিগত সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ স্বভাবই উপন্যাস-চরিত্র-স্রষ্টার সাক্ষাৎ লক্ষ্য । কিন্তু গৌণভাবে আরও একটি লক্ষ্য আছে ।

সেটি পাঠকবর্গের চিত্ত শুদ্ধি বিধান । পাঠকের ‘চিত্তকে সৌন্দর্য্য অহুভব করাইয়া ইহার চিত্তশুদ্ধি বিধানই কাব্যের ধর্ম্ম’—আমরা ‘কাব্য’ কথার অর্থ-গোলে না পড়িয়া বলিব—উপন্যাসের ধর্ম্ম । কাব্যের অন্যাংশ আমাদের আলোচ্য নহে । উপন্যাস এই দুইটি লইয়া—সৌন্দর্য্য ও চিত্তশুদ্ধি । কিন্তু এই পিত্তীকৃত অর্থ সমষ্টিকে কেহ কেহ সামান্য অর্থবোধক মনে করিয়া সময়ে সময়ে বড় প্রমাদে পতিত হইয়া থাকেন । কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে এই সৌন্দর্য্য প্রেমমূলক—শুদ্ধ তাহাও নহে, রমণী-প্রেমমূলক । কেহ কেহ এরূপ মনে করেন, নীতি বা ধর্ম্মতত্ত্ব হইলে, তথ্যের সৌন্দর্য্যের আবহান অসম্ভব ব্যাপার । প্রচলিত অর্থ হইতে বিভিন্ন অর্থযুক্ত অথবা বিস্তৃত বা অনির্দিষ্ট অর্থযুক্ত কথার ব্যবহারে প্রায় সর্বত্রই এইরূপ একটা ফল পাঁড়ায় । আমরা বুঝি যে, চবিত্ত লইয়া উপন্যাস, সেই চবিত্তে যাহা কিছু আছে, ধর্ম্ম হউক অধর্ম্ম হউক, পাপ হউক পুণ্য হউক, তদ্ব্যবহি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা সম্ভব । যাহা পাপ চবিত্ত-দ্বারা আবাব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি কি, বুঝেন না, তাহাদিগের সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই উপন্যাসের উদ্দেশ্য একথা বলিবার অধিকার নাই । কিন্তু পাপচরিত্রে যে পুণ্যচবিত্তেবই সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়, উপন্যাস পাঠককে এ কথা বলিতে হইবে না । পাপ চরিত্র পুণ্য চরিত্রেরই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে । কেবলমাত্র ইহা লইয়াও উপন্যাস হইতে কোন বাণ্য দেখি না । ইহাও পুণ্যের সৌন্দর্য্য অহুভব কবাইয়া চিত্তশুদ্ধি বিধানে সমর্থ । হৃদয়ের স্থায়ী ভাবমাত্রই লোকেব নীতি হইতে পারে । চরিত্র ত এই স্থায়ী ভাব লইয়া ? তবে উপন্যাস নীতিমূলক বলিতেই বা কি আপত্তি হইতে পারে ? নীতির উল্লেখ অবশ্য উপন্যাসেব কার্য্য নহে—নীতির ব্যাখ্যা বা তাহার কার্য্যকার্য্য প্রদর্শনই উপন্যাসেব কার্য্য । বস্তু বা একস্থলে লিখিয়াছেন কাব্যগ্রন্থ মনুষ্য-জীবনের কষ্টিন সমস্যাব ব্যাখ্যামাত্র । কাব্য অর্থ বেক্রপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সংজ্ঞাবও কিছু অর্থ-বিস্তৃতি আবশ্যক, কিন্তু আমাদের আলোচ্য উপন্যাস সঙ্ক্ষে কথটি বড়ই স্পষ্ট ও যুক্তিযুক্ত । উপন্যাস গ্রন্থ মনুষ্য-জীবনের সমস্যার ব্যাখ্যা মাত্র । কষ্টিন বা সহজ, উপন্যাসের বিচারকালেই দ্রষ্টব্য—উপন্যাস এই সমস্যা লইয়া । যাহাকে আমরা সচরাচর নীতি বলি, সেই নীতি এই ব্যাখ্যা হইতে সংগৃহীত । এই নীতিতে যুক্ত হইয়াই উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্ট হয়—

উপন্যাস সৃষ্ট হয়। নীতিকে প্রচ্ছন্ন রাখে, তাই স্বল্পদৃষ্টিতে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। উপন্যাসের নীতি-ব্যাখ্যা অনাবশ্যকীয় কার্য্য নহে। কারণ ইহা বুঝিলে art ভাল বুঝা যায়। চিত্র ও চরিত্র এ সম্বন্ধে একরূপ নহে। চিত্রে ফুটাইতেই art নিয়োজিত হয়, চরিত্রে প্রচ্ছন্ন রাখিতেই art ব্যবহৃত হয়। কারণও বড় সুন্দর, কিন্তু তাহা বলিবার এ স্থান নহে।

উপন্যাসের এই যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হইল, উপন্যাসের প্রকৃত বিচারে তাহা নিতান্তই জটিল বিষয়। এই উদ্দেশ্য বল, সমস্যা বল, নীতি বল, তত্ত্ববল, ইহা না বুঝিলে, লিপি-নৈপুণ্য বুঝা যায় না। এই subject না বুঝিলে তৎপ্রতি নিয়োজিত art বুঝা যায় না। এই art এর মাত্রা না বুঝিতে পারিলে, উপন্যাসের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইল না এবং তাহা না হইলে উপন্যাসের বিচারই অসম্ভব।

দৃষ্টান্ত দ্বারা কথ্যটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

দুইটি চিত্রকর দুইটি চিত্র অঙ্কিত কবিল। একটি সরল রেখাব—অপরটি মনুষ্যমূর্ত্তির। প্রথমটি নিকলঙ্ক হইল, দ্বিতীয়টিব স্থানে স্থানে কিছু কলঙ্ক দেখা গেল। ইহা দেখিয়া কি কোনও বিচারক বলিতে পারেন যে, এই সরল রেখার চিত্রকর মনুষ্যমূর্ত্তির চিত্রকর অপেক্ষা ভাল চিত্রকর? কখনই নহে। কারণ একটির বিষয় অতি সহজ, অন্যটির বিষয় অপেক্ষাকৃত অনেক কঠিন। আবার মনে কর, একটি অতি সুন্দর ভাবযুক্ত ছবি ও আর একটি বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণরাজী বিভাসিত অনর্থযুক্ত ছবি তুমি একটি বালকের সম্মুখে ধরিলে। বালক ইহার কোনটি লইবে। অবশ্যই শেষেরটি। কেন? না, প্রথমটি অপেক্ষা সে শেষেরটিতে অধিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। কেন পায়? না, সে প্রথমটির art বুঝিতে পারে না, সুতরাং সৌন্দর্য্যই বুঝিতে পারে না।

কেহ যদি একরূপ বলিতে চাহেন “অত কথার কাজ কি? যাহা আমার নিকটে সহজে ভাল লাগিবে, তাহাই ভাল বলিব, যাহা ভাল লাগিবে না, তাহাই মন্দ বলিব,” আমরা তাঁহাকে বলিব যে এ তাঁহার বিচার হইল না। সৌন্দর্য্য দ্বারা বিচার করিতে হইবে বলিয়াই যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই একরূপ নহে। উপন্যাস বিচারকালে তাঁহাকে ধীরভাবে উপন্যাসের বিষয় ও তত্ত্বপরি প্রযুক্ত art ভাল করিয়াই দেখিতে হইবে, নহিলে সুবিচার অসম্ভব।

বৈদেশিক সভ্যতা ।

সৌভাগ্য বশতই হউক আর দুর্ভাগ্য বশতই হউক আমি বালাকানাবধি ইংরাজি মতে শিক্ষিত । আমাদের সমাজের বন্ধগার্থ সম্প্রদায় বা সংস্কার-প্রয়াসী দল আমার প্রতি একমত হইবেন কিনা জানি না । আমি নিজেব শিক্ষানুসারে ইংরাজি মতে, বৈদেশিক সভ্যতা আমাদের গ্রহণীয় কি না এতৎ সম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিব ।

আমার মতে ইংরাজি সভ্যতা কোন কোন অংশে আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । কিন্তু আমি এখানে ইহাকে সর্বোংশে উৎকৃষ্ট বলিয়াই ধরিয়া লই-
লাম । এই উৎকৃষ্ট সভ্যতা আমাদের গ্রহণীয় কি না তাহাই আমাব আলোচ্য ।

বলা উচিত আমি জাগতিক সাধাবণ বিবর্তবাদে বিশ্বাস করি এবং জৈব বিবর্তনে, ডাবউইনের মতে, শ্রদ্ধা করি । বিবর্তবাদের সাহায্যে আমি নিজমত সমর্থনে প্রয়াস পাইব । যাহা বিবর্তবাদে অশ্রদ্ধা করেন, অথবা ডার্কইনের নামে নাসিকা স্কেচ করেন তাঁহাদিগকে আমার এ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কষ্ট পাইতে বলি না ।

ইয়রোপীয় বিজ্ঞান অধুনা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে মনুষ্য সমাজ একরূপ শরীর পদার্থ । প্রাণী-শরীরের ক্রিয়া যে যে সাধারণ নিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে, সমাজ-শরীর ও সেই সেই নিয়মেব অনুযায়ী । সমাজকে কি কারণে শরীরী বলা যায়, যাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয়ের লিখিত প্রথম বৎসরের “নব জীবনে” প্রকাশিত সমাজ-শরীর প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুবোধ করি ।

সমুদয় মনুষ্য জাতির সমষ্টি লইয়া একটি শরীর নহে ; ইংরাজ সমাজ, হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজ ইত্যাদি বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন দেহধারী । তন্মধ্যে কোনটিই এত উন্নত নয় যে সর্বোচ্চ সুন্দর মনুষ্য দেহের সহিত তুলনীয় হইতে পারে । প্রাণী-জগতে যেমন অরয়ব রহিত কীটাপু ক্রমি হইতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবয়বাবাদি সম্পন্ন স্তন্যপায়ী পর্য্যন্ত নানা পর্য্যায়ভুক্ত জীব আছে, সমাজ জগতে ও সেইরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি রহিত বর্কর জাতি, হইতে

•আরম্ভ করিয়া নানা অবয়ব সম্পন্ন সুসভ্য জাতি পর্য্যন্ত বিবিধ পর্য্যায় দৃষ্ট হয় ।* কোন জীবের সহিত কোন সমাজের তুলনা করা যাইতে পারে যাহারা জানিতে চান, তাহার Spencer প্রণীত Principles of Sociology পাঠ করিবেন ।]

বিবর্তবাদের একটা সাধারণ নিয়ম এই জীবমাত্রের গঠন বহিস্ প্রকৃতিব অনুযায়ী হয় । যে জীব বহিস্ প্রকৃতির উপযোগী ইন্দ্রিয়াদি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না, তাহার বেশি দিন বাঁচিবার আশা নাই । এই বহিস্ প্রকৃতিব ইংরাজি নাম Environment এবং এই উপযোগিতার নাম Adaptation । যে জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহ্য প্রকৃতিব উপযোগী, সেই জীব সংগ্রামে জয়লাভ করে, অন্যান্য অনুপযুক্ত প্রাণী লোপ পায় । এইরূপে উপযুক্তের স্থিতি ও অনুপযুক্তের বিকাশে ঋণক্রমে সকল জীবই বাহ্য জগতের উপযোগী প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া উঠে । এই নিমিত্তই মৎস্যাদির নিঃশ্বাস যন্ত্র একরূপ, আবার স্থলচর জীবের শ্বাস যন্ত্র অন্যবিধ । এই নিমিত্তই শীত প্রধান দেশের জীবের লোম দীর্ঘ ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জীবের লোম খাট । এই নিমিত্তই মাংসাশী জন্তুরা তীক্ষ্ণ-নখদন্ত-শালী ও হিংস্র প্রকৃতিক হয় এবং উদ্ভিজ্জাদি মৃদু প্রকৃতিক হয় ও তীক্ষ্ণায়ুধ রহিত হইয়া থাকে । ইত্যাদি—

Adaptation to Environment বাহ্য প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য বিবর্তবাদের একটা মূল বক্তব্য । গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী জীব বা উদ্ভিদ শীত প্রধান দেশে বিশেষ যত্ন না করিলে বাঁচে না ; কিম্বা শীতল দেশের তরু লতা গরম দেশে বৃদ্ধি পায় না । জলজন্তু স্থলে আসিয়া জীবিত থাকে না অথবা স্থলের জন্তু জলে ফেলিয়া দিলে মরিয়া যায় । ইহাই সাধারণ নিয়ম ।

তদ্ব্যতীত একটা কথা আছে । জীব যাত্রেরই দ্যুনাথিক পরিমাণে এরূপ শক্তি আছে, যদ্বারা বহি প্রকৃতিব কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিলে নিজ অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও তদুপযুক্ত রূপে পরিবর্তিত করিতে পারে । এই শক্তি টুকু না থাকিলে জীবের আবুস্থানই অসম্ভব হইত । এমন কি পৃথিবীতে জীবের উদ্ভবই ঘটিত না । কেননা বহি প্রকৃতি সদা পরিবর্তনশীল ; পলে পলে, যুগে যুগে, বর্ষে বর্ষে শতাব্দে শতাব্দে ভূপৃষ্ঠে পরিবর্তন ঘটতেছে । জলে স্থলে বায়ুমণ্ডলে সর্বত্র অবিশ্রাম গতিতে পরিবর্তনই জগতের নিয়ম ।

দিবসের মধ্যে আলোঐশ্ব্য, সৌরতাপের পরিবর্তন, বর্ষের মধ্যে ঋতু পরিব-

ক্ষন, জলের গতি, বায়ুর গতি, ভৌত বস্তুর পরিমাণ, নৈসর্গিক বিপৎ পাত,—
এ সকলের পরিবর্তন আছেই ত। তন্নিম্ন যুগ ব্যাপী পরিবর্তনে পৰ্ব্বত
ভাঙ্গিয়া দেশ প্রস্তুত হয় এবং মৃগের গর্ভ পৰ্ব্বভাষিত্যকায় পরিণত হয়।

ভূপঞ্জর পরীক্ষা করিয়া ও নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহে পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন
যে কোটি বর্ষ পূর্বে পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল এখন তাহার লম্বিক পরিবর্তন
ঘটিয়াছে। এই মহা মহা পরিবর্তনের কথা ভূপঞ্জরের স্তরাবলিতে ক্ষুট-
ক্ষরে লেখা আছে।* এই বহি প্রকৃতিব পরিবর্তনের সঙ্গে জীব জগতে ও
মহান পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। কত পত নূতন জীব পৃথিবীতে উদ্ভূত
হইয়াছে। এবং কিছু কাল লীলা খেলা করিয়া চিরকালের মত লয় পাই-
য়াছে। যে কালে যে জাতি প্রকৃতিব উপযোগী ছিল সে কালে তাহারাই
আধিপত্য করিয়াছে এবং তৎপরকালে বহির্জগতে রূপান্তর ঘটিলে অধিকতর
উপযুক্ত জাতি আসিয়া তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন অধিবাসীদের
মধ্যে বাহারী প্রকৃতিব সঙ্গে নিজ অবস্থা সম্বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিয়াছে,
যাহা প্রকৃতিব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শক্তির বলে নিজ অবস্থার
উন্নতি করিয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়াছে তাহারাই কেবল রূপান্তরিত
অবস্থায় বাঁচিয়া আছে, অন্যান্য জাতি যাহা তাহা পারে নাই, তাহারা ধরা-
পৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইয়া ভূতত্ত্ববিদের জন্য ভূপঞ্জরে কালাবশেষ রাখিয়া
গিয়াছে। ইহারই নাম জীব জগতে বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ। এই রূপেই
বিভিন্ন রূপ-ধারী, বিভিন্ন স্থান-বাসী, বিভিন্ন দেশ কালোপযোগী স্তরায়
বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব সমূহের উদ্ভব হইয়াছে।

আমরা যাহা দেখিলাম তাহার ফল এই দাঁড়ায়। (১) জীব মাত্রেই
সাধাবণত বহি প্রকৃতিব অনুযায়ী শরীর ও প্রকৃতি বিশিষ্ট। (২) বহি
প্রকৃতি ক্রমশ পরিবর্তন শীল এবং তাহাব সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার
জন্য জীব শরীরও পরিবর্তন শক্তি বিশিষ্ট। (৩) বাহিরের পরিবর্তন অল্প
পরিমাণ হইলে জীব শরীর ও তদনুরূপ পরিবর্তিত হয়; ইহারই নাম ক্রম-
বিকাশ। (৪) বাহিরের পরিবর্তন আকস্মিক বা অমিত প্রমাণ হইলে জীব
শরীর তদনুরূপ না হইতে পারিয়া মারা পড়ে।

এই কয়টি কথা যে কেবল বড় বড় বিষয়েই খাটে এমন নহে প্রাত্যহিক
ঘটনা হইতে সহস্র সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন ক্রমশ

ঋতু পরিবর্তনে কাহাবও কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু আকস্মিক পরিবর্তন ঘটলেই নানা রূপ ব্যাধি, এমন কি মহামারী পর্য্যন্ত ঘটয়া যায়। রেলপথে বিস্তাবে ম্যালেরিয়া, ছুঁড়ির সহচরী মড়ক—এ সকলই আমাদের নিত্য ঘটনা।

সকল জীবে বাহা, মনুষ্যপক্ষেও তাহা। মনুষ্য কিয়ৎ পরিমাণে ক্রমশ পরিবর্তন অক্লেশে সহ্য করে, মনুষ্যের শরীর ও মানসিক প্রকৃতি পর্য্যন্ত কিয়ৎ পরিমাণে বাহ্য শক্তির অনুযায়ী। নতুন ব্যায়াম শিক্ষা বা বিদ্যালোচনা বা নীতি শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? বাহিরের শক্তি প্রয়োগে শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিকে আন্তে আন্তে গড়িয়া তুলিতে ও দৃঢ় করিতে পারা যায় বলিয়াই উহাদের উপকাৰিতা। কিন্তু যখনই এই বাহ্যশক্তি প্রবলবেগে আকস্মিক ভাবে আক্রমণ কবিলে, তখন আব মনুষ্যদেহ গঠিত হইবে না, বরং ভাঙিয়া যাইবে। নতুবা হঠাৎ শীত পড়িলে বা গরম পড়িলে পীড়া হয় কেন? অনিয়মে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় কি কারণে? গুরুতব পরিশ্রমে জীবন হানি কাৰণ কি? গুরুতব মানসিক ব্যায়ামে মনোব গঠন না হইয়া প্রত্যাশিত মানসিক শক্তি নিপীড়িত ও ক্ষয়িত-তেজ হইয়া যায় কেন?

সুতরাং কি জীব জগতে, কি মনুষ্য জগতে, কি অতীত ইতিহাসে, কি বর্তমান কালে দেখিতে পাই; (৫) বাহ্য জগত পরিবর্তনশীল; সুতরাং জীব দেহেরও আত্মবিকাশ ক্ষমতা আবশ্যক। এবং সাধারণত জীব মাত্রেই এই ক্ষমতা অল্প বা অধিক পরিমাণে ধারণ কবে; (৬) বাহ্যজগতে আকস্মিক বা অমিত প্রমাণ পরিবর্তন ঘটিলে জীবদেহেব মৃত্যুই অবশ্যজ্ঞাবী; সুতরাং তাদৃশ পরিবর্তন সর্ব্বথা অবাঞ্ছনীয়। (৭) জীবদেহ সর্ব্বতোভাবে তরল হইলে চলিবে না, যিনি একেবারে কঠিনা রহিত, তিনি সামান্য ফুংকার মাত্রে বিচলিত বিপর্য্যন্ত বা বহুধা ভগ্ন ও বিনষ্ট হইবেন। আবাব সর্ব্বতোভাবে কঠিন হইলে ও চলিবে না, একেবারে কঠিন হইলে অবশ্য কিছুকাল বাহ্য প্রকৃতির চাপল্য ঘটিলে নির্ধাতন সহ্য করিতে পারিবে বটে; কিন্তু একেবারে নোঙাইতে না চাহিলে, বাহ্য শক্তি অতি প্রবল হইলে ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

বস্তুত জীব দেহ মাত্রেই নাতি তরল নাতি কঠিন হইয়া থাকে।

এখন আমরা জীব দেহের সাত নিয়ম ব্যক্ত করিলাম। সমাজ দেহেব উপরেও উক্ত নিয়মগুলি অক্ষরে অক্ষরে খাটিবে। কতিপয় উদাহরণ দ্বারা বিশদ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম নিয়ম । সমাজ শরীর যে বাহ্য প্রকৃতির অস্থায়ী, সে কথা কহা-
কেও বলিতে হইবে না । Buckle সাহেব এই কথা বুঝাইতে গিয়া অনেক
কথা বলিয়াছিলেন । আর্য্যাবর্তের পূণ্যভূমি প্রাচীন ঋষিচরিত্র এবং গ্রীস
দেশের সাগর পরিবেষ্টিত পার্শ্বভূমি প্রদেশ প্রাচীন গ্রীক চরিত্র গঠন করিয়া-
ছিল । সাগরবর্গে ভাসমান, প্রকৃতির শস্য সম্পত্তি বঞ্চিত, কুজ্জ্বলিকা
সমাস্ক্রম-নভ-প্রদেশ ইংলণ্ড দেশে ইংরাজ জাতি, আর সাহারাৰ বিকট
মরুতে আতপ-দগ্ধ কাফি । এইরূপ যে জাতি দেখিবে সকলেই যে বহি
প্রকৃতির দ্বাৰা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত তাহাদের জাতীয় প্রকৃতিই তাহার পরিচয়
দিতেছে ।

দ্বিতীয় নিয়ম । বহি প্রকৃতি বা Environment বলিলে কেবল মাত্র নদী
পর্বত ও জলবায়ু মাত্র বুঝায় না, চেতন বা অচেতন বাহ্য জগতের শক্তি
নিচয়ের সমষ্টিকে বুঝায় । বঙ্গের উর্বরা ভূমি, ভাগীরথীর জলপ্রবাহ, বড়-
ঝরু বিকাশ বা হিমালয় পর্বত—আমার শরীর ও মানস প্রকৃতির যেরূপ
নিয়ামক, আমার বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশী দেশবাসী, জীবজন্তু বৃক্ষ লতা-পর্য্যন্ত
সেইরূপ আমার প্রকৃতির উপর আধিপত্য বাখে । এ সকলের পরিবর্তনে
আমার পবিত্ব ন হয় । সেইরূপ সমাজেও । কেবল ভূমধ্য সাগরের বাণিজ্য
বর্তন, Gulfstream এর উত্তপ্ত প্রবাহ, বা সাহারাৰ জলন্ত নিঃশ্বাস ইয়ু-
রোপ ভূমিৰ সভ্যতা বজায় রাখিয়াছে একপ নহে ; ভারতের আবাদ বাণিজ্য,
কালিফোর্নিয়ার স্বর্ণখনি, আফ্রিকার দাসজাতি ও চীনবাসীর অহিংস
প্রিয়তাও সেইরূপ ইউরোপ সমাজকে নিয়মিত করিয়াছে ও কবিতোছে ।
কে বলিবে বহি প্রকৃতির পরিবর্তনে সমাজ শরীরে পরিবর্তন হয় না । পঞ্চ-
দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপ মুর্থ ছিল । কেন ? ইউরোপের উপর বহিপ্রকৃতির
বিশেষ পরিচালনা হয় নাই বলিয়া । ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাজ
ভড়িঙ্গগতিতে উন্নতি মার্গে আরোহণ করিল । কেন ? তাহার Environment
পরিবর্তিত হইল বলিয়া । আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল বলিয়া ও ভারতে বাণিজ্য
প্রচার হইল বলিয়া । প্রাচীন রুটন রোমানদের সংসর্গে আসিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম
গ্রহণ করে এবং বিজ্ঞত্ব ব্যবহার অমুকরণ করে । প্রাচীন লাক্সন নদ্রাণ
দের সংসর্গে পড়িয়া পশুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া Castle নির্মাণ অভ্যাস কবে
এবং Arthur ও Charlemagne এর বীর্য কাহিনী গাহিতে শিখে । বাহ্য

প্রকৃতি যে জাতির প্রকৃতি গঠন ও নিয়মন করে ইহা কেহ! অস্বীকার করিবে না ।

(৩) বাহ্য শক্তির পরিবর্তন যেখানে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ঘটে সমাজ ও সেই থানে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া উন্নতি ও বিকাশের দিকে অগ্রসর হয় । ইউরোপের বাহিরের জ্ঞান ক্রমে ক্রমে যুক্তি পাইয়াছে ; ইউরোপীয় সমাজ ও ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । জ্ঞানোন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের রাজনীতি, ধর্মনীতি বিকাশ পাইয়াছে, তাই বলিয়া ইংরাজ সমাজ এত দৃঢ়মূল, তাই বলিয়া ইংরাজ সমাজ Constitutional Government এত এত গর্ব করে । ফরাসী সমাজ জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সম-ভাবে বিকাশ পায় নাই, তাই যখন বাহ্য শক্তিব প্রচণ্ড বাত্যা ঘোর বেগে বহিয়া উঠিল, সমাজের মূল পর্য্যন্ত খবহরি কাঁপিয়া গেল, নব শোণিতে ফরাসী ভূমি আত্ম হইল । আজি পর্য্যন্ত ফরাসী সমাজ টলটলাধমান ।

(৪) চতুর্থ নিয়ম । কিন্তু বাহিরের পরিবর্তন যখন আকস্মিক ও অপরি-মিত হয়, তখন জীব শরীরই হউক, আব সমাজ শরীরই হউক, কাহার সাধ্য নাই, যে বাঁচিয়া উঠে । পরিবর্তন যেখানে অল্প, জাতীয়-প্রকৃতির ও সেই থানে বিকাশ, বাহিরের পরিবর্তন যেখানে বেশী জাতিবৎ তথায় বিনাশ ।

নিকট সমাজই হউক আব উৎকৃষ্ট সমাজই হউক বিজাতীয় সমাজ যখন প্রবলবেগে আক্রমণ কবে, তখন আক্রান্ত সমাজের সাধ্য নাই যে সামঞ্জস্য বজায় রাখে । বিনাশ সেখানে অবশ্যস্বাবী । ছন দিগের আক্রমণে ইউরো-পের প্রাচীন সমাজ ভাঙিয়া গিয়াছিল । অসভ্য স্প্যানিয়ার্ডের প্রবল আক্রমণে সভ্যতাব মেক্সিকো ও পেরুব প্রাচীন সমাজ সহিতে পাবে নাই । ইসলামের প্রবল ঝটিকায় প্রাচীন পারস্যের জাতীয় জীবন বিধ্বস্ত হয় । বোডশ শতাব্দীর ধর্ম বিপ্লবের প্রচণ্ডবেগে স্পেনেব কাথলিক সমাজ জীবনমৃত হইয়াছে । এইত গেল অসভ্যতার আক্রমণে সভ্যতার বিনাশ । এইবাব সভ্যতার আক্রমণে অসভ্যতার ছন্দশা দেখা যায় । প্রাচীন রোমের সংসর্গে পড়িয়া অসভ্য রুটন শুল্লভুক্তি পরিহার করিয়া উৎকৃষ্টতর জীবন বৃত্তি অবলম্বন কবে । বিজ্ঞতার অনুকরণে বিজ্ঞতার ভাবা, বিজ্ঞতার আচার, বিজ্ঞতার পবিচ্ছদ, বিজ্ঞতার ধর্ম গ্রহণ করে । ইহার নাম উন্নতি সন্দেহ নাই । প্রাচীন রুটন উন্নতি মার্শে আরোহণ করিল, অসভ্যতা পরিহার করিয়া সভ্য অদবী প্রাপ্ত

ইইল। কিন্তু ইহার নাম বিকাশ নহে। বাহ্য শক্তির সহিত প্রাচীন বুটন জাতীয় জীবনের সামঞ্জস্য রাখিতে পারে নাই। রোম বধন আশ্রয়স্থান জন্য বুটনকে পরিত্যাগ করিল, তখন বুটনের সেই উন্নতি, বুটনের সেই সভ্যতা কোথায় রহিল, ইতিহাসজ্ঞ মাঝেই সেই দারুণ বাস্তব অবগত আছেন।

আব একটা আধুনিক উদাহরণ দিব। আট্টেলিয়া ও ফিজি দ্বীপের আদিম নিবাসী মনের আনন্দে পশুর সঙ্গে পশুর মত চরিয়া বেড়াইত। তিন হাজার বর্ষ পূর্বে ইউরোপ যে পদবীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহারাও ততুল্য অথবা আরও নীচ অবস্থায় ছিল। ভাষাহীন, জ্ঞানহীন, ধর্মহীন ফিজি বাসী পশুর ন্যায় বিচরণ করিত এবং কৃষির পিপাসু দেবতার নিকট বৃদ্ধ পিতাকে বলিদান দিয়া পরম স্নেহে পিতৃদেবের আম মাংস উদরসাৎ করিত। তাহাদের অবস্থা শোচনীয় ও ঘৃণেয় ছিল সন্দেহ নাই—অকস্মাৎ ইউরোপ তাহার উৎকৃষ্টতর সভ্যতা ও উৎকৃষ্টতর ধর্ম লইয়া তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পাপীর পবিত্রার্থ্য খুঁটান পাদরি ধর্ম পুস্তক হস্তে করিয়া তাহাদের উদ্ধারার্থ বদ্ধ পরিকর হইলেন। ফল হইল কি? সকলেই জানেন আট্টেলিয়া বাসীর উদ্ধারে আর বিলম্ব রহিল না, সামাজিক ক্রম বিকাশের পথে অগ্রসর হইবার অবসর রহিল না। আট্টেলিয়ার আদিম বাসী ধরা পৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবার উদ্যোগ দেখিতেছে।

সুতরাং (পঞ্চম নিয়ম) সমাজ মাত্রই অল্প মাত্রায় পরিবর্তন সহিতে পারে এবং ক্রমে বিকাশ লাভ করিয়া উন্নত হইতে পারে সত্য, কিন্তু, (ষষ্ঠ নিয়ম,) উন্নতির পক্ষেই হউক আর অবনতির দিকেই হউক, পরিবর্তন আকস্মিক হইলে বিনাশের সম্ভাবনাই বেশী। সমাজের বিকাশ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বিপ্লব ভয়ঙ্কর।

ভারতের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, জানি না বৈদেশিক শক্তির তরঙ্গ আসিয়া এই প্রাচীন সমাজের ভিত্তির উপর আঘাত করিতেছে। হইতে পারে ইংরাজি সভ্যতা, উৎকৃষ্ট, হইতে পারে ইংরাজী সভ্যতা নিকট, সে বিষয়ে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। উৎকৃষ্টই হউক, আর নিকটই হউক, প্রবল পরাক্রমে বাহ্য শক্তি আসিয়া এই সমাজের উপর আপতিত হইয়াছে। কাহারও সাধ্য নাই যে এই শক্তি রোধ করে বা প্রতিহত করে। এই প্রাচীন তত্ত্ব উপর আরও ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, আরও

প্রবল বাত্যা এই তরুর মূলোৎপাঠনে সমর্থ হয় নাই। কে বলিবে এই নৃহন আক্রমণের ফল কি? এ ঝটিকার বেগ সত্য করিতে পাবিবে কি না পাবিবে কেহই তাহা বলিতে পারে না। হিন্দুর জাতীয় জীবনের Environment বিহ্বাধেগে পরিবর্তিত হইতেছে। এই পরিবর্তন ধীর গতিতে হইলে কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না। হিন্দুর জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ বিকাশ ক্ষমতা আজও লোপ পায় নাই। কিন্তু পরিবর্তন যেরূপ আকস্মিক তাহাতে সমধিক শঙ্কার বিষয়। আমাদের জাতীয় জীবনের পবিণাম কি কাহার ও সাধ্য নাই যে গণিতে পাবে। পরিবর্তনের উদ্ভিমালা আঘাত কবিত্তেছে, এই আঘাত নিবারণের উপায় নাই, তবে সেই আঘাতের আত্মকূল্য করা কর্তব্য কি না ধীর ব্যক্তির আলোচ্য বিষয়।

১. আমার আব অধিক বক্তব্য নাই। ইউরোপীয় জীববিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র কয়টি বলাই আমার উদ্দেশ্য। আমাদের কোন পদ্ধতি অবলম্বনীয় সুবোধ লোকে বিবেচনা কবিবেন। সমাজ বিজ্ঞান কেবল এত দিনে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে মাত্র। সমাজ বিজ্ঞান আব কিছু দোণাক্ষ আর না দেখাক্ষ এই কথা প্রতিপন্ন কবিত্তে চাব যে জাগতিক সকল কায্যই নৈসর্গিক নিয়মের অধীন, মনুষ্য সমাজ সেই রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম নিচেষে আবদ্ধ। সেই সকল নিয়ম অপরিবর্তনশীল, মনুষ্যেব ইচ্ছাব বশীভূত নহে। মানুষ যেমন ইচ্ছা করিলে মাধ্যাকর্ষণেব ব্যতিক্রম কবিত্তে পারে না, সেইরূপ সমাজ শরীরে বিবর্তনের উপরে ও হাতদিতে পারে না। সমাজ আপনা হইতে উদ্ভূত হয়, আপনা হইতে বিকাশ পায়, মানুষ তাহাব অল্পথা কবিত্তে পাবে না। সমাজের গঠন যেরূপ সম্ভবপর নয়, ইচ্ছাকৃত সমাজেব উন্নতিও সেকপ সম্ভবপর নয়। শাবীর বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া চিকিৎসক জীব-শরীরের ব্যাধি আরোগ্য করেন সত্য বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি কিছু নৈসর্গিক নিয়মেব বিরুদ্ধে আচরণ কবে না। জীব-শরীর যেদিকে ইচ্ছা লইয়া যাওয়ার তাহার ক্ষমতা নাই। বিজ্ঞান বলে প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যেই তিনি প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়মিত করেন। যেখানে চিকিৎসক বিজ্ঞানের সাহায্য পান না, সেই খানেই পীড়া আরোগ্য করিতে গিয়া মৃত্যু ডাকিয়া আনেন। হুর্ভাগ্য ক্রমে জীবদেহের চিকিৎসা প্রণালী আজিও বৈজ্ঞানিক মতে পূর্ণতা লাভ করে নাই। জীবের শারীর-বিজ্ঞান অনেক উৎকর্ষ

জাতি করিয়াছে সভ্য কিন্তু চিকিৎসক। প্রাণালী তদনুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই। সমাজের শরীর বিজ্ঞান সবে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। সমাজের ব্যাধি বিজ্ঞান সম্বন্ধে চিকিৎসা প্রণালী প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনেক দেরি। যে সকল সংস্কারক নিজ অজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া সমাজের ব্যাধি আরোগ্য করিতে প্রয়াস পান তাঁহারা হাতুড়ে চিকিৎসক। তাঁহাদের দ্বারা কোন সুফলের প্রত্যাশা নাই, প্রত্যাশ অপকাবের সম্ভাবনা।

হইতে পাবে আমাদের সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত, কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রান্ত সংস্কারক ইহার ব্যাধি আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিও না। আমাদের বন্ধ সমাজ-তরু অনেক বাত্যা সহ্য করিয়াছে। ইহাব মূলোৎপাটন হয় নাই বটে, কিন্তু কে বলিবে ইহা অক্ষত শরীরে রহিয়াছে, কে বলিবে ইহাব দুই একটি প্রকাণ্ড শাখা ভগ্ন হয় নাই। কে বলিবে ইহার প্রকুরতা সজীবতা নবীনতা পূর্বের মত স্বত্বমান আছে। পুনরায় পাকাত্য সভ্যতার প্রবল বাত্যা বহিতেছে। দুই একটি শাখা প্রশাখা জীর্ণমূলও ভগ্ন হইয়াছে। উপরের পাতাগুলি ঝরিয়া বাইতেছে। এই বাত্যা প্রতিবোধের উপায় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া আর ইচ্ছা পূর্বক সমাজ তরু অঙ্গচ্ছেদ করিও না। আপনা হইতে যাহা ভাঙিতেছে ভাঙুক। ইচ্ছা পূর্বক ক্ষত সংখ্যা বাড়াইও না।

স্বীকার করি কোন জীবেরই পক্ষে কাঠিন্য শুভকর নহে; সপ্তম নিয়মানুসারে কাঠিন্য ও তারল্যের সমবায়ই জীবশরীর গঠিত হওয়া আবশ্যিক, স্বীকার করি পরিবর্তন আবশ্যিক; পরিবর্তনের একান্ত অভাব বিকাশের অন্তবায়; কিন্তু পরিবর্তন যেখানে মুহূর্ত্তে আইসে, সেই খানেই বিবর্তন ও বিকাশ। পরিবর্তনের বেগ যেখানে প্রবল সেইখানেই ভবিষ্যৎ আশঙ্কা জনক।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সন্মিলন মধুর কথা; প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সন্মিলন আশাজনক ও সমগ্র মানব জাতির মঙ্গলাবহ। কিন্তু সন্মিলন সম্ভব কি না আলোচ্য বিষয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে অনেক প্রভেদ; প্রত্যেকে আপন আপন Environmentএর উপযোগী। সন্মিলন বাহ্যিক বটে, কিন্তু একের বিনাশ ও অপরটির উত্থান প্রার্থনীয় নহে। প্রাচ্য ভূমেজাত বুদ্ধ তরু শাখা কল্কান করিয়া তদুপরি প্রতীচ্য তরু কলম রাখিলে সুফলের আশা করা যায় কি না সমাজ বিজ্ঞানের আলোচ্য, অজ্ঞ উদ্ভূত প্রকৃতিক সংস্কারকের অধিগম্য নহে।

ইউরোপীয় সমাজ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা মহামানসী হবার্ট স্পেনসরের এই হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

“The unfolding of an organism after its special type, has its approximately uniform course taking its tolerably definite time; no treatment that may be devised will fundamentally change or greatly accelerate these. But it is quite easy to adopt a treatment which shall dwarf or deform otherwise injure: the process of growth and development may be hindered or deranged though they can not be artificially bettered. Similarly with the social organism. Though, by maintaining favorable conditions, there can not be more good done than that of letting social progress go on unhindered, yet an immensity of mischief may be done in the way of disturbing and distorting and repressing by policies carried out in pursuance of erroneous conceptions.”

Study of Sociology. p.—401.

পুনশ্চ (প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে মিলনাকাঙ্ক্ষীদেব প্রতি)

Between organisms widely unlike in kind no progeny can arise; the physiological units contributed by them respectively to form a fertilized germ, can not work together, so as to produce a new organism.

Evidently as while multiplying, the two classes of units tend to build themselves into two different structures, their conflict prevents the formation of any structure. In cases where the conquering and the conquered widely unlike intermarry extensively, a kindred effect is produced. The half caste inheriting from one line of ancestry proclivities adapted to one set of institutions and from the other line of ancestry is not fitted for either. He is a unit whose nature has not been moulded by any social type and therefore can not evolve any social type. Spain with its diverse peoples Basque, Celtic, Gothic, Moorish, Jewish, partially localized shew us this result,

Principles of sociology, Vol. I. p. 592—594.

ক্রোটনের কথা ।

১।

আমি ক্রোটন ভাল বাসি না ;—বাবু ভায়াদের বড় বড় বৈটকখানার উঠিবার সিঁড়ির চুই ধারে, বাগানের যেখানে, যেখানে—এখানে ওখানে যে পাঁচরক্স পাতার বিমাতী রত্নিন গাছগুলো দেখা যায়—সেই গুলাই ক্রোটন ;—আমি ক্রোটন ভাল বাসি না ; দেখিতে পারি না—আমার একান্ত ইচ্ছা যে তোমারাও ও গুলাকে না ভালবাস, না পছন্দ কর, দেখিতে না পার। তোমরা—কিনা—গড়-গড় গাড়ী তেতলা বাড়ী বড় মাহুঘেরা, তোমরা কিনা—বাগান বায়ু গ্রস্ত মধ্যবিধ বাবুবা, তোমরা কিনা—গোলাপী সৌখীন গৃহস্থ লোকেরা ; তোমরা কিনা—কুল কাছারিব আপিসের অধ্যক্ষেরা, তোমরা কিনা আধকাঠা উঠান পাইয়া সহরের সোভাগ্যশালী বাসাড়িয়ারা ; তোমরা কি না—একহাত রোয়াকে বসিয়া শুড়ুক-সেবী দোকান-দারেরা , আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমরা সকলেই ক্রোটন গুলি না-পছন্দ কর, আমার মত দেখিতে না পার।

আমি বাহা ভালবাসিনা, তাহা যে তোমাদিগকেও না-পছন্দ করিতে বলিতেছি,—ইহাতে তোমরা আমাকে ঘোরতর অহঙ্কারী মনে করিতে পার, বড় অহুদাব সঙ্কীর্ণমনা মনে করিতে পার ; তোমাদের মনের জ্বার দিয়া অহুমানের গতি আমি আমার ভাঙ্গা আগুদ দিয়া আটক বাধিতে পারিব না ; কিন্তু তোমরা আমাকে বড় অহঙ্কারী বা নিতান্ত অহুদার মনে করিলে, আমাব কাজ হাসিল হইবে না—আমাব কথা তোমরা রাখিবে না—বলিয়া একটা কথা আমাকে বলিতে হইতেছে। কথাটা এই, যে এমনও ত হইতে পারে, যে আমি তোমাদিগকে ভালবাসি বলিয়াই, আমার চক্ষে জগ-তের ভাল মন্দ দেখিতে, আমি তোমাদিগকে অহুরোধ করিতেছি ; তোমরা সকলেই এই রূপ কর ; বাহাকে ভালবাস, তাহাকে বল না কি, “হি ও সকল সামগ্রী তুমি ব্যবহার কর কেন ?” হয়ত সেইরূপ তোমাদের ভালবাসি বুঝিয়াই বলিতেছি “হি হি ক্রোটন গুলিকে তোমরা অত আদর কর কেন ?”

ক্রোটনের পাঁচরক্স পাতা ; এই না তার গুণ ? ভাল, ওটা গুণ না বোঝ ? তা বেশ করিয়া প্রকবার ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখ দেখি।

এক একটি বর্ণে এক একটি ভাবের সুন্দর স্ফুর্তি হয় ; সে বর্ণটি মিশ্র হটক, আর অমিশ্র হটক, এক এক প্রকারের বর্ণে এক এক রূপ ভাবের স্ফুর্তি ও স্ফুর্তি হয় । ঐ আকাশের আশমান বঙ্গে, দেখ কেমন উদারভাব, উদাসভাব, ধীর স্থির গম্ভীর ভাব, সর্ব সামঞ্জস্য ভাব—গরিফুট রহিয়াছে । প্রান্তরের শ্যামল শোভা—উহাতেও তেমনই উদার ভাব আছে—কিন্তু সে উদাস ভাব নাই ; উহার সঙ্গে সঙ্গে আশা যেন চল চল করিতেছে ; সেই গম্ভীরতা আছে তবু যেন সে ধীর স্থির ভাব নাই ; বাতাসে দোলে ; শিশিরে কঁাদে । জবাকুসুম দঙ্কাশ কাশ্যপেয়ের মহাছাতিতে প্রতাপ যেন গর গর করে, আবার এই শরতের ফুট ফুটে জোৎস্নার জগৎ যেন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্নানপ্রহাসিতে থাকে ।

সুহৃৎ হটক, মিশ্র হটক, এক এক বর্ণের ভাবে, এক একটি রাগিনী বাঁধা আছে । ঐ সুহৃৎ উদ্যানেই দেখ না কেন । ঐ ঘোরাল রক্তবর্ণ পঞ্চমুখী জল—যে সমগ্র তত্ত্ব শাস্ত্র উদ্ভিদবতারে ফুটিয়া বহিয়াছে । মহাশক্তির সেই প্রসন্ন বদনের করাল জিহ্বা, মর্ন্তনশীল ত্রিচরণেব কোকনদ আভা, সেই ববভয়-দাক্তীর রক্ত রঞ্জিতা স্ফুর্তি, রাগরঞ্জিত লোচনেব ভীমা ক্রকুটি—যেন সকলগুলি মিলিয়া মিলিয়া বর্ণগত হইয়া কল্পব্রহ্মের পুষ্পাবতার হইয়াছে , মধুর বটে, কোমল বটে, শীতল বটে,—মৃদু মৃদু ছলিতেছে, মুচকি মুচকি হাসিতেছে—কিন্তু কি রক্ত-রাগ—কি ভীষণ ক্রকুটি ! যেন সহস্র সিংহচক্ষু কেন্দ্রীভূত হইয়া তোমার দিকে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে তোমার অন্তর পরীক্ষা করিতেছে । তুমি পাবণ হইলে, সেই অন্তর পরীক্ষায় তোমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইবে ; তুমি ভক্তিময় হইলে, আপনা আপনি বলিবে—

“রাজ্য জবা কি শোভা পায়—পায় ;”

কোন পায় ? সেই মহাশক্তির পায়—

“যে ক্রকুটি ভঙ্গে, সজিনী সঙ্গে, বামা কত রঙ্গে নেচে যায় ॥”

বাস্তবিক ঐ পঞ্চমুখী জবা—ক্রকুটি ভঙ্গময়ী, রঙ্গময়ী মহাশক্তির মহাপ্রদীপবিন্দে শোভা পায়—তাহাতেইত বলিয়াছিলাম—একটি ছলত ফুটিয়া নাই—যেন একখান তত্ত্ব শাস্ত্র ফুটিয়া রহিয়াছে !

দেখ ঐ চাঁপা ; দেখ ঐ টগর ; দেখ ঐ অপরাঞ্জিতা । বিভিন্ন কুসুমের বিভিন্ন বর্ণের বৈচিত্র্য—চারিদিকেই মোহকর । চাঁপা সত্য সত্যই আলো

করিয়া আছে; সোণার বরণ বলিলে চাঁপার অপমান করা হয়, সোণা বক্ মক্ করে, চাঁপা তা করে না; চাঁপার চাকচিক্য নাই; শোভা আছে, তাহে প্রভা নাই; আলো আছে, তাহে আভা নাই; যে প্রথমে বলিয়াছিল—“সেই মহাশয়, চাঁপা ফুলময়, হেন মনে হয়, খোঁপায় রাখি।” বোধ করি, সে চাঁপা ফুলেব গোবব কিছু বুঝিয়া থাকিবে। সোনার অলঙ্কার—চক চক করে, তাহা অঙ্গে ধারণ করিতে হয়—চাঁপা ফুল স্বাভাবের সোণারি গড়ন—তাহা মাথার মণি করিয়া খোঁপায় রাখিতে হয়।

টগরের ত কোন রঙ্গ নাই বলিলেও চলে; যাহাকে তোমরা রঙ্গ রঙ্গ বল, তাহাবড়ুকিছুই টগবে নাই; অথচ দেখ দেখি কেমন সুন্দর! যে বলিয়াছিল, “শাদা মুলুক জাদা” সে অন্ধ কবি। যে বুঝাইয়াছিল, যে খেতবণই পবিত্রতা—সে মহাদার্শনিক—মহাকবি। টগরের ন্যায় অমল ধবল পুষ্প—মূর্ত্তিমতী পবিত্রতাই বটে। বঙ্গের বালা-বৈধব্য-ব্রত যেন নীরবে, বিরলে বসিয়া রহিয়াছে, তাহাতে হাব, ভাব, বিলাস, বিলম্ব কিছুই নাই; কেবল পবিত্রতাব অমলচ্ছদে স্ততই সুন্দর। ঐ দেখিলে বালবিধবা ব্রহ্মচারিণীব বন-বাসিনী মূর্ত্তি। আবার যখন দেখিবে, টগর প্রতিমা লম্বুখে পুষ্পগারে রাশিকৃত বহিয়াছে, একটু একটু চন্দনেব ছিটা লাগিয়াছে—তখন বুঝিবে সেই ব্রহ্মচারিণীর দেবমন্দিবাসিনী মূর্ত্তি! কুসুমের এ সকল মূর্ত্তি কি তোমাদের ভাল লাগে না? যদি লাগে—তবে কুসুম-কান্তি শূন্য, স্ত্রীকুষ্ঠময় ও পাঁচ রঙ্গ। পাতাগুলার অত আদর কেন? ওগুলো ফুল ও নয়, পাতা ও নয়, ওগুলো ছয়ের বাহির।

জীবন সমস্যা।

১

কেন এ জীবন
নয়নের পথে
সংসারের সেবা?

কেন বা মরণ?
তৃণ হাসি কর
পারি না বুঝিতে

ধরার কি কাণ্ড করি?
“আমিও জীবন ধরি!”
আছে কিবা ফল তার!

অদূরে জাহ্নবী
 “রেণু হ’তে প্রাণী
 “অকুল অতল
 কোথা সে সাগর—
 প্রকৃতি কহিছে
 নয়ন ভুলিয়া ।
 জাহ্নবী কহিছে

ডাকিয়া কহিছে
 আর্ধ্যাবস্ত্য যুড়ে
 সাগরে পড়িয়া
 জীবন প্রবাহ
 “ডুব আসি বুকে
 হেরি চারি ধার—
 “অনন্তের বুকে

২

আপনার স্মৃতি
 একের হৃদয়ে
 আপনার জায়া
 তাহাদের সনে
 আপনা ভুলিব ?
 সে যে বিনিময় !
 বিদ্যা ধন যশ
 আপনা ভুলিয়া
 আপনাতে ডুবে
 এ জীবন কভু

পারি না ভুলিতে
 পারি না ডুবিতে
 আপনার স্মৃতি
 মেলে না মানস
 ভুলিয়াছি কবে !
 তবু তুষ্ট নয়
 লভিতে বাসনা
 কিছু কি তাহাব
 থাকি চির দিন
 মিশে কি অনন্তে

৩

জাহ্নবীর তীরে
 যুবকের দেহ
 “আপনা ভুলিতে
 “আপনাতে ভরা,
 “আপনার স্মৃতি
 “জগত হইতে
 “এত আপনায়
 “তথাপি অনন্ত
 “এই স্মৃতি দেহে
 “তুমি কোন্ বিন্দু ?

কালীতলা ঘাটে
 ধরিয়া কোলেতে
 পাবনা মানব
 ছিল বুক ভাব
 জগতের হুখে
 মহত ত্যজিত
 ভরা যে জীবন
 হৃদয় পাতিয়া
 ও অনন্ত যদি
 তুমি কি মানব

“দেখ মোবে একবার,
 সেবি আমি অবিরল,
 করি প্রাণ অশাতল ।”
 যেখানে মিশায়ে যায় ?
 দেখিতে পাইবে তার ?
 শান্তির সাগর কই ?
 অনন্ত জীবন ওই ।”

অনন্তে মিশিব, হয় !
 অনন্তে ডোবা কি যায় !
 আপনার পরিজন,
 অনন্তে মিলিবে মন !
 কভু কি দিয়াছি প্রাণ !
 তবু যে কবেছি মান ।
 স্মৃতি নিঞ্জের তরে
 দিয়াছি কখন পরে !
 কুপ গর্ভে ভেক প্রার,
 কেন এ জীবন, হয় !

চিতায় অনল জলে,
 হাসিতে হাসিতে বলে
 হের এই মৃত্যুকার
 সে আপনা কোথা, হার !
 ছিল না ইহার জ্ঞান,
 ইহার আপন প্রাণ,
 হের নর দশা তার,
 ধরিতেছে চারি ধার,
 আপনি মিশিতে চাম,
 মিশিতে নারিবে তার !”

৪

চাহিয়া দেখিছু
চাবি পাশে তার
ভুলিলাম তুণ
ওই মৃত সনে
এত অভিলাষ—
অমনি কবির
মায়ী মোহ প্রেম
বালকের মত
সিহরিল প্রাণ—
ওই কি জীবন

চিত্তার অনলে
বসি প্রিয় জন
ভুলিছু জাহ্নবী
ওই প্রিয় জনে
এত অভিমান
চিত্তাব অনলে
বালিব সৈকত !
আপন ছায়ার
মুদ্রিছু নয়ন
জড় অজড়ের

পুড়িছে মানব দেহ,
নিকটে না যার কেহ,
চিত্তায় ভয়িল প্রাণ,
সুধু কি স্নেহের ভাণ ?
আজীবন মোহ যার,
ওই পরিণাম তার !
মানব জীবন তায়
মাচিয়া ধরিতে যায় !
মানব জীবন স্মরি
হায়রে ভুবন'পরি !

৫

গবাক্ষের পাশে
“তবে কি মানব
“আমার বিকাশে
“ছার সুখ দুখ
“নেহার জগৎ
“এত দুখ যদি
“এ জীবন বারি
“এ মহত্ত্ব তার
“ওই মহত্ত্বের
“আইস মানব

কুসুম কোরক
ফুটিবনা আমি
এ কানন হালে
তুলনায় তার
আকুলি ব্যাকুলি
তবু কেন প্রাণী
জগৎ হইতে
রহিবে কোথায়
বিন্দু বিন্দু কণা
ওই সিঙ্গুনীরে

হাসিয়া কহিছে ধীরে
এখনি যাইব ফিরে ?
সুখ তাহে কতজন !
সুখ দুঃখ কতক্ষণ !
ফোটে প্রাণী কত তার
জীবন ধরিতে চায় !
লহ তুলি একবার
জগৎ রহিবে আর ?
তুমি আমি অন্যজন
কাঁপ দিব দুই জন !”

৬

তটিনীর পারে
গত জীবনের
ছিল কত সজ্জা
ভ্রমণ পতি
সুরভিত দীপে
মুক্ত বাতায়নে
গবাক্ষে গবাক্ষে

বৃক্ষ বাটিকার
কক্ষে কক্ষে আলো
প্রাকোষ্ঠে প্রাকোষ্ঠে
বুরিকা মোহিত
পুলকিত ঘর
ঝুর ঝুর করি
আকুল হৃদয়ে

দীপ শিখা দেখা যাক
ফুটিয়া উঠিছে তায়
কত শোভা ছিল তার
প্রবেশিলে একবার
কুসুম ছড়ান তায়
মহিত মলয় বায়
পাণিরা ঢালিত গান

আশার শরনে
তেমতি করিয়া
দেখি পারি কিনা

আবশে গলিয়া
আবার সাজায়
অনন্তের বৃকে

চলিয়া পড়িত প্রাণ
যদি কেহ এ জীবন
এবার চালিতে মন ।

৭

ফুটীরের দীপ
“অনন্তের দিকে
“হেরি প্রতিদিন
“খায় দায় পরে
“আমারেও কিরে
“চারি পাশে তার
“জালিতে আমারে
“চাঁদের কিরণে
“রাখি তৈলাধার
“স্বামীরে দেখায়

হাসিয়া কহিছে
চাহিবে না ফিরে
যে জালে আমাবে
শেষে শয্যা পাতি
মেথেনা চাহিয়া
ভীষণ অঁধার
আসিলে সুন্দরী
বিভোব অনন্ত
অঙ্গুলি নির্দেশি
কহিল সুন্দরী

“সে আলো জালিলে পুন
তোমাতে ডুবিলে মন
সে নাহি অনন্তে হেরে
আলস্যে ঘুমায় পরে
নিবি আমি ধীরে ধীরে
আসিয়া দাঁড়ায় ঘিরে,
সুধাইয়া ছিন্ন তার ”
সে কেন ফিবে না চায়,
পুলকে বিভোর হই
‘আমাব অনন্ত ওই’ ।”

৮

নিবিল প্রদীপ
কত প্রিয় মুখ
অঙ্গুলি তুলিয়া
কত জন তার
দেখিছে চাহিয়া
ছনয়ন ভরা
একে একে একে
দেখিছে চাহিয়া
বিশ্বয়ে ভরিয়া
হাসি কহে শশী

নয়নের পথে
কত প্রিয়-দুঃখ
আমারে নির্দেশি
কহিছে ডাকিয়া
তাঁহাদের পানে
মমতার সিক্ত
হইল স্বৰ্ণ
আমাতে বাসনা
উঠিল হৃদয়
“ফুটিয়াছে অঁখি

সংসার ভাসিয়া ওঠে,
মানস ভবিয়া ফোটে,
পুলকে পূর্ণিত হই
আমার অনন্ত ওই,
বদনে করুণ অঁকা
বাহুতে বস্তন মাখা ;
সুখ দুখ যত যার,
চালিয়াছে কতবার,
অনন্ত কোণায় আর,
চাল প্রাণ এইবার ।”

হৃদয়

শিখ ঘাট ।

জ্ঞান ।—

নবজীবন ।

১৪র্থ ভাগ ।

ভাদ্র ১২৯৪ ।

২য় সংখ্যা ।

পানিপতের যুদ্ধ ।

(পণ্ডিত কাশীরাজের গ্রন্থ হইতে)

৩১

পৰদিন উজ্জীব সেই ছাগী সেনাকে ডাকাইয়া মৃত কোণায় আঁচে ঠিক
বলিয়া দিলে লুণ্ঠনদ্রব্য প্রত্যাৰ্পণ কবিত্তে হইবে না—এটুকুপ আশাস দিলেন ।
তাহাতে ছাগী সৈনিক বদ্বাবৃত একটা মুণ্ড আনিয়া উজ্জীবেব সমুখে ফেলিয়া
দিল; মুণ্ড চিনিবার জন্য বাজাবাবু পণ্ডিতকে ডাকান হইল, সে দেখিয়া বলিল,
“এ মুণ্ড ভাণ্ডয়েবই বটে, তিনি আগাব প্রভু ছিলেন, অতএব এ মুণ্ডেব
সংকাব কবা আমাব পবিত্র ধৰ্ম্ম, মুণ্ডট অলুগ্রহ কবিয়া আমাকে দিন,
আমি স্বধৰ্ম্মাচাব অনুসাবে দাহ কবিব ।” উজ্জীব ঈষৎ হাসা কবিয়া মস্তকটি
তাহাকে দিলেন এবং কেহ প্রতিবন্ধক না হয এজন্য বযেকজন চিহ্নিত
সেনা প্রেবণ কবিলেন । বাজা বাবু পণ্ডিত শিবিরেব বাহিৰ্ভাগে মুণ্ডেব
সংকাব কবিল । তৎপবে ভাণ্ডয়েব মৃত্যু বিষয়ে কাহাবও সন্দেহ বহিল না ।
পানিপতের যুদ্ধ এব' ভাণ্ডয়েব মৃত্যু বিষয়ে আমি মাত্র চক্ষে দেখিয়াছি
এ স্বহস্তে কবিয়াছি, এই খানে তাহার শেষ হইল ।

পরে শুনা গেল, মলহব রাও, আমাজী গৈকোয়াব, সুদেব বেতাল প্রভৃতি
মহারাষ্ট্রীয় সর্দাবগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে হইতে পলায়ন কবিয়া প্রাণ বন্ধা কবিয়াছিল ।
ভাণ্ডয়ের এক পত্নী অম্বারোহণে দীপ নগবে পলায়ন কবিত্তে সক্ষমা হইয়া

ছিলেন। বাজা সূর্যমল তাঁহাকে সাতিশয় সম্মান সহকাৰে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, এবং অর্থ, বস্ত্র ও পাকী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বক্ষক সমষ্টি-বাহাবে বান্ধী নগর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়াছিলেন, তথা হইতে ভাও-পত্নী দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সমশের বাহাদুর আহত হইয়া দীর্ঘ পৌঁছিলেন ; সূর্যমল তাঁহার যত্নপূৰ্ব্বক চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু কিয়ৎদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল, তাঁহার সমাধি-স্থানব অভ্যাগি দীর্ঘ বিদ্যমান বহিয়াছে।

যুদ্ধের পাঁচ দিন পবে আহম্মদ শাহ ছবানী, দিল্লি যাত্রা করিলেন। চারিদিন কুচ করিয়া ওখায় পৌঁছিলেন। তাঁহাব ইচ্ছা ভাবত-রাজ-শ্রী সন্তোগ কবেন, কিন্তু দৈব তাঁহাকে প্রতিকূল সাধিলেন। নবাব স্ফাউদোলাও তৎসঙ্গে দিল্লি পৌঁছিলেন। মহাবাহু শিবিরেব যত লোক তাঁহাব আশ্রয় লইয়াছিল, সকলকে তিনি এইখান হইতে বিদায় দিলেন। তাঁহাব সেনা উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া জাট বাজোব সীমান্তে নিবাপদে পৌঁছিয়া দিল।

পবমেশবেব ইচ্ছায় ইহাব অষ্টাহ পবে ছুরাণী সৈনিকেরা একত্ৰ হইয়া বিদ্রোহ করিল এবং গত দুই বৎসবেব বাকী বেতন প্রাপ্তি ও কাবুলে প্রত্যাগমন কবিবাব জন্য অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। কয়েক দিন পর্য্যন্ত এই গোল-মাল মিটিল না। ইতিমধ্যে ছবানীবা নবাব স্ফোর অমুচরবর্গেব সহিত কলহ করিতে লাগিল এবং তাঁহাব শিবির আক্রমণ করিবার ভয় দেখাইতে লাগিল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া উজীরেব নিকট গিয়া বলিলেন, “মহাশয়, আমার নিকট পূৰ্বে বেক্রপ প্রতিক্ষিত হইয়াছিলেন, এই সকল, কি তাহার উচিত ব্যবহাব হইতেছে?” উজীর বলিলেন “মহাশয় আমার এবং শাহেব উভয়েই আপনাব সম্মান ও যত্নেব প্রতি লক্ষ্য আছে, কিন্তু কি কবিব, ছুরাণী সেনা অহম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।” নবাব বলিলেন, “বুঝলাম, আপনাদের প্রতিক্ষিত্তর মূল্য কত?” এই বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, উজীর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “আবার যেন সাক্ষাৎ হয়।” নবাব কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া নবাব বজুবর্গেব সহিত পরামর্শ করিলেন, সকলেই বলিল যে ছুরাণী শাহের সহিত থাকা আর নিরাপদ নহে। সেই দিন অপরাহ্নেই শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজবিবোগে ১৫ জোণ পথ অতি ক্রম করিয়া আসিলাম, এবং ৫ দিন অবিশ্রান্ত কুচেব পব গঙ্গাতীরবর্তী মিন্দি

বাই নামক স্থানে পৌঁছলাম। নবাবের সন্মুখ হইরাছিল, যে হঠাৎ পলায়ন করায় দুরাণী শাহ তাঁহাকে অনুসরণ জন্য সেনা প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কেহই আসিল না। নবাব গঙ্গা পার হইয়া স্বরাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

পরে সংবাদ লেখকদিগের পত্রে জানা গেল, যে দুরাণী শাহ কোন প্রকারে সৈনিকগণকে দমন করিতে না পারিয়া, পবিশেষে ভারত রাজ্য ভোগের আকাঙ্ক্ষা পবিত্যাগ পূর্বক কাবুলে প্রত্যগমন করিতে বাধ্য হইলেন। বাইবার পূর্বে নজীবুদ্দৌলার নিকট হইতে নিজ সহায়্য দানের মূল্য স্বরূপ ৪০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উক্ত ইতিহাসে সদাশিবের মৃত্যু স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইলেও ঐ মৃত্যু লইয়া কয়েক বৎসর পরে বড়ই গোলযোগ হইয়াছিল। ১৭৭৯ খালে এক-ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া আপনাকে সদাশিব বলিয়া পরিচয় দিল। ইটাবা নগরে বালগোবিন্দ নামক একজন ধনী মহাজনের সহিত সদাশিবের বন্ধুতা ছিল, তাহারই বাটীতে ঐ ব্যক্তি প্রথম উপস্থিত হয়। আকার বয়সাদিতে ঐ ব্যক্তি ঠিক, প্রকৃতি সদাশিবের ন্যায় ছিল, এবং বালগোবিন্দ তাহাকে সদাশিব বোধে বহু ও সম্মান করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি আপন ইতিহাস এই প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছিল, “পানিপতের যুদ্ধে আহত হইয়া আমি প্রাণে প্রাণে কুমায়ুন পর্বতে পলায়ন করিলাম, সেখানে ৫ বৎসর কাল এক সম্ভ্র-দায় ককিণের সহিত থাকিয়া তাহাদের ব্যবহার ও আশ্রয়সংযমাদি আচরণ করিয়া কাটাইলাম। তৎপরে বৈরাগীবশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিলাম, এক্ষণে আশ্রয় পবিচয় জন্য ভোমার নিকট আসিয়াছি।” ঐ ব্যক্তি পরে ছত্র-কোট হইতে বারাণসীতে বামচন্দ্র গোটকর, গণেশ ভট্ট প্রভৃতি ভাওরের পুরাতন পরিচিত মহারাষ্ট্র অচ্যুতগণকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র লিখিল। তাহার ছত্রকোটে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া কয়েক দিন পরামর্শ করিল, কিন্তু যখন ঐ ব্যক্তি বলিল, যে আমি যুদ্ধের পূর্বে রামচন্দ্রের নিকট কয়েক লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছি, তদবধি উহারা সকলেই উহাকে পবিত্যাগ করিয়া বারাণসী প্রত্যগমন করিল এবং প্রচার করিয়া দিল যে ঐ ব্যক্তি জাল সদা-শিব মাত্র। জালভাও বারাণসী আসিল; অনেক মহারাষ্ট্রীয় তাহাকে সভ্য সদাশিব জানে অর্থাৎ কুল্য করিতে লাগিল। ক্রমে ঐ ব্যক্তি প্রায় ৪০০

শত অনুচর সংগ্রহ করিয়া রামচন্দ্র গোটকব প্রকৃতির নিকট দাবী স্বাধীনতার জন্য বলপ্রয়োগের উদ্যোগ করিল। ঐ সময়ে গ্রেহাম সাহেব কোম্পানির পক্ষে বানারসেব বেসিডেন্ট। তৎকালিক কাশী নরপতি মহারাজ চৈতন্যসিংহের ইংরাজের সহিত সন্তাব ছিল না, মহারাজদ্রৌপদসিংহের সহিত তখন ইংরাজের যুদ্ধ চলিতেছিল। গ্রেহাম সাহেব সংবাদ পাইলেন যে চৈতন্যসিংহ জাল সদাশিবকে গোপনে আশ্রয় করিতেছেন। তাঁহার মনে আবণ্ড উদ্ভূত হইল, (কেন হইল কে বলিবে?) যে জাল সদাশিবের দ্বারা অধিবাসী গণ মধ্যে একটা গোলযোগ উত্থাপন করিয়া, সেই সুবিধায় সাহেবের প্রাণবধ করা চৈতন্যসিংহের ইচ্ছা। গ্রেহাম সাহেব চৈতন্যসিংহের নিকট কৈফিয়ত তলব করিলেন। চৈতন্যসিংহ সকল বথা অস্বীকার করিলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য উহাকে তৎসমীপে পাঠাইতে লিখিলেন। কিন্তু জাল সদাশিব গ্রেহামের আদেশ গ্রাহ্য করিল না। গ্রেহাম সাহেব চৈতন্যসিংহের অনুজ্ঞা লইয়া বাবাগসীবে কোতোয়াল এবং কতকগুলি সিপাহী সমভিব্যাহারে জাল সদাশিবের আবাস গৃহ বেঠন করিয়া তাহাকে বন্দী করিলেন। উহার জবানবন্দী লইয়া সাহেবের চৈতন্যসিংহের গুপ্ত শত্রুতাব প্রাপ্তি সন্দেহ বন্ধমূল হইল, হইবাবই বথা।

বাবাগসীব আমিন কাছারি জেলে কিয়দ্দিবস আবদ্ধ রাখিয়া কলিকাতার বোর্ডের আদেশ মত জাল সদাশিব চূনাব দুর্গে প্রেরিত হইল। গ্রেহাম সাহেব অনেকবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার পরিচয়ের সত্যতা বিষয়ে তদন্ত করিয়াছিলেন, ক্রমে ঐ ব্যক্তিকে প্রকৃত সদাশিব বলিয়া গ্রেহামের বিশ্বাস হইল। কিন্তু অল্পবয়স মধ্যে গ্রেহাম সাহেব মাস্তাজে বদলী হওয়ায় ঐ কথাব আর উচ্চ বাচ্য বাহুল্য না, জাল সদাশিব জেলে পড়িতে লাগিল। ১৭৮১ সালের আগষ্ট মাসে গবর্নর জেনরল হেষ্টিংস সাহেব, চৈতন্যসিংহের সহিত বিবাদের সময় চূনার দুর্গে বয়েক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তিনি জাল সদাশিবকে ডাকাইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করার পর তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। দুর্ভাগ্য বাবাগসীবে প্রত্যাগমন করিল, কিন্তু অধিক দিন জীবিত ছিল না। প্রবন্ধ লেখক কাশিাবাজা পণ্ডিতও বারাণসীতে জাল সদাশিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছেন যে অবকোত্ত শাবীরিক চিহ্ন সকল এ ব্যক্তির শরীরে সমস্তই বিদ্যমান ছিল, তবে প্রকৃত সদাশিবের ন্যায় দৃঢ়তা ও আচরণ ছিল না। যাৎ

চটক ঐ ব্যক্তি প্রকৃত সনাতন কি না, এই সম্বন্ধে চিরকাল বহিষা
গিন্নাছে।

আধ্যাত্মিক-অর্থ ।

আজ কাল ধর্ম্মান্দোলন সংক্রামক বোগে পরিণত হইয়াছে। হাটে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে—সর্বত্রই ধর্ম্মের কথা। জ্ঞানবয়োবৃদ্ধ ঋষিগণ সমৃদ্ধ সভা
কবিয়া যে সকল তত্ত্বের মীমাংসা কবিয়াছেন, আজ অজাত-অশ্রু অপরিণত-
বুদ্ধি বালক সেই কূটতর্কে সময় অতিবাহিত করিতেছে! কি বিড়ম্বনা!
বি দুর্দ্দেব!! অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কালিদাসের প্রশংসার সহিত সেকপীবের
কুংসা করা যেমন উপহাসের বিষয়, সেইরূপ জ্ঞান-বালকের ধর্ম্ম মীমাংসা
উপহাসের বিষয়। হাসিবার যো নাই; সকলেই ধর্ম্মান্দোলী—ঠক বাঁছতে
গাঁ ওজোড়। শুক পক্ষীর “বাধাক্লম্ব” বুলির ভ্রায় অনববত ধর্ম্মবুলি বহি-
র্গত হইতেছে। বালিতপ্ত স্থালী হইতে যেন ধর্ম্ম থৈ ফুটিতেছে। কেহ
কেহ এই আন্দোলনরূপ অকণ্ঠে উদয় দেখিয়া ভবিষ্যতে স্মৃৎস্মরণের উদয়
আশা কবিতেছেন। কেহ বা পশ্চাত্তিত প্রবল মেঘ দেখিয়া আতঙ্কে অশ্রু-
বারি বিসর্জন করিতেছেন।

লোকেব স্বভাব—হজুগেব শ্রোতে গা ঢালিয়া দেয়। ভবিষ্যতে সে
শ্রোত স্মৃৎস্মরণে সাগরে মিশ্রিত হইবে, কি হুংথেব সাগরে পরিণত হইবে,
তাহা অহুংধাবন কবে না। অনেক সময়ে অহুংধাবনেও কর্তব্য স্থির করা
কঠিন হয়।

আমার বিবেচনায় আন্দোলনেও উপকার হইতে পারে। সংকল্পের
নকলও ভাল। নকল করিতে করিতে নকল আসলে উপস্থিত হইতে পারে।
কদাচিত্ কচিৎ আন্দোলনের ফল ফলিবেই ফলিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।
তবে যে আকারে আন্দোলন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, ইহাতে তাদৃশ
ফললাভ ঘটিবে বোধ হয় না।

প্রচলিত আন্দোলন ক্রিয়াগত নয়, কেবল অধ্যাত্ম কথার পূর্ণ। আজ
কাল বশিষ্ঠকে বশিষ্ঠ ঋষি এবং বিশ্বামিত্রকে বিশ্বামিত্র ঋষি ইত্যাদি ভাবিতে
যেন লজ্জা হয়, কেননা ইহাদিগকে ঋষি বলিয়া, তাঁহাদের কৃত অলোকসাধা-
রণ কার্য্য পরম্পরা,—স্বীকার করিলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপহাসান্দিত হইতে

হয়; অথচ হিন্দুধর্ম পুরুষপুরুষের আদরের ধন, অস্বিমাত্রাবশিষ্ট, হর্যার পাত্র; সুতরাং ধর্মটিকে মাজিয়া খসিয়া অক্ষতের জলে পরিষ্কার করিয়া লইতে ইচ্ছা করেন, তাই “বশিষ্ঠ” বলিতে ইচ্ছিবশীকরণশক্তি এবং “বিখ্যামিত্র” বলিতে বিষেব মিত্র ধর্মজ্ঞান ইত্যাদি প্রকার (১) স্বকপোলকল্পিত অর্থে নিজে বুঝিবার চেষ্টা করেন এবং অন্তের চক্ষুতে এইরূপ ধূলিক্লেপ করিতে প্রয়াস পান। এই বিশ্ব বিভ্রমনার হিন্দুধর্ম আরও বিভ্রান্ত হইয়া সাধারণের দৃষ্টির জিনিষ হইয়া পড়িতেছে, কেন না সকল কথায়ই এইরূপ একটি না একটি আধ্যাত্মিক অর্থ কল্পনা করা যাইতে পারে। অথচ কল্পিত, এত আশ্রয়সেই, অর্থ—নিরর্থক মাত্র। মনে করুন বেহ বালক, “কালিদাস কুমারসম্ভব করিয়াছেন” আধ্যাত্মিক অর্থদর্শী ভাবিতে পারেন—কলয়তীতি কালী—প্রকৃতি। তাঁহার দাস অর্থাৎ ভদ্রধীন চৈতন্য। ‘কু’শব্দে পৃথিবী, তাহাতে মরে যে অর্থাৎ মরুধ্য। ইহার তাৎপর্য প্রকৃত্যাপ্রিত চৈতন্য কিত্যাদির সৃষ্টিতে, কুমার (মরুধ্য) সৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অতি সহজ এবং অতি অকিঞ্চৎকর। প্রস্তাব বাহ্যিক ভয়ে সেকপীরের পুস্তকের আধ্যাত্মিক অর্থ প্রদর্শিত হইল না। পাঠক! ইচ্ছা করিলে কল্পনা করিয়া লইতে পারেন। এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দুশাস্ত্রে বীতল্প হইতেছেন।

কল কথা, আশ্রয় আধ্যাত্মিক অর্থের বিরোধী নই। যে আধ্যাত্মিক অর্থ ঋষিগণের বা বক্তার (?) অভিপ্রেত, তাহা নত শিরে স্বীকার করি। যে আধ্যাত্মিক অর্থ বটতলাব উপজীবিকা বা সংবাদপত্রের পত্রপূরক, তাহার পক্ষপাতী নই, বরং বিরোধী।

লোকে আধ্যাত্ম্য অর্থের এত পক্ষপাতী হইয়াছে যে, বাহ্যার্থে এক প্রকার অন্ধ হইয়াছে। একদা একটি বিষয়ী লোক বলিল “রাবণ সীতাকে হরণ করেন।” এই কথা শুনিয়া জনৈক অধ্যাত্মদর্শী বলিলেন “বল দেখি রাবণ কে?” আমার বন্ধু বলিলেন “লঙ্কার রাজা।” তিনি বলিলেন “ওতো বাহ্যার্থ। দশানন—দশ ইচ্ছিয়। সীতা প্রকৃতি। রাবণ অর্থাৎ বন্ধু তাঁহার কথার বাধা দিয়া বলিলেন, “তোমার আর আধ্যাত্মিক অর্থ কল্পিতে হইবে না। ‘রাবণ সীতাকে হরণ করেন’ এই বাহ্যার্থেই সমস্ত অর্থ পার্শ্বকূট। সেই সঙ্গে তোমারও বিদ্যা বুদ্ধি পার্শ্বকূট।”

(১) বশা অধিক, বশিষ্ঠ, ও বিখ্যামিত্র প্রদর্শন শাস্ত্র।

• গায়ত্রী সঙ্খ্যাবন্দনা প্রভৃতির আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। তাহার বাহ্যিক অর্থ বহির্জগতের আরাধনা, আর আন্তরিক অর্থে অন্তর্জগতের আরাধনা। এই বিধাবিত্তক উপাসনাপ্রণালী উপাসকভেদে সৃষ্ট হইয়াছে। বাহ্যাদের চিত্ত বহির্জগতেব কার্য্যপ্রপঞ্চে আকৃষ্ট, তাহারা বাহ্যার্থে মুগ্ধ হইয়া উপাসনা করিবে। এইরূপ উপাসনা করিতে করিতে চিত্তের নির্মলতা সাধিত হইবে; সেই সূত্রে সূত্রে অন্তর্জগতে প্রবেশের অধিকার হইবে। • বাহ্যাবা অন্তর্জগতে সর্লদা বিচরণ কবে, তাহারা অন্তবেব অর্ণের অমূলকান করে। বাহ্যবিষয়ে চিত্ত আকৃষ্ট থাকিলে আধ্যাত্মিক অর্থ ধাবণা করিতে পাবে না। যে অন্তর্জগতের পদার্থনিচয় চেনে না, সে কেমন কবিয়া সেই পদার্থ-বাচিত্ত অর্থ স্তদয়কম কবিবে? কয়জন ব্যক্তি গায়ত্রীব অর্থ বুঝিতে পাবে—কয়জন বা গায়ত্রীর “ধী” ধাবণা কাবতে পাবে? এই হেতু বলিয়াছেন,—

“ইদং গুহ্যতমং লোকে ন দেয়ং যসাকসাচিং ।

জ্যেষ্ঠপুত্রায় শিষ্যায় ভক্তিসুত্রায় বা পুনঃ ॥ ইত্যাদি”

অনেকে বলিতে পাবেন, এইরূপ ভিতব বাহিরেব দুইটি অর্থ কখন ঋষি-গণেব অভিপ্রেত হইতে পাবে না। ঋষিবাবী ভিন্ন কোন বক্তা দ্বার্থ শব্দ ব্যবহাব করেন না। প্রভূত ভ্রম প্রমাদ, প্রবঞ্চনা রহিত বেদ এইরূপ দ্বিভাবে গঠিত হইয়া লোককে বঞ্চনা করিতেছে, ইহা কখন মূক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। —এই তর্ক-বায়ুতে ঘূর্ণিত হইয়া অনেকে ভ্রমসাগরে পতিত হন। বাস্তবিক বেদেব দ্বার্থ বোধকতা উদ্দেশ্য নয়। কেবল আধ্যাত্মিক অর্থবোধক শব্দ নাই, হইতেও পারে না। বাহ্যার্থ প্রকাশক শব্দ সাহায্যে আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহ হয় মাত্র। এই হেতু ক্রটিতে আছে—

“যতো বাচো নিবর্তন্তেহপ্রাপ্যমনসা সহ।”

বাক্যে আধ্যাত্মিক অর্থ বলিয়া উঠিতে পারে না কেবল সহায়তা মাত্র কবে। অথচ বাক্যাত্মেরই একটি না একটি অর্থ আছে; সে অর্থ আবার নৌকিকভাবে পূর্ণ। কাজেই বেদাদি দ্বার্থ হইয়া পড়িয়াছে। সেই দ্বার্থ ভাবে পরিণত বেদও আমাদের পরম উপকারী। যেমন মূক্তিকারূপে পরিণত ঈশ্বর আমাদের পরমার্থের অনুকূল। তাহার (মূক্তিকার) বাহিরে মূক্তিকা বা জড়তাব, অন্তরে ঈশ্বর বা চৈতন্যতাব। দ্বিভাবেই সত্য; অথচ উপাসনার স্মৃতিকর্তার উদ্দেশ্যই আধ্যাত্মিক ঈশ্বরতাব। মূক্তিকাময়ী প্রেতিয়া অবলম্বন ব্যতীত ঈশ্বরোপ সনার প্রতিষ্ঠা হয় না, তাই সাধক মূক্তি

কান্ধ চৈতন্যে প্রমে মুক্ত হইয়া আপনাব অস্তিত্ব পর্যাস্ত তাহাতে মিশাইতেছে। সেইরূপ বাহ্যার্থ অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক অর্থ বিবাজ করে। বাহ্যার্থ ব্যক্তিবকে আধ্যাত্মিক অর্থেব প্রতিষ্ঠা হয় না, অথচ প্রতিমার ন্যায় বাহ্যার্থ নিরর্থক মাত্র।

সাধাবণ জনগণ আধ্যাত্মিক অর্থোপদেশেব পাত্র নয়। অসম্পূর্ণোপাসনা-বহুতর আধ্যাত্মিক ভাব হৃদয়ে দাবণ হয় না। অবহায্যায়ী ব্যবস্থা কবিলে ফল হইতে পাবে। চৈতন্যদেবেব সম্পূর্ণ ধর্মের উপদেশ অসম্পূর্ণাবস্থা-বাক্তিও গ্রহণ করিতেছে, তাই তাহাব মূল বিপবীত ঘটয়াছে। বাবাজীবী নামমাত্র কোপীনধাবী হইয়া দাবে দাবে “হর বোল” বলে মুষ্টি ভিক্ষা কবিতোছে, আব অধর্মের অবতাব হইয়া ধর্মের দোহাই দিয়া সমস্ত অবার্থ্য অল্পতান কবিতোছে, কিন্তু আমাদেব শাস্ত্র উপদেশ দানে সবিশেষ সতর্ক, তাই আজিও হিন্দুধর্ম অস্থিমাত্র সব হইয়াও সজীব বহিয়াছে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ।

(ধর্মের দেবাদেবী ।)

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কেষ্ঠী বন্দা, বেবাবেও কৃষ্ণমোহন এবং রেববেও কে এম বাণজী। এই চতুর্বিধ নামধাবী ব্যক্তি বঙ্গদেশের যে এক জন অতি চিত্তিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা আব আমার এক্ষণে বলিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না। খ্যাত্যাপন্ন পাঁচালী বচযিতা এক চক্ষু অন্ধ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস; তাঁহাব অন্যতব নাম লখে বাণা ছিল। তিনি বলিতেন যে “যিনি আমাকে লক্ষ্মীকান্ত বলেন, তিনিই আমাকে বিশ্বাস বলেন, কিন্তু যে ব্যাটা আমাকে লকে বলে সে ব্যাটাই আমাকে কাণা বলে।” সেইরূপ চারি প্রকাব লোকে কৃষ্ণমোহনকে চাবি প্রকাব নামে অভিহিত করিত। তাঁহাব পিতা নাম রাধিয়াছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খ্রীষ্টান হওয়ার পূর্বে তাঁহাব সেই নামই ছিল, কিন্তু যখন তিনি খ্রীষ্টান হইয়া হিন্দু-দিগকে বিরক্ত কবিয়া তুলিলেন, তখন তাহার তাঁহাকে কেষ্ঠী বন্দা বলিয়া ডাকিত। পক্ষান্তবে সাহেব এবং দেশী খ্রীষ্টান মহলে তিনি রেবাবেও কৃষ্ণমোহন বলিয়া পবিচিত ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বনবোকেশন এবং

সভাসমিতিতে তিনি বেধারেও কে, এম, বানজ্জী বলিয়া সম্মানিত হইতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে একজন ঋণজন্মা পুরুষ ছিলেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার কবিতে হইবে। যেমন বিদ্যাবুদ্ধির জোব তেমনই, আবার বৈষয়িক বুদ্ধিও চমৎকার ছিল। আমি অনেক বিচক্ষণ লোককে বলিতে শুনিয়াছি যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খুঁটান হইয়া যেমন দেশী খুঁটানের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, খুঁটান না হইলেও তিনি যে ব্যবসায় প্রবেশ কবিতেন তাহাতেই তিনি যশস্বী এবং প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে কয়েকজন বড় বড় লোকের জন্ম হইয়াছিল এবং যদিও তাঁহারা সকলে কৃষ্ণমোহনের সমবয়স্ক ছিলেন না, তথাপি তিনি তাহাদের সমসাময়িক ছিলেন। প্রথমতঃ রামমোহন বায়, তখন কৃষ্ণমোহন অবশ্যই বালক ছিলেন। তদনন্তর দ্বাবকানাথ ঠাকুর, বামকমল সেন, মতিলাল শীল, বসময়ী দত্ত; তদনন্তর কাশীপ্রসাদ ঘোষ, তাবাচাঁদ চক্রবর্তী, বসিকরুষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, বমাপ্রসাদ বায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত; তদনন্তর হবিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বাবকানাথ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র জীবিত আছেন, আর সকলেই কৃষ্ণমোহনের অগ্রে লোকান্তরিত হইয়া গিয়াছেন।

কলিকাতাই ছিল কৃষ্ণমোহনের জন্মস্থান। বাহির সিমলা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলিতে তাঁহার বাড়ী ছিল এবং সেইখানে বোধ করি এখনও তাঁহার একজন জাতির বাস আছে। কুলীন বামনের ছেলে কৃষ্ণমোহন অবশ্যই শ্রীমান ছিলেন। বর্ণ আগে ছিল উজ্জল শ্যাম, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া মদ্যমাংস-সেবন, পায়ে সাবানাহুলেপন ও সাহেবী ধরণে কালযাপন করাতে বর্ণটা শেষে গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল। খুঁটান হওয়ার পরে কৃষ্ণমোহন যদিও ধূতি চাদর পরিহিত্যগ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কখনও সাহেবী হ্যাট কোট অবলম্বন করেন নাই; কেবল ইদানীন্তন দুই গালে দুইটা খেত চুলের গালপাটী রাখিয়া এমন অক্ষর মুখখানি বিকৃত করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দী হইতে হইলে যে সকল ভাষায় অভিজ্ঞ হইতে হয়, তৎসমস্তই কৃষ্ণমোহন বিসম্পন্ন কালেজে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তদতিরিক্ত তিনি সংস্কৃতও শিখিয়াছিলেন; কিন্তু গোল ডষ্টুকর, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি ইউরো-

পীর পণ্ডিতগণ যে উদ্দেশ্যে সংস্কৃত চর্চায় উন্নত হইয়াছেন, কৃষ্ণমোহনের ঠিক তাহার বিপরীত উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা হইয়াছিল। তিনি কেবল হিন্দুধর্মের এবং হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের ছিদ্র অচুস্কান করিবার এবং দোষ দেখাইবার নিমিত্ত এই অদ্বিতীয় ভাষাটী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কার্যই সেই উদ্দেশ্যবুধী বলিয়া বোধ হয়।

ইদানীন্তনই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বজাতিবৎসল হইয়াছিলেন। তাহাতেই সভ্যসমিতিতে তাঁহাকে আত্মবান কবিত্তা সভাপতি স্বরূপে বরণ করা হইত এবং তাঁহার মৃত্যুর পবে তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন সংস্থাপনের জন্যও অনেকে ব্যস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু পূর্বে একপ ছিল না। পূর্বে বরং কৃষ্ণমোহন হিন্দু-সমাজের একজন পরম শত্রু বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন। কলিকাতায় অধিক লোকে তাঁহাকে ‘ঘর মন্ডানে কৃষ্ণ’ বলিয়া ডাকিত। বালকদিগকে এক বারের অধিক তাঁহার সংসর্গে দেখিলে তাহাদের বহুবান্ধবেরা সশঙ্কিত হইত। ফলেও কৃষ্ণমোহন অনেক অপবিগত-বয়স্ক এবং স্কুলমারমতি হিন্দু বালকের ধর্ম নষ্ট কবিত্তাছিলেন। তিনি যে কত হিন্দু পিতামাতাকে শোক-সাগরে ডুবাইয়া তাহাদের অকাল মৃত্যুর কাণ্ড হইয়াছিলেন, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? ইহাব উজ্জল দৃষ্টান্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। যদি হিন্দুবালকদিগকে কেবল ধর্মবিষয়ে উপদেশ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকিত না। কারণ, তিনি খৃষ্টীয় ধর্মযাজক এবং সেই নিমিত্ত বেতনভোগী। সেই ধর্ম প্রচার করাই তাঁহার কর্তব্য কার্য ছিল এবং তাহাতে তিনি উৎসাহ দেখাইলে নিন্দার পাত্র না হইয়া বরং তিনি প্রশংসনীয়ই হইতে পারেন। কিন্তু গুরু তাহা নহে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির চক্রান্তটাও বহুল পরিমাণে ছিল। বালকের মন একবার খুঁটান ধর্মের দিকে ধাবমান করিতে পারিলে তাহার বহুবান্ধবেরা পবে আর তাহার মতি ফিরাইতে না পারে তৎপ্রতি কৃষ্ণমোহনের বিলক্ষণ যত্ন ও দৃষ্টি ছিল এবং সেই জন্য কোন বালক একবার তাহার পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলে তাহাকে আর তাহার পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ দেখা কিম্বা কথোপকথন করিতে দিতে আশঙ্ক্য করিতেন। কৃষ্ণমোহন জানিতেন যে বাঙালী বালকেরা তাহাদের পিতামাতার অত্যন্ত বশীকৃত, অতএব যদি বালক তাহার মাতার ক্রন্দন দেখিয়া কিম্বা পিতার বিনয়বাক্য

শুনিয়া ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার শীকার হাতছাড়া হইয়া যাইবে, সেই জন্য বালককে তাহার বন্ধুদ্বয়ের অন্তর করিয়া রাখিয়া যত শীঘ্র সাধা তাহাকে ব্যাপ্টাইজ করা হইত। তবে কেবল লোক দেখান যে দুই একবার তাহাকে দেখা করিতে দেওয়া হইত সে কেবল নাম মাত্র। বালক একবার হস্তগত হইলে ব্যাপ্টাইজ না হওয়া পর্য্যন্ত সে কদাচিৎ বাহিরে যাইতে পারিত না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান হওয়ার অভিপ্রায়ে পিতৃগৃহ হইতে কাহির হইয়া (শুনিয়াছি) প্রথমে কৃষ্ণমোহনের আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণমোহন দেখিলেন যে মধুর পিতা রাজনারায়ণ বাবু একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। তাঁহাব জমিদারীতে অনেক লাঠিয়াল শড়কীওয়ালা আছে, বিশেষ কলিকাতায় সমস্ত ধনাঢ্য হিন্দুদিগেব সহানুভূতি রাজনারায়ণ বাবুর পক্ষে, অধিকন্তু কলিকাতায় পুলিশও তখন পরাক্রান্ত ছিল না, অতএব রাজনারায়ণ বাবু ইচ্ছা করিলে অনায়াসে মধুকে তাঁহার গৃহ হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে সমর্থ হইবেন, এই ভাষণেই যে পর্য্যন্ত ব্যাপ্টাইজ করা না হয় সে পর্য্যন্ত মধুকে কেল্লার মধ্যে কোন স্থানে গোপন করিয়া রাখিবার মন্ত্রণা করিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শ মতে লাট-পাদ্রী কেল্লার কর্তা ব্রিগ্রেডিয়ার পৌণী সাহেবকে অনুরোধ করিয়া কেল্লার মধ্যে ঐ সাহেবেব কুঠিতে মধুর থাকিবার একরূপ এক স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন যে তথায় বাইয়া রাজনারায়ণ বাবু কিম্বা অন্য কোন বাঙ্গালী মধুর প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে কোন মতেই সমর্থ হইবেন না। এই স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কৃষ্ণমোহন যে খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, মধু সেই সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইয়াছিল বলিয়াই লাট-পাদ্রী এবং ব্রিগ্রেডিয়ার পৌণী সাহেব মধুকে একরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, নচেৎ অন্য কোন সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইলে তাঁহারা সেইরূপ সাহায্য করিতেন কি না সন্দেহের বিষয়।

জানেন্স ঠাকুরের খৃষ্টান হওয়া এবং কুচবিহাবের রাজার ব্রাহ্ম হওয়া সমান কথা। উভয় ঘটনাতেই ধর্ম্মযাজকের আত্ম-স্বার্থ-বিশিষ্ট গাঢ় অভিমন্ধি নিহিত ছিল। এই দুই কার্যের জন্য কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় এবং কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম্মের নিকট অব্যাহতি পাইবেন কি না তাহা যিনি ধর্ম্ম তিনিই জানেন, কিন্তু উভয়েরই লোকসমাজে বৃক্কাইবার অনেক কথা ছিল। সন্দেহে বাবু অধিক বয়সে এক্ষণে বখন তাঁহার বুদ্ধি ধুব প্রস্ফুটিত এবং পরিপক্ব হইয়াছিল, তখন খৃষ্টান হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া-

ছিলেন। তন্নিমিত্ত কৃষ্ণমোহনকে বেহ নিন্দা করিতে পারে না। আমি বৃং তাঁহাকে প্রশংসাই করি। কৃষ্ণমোহন উত্তম কর্ম করিয়াছিলেন এবং প্রসন্ন-কুমার ঠাকুরের বংশকে উচিত প্রতিফল দিয়াছিলেন। পীরালী মহাশয়ের কন্যাত্যারণ্য হইলে টাকার প্রলোভন দেখাইয়া কুলীনের ছেলেদের জাতিনাশ করেন, কৃষ্ণমোহন না হয় ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া তাঁহাব অবিবাহিতা কন্যার নিমিত্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে হস্তগত করিয়াছিলেন ; ইহাতে কৃষ্ণমোহনের কিছুমাত্র দোষ নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া বৃদ্ধ এবং ব্যথিত প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে বালক এবং ইতব ব্যক্তিব ন্যায় ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং অবমানিত কবা কৃষ্ণমোহনের উচিত কার্য্য হয় নাই। জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে খুঁটান করিয়া এবং তাঁহাকে কন্যা বিবাহ দিয়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে পবিমাণে উল্লাস এবং উৎসাহ হইয়াছিল, তাহাব অধিক পবিমাণে প্রসন্নকুমারের দুঃখ ও মনঃকোভ হইয়াছিল। অনেকের বিশ্বাস যে জ্ঞানেন্দ্র বাবুর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন কবায় তাহার পিতাব যত আপত্তি ছিল, তাহাব শতগুণ অধিক আপত্তি কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ কবাতে হইয়াছিল। কিন্তু যে কোন কারণে হউক, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, প্রসন্নকুমার বাবু তাঁহার শেষ বয়সে পুত্রের কার্য্যগতিকে মনে বড় শক্ত ব্যথা পাইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার বাবুর হৃদয় বিলক্ষণ সংযত এবং কঠিন ছিল এবং সেই জন্য তাঁহাব কথা-বার্ত্তায় কিছা কার্য্য-কর্ম্ম সহসা কেহ তাঁহার শোক দেখিতে পাইত না ; কিন্তু রাবণের চুল্লিব ন্যায় তাঁহাব অন্তঃকরণের ভিতর পুত্রের বিরহাগ্নি যে সদাসঙ্গ্রহণ প্রজ্জ্বলিত ছিল, তাহা তাঁহাব সহচরেরা সকলেই সহজে অনুভব করিতে পারিত এবং কৃষ্ণমোহনও তাহা না জানিতেন এমন নহে ; বরং তিনি অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা প্রসন্নকুমার বাবুব অনেক গোপনীয় এবং আন্তরিক সংবাদ অবগত ছিলেন।

আমি জানি, এক দিবস প্রসন্নকুমার বাবু বায়ু-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাঁহার বিখ্যাত মুদ্রাবের পীরপাহাড়ী বাড়ীতে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া হাওড়ার রেলওয়ে ষ্টেশনের প্লাটফর্মের উপস্থিত হইয়া দীর্ঘ গতিতে অশ্রম শ্রমীর এক গাড়ীতে যাইয়া উঠিতেছিলেন। সেই দিন কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার স্ত্রী অন্য কোন স্থানে যাইবাব জন্য তাহার পূর্ব্বকণে অন্য এক গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সেই গাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া কৃষ্ণমোহন তাঁহার স্ত্রীকে উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন

“ঐ দেখ আমাদের বিয়াই বাইতেছেন।” এসময়কুমার বাবু এই কথা শুনিবামাত্র ঘাড় হেঁট করিয়া দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণমোহন নাছোড়বন্দা ; কৃষ্ণমোহন তৎক্ষণাৎ তাঁহার গাড়ী হইতে নামিয়া যথাসাধ্য উচ্চ কণ্ঠে “ও বেয়াই ও বেয়াই” বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন “বিয়াই আসুন না কেন আমরা দুই বেয়াই এবং বেয়ানে একত্র হইয়া এক গাড়ীতে যাই।” কৃষ্ণমোহনেব এই ব্যবহার সহ্য ক’রিতে না পাবিয়া এবং পথি মধ্যে কৃষ্ণমোহন কর্তৃক আবও অবমানিত হওয়ার আশঙ্কায় এসময়কুমার বাবু সেই যাত্রায় মৃদ্বের যাওয়া বহিত কবিয়া অধোমুখে এবং ভয়ঙ্কর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এইরূপ কৃষ্ণমোহন ও এসময়কুমার ঠাকুর ঘটিত অনেক উপস্থান আছে, কিন্তু তাহা লিখিয়া আমি আব পাঠকবৃন্দের সময় নষ্ট করিব না। এসকল কথা তাহাদের ভাল লাগিবে না।

যাহাতে হিন্দুর উৎসাহ, তাহাতেই কৃষ্ণমোহনের নিরুৎসাহ এবং যাহাতে তাহাদের উদ্যোগ ও আনন্দ, তাহাতেই তাঁহার নিরানন্দ ছিল। হিন্দুদিগেব সভাসমিতিতে তিনি যোগ দিতেন না এবং হিন্দুদিগের যাহাতে কোন উপকার হয় তাহাব দশহাত অন্তর দিয়া চলিয়া বাইতেন। এই দেখুন না কেন, যে হেয়ার সাহেব হিন্দুসমাজের নিকট দেবতার ন্যায় পূজিত ছিলেন এবং যাহাব রূপায় এবং যাহার স্কুলে বিনা বেতনে কৃষ্ণমোহন ইংবাজী বিদ্যা উপার্জন কবিয়াছিলেন বাঙ্গালীর মধ্যে কেবল কৃষ্ণমোহনই সেই হেয়ার সাহেবের বৈরজ ছিলেন। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পবে কলিকাতায় সকল হিন্দু বৃষ্টিতে ভিজিয়া বাদা ভাঙ্গিয়া তাঁহার শবের সঙ্গে সঙ্গে সমাধি-স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিল, কেবল কৃষ্ণমোহন সেই যাত্রায় যোগ দেন নাই। কৃষ্ণমোহন যদি সেই সমাধি স্থানে উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে শুনিতে পাইতেন যে স্বচ্চর্কের পুরোহিত রেবারেও ডাক্তার চার্লস্ সাহেব বাইবেলের এক শাস্তিপূর্ণ বচন ভিত্তি করিয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় উপস্থিত শ্রোতাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। বাইবেলের সেই বচন এই—“Ye fight not with the dead” অর্থাৎ তোমরা • মৃতব্যক্তির সহিত বিবাদ কবিওনা। অনেকের মনে হইয়াছিল কথা শুনা যেন কৃষ্ণমোহনকে উপলক্ষ করিয়াই বলা হইতেছে। হেয়ার সাহেবের মরণ-টিহু সংস্থাপনের জন্য মেডিকেল কলেজ গৃহে হিন্দুদিগের এক

মহতী সভা হইয়াছিল তাহাতেও কৃষ্ণমোহন উপস্থিত হইবেন নাই। হেয়ার সাহেবের প্রতি কৃষ্ণমোহনের মনোমালিন্যের কারণ আর কিছুই নয়, কেবল খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি হেয়ার সাহেবের অধিক শ্রদ্ধা ছিল না এবং হিন্দুর ছেলেরা যে খ্রীষ্টান হয়, তাহা তিনি ভাল বাসিতেন না।

হিন্দুকালেজের উপরেও কৃষ্ণমোহন বাবুর বিরাগ ছিল, কারণ তাহাতে হিন্দু ডিগ্রি অন্য জাতীয় বালক বিদ্যাভ্যাস কবিত্তে পাইত না এবং বাইবেল কিম্বা খ্রীষ্টীয়ধর্ম সংক্রান্ত কোন পুস্তক পঠিত হওবা অচ্যুত ছিল না। কৃষ্ণমোহনের বিশ্বাস ছিল যে হিন্দু কালেজের কোন রূপ বিঘ্ন করিতে পারিলে অনেক হিন্দু বালককে তিনি খুঁটান করিতে পারিতেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি এক বার একটা স্কুলের কৌশল খেলিয়াছিলেন ; কিন্তু হিন্দুকালেজের সৌভাগ্যে এবং হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে সেই কৌশল সকল হইতে পারিল না। বলিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না যে কৃষ্ণমোহনই প্রথমে দেশী খুঁটানের কুল পবিত্র কবিয়াছিলেন। পূর্বে হিন্দু ভদ্রবংশীয় কিম্বা কুতবিদ্যা লোকে খুঁটান হইত না। পাত্রী সাহেবেরা নীচ জাতীয় লোককে ব্যাপ্‌টাইজ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। ছুর্ভিক্ষের সময় স্কুলের বনের এবং অনেক জেলাব দুর্গম স্থানের দরিদ্র কৃষী প্রজাদিগকে ধান চাউল এবং টাকা দিয়া কিম্বা জমিদার তালুকদারের অত্যাচাব হইতে বক্ষা করাব প্রলোভন দেখাইয়া খুঁটান করা হইত। কলিকাতার মৃজাপুরে সাণ্ডিল সাহেবের গির্জাতে যে সকল বাঙ্গালী খুঁটান বাস করিত তাহাদের অধিকাংশ সাহেবদিগের খানসামা, খিদমতগার, চাপরাশী বা পেয়াদা ছিল। জ্বীলোকেরা মেম সাহেবদিগের আত্মাগিরী কার্য্য করিত। অধিক সম্মানের চাকরী হইলে কাটিকিষ্ট নামক নিরুপদ্রব শ্রেণীর ধর্ম প্রচারকের চাকরী পাইত ; কিন্তু খ্রীষ্টান হইয়া বিসপ্‌ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া রেবারেও উপাধি পাইবার পবে তাঁহার চেঁচায় দেশী খ্রীষ্টান সমাজের উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। পাত্রী সাহেবেরা দেখিলেন যে কালা খ্রীষ্টানদের পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণমোহনকে পদ বৃদ্ধি করা আবশ্যিক এবং তাঁহারা ভাবিলেন যে কৃষ্ণমোহনের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে অনেক ভদ্র বাঙ্গালী যুব ঐ প্রলোভনে পড়িয়া খুঁটান হওয়ার জন্য প্রার্থিত হইবে। কিন্তু তাঁহারা ইহাও দেখিলেন যে সাহেবদিগের গির্জার মধ্যে কালা পাত্রীর স্থান হইবে না। চৌরঙ্গির ব্রজীতলার বড় গির্জা ঘর নির্মিত হইলে পরে, কৃষ্ণমোহনকে

তাহার মধ্যে এক কার্যের ভার দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু সাহেবেরা কাল আদমির পৌরহিত্য স্বীকার করিতে অসম্মত হইলেন কাজেই কয়েক দিন ধরিয়া কৃষ্ণমোহনকে লইয়া পাদ্রীর কর্তৃপক্ষগণের বিজ্ঞাট উপস্থিত হইল । সে বাহা হউক অবশেষে পাদ্রীরা এক মন্তব্য করিয়া সেই দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন । মন্তব্য স্থবীকৃত হইল যে কৃষ্ণমোহনকে সাহেবী কোন গির্জায় নিযুক্ত না করিয়া বাঙ্গালী খৃষ্টানদিগের জন্য কলিকাতায় বাঙ্গালী টোলার মধ্যে এক নূতন গির্জা বানাইয়া তাহার প্রধান পাদ্রী পদে কৃষ্ণমোহনকে নিযুক্ত কবিলেই সর্বাঙ্গের উত্তম কার্য হইবে, কারণ তদ্বারা কৃষ্ণমোহনেরও উচিত পূর্বস্বার হইবে এবং হিন্দুরাও দেখিতে পাইবে যে উপযুক্ত ব্যক্তি খৃষ্টান হইলে পাদ্রীরা তাহাকে উপযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত করিতে ক্রটি কবিবেন না ।

এই গির্জার স্থান নির্ণয়ের সময়ে কৃষ্ণমোহন তাহার বুদ্ধির প্রখরতা দেখাইলেন এবং এক বাণে দুই পক্ষী শীকার করিতে মনস্থ করিলেন । তিনি মিসনরী সাহেবদিগকে পৰামর্শ দিলেন যে হিন্দু কলেজের নিকটবর্তী কোন স্থানে এই গির্জা নির্মাণ করিতে পারিলে কালেজের ছাত্রেরা অন্তত তাহাঙ্গ দেখিবাব জন্য গির্জাতে না আসিয়া ও প্রচাবেব বাক্য না শুনিয়া থাকিতে পারিবে না ; হেয়ার সাহেব কিম্বা কালেজের অধ্যক্ষগণ কতদিন তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বাধিবেন ? নিষেধক হুকুম অবশ্যই ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িবে, কাজে কাজেই অবশেষে কৃষ্ণমোহন তাহার বহুকালের মনস্কামনা সিদ্ধি করিতে পারিবেন । এই মন্তব্য কবিয়া কৃষ্ণমোহন অতি গোপনে হিন্দু-কালেজের পশ্চিমের বারান্ডার পশ্চিম ধাৰে, যেখানে এক্ষণে হেয়ার স্কুল এবং প্রেসিডেন্সি কালেজ হইয়াছে, সেই স্থানটী ক্রয় করিয়া তাহাতে গির্জা নির্মাণের কল্পনা কবিলেন । এই স্থান পূর্বে একটা বৃহৎ বস্তী ছিল, খোলাব ঘর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, আমবা কলেজে আসিয়া এই স্থানের লোহার কর্মকাবদিগের দ্বারা লাটিমের আল বসাইয়া লইতাম । এ দিকে ভিতরে ভিতরে কৃষ্ণমোহন মহা সমাবোধের সহিত প্রস্তাবিত গির্জার ভিত্তি সংস্থাপনের আয়োজন করিলেন, কিন্তু হেয়ার সাহেব এবং হিন্দু কালেজের কোন অধ্যক্ষই ইহার কোন সংবাদ জানিতেন না । অবশেষে ভিত্তি সংস্থাপনের অতি অল্প সময় পূর্বে, এক কি দুই দিবস পূর্বে, কি ঠিক সেই দিবস প্রাতে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল । ভিত্তি গাড়ার

কার্যটা বৈকালেই সাধারণত হইয়া থাকে। আমরা কালেজে আসিবার সময় দেখিলাম যে সেই বস্তীর মধ্যে একটা স্থান পরিকৃত হইতেছে, কয়েক গাড়ী বাশ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আসিয়াছে এবং অনেক কুলী মজুর সেইখানে সমবেত হইয়াছে। আমার উত্তম স্বৰ্ণ আছে যে, কালেজ বসিবার পরে কালেজের অধ্যক্ষদিগের নিকট হইতে হুকুম আসিল যে সেই দিবস নিয়মিত ৫টার সময় ছুটি হইবে না, সন্ধ্যাব পবে ছুটি হইবে এবং কোনও বালক সন্ধ্যার পূর্বে কালেজ গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। এমন কি গ্রাহরীরা সেই দিবস কোন ছাত্রকে কালেজেব হাতার পশ্চিম দিকেব রেলের নিকট যাইতে দেয় নাই। আমরা বালক আমরা বাজনীতি কি বুঝি? স্কুলে আসিবার সময় বস্তীতে আয়োজন দেখিয়া বড়ই আশা করিয়াছিলাম যে ছুটি হইলে পবে আমরা যাইয়া পেট ভরিয়া তামাসা দেখিব, কিন্তু কালেজেব মধ্যে আসিয়া সন্ধ্যাব পূর্বে ছুটি হইবেনা শুনিয়া নিতান্ত ভ্রমোৎসাহ হইলাম, তথাপি আমরা অনেকে মনে কবিলে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু শিক্ষকেরা স্বীয় স্বীয় ক্লাসেব ছাত্রেরা ক্লাস ছাড়িয়া যাইতে না পাবে তৎপ্রতি অত্যন্ত সাবধান হওয়াতে আমরা পলাইতে পারিলাম না, বিশেষ হেরার সাহেবের প্রহাবের ভয়েও আমরা নিবস্ত হইয়া রহিলাম। কিন্তু কৃষ্ণমোহনের এত আয়োজন এবং দর্শকদিগের এত আশা সকলই নিফল হইল। সে দিবস ভিত্তি গাড়া হইল না। শুনিলাম যে হেরার সাহেব, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বাবকানাথ ঠাকুর, রসময় বসু, মতিলাল শীল প্রভৃতি হিন্দুসমাজের প্রধান কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া স্প্রিমকোর্টের প্রধান জজ স্যার এডওয়ার্ড বায়েলের সহকায়ে বড় লাট লর্ড অকল্যান্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার দ্বারা লাট পাদ্রীকে সেই দিবস প্রস্তাবিত গির্জাব ভিত্তি গাড়াব কার্য স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন এবং লাট পাদ্রীও সেই অনুরোধ মতে ভিত্তি সংস্থাপন করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। হিন্দুতে বলে যে “এক দম হাজার উমেদ” এই গির্জা সঙ্কল্পে ঠিক তাহাই ঘটিল। নির্দ্ধারিত দিবসে ভিত্তি সংস্থাপিত না হওয়াতে হেরার সাহেব ও হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া পাদ্রীদিগের সেই কার্য বহিত করিতে রুতকার্য হইলেন এবং অবশেষে অধ্যক্ষগণ পাদ্রী সাহেবদিগের নিকট সেই ভূমিখণ্ড উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া তাহার উপরে এক বাঙ্গালী পাঠশালা

সংস্থাপন করিলেন। পাদ্রী সাহেবেরা হেঁচরা গুরুত্বের নৈরুত কোণে ভূমি সংগ্রহ করিলেন এবং তাহার উপরে ক্রাইস্টচার্চ নামে স্থানর এক শির্কা নির্মাণ করিয়া কৃষ্ণমোহনকে সেই শির্কার প্রধান পাদ্রী পদে বরণ করিলেন। এই রূপে উভয় কুল বজায় রহিল।

হিন্দুকালেজের প্রতি বিরূপ কেবল এক কৃষ্ণমোহনের ছিল এমন নহে, খৃষ্টান ধর্মবাহক-মণ্ডলীর মধ্যে এই ব্যাধিটি বেন সংক্রামক ছিল। হিন্দুকালেজের শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি কোর ঘোষারোপ কিবা দেখানকার ছাত্র-বিগকে অপদস্থ কিবা অবমানিত করিতে পারিলে পাদ্রীসাহেবেরা চেষ্টার ক্রটি করিভেন না, এই বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত আমি এই স্থানে বিবৃত করিব। আমাদের সময়ে হিন্দুকালেজে যেমন সাহিত্যের অধ্যাপক বিখ্যাত রিচার্ডসন্ সাহেব ছিলেন, গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক তেমনি বিখ্যাত রীজ সাহেব ছিলেন। ইদানীন্তনও রীজ সাহেব নামে আর একজন অল্পশাস্ত্রে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তিনি আমাদের রীজ সাহেব নহেন। আমাদের রীজ সাহেব যদিও রিচার্ডসন্ সাহেব প্রকৃতির ন্যায় খ্যাতাপন্ন ছিলেন না তথাপি তিনি গণিত বিদ্যায় একজন ধর্ম্মের ব্যক্তি ছিলেন। রীজ সাহেব ইংরাজ ছিলেন না, তিনি সুইজারল্যান্ড দেশের অধিবাসী এবং কেহ কেহ বলেন যে তিনি নেপোলিয়ান বোমাপার্টের সৈন্যের মধ্যে একজন সেনা ছিলেন। সে বাহা হউক ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অতি অল্প অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি প্রথমে প্রথমে Stop the motion of a ball বলিতে যাইয়া Stop the go of a ball বলিতেন। পক্ষান্তরে রোপে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অকর্ণণ্য হইয়া গিয়াছিল, বাম হস্তে লিখিতেন। তিনি ছাত্রদিগের সহিত বজুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন এবং যে প্রকারে তাহাদের উন্নতি করিতে পারিতেন তদ্বিষয়ে চেষ্টার ও যত্নের ক্রটি করিতেন না। রীজ সাহেব এক বার (বোধ হয় ১৮৪৭ কিবা ১৮৪৮ সালে হইবে) প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে গণিত-জ্যোতিষে সূর্য্যগ্রহণ গণনার উপদেশ দিয়া করেক জন ছাত্রকে আন্ত-গন্তব্যীয় এক সূর্য্যগ্রহণ গণনা করিতে আদেশ করেন, তাহাতে ছাত্র ইতরচক্স মিথের গণনাই উৎকৃষ্ট এবং বিস্তৃত হয়। এই ইতর বারু পরে বহুকাল ধরিয়া ভেগুদী-অফিসিটেট ছিলেন এবং এই রূপে সেনসন পাইভেছেন। ইতরের গণনার রীজ সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এবং অসংখ্য ছাত্রের উৎসাহের নিবিন্ত সেই গণনা

স্ক্রেনাল হরকরা কাগজে ছাপাইয়া দিয়াছিলেন । এখন যেমন ইংলিসমান কাগজ, তখন তেমনি দৈনিক কাগজের মধ্যে বেঙ্গল হরকরা এবং সাপ্তাহিক কাগজের মধ্যে কেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্বাদ পত্রই প্রধান ছিল । এই স্থানে বলা আবশ্যক যে ইংরাজী গণিত বিদ্যার মধ্যে সূর্য্যগ্রহণ গণনা অতি কঠিন কার্য্য এবং অঙ্ক শাস্ত্রে প্রচুর বিদ্যা না হইলে কেহ তাহা গণনা করিতে সক্ষম হয় না । অতএব ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের সূর্য্যগ্রহণ গণনা হরকরা কাগজে প্রচারিত হওয়াতে প্রমোদীকৃত হইল যে হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগের অঙ্ক-শাস্ত্রে চরম উন্নতি হইয়াছে । কিন্তু হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের গৌরব পাত্রী সাহেবদিগের কিরূপে সহ্য হইবে ? ঈশ্বরের গণনার ভুল না দেখাইতে পারিলে তাঁহাদের মনে শান্তি হইতে পারিল না, অতএব ঈশ্বরের পত্র হরকরা কাগজে প্রচারিত হওয়ায় ৭।৮ দিবসের মধ্যে জেনারেল এসেঙ্কলী স্কুলের রেবরেণ্ড স্মিথ নামক এক জন অধ্যাপক এই গণনার প্রতিবাদ করিয়া নিজের এক গণনা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, ঈশ্বর যে সময়ে গ্রহণ হইবে এবং ছাড়িবে বলিয়া গণনা করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক ; তাঁহার নিজের গণনাই বিস্তৃত, ঈশ্বরের গণনা কোন কার্য্যকারক নহে ; কেবল লোক দেখান গণনা মাত্র । ইহার উত্তরে রীজ সাহেব তাঁহার নিজ নামে এক পত্র লিখেন যে তাঁহার ছাত্রের গণনাই ঠিক এবং তিনি তাঁহার জন্য এক হাজার টাকা বাজী রাখিতে প্রস্তুত আছেন । যদি রেব-রেণ্ড স্মিথ সাহেব সত্যত হয়েন তবে উভয়ে এক জন মধ্যস্থ নির্দোষ কবিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যেকে এক সহস্র টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারেন, এবং যেহেতু গ্রহণের দিন অতি নিকট আসিয়াছে অতএব সেই দিবস উভয়ে মধ্যস্থকে লইয়া সর্ব্বোত্তম জেনারেল আফিসের অবজারবেটরি ঘরে যাইয়া সেই স্থানের দূরবীক্ষণ প্রভৃতি উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি-বেন, যে কাহার গণনা বিস্তৃত এবং কাহার গণনা বিস্তৃত বলিয়া স্থির হইবে তিনি তাঁহার বিপক্ষের গচ্ছিত টাকা পাইবেন । সাহেবদিগের সকল বিষয়েই ধনোপার্জনের প্রতি দৃষ্টি থাকে । রেবরেণ্ড স্মিথ সাহেব প্রথমে ঘোষণা করিয়া বিবেচনা করিতে পারেন নাই যে ব্যাপার এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে । হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে একে তিনি সাহেব, তাহাতে আবার এক জন ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত রেবরেণ্ড পাত্রী, অধিকন্তু জেন-রেল এসেঙ্কলী স্কুলের ন্যায় বড় স্কুলের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক অতএব

তাহার নাম দেখিলে সকলেই বাঙ্গালী বালক ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের গণনা উপেক্ষা করিয়া তাহার গণনাই বিশ্বাস করিবে। বাহা হউক রীজ সাহেবের পত্র প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি লোক-লজ্জার খাতিরে কিবা অন্য যে কোন কারণে হউক, রীজ সাহেবের বাজী গ্রহণ ও এক জন মধ্যস্থ নির্মাচন করিয়া তাহার নিকট এক সহস্র টাকা গচ্ছিত করিতে বাধ্য হইলেন। সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু তৎকালে শুনিয়াছিলাম যে কয়েক জন পাত্রী একত্রে চাঁদা করিয়া এক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া মধ্যস্থের নিকট গচ্ছিত করিয়াছিলেন, মচেন্দ্র সিংহ সাহেবের ন্যায় গরিব পাত্রীর একলা এক সহস্র টাকা দেওয়ার সঙ্গতি ছিল না। পরে গ্রহণের দিবসে উভয় পক্ষে অবজরবেটরি ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং যথা সময়ে সূর্য্যোদয়েই আকাশে বলিয়া সাক্ষ্য দিলেন যে ঈশ্বর মিত্রের গণনা বিগুহ। রীজ সাহেব জয়ী হইলেন, হিন্দু কলেজের মান বজায় রহিল এবং শত্রুর মুখে কালি পড়িল। রীজ সাহেব সেই সহস্র টাকা লইয়া তাহার তিন শত টাকা দিয়া ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রকে এক সোনার ঘড়ি উপহার দিলেন এবং অবশিষ্ট টাকায় পূজার অবকাশে পালকীর ডাকে কাশীর মাগ-মন্দির দেখিয়া আসিলেন।

কৃষ্ণমোহনেন্দ্র খ্রীষ্টান হওয়ার পূর্বে তিনি গোহাড় প্রভৃতি হিন্দুর অস্পর্শীয় দ্রব্য সকল তাহার প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বিরক্ত করিতেন, পরে যখন তিনি ক্রমভাষ্যদ্বারা ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন তখন ত একে মনসা তাহাতে আবার ধুনীর গন্ধ। তাহার লেখার চোটে হিন্দু সমাজকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন। সংবাদ পত্রে লিখিয়া, পুস্তক ছাপাইয়া, তিনি হিন্দুদিগের শাস্ত্রের ও আচার ব্যবহারের নিন্দা করিতে কল্পন করেন নাই। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রতিদ্বন্দী গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের বেক্রম স্বভাব চিত্র করিয়াছেন তাহা কৃষ্ণমোহন সঙ্কটেও খাটে। ঈশ্বরগুপ্ত লিখিয়াছেন যে গৌরিশঙ্করের—

“লেখনীর গর্বে গালাগালী পর্বে পুরবাসী সর্বে সিকণ্ডে।”

কয়েক বৎসর ধরিয়া কৃষ্ণমোহনের বিদ্যার কলও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। এমন যে ঋষি তুল্যা নিরীহ রাজা রাধাকান্ত দেব বাঁহাকে কি সাহেব কি হিন্দু কি মুসলমান সর্বজননে সমান সম্মান করিত, তাহাকেও কৃষ্ণমোহন বিজ্ঞপ এবং অপমান করিতে ছাড়েন নাই। কৃষ্ণমোহন হিন্দু-

সমাজকে ঠাট্টা করিয়া ইংরাজীতে এক নাটক লিখিয়া ছাপাইয়া হিতেন তহাতে তিনি রাজা রাধাকান্ত দেবকে রাজা গাধাকান্ত নাম দিয়া তাঁহাকে অভিনয়ের রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য হিন্দুকে ও তিনি সেই পুস্তকে সেইরূপ বিজ্ঞপ করিয়াছিলেন। এই পুস্তক বাহির হইলে অহিন্দু-মহলে আনন্দ উঠিল,—আনন্দ হইবারই কথা।

কলিকাতার তখন হিন্দুসমাজের পক্ষে ভাল কথা কহে, এমন অধিক লোক ছিল না; বিশেষ কৃষ্ণমোহনের ন্যায় বিদ্বান ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি করিতে সকলে সাহস করিত না, তথাপি বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের হিন্দু ইনটেলিজেন্সের ছাপাখানা হইতে একব্যক্তি কৃষ্ণমোহনের উত্তরে ‘সঞ্জয় রিডিবাইবল্’ নামে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির কবিয়া তাহাতে কৃষ্ণমোহনকে ‘ধিনিষ্ঠা’ তিনি তা’ ও খৃষ্টান বিপ্রদাসকে *Beef-fed-ass* কৃষ্ণমোহনের ভ্রাতা কালীমোহন বন্দোপাধ্যায়কে ‘হাড় কালী’ ও একজন খৃষ্টান মহিলাকে ‘ইল্লাইজা ভূতোর মা’ বলিয়া বিজ্ঞপ করিয়াছিল। যদিও এই পুস্তকের ইংরাজী রচনা কৃষ্ণমোহনের পুস্তকেব ন্যায় উৎকৃষ্ট মছে, তথাপি ইহা যে কৃষ্ণমোহনের নাটকেব মুখের মতন গরম গরম তীব্র উত্তর হইয়াছিল, তাহা হয়করা ও কেও অব ইণ্ডিয়া কাগজেব সম্পাদকেবাও স্বীকাব করিয়াছিলেন। কেবল কৃষ্ণমোহনই যে এরূপ কার্ষ্যে ত্রুতী ছিলেন এমন নহে, পাত্রী মণ্ডলীর মধ্যে যে বধন অবকাশ পাইতেন, বাণ নিক্ষেপ করিতে ছাড়িতেন না। এত বড় যে ডফ সাহেব তিনিও একবার (বোধ হয় ১৮৩২ সালের অগষ্ট কিম্বা সেপ্টেম্বর মাসে হইবে) বেঙ্গল হবকবা পত্রে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি হিন্দু বালকদিগকে খ্রীষ্টান করেন বলিয়া বাঙ্গালীয়া তাহাকে খুন করিতে মন্ত্রণা করিয়াছে। এই গুরুতর কিন্তু অমূলক অভিযোগের উত্তরে একজন হিন্দু কালেজেব ছাত্র ‘Mac Bamboo’ নাম ব্যক্তরে এমন এক তেজস্বী পত্র সেই কাগজে প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাহার পরে ডফসাহেব কিম্বা অন্য কোন পাত্রী বাঙ্গালীদের প্রতি এরূপ ঘোষণা-রোপ করিতে আর সাহস পাইলেন না।

কৃষ্ণমোহনের উন্নত সময়ে তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বান বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল এবং অনেকের বিশ্বাস ছিল যে অনেক সাহেবেবনাও তাহার তুল্য ইংরাজী রচনা করিতে পারেন না। কৃষ্ণমোহন ‘Lardner’s Encyclopedia’ র অনুকরণে ‘Encyclopedia Bengalenis’

নায়ে খণ্ডে খণ্ডে বৈভাবিক অর্থাৎ ইংরাজী এবং বাঙালী ভাষার বৃহৎ এক পুস্তক রচনা করিতে লক্ষ্য করিলেন, তাহার দ্বাদশ খণ্ড বাহির হইয়াছিল।

কুকমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন চরিত লেখা বা তাঁহার চরিত্রের দোষ
 গুণ বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ৪০। ৫০ বৎসর পূর্বে খৃষ্টান
 সম্প্রদায় কিরূপ ভাবে হিন্দুসমাজের উপর আক্রমণ করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত
 প্রদর্শনই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রদর্শন করিতে গিয়া আমরা হয়ত
 অনেকের মনোকষ্টের কারণ হইয়াছি—কিন্তু জীবন্ত ইতিহাস লেখকের কোন
 দিকেই নিস্তার নাই। বাহা হউক, সহৃদয় পাঠক এই প্রবন্ধ ইতিহাসের
 উপকরণ জ্ঞান করিয়া আমাদের দিকে দৃষ্টি করিবেন, ইহাই আমাদের ভরসা।

রুক্মিণী বাইএর চিঠি ।

কেননে পুরিবে সাধ হে ;

অহে—কহ গুণমণি কেমনে তা শুনি
বামনে ধরিবে চাঁদ হে ।

তুনে হানি পায় বন্ডো ঘরে আয়—

কই পতি ঘর কই ?

ନିଦା ଅଢ଼ାନିକା ଛଦ୍ମେର ବାଗାନ

মার্কেল ফোয়ায়া কই ?

লক্ষ্য 'বাউয়র', হাওয়াখানা স্বর

માનિ મૌથા વાડેથાહ.

'টেলিগে'র ঘর কই হে আয়ার,

कृष्ण कहे धेनि बाहू ?

আমি কি এখন অছি হে তেমন

ସୋମଟା ବୁଦ୍ଧନୀ ବଡ଼,

• পোহসিহি ঐকন কুশের আবাদ—

চিনেছি শাকাত্য যউ ।

সে ঘোর ভেঙেছে ছ চোখ ফুটেছে,
উঠেছে প্রাণের ডানা,
আর কি কোটরে পারিছে থাকিতে
শাবক যেমন কাণা ?

এখন—সুখের সাহিত্য পড়ি সেক্ষণীব'
কাব্য শত শত খান ;
'গীবন্' 'গ্রোটে' পড়ে ইতিহাস
হয়েছে—পেয়েছি জ্ঞান ;
পড়েছি দর্শন 'লক্' 'হ্যামিল্টন,'
'মিল্' 'হিউম্' 'বেহাম'
বিবর্তনবাদী— 'ডাবউইন' 'স্পেন্সার'
জগৎ বিখ্যাত নাম ;
'মিলেব' 'লজিক' 'লিবাটি' পড়েছি,
'বেনেতে' 'কল্‌চর' বেশ,
'ফারাদে' 'হার্শেলে' 'হক্সে' 'টিগ্গেলে'
বিজ্ঞান করেছি শেষ ।
নবেল পড়েছি 'থ্যাকারে' 'কট'
'ডিকেনস' করেছি সায়,
'ভিউমা' 'লিটন' 'এন্টনি ট্রোলোপ'
'রিচার্ডসন্' সমুদায়,
'ক্লীল্ডিঃ' 'রেনল্ডস্' কণ্ঠস্থ আমার
'স্যাণ্ডে' নবেলে প্রাণ ;
এখন—স্বনাম প্রসিদ্ধ বিদূষী হয়েছি,
লিখেছি 'ড্যান্সিং' গান ।
এখন—দেখিব দেখাব শিখিব শিখাব
কেবা নিবারয়ে তার,
ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াবে এখন—
স্বর্গী প্রজাপতি প্রায় ;

যা'ব নাট্যশালা নাচ রঙ্গভূমে
তোড়া নেব হাতে করি,
চেয়ারে 'শোফাতে' সতার সাফাতে
বসিব যেমন পরী ।

সাক্ষাৎ, পতি হ'তে চাও তুমি হে ।
অহে—মম অঙ্গে 'সোপ্' সুগন্ধ পার্ফিউম্—
সৌরভ ছুটেছে দূরে,
তব অঙ্গধুলি উড়ায় পবন
হৃগন্ধে নাসিকা পূরে;
মম অঙ্গে কিবা 'গউনের' শোভা,
সর্বলজ্জা আচ্ছাদন,
তব অঙ্গে ধুতি লেঙ্গুটা প্রমাণ
নাম মাত্র আবরণ;
মম শিরে 'ক্যাপ্' ছেলনে দোলনে
ময়ূরের পৃচ্ছ শোভা,
তব শিরে পাগ্ ঝিঁড়েটা যেমন—
মজুরের বেশ কিবা;
মম কটিতটে স্বকোমর বন্ধ—
কটির কষণ তার,
তোমার কোমরে কড়সি বন্ধন—
ভুঁড়িটা অগাবু প্রায়;
আমার সুগণ্ডে 'রুজ্' 'পাউডরে'
প্রস্ফুট গোলাপ দেখা,
তোমার কপালে গেবি মাটি গোলা,
দ্বিবম ত্রিপুণ্ড্র রেখা;
সুচিকণ 'বুট' আমার চরণে
বিলাতি পালিসে বকে;

রুম্মাবাণের চিঠি ।

নিগড় বন্ধন, নাগোরা তোমার
 চরণ হুখানি চাকে ;
 আমার স্নেহজ্বা রঞ্জিত বেশমী
 যোজা করে আবরণ,
 সর্কাক তোমার অসভ্যের প্রায়
 খোলা থাকে সর্করণ ;
 আমাব জিহ্বাতে বিলাতি ধবণে
 কথাগুলি ধীবে সরে,
 বর্করের প্রায় রসনা তোমার—
 কথা অতি উচ্চৈঃস্বরে ;
 বাবুর্চিব হাতে রন্ধন আমাব—
 সুগন্ধে আশ্বাদ করে,
 চাপাটি তুল আহা! তোমার—
 দেখিলে অকচি ধরে ;
 আমি বলি 'গড' তুমি বল হরি
 যাগ যজ্ঞ মানো বেদ হে;
 তোমায় আমায় অনেক তফাৎ
 জমিন আস্‌মান্ ভেদ হে,—
 কেমনে পূরিবে সাধ হে ॥



মুতা ।

মুতা অনেক রকম ;—গুলি মুতা, ভাসা মুতা, রিল মুতা, কাটিম মুতা, ও কাপড় বুনবার মুতা । গুলি, ভাসা, রিল ও কাটিমের মুতার প্রায়ই সেলাই-এর কার হই ও বুড়ি উড়ান হয় । অন্যান্য উদ্দেশ্যেও লাভিত হইয়া থাকে, কিন্তু সে সকল লিখিবদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই ।

বর্তমান প্রবন্ধে কাপড় বুনবার মুতার কথা আলোচিত হইবে । সকল মুতার মধ্যে এই মুতারই কারবার অধিক । কিন্তু কারবার অধিক বলিয়া লোকে জিনিসটার অনেক তত্ত্ব রাখিয় থাকে, এমন বোধ হয় না । ব্যবসায়ীর হই একটা মোটামুটি ধরার জানেন আর অন্য সকলে এই পর্য্যন্ত জানেন, যে এই সকল আমদানিতেই দেশটা উৎসন্ন হইতেছে, এ ব্যবসায় যত কর্ম, এদেশের পক্ষে ততই ভাল ।

মুতা একটা পদার্থ । জ্যামিতির বেধাব ন্যায় অপদার্থ নহে, মুতারঃ ইহাব দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থও আছে । তাহা ছাড়া আবাব গুরুত্বও আছে ।

১। দৈর্ঘ্য কিয়ৎপ, দেখা যাউক ।

১১০ গজ = ১ মুতা ।

১২০ „ = ৮০ „ = ১লি

৮৪০ „ = ৬৬০ „ = ৭ = ১ গুছি ।

১৬৮০০ „ = ১১২০০ „ = ১৪০ = ২০ „ = মোড়া ।

“লি” কথার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নাই । গুছি ও মোড়ার ইংরাজি নাম হ্যাক (Hank) ও পূর্বোন্নিধিত হিসাবটি সকল মুতার খাটে, কেবল উইলকিন্সের (Doffing) কলের মুতার সৰ্বটা খাটে না । উইলকিন্সের গুলিতে এক গুছি, ৭ লিত নহে । কিন্তু তাহাই বলিয়া অন্যান্য কলের এক মোড়ার যত মুতা, ইহাতে তদপেক্ষা কম নাই ।

২। মুতার প্রস্থের কথা বুঝা একটু কঠিন । প্রস্থের মাপ নম্বরওয়ারি ; যেমন ১০ নম্বরের মুতা, ২০ নম্বরের মুতা, ৪০ নম্বরের মুতা ইত্যাদি । কিন্তু মুতা দেখিয়া নম্বর ঠিক করিয়া লন, এমন লোক বাঙ্গালার অতি কমই আছেন । সকলেই মোটামুটি একটা আন্দাজ করিয়া লন । নম্বরের বেশী তফাৎ হইলে বুঝা যায়, নম্বুরা বুঝিতে পারা যায় না । তাঁহারা অনেকটা বুঝিতে পারে ; কিন্তু ব্যাপারীদ্ব্যবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিলে

অত্যাক্তি হয় না। সাহেব মহাজনেরা ব্যাপারিদিগের বিদ্যা জানেন বলিয়া, এই কারবারে যত ভেল চলে, অন্য কোন ঘাবসায় তত চলে কিনা, আমি বলিতে পারি না। নম্বরের মার পৌঁচ কি, হিসাব কি, কি কবিতা ঠিক ধরা যাইবে, একটু পবেই বলিব।

৩। সূতার গুরুত্বের কথা। গুরুত্বটি গুরু কথা, ছাড়িয়া দিয়া ওজন বলা যাউক।

(ট্রয়) ইংরাজি।

২৪ গ্রেণ = ১ পেনিওয়েট।

৪৮০ „ = ২০ „ = ১ আউন্স।

৫৭৬০ „ = ২৪০ „ = ১২ „ = ১ পাউণ্ড।

ইংরাজি এক গ্রেণ আমাদের একতোলার ১৮০ ভাগেব এক ভাগ; অর্থাৎ

১৮০ গ্রেণ = ১ তোলা বা ভবি।

১ আউন্স = ২৪ „ „ „।

১ পাউণ্ড = ৩২ „ „ „।

এখন আবার নম্বরের কথা বলা যাউক। কলিকাতার বাজাবে সূতার নম্বর একেবারে দশ দশ করিয়া উঠে। যেমন ১০ এব পর ২০। ২০র পর ৩০, ইত্যাদি। ১, ২, ৩, ১১, ১৪, ৪৫, ৫৬ প্রভৃতি নম্বর এখানে নাই। নম্বরের উর্দ্ধ সংখ্যা ২২০। বিলাতি কাপড়েব কলওয়ালারা এই সকল মধ্যবর্তী নম্বর লইয়া কাজ করে। নম্বর যত কম, সূতা তত মোটা। ৪০ নং অপেক্ষা ৩০ নং মোটা, আবার ৩০ নং অপেক্ষা ২০ নং মোটা; এই রূপ। ২০ নং অপেক্ষা নিচু নম্বরের সূতা কলিকাতায় আইসে না।

কোরা সূতার যত নং; প্রতি পাউণ্ড সূতায় তত গুছি থাকে! যেমন ২০ নং সূতায় ২০ গুছি, ৩০ নং সূতায় ৩০ গুছি ইত্যাদি। পূর্বে বলিয়াছি ২০ গুছি এক মোড়া, তাহাতেই

২০ নম্বরের সূতাব ১ পাউণ্ডে ১ মোড়া।

৩০ „ ১ „ ১½ „

৪০ „ ১ „ ২ „

৫০ „ ১ „ ২½ „

৬০ „ ১ „ ৩ ইত্যাদি।

এখন শঠাই দেখা যাইতেছে, সূতা নম্বরে যত কম, মোটায় তত বেশী কেন, অর্থাৎ ২০ নম্বর ৩০ নম্বরের চেয়ে মোটা কেন, ৩০ নং ৪০ নং এর চেয়ে মোটা কেন ?

১ পাউণ্ড ওজনের তুলা হইতে

২০ নম্বরের সূতা ১৬৮০০

৩০ „ . . ২৫২২০

৪০ „ ৩৩৩০০

৫০ „ ৪২০০০ গজ প্রস্তুত হয় ।

তাহার পর দেখা যাউক, নম্বর ঠাণ্ডাইবাব উপায় কি ? অল্প সূতা হইলে, আন্দাজ ব্যতীত গতি নাই। কিন্তু বেশী সূতা পাইলে অকাটা ধরা যায়।

নিয়ম ১ লি কে ১০০০ দ্বিগুণ গুণ কবিয়া সেই লি ওজনে যত গ্রেণ, সেই গ্রেণের সংখ্যা দিয়া ভাগ দিলে নম্বর ঠিক হইবে যথা—

যদি ১ লিব ওজন ২০ গ্রেণ হয়, তাহা হইলে সূতার নং কত ?

$$\frac{১ \times ১০০০}{২০} = ৫০$$

উত্তর,—সূতাব নম্বর ৫০ ।

২০ নং সূতাব ১লিব ওজন কত ?

$$\frac{১ \times ১০০০}{২০} = ১১\frac{১}{২} \text{ গ্রেণ } !$$

সূতা কি ভাল কি মন্দ দেখিবার তিনটি কথা আছে। সূতাটি বরাবর এক রকম মোটা কিনা, সূতাটির বং খুব ধবধবে কিনা, আব সূতা কতটা টান সহ্য করিতে পারে।

কলিকাতাব ব্যাপারীরা সূতার নাম, টিকিট, ও বাঁধাই দেখিয়া মাল ভাল মন্দ বিচার করেন। সূতার নাম অর্থে বুঝিতে হইবে, কোন্ কলের সূতা। সুকর্ণ সূতার বাণিলে কলওয়ার নাম থাকে না। আমদানিকারক মহা-অনেরা কলওয়ার নাম দিতে দাক্ষণ নারাজ ; তাহারা বিনয়ের নামের টিকিট ঢালাইবার চেষ্টা করে। সূতার বাঁধাই কি পূর্ণাধ, অব্যবসায়ীরা তাহা জানেন না। সাতটি কবিয়া লি. কোন একটা রঙ্গিন সূতার বাঁধিয়া একটা

করিয়া গুচ্ছ করা হয় । সেই রং ধরিয়া বাপারীরা সুতাকে কাল বাঁধাই
জুঁদা বাঁধাই ইত্যাদি নাম দেন । কিন্তু বাঁধাই দেখিয়া সুতা বিচার করা
বড় ভুল ও ঠকিরা ঘাইবার একটা বিশেষ হেতু ।

কেরা সুতা । মোড়া ও পাউণ্ড হিসাবে বিক্রীত হয় । সাহেব মহা-
জনেরা পাউণ্ড ধরেন, ও দেশীয় বাপারীরা মোড়া ধরেন । অর্থাৎ একটা ৫০
নম্বরের সুতার দাম ইংরাজ মহাজনেরা দশ আনা বলিলে, বুঝিতে হইবে,
মোড়া হিসাবে সুতাটির মূল্য চারি আনা মাত্র ।

সরু সুতার অপেক্ষা মোটা সুতার দাম কম । অর্থনীতিজ্ঞ জিজ্ঞাসা
করিতে পারেন—এইরূপ হইবার কারণ কি ? এক পাউণ্ড তুলায় এক পাউণ্ড
২০ নম্বর সুতা হয়, এবং সেই ১ পাউণ্ড তুলায় এ পর্যন্ত ৫০ নং সুতা হয় ।
তবে ২০ নম্বর অপেক্ষা ৫০ নম্বরের দাম বেশী কেন ? ইহার প্রথম
কারণ সরু সুতা তৈয়ার করিতে মেহেনতমানা বেশী । তুলাকে অনেক
পাট করিতে হয়, এবং তুলাকে বেশী পিজিতে হয় । তাহার পর আর এক
কারণ—যে, সকল তুলায় বেশী নম্বরের সুতা প্রস্তুত হয় না । ভারতবর্ষের
তুলায় ১ হইতে ৪০ নম্বর পর্যন্ত সুতা হয় ; আমেরিকার তুলায় ৪১ হইতে
১০০ সুতা, ও মিসরের তুলায় তাহার অধিক নম্বরের সুতা হয় । ভারত-
বর্ষের তুলা অপেক্ষা, আমেরিকার তুলা মহাঘ, আবার আমেরিকার তুলা
অপেক্ষা মিসরের তুলা মহাঘ । ভারতবর্ষের তুলায় ৪০ নম্বরের অধিক
নম্বরের সুতা তৈয়ার করিলে তত মজবুত হয় না । অব্যবসায়ী পাঠকের
কাছে এই কথাটা সমস্যার মত বোধ হইবে । যে তুলার সুতার ঢাকার
মলমল হয়, সে তুলার সরু সুতা হয় না—এ কি কথা ? উত্তরে এই বলা
যাইতে পারে, সরু সুতা হইবে না কেন, হয় ; কিন্তু কলে নয়, হাতে ।

তাহার পর দেখা যাউক, গত বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় কত কোরা সুতাব
আমদানি হইয়াছেন ; —

২০নং ৩০নং ৪০নং ৫০নং ৬০নং ৭০নং ৮০নং ৯০নং ১০০নং উর্কসংখ্যা

১৮৭৪ ২১৫৪ ২১৫৪ ১৩০২১ ১৫২৮ ২৮১ ৩৪৩ ৩২৩ ১৮১ ১৫৩ ২৭৩

১৮৭৫ ২৩৬ ২৭৭ ১৪৬৫৫ ১৬৮৮ ১০৬৭ ৪৬৫ ৩৭২ ২৫৭ ২২০ ১৭১

১৮৭৬ ৮৬৪৬ ৫০৫ ১১৪৯২ ১৪১৬ ১০৮২ ৩৮৮ ২৮৬ ২২২ ১৮৫ ৩১৬

১৮৭৭ ১৭২৭০ ৭৫৬ ১৫৪১৫ ১৯৮৩ ১৪৪৫ ৫৪৬ ৪৪৮ ৩৪০ ২১১ ১৩৬

১৮৭৮ ১৩২৯৩ ১৫২৮ ১৪২০১ ১৭২০ ১২৩৪ ৪৪৯ ৩৫৫ ২৩৬ ১৮৮ ৬৭

১৮৭৯ ৮২৭০ ৩২২ ২০৪৪ ১০২৪ ২০০ ৪৯৬ ৪৫৩ ২০৩ ১৯১ ১৬৭
 ১৮৮০ ১৩৩৬২ ৭৬৮ ১০২২২ ১৮৪৮ ১৮২৩ ৫৬৫ ৪৩১ ৩০৬ ১৭১ ১১০
 ১৮৮১ ১২৮৩৭ ৬০০ ১১১২৫ ১৩৬২ ৮৫৬ ৫৭১ ৩৬১ ২৬৮ ২০০ ১০৩
 ১৮৮২ ১৫৮৩৭ ২২৬ ১০৮১৮ ১১৬৯ ১০৬৩ ৩৮৬ ২৩২ ৯৮ ৮২ ১২৮
 ১৮৮৩ ১৭৫৪৮ ৫১৬ ২৬৭৩ ১৫৫৫ ১২৬৪ ৮১৮ ৩৪২ ৩৪৮ ৩১৪ ২৫৮
 ১৮৮৪ ১২২০০ ৪৩৮ ১০১২২ ৯৮৫ ৮৬৭ ৭৮১ ৫৬৪ ৩০৪ ৩০১ ২৭২
 ১৮৮৫ ১৭৪৫০ ২৪৩ ১৫০০ ১০৭৭ ১০৩২ ৬১২ ৫৯০ ২৯৪ ২৬৪ —
 ১৮৮৬ ১২৬৭২ ১৭৩ ৯৫১১ ১৩২৬ ১১২২ ৬৪৭ ৪৯৬ ২৬২ ২৭০ —

উপরের সংখ্যা গুলি গাঁট বৃত্তিতে হইবে। প্রত্যেক গাঁটে ৪০ শত পাউণ্ড সূতা থাকাই রীতি, তবে কোন কোন আমদানিকারক মহাজন ৫০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত সূতার গাঁট বাঁধাইয়া থাকেন; বড় গাঁটে মহাজনের সুবিধা অনেক;—খরচ কম পড়ে। গাঁট তৈয়ারি করা, জাহাজ ভাড়া, জাহাজ বোঝাই, ও জাহাজ হইতে নামান, কলিকাতায় শুদাম ভাড়া ইত্যাদি অনেক খরচ গাঁট হিসাবে ধরা হয় বলিয়া, বড় গাঁট সুবিধা জনক। আবার খরচের সুবিধা হইলেই সকল দিকেই লাভ;—অন্যান্য প্রতিযোগ অপেক্ষা একই মাল অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রয় করিতে পারিলে, জিনিসের কাটতি বেশী হয়।

তালিকাটি যে নিম্নলিখিত, তাহা বলিতে পারি না। তবে যত ঠিক করা সম্ভব, তাহার যত্নের ক্রটি হয় নাই। কলিকাতার কষ্টম হাউসের দৈনিক রিপোর্ট হইতে তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে; সূতরাং ইহাতে কেবল জাহাজের মাল আছে, রেলের মাল নাই। রেল করিয়া অল্পই সূতা কলিকাতায় আসিয়া থাকে, কখন কখন বোঝাই ও করাচি হইতে হই এক গাঁট প্রেরিত হয়। সে গুলি হিসাবে না ধরিলেও ক্ষতি নাই। বিলাত হইতে বোঝাই এ মাল আনিতে যত জাহাজ ভাড়া লাগে, কলিকাতার আসিতে তাহা হইতে অতি সামান্যই অধিক লাগে। কিন্তু বোঝাই হইতে রেল করিয়া মাল আসিতে যে খরচ লাগে, বিলাত হইতে জাহাজ করিয়া আনয়ন করা তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যয় সাধ্য।

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে সকল সূতার মধ্যে ২০ নং ও ৪০ নং সূতারই আমদানি অধিক। সর সূতার আমদানি বড় কম। ২০ নম্বরের প্রায় সমস্ত মাল বোঝাই হইতে আইসে। পূর্বে বিলাতি

সুতা আমদানি হইত, কিন্তু অধ্যবসায়ী বোম্বাইবাসিনা আগুনাদিগের দেশে কলি আনাইয়া ভাবতবর্ষ হইতে ২০ নম্বরের বিলাতি সুতাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। কেবল ভারতবর্ষ হইতে নহে; পূর্বে উপহীপ, চীন ও জাপানে এখন ২০ নম্বরের বিলাতি সুতাব পরিবর্তে বোম্বাই এর সুতা যায়। এখন কলিকাতায় ২০ নংএব বিলাতি সুতা বৎসবে দশ গাঁট ও আইসেনা। কলিকাতায় ও বেঙ্গল নিস বা উড়িয়া প্রভৃতি দুই চাষিটি সুতার কল আছে। এই সকল কলে ১০ ও ১৫ নম্বরের সুতা প্রস্তুত হয়।

কলিকাতার পার্শ্ববর্তী কোন গ্রামে যদি ৪০ নং সুতার কতকগুলি কল আনা যায়, তাহা হইলে, আমার বোধ হয়, সে গুলিতে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। ৪০ নং এব সুতার উপযোগী তুলা, ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইবে; ইহার জন্য আমেরিকায় বা নিসরে যাইতে হইবে না। বিলাতি সুতা হইতে এসুতাব দাম অনেক সস্তা হইবে, কারণ ধরচ অনেক কম হইবে। এখন তুলা এখান হইতে বিলাতে যায়, ও সুতা হইয়া বিলাত হইতে এখানে আইসে। এই দুই বারের জাহাজ ভাড়া একেবারে বাঁচিয়া গেল, তাহাব পব দালালি, বিমা, গাঁট বাধাই প্রভৃতি অন্যান্য অনেক ব্যয় একেবারে থাকিবে না। কিন্তু হইলে কি হয়, বাঙ্গালি যৌত কাববার বুঝেন না। চক্ষের সম্মুখে দৃষ্টান্ত থাকিলেও তিনি তাহাতে বিশ্বাস করেন না। পূর্বে এখান হইতে পাট বিলাতে গিয়া ডগ্গী নংয়ের কলে, চট বুনাই হইত ও সেই চট এখানে আসিয়া বিক্রয় হইত। এখন আর এরূপ হয় না। কতকগুলি সাহেব চটের কল আনাইয়া, একেবারে ডগ্গীর মাথা ধাইয়া দিয়াছেন।

কলিকাতার বাজারে নিম্নলিখিত কলগুলির নাম বিখ্যাত;—

৪০ নং। জন মেয়াল, জর্জ মেয়াল, কিংষ্টন, ব্যানারমিল, কন্ডেক্টী, ও উইলকিন্সন। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জন মেয়াল নিকট, ও উইলকিন্সন উৎকৃষ্ট। জন মেয়ালের মত অনেকগুলি সুতা কলিকাতায় আসিয়া থাকে, কিন্তু সে সকল কলের নাম, বাজারে প্রকাশিত নাই; লোকে টিকিট অহুসারে, সেই সুতা কলের নাম করে যথা কুলি পুলি ইত্যাদি।

ব্যানারমিল সুতার সর্বাপেক্ষা অধিক কাজ হয়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এই সুতার যত আদর, উইলকিন্সনের তত নহে। শেষোক্ত সুতা বাঙ্গালা দেশে চলে; এত দামী জিমিস, পশ্চিমের গীতিরা কিনিতে চাহে না। অন্তি

গ্রেহেম কোম্পানি জর্জা বোড়া বা জর্জারাজা টিকিটের এক প্রকাব ৪০ নম্বরের কোরা সূতা আনা হইতেছেন। তাহা, উইলকিন্সন অপেক্ষা ভাল বলিয়া বোধ হয়। নূতন আমদানি বলিয়া, লোকে এখনও ইহা ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। রয়টার টেলিগ্রাম কোম্পানি নিত্য নিত্য বিলাতি বাজারের দর পাঠাইয়া থাকেন, তাহাতে কেবল ব্যানার মিলেব দব থাকে। . .

রুসিয়া নামক সূতাও খুব প্রচলিত। রুসিয়া সূতা ৫০ হইতে ১০০ শত নম্বর পর্য্যন্ত। ইহাব মধ্যে কোন একটা নম্বরের সূতা আলাহিদা বিক্রয় হয় না। সকল নম্বর একেবারে একটি অমুপাত অমুসাবে বদ্ধ। এই অমুপাতকে ব্যাপারিবা “ভোল” বলে। রুসিয়ার ভোল এইরূপ; ত্রিশ গাঁট সূতা কিনিলে ৮ গাঁট ৫০ নং, ৮ গাঁট ৬০ নং, ৪ গাঁট ৭০ নং, ৪ গাঁট ৮০ নং, ৩ গাঁট ৯০ নং ও ৩ গাঁট ১০০ নং।

“লাইট মলাব” সূতাব ৩ নাম আছে। এই সূতা ৭০ হইতে ১০০ নং পর্য্যন্ত। রুসিয়ার নায়, ইহাব ভোল আছে। দশ গাঁট লাইট মলাবে ৪ গাঁট ৭০ নং, ৩ গাঁট ৮০ নং, ২ গাঁট ৯০ নং ও ১ গাঁট ১০০ নম্বর।

উর্ক্, সংখ্যার সূতার মধ্যে “ঢাকা” কলের সূতা সর্বাধিক ভাল। এই সূতা মিশরের তুলায় প্রস্তুত হয়। ইহার আমদানি অতি কম। পূর্বের তালিকায় দৃষ্ট হইবে ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ সালে কিছুই সূতা আইসে নাই।

কোরা সূতার কোন মরসুম নাই; অর্থাৎ বৎসরের যে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ইহাব ক্রয় বিক্রয় অধিক হয়, এমনত নহে। তবে পৌষ মাসে, সকল বাজার মন্দা, সূতার বাজার ও মন্দা। কোরা সূতার বিষয় আর অধিক কিছু বলিবার নাই। এবার রঙ্গিণ সূতার কথা বলিয়া প্রবন্ধ সাঙ্গ করিব। রঙ্গিণ সূতা দুই ভাগে বিভক্ত; টর্কিরেড সূতা, ও অন্যান্য, রঙ্গের সূতা। টর্কিরেড সূতা অন্য রঙ্গের সহিত কোন বিষয়ে সমান নহে, ইহা ভিন্ন শ্রেণীস্থ। অন্যান্য রং ছোপাইয়া প্রস্তুত হয়; টর্কিরেড পেরূপ নহে; ইহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রঞ্জিত। এ প্রক্রিয়ার বর্ণনা এখানে অনাবশ্যক, পাঠক বোধ হয় দেখিয়াছেন, যে বিলাতী সকল রঙ্গের অপেক্ষা লাল রং টা পাকা; সেই পাকা রং, এই টর্কিরেড। টর্কিরেড ভিন্ন অন্য লাল রং অনেক আছে; কিন্তু সেগুলি পাকা নহে।

গত তের বৎসবে কত রঙ্গিন সুতা কলিকাতার আসিয়াছে, তাহার তালিকা এই ;—

টর্কিরেড সুতা অন্যান্য রঙ্গের সুতা ।

	গাঁট	গাঁট
১৮৭৪	৪১৭১	২৫৬০
১৮৭৫	৫২২০	৩৪৭৮
১৮৭৬	৫৬২২	২২৭৩
১৮৭৭	৬২৫৩	৪০৮১
১৮৭৮	৭১৬০	৪২৮৮
১৮৭৯	৮৬০৮	৩১৮০
১৮৮০	১২১৫৫	৩২৩৭
১৮৮১	১২২৭৮	৪১২৮
১৮৮২	১৩৫১৭	২৮৪২
১৮৮৩	১১২০৬	২৫৪০
১৮৮৪	১৭৭৫৬	৩৫৮৬
১৮৮৫	১১৩২০	২৮২৫
১৮৮৬	১৬৪৪৫	৩৪২৮

এই তালিকাটি বিশেষ কার্য্যকারী নহে। কোন্ বস্ত্রের কত সুতা আসিয়াছে, জানিবার উপায় নাই। তারি ওজনবৎ কত সুতা, ও হাল্কা ওজনের কত সুতা তাহাও জানা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝা যায়, রঙ্গের সুতার কারবার এক রকম স্থিতিশীল, আর টর্কিরেডের কারবার বৎসর বৎসর বাড়িয়া যাইতেছে।

আবার এদিকে টর্কিরেডের কারবার যেমন বাড়িতেছে, দাম তেমনই কমিতেছে। তের বৎসর পূর্বে, যে দাম ছিল, এখন তাহার অর্দ্ধেক দামে টর্কিরেডের সুতা পাওয়া যায়। তবে মালও অনেক খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। সস্তার বেচিবার উদ্ভাবন করিতেছেন, আর মালও পূর্ব্বমত হইতেছে না। পূর্বে, এদেশে কেবল জর্জানির প্রস্তুত টর্কি রেড আসিত, এখন বিলাতি লালই অধিক আইসে ; জর্জানির লাল একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। বগিলেও বলা যাইতে পারে। জর্জানিতে জিনিস ভাল হয় বটে কিন্তু লোকে ভাল জিনিস চায় না, সস্তা জিনিস চায়, কাজেই বাণিজ্যে

ইংবাজ জয়ী। যাহাকে বিলাতি টর্কি বলি, তাহা বাস্তবিক টর্কি রেড^{*} নহে, তাহার নাম আলিজিরিন রেড। বিলাতি টর্কি রেড রংওয়াল দিগের মধ্যে, জুন অব ইতরিং, এমর ইউবিং, ষ্টাইনাব, ষ্টালিং মণ্ডিথ টিপি মিলার ও বিড প্রসিদ্ধ।

বাঙ্গালা দেশে, টর্কি রেড ও অন্যান্য সূতার কাপড়ের পাড় প্রস্তুত হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে টর্কি বেড সূতার কাপড় বুনাইও হইয়া থাকে। বৎসবেব সকল সময়েই এই রঙ্গিন সূতা বিক্রয় হয়, কেবল পৌষ, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে অপেক্ষাকৃত কম।

রঙ্গিন সূতার কথা বলিতে গিয়া, হাল্কা ওজন ও ভারি ওজন সূতার নাম কবা হইয়াছে। এই দুই সূতার পার্থক্য বলিয়া দেওয়া আবশ্যিক। প্রথম প্রভেদ এই যে, ভারি ওজনের সূতা ঠিক মাল, ও হাল্কা সূতা বিটিক। ৪০ নম্বরের সূতা রঙ্গ করিয়া যদি বিক্রয় করা যায় তাহা হইলে ভারি ওজন ৭০ নম্বরের সূতা হইল। আর যদি চল্লিশের উর্দ্ধ নম্বরের সূতা ছোপাইয়া চল্লিশ বলিয়া বিক্রয় কবা যায়, তাহা হইলে হাল্কা হইল। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি ;—

এক পাউণ্ড ৪০ নং কোরা সূতার ২ মোড়া অর্থাৎ ৩৩, ৬০০ গজ। এই এক পাউণ্ড সূতা রং করিলে অবশ্য সূতা মোটা হইবে ও ভাবি হইবে। এইরূপ সূতা ভারি ওজনের সূতা।

আর এক পাউণ্ড ৫০ নং কোরা সূতার ২১০ মোড়া অর্থাৎ ৪২,০০০ গজ। এই সূতাকে যদি বং দিয়া ৪০ নম্বরের মোটা করিয়া আশ মোড়া বাদ দি, তাহা হইলে, এই সূতা ৪০ নম্বরের সহিত লম্বার সমান হইল। এই হইল ৪০ নম্বরের হাল্কা ওজন সূতা। পূর্বে বলিয়াছি, মোটা সূতা অপেক্ষা সরু সূতার দাম বেশী। কিন্তু ৪০ নম্বরের অপেক্ষা ৫০ নম্বরের দাম যত অধিক, আশ মোড়া সূতার তাহার ক্ষতি পূর্ণ হইয়া, অনেক লাভ থাকে।

রঙ্গিন সূতা মোড়া হিসাবে বিক্রয় হয় না। পাউণ্ড হিসাবে বিক্রয় হয়। রঙ্গিন সূতার ৪০ নম্বরের কারবার বেশী। ২০ নং ৩০ নং, ৫০ ও ৬০ নং সূতার ও আমদানি আছে; কিন্তু অল্প।

শ্রীরঘুনাথ দে।

শারদীয়া শক্তি পূজা ।

(১)

হরি হতে অবতরি হয়বে দিনেশ,
ধীবে ধীবে কন্যালায়ে কবেন প্রবেশ ।
উগ্রভাব নাহি আর, প্রচণ্ড প্রতাপে যার,
দহিত অখিল বিশ্ব জ্বলিত জীবন,
এখন ঢালেন রবি মূঢ়ল কিরণ ।

(২)

ভাসুব প্রশান্তভাবে স্থলীল শবত,
বিমল সৌন্দর্য্যে কবে ভূষিত জগত ।
কিবা মনোহর কাল, ছিঁড়িল জলদ জাল,
তিবোহিল তমোবাশি ঘন ঘন সনে,
প্রকৃতি হাসেন পুন প্রফুল্ল বদনে ।

(৩)

ত্রিষামায় কিবা শোভে গগন মণ্ডল,
উজ্জ্বল ভাবকাবলী অঙ্গে বলমল ।
রজত তটিনী প্রায়, নীহাবিকা নীপ্তি পায়,
রজত কিবণ ঢালি শশী হাসি হাসি,
বিমল আকাশ পথে যায় ভাসি ভাসি ।

(৪)

পথ, ঘাট, শুকাইল ঘুচিল কর্দম,
বিধৌত ধরণী ধরে মূর্তি মনোরম ।
নানাবিধ তরুরাজি, শোভে ঘন পত্রে সাজি,
অনিলে আমোন ক্ষেত্র কিবা আন্দোলিত,
স্থলীল সাগর যেন মৃদু তরঙ্গিত ।

(৫)

স্থলপদ্ম, শেফালিকা, কোমল কামিনী,

নদ, নদী, নিরমল, ধীর গামী ঢল ঢল,
জলাশয়ে ফুটে কত জলজ স্নানর,
কুমুদ, কল্লার আর কমল নিকর ।

(৬)

এইরূপ রমণীয় স্থান শরতে,
আদ্যাশক্তি সনাতনী এলেন ভারতে ।
এলেন আনন্দময়ী, ধরি রূপ বিশ্বজয়ী,
ভেজঃপুঞ্জ প্রভাপুঞ্জ তিমিষ তাড়িত,
উজ্জ্বল আলোকে দেশ কিবা আলোকিত ।

(৭)

কালরাত্রি পোহাইল হলো সুপ্রভাত,
ভারতের হলো যেন দুঃখেব নিপাত ।
চতুর্দিকে জঙ্ঘ জয়, হর্ষেব লহরী বয়,
স্বর্ণ হতে দেবগণ ছেবেন নয়নে,
অগত জাগিল যেন নবীন জীবনে ।

(৮)

জাগবে ভাবতবাসী জাগবে সকলে,
নিজা হতে উঠ সবে দুর্গা দুর্গা বলে ।
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল, বাজায়ে আনন্দ বোল,
ভোল সবে একতানে ভেদিয়া গগন,
বিষাদে বিশ্বুতি হ্রদে দিয়ে বিসর্জন ।

(৯)

মহাদিনে মহাপূজা কর মহোৎসবে,
বিতরিতে শিব শিবা এসেছেন ভবে ।
আনরে কমলদল, বিষ্ণুপত্র গজা জল,
অঞ্জলি পুরিয়ে দেহ চরণ কমলে,
মঙ্গলার কুপা হলে থাকিবে মঙ্গলে ।

(১০)

পূজ পূজ মহাশক্তি শক্তি প্রদায়িনী,
নিশ্চিন্ত নাশিনী দেবী শুভ নিপাতিনী ।

নারদীয়া শক্তি পূজা ।

পাবে সন্মুখে হৃদে বল, দলিবে মানবদল,
কবিবে শত্রুর কুল সংহার লাহনে,
স্বদেশে বিদেশে গুণ গাবে সন্মুখে বশে ।

(১১)

পূজ পূজ মহেশ্বরী মহেশ ললনা,
ভাবনা যাইবে দ্বে পুৰিবে কামনা ।
যাব পদ পূজা কবি, ত্রেতার রাক্ষস অবি,
বাঘবেন্দু বামচন্দ্র বধিয়া বাবণ,
জানকীর সমুদ্রাব বেন সাধন ।

(১২)

পূজ ভক্তি ভবে হুর্গা হুর্গতি দলনী,
শুভকথা হুংখ হরা দীনেব জননী ।
শোক, তাপ, দুঃখ যাবে, কতই না সুখ পাবে,
ঐশ্বর্য্য সৌভাগ্যশালী হবে সবে ভবে,
দৈন্য দাবানলে আব দহিতে না হবে ।

(১৩)

ভারত জননী পূর্বে শক্তিব রূপায়,
মহিমায় অস্বীকৃত ছিলেন ধবায় ।
মহা তেজে তেজস্বিনী, জ্ঞানে মানে বশস্বিনী,
ধন্যতা ধর্ম্ম পুত্রা বীরের আবাস,
শত্রুকুল হেবে সদা পাইত সন্ত্রাস ।

(১৪)

ভাবতের সেইভাব যেন দেখাইতে,
অবতীর্ণা মহেশ্বরী অপূর্ণ মূর্তিতে ।
অসুরের জুটে ধবি, সমারুঢ়া সিংহোপরি,
সঙ্গে শোভা পায় কিবা লক্ষ্মী সবস্বতী,
গণ অধীশ্বর আর সুর সেনাপতি ।

(১৫)

পূজ পূজ হেন মূর্তি বয়িয়া ভক্তি,
উদলিবে অম্বাগ মাতৃভূমি ঐতি ।

পাথে ধন, মান, জ্ঞান, হবেসবে শক্তিমান,
একতার বিহীনবে দানবেব দলে,
দেবগণ সহ স্বর্গে বসিবে সকলে ।

আগমনী ।

এতদিনপবে কিমা লড়িয়াছে মনে ?
তাইএসেছিস এই ভাবত ভবনে,—
দবিজ্র দস্তান দলে, আদবে লইতে কোলে,
তুষ্টিতে তাদের মন আশস্ত বচনে ।
অই গো দেখ না চেয়ে, মা তোবে দেখিতে পেয়ে,
‘মা’ বলে ছুটিছে সবে প্রফুল্ল বদনে ।
কতই কৈদেছি মাগো দৈত্য অত্যাচারে,
‘মা’ ‘মা’ ব’লে কতই মা ঢেকেছি তোমারে,
কতই চখেব জল, কৈলেছি মা অবিরল,
গিয়াছে কতই দিন কতই প্রকাবে ;
কত দিন উপবাসে, কত দিন উৰ্দ্ধ্বাশে,
দৌড়েছি আকুল হয়ে তোবে দেখিবারে ।

আসিব বলিয়া তুই গেলি মা চলিয়া,
এতদিন ছিলি বল্‌কেমন করিয়া ?
• কতই যাতনা, হায় ! পেয়েছি না বলা যায়,
শরীর হয়েছে শীর্ণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ।
দীর্ঘ বৎসরের পবে, পেয়েছি জননী তোবে,
প্রতিজ্ঞা কব্‌ মা বাবি না ছাড়িয়া ।

তুই না থাকিলে কাছে, কি বলিব, হায় !
 অম্বরের অত্যাচাবে প্রাণ যেন যায় !
 আমবা মা অতি দীন, চীর বাস চির দিন,
 পাতার কুটীবে থাকি, বেড়াই ভিক্ষায় ;
 যা কিছু মা অন্ন ঘুটে, অম্বরে তা লয় লুটে,
 বিষম যাতনা পাই, মরি মা ক্ষুধায় ।

বারেক দেখ মা চেয়ে ছেলেদেব প্রতি,
 তোবে ছাড় হৃদে বত পেয়েছি হুর্গতি !
 তুই মা হুর্গতি হরা, হুর্গতি হব মা তাবা ,
 দে মা, দে অভয়, ভয়ে মরি দিবা বাতি ;
 প্রাণ যে মা ওষ্ঠাগত, দেহ অস্থি চর্খ গত, '
 হস্ত পদ নাড়িবারে নাই মা শক্তি ।

করণ কটাক্ষে চেয়ে দেখ একবার,
 তুই ভিন্ন আমাদের কে আছে মা আব ?
 অপার হৃৎস্বের নদী পাব না কবিস্ যদি,
 নিশ্চয় তুফানে প্রাণ যাবে মা এবাব !
 তাই গো মা জগদম্ব, রক্ষা কর অবিলম্বে,
 বিলম্ব সহেনা আর কব গো মা পাব ।

আমরা যে চিরদিন মা তোব আশ্রিত,
 আমাদের দুখ দেখা তোব কি উচিত ?
 যে দুখ পেতেছি, হায় ! হৃদয় বিদবে যায়,
 স্বভাব এ দুখ ভাব কর মা দূরিত ।
 পাষণ-তনয়া ব'লে পাষণ-হৃদয়া হ'লে,
 পষণে কলঙ্ক তোম হইবে খোদিত ।

কি দিয়া পূজিব তোরে, কি আছে মা বল ?
 আমরা দবিত্র অতি, নাই মা সম্বল ;

উদর পূরণ তরে, যা কিছু মা ছিল ঘবে,
সকলি নিয়েছে হবে দানবের দল,
কিছুই সম্বল নাই, কোথায় বা কিবা পাই,
আমাদেব আছে মাত্র নয়নের গল ।

তাই তোরে দিয়ে মাগো পুজিব এবার,
আয় মা মঙ্গলময়ী, দয়াব আধার !
ও চবণে অবিবল, ঢালিয়া চখের জল,
পূর্যাব মনেব সাধ, ভাস্যাব সংসার ,
আয় মা আয় মা ঘবে, অনেক দিনেব পবে,
পেয়েছি জননী তোবে, ছাড়িবনা আর ।

আয়বে ভারতবাসী আয়বে সকলে,
কেন আর শোকাকুল পড়িয়া ভূতলে ?
দেখ্ চেয়ে দেখ্ অই, এসেছে মা দয়াময়ী,
উঠি গিয়ে আয় সবে জননীর কোলে ;
পেয়েছি পেয়েছি মায়, আয়রে সকলে আয়,
যুড়াই তাপিত প্রাণ ডাকিয়া 'মা' বলে ।

আমরি 'মা' কথা আহা কিবা মধুময় ।
ডাকিতে ডাকিতে নেচে উঠিছে হৃদয় !
'মা' ব'লে ডাকিছি যত, ডাকিতে বাসনা তত,
কিছুতেই সে বাসনা নিবৃত্তি না হয়,
আয় সবে আয় আয়, মা বলিয়া উভরায়,
ডাকি আয় মায় সবে খুলিয়া হৃদয় ।

ধন, বিদ্যা, রূপ, গুণ, আমাদের নাই,
আমাদের মত দুখী কেবা আছে ভাই ?
মা অভয়া দয়া ক'রে, দুখ নিবারণ তবে,
ও সকল সঙ্গে ক'রে এনেছেন তাঁই ;

মার মত দয়া কার, এসংসারে আছে আর ?
আয় আয় ভাই সব মার কোলে যাই ।

যে শরীরে কিছু মাত্র ছিল নাই বল,
কেন আজি সে শবীর এতই সবল ?
যে চখে ছিলনা দৃষ্টি, অন্ধকারময় দৃষ্টি,
আজি কেন সেই চখে জগত উজ্জ্বল ?
যে শ্রবণ চিবদিন, শ্রবণেব শক্তিহীন,
কেন সে শ্রবণে আজি বর্ষে পবিমল ?

যে মন বিষাদে পূর্ণ সকল সময়,
কেন বা সে মন আজিহেন সুখময় ?
কাদিত রে যেই শ্রাণ, হাসিছে বে সেই শ্রাণ,
কেন আজি সেইরূপ দেখি বিপর্যয় ?
সেই রাত্তি, সেই দিবা, ইহাব কাবণ কিবা ?
জেনেছি,—মা হয়েছেন ভাবতে উদয় ।

দুর্গোৎসবে আশা ।

চেখের জলে ভিজিয়া ভিভিয়া একটা ববষ গেল ।
ভেমনি হইয়া ভাসিতে আবার নুতন বরষ এস !
সুখের আভাস নাহিক যথায় আশার আলোক আব,
ভবিষ্যৎ বা'র ঘোর অমানিশা আঁধারের পারাবার ।
তা'র তরে কেন এত পরিবর্ত আবার নুতন আসে,
অমানিশা মাঝে অকুল সাগরে কি লাগি জোছনা হাসে ?

দু-চোকের জল হৃদনের তবে কেন শুকাইয়া যায় ?
 মুমূর্ষু' কেন মুখে মৃদু হাস নিমেষেব তরে হয় ।
 হৃদনের তবে কেন বৃথা আশা কেন বৃথা (এ) উৎসব ?
 জীবনের মত আফ্লাদ আমোদে কিহেতু নিবত শব ?
 তাই বলি, কেন বৃথা বিড়ম্বনা কব বিধি হৃদী জনে,
 আধাবের জীব আধাবে লুকায়ে থাকুক আপন মনে ।
 ডাকিও না তাবে জাগা'ওনা আর ডেকেছত বতাবাব—
 ডাকিলে শুনে না, জাগিয়া জাগে না, বাহবে যায় না আর ।
 দেখে না চাহিয়া অনন্ত আকাশ—অনন্তের পাবাবাব,
 চন্দ্র, সূর্য্য, তারা দেখেও দেখে না, বুঝেও বুঝে না আব ।
 গিবি, সিন্ধু, নদী, বন, উপবন কেজানে দেখিতে আব ?
 প্রকৃতি ইন্দ্রিত কে বুঝে এখন ? কৃত্রিম হয়েছে সাব !
 প্রকৃতি প্রকৃতি না বুঝি' কেমনে প্রকৃতি সাধনা কবি ?
 না জানি, চিন্ময়ী রতই কুপিতা !—অকূলে পাই না তবী ।
 যুনাগী মণ্ডলী প্রকৃতি সাধনে হয়েছে সুসিদ্ধ বাম,
 হৃদয়ে তা'দেব শক্তি বিবাজে, পেয়েছে সাধক নাম ।
 আছে কি মোদেব ওদেব মতন সাহস, যতন, পণ ?
 আছে কি তেমন অজস্র সাধন, অচল অটল মন ?
 “কবিবাব যাহা কবিব এখনি' একদিন পাব ফল,
 “না হয় জীবন যাইবে আমাব ক্ষতি কিবা তায় বল ?
 “পুত্র পৌত্রগণ ভুজ্জিবে সে ফল জন্মিবে যাহাবা পবে ।”
 মবি কিবা হয়, স্নেহেব ধাবণা অটল যতন ধবে !
 নাহিক মোদের সাধনাব বল মুখটি হ'য়েছে সাব,
 বল মা অধিকে, পা'ব নাকি কুল—পুজিতে সাধিতে আব ?
 না থাকে যদি মা, এত্থের কুল, কি লাভ ভারতে এসে ?
 প্রিয় পুত্র যথা আছে মা তোমাব যাও সে যুনানী দেশে ।
 আজি হতে মোরা ভুলিব তোমার তুমিও তুমিত ভুলেছ কবে !
 মা বলিয়া আর ক'বনা তোমায় হৃদয় বেদন সবে ।
 কিন্তু যেন মনে থাকে গো তোমার এমনি যাবে না দিন,
 বজ্রনী পোহালে কিবা হৃদী স্ত্রী সকলি' পায় যে দিন ।

মহা কালে যবে এ হুথের কাল মিশাবেনিয়মে তাঁব,
 উদিকে তরুণ স্নুথের অরুণ ভারত পাইবে পার।
 দেখিব তখন, এস কি না এস, কালের আদেশ বলে,
 ভারত-ভনয়ে হবে গো ডাকিতে ভাসিষা নয়ন জলে।
 এমন সাধক পাবেনা গো আব, (এখনি' সে নাই কেহ)
 তোমাব চরণে আত্ম বিসর্জন—নহেক নশ্বর, দেহ—
 আত্ম-বিসর্জন ভাবত সন্তান ক'রেছে চরণে তব।
 বুনাগী তেমন জানে না সাধন, দেহই তা'দেব সব।
 'দেবী' বলি মোরা পূজিগো তোমায়—জগত জননী বলি,
 জড় যন্ত্র বলি' সবার সাধন—স্বভাবের গ্রন্থাবলী।
 সজীব তাহার—নিজ্জীব উদ্যান তুমি গো তাদেব তবে,
 বাছি' বাছি' ফুল তুলিয়া যতনে সবায গলায় পবে।
 এখনই এই, আছে এর শেষ, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান তা'জ্ঞে
 পদার্থ বিজ্ঞান সাধনে কি ফল—নাস্তিক্যে সবাই মজে!
 তখন ভাবতে' পড়িবে গো, মনে, যুবোপে না পেয়ে ঠাই,
 বুঝিবে তখন, যুগেক্ত-নন্দন ভাবত বিনা বে নাই!
 "সম্বব বিলাপ ভাবত সন্ততি, এখনি যাবেনা দিন,
 "ঐ দেখ চেয়ে পূর্ব আকাশে উষাব উজল চিন!
 "উত্থান পতন জগত নিয়ম, বৃকত তোমবা সবে,
 "চির হুখে কাম, যায় হে জীবন,—চিরসুখী কেবা কবে?
 "নব দিবা এবে পেয়েছ সকলে, নূতন যতন ধর,
 "অতুল উদ্যমে কর্তব্য সাধনে প্রাণপণ সবে কর!
 "সাধিলেই সিদ্ধি" জ্ঞান পূর্বাণব—ভুল না ক্ষণেক তরে,
 "ভাই বোন মিলি' মাতৃ সেবা কর অতুল প্রমোদ ভবে।
 সম্বৎসর পরে যে শক্তি বলে জাগহ হু"দিন তরে,
 "ভুলিও না তা'য়; শক্তি সমষ্টি অসাধ্য সাধন করে।"
 এ কি বে হুথের আশার আলোক উদিল মানস পটে?
 দেবী কি কহিলা এ আশ্বাস বাণী রহিয়া বোধন ঘটে?
 এস মাগো তবে, এস হৃদি মাঝে, দিতেছি পরাণ দান
 একে একে একে সবারি সাধনে হৃদি দিব বলিদান।

এস দশভূজে, রমা বীণা-পানি, গুহ গজানন আব,
তাজ ও কেশবী, গভাসু অশ্বর, রতন মানিক হাব।
লৌহ বর্ম এবে পবা'ব সবায় আমবা কেশবী ছ'ব,
সম্মুখ সমবে দুৰ্জয় অসুবে বীরতা দেখা'ব সব।
বমাব ভাণ্ডাবে কত বহু আছে, বাণীব মোহন গাঁথা,
দেখিব'কেমন কার্তিকেয় বীৰ্য্য, গণপতি সিদ্ধিদাতা ?
কত শক্তি ধবে সে শক্তি রূপিণী দেখিব বুঝিব এবে,
বাহন কেমন দেখিব তোমবা—বিলম্ব কিহেতু তবে ?

পৌত্তলিকতা ।

ইদানীং ইংরাজী ভাষাবিৎ কৃতবিদ্যাগণ মূর্তিপূজাব নাম গুনিলে একে-
বারে জ্বলিয়া উঠেন, তাঁহাদের চিবস্কিত ক্রোধ উদ্বেল হইয়া পড়ে।
পৌত্তলিকতা অতীব হেয়, ঘণা ও জাতপ্রজ্ঞ লোকেব পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য,
ইহাই তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস। ঈশ্বরের রূপ বল্পনা অত্যন্ত অবৈধ ও ভ্রম-
সঙ্কুল, বৈদেশিক শাস্ত্র পাঠ কবিয়া তাঁহাদের এই জ্ঞান জন্মিয়াছে। মূর্তি-
পূজা সভ্যতাব্য জাতিব পবিত্রজ্ঞানীয়, এ প্রতীতিও তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল।
উহার উচ্ছেদ সাধন কবা তাঁহাদের মধ্যে কাহাবও কাহাবও জীবনব্রত হইয়া
দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক সাকার ঈশ্বরের উপাসনা কি সকল অনর্থক
মূল ? মেঘঘুথেব ন্যায়, যাঁহাবা বৈদেশিক শাস্ত্রাস্বাদে বিকৃতচিত্ত স্বশাস্ত্রান-
ভিজ্ঞ অগ্রণীব প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে এ প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা কবা নিবর্থক। তবে প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিসু সমদর্শী ও সহৃদয়
লোকৈ স্থিতিতে এই প্রশ্নাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন, এই
আশয়ে ইহা উত্থাপন কবিতৈছি।

ভূমণ্ডলের সর্বত্রশেই কোন না কোন কালে জড়োপাসনা প্রচলিত ছিল।
এখনও অনেক প্রদেশে উহাব প্রচলন লক্ষিত হয়। সকল সূসভ্য জাতিব

আদ্যন্ত ইতিবৃত্ত পবিজ্ঞাত হইলে, মানবসমাজে যে ক্রমাশয়ে জড়, শ্রীব, পঞ্চভূত গ্রহ, উপগ্রহ, ঈশ্বরজ্ঞানে পুঞ্জিত হইয়া আসিয়াছে, ইহাব অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রমে আদর্শ নব সাফাৎ ঈশ্বর বলিয়া সম্পূজিত হইয়াছেন, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। পবে যে জাতিতে ঈশ্বরোপলব্ধি আবণ্ড বিকশিত হইয়াছে, সেই সেই জাতীয় লোকে, ঈশ্বর বিশ্বসংসার হইতে অভিন্ন, ঈশ্বরই বিশ্বরূপ, অনন্তরূপ এই জ্ঞান লাভ কবিতো সক্ষম হইয়াছেন। অদ্বৈতবাদী শ্রোক্ত ব্রাহ্মণদিগেব ঈশ্বর জ্ঞান এইরূপই ছিল। শ্রষ্টা ও সৃষ্টিব প্রভেদ তাঁহাব স্বীকাৰ কবিতেন না, তাহাবা “সর্বং খলিদং ব্রহ্ম” ভাবিতেন। ইউরোপ খণ্ডে বহুকাল ব্যাপিয়া খৃষ্টধৰ্ম্ম প্রচলিত। খৃষ্টধৰ্ম্মে শ্রষ্টা ও সৃষ্টিব পার্থক্য বিশিষ্টরূপে নির্ণীত হইয়াছে। খৃষ্টধৰ্ম্মাবলম্বী নিকটে জগৎ নশব অনিত্য, ঈশ্বর অবিনশব ও শাস্ত। খৃষ্টধৰ্ম্মে আদর্শ মনুষ্য যে জগদীশ বলিয়া পবিগৃহীত হইয়াছে, তাহাও সহজে অনুভব কবিতো পাৰা যায়। ইউরোপে অধিকাংশ লোকে এখনও খৃষ্টধৰ্ম্মাবলম্বী। সেই জন্য এখনও তাঁহাব দৈতবাদেৰ উত্তাল তবঙ্গে বিঘূৰ্ণিত ও তিতস্তত সন্তাড়িত হইতেছেন। তাঁহাদেব মধ্যে দুই একজন ক্ষণজন্মা পুৰুষ কচিং কখন অদ্বৈতবাদেব বেলা ভূমিনে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছেন মাত্র। সাধাবণ লোকে অদ্যাবদি শবিদৃশ্যমান জগৎ হইতে বিভিন্ন, আদর্শ নবগুণোপেত ঈশ্ববেব উপাসক। ঈশ্বর নিবাকার, তাঁহাব মূৰ্ত্তিৰূপনা মনুষ্যেব অসাপা; তিনি একক ও অদ্বিতীয়, বিশ্ববাস্ত্বে তাঁহাব সমকক্ষ দেবোপদেব বেহ নাই, এ শিক্ষাও খৃষ্টধৰ্ম্মে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবশ্বিধ ধৰ্ম্মভাব যে সব লোকেব চিত্তাধিকাৰ কবিবে তাঁহাবা যে পৌত্তলিকতাৰ উপব খজাহস্ত হইবেন, তাহা আদো বিশ্ববকব নহে।

একণে পৌত্তলিকতাৰ গুণাগুণ বিচাৰ কবিবাব পূৰ্বে, পৌত্তলিকতা কি অৰ্থে বাবহৃত হইয়া থাকে তাহা নির্ণয় কৰা আবশ্যক বোধ হইতেছে। পৌত্তলিকতা “পুত্তলি” পদ হইতে উৎপন্ন। পুত্তলি শব্দে সাধাবণত মূৰ্ম্ময়ী কি ধাতবী জীবমূৰ্ত্তিই সূচিত হয়। এই জন্য প্রথমত ঈশ্বরজ্ঞানে জীবরূপিণী মূৰ্ত্তিৰ পূজা লক্ষ্য কবিয়া যে পৌত্তলিকতা পদেব উদ্ভব হয়, ইহা সহজে অনুমান কবিতো পাৰা যায়। এই জীবমূৰ্ত্তি সকল সময়ে ইঞ্জিয় গ্রাহ্য সমবে প্রাণিপুঞ্জেব অবিকল অনুরূপ, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে যে কল্পনাবলে ঈশ্বরমূৰ্ত্তি সংগঠিত হইয়াছে, তাহাব বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু অদৃষ্ট পূৰ্ণ অভীক্ষিয় কোন জীব বা পদার্থেব বৰ্দ্ধনা মনুষ্য

পক্ষে অসম্ভব । তজ্জন্য জীব জগতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংযোজন করিয়া এক অভূতপূর্ব অভিনব ঐশ মূর্তিব সৃষ্টি ঐশ সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় । ফলত সর্বপ্রথমে যে পৌত্তলিকতার অর্থ, ঈশ্বরের জীবরূপকল্পনা ছিল, ইহাই প্রতীয়মান হয় । কিন্তু কালক্রমে এই শব্দের অর্থ আরও পূর্ণায়বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে জীবরূপসঙ্কল্প পৌত্তলিকতার অপবিহার্য্য অঙ্গ নহে ; স্বভাব বশ কৃত্রিম পদার্থ বিশেষকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিলেই, পৌত্তলিক অভিহিত হয় । ইদানীং শালগ্রাম শিলাও পৌত্তলিকতা । কিন্তু সকল পদার্থেবই, স্তম্ভের হউক, অস্তম্ভের হউক, রূপ আছে ; রূপ পদার্থে একটি ধর্ম্ম মাত্র , রূপহীন পদার্থ অনুমান করা অতীব দুঃসাধ্য । এ কারণে অদ্যাপি পৌত্তলিকতার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের রূপ কল্পনা সূচিত হইয়া থাকে । কিন্তু এতদ্ব্যতীত পৌত্তলিক বলিলে বহুদেবতায় বিশ্বাস এবং বহু দেবতার পূজা অভিযাজিত হয় । পৌত্তলিকতার এ অভিযুক্তি কিরূপে হইল, ইহা স্থির করা নিতান্ত সুকর নহে । যে সমুদয় জাতির মধ্যে মূর্তি পূজার প্রাবল্য পবিদৃষ্ট হইয়াছে, সেই সব জাতির মধ্যেই বহুদেবতার অর্চনা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । এই জন্য মূর্তি পূজা ও বহু দেবোপাসনা সর্বত্র যুগপৎ প্রাদুর্ভূত হওয়ায়, মূর্তিপূজক হইলে বহুদেবোপাসক হইবে, সাধারণ লোকেব মনে এই প্রতীতি জন্মিয়াছে বোঝা হয় । যে ক কারণেই হউক, এখন একেশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক দুইটি বিবোধী পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ।

ইউরোপ খণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচাৰিত হইবার পূর্বে মূর্তিপূজার বিশেষ প্রাদব ও প্রচলন হইয়াছিল । খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিপূজার উপব বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা লক্ষিত হয় । ত্রয়োদশ ও একাদশতম শতাব্দীর সময়কাল অব কোন দেবতা নাই । ইউরোপে সর্ব প্রথমে এ কথা খৃষ্টধর্ম্মই সাধারণ লোকেব কর্ণগোচর করে । “মুশা” এ শিক্ষা ইহুদিদিগকে বহুকাল পূর্বে দিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই । ইহুদিগণ অচিবে পূর্ববৎ দেবোপদেবতার অর্চনে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন , এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের স্মৃতি ঠাহার চিত্ততৃপ্তি জন্মায় নাই । খৃষ্টধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে, একেশ্বরবাদিত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে লোকেব মনে বদ্ধমূল হয় । কিন্তু ইদানীং পৌত্তলিকতার উপব যে ভীষণ ক্রোধ ও ঘোর বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাব উৎপত্তি মহম্মদীয় ধর্ম্মে । মহম্মদেব চিত্ত যে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রসাদে বিস্ফারিত

হইয়াছিল, তাহা তাঁহাব ইহজীবনের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করিলে সর্বিশেষ অবগত হইতে পাবা যায়। অপরাপর বিধর্মীর ন্যায় খৃষ্টধর্মাবলম্বিগণ মুসলমানদিগের নিকটে ঘৃণা ও অসমর্থ্যাদার পাত্র নহেন। তাঁহারা এক অদ্বিতীয় ঈশ্ববেব উপাসক বলিয়া মহম্মদের সমীপে যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছিলেন। মুসলমান ধর্মেরও বীজমন্ত্র এক অদ্বিতীয় ঈশ্ববেব বিশ্বাস। “কোবাইস” সম্প্রদায়ে সাকাব ঈশ্ববেব উপাসনা হইত এবং একাবিক উপাসা দেবতাব পূজা হইত। মহম্মদ নিজে “কোবাইস” সম্প্রদায়ভুক্ত এবং স্বসমাজ হইতে বহু দেবাবাদনা নিবাকবণ কবিবাব জন্য তাঁহাব মুসলমান ধর্ম প্রচাবে প্রথমে প্রবৃত্তি জন্মে। এবস্থিধ ধর্ম যে পৌত্তলিকতাব বিষম বিদ্রোহী হইবে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পাবা যায়। ইতিহাস পাঠে মুসলমানগণ যে পৌত্তলিকতাব উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তাহাব ভূষোভূষঃ প্রমাণ পাওয়া যায়। গনুদায় মূর্তিপূজক জাতিব দেবমূর্তিসমূহ খণ্ড খণ্ড কবিয়া ভগ্ন কবা, মুসলমানদের মধ্যে অতি প্রশস্ত ধর্ম কর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান ধর্মের অভ্যুদয় হইলে মুসলমানদিগেব দৃষ্টান্তানুসারে মূর্তিপূজাব প্রতি বিদ্রোহ চতুর্দিকে প্রসৃত হইতে থাকে; একেশ্বরবাদী খৃষ্টধর্মালম্বীও পৌত্তলিকতাব ভীষণ শত্রু হইয়া উঠিলেন। তাঁহাব ক্রোধাগ্নি ধুমজাল অতিক্রম কবিয়া দীপ্তশিখা মণ্ডিত হইল।

ভাবতবর্ষে পৌত্তলিকতাব প্রতি কাহাবও কোন কালে অভক্তি ছিল কি না সন্দেহ। ভাবতবাসীগণ চিবকালই মনের সূত্রে নানা দেবদেবী পূজা কবিয়া আসিয়াছেন। বিধর্মী মুসলমান ভাবতে বাজ্যেবশ্বর হইলেও, মূর্তিপূজাব অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই। অত্যাচারেব অসন্তোষ ছিল না; কিন্তু বাহ বলে কস্মিন্ কালে কোন জাতিব ধর্মজ্ঞান পবিবর্তিত কবিতে পারা যায় না। কাহাব স্বধর্মে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাভক্তি নাই, তিনিই কেবল অন্য ধর্ম গ্রহণ করিতে পারেন। নতুবা বলপ্রয়োগ কবিলে কেহ কখনও আত্মশব্দপ্রতাপৈতৃক ধর্ম পবিত্যাগ কবেন না। স্বদেশাধিপ বলপূর্বক ধর্মলোপ করিবার চেষ্টা পাইলে, লোকে জন্মভূমিও পবিত্যাগ কবে, কিন্তু স্বধর্মচ্যুত হয় না। মুসলমান নৃপতিকুল ভীষণ অত্যাচার করিয়াও আমাদেব ধর্মের আদৌ হানি করিতে পাবেন নাই। আমবা তখন স্বশাস্ত্রে আত্মবান্ ছিলাম; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে তখন শাস্ত্রবিশাবদ ছিলেন, কেহই তখন বৈদেশিক ভাষা অধ্যয়ন কবিতে গিয়া স্বধর্ম বিস্মৃত হন নাই। স্তোত্রাং মুসলমান

ভূপতিগণের বলপ্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া যায়। পূর্ববৎ আমরা দেবদেবী পূজা করিতে থাকি। কিন্তু ইংরাজ সমাগমে আমাদের মতিগতি অন্যরূপ হইয়া যাইতেছে। বলপ্রকাশ করিয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব দীক্ষিত করা, এক প্রকার অসম্ভব এ জ্ঞান ইংবাজের বিলক্ষণ জন্মিয়াছে। তাঁহারা প্রকাশ্যে আমাদের স্বধর্ম ত্যাগ করিতে কখনও বলেন নাই। কিন্তু ইংবাজী ভাষা শিক্ষা কবা, এখন আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য করিয়া তুলিয়াছেন। আজীবন অনন্যকর্মা হইয়া ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন না করিলে এখন যে কেহ আত্ম পরিবাবের গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। সুতরাং ইদানীং সকলে আজীবন ইংবাজী শিক্ষা করেন; স্বশাস্ত্র মূলে পাঠ করেন না। এইরূপ শিক্ষার ফল অসম্ভাবী ফল, তাহাই ঘটয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই এখন ইংবাজদের চরিত্রচর্চণ গলাধঃকরণে শশবাস্ত।

অতি অল্প লোকেব এখন স্বশাস্ত্রে ভক্তি, শ্রদ্ধা বা অভিজ্ঞতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংবাজি শিক্ষার সমভিবাহাবে আমাদের দেশে বৈদেশিক মত সমূহের সমাদর যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে। পৌত্তলিকতাব প্রতিকূলে এখন যে এই মহা কলোয় উথিত হইয়াছে তাহা কেবল এই জীবন ব্যাপিনী ইংরাজি শিক্ষার গুণে। ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে আমাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা শব্দের ব্যবহার ছিল না। বস্তু যে একদল প্রচ্ছন্ন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লোক জন্মিয়াছেন, তাঁহাবাই প্রথমে এই পদ প্রচলিত করেন বলিয়া, বোধ হয়।

এপর্যন্ত কেবল পৌত্তলিকতাব অর্থ কি, কি প্রকৃতির লোকে উহাব বিবোধী, কেমন কবিয়াই বা আমাদের কৃতবিদাগণ মূর্ত্তি পূজার উপর জাত-ক্রোধ হইলেন, এই সব বিষয় সামান্যত সমালোচিত হইয়াছে। এক্ষণে কি কি আপত্তি উত্থাপন করিয়া, নিবাকারবাদী মহোদয়গণ মূর্ত্তি পূজা পদদলিত কবিত্তে ইচ্ছুক, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা কবিব।

প্রথম আপত্তি এই যে ঈশ্বর নিরাকার; তাঁহাব রূপ করনা অতীব গর্হিত কর্ম্ম। কেন গর্হিত কর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে, নানা প্রকার উত্তর পাওয়া যায়। কেহ বলেন নিরাকার ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্মাণ করিলে জগদীশের অবমাননা করা হয়; আবার কেহ বলেন অনন্ত ঈশ্বরকে সান্ত বলিয়া পূজা করিলে প্রকৃত ঈশোপলব্ধি হয় না। কৃত্রিম শিল্পজ পদার্থকে ঈশ্বর

জ্ঞানে পূজা কবিলে মহা পাপ জন্মে, এ কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কাবণ জগৎ স্রষ্টাকে মানুষ কখনই শিল্প কৌশলে ইচ্ছিমগোচর কবিতে সক্ষম নহে। এইরূপ অনেক বাগ্‌জাল বিস্তার কবিতা ঈশ্বরের রূপ কল্পনা অতীত যুগপ্‌সিত নিবাকার বাদীরা ইহাও প্রতিপন্ন কবিতে প্রয়াস পান। কিন্তু নিবাকার ঈশ্বরের আকার কল্পনা করিলে, কি কাবণে জগদীশের অপমান হইবে, ইহা স্থির বলা নিতান্ত দুঃকর। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেব আকার আছে কিন্তু স্রষ্টাব আকার নাই, নিবাকার হইতে সাকার উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ চিন্তা কবাই মানুষের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু নিরাকার হইতে সাকার জগতের উৎপত্তি স্বীকার কবিলেও, স্বাকার ঈশ্বরের আবোধনা দোষাবহ বলিয়া বোধ হয় না। আমি সাকার জীব, নিবাকার সত্তা আমার চিন্তনীয় নহে! আমি পৃথিবীতে যে সমুদয় পদার্থ অবলোকন করি সকলই আকৃতিবিশিষ্ট। সকল সামগ্রীবই দৈর্ঘ্য প্রস্থ আছে; ব্যাপ্তিহীন সামগ্রী মানুষের অচিন্ত্য। এ স্থলে নিজ শক্তির অসম্ভাববশত আমি পবমেশ্বরের যদি রূপ কল্পনা কবি, তাহা হইলে কেন আমি দোষী হইব? আমার যদি নিবাকার ঈশ্বর চিন্তা কবিবাব ক্ষমতা থাকিত এবং আমি যদি স্বেচ্ছাপূর্বক মূর্ত্তিমান ঈশ্বর নির্মাণ কবিয়া পূজা কবিতাম, তবে আমি নিন্দ্যভাজন হইলেও হইতে পারিতাম। কিন্তু যখন নিবাকার সত্তা চিন্তা করিবার আদৌ শক্তি নাই, তখন সাকার ঈশ্বরের উপাসনা কবিলে আমি কেন দোষী হইব? কেনই বা আমার পূজায় ঈশ্বরের অবমাননা হইবে? বাহ্যিক চক্ষু মুদিত কবিয়া নিবাকার ঈশ্বর পূজনে মনঃসংযোগ করেন, তাঁহারা বস্তুত নিবাকার ঈশ্বরের পূজা কবেন না। ঈশ্বর চিন্তায় সংলগ্নচিত্ত হইলেই মনোমধ্যে সাকার ঈশ্বর সমুদিত হন। দেবভক্ত উচ্ছুসিত হৃদয়ে গীত আরম্ভ করিয়া বলেন “দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে।” যতই কেন নিবাকারবাদী নিবাকার ঈশ্বরচিন্তনে সমাহিতচিত্ত হউন না, তিনি মনশ্চক্রে সৰ্বদা দিব্যমালাস্বরূপ বিশেষরূপে দেখিতে পাইবেন। ভাষা ব্যতীত উপাসনা কি পূজন সম্ভবপর নহে। মৌনাবলম্বন কবিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেও মানুষ চিন্তাবিচ্যুত হইতে পারেন না। চিন্তা করিতে হইলেই ভাষার প্রয়োজন; ভাষা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে রূপ চিন্তা এক প্রকার অপরিহার্য। প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, নিবাকার ঈশ্বরের পূজা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। নিরাকারবাদীরা চক্ষুচক্ষুর দর্শনীয় মূর্ত্তি নির্মাণ কবেন না, কিন্তু মনশ্চক্ষুর

গ্রাছা ঐশ্বর্য ধ্যান করেন। পৌত্তলিকের সহিত তাঁহাদের মূলত বিশেষ ঐক্য আছে। পার্থক্য কেবল নামত।

এ স্থলে আর একটি যুক্তির উদ্ভাবন আবশ্যক বোধ হইতেছে। লোকের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া আমরা “অনাদব” “অপমান” প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করি। তুমি আমার প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছে, আমাকে অপদস্থ ও অপ্রতিভ করিতে পারিলে তোমার স্মৃতি হইবে, এই জন্য তুমি আমাকে অপমান করিতেওঁ প্রস্তুত। তুমি আমাকে অবমাননা করিয়াছ কি না, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আমার প্রতি তোমার মনোভাব কিরূপ ছিল ইহা স্থির করা আবশ্যক। সাকার ঈশ্বর পূজা করিলে নিরাকার ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য সাকার উপাসকের ঈশ্বরের প্রতি মনোভাব কীদৃশ, তাহা নিরূপণ করা অত্যাৱশ্যক। যদি মূর্তিপূজকের চিত্ত ভক্তির-সাপ্রসূত হয়, যদি পৌত্তলিক দেবমূর্তি সম্মুখে তন্ময় হইয়া দেৱা-রাধনা কবিত্তে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাব পূজাবিধি কদাপি প্রকৃত ঈশ্বর-পৰ্যায় লোকেব নিকট নিন্দনীয় হইতে পারে না। ফলত চিন্তাশীল ঐশ-ভক্ত লোকে কখনই মূর্তিপূজা পৰমেশ্বরের অপমানজনক মনে কবেন না। তবে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশিত ও তদগতচিত্ত হওয়া, পূজকেব প্রকৃতির উপব অধিক মাত্রাধ নির্ভর কবে। কি মূর্তিপূজা কি মানস পূজা, উভয়বিধ পূজায় অতন্ত ভণ্ড থাকিবার সম্ভাবনা সমান।

দ্বিতীয়ত অনন্ত ঈশ্বকে সান্ত্বলিয়া পূজা করিলে প্রকৃত ঐশজ্ঞান জন্মে না, এ কথাও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি অনন্ত ঈশ্বকে চিন্তা করিতে পাবেন এবং “নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্ত্বাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ” এ মধুব কথা বলিতে পাবেন, সে মহাত্মা কখনও সায়তন সান্ত ঐশ মূর্তিকে ঈশ্বব ভাবিবেন না। তিনি দৈব প্রতিমাকে ঈশ্ববেব অংশ বা লক্ষণ জ্ঞান করিবেন। সকল সামগ্রীকে মানুষ লক্ষণ দ্বারা আত্ম-হৃদয়ে জাগরুক রাখিতে সতত চেষ্টা পায়। যে সব কৃত্তবিদ্যাগণ অধুনা পৌত্তলিকতার পরম শত্রু বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তাঁহারা ই গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন কালে অবাধে, অক্লিষ্ট মনে অনন্তসূচক সঙ্কেত বাবহার কবিয়াছেন। গণিতশাস্ত্রে সান্ত সঙ্কেত আনন্ত্যবাচক হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু দেবপূজা কালে সান্তমূর্তি ‘অনন্ত ষ্বেবোদ্দেশে নির্মিত হইলেই যত দোষ। এ যুক্তির পক্ষপাতী হওয়া প্রকৃতিস্থ লোকের পক্ষে দুষ্কর। ইংরাজ ঈশ্ব-

গণের এখন যথেষ্ট সমাদর দেখিতে পাই। এই জন্য কোবিদ “কারলাইল” মূর্তি পূজা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তদ্ব্যতীত নিম্নে এক ছন্দ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। “I do is *Idol* a thing seen, a symbol. It is not God but a symbol of a God.” বাস্তবিক চিন্তা করিয়া দেখিলে কেবল সান্ত্বনার অনন্ত অমুভূত হইতে পারে। অনন্ত ঈশ্বরের লক্ষণ স্বরূপ দেবপ্রতিমা, ঈশোপলব্ধির প্রশস্ত উপায়। যাহাবা মূর্তি পূজায় অনন্তদেবোপলব্ধি মূলে সম্ভবপর নহে, এ কথা বলেন, তাঁহাদের উক্তি সর্বথা অগ্রাহ্য।

তৃতীয়ত কৃত্রিম শিল্পজ পদার্থ ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিলে, কেন যে ঈশ্বরের অগৌরব হয়, কেন যে শুক পাপগ্রস্ত হইতে হয়, ইহা নিকপণ করা অতীব কঠিন। মানুষ বাজ্যেশ্বরের প্রীণনার্থ অত্যাশ্রুত উপায়ন আহরণ পূর্ণক রাজ পাদমূলে উপঢৌকন দেন। এ প্রথা হুয্য নহে; কিন্তু বিশ্বরাজ্যেব নিয়ন্তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে মনোমুগ্ধকব কৃত্রিম পদার্থে অধিষ্ঠিত করিলেই মহাপাপ। এইরূপ চিন্তা মনে মনে স্থান দিলে, তর্ক ও মূর্তির বিদ্যায় গ্রহণ কবিত্তে হয়। যাহাকে প্রজ্ঞা, ভক্তি, সম্মান করেন, তাহার তুষ্টির জন্ত মানুষ স্বত প্ররুত হইয়া নিজের প্রীতিকর সামগ্রীই তাহার পরিচর্য্যার্থ উপস্থিত কবেন। সাক্ষর ঈশ্বরের পূজা করিতে হইলে, মানুষ নিশ্চয়ই সুন্দর শিল্পজ মূর্তি প্রস্তুত কবিবেন। ঈশ্বরের চাক মূর্তি সজ্জন মানুষের একটি স্বাভাবিকী ক্রিয়া। এস্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে পৌত্তলিকদিগের সকল দেব মূর্তিই কি নয়ন-তর্পণ? সকল দেবতার মূর্তি এক্ষণে সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যে সামগ্রী অদ্য কুৎসিত ও বিরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে, মাক্কাতার সময়ে যে সেই সমুদ্র সামগ্রী নয়নানন্দকর ছিল না, ইহার কোন স্থিরতা নাই। কালক্রমে যে লোকের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যের জ্ঞান পরিবর্ত্ত হয় তাহাব ভ্রয়োভ্রমঃ প্রমাণ পাওয়া যায়। যে দেবমূর্তি অদ্য ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইতেছে, দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে সেই মূর্তিই সর্জন মনোহর ছিল। এই জন্ত যখন যে দেবমূর্তির সৃষ্টি হইয়াছে তখন যে সেই মূর্তি সুন্দর ও প্রীতিপ্রদ ছিল, ইহাই ধারণা হয়।

এশ রূপ কল্পনার প্রতিকূলে হই একটি প্রধান প্রধান আপত্তির উল্লেখ করিলাম মাত্র। যদি এই সব আপত্তি খণ্ডিত হইয়া থাকে, তবে পৌত্তলিক-তার উপর কাহারও জাতক্রোধ হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু পৌত্তলিক

কেবল মূর্তি পূজক নহেন, তিনি বহু দেবোপাসক বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। এক্ষণে পৌত্তলিকের বহু দেবোপাসনা নিন্দনীয় কি না, ইহাই মীমাংসার বিষয়। পৌত্তলিকদিগের মধ্যে বহু দেব দেবীর অর্চনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেক দেবতার একটী বিশেষ কোন শক্তি থাকে; কোন দেবতাই সৰ্ব্বশক্তিমান বলিয়া সম্পূজিত হন না। যখন আরাধ্য দেব দেবীর মধ্যে ঈদৃশ বিভাগ দৃষ্টি পোচব হয়, তখন এই সমুদয় দেবতাকে সহজেই খণ্ড দেব বলিয়া অনুমান করিতে পাবা যায়। খণ্ড দেবের সমষ্টিই এক অবিভীষ ঈশ্বর। একটা একটা দেব দেবীকে পূর্ণাঙ্গ ঈশ্বর না ভাবিয়া ঈশ্বরের অংশ বিশেষ ভাবিলেই আর পৌত্তলিকগণকে বহু দেবোপাসক বলিয়া, বোধ হইবে না। আংশিক ঈশ্বরের পূজাও হুয্য নহে; কেন না, অংশেব পূজা হইলে সমষ্টিবও পূজা হয়। যে মানুষেব পাদ পূজিত হইল সেই মানুষেরই পূজা হইল, ইহাই অনুভাব্য।

এতক্ষণ কেবল পৌত্তলিকতার বিকল্পে সচরাচর যে সমুদয় আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারি খণ্ডনে নিযুক্ত ছিলাম। এক্ষণে পৌত্তলিকতার যে বিশেষ গুণ আছে, তাহারি উল্লেখ করিব। আমাদের শাস্ত্রকারেরা সকল মানুষেব মেধা সমান ভাবিতেন না। যে কারণেই হউক, মানুষের চিন্তা শক্তির অনেক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য তাঁহারা মানুষেব মধ্যে অধিকার ভেদ স্বীকার করিতেন। ঈশ্বব-জ্ঞান কখনও সকল মানুষেব একরূপ হইতে পারে না। কেহ শিলা খণ্ডে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবেন, কেহ উছাতে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত হন ইহাই ভাবেন, কেহ বা ‘সর্ব্ব খষিদং ব্রহ্ম’ দেখেন। কাহারও ঈশোপলব্ধি দ্বৈতবাদ অতিক্রম করিতে পারিল না, কাহারও বা অদ্বৈতবাদের শাস্তি সলিলে নিমজ্জিত। এতদবস্থায় পৌত্তলিকতার নাম সৰ্ব্বাঙ্গ স্তম্ভ পূজা বিধি আর কি হইতে পারে? বাহার শুদ্ধ মূল মূর্তি চিন্তা করিবার শক্তি আছে, তিনি ঐশ মূর্তি ঈশ্বব ভাবিয়া পূজা করিবেন। যে ব্যক্তি নিজ মেধা গুণে একেশ্বব বাদী হইয়াছেন, তিনি ঐশ মূর্তিকে ঈশ্বরের লক্ষণ স্বরূপ জ্ঞান করিবেন। যে মহাত্মা ঈশ্বরের বিশ্ব-রূপে বিভোর, তিনি দেব মূর্তিতে দেবাংশ দেখিবেন। এমন সৰ্ব্বজনোপযোগী পূজা প্রকরণ আর দ্বিতীয় নাই।

হিন্দু ধর্মের সংস্কার ।

নবীনে আব প্রবীণে প্রীতি এক প্রকাব প্রকৃতি বিরুদ্ধ, তাই বোধ করি, নবীন হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত প্রবীণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মতের একতা হয় না। প্রাচীনেরা চির সঞ্চিত অথচ শিক্ষা মার্জিত সংস্কারের দ্বারা চালিত, নবোরা শিক্ষা সুলভ কর্তব্য জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত। প্রবীণেরা প্রায় পরের মুখে ঝাল খান, কিন্তু নবোরা নিজে পবক না কবিলে স্ব মত প্রকাশ করেন না। নবোরা অন্য ধর্মের সহিত যোগ করিয়া হিন্দু ধর্মের কলম বাধিতে চান; হিন্দু প্রাচীন দল তাহাতে বিকপ—তাহারা স্বধর্মবুদ্ধির কেবল পব গাছা কাটিতে চান। উভয় সম্প্রদায়ই সমাজ সংস্কার করিতে প্রস্তুত আছেন। সংস্কারের পথ পূর্বস্পর্শের পৃথক্—কেহ পূর্বাভিমুখে, কেহ পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত; সূত্রম্ পবস্পর্শের সম্মিলন দুর্লভ। উভয় দলই একস্থানে যাইবাব মানসে যাত্রা করিয়াছেন। অপর যাহারা সেই সংস্কৃত পথে ধর্মস্থানে যাইতে প্রস্তুত, তাহারা বিষম বিভ্রাটে পড়িয়াছে। এখন তাহারা কাহার ক্ষুর মার্গে গমন কবে? অনুযাত্রীগণের এই গোল মিটাইতে যদি পবস্পর্শ প্রীতিপাশে বদ্ধ হইয়া একটি নির্দিষ্ট সংপথে উভয়ে প্রস্থান কবেন, তাহা হইলে সকলেই সুখী হয় এবং উভয় সম্প্রদায়েরই একাকী যাইতে হয় না, সেতো পান। একপ সম্মিলন যে সুখকর এবং ইষ্ট সাধনতাব অনুকূল, তাহা সঙ্ঘ পাঠক মাত্রেই বিবেচনা করিতে পারেন; কিন্তু হতভাগ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের বা মনুষ্য মাত্রেয় জাগ্যে এরূপ সর্বজনীন সম্মিলন বড়ই অসম্ভব। তথাপি সংকার্য্যের চেষ্টা করা কর্তব্য, তাহাতে আর অণু-মাত্র সন্দেহ নাই।

হিন্দুগণের সাম্প্রদায়িকতা পবিচ্ছাব করিবাব জন্য অথবা অন্যান্য কারণে ব্রাহ্ম ধর্মের আবির্ভাব হইল। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, ব্রাহ্ম ধর্ম নৈশব অতীত করিতে না কবিতে গুরুজনের সহিত পৃথক্ হইলেন। তাই আজ উদার ব্রাহ্ম ধর্ম “আদি”, “নববিধান” ও “সাধারণ”—এই ত্রিধা বিভক্ত মূর্তিতে বিরাজ করিতেছেন; সূত্রম্ সাম্প্রদায়িক বিরোধ এক প্রকার প্রকৃতিগত, আমরা সিদ্ধান্ত কবিয়া রাখিয়াছি। এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা স্থির করিয়াছি—প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্মিলন সম্ভ্রতি দুর্ঘট।

গত আষাঢ় মাসেব নবজীবনে “হিন্দু ধর্মের সংস্কার” নামক প্রবন্ধেব লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বাবু “নবজীবনের ভূমিকায় যুদ্ধ হইয়া ভাবিয়া-ছিলেন, “এই বার বুঝি নবীনে ও প্রবীণে প্রীতি হইবে—ইত্যাদি বত স্মৃথ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ফলবতী না হওয়ার মর্মান্বিত হইয়াছেন, হইবারই কথা। একটু আকাশ পবিত্রাব হইবার যো হইয়াছিল। সন্ধ্যা-লেনেব কিবণ অন্ধ মেষাবৃত হইলেও দৈবৎ বিকীর্ণ হইতেছিল, অমনি কোথা হইতে রমেশ মেঘে আকাশ ছাণিয়া পড়িল, সেই সময়ে সকলেব আশা সমূলে উৎপাটিত হইল। অন্ধকার সময় পাইয়া অধিকার বিস্তার করিল। পেচকেরা কোতুক করিতে লাগিল।

ফলত বমেশ বাবুব দ্বারাও আমবা উপকৃত হইয়াছি; সে উপকার কখন ভুলিব না। যিনি ভুলিবেন, তিনি অকৃতজ্ঞ। তিনি যদি নির্জ্ঞাপ প্রায় ধর্ম বহিতে গোঁচা না মারিতেন, কখনই অকস্মাৎ এরূপ জ্বলিয়া উঠিত না। সর্পকে খোঁচা না মারিলে ফোঁস কবে না। যে নবজীবনে বেদ কৃষকেব ভাব-ভোর প্রাণ ভরা সরল সঙ্গীত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই নবজীবনে বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য নব্য শিক্ষিতের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, ইহা সামান্য সৌভাগ্যেব বিষয় নহ। যদি রমেশ এরূপ খোঁচা না মারিতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ পত্রিকা নির্বিশেষে বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য সমর্থিত হইত না। ভগবান বুদ্ধদেব একবার খোঁচা মারিয়াছিলেন। যখন সাধা-বণেব কর্ম-কাণ্ডে আসক্তি, জ্ঞানকাণ্ডে একটু মাত্র ও দৃষ্টি নাই।—কেবল যাগ—গোমেধ, অশ্বমেধ, ছাগমেধ।—যাগে, পূজায়, যধু-পর্কে—সর্বত্রই জীবহিংসা। আব যখন ধর্ম্ম সূত্রে—আত্মাভিমানে পূর্ণ, বৈদিক কার্য্যে—জ্ঞান রহিত কেবল মন্ত্রগত,—অন্তঃকরণে বড় নাই; সেই সময় ভগবান্ বুদ্ধদেব এক খোঁচা মারিয়াছিলেন, আর আশুপ দপ্ কবিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া-ছিল। তাই বলি, যে খোঁচা মারে তার প্রতি আমরা বা আমি বড় সন্তুষ্ট হই। এই যুক্তি মূলে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয়ানেরা আমাদের সন্তোষের পাত্র। মধ্যে মধ্যে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের নির্জ্ঞাপ প্রবণ দশায় এইরূপ খোঁচা খাইয়া অপেক্ষাকৃত সতেজ হইতে হইবে—এই বড় আশ্বপের বিষয়।

পাঠক! পূর্বোক্ত কুজ্বটিকাই “বেদব্যাসের” উৎপত্তির অপন্ন কারণ। সেই অবধি বা তাহার কিছু পূর্বাধি নব্যেব প্রিয়, প্রাচীনেব সম্পূর্ণ অপ্রিয় এবং নবজীবনে বেশী বেশী বাহিব হইতে লাগিল; নব্যদল দলে দলে

দ্বিগুণ উৎসাহে নব্য হিন্দু ধর্ম দিন দিন আকৃষ্ট হইতে লাগিল, নব-জীবন ও প্রচার সৌভাগ্য প্রেমে চিববন্ধ; সুতরাং, প্রচারও নবজীবনের অনুরূপ করিতে লাগিল ইচ্ছা বলা বাহুল্য। যাহা হউক দাদা, ভাই নব-জীবন ও প্রচারের ধর্মকথায় নবোন্নত অনেক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে প্রাচীন বা ভগ্নতাবলম্বীয় মনস্তি ইহল না, তাঁহাদের উপ-যোগী একখানি সংবাদপত্রের প্রয়োজন হইল। এই সমাগমে “বেদব্যাসের” উৎপত্তি। নতুবা “শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের “ধর্ম ও ধর্মের অমুঠাতা” শীর্ষক প্রবন্ধ কাটিয়া ছাটিয়া ছাপা” হওয়াতে বেদব্যাসের সৃষ্টি হয় নাই ৷

রমেশ বাবু বঙ্কিম গীর্ষক প্রস্তাব যে প্রাচীনের নিতান্ত অপ্ৰীতিকর, তাহা সাধারণে অবগত আছেন। এই সম্বন্ধে নবীনের আব্রহীণেব বিবেচনায় সমর্থক অলিয়া উঠিল। চন্দ্রমোহন বাবু লিখিয়াছেন, “সকলেই বুঝিতে পারিলেন, চূড়ামণি মহাশয় এই অছিলায় নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রতিযোগী দল সৃষ্টিব চেষ্টায় আছেন,” এটা কিন্তু তাঁহার নিতান্ত ভুল। পাছে লোকে তাঁহাকে নব জীবনের ও প্রচারের পোষক বিবেচনা করে, এই মানি ভয়ে, বঙ্গবাসীতে ঘোষণা দিলেন, যে, “নবজীবন ও প্রচারের ধর্ম রতের সহিত তাঁহাব কিছুনাত্র সহানুভূতি নাই”।

“বেদব্যাস” সম্পাদক মহাশয়! দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াই “বেদব্যাস ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখপাত্র” বলিয়া পবিচয় দিয়াছেন। লেখক বেদব্যাস ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখপাত্র স্বীকার করিতে বড় নারাজ; কেননা তাহাতে চন্দ্রশেখর বাবুর ও রজনী বাবুর দুইটা মাত্র প্রস্তাব আছে। তিনি জানেন না “ভূয়সা ব্যবদিধ্যাতে”—ভূয়ঃ অংশাঃসারে বস্তুর নাম কীর্তিত হয়। পাঠক দেখিতে পাবেন, বেদব্যাসের অধিক লেখা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকল্প পাশ্চাত্য-শিক্ষিতের, তাই মুখপাত্র বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। বিশেষত চন্দ্রশেখর বাবুর ‘দেবধান’ প্রস্তাব ছাপান কালে এ ঘোষণা দেওয়া হয় নাই। তবে ঘোষণার পরে রজনী বাবুর প্রস্তাব

* অজ্ঞানন্দ মবজীবন সম্পাদক মহাশয় তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধ বে কাটিয়া ছাটিয়া ছাপান নাই, তাহার সন্তোষজনক কৈকিরং দিয়াছেন। অবশিষ্টাংশ তৎকালে প্রকাশ না করিয়া বরং সাধারণের উপকার করিয়াছেন। ও রূপ মর্মভেদি নিষ্ঠুর বাক্য প্রকাশ না করাই উপযুক্ত সম্পাদকের কার্য। আদি লেখকের ঠিক লেখা ভুলিয়ায়।

অঙ্কিত হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে ধর্মতত্ত্ব কিছু নাই, ইহাতে কিছুমাত্র গোড়ামি নাই । এই মাত্র বলিতে পারি, বেদব্যাঙ্গ সম্পাদকের ইচ্ছা, এই পত্রখানি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা পরিচালিত হয় ; সে ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া কঠিন । শর্কশাক্ত বিশাবধ মদধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়লক্ষ্যনন মহোদয় অমূল্য হইয়াও লিখিতে অনিচ্ছুক ; অন্যান্য অধ্যাপকেও এই ইচ্ছা । তাঁহারা হাতে, ঘাটে ধর্ম যজ্ঞাইতে ইচ্ছা করেন না । অনেকের বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যতীত ধর্মের মৌলিকতা রক্ষিত হওয়া কঠিন । যাহারা পূর্ববাহুক্রমে কেবল ধর্মাদোলন করিয়া আসিতেছে, ধর্ম তাহাদের হাতে মাসে জড়িত, এ কথা কে অবিশ্বাস কবে ? তাহারা ধর্মতত্ত্ব লিখিতে বা বলিতে জাহ্নুক বা না জাহ্নুক, অমূল্য কবিতা জানে । এ কথাও বলি, গোবরেও পদ্ম হয়, সূতও ভেল হয় ।

নিরপেক্ষ লেখক যথাসময়ে উপস্থিত বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া আমাদেব অতি মহান্ অপকাবেব মূল উৎপাটন কবিবাব সূত্রপাত কবিয়াছেন । যদি তাঁহার প্রস্তাবে উভয় পক্ষ দলাদলি ঘেঁষাঘেঁষি, বকাবকি পরিহার কবিয়া আপনাদেব গুরুতব কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কবেন, তাহা হইলে সকলই স্থখের ভূমিতে অবতীর্ণ হয় ; নতুবা কেবল শত্রু হাসান মাত্র সার হইবে ।

প্রতি পবমাণু মিশিয়া স্থল পদার্থ হয় । পবমাণু যে যে জাতীয় ও যে যে গুণসম্পন্ন, স্থল পদার্থও অবিকল সেইরূপ হয় । সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি মিলিয়া একটা একটা সম্প্রদায় হয় । তাহাব মধ্যে ব্যক্তিগত যে যে গুণ থাকে, সেই সেই গুণ সম্প্রদায়ে সংক্রান্ত হয় । অর্থাৎ সম্প্রদায়ের দোষ গুণের জন্য প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়ী, তাহাতে আব সন্দেহ নাই । প্রাচীন আব নব্য এই দুইটা মাত্র হিন্দুসম্প্রদায় ধরিলে লেখকও এই দুইএর একটাব অন্তর্ভুক্ত হইবেন । নব্যসম্প্রদায়ের দিকে একটু আন্তরিক টানের আব-ছায়া পরিলক্ষিত হওয়ায়, তাহাকে নব্যহিন্দুসম্প্রদায় বলিয়া নির্দেশ করিতে ইচ্ছা করি । অথবা তিনি না—নবীন—না—প্রবীণ তৃতীয় হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত হউন, তাহাতে ক্ষতি নাই ; তবে এই মাত্র বলি, যে চন্দ্রমোহন বাবু আক্ষ পবম্পরের প্রতি কটাক্ষ করিতে নিষেধ করিতেছেন, এবং উভয়ের ঘৃণা-ধূসি নিবারণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তিনিও বাগ্ পাইয়া ছাড়েন নাই—ঘৃসি ঠেকাইতে গিয়া পাশ কাটিবাব সময় এক ঘৃসি মারিয়া

আসিরাছেন । তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন, “প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর
দেখাদেখি বামা, শ্যামা ও ভূতি তীর্থযাত্রীবাও যেন বা হিন্দুসম্প্রদায়কে সর্বদা
নানাবিশেষণে বিশেষিত করিতেছেন, তন্নিবারণের চেষ্টা করাও তাঁহাদের
উচিত।”

পাঠক ! আমি একজন “রামা, শ্যামা” তীর্থযাত্রী ; সুতরাং আমাব
আঁতে যা লাগিয়াছে ; তাই আজ নিরপেক্ষ লেখককে ২।১ টি কথা বলি-
বার ইচ্ছা করিয়াছি। “দোষাবাচ্য গুবোবপি”—তীর্থযাত্রীবা কোন
ছাব । তাহাদের দোষ সংশোধনেব ছই উপায়—এক তীত্র বিজ্ঞপ বাণ,
অপব গুরু গম্ভীর উপদেশ বর্ষণ । উত্তরবিধই বথাসময়ে উপযোগী । শেবোক্ত
উপায়ই উন্নতমনার আশ্রয়ণীয় । লেখকও এই শেবোক্ত প্রিয়, তাহা
আভাসে আনাইয়াছেন ; কিন্তু নিজেব মহত্ব নিজে বক্ষা কবিতে পাবেন
নাই । তিনি কীলোকীলি থামাইতে গিয়া এক কীল মারিয়া আসিলেন ।
বাছিয়া বাছিয়া গরিবকে মাঝিলেন, তাই কীল কিছু বেশী জোরে বোধ
হইয়াছে ।

উপসংহাবকালে আব একটি কথা বলিরা বেদব্যাসের বিশ্রাম কবি ।
লেখকের মনের ভাব, তীর্থযাত্রীদিগকে প্রথমেই জ্ঞান করা উচিত ; ভবি-
ষাতে তাহারা আর বাড়িতে না পাবে । এই তীর্থযাত্রীদের আত্মপূজা নিবা-
রণ কবিবাব ক্রমতা কোন সম্প্রদায়ের নাই । লেখক যেমন তাহাদিগকে
অধম ভাবেন, বাস্তবিক ততদূর তাহাবা নয় । বিশেষত তাহারা হিন্দুসমা-
জের প্রধান অঙ্গের মধ্যে গণ্য । কালে তাহাদেব দাবাই এই কঙ্কালবশিষ্ট
হিন্দুধর্ম বক্ষিত ও চালিত হইবে । লেখক জানেন কি—“কালে বাণ্ড
পণ্ডিত হয়।” আজ লোকে যে হিন্দুধর্মের বড়াই কবিয়া থাকে, তাহাও
এই জাতির লোকের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল, নতুবা এত দিন কেই হিন্দু-
ধর্মের নাম যাত্রণ শুনিতে পাইত না ।

আমি প্রতিবাদ করিতে এই প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই । চক্রমোহন
বাবুব মন উন্নত, উদ্দেশ্য অতি মহান্, জ্ঞানও প্রবীণবৎ পবিপূর্ণ । তাঁহার
সময়-স্বলভ করণ প্রদর্শন করিবাং জনাই আজ লেখনী দাবণ কবিলাম ।

কে আছে আমার ?

কে আছে আমার ?

এই যে বিশাল ধরা, কত বাজ্য দেশ ভবা
কত জনপদ গ্রাম সংখ্যা নাহি তাব,
কে আছে এ পৃথিবীতে
এ দগ্ধ জলন্ত চিতে
একটু শাস্তনা দিতে কে আছে আমার ?
এত ছুঁখে মনস্তাপে
এত কাঁদি শোক তাপে
এত যে ভাঙ্গিয়া গলা করি হাহাকাব,
অক্ষেপে চাহে না কিবে
কেহই শোনে না কিবে ?
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে অহা কে আছে আমার ?

(১)

কে আছে আমার ? আমি একা—অসহায়,
দেখেছি আমার ছুঁখে
দয়া নাই কাবো বুকে
এক বিন্দু অঞ্জন নাহি এ ধবায় !
দেখেছি খুঁজিয়া ধরা
শুধু নিষ্ঠুরতা ভবা
একটু মমতা স্নেহ নাহি পাওয়া যায় !
খুঁজিয়াছি পৃথিবীবে
অস্থি মজ্জা শিবে শিবে
প্রতি অণু পবমানু রেণু কণিকায়,
একটু মমতা স্নেহ নাহি পাওয়া যায় ।

(২)

কে আছে আমার ? আমি একা--অসহায়,
 যেখানে সেখানে আছি,
 মবি মবি—বাচি বাচি
 সংসার, তোমার তা'তে কি বা আসে যায় ।
 আমি যাই অধঃপাতে
 ক্ষতি কি তোমার তা'তে
 কাঁদে না তোমার প্রাণ পাষণের প্রাণ ।
 ভিখারী ভিক্ষুক বেশ
 ফিবিতেছি দেশে দেশে
 পাইনা একটু দয়া কাঁদিয়া কোথায় ।
 একটা স্নেহের ভাষা
 একটুকু ভালবাসা
 একটা নিশ্বাস দীর্ঘ,—হায হায হায,
 পাইনা একটু দয়া কাঁদিয়া কোথায় ।

(৩)

একাকী সংসারে আমি, কে আছে আমার ?
 ভাই হাবা বন্ধু হাবা
 দেশ ছাড়া লক্ষ্মী ছাড়া
 এমন কপাল পোড়া আছে নাকি আর ?
 আছে কি আমার মত
 অগতে হুঁতরা এত
 'আমার' বলিতে যাব নাহি অধিকার ?
 এমন 'আমার' হাবা
 কোথা আছে আমি ছাড়া
 বিবাত বিশাল বিশ্ব খুঁজে মেলা তার,
 সামান্য পথের ধূলি
 হৃদয়ে লইতে তুলি

সংকুচিত হয় চিত্ত নাহি পাবি আব !
বিশাল বক্ষাণ্ডে আহা কে আছে আমাব ?

(৪)

আমি যেন সংসাবেব কেহ কিছু নই,
জগতে কিছুতে মম নাহি অধিকাব,
ববি শশী সমুদয়
এই যে উদয় হয়
বুচাইয়া সকলেব আঁখি অন্ধকাব,
ইহাবা আমাব তবে
আলো দান নাহি কবে
কে আছে এ সংসাবেব ?—আমি কোন্ ছাব !
এই যে সমীব বহে
আমাব লাগিয়া নহে
তরু তৃণ বল শস্য ধবে না আমাব ।
তবু বেহায়ার মত
দ্রবায় লজ্জায় এত
নিষ্ঠুর জগতে আছি—ধিক্ শতাবাব ।
এত হেয় অবজ্ঞেয় জীবন আমাব ।

(৫)

কেন এ সংসাবে আছি—বাং মমতায় ?
শৃগাল কুকুর ভিন্ন
বান্ধব নাহিক অন্য
শকুনী গৃধিনী মম শেষেব সহায় !
কাকব কর্কশ ববে
সাক্ষনা পাইতে হবে
এই মম পরিণাম, হায় হায় হায়,
কেন এ সংসাবে আছি, কার মমতায় ?

(৬)

কোন কালে ছিঁড়িয়াছে তবেব বন্ধন,
 মিছে সে আশায় আছি
 মিছে সে আশায় বাঁচি
 মিছে শুধু দেশে দেশে কবি অশ্বেষণ !
 এই যে বিশাল ধরা
 এতে নব নারী ভরা
 একটা মিলিল কই মমতা তেমন
 এ দেশে আছে কি তাবা
 পাপিষ্ঠ মানুষ ছাড়া ?
 দেবতা দৈত্যাব দেশে তিষ্ঠে না কখন !
 মিছে শুধু দেশে দেশে কবি অশ্বেষণ ।

(৭)

মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই,
 যবে দেখি তাবে যেয়ে
 শুধুই স্রুধাই গিয়ে
 তুমি কিবে জগবন্ধু জীবনের ভাই ?
 তুমি কি ভগিনী মম
 প্রাণ হতে প্রিয়তম
 পূজনীয়া দেবী সম আমি ঝাঁবে চাই ?
 দেখিলে বালিকা মেয়ে
 মিছে কোলে কবি যেয়ে
 প্রাণেব প্রমদা ব'লে মিছে চুমা খাই ।
 কেহই বলেনা কথা
 কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা
 অনাদবে প্রাণ মন পুড়ে হল ছাই !
 একটুকু ভালবাসা
 একটা স্নেহের ভাষা
 এক ফোটা আশি জল কোথাও না পাই !

সত্যই এ বসুন্ধরা
কেবলি বাহুসে ভরা
দয়াব সে দেবতাবা এ*জগতে নাই !
মিছে শুধু দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই ;

(৮)

মিছামিছি দিবা নিশি কবি অশ্বেষণ,
দেখিয়াছি অনিমেষে
অনন্ত আকাশ দেশে
ওঠে কত রবি শশি গ্রহ তাবা গণ,
খুজিয়াছি পাতি পাতি
সে নব লাবণ্য ভাতি
একটি সারদা নাহি মিলে কদাচন !
একটী ভগিনী ভাই
অনন্ত আকাশে নাই
একটী প্রমদা নাহি তোষে প্রাণ মণ !
ওঠে কত শশী তারা তরুণ তপন !

(৯)

মিছামিছি দিশি দিশি কবি অশ্বেষণ,
উপবনে শত শত
দেখেছি কুসুম কত
কামিনী গোলাপ কুল কবরী কাঞ্চন,
দেখিয়াছি ফুলে ফুলে
কি মঞ্জরী কি মুকুল
সায়দার স্নেহ স্থধা মিলে না তেমন !
ভগিনী ভাইয়ের মত
ভালবাসা নাই তত
সান্নাধ্য সৌরভে নাহি জুড়ায় জীবন !
দেখিয়াছি সরোবরে
কমল কুমুদ ধরে

একটী প্রমদা নাহি কোটে কদাচন !
 মালতী মাধবী জ্ঞাতি
 সূর্য্যামুখী বেলী যুথী
 বকুল বান্ধুলী বক সেউতী বঙ্গন,
 দেখেছি কুসুম কত
 উপবনে শত শত

একটী সাবদা ফুল ফোটেনা কখন !
 দেখেছি বসন্ত কালে ভরা উপবন !
 (১০)

শুনেছি বসন্ত কালে বোকিল কুজন,
 শুনিয়াছি শাখে শাখে
 পাঁপিয়া দহেল ডাকে
 শ্যামার সঙ্গীতে বটে ভুলায় ভুবন,
 দেখিয়াছি যথা তথা
 মৃত তরু মৃত লতা
 মঞ্জবী মুকুলে ফুলে জাগে উপবন !
 কিস্ত এ পার্শ্ব গানে
 সে সূর্য্য পশে না প্রাণে
 সাবদা প্রমদা সূর্য্য ঢালিত যেমন ।
 ভগিনী ভাইয়েব ভাষা
 মিটাইত যত আশা
 কলকণ্ঠে সে লিপাসা হয় না বাবণ,
 শুনেছি বসন্ত কালে কোকিল কুজন !
 (১১)

মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমি অকাবণ,
 দেখেছি গুজিয়া ছায়
 শত যত্নে অঙ্গরায়
 দেবতা ছত্রিশ কোটি স্রববালা গণ,
 অমর ঐশ্বর্য্য চয়
 দেখিয়াছি সমুদয়

দেখিয়াছি কুসুমিত দেব উপবন !
 সাবদা ভগিনী ভাই
 প্রমদা সেখান নাই
 অমর জানেনা আহা মমতা তেমন !
 দেখিয়াছি পরখিয়া
 দেবতাব স্রুধা দিয়া
 প্রাণেব জলন্ত জালা নহে নিবাবণ,
 দেবতা জানেনা আহা মমতা কেমন।

(১২)

মিছামিছি দিশি দিশি কবি অন্বেষণ,
 দেখেছি খুজিয়া স্বর্গ, নিলে বটে চতুর্বর্গ
 মিলে স্রুধ মিলে শাস্তি অনন্ত জীবন '
 দেখিয়াছি অন্বেশিলে
 সালোকা সমুজা মিলে
 মিলে সে নিকরূণ যুক্তি কবিলে সাধন,
 কিন্তু সে ত্রিদিব ধামে
 জনক জননী নামে
 দেবেব দেবতা নাহি মিলে কদাচন,
 কোথা সে পবিত্র ঠাই
 কল্পনায় নাহি পাই
 কোথা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কবিছে পূজন,
 দেবের দেবতা তাবা কোথায় এখন ?

(১৩)

মিছামিছি দেশে দেশে কবি অন্বেষণ,
 ত্রিদিবেও নাহি বাবা,—
 বৃথা খুজি বসুন্ধরা
 কে আছে এমন মূর্ত আমাব মতন ?
 শুধু এ দৈত্যেব দেশে
 মানব মানবী বেশে

কে আছে আমার ?

দানব দানবী আছে ভরিয়া ভুবন !
 করুণা মমতা শূন্য
 নাহি জনে পাণ পুণ্য
 পিশাচ রাক্ষসগুলা কাহাব সৃজন ?
 মিছামিছি দেশে দেশে কবি অন্বেষণ !

(১৪)

কেন এ সংসারে আছি ?—কার মমতায় !
 শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন
 বান্দব নাহিক অন্য
 শকুনী গৃধিনী মম শেষেব সহায় ।
 কাকের কর্কশ হবে
 সাস্ত্রনা পাইতে হবে
 এই মম পবিণাম হায় হায় হায়,
 কেন এ সংসারে আছি, কার মমতায় ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস ।

নবজীবন ।

৪র্থ ভাগ । } আশ্বিন ১২৯৪ । } ৩য় সংখ্যা ।

বিজয়া দশমী ।

ফুরাইল সব ;—হাসি, হর্ষ, মহোন্মাদ,—
জীবন্ত উৎসাহ, বদ্ধ, আমোদ, উচ্ছ্বাস,
শিখিল অঙ্গের গ্রন্থি,
নীরব হৃদয় তন্ত্রী,
অচল ধমনীচয়, অবসন্ন প্রাণ,—
উবেল হৃদয়ে বন্ধু বহে না উজ্জান ।

২

সমাপিত সাউহব শক্তি মহোৎসব,—
জগতী বিষাদময়ী,—শূন্যময় সব ।
ক্ষণিক স্বপন প্রায়,—
সকলি কুবাল হাথ,—
বিহ্বাতের বহ্নিক্রীড়া,—বজ্র নিঘোষন,—
প্রাণেব প্রমত্তভাব, হৃদয়োদ্দীপন ।

৩

বঙ্গের অদৃষ্টাকাশে তিনটি বাসব—
সমুদিত ছিল যেই সুখস্বপ্নাব,—
ববষি আলোক বাশি,
হৃৎথেব তামস নাশি,—
অসুখ—জলদ জালে মিশিল আবার,
বিষাদ নিলয় বঙ্গ পুনঃ অন্ধকার ।

৪

বিসর্জিয়ে শক্তি মূর্তি বিষাদিত মনে,
ফিরিয়ে ভবনে, হার নিবন্ধি নয়নে,—
নাহি সে সুখেব হাসি,
সর্বত্র বিষাদ রাশি,—
ভাসে না হর্ষেব জ্যোতিঃ নয়নে নয়নে—
ভ্রমে না সুখ ষট্পদ প্রাণ-পুষ্পবনে ।

৫

যে মন্দিবে মহাশক্তি ছিল অধিষ্ঠিত,
যে মন্দিব দীপালোকে ছিল আলোকিত,
আজি সে মন্দিব শূন্য,—
অন্ধকাবে স্নান, ক্ষুধ;
নিরখি সে স্নান কক্ষ কেঁদে উঠে প্রাণ,
মন্দিব সূক্ষ্মা শক্তি করেছে প্রস্থান ।

৬

যে প্রাজ্ঞনে অহর্নিশি হাসি হর্ষ বোল—
বাজিত সুকণ্ঠে; যথা শঙ্খ ঢাক ঢোল—
প্রমোদ প্রবাহে মরি,—
হৃদয় আকুল করি,—

গভীর দাপটে ঘন উঠিত বাজিয়া,
হৃদয়ের রক্ত স্রোতে বিদ্যৎ ঢালিয়া,—

৭

ঋত্বিকের প্রাণস্পর্শি মন্ত্র উচ্চারণ
করিত যেখানে সদা, চিত্ত-বিনোদন—
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পায়ে,
'পুত্রান্ দেহী মহামায়ে
সর্বান্ কামাংস্ত দেহী মে' করি নিবেদন,
হৃদয়েব সুপ্ত আশা হ'ত সচেতন,—

৮

আজি সে উৎসব ময় পুজার ভবন,—
 নীরব গাভীরে আছে হসে নিমগন ।
 নাহি সে হর্ষের রোল,
 নাহি বাজে ঢাক ঢোল,
 বিষণ্ণ হৃদয় মাঝে থাকিয়া থাকিয়া,—
 অতীত স্মৃতি উঠিছে জাগিয়া ।

৯

কেন কঁাদ প্রাণ, কেন এত অবসাদ,
 কি হেতু আক্ষেপ এত, কেন এ বিষাদ ?
 সময়ের সিঁদু পায়
 দেখ গিঞ্জ একবার,
 আর্ঘ্য মহাশক্তি মগ্ন হয়েছে কোথাষ,
 আর্ঘ্য বীর্য বহি কোথা নির্ঝাপিত হয় ।

১০

কুরুক্ষেত্র সময়ের বহুকাল পবে,
 ভাবতেব শান্তিশূন্য অনৈক্য আঁধারে,
 রণ মদে দম্ভভাবে
 শাণিত কুপাণ করে,
 প্রবেশিল জয়োন্নত যবন দুর্জীব,
 অত্যাচাবে স্বর্ণভূমি হ'ল ছাব খাব ।

১১

নাশিতে যবন গর্জ কত আর্ঘ্যবীব,—
 সময় অনলে, দিলা আহুতি শবীব,—
 শোণিত প্রবাহে হার,
 ভাসিল ভাবত কাষ ;
 আর্ঘ্যরক্তে স্নেহরক্তে হল মেশামিশি,
 প্রাসিল ভাবত রাজ্য—দুর্ভাগ্যেব নিশি ।

১২

সময় সিদ্ধব সেই বক্তৃতা শ্রোতে,
আর্য্য মহাশক্তি মগ্ন বহু দিন হ'তে
একতা অধ্যবসায়,
সকলি বিনুণ হাৰ,—
শোণিত প্রবাহে ধৌত সুখ স্বাধীনতা,—
অতুল বীৰত্ব ভাতি, তৌর তেজস্বিতা।

১৩

তবে কেন প্রাণ আজি অধীর এমন ?—
মুগ্ধমী প্রতিমা জলে কবি বিসর্জন।
যেই শক্তি প্রাণরূপা

অনন্ত সুখ-স্বরূপা

ভীকব সাহস বীৰ্য্য, দুৰ্জ্জলৈব বদ,
পাতিতৈব ত্রাণকর্ত্রী,—জাতীয় সম্বল,

১৪

সেই শক্তি বিসর্জিয়ে কাল সিদ্ধ জলে,
সমর্পিয়ে প্রাণ মন শত্রু পদতলে—
অগিত জীবন লগে,

দাসত্বের বোঝা বয়ে,

সপ্ত শত বর্ষাবধি বহিষাচ্ছ হায,
হাবায়ে জাত্যাভিমান,—জীবনু ত প্রায়।

১৫

পুনঃ কি সে মহাশক্তি হইবে উদ্ধাব ?—
পুনঃ কি এ দেহে হইবে জীবন সঞ্চাব ?—

আর্য্যসূত মহাভক্ত

দিশে জদয়েব রক্ত

সে জীবন্ত মহাশক্তি পূজিবে আবার ?
হানিবে ভাবত ভূমি, বুচিবে অঁধার ?—

শ্রীশবচন গোষ্ঠীপতি।

পাতঞ্জল যোগসূত্র ।

অথ যোগানুশাসনম্ । ১ ।

পদচ্ছেদঃ । অথ, যোগ-অনুশাসনম্ ।

পদার্থঃ । অথ ইত্যধিকারার্থঃ, যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ,
অনুশাসনম্ শাস্ত্রম্ ।

বাক্যার্থঃ । যোগশাস্ত্রমধিকৃতমিত্যর্থঃ । ইতঃ পরং
যদ্বক্ষ্যে তদযোগবিষয়কমিতি ভেদয়ম্ ।

অনুবাদ । এই সূত্র যোগশাস্ত্রের আবন্তক । ইহার পব যে সকল সূত্র
কথিত হইবে, সকলই যোগের বিষয় জানিবে ।

সমালোচনা ‘যোগ’ শব্দের অর্থ ‘সমাধি’ অর্থাৎ অধ্যাত্মচিন্তায় দীর্ঘকাল
চিন্তের স্থির ভাব । সামান্যত চিন্তের পাঁচ প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়, ক্ষিপ্ত,
মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ । ইহাদিগের মধ্যে বজ্রোপশ্লিষ্টের প্রাবল্য
বশত সৰ্বদা বিষয় লালসায় চঞ্চল চিত্তকে ‘ক্ষিপ্ত’ বলা যায় । যে চিত্ত
তমোগুণের প্রভাবে সৰ্বদাই নিদ্রিত, অর্থাৎ মোহ বা অজ্ঞানে পবিপূর্ণ,
তাহাকে ‘মূঢ়’ বলা যায় । ‘বিক্ষিপ্ত’ চিত্ত ‘ক্ষিপ্ত’ হইতে কিঞ্চিৎ
বিশিষ্ট । ক্ষিপ্ত চিত্ত যেমন বজ্রোপশ্লিষ্টে চালিত হইয়া সৰ্বদা বিষয় বাসনায়
পাগলের মত ছট্‌ফট্‌ করে, বিক্ষিপ্ত চিত্ত সেরূপ নহে । ইহাতে সত্ত্বগুণের
অল্পমাত্র অধিকার থাকায় মধ্যে মধ্যে স্থির হয় । ‘একাগ্র’ চিত্ত এক
বিষয়ে নিবৃত্ত । যেমন বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা স্থির ভাবে থাকে, সেইরূপ
সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হেতুক একাগ্রচিত্ত একই বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া স্থি-
ভাবে অবস্থান করে । যখন চিন্তের সমুদয় বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হয়, কেবল সংস্কার
মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম ‘নিরুদ্ধ’ । এই পাঁচ প্রকার অবস্থার মধ্যে
ক্ষিপ্ত বা মূঢ়াবস্থায় যোগ হইতেই পারে না । কাবণ, ক্ষিপ্তাবস্থায় চিন্তের
স্থিতি নাই । মূঢ়াবস্থায় অজ্ঞান-বাহুল্য ; তাহাতে সবিষয়ের জ্ঞান হয় না ।

সুতরাং দীর্ঘকাল ধরিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তা অসম্ভব । বিক্ষিপ্ত চিন্তের কিঞ্চিৎ স্থিরতা আছে বটে, কিন্তু ঐ স্থিরতা ব্যাপককাল স্থায়ী নহে, স্থিরতা হইতে না হইতেই রঞ্জোগুণের প্রাবল্য হেতুক অস্থিরতা আসিয়া পড়ে । কেবল একাগ্র এবং নিরুদ্ধ এই দুই অবস্থাই যোগের উপযুক্ত । ইহাদের মধ্যে একাগ্র অবস্থায় যে ‘সমাধি’ হয়, তাহার নাম ‘সম্প্রজ্ঞাত ।’ এই সমাধিতে পবমার্থ স্বরূপ ধোয় বস্তুকে প্রকাশিত করে, ক্লেশ সকলের ক্ষয় করে, কর্মবন্ধনদিগকে শিথিল কবে, এবং ক্রমে ক্রমে চিত্তকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধাবস্থায় নীত করে । ‘সম্প্রজ্ঞাত’ শব্দের অর্থ, যাহাতে ধোয় বস্তু সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় । এই সম্প্রজ্ঞাত চারি প্রকার । ‘বিতর্কাহুগত’, ‘বিচাবাহুগত’, ‘আনন্দাহুগত’, এবং ‘অস্মিতাহুগত’ । ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ পবে বলা হইবে ।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিব সময়ে সকল বৃত্তির নিবোধ হয় না । কারণ, সে সময়ে ধোয় বস্তুব সাক্ষাৎকাবিণী বৃত্তি থাকে ; সে বৃত্তিটিও যে অবস্থায় লুপ্ত হয়, উহাকে নিরুদ্ধাবস্থা বলে, এই অবস্থায় যে সমাধি হয়, তাহার নাম ‘অসংপ্রজ্ঞাত’ সমাধি । অসংপ্রজ্ঞাত বলিবাব তাৎপর্য্য, এই অবস্থায় কিছুই বিদিত হয় না ; ধোয় ও ধাতার প্রভেদ জ্ঞান থাকে না, চিত্ত ধোয় বস্তুতে লীন হইয়া কেবল অনিচ্ছাচরিত্র আনন্দে ভোব হইয়া থাকে, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হয় । কিন্তু এ অবস্থাতেও পূর্ক সংস্কারগুলির একেবারে লোপ হয় না । উহারা কোনরূপে অলক্ষিতভাবে চিত্তমধ্যে অবস্থান করে । কারণ, সমাধিভঙ্গেব পূব পদার্থ নিচয়ের পূর্কবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে ।

যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ । ২ ।

পদচ্ছেদঃ । যোগঃ চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধঃ ।

সংক্ষেপার্থঃ । চিত্তস্য মনে বুদ্ধ্যাহংকাররূপস্যান্তঃকরণ সামান্যস্য বা বৃত্তয়ঃ (স্বপ্নদুঃখেচ্ছা বৈষ প্রযত্ন সংস্কাররূপা যে পরিণামাঃ) তাস্য নিরোধঃ উপশমঃ বহির্মুখপরিণতি বিচ্ছেদাদন্তর্মুখতয়া প্রাতিলোম পরিণামেন স্ব স্ব কারণে লয়ঃ ইত্যর্থঃ । ‘যোগ’ আখ্যায়ত ইতিশেষঃ ।

অনুবাদ । চিত্ত শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ, তাহার বৃত্তি সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা .
 ঘেদ চেষ্টা এবং সংস্কার প্রভৃতি পরিণাম ; এই সকল পরিণামের যে নিরোধ,
 নিবৃত্তি, অর্থাৎ বাহ্য বস্তু সঞ্চর রহিত হওয়ায় অন্তর্বীণ ক্রিয়া দ্বারা উহার। যে
 ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার বিপরীত ক্রমে স্ব স্ব কারণে লীন হওন,
 তাহার নাম যোগ ।

সমালোচনা । চিত্তের নাম অন্তঃকরণ । উহা তিন প্রকার ; মন, বুদ্ধি এবং
 অহঙ্কার । এবং উহাতেই বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব হওয়াতে আমাদের জ্ঞানের
 উদয় হয় । উহার স্বরূপ কি, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই ।

ব্যাসদেব বলেন, আমরা চিত্ত বা অন্তঃকরণেব প্রকাশ, প্ররুতি এবং
 স্থিতি অর্থাৎ নিক্রিয়াবস্থা—এই তিন প্রকাব স্বভাব লক্ষ্য করি । ইহাতে
 অনুমান হইতেছে যে, চিত্ত বা অন্তঃকরণ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগু-
 ণাত্মক । যখন উহার প্রকাশ স্বভাব দৃষ্ট হয়, তখন উহা শুদ্ধ সত্ত্বগুণময় । ঐ
 সত্ত্বময় চিত্ত রজঃ এবং তমঃ এই উভয় গুণেব দ্বারা সংশ্লিষ্ট হইলে, ঐশ্বর্য্য
 (অলৌকিক শক্তি বিশেষ) এবং বিষয় (সাধারণ ভোগ্য বস্তু) এই উভয়কে
 ভাল বাসে । আর কেবল তমোগুণ সংযুক্ত হইলে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য
 এবং অনৈশ্বর্য্য এই সকল প্রিয় বলিয়া বোধ করে । চিত্তের মোহরূপ আব-
 বণ ক্ষীণ হইলে, কেবল অল্পমাত্র রজোগুণের এক বিন্দু সম্পর্ক থাকিলে, ধর্ম্ম,
 জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য এই সকলে চিত্ত উপগত হয় ; আব ঐ রজো-
 গুণেব সম্পর্কটুকু অপগত হইলে, চিত্ত আবার স্বরূপে অবস্থিতি করে ; তখন
 বুদ্ধি ও আত্মার স্বরূপ জ্ঞান মাত্র ইহার বৃত্তি হয় ।

উপরে চিত্তেব স্বরূপ বাহা উক্ত হইল তাহাতে জানা গেল যে চিত্ত
 ত্রিগুণময়, এবং যখন যে গুণেব আধিক্য হয়, তখন উহা তদনুগামী
 হয়, কাজেই সর্বদা পরিবর্তনশীল । বজোগুণেব আধিক্য হইলে
 সুখ দুঃখাদি বিষয় লাভে প্ররুত হয় । তমোগুণেব উদ্রেক হইলে
 হিতাহিত জ্ঞানের লোপ হওয়ায় সর্বদা অহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং
 সত্ত্বের আধিক্য হইলে কেবল স্বথের সাধনে প্রবৃত্ত হয় । এই পরিবর্তনশীল
 চিত্তে বাহ্য বস্তু নিচয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া উহার নানাবিধ পরিণাম,
 সুখ, দুঃখ, ইত্যাদি উৎপন্ন করে । ঐ সকল পরিণামেব নাম বৃত্তি । বৃত্তি

সকল নানা প্রকার । কোন বৃত্তি কেবল ক্লেশজনক, কোন বৃত্তি আনন্দ জনকও হয়, কিন্তু কোনরূপ বৃত্তি স্থির স্তরের কাবণ নহে ।

ক্রমশ অভ্যাস দ্বারা ঐ বৃত্তি গুলির নিবৃত্তি করাব নাম নিরোধ । বৃত্তিব নিবোধ কবিতে হইলে অগ্রে ইন্দ্রিয়দিগকে বাহ্য বস্তু হইতে নিবৃত্ত কবিতে হয় । তাহাব পব ইন্দ্রিয় এবং মনের সম্বন্ধ পৃথক কবিতে হয় । এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৃত্তি সকল লীন হয় ।

সূত্রে ‘বৃত্তি নিবোধ’ মাত্র বলিয়াছেন, ‘সর্ববৃত্তি নিরোধ’ বলেন নাই । এই নিমিত্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও যোগশব্দের বাচ্য হইল । যদি সর্ববৃত্তি নিবোধ বলিতেন, তাহা হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি যোগশব্দের বাচ্য হইত না । কাবণ সংপ্রজ্ঞাত সমাধিব সময় বুদ্ধি ও আত্মার স্বরূপ জ্ঞানবৃত্তি চিত্তে অবস্থান কবে । যদি বল সম্প্রজ্ঞাতই যোগের চরমসীমা হউক, সকল বৃত্তি নিবোধরূপ যোগের আবশ্যকতা কি ? ইহার উত্তর এই যে বৃত্তি-মাত্রই ত্রিগুণাত্মক এবং পবিণামিনী, সূতবাং উহা স্থিৰ আনন্দের হেতু হইতে পারে না, এই নিমিত্ত তাবং বৃত্তিবই নিবোধ আবশ্যক ।

চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণময় ; কাবণ ইহাতে নব্বু গুণেব ধর্ম ‘প্রকাশ’ অর্থাৎ দর্পণ তুল্য নির্মলতা, রজোগুণেব ধর্ম, ‘প্রবৃত্তি,’ এবং তমোগুণেব ধর্ম ‘অন্ধকার’ এই তিনই লক্ষিত হয় । চিত্তেব পবিণাম অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্তিব নাম বৃত্তি । এই অবস্থান্তর প্রাপ্তি যে কেবল বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পতনে হয়, তাহা নয়, চিত্তেব উপাদান স্বরূপ উপবি কথিত গুণত্রয়ের নানাধিক্য বশতও ঐরূপ অবস্থান্তর ঘটয়া থাকে । যে চিত্তে সত্ত্বগুণের আধিক্য তাহার বৃত্তি সকল সুখময়, ধর্মপ্রিয়, বৈরাগ্য-প্রধান; বাহাতে রজোগুণের প্রাবল্য তাহার বৃত্তি সকল ইচ্ছা-প্রধান, চেষ্টা-বহল, এবং ঐর্ষ্যাসক্ত ; এইরূপ তমোগুণের আধিক্য হইলে চিত্তের বৃত্তি সকল পাপময়, দুঃখপূর্ণ, শোকাকুল হয় । ফলত চিত্তের তাল অবস্থাও বৃত্তি এবং মন্দ অবস্থাও বৃত্তি । এই বৃত্তি সকলের উপশম হইয়া চিত্ত যখন নির্বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যখন সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা চেষ্টা কিছুই না থাকে, তাহার নাম যোগ । সম্পূর্ণ যোগ হইলে চিত্তে কেবল শুদ্ধচৈতন্য রূপ আত্মার প্রতিবিম্ব নিপতিত হওয়ায় চিত্তও আত্মার সহিত ঐক্য রূপ ধারণ করে ; আত্মাও

যেমন সুখ দুঃখ রহিত, কেবল চৈতন্যস্বরূপ, চিত্ত ও তাদৃশ হয়। তখন আত্মা ও চিত্তের বিবেক অর্থাৎ প্রভেদ জ্ঞান থাকে না। ইহাই যোগের চতুর্থ অবস্থা। ইহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। কেহ কেহ ইহাকেই ব্রহ্মানন্দ বলেন। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার যে গ আছে, তাহাতে চিত্তের অপর বৃত্তি সকলের উপশম হয় বটে, কিন্তু একটিমাত্র আত্মা ও বুদ্ধির বিবেক রূপ বৃত্তি থাকে। পূর্বের রজঃ ও তমোগুণের সংশ্রব থাকিতে অহঙ্কার উৎপন্ন হওয়ায় আত্মা নিজ প্রতিবিম্বযুক্ত চিত্তকে আমি বলিরা জানিত। ক্রমে রজঃ ও তমোগুণের ক্ষীণতা এবং সত্ত্বের প্রাবল্য হওয়ায় সেই ভ্রমজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যে অবস্থায় বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হয়, যে অবস্থায় বুদ্ধি জড় ও পৰিণামী, এবং আত্মা চৈতন্য ও অপরিণামী, এইরূপ বিবেকমাত্র থাকে, আর কোন বৃত্তি থাকে না, উহাও যোগ। উহাব নাম সম্প্রজ্ঞাত যোগ। এক্ষণে তৃতীয় স্তরের ব্যাখ্যা লিখিতেছি।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্ ॥ ৩ ॥

পদচ্ছেদঃ। তদা, দ্রষ্টুঃ, স্বরূপে, অবস্থানম্।

পদার্থঃ। তদা, তন্মিন্ন সময়ে, অসম্প্রজ্ঞাত যোগকালে ইত্যর্থঃ। দ্রষ্টৃদর্শকস্য, চিত্তিশক্তেঃ, পুরুষস্য, আত্মনঃ, স্বরূপে নিজপ্রকৃতি, নির্বিষয় চৈতন্যমাত্রো। অবস্থানং স্থিতির্ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। যদা অসম্প্রজ্ঞাতো যোগঃ সিধ্যতি তদা উৎপন্ন বিবেক ব্যাভেদে পুরুষস্য আত্মনঃ কর্তৃত্বাভিমাননিরন্তো, প্রোক্ষ্মুক্তপৰিণামায়াঃ বুদ্ধাবাস্ত্বানঃ স্বরূপেণাবস্থানং স্থিতির্ভবতি।

অনুবাদ। 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি' সিদ্ধ হইলে তখন চৈতন্য আত্মা বৃত্তি-শূন্য চিত্তে শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপে অবস্থান করেন। তখন তাহাতে আর কোন রূপ কর্তৃত্বাদি অভিমান থাকে না।

সমালোচন। পূর্বে আত্মা এবং বোধের স্বরূপ কথনের সময়ে ইহা বলা হইয়াছে যে, আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, পৰিবর্তন-শূন্য, অর্থাৎ বরাবর এক রূপই থাকে। ইহাতে বাহ্য বস্তু এবং নিজ প্রতিবিম্বযুক্ত চিত্তের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া জ্ঞান ও অভিমান উৎপন্ন করে। যেমন ফটিক মণি বা নির্মল কাচের নিকট জ্বাপুস্প বা কোনরূপ বজ্রিল পদার্থ

অনীত হইলে ঐ ক্ষটিক মণি বা কাচ সেই জ্বাপুস্প বা রঙ্গিল পদার্থের যন্ত্রে রঞ্জিত হয়, সেইরূপ বিগুহ্ব চৈতন্য স্বরূপ আত্মার সম্মুখে বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্ববৃত্তি উপস্থিত হইয়া আত্মাকে স্বীয় রঙ্গে রঞ্জিত করে। বুদ্ধি-স্থিত বস্তু সকল আত্মার নিম্নেই বলিয়া ভাসমান হয়। এইরূপে বুদ্ধির বৃত্তি সকল আত্মাতে প্রতিফলিত হওয়াতে আত্মার কৰ্ত্তৃত্বাদি অভিমান, স্মৃতি, হৃৎ ও নানাবিধ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। আবার যেমন ঐ ক্ষটিক বা কাচের সম্মুখ হইতে সেই জ্বাপুস্প বা রঙ্গিল পদার্থ দূরে অপনীত করিলে উহা স্বীয় নির্মল স্বরূপে অবস্থান করে, সেইরূপ বুদ্ধি যখন বৃত্তি-শূন্য হইয়া নির্মল ভাব ধারণ করে, তখন আত্মাও স্বীয় নির্মল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। উহাতে কোন রূপ বৃত্তির প্রতিবিম্ব থাকে না। বুদ্ধি ও আত্মা এক ভাবই ধারণ করে।

বৃত্তি সাক্ষ্যপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

পদচ্ছেদঃ । বৃত্তি-সাক্ষ্যপ্যম্, ইতবত্র ।

অর্থঃ । ইতবত্র (বাথানে, অসমাধিদশায়ামিতি শেষঃ), বৃত্তি-সাক্ষ্যপ্যম্ (চিত্তেন সহ আত্মনঃ বৃত্তৌ সাক্ষ্যপ্যম্, বৃত্তি বিষয়ে চিত্তৈকরূপ-তেত্যর্থঃ) । বৃত্তিভিঃ সাক্ষ্যপ্যমেকরূপতেতি কেচিৎ ।

ভাবার্থঃ । যোগাদন্যাম্বিন কালে চিত্তস্য যাদৃশ্যো বৃত্তয়ঃ স্মৃতি হৃৎ মোহাশ্রিকাঃ প্রাচুর্যবন্তি, আত্মনোহপি তাভিবিলক্ষণাঃ সমানরূপা ইতি যাবৎ বৃত্তয়ো ভবন্তীতি ভাবঃ ।

অনুবাদ । যোগভিন্ন অবস্থায় চিত্তেই যাদৃশ বৃত্তি হয়, আত্মারও তাদৃশ বৃত্তি হইয়া থাকে। চিত্ত ও আত্মার একরূপতা উভয় অবস্থাতেই তুল্যভাবে হইয়া থাকে। অর্থাৎ, সমাধি সময়েও চিত্ত ও আত্মার যেমন একরূপতা হয়, সমাধির অতিরিক্ত সময়েও চিত্ত ও আত্মার তেমনই একরূপতা হয়। ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, সমাধি সময়ে চিত্ত আত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এবং সমাধির অতিরিক্ত সময়ে আত্মা চিত্তের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

সমালোচন । যদি কেহ একরূপ আশঙ্কা করেন যে, তুমি বলিতেছ, চৈতন্য অপরিণামী, তাহার একই রূপ, কখন পরিণাম হয় না, আবার

বলিতেছ, অসম্প্রজ্ঞাতাবস্থায় (যে অবস্থায় সমুদয় বৃত্তির নিবোধ হয়) চৈতন্য আপনার স্বরূপে অবস্থান কবে। ইহা দ্বারা এই সিদ্ধ হইল যে, তাদৃশ সমাধি ভিন্ন, অন্য সময়ে চৈতন্যের অন্যান্যরূপ অবস্থা থাকে। তবে তাহাব অবস্থান্তব আছে। যাহাব অবস্থান্তব হয় সেই তো পরিণামী। ইহাব উত্তবে বেদব্যাস বলিয়াছেন, চৈতন্যের, কি সমাধি অবস্থা কি অন্য অবস্থা, সকল সময়েই এক রূপ। উহাব কোন সময়েই কিছুমাত্র পবিবর্তন বা বিকৃতি হয় না। তবে সমাধিভিন্নাবস্থায় চৈতন্য অন্যান্যরূপ লক্ষিত হয় কেন, তাহা বুঝাইবাব জন্য মহর্ষি পতঞ্জলি উপবি উক্ত চতুর্থ সূত্রের অবতারণ কবিয়াছেন।

সমাধিভিন্নাবস্থায় চৈতন্য অন্যান্যরূপে লক্ষিত হয় কেন? ইহাব প্রতি ভাষ্যকার হেতু নির্দেশ কবিয়াছেন ‘দর্শিতবিষয়ত্বাৎ’। যোগাতিবিক্তাবস্থায় বুদ্ধি আপনাতে উপস্থিত বিষয় সকল আত্মাতে প্রতিবিম্ব রূপে নিহিত কবে, তাহাতেই আত্মাব অন্যান্যরূপতা লক্ষিত হয়। এই নিমিত্তই নিম্নপুবাণে বলিয়াছেন ‘গৃহীতানিস্ত্রিযৈবর্থানাঙ্ঘ্রেন যঃ প্রযচ্ছতি। অন্তঃকরণরূপায় তস্মৈ বিখ্যাত্ত্বেন নমঃ’। যে অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত পদার্থ নিচয়কে আত্মাতে অর্পিত কবে, সেই বিখ্যান্যাপী অন্তঃকরণকে নমস্কাব। উপবি উক্ত বিম্বপুবাণেব বচন দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং অবিকাবী বটে, তথাপি বুদ্ধির যে সকল বৃত্তি আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাবাই আত্মাব বৃত্তি। ঐ প্রতিবিম্ব ছায়ার মত আত্মার স্বরূপাচ্ছাদক যাত্র। উহাদ্বারা আত্মাব বিমুক্ত চৈতন্য রূপের কোন প্রকার পবিবর্তন ঘটে না, কেবল সেট সেই বিষয়ে একটু অভিমান উৎপন্ন হয়। ঐ বিম্বরূপ ছঃখনিবৃত্তিই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির ফল। যদি কেহ এমন বলেন যে, ‘আমি সুখী’ বা ‘আমি দুঃখী’ এইরূপ জ্ঞান বখন আমাদেব হয়, তখন বুদ্ধি সকল আত্মাব নিজেরই পবিণাম বিশেষ বলিতে চাইবে। তদ্বত্তবে বৃত্তিকার বলেন, একথা অতি ভুল, কারণ যদি আত্মার পবিণাম স্বীকার কর, তবে সকল সময়েই আত্মাব ঐরূপ পরিণাম হই, ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে। যে মোক্ষের জন্য এত উদ্যোগ, তাহা ত আব চাইতেই পাবে না।

যদি বল, সকল সময়ে আত্মা একপ পবিণাম হইতে পরে না, ঐকপ পবিণামেব প্রতি আত্ম মনঃ-সংযোগই কাবণ, যখন আত্মা সহিত মনের সংযোগ হইবে, তখনই ঐকপ পবিণাম হইবে। ভাল, এখানে বিচাৰ করিয়া দেখ, আত্মা, মনঃ, এবং এই উভয়েব স যোগ এই তিনকে পাবণামেব হেতু স্বীকাৰ কৰা অপেক্ষা একমাত্র মনই তাদৃশ পবিণামের কাবণ অথাৎ স্বীয় প্রতিবিম্বিত বস্তু সকল আত্মাতে প্রাত বস্তুৰূপে অৰ্পণ কৰে, এইকপ বাললেই হয়।

তবে ‘আমি কৰ্ত্তা’ ‘আমি সূৰী’ এইকপ যে জ্ঞান হয়, সে সবল জ্ঞান ‘আমি সূন্দৰ’ ‘আমি স্থূল’ ইত্যাদি জ্ঞানেব মত ভ্রনকালত। যেমন সৌন্দৰ্য্য বা স্থূলতা দেহেব ধৰ্ম্ম, উহা ভ্রান্তি বশতঃ আত্মাতে আবোপিত হয়, সেইকপ সূক্ষ্ম হুঃখ ও কৰ্কটাদি চিত্তে পবিণাম অহঙ্কাৰ বশতঃ আত্মাতে আবোপিত হয়। দেহ-ভ্রন-আত্মাদীবা যে যুক্ত প্রমাণদ্বারা ‘আমি সূন্দৰ’ এইকপ জ্ঞানকে লাভ বুলিয়া প্রতিপন্ন কৰিয়াছেন, আমাদেব পক্ষেও ‘আমি কৰ্ত্তা’ ইত্যাদি জ্ঞানকে লাভ বলা সেই একই যুক্ত ও প্রমাণ জানিবা। স্মৃতিও বলিয়াছেন ‘প্রকৃতিত্ববচ কথ্যাণি ক্রিয়মাণানি সঙ্কশঃ। যঃ পশ্যতি তথা জ্ঞানমকস্তাবং স পশ্যতি’। যে ব্যক্তি কাৰ্য্য সকল প্রকৃতি কর্ত্তক নিষ্পাদিত বলিয়া জানিতে পাবে, আত্মা যে কৰ্ত্তা নয় ইহা সেই জানে।

যখন বাহ্য বস্তুব জ্ঞান কখন হয়, কখন হয় না, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, বাহ্য বস্তুৰ আকাৰ প্রাপ্তি জ্ঞানেব প্রতি কাবণ, বুদ্ধিই বাহ্য বস্তুৰ আকাৰ প্রাপ্ত হয়, কারণ উহা পবিণামী। ঐ বাহ্য বস্তুৰ আকাৰে পরিণত বুদ্ধি নিম্নলিখিত পৰ্পণস্বরূপ আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন তীব্র বৃক্ষ সকল সর্বোববে প্রতিবিম্বিত হয়। বেকপ আত্মাতে বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত হয়, সেইকপ বুদ্ধিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব অবশ্য স্বীকাৰ্য্য, নতুবা চৈতন্যের জ্ঞান হইতে পারে না। আপনি আপনার জ্ঞান কবিতে পারে না। অতএব বেকপ বাহ্য বস্তু সকল বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় আত্মা ব জেয় হয়, সেইকপ আত্মাও বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া আপনার জেয় হয়।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয়াঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

পবিচ্ছেদঃ।—বৃত্তয়ঃ, পঞ্চতয়াঃ, ক্লিষ্ট অক্লিষ্টাঃ।

পদার্থঃ।—বৃত্তয়ঃ, চিত্তসা পৰিণামবিশেষাঃ ; পঞ্চতয়াঃ, পঞ্চ প্রকাবাঃ ;
পঞ্চাবয়ব ইত্যর্থঃ ; ক্রিষ্টাঃ ক্রৈশ্বাক্রান্তাঃ ; অক্রিষ্টাঃ, তদ্বিপৰীতাঃ ।

স্বার্থঃ।—পূৰ্ব্বোক্তা নিবোধবা বৃত্তয়ঃ বক্ষ্যমাণাঃ পঞ্চতয়াঃ পঞ্চ প্রকারা
এব ক্রিষ্টা অক্রিষ্টা বা ভবন্তি । বৃত্তিকপোহবয়ব্যকঃ, তস্য প্রমাণাদয়োহব-
য়বাঃ পঞ্চ ইতি পঞ্চতয়াঃ ।

ভাবার্থঃ।—বৃত্তলব্ধ বক্ষ্যমাণ প্রমাণাদি পঞ্চাবয়বাঃ । ত : ক্রৈশ্বাবিকাঃ
অক্রৈশ্বাবিকাস্চ । কাশ্চিৎ ক্রৈশ্বং জনয়ন্তি কাশ্চিৎশ্চেত্যর্থঃ । যাঃ ক্রৈশ্বং
জনয়ন্তি, তাঃ রজস্তমোগুণাক্রান্তাঃ, তেন যাঃ ক্রিষ্টা বৃত্তিঃ সা বাজসী,
তামসী বা, যা অক্রিষ্টা সা সাত্বিকী । বহিমূৰ্খচিত্তস্য ক্রিষ্টা বৃত্তিঃ, অন্ত-
মূৰ্খস্য চাক্রিষ্টা । যা ক্রিষ্টা সা পাপাষ সংসাৰায় চ । যা অক্রিষ্টা সা কল্যা-
ণায় যোক্ষায় চ । ভবতি চৈত্ৰো মৈত্ৰোবা কশ্চিৎ সৰ্ব্বেষামেষ তেষাং
বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয়া এব নাধিকা ন ম্না বা । বাহ্য বিষয় দৰ্শনেনাস্তব বিষয়
দৰ্শনেন চ চিত্তমনেক্ষা সংস্কৃত্যে, তে সংস্কাৰা বৃত্তিকপপরিণামানুৎপাদ-
য়ন্তি, বৃত্তরজ্জ সংস্কাৰান জনয়ন্তি । এতচ্চক্রমনিশ' চলতি ।

অমুবাণ।—নিবোধের বিষয়ীভূত বৃত্তি সকল পাঁচ প্রকার, উহাদের
মধ্যে কেহ কেহ ক্রৈশ্ব হেতু অর্থাৎ দুখেব কাবণ আব কেহ কেহ বা অক্রৈশ্ব
অর্থাৎ সুখের কাবণ ।

সমালোচন।—বৃত্তি বিকল্প এবং কত প্রকার ইহা না জানিয়া কিকপে
তাহাব নিবোধ কবিবে । আব বৃত্তি সকল অসংখ্য হইলেও হইতে পাবে,
মহশ্র বৎসব পবমায়ু হইলেও সেই সকল বৃত্তিদিগকে কেহ গণনা করিতে
পাবে কি না সন্দেহ, অতএব সেই অসংখ্য বৃত্তিব নিবোধ কিকপে সম্ভব ।
এইরূপ আশঙ্কাকাবীদিগকে নিবস্ত্র কাবিবাব নিমিত্ত বৃত্তিদিগেব সাধাবণ
লক্ষণ এবং তেদ নির্দেশ কবিয়া পঞ্চম সূত্রেব অবতাবণা কবিয়াছেন ।

বৃত্তি সকল সাধারণতঃ দুই প্রকার লক্ষিত হয়, যথা কওকগুলি ক্রিষ্ট
এবং কতকগুলি অক্রিষ্ট । ক্রিষ্ট দ্বাবা তমোগুণপ্রধান বৃত্তিনিচয়ের, এবং
অক্রিষ্ট বলিতে সত্ত্বগুণপ্রধান বৃত্তিনিচয়েব, গ্রহণ হইয়াছে । এই উভয়
মিশ্রিত রজোগুণপ্রধান ক্রিষ্টাক্রিষ্ট রূপ স্বতন্ত্র আব বৃত্তি নাই ; কারণ
যাহাবা অক্রিষ্ট, তাহাবা সৰ্ব্বদাই অক্রিষ্ট, ক্রিষ্টদিগেব সহিত একত্র অবস্থান

করিয়াও তাহারা স্বীয় অক্লিষ্ট ভাব পবিত্যাগ ববে না। এই রূপে ক্লিষ্ট বৃত্তি সকল অক্লিষ্ট বৃত্তিদিগেব সহিত, একত্র অবস্থান করিয়াও আপনাদি ক্লিষ্ট ভাব পবিত্যাগ করে না, সৰ্বদাই ক্লিষ্ট রূপই থাকে। ফল, যে সকল বৃত্তি হুঃখের কাবণ, তাহারা সৰ্বদাই হুঃখ দান কবে। এইরূপ যাহারা সুখের কাবণ, তাহাদের হইতে সৰ্বদাই সুখ পাওয়া যায়। কখন সুখ এবং কখন হুঃখ দেয়, এরূপ কোন বৃত্তি নাই। কাজেই তমঃ বা সত্ত্বগুণের সহিত রজোগুণের মিশ্রণে আর কোন রূপ স্বতন্ত্র বৃত্তিব উৎপত্তি হয় না। রজোগুণ যখন তমোগুণের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন ক্লিষ্ট বৃত্তি সকল উৎপন্ন হয়; এবং রজোগুণ যখন সত্ত্বগুণের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন অক্লিষ্ট বৃত্তি সমূহেব উৎপত্তি হয়; এবং সত্ত্ব বা তমের সহিত প্রধান রূপে রজোগুণ মিশ্রিত হইলে ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট, এই দুই প্রকার বৃত্তিই আবির্ভূত হয়, এক বৃত্তিব দুইরূপ ধৰ্ম্ম হয় না। বৃত্তি অহুসাবে চিত্তে সংস্কার সকল উৎপন্ন হয়, ক্লিষ্ট বৃত্তি নিচয় ক্লিষ্ট জাতীয় সংস্কার উৎপন্ন কবে, এবং অক্লিষ্ট বৃত্তিবা অক্লিষ্ট জাতীয় সংস্কার উৎপন্ন কবে, এবং ঐসকল সংস্কারেব আবার কখন কখন স্ব স্ব অমূৰূপ বৃত্তি নিচয়কে উৎপাদিত কবে। যে পর্য্যন্ত নিবোধ সমাধি না হয়, সেই পর্য্যন্ত এইরূপ বৃত্তি ও সংস্কারের চক্র বাস্তবিক পৰি-
ভ্রমণ করিতে থাকে। এই জীবনামক বৃত্তি ও সংস্কারচক্রেব গতিবোধ বা একবারে নিবোধই যোগেব একমাত্র উপায়। অক্লিষ্ট বৃত্তিদ্বারা ক্লিষ্ট বৃত্তি সকলেব নিরোধ করিবে, এবং অক্লিষ্ট বৃত্তিদিগকে আবার শ্রেষ্ঠ বৈবাগ্য-
দ্বারা (বাহার বিষয় পবে বলা হইবে) নিরুদ্ধ করিবে। এই বৃত্তি-সংস্কার-
ময় চিত্ত যখন সম্পূর্ণ নিরোধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার অধিকার (Office) শেষ হয়, আব কিছুই কর্তব্য থাকে না; তখন উহা আত্মার সহিত একরূপ হয়, এবং বে পযাস্ত যোগভঙ্গ না হয়, হুঃখ শূন্য হইয়া অব-
স্থান কবে, যোগভঙ্গ হইলে আবার সংস্কার অহুসারে বৃত্তি সকলের উদয় হয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ নিবোধের অভ্যাস বশতঃ সংস্কার সকলের ক্ষয় হইলে চিত্ত একবারেই আত্মার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, আর যোগভঙ্গ হয় না। ঐরূপ মিশ্রিত হওয়াব নামই মুক্তি।

বাস্তব বালিতে হইলে চিত্তের একই বৃত্তি—বিষয়াকারে পরিণাম। ঐ

এক বৃত্তি যেমন বিষয়ভেদে ক্রিষ্ট এবং অক্রিষ্টরূপ ধারণ করে, তেমনি আশ্রয় বা কারণভেদে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারে গণনীয় হয়; সুতরাং বৃত্তি অসংখ্য হইলেও তাহাদেব আকার দুই রকম, ক্রিষ্ট এবং অক্রিষ্ট; আর প্রকার পাঁচ রকম, প্রমাণ, বিপর্যায় বিকল্প, নিদ্রা এবং স্থিতি । এক্ষণে বৃত্তির আকার এবং প্রকার উভয়ই জ্ঞাত হওয়া গেল ।

প্রমাণ বিপর্যায় বিকল্প নিদ্রাস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥

পদচ্ছেদঃ ।—প্রমাণানিচ, বিপর্যায়শ্চ, বিকল্পশ্চ, নিদ্রাচ, স্থিতিশ্চ, তাঃ ।

ভাবার্থঃ ।—প্রমাণবৃত্তিঃ, বিপর্যায়বৃত্তিঃ, নিদ্রাবৃত্তিঃ, স্থিতিবৃত্তিঃ ।

এতাঃ পঞ্চবৃত্তয়ঃ । তাসাং লক্ষণান্যত্র বক্ষ্যন্তে ।

অনুবাদ ।—প্রমাণ, বিপর্যায়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্থিতি এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি ।

সমালোচন, । প্রমাণ, বিপর্যায়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্থিতি এই পাঁচ প্রকার বৃত্তির বিষয় যথাক্রমে বিশদরূপে পবে আলোচিত হইবে । এই নিমিত্ত এস্থলে আব বিশেষ রূপে আলোচিত হইল না । তবে এইমাত্র বলা যাইতেছে যে, যেসকল বৃত্তির উদয় হওয়াতে চিত্ত বস্তুস্বরূপ ঠিক ঠিক জ্ঞানিতে পাবে, ঐ সকল বৃত্তির নাম প্রমাণ । যে বৃত্তি বশত বস্তুকে বিপরীত ভাবে জ্ঞান করা হয়, তাহাব নাম বিপর্যায় । শব্দ আছে অথচ তাহার অভিধেয় বস্তু নাই, যে বৃত্তি বশতঃ ঐক্য শব্দেব বোধ হয়, তাহার নাম বিকল্প । নিদ্রা কি তাহা বোধ হয় বাঙ্গালী পাঠকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না । কারণ বাঙ্গালীর আব কোন বৃত্তি থাকুক বা না থাকুক নিদ্রাটি বিলক্ষণরূপে আছে । পূর্ণানুভূত বস্তুর মানসিক প্রত্যক্ষের নাম স্থিতি ।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

পদচ্ছেদঃ ।—প্রত্যক্ষ—অনুমান—আগমাঃ প্রমাণানি ।

পদার্থঃ—ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবস্তুরূপবাগাং চিত্তস্য তদ্বিষয়া সামান্য বিশেষাণ্যনোদ্বিষধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্, পক্ষে গৃহীত সধক্স হেতু দর্শনেন সাধাস্য সাধনাজ্ঞানা নির্ধারণমনুমানম্ । আগমস্তাপ্তবচনম্ । আপ্তশ্চ

যথার্থ বক্তা । প্রমা অবিসংবাদি জ্ঞানং, অনধিগতভববোধো বা । তৎ-
করণং প্রমাণম্ ।

অর্থঃ ।—উদ্দেশ্য বিধেয় স্থলে লিঙ্গ বচনস্যা তদ্ব্যতিরিক্ত ন্যায়াদিত্তিন্ন
লিঙ্গতা নদোষমাবহতি । প্রত্যক্ষং অনুমানং, আগমঃ এতানি ত্রীণি
প্রমাণানীত্যর্থঃ ।

ভাবার্থঃ ।—এতানি ত্রীণ্যেব প্রমাণানি, এতদন্তিবিচ্ছিন্নানাং পরোক্তানাং
প্রমাণানামেতেষেবাস্তর্ভাবঃ, তথাহ্যুপমানার্থাপত্ত্যাবস্থামানেহস্তর্ভাবঃ, অভা-
বস্য প্রত্যক্ষে, সম্ভবস্য চাস্তবচনে । ঐতিহাস্য প্রমাণামেবনাস্তি ।

অনুবাদ ।—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম এই তিনটি মাত্র প্রমাণ
যথার্থ জ্ঞানের হেতু অথবা অজ্ঞাত পদার্থের স্বরূপ বোধক ।

প্রমাণ শব্দের বুৎপত্তিলব্ধ অর্থ প্রমাণ করণ, অর্থাৎ যাহা দ্বারা প্রমাণ
উৎপত্তি হয় ; কায়েই প্রমাণ অর্থ না জানিলে প্রমাণ শব্দের অর্থ ঠিক ঠিক
জানিতে পারা যায় না । তবেই জিজ্ঞাসা হইল, প্রমা কি ?

আমাদের সাধাবণতঃ দুই প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, প্রমা এবং
ভ্রম । প্রমা শব্দে যথার্থ জ্ঞান, যাহা যেরূপ ঠিক সেই সেই রূপে তাহার জ্ঞান ;
ভ্রম ঠিক ইহা বিপবীত, যাহা যেরূপ নয়, তাহাকে সেই রূপে জ্ঞান ;
গাছকে গাছ, কলসীকে কলসী বলিয়া, জ্ঞানাব নাম প্রমা ; দড়ীকে সাপ,
কিণ্বককে রূপা বলিয়া জ্ঞানাব নাম ভ্রম ।

যে সকল বৃত্তি দ্বারা মনে এই প্রমা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, উহাদিগকে
প্রমাণ বলে । মহর্ষি পতঞ্জলি ঐ বৃত্তি গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত
করিয়াছেন, (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান এবং (৩) আগম ।

প্রত্যক্ষ কি ? এই প্রশ্নেব মোটামুটি একটা উত্তর দিতে হইলে ইহা
বলিলেই হয় যে, ইন্দ্রিয় সন্নির্গতজন্য চিত্তের বাহ্য বস্তুরূপে পরিণাম ।
আর একটু বিশদ করিতে চেষ্টা করা যাউক । চিত্তের বহিঃসংস্পর্শের নিমিত্ত
ইন্দ্রিয়গুলি যেন প্রণালী বা পূলের মত ; যেরূপ গৃহান্তরে প্রজ্জ্বলিত
প্রদীপের শিখা গবাক বা দ্বার দ্বারা বহির্গত হইয়া বহিঃস্থ পদার্থে পতিত
হয়, তাহাকে উজ্জ্বল করে ও তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অন্তর্ভুক্ত
অন্তঃকরণও ইন্দ্রিয় রূপ প্রণালী দ্বারা বাহ্য বস্তুতে নিপতিত হইয়া তাহার

আকার প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত একাকার হয়। চিত্তের এইরূপ পরিণাম ন্য বৃত্তিকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। এই প্রত্যক্ষ বৃত্তি আমাদের প্রমাণ অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপবোধের প্রতি কাবণ। এই নিমিত্ত উহা প্রমাণ। দেখ উক্তরূপে বাহ্যবস্তুর সহিত ঐক্য ভাব প্রাপ্ত অন্তঃকরণ আশ্রয় চৈতন্যে প্রতিনিব্বিত হইয়া চৈতন্যে বাহ্য বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তি করে। 'আমি অমুক বস্তু জানিতেছি' চৈতন্যে এইরূপ বোধ হয়। আমি ইহাব অর্থ আমার চৈতন্যে অমুক বস্তুর অমুক বস্তু জানিতেছে, সহিত ঐক্য ভাব ধারণ করিয়াছে। এইরূপে বাহ্য বস্তুর সহিত ঐক্য ভাব ধারণ করিলেই চৈতন্যে অপরিণামি স্বভাবের যে কিছু ব্যত্যয় হয় না, ইহা পূর্ণেই আলোচিত হইয়াছে। সংখ্যা শাস্ত্রে বৃত্তির বাহ্য বস্তু আকারে পরিণামকেও প্রমাণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রমাণ, একটি বৃত্তিবৃত্তিকপ, অপবটি প্রত্যক্ষ বোধ রূপ। ইহাদের মধ্যে বৃত্তিবৃত্তিকপ প্রমাণ প্রতি চক্ষুদ্বারা ইন্দ্রিয় নিচয়, এবং আত্মবোধ রূপ প্রমাণ প্রতি অঙ্গ বৃত্তিবৃত্তিই কাবণ। আত্মবোধ রূপ প্রমাণ মুখ্য বা চরম ফল।

আমরা এতক্ষণ চিত্তের বাহ্য বস্তুর আকারে পরিণাম সম্বন্ধে বলিয়া আসিলাম, তাহা বলিয়া যেন কেহ এইরূপ বিবেচনা না করেন যে, প্রত্যক্ষের বিষয় কেবল বাহ্য বস্তু। প্রত্যক্ষ বৃত্তিটি ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আমরা 'বাহ্যবস্তু' এই শব্দটির ব্যবহার ব্যবহৃত করিয়াছি। বস্তুত বস্তু মাত্রই প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। আত্মবোধ প্রত্যক্ষ হয়, ইন্দ্রিয় বোধ প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু এই সকল প্রত্যক্ষের প্রতি একমাত্র অন্তঃকরণই কাবণতা। আমরা এই প্রত্যক্ষ বৃত্তিকে ভাল রূপে বুঝাইবার জন্য নীচ কতকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত বচনের উদ্ধৃতি করিলাম।

‘প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিবেদচ।

প্রমার্থীকার বৃত্তীনাং চেতনঃ প্রাভাবধনম্ ॥

প্রতিনিব্বিত বৃত্তীনাং বিষয়োমেয় উচ্যতে :

বুদ্ধয়ঃ সাক্ষিভাস্যাঃ স্যুঃ করণস্যানপেক্ষণাং ॥

সাক্ষাদর্শন কপঞ্চ সাক্ষিঃ সাংখ্য সূত্রিতম্ ।

অবিকাবেণ দ্রষ্টৃঃ সাক্ষিব্যবহাপরে জগুঃ ॥

শুদ্ধ (অবিকারী) চৈতন্য আত্মাই প্রমাতা (প্রমাজ্ঞান বিশিষ্ট) । চিত্তের বস্তু স্বরূপে পবিণামরূপ বৃত্তি নিচেষ্টে চৈতন্যে পতিত প্রতিবিম্বের নাম প্রমা । চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত বৃত্তির বিষয়, অর্থাৎ মূল বস্তুই প্রমেয়, আমা-দেব জ্ঞেয় । বৃত্তিসকল চৈতন্য কষ্টক প্রকাশিত হয় । সাংখ্য মতে চৈতন্য স্বয়ং যখন দৃশ্যের সহিত ঐক্য ভাব ধারণ কবে, তখন উহাকে সাক্ষী বলা হয় । অন্যমতে চৈতন্য যখন কোন রূপ বিকাশ প্রাপ্ত না হইয়া বস্তু সকল দর্শন করেন, তখন তিনি সাক্ষী ।

অনুমান—আমি একটি অন্তঃকরণেব বৃত্তি, দ্বিতীয় প্রমাণ । ইহাও প্রমা বা বস্তুর স্বরূপ নোথেন প্রতি বাদ । । কিন্তু সে প্রমা পূর্বোক্ত প্রমা হইতে অন্যরূপ । ইহাতে ইন্দ্রিয় সন্নিবর্ধন আবণ্যকতা আছে বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ কাবণতা নাই । ইহা দ্বারা পূর্বে পবস্পব নিত্যসম্বন্ধ রূপে বিদিত বস্তু দ্বয়ের মধ্যে একটিকে প্রত্যক্ষ কবিয়া অপবটির সত্তা অবধাবণ কবা হয় । নিত্যসম্বন্ধ শব্দেব অর্থ নিত্যসম্বন্ধ যুক্ত । এখানে নিত্যশব্দে যাহাব কখন নাশ নাই একপ বিবেচনা কবিবেন না, কিন্তু যাবদ্ বা ভাবি, অর্থাৎ যতক্ষণ দ্ব্যর্থ থাকে ততক্ষণ যাহা স্থিতি কবে । যেমন অগ্নি এবং ধূম ইহাবা নিত্যসম্বন্ধ, ইহাদেব পবস্পবেব সম্বন্ধ উভয়েব স্থিতি কাল অবধি । অগ্নিব সৃষ্টিব প্রথম হইতে ধূমেব সহিত উহাব সম্বন্ধ হইয়াছে, এবং যতকাল অগ্নি থাকিবে ততকাল ধূম থাকিবে । যদি পূর্বে আমবা ইহা জানিয়া থাকি যে, ধূম অগ্নিব সহিত নিত্যসম্বন্ধ, যেখানে অগ্নি সেই খানেই ধূম,—যেখানে অগ্নি নাই সেখানে ধূমও নাই, তবে কোন একস্থলে, বস্তুই ঘবে, গোয়াল ঘবে, জ্বালামুখী পর্বতে, অথবা পাটব কলে, দুব হইতে ধোঁয়া উড়িতে দেখিযাই অন্তঃকরণে একটি বৃত্তি বা পবিণামেব উদয় হয় যাহা দ্বারা ‘ঐ স্থানে অবশ্য অগ্নি আছে’ এইকণ বোধ হয়, দুব হইতে ধূম দেখিযা অগ্নিব সত্তা নির্দ্ধাবিত হয় । এস্থলে আমবা দুইটি জ্ঞান দেখিতে পাই, এক ধূমেব জ্ঞান, উহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, কাবণ ইন্দ্রিয়েব সাক্ষাৎ সন্নিবর্ধ জ্ঞাত, দ্বিতীয় অগ্নিব জ্ঞান, উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, যেহেতু অগ্নিব সহিত কোন ইন্দ্রিয়েব সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, অথচ অন্তঃকরণে উহাব সত্তা প্রতিভাত হইতেছে, স্মৃতবাং উহার বোধের নিমিত্ত প্রত্যক্ষ হইতে

একটি অতিরিক্ত বৃত্তি কল্পনা কবিতে হইবে, সেই অতিরিক্ত বৃত্তির ন মই অহুমান । অহুমান শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, প্রত্যক্ষের পব, যে বৃত্তি দ্বারা বস্তু স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় । জগতের যাবতীয় বস্তুই পদস্পর্ষ কোন না কোন রূপে স্পর্ষক দেখিতে পাওয়া যায় । স্পর্ষকও নানা প্রকার, কার্য্য-কারণ স্পর্ষক, আধাব আধেষ স্পর্ষক, বাচ্য বাচক স্পর্ষক, ইত্যাদি অসংখ্য স্পর্ষক সুতরাং বস্তু নিচয়ের পরস্পরবে মধ্যে কোন না কোন একটি স্পর্ষক অবশ্যই বিদ্যমান আছে । সেই স্পর্ষক নিম্নেই অহুমানের মূল সূত্র । যাহার স্পর্ষক জ্ঞান আছে, তিনিই অহুমানে নিপুণ, এবং তাঁহার অহুমান কখনই ব্যভিচারী হয় না । এই স্পর্ষক জ্ঞানকে নৈর্ঘাযিকের ব্যাপ্তিজ্ঞান বলেন । যিনি ব্যাপ্তি স্থির কবিতো অক্ষম, তাঁহা ব ন্যায়শাস্ত্রে অধিকার নাই । যদি আমরা জানি, কার্য্য এবং কাৰণ পদস্পর্ষ নিত্য স্পর্ষক, কাৰণ ভিন্ন কার্য্য কখনই উৎপন্ন হয় না, এবং কাৰণ থাকিলেই কার্য্য অবশ্যস্তাবী, কার্য্য কাৰণের আমবা যখন কেবলমাত্র কার্য্য দেখি, তখন আমাদের অজ্ঞানবশে অহুমান বৃত্তির উদয় হয়, যাহাবা আমবা কাৰণের সত্তাও নির্দ্ধারিত কবি । যদি আমরা জানিতে পাবি যে, মেঘ কাৰণ বৃষ্টি কার্য্য, তাহা হইলে আমবা বৃষ্টিজলের প্রবাহ দেখিয়া অহুমান দ্বারা মেঘের পূর্বসত্তা স্থির কবিতো পাবি । এইকপা জগৎ বচনাক্রম কার্য্য দেখিয়া অহুমান দ্বারা উহাব কাৰণ পদস্পর্ষের সত্তা নির্দ্ধারিত হয় ।

মিসর ।

পূবাকালে মিসরের কিকপ অবস্থা ছিল এবং তৎপবে কিকপ ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া এখন মিসরের দারুণ দুর্দশা হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত কবা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ।

যৎকালে ইউরোপ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, কেবলমাত্র অসভ্য ও বন্য জাতিদিগের এবং হিংস্র জীবজন্তুগণের আবাসস্থান ছিল, তৎকালে মিশর একটি শবল পবাক্রান্ত সমৃদ্ধিশালী স্রসত্তা বহুবিস্তৃত রাজ্য । যীশুখ্রীষ্টের

জন্মের নয় শত বৎসর পূর্বে এই দেশে ফেবো নামে অভিহিত প্রাচীন রাজা-
দিগের কীৰ্ত্তিত্ত্বের চিহ্ন বাক্য বহুৎ বহুৎ পিষামিড্ নির্মিত হয়। এই
দেশে পূর্বকালের লোকেরা ফেড্রিদিয়া, যববিদ্যা, শিল্প শাস্ত্র জ্যোতিষ শাস্ত্র
অতুর্ভূত নানা শাস্ত্র ও বিজ্ঞানাদয়কে বিশেষ পাবদর্শী ছিল।

মিসর হইতে গ্রীক ও রোমেরা একমুখে বিস্তর জ্ঞান শিক্ষা লাভ
করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই দেশ প্রথমে দিগ্বিদ্যী আলেকজান্ডার কর্তৃক
বিজিত হইয়া গ্রীকদিগের অধীন হয় এবং টলেমি নামক এক রাজাদিগের দ্বারা
শাসিত হইতে থাকে। টলেমি দগের শাসন কালে মিসর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ড-
লীর বাসস্থান এবং সভ্যতা বৎসর জ্ঞান বজয়া জগতে পবিগণিত ছিল।
তৎপরে ভুবন বিখ্যাত বাণী ক্রিস্টপেট্রাব যুক্তবৎ এই রাজ্য রোম সাম্রা-
জ্যের অধীন হয়। অতঃপরে রোম সাম্রাজ্যের পতন হইলে এই দেশ উত্তর
আফ্রিকান্স অন্যান্য দেশ সমূহের সহিত ঐক্য লাভ পাইয়া তুর্কীর সুলতান
কালিকদিগের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ হইল, মিসরে মহম্মদ আলী নামে এক
দয়ালু ব্যক্তি তুর্কী কর্তৃক শাসন করিতে নিযুক্ত হন। এই ব্যক্তি অতি
বিচক্ষণ সূচ্যদর্শী ও বাক্য প্রতিভা। ইনি তুর্কীর অধীনতা হইতে মিসরকে
মুক্ত করিতে সাবশেষ যত্নবান্ হন। ইনি অতি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন
যে, তুর্কীর আধিপত্য মিসরের পক্ষে বড় অমঙ্গলের কারণ ও অপায়ের বীজ
স্বরূপ। ইনি অংশে তবৎবিবদ্ধ বা নিশান ও তুর্কীর পবস্পর সহক ছেদন
করিতে উদ্যত হইলেন এবং যাহা পুত্র ইব্রাহিমকে সমসামান্য তুর্কীর সহিত
যুদ্ধ বাতায় প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধ বিশ বৎসর হইয়া নানা দেশ ভয় কবিসা
স্তম্ভিত ৫০ কোশ দূরে উপস্থিত হইলেন। ইনি ইটালী পালার সুলতান
আসফ বিপদ হইতে উদ্ধার পাটবার নিমিত্ত ইটালীর প্রধান প্রধান রাজ্যের
নিকট মিশরশাসন ইত্যাদি এককপ শত্রুতাচরণের কথা কহিলেন। ইটালী-
পীয় রাজ্য হস্তক্ষেপ করিলেন বলিয়াই মহম্মদ আলী যুদ্ধ হইতে বিবৃত হই-
লেন এবং তদীয় অভিষ্ট সিদ্ধি হইল না।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ ইংল্যান্ডের মহম্মদ আলী সুলতানের নিষেধ হইতে
এক অসুখ্যাত্র প্রাপ্ত হন। তদুদ্য তিনি মিসরের রাজ্য পরিচালনা হন

মিশরে তুর্কীর রাজপ্রতিনিধিবাঁশ সংস্থাপনের আদিপুরুষ এই মহম্মদ আলী । মহম্মদ আলী জীবদ্দশায় সুলতান কালিফকে বাৎসরিক বব ৩,২৫,০০০ পাউণ্ড প্রদান করিতেন ।

মহম্মদ আলীর মৃত্যুর পর আর্কাস ও সাবদেব শ সনকালে তুর্কী মিসরে পূর্ববৎ আধিপত্য স্থাপনের নিমিত্ত পুনরায় চেষ্টা করেন । ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আলীর পৌত্র ইস্মায়েল পাশা মিসরের রাজপ্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত হন । শিতামহেব নামক ইস্মায়েল প্রথম তইতেই তুর্কী বহু হইতে নিকৃতি পাইবার প্রয়াস পান । কিন্তু ইস্মায়েল নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করেন । এই সময়ে তুর্কী সাম্রাজ্যের কালিফদিগের নিকট যদি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোন সম্মানসূচক পদ বা ক্ষমতা পাইতে অস্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সুলতানের কাপেট চূষন করিতে হইত । খেয়ার উদ্দিন পাশা নামে টিউনিস নগরের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিয়া তুবক সাম্রাজ্যের উজ্জীব বা প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন । অতি ব্যয় সাধা ও অপমানজনক হইলেও ইস্মায়েল এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । এতদ্বিষয় স্বাক্ষর্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত ব্যয় করিতে ইস্মায়েল কখনই বিচ্যুত কুড়িত হইতেন না । সুলতান কালিফদিগকে অর্থ ও বহুবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া ইস্মায়েল তাঁহাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন । তিনি অনেক গুলি সন্দলভ করেন । ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ এ মে তারিখ হইতে মিসরের রাজকার্য্য স্বাধীন ভাবে সম্পাদন করিবার ক্ষমতা পান । তাঁহার বাংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুষানুক্রমে উক্ত কালে প্রতিনিধি পদাভিষিক্ত হইবে, এই মর্মে তিনি একটি সনন্দ পান । ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যে সনন্দ পান তাহাতে তিনি খিদিব (১) উপাধি পান এবং বাণিজ্যের নিমিত্ত সন্ধি স্থাপন ও ভূম্যাদি সম্প্রদানের ক্ষমতা পান ।

(১) বোধ হয় এস্থলে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, তুর্কীর সুলতান পোর্টি নামে অভিহিত হন । মিসরের প্রতিনিধি খিদিব নামে অভিহিত হন ; মিসরের ও তুর্কী সাম্রাজ্যের কোন কোন স্থলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ পাশা নামে অভিহিত হন এবং মিসরের নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণকে ফেলা ও মিসরনিবাসী খৃষ্টানদিগকে কণ্টস্ বলা হয় ।

ইস্মায়েল মিসরের বাৎসরিক কব ৭,৫০,০০০ তুবস পাউন্ডে পবিত্রিত করেন, তিনি অপক্ষপাতী ও সুবিচারক ছিলেন। প্রজাগণকে সমভাবে পালন কবিতেন ও সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। বিধম্মী বলিয়া তিনি কখন কাহাও প্রতি অত্যাচার কবিতেন না। তিনি গুণবানকে উচিত মত পুঙ্সাব কবিতেন। তচ্ছাশনকালে অনেক বিদেশীয় ব্যক্তি মিসরের বহুবিধ রাজকন্ম নিযুক্ত হয়। ইহাবাই ধনশালী ও ক্ষমতাশালী হইয়া পবে মিসরের কালস্বরূপ হইয়া উঠে।

ইস্মায়েলের শাসনকালে মিসর দেশে যেকপ উন্নতি হয়, বোধ হয়, টলেমিদিগের রাজত্বের পব আর কোন সময় সেকপ হয় নাই। ইস্মায়েল আলেকজাণ্ডিয়া ও অপব অপব নানা স্থানে নানা বন্দব নিম্মাণ কবেন। তিনি বাস্পীয় শকট গমনাগমনের নিমিত্ত মিসরের চতুর্দিকে বেলপথ প্রস্তুত কবেন, মিসরের প্রধান প্রধান নগরে তাড়িতদ্বার্ত্তবহ সংস্থাপন কবেন ও স্থানে স্থানে বৃহৎসেতু নির্ম্মণ ও দীর্ঘিকা খনন কবেন। ইস্মায়েল সূর্য্যক-প্রণালী উদ্ভাটিত কবিয়া পৃথিবীর মধ্যে এক অপূৰ্ণ অভ্যাক্ষ্য কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি মিসর নানা প্রকার নূতন ব্যবসা ও বাণিজ্যেব সৃষ্টি কবেন এবং সৰ্বদাই বিদ্যাশিক্ষা ও সভ্যতাব সকল প্রকার উন্নতিব চেষ্টা কবিতেন। তিনি মিসরে জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় গোবব বৃদ্ধিব প্রথম সূত্রপাত কবন। মধ্য আফ্রিকাব ক্রীতদাস ব্যবসার উন্মূলন করিবাব নিমিত্ত ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা এপ্রেল তাবিখে এক দল সৈন্য তথায় প্রেরণ কবন। ইংলও হইতে উত্তম ও বহুমূল্য জলযান ও তাঁর সকল এই নিমিত্ত আনয়ন কবেন। তাহাব সৈন্য নীলনদী দিয়া নিউবিয়া অতিক্রম কবিয়া খার্তুম পর্য্যন্ত যাত্রা কবে। সাব্ সামুয়েল হোয়াট্বেকাব ইস্মায়েলের নিকট হঠতে পাশা উপাধি গ্রহণ করেন ও এই যুদ্ধযাত্রার সৈন্যদলের অধ্যক্ষ হন।

পূৰ্ণক উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইস্মায়েল বায়কুষ্ঠিত ছিলেন না। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতা অল্পকণ কবিত্তে গিয়া বায় কবিবাব নিমিত্ত ঋণ করিতে থাকন, দুর্ভাগ্য বশত বিদেশীয় গণেব নিকট হইতে ঋণ গ্রহণে তৎপর হইলেন এবং তাহাদিগকে অতিবক্ত স্ৰদ দিতেও সম্মত হইলেন।

এমন কি, সময়ে সময়ে বাৎসবিক সুদের মাত্রা বৎসব কাল মধ্যে আসল ও অতি-
ক্রম করিল। এই ঋণ গ্রহণে ইস্মায়েলের মুখর্তা ও অবিমুখ্যাকাবিতার যথেষ্ট
পরিচয় মিলিয়াছি, এই ঋণই তাঁহার সকল যত্ন বিফল ও শ্রম পণ্ড করিয়াছে।
এই ঋণই তাঁহার বাজচ্যুতিব কাবণ এবং মিসবে মহা অনর্থ ও বিপ্লবের
নিদান। বাস্তবিক ঐ ঋণ গ্রহণকালাবধি মিসব আব পূর্বেব ন্যায় শাসিত
হয় নাই। উত্তমর্ণেরা সুদ না পাইলে ভুলবাব পাত্র নহে। তাহারা
যে রূপ পীড়াপীড়ি কবিত্তে লাগিল, ইখায়েল কোন মতেই তাহাদিগকে
সন্তুষ্ট বাখিতে পাবিলেন না, অগত্যা ইস্মায়েল ছুঁতগা ফেলাগণকে উৎপীড়ন
কবিত্তে লাগিলেন। তাহাদিগেব নিকট হইতে ভবিষ্যতেব বাজস্ব অশ্রিম
আদায় কবিত্তে লাগিলেন কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না।

ইস্মায়েল নানা ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে মিসবেব ভূম্যধিকারীগণকে সম-
বেত কবিয়া (১৮৭৬। ৭৭। ১২ বৎসবেব নিমিত্ত মোবাবিল) নামে একটি
বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি বাজস্ব পূর্নাপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকা অধিক
বদ্ধ কবিলেন এবং দ্রব্যেব মাসুল পূর্নাপেক্ষা অর্দ্ধ পরিমাণে হাস কবিলেন।
ঐ বাব বৎসব অতীত হইলে একটি চিবস্তায়ী নিদিষ্ট বাজস্ব স্থিব করিবেন
বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রজাবাও এইরূপ মুক্তকবী আশায় প্রতারিত
হইয়া অতিবিক্ত সুদে ঋণ গ্রহণ কবিত্তে লাগিল। কিন্তু ঋণ পরিশোধ
কবিত্তে না পাবায় তাহাদেব সকল কর্মই বন্ধ হইলেও তাহাদেব ঐরূপ
শোচনীয় অবস্থাব প্রতি বেহই কটাক্ষপাত কবিল না।

ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় চতুৰ উত্তমর্ণেবা ইউরোপীয় বাজগণেব আশ্রয়
গ্রহণ কবিল। লর্ড বীবনস্ফিল্ড এই সময়ে ইংলেণ্ডেব প্রধান রাজমন্ত্রী।
তিনি অবিলম্বে ফ্রান্সেব সহিত মিলিত হইয়া মিসবেব বাজবার্ষ্যে হস্তক্ষেপ
কবিলেন। ১৮৭৬ অব্দেব আগষ্ট মাসে ইস্মায়েল এক পক্ষে এবং ইংলেণ্ড ও
ফ্রান্সেব বাজনীতিজ্ঞ গোসেন ও জুবেয়াব অপব পক্ষে থাকিয়া একটি বন্দো-
বস্ত কবিলেন। খিদিবেব জ্যেষ্ঠ পুত্র টিউফককেও ইহাতে লিপ্ত হইতে
হয়। খিদিবেব নিজ অধীনে কতকগুলি ডেবা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত
মিশবেব স্থাববসম্পত্তি গুলেব নাম) ছিল। গোসেন ও জুবেয়াব উক্ত
ডেবা গুলি ইস্মায়েলেব নিকট হইতে ঋণ পরিশোধেব নিমিত্ত এক বন্ধক নামা

কবিয়া লন । এক্ষণে ঐ ডেবা গুলি ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে আছে । সেই গুলিতে অনেক কুটীৰ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, ইক্ষুব চাস ও চিনি প্রস্তুত হইতেছে ।

মিসরের ঐক্যপ দুৰ্দশা দেখিয়াও উত্তমৰ্ণগণ ক্ষান্ত হইল না । তাহাদের পরামর্শে চৌদ্দটি ভিন্ন ভিন্ন জাতিব প্রতিনিধি মিলিত হইয়া মিসরে এক নূতন প্রণালীৰ বিচাৰালয় সৃষ্টি কবিতে অন্তমোদন কবেন । ঐ বিচাৰালয়ে ভিন্ন জাতি সংক্রান্ত কেবল দেওয়ানী মকদ্দমাব বিচাবেব ক্ষমতা দেওয়া হইল । বিচাৰকর্তাগণও ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে নিৰ্ব্বাচিত হইল, খিদিব হইতে অতি সামান্য মিসববাসী এবং ইংবাজ, ফরাসী, জৰ্ম্মাণ, রুশ, ও ইতালীয় প্রভৃতি সকলেই উক্ত বিচাৰালয়েব অধীন হইল ।

এইকপে মিসরে বিদেশীয় গণেব বিশেষ প্রতিপত্তি হইতে লাগিল বিদেশীয়গণ ফৌজদারীৰ নিৰ্ম্মিত কোন বিচাৰালয়ে অধীন নহে, তাহাবা কবদান হইতে মুক্ত । এদিকে মিসববাসিগণ কব দিতে মহা কাতর । যে, নূতন দেওয়ানী বিচাৰালয় গুল সংস্থাপিত হইল, সেগুলিও মিসরের প্রান্তভাগে ও মিসববাসিগণের পক্ষে দূববর্তী । তথায় গমন কবিবার পথ খবচ কবাও তাহাদের পক্ষে সহজ নহে । মিসরের ভাষাও উক্ত বিচাৰালয়ে চলিত নহে ।

অল্পকাল মধ্যে মিসরের বানীতিব রূপান্তর হইল । যে খিদিব সকলের শাসনকর্তা তিনি অন্যান্য জাতিব নিকট এক প্রকার অধীন । তাঁহার অধিকাংশ কর্ম্মই বৈদেশিক গণেব মতসাপেক্ষ । দেখিতে দেখিতে খিদিবের নামেও নানা অভিযোগ হইতে লাগিল । তাঁহার নামে ডিক্রী ও তাঁহার সম্পত্তি সকল ফ্রোক হইতে লাগিল । তাঁহাকে আর ঋণ দিতে কেহই স্বীকৃত নহে । তথাচ তিনি পাপ পবিশোধেব নিৰ্ম্মিত বিশেষ চেষ্টা ও নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন ।

কথায় বল “চোরা না শুনে ধর্ম্মেব কাহিনী” খিদিবের কথায় কর্পাপাত করা দূরে থাকুক, উত্তমৰ্ণগণ তাঁহাকে অধিকতর রূপে উদ্ভাস্ত করিতে লাগিল । এত অত্যাচার খিদিব আব সত্য কবিতে পারিলেন না । তিনি সীম মন্ত্রী নিউবর পাশা ও উলসন প্রমুখ বিদেশীয় মন্ত্রীবর্গকে কর্তৃ হইতে চ্যুত করিলেন, এবং উক্ত বিজাতীয় আদালত গুলির ডিক্রীকারী এককালীন বন্ধ কবিয়া দিলেন ।

এখানে নিউবর পাশা স্বয়ংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। এই ব্যক্তি একজন অসামান্য খুশান। ইনি চতুর্ভাষী ও বুদ্ধিমান। সামান্য কেবানীগিহি হইতে মিসরের উচ্চপদ ও বহু ধনসম্পত্তি লাভ করেন। ইনি রাজকর্মে সুদক্ষ এবং ইউরোপীয়দিগের পরম বন্ধু।

ইস্রায়েল পাশার এইরূপ অচরণে ইউরোপীয় রাজগণের অপমান বোধ হইল। বিশেষতঃ অপমান শূল ফরাসী ও ইংল্যান্ড আতিব ক্ষমত্ব বিধ্ব করিল। কোন প্রকাবে প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত তাহারা খিদিবেব ছিদ্রাধেষণে তৎপর হইল। অবশেষে তুর্কী সুলতান আবদুল হামিদ ফাৎস ও ইংলণ্ড কুইন্স অফ দি হীরা ইংল্যান্ডকে প্রচেষ্টা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। সুলতান ইস্রায়েল দত্ত উপঢৌকনগুলি ও ইস্রায়েলের পূর্ণ বৃত্তান্ত বিশ্বিত হইলেন।

১৮৭৯ অব্দেব জুন মাসে কনষ্টান্টিনোপল হইতে তাবযোগে সংবাদ আসিল যে, অতঃপর ইস্রায়েল পাশা খিদিব পদচ্যুত ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র টিউফিক খিদিব পদাভিষিক্ত হইলেন। ইস্রায়েল ১৭ বৎসর মিশর শাসন করেন। তাহার ঋণই সকল অনর্থের মূল। তিনি যে জাতীয় সম্প্রদায়, পালিগামেন্ট ও সেনাদল সৃষ্টি করেন, তাহাতে তাহাব নাম মিশবে চিবস্থায়ী হইবে।

যতকালে টিউফিক পাশা খিদিব পদে অভিষিক্ত হন, তখন তাহার বয়স-ক্রম অধিক নহে। যুবক টিউফিকেব বিষয় বর্ষে বুদ্ধি পরিপক্ব হয় নাই। কোন বিশেষ ক্ষমতা বা জ্ঞানও তাঁহায় ছিল না। তুর্কী সুলতান এক্ষণে তাবযোগ পাইয়া পূর্বে ইস্রায়েলকে যে সকল ক্ষমতা দিয়াছিলেন, তাহা অনাগ্রাসে টিউফিকেব নিবট হইতে বাড়িয়া লইলেন। টিউফিক কলের পুত্তলিকা। কাব ন্যায ফাৎস ও ইংলণ্ড বড়ক চালিত হইতে লাগিলেন। বিদেশীয় শাসন মিশর পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইল। উত্তমর্ণদেব ঋণ প্রতিশোধের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল; কিন্তু বাস্তবিক অর্থ শূন্য; এই নিমিত্ত অনেক রাজকর্ম-চারীও বেতন নষ্ট পড়িল, তদ্বিষয়ে কোন বন্দোবস্তও হইল না।

ফাৎস ও ইংলণ্ডের মিসর শাসনে দৃষ্টক্ষেপ বিববার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য দুইটি—প্রথম—সমগ্র মিসরে স্বশাসন ও শান্তিস্থাপন; দ্বিতীয়—ঋণ পরিশোধের স্ববন্দোবস্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অদ্যাবধি দুইটির একটিও

স্বসিদ্ধ হইল না। ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত নামক একটি আইন ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পরামর্শে টিউফিক মিসরে প্রচারিত করেন। তাহাতে ঋণের সুদ শতকরা ৪ টাকা ধার্য্য হইল এবং ইম্প্রোভেজের ঋণের নিমিত্ত উত্তমর্গগণকে মিসরবাসিগণের ৬০০০০০ পাউণ্ড দিতে হইবে ধার্য্য হইল। ইহাতে পাঁচটি প্রধান ইউরোপীয় বাজ্যেব প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করেন। চাবিবৎসর কাল অতীত হইলে হিসাব হয়। ১৮৮১ হইতে ১৮৮৪ পর্য্যন্ত এই আইনানুসারে যে কার্য্য হয়, তাহার মাসিক ও বাৎসরিক কোন হিসাব হয় নাই। এক্ষণে চাবি বৎসর পাবে প্রকাশ হয় যে, আদায়ের টাকা হইতে ৮০০০০০০ টাকা ঘাটিয়াছে। মিসরবাসিগণের চুংগেব আর সীমা বশি নাই। মিসরের এইরূপ শাসন কার্য্য প্রতিবোধের নিমিত্ত মিসরবাসিগণ সবিশেষ সচেষ্টি হইল।

এই সময় আরবি পাশাব আব্বির্ভাব হয়। স্বদেশানুবাগ তাঁহার অন্তঃকরণ বিদ্ধ কবিল। মিসরের চুংগ দূরীকরণ ত্রুতে তিনি ত্রুতী হইলেন। দেশোন্নতি ও স্বদেশের মঙ্গল সাধনার্থে তিনি মিসরবাসিগণকে দেশভক্তি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। খিদিবের ব্যবহার ও বিদেশীয় দিগের অবিচাব ও পক্ষপাতিত্ব উল্লেখ কবিয়া তিনি মিসরবাসিগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং মিসরের কুশাসন নিবারণে বদ্ধ পবিকর হইলেন। আব্বি পাশা উদাব প্রকৃতি, অকপট ও নত্যবাদী ছিলেন। তাহার গুণে ও ব্যবহাবে মিসরবাসি সকলেই মুগ্ধ হইল। অল্পকাল মধ্যে আব্বিকে মিসরবাসিগণ জাতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান মন্ত্রী ও অধ্যক্ষ কবিল। আব্বিও অপত্য-নির্কিশেষে প্রজাপালন কবিত্তে লাগিলেন। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, তাঁহার পক্ষে সকলেই সমান। তিনি পরোপকারে আত্মোৎসর্গ কবিয়াছিলেন। তাঁহার লোভ ছিল না। উপচোকন স্বরূপে তাঁহাকে কেহ অর্থদান কবিত্তে সাহস কবিত না। তাঁহার সাধুতা, ন্যায়পবতা, ও সূচিচাবের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এক সময়ে আরবী বহু কষ্ট স্বীকার কবিয়া কোন স্ত্রীলোকেব নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করেন। স্ত্রীলোকটি আনন্দমাগরে মগ্ন ও বিস্মিত হইয়া আব্বিকে ১০ একব ভূমি দান কবে। আব্বি এই দান লইতে অস্বীকার কবিয়া তাহাকে এই

বলিষা উক্তব দিলেন যে, তিনি তাহার ধন্যবাদকেই যথেষ্ট পূবক্ষাব মনে করেন ।

মিসরের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সমবেত কবিয়া আর্বি পরামর্শ করিলেন, যে মিশরের রাজস্বের যে অংশেব সহিত উত্তমর্গগণের কোন সংশ্লব নাই, তাহাতে বিদেশীয়গণ হস্তক্ষেপ কবিতে পাবিবে না । ইহাতে বিদেশীয়গণ অসন্তুষ্ট হইয়া টিউফিককে আর্বির কথায় কর্ণপাত কবিতে নিবাবণ কবে । মিসরবাসিগণ আর্বির কথায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইল এবং টিউফিকের উপর তাহাদেব আব কোনও বিশ্বাস রহিল না । যেরূপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ইম্মায়েলকে রাজ্যচ্যুত কবে, তদ্রূপ তাহাবাও টিউফিককে পদচ্যুত করিতে উদ্যত হইল । স্ততরাং মিসবে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল । এই বিপ্লব নিবাবণে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড স্বীকৃত হইল । কিন্তু ফ্রান্স শীঘ্রই কর্মক্ষেত্র হইতে অপস্থত হইল । তুংস্ক হইতেও সেনাপতি আলি নিজামি পাশা, উজির আলি ফোয়াদবে, বিশ্বস্ত কর্মচারী ও দূত কাঙ্গ্রীবে এবং সুলতানের প্রিয়পাত্র আমেদ বাতিব পাশা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মিসরে আগমন করেন । তাহাবা বিদিবকে তুবস্কের অধীনতা স্বীকার করিতে এবং মিসরবাসিগণকে সুলতানের ক্ষমতাধীনে আনয়ন করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন ।

আর্বি পাশা ১৮৮২ শালের প্রাবস্তে জাতীয় সম্প্রদায়ের যুদ্ধসচিব পদে নিযুক্ত এবং অল্পকাল মধ্যে প্রভূত ক্ষমতামালী হইলেন ; মিসরে তুবস্ক প্রাধান্য তিনি কোন মতেই স্বীকার কবিলেন না । তিনি বলেন, মিসবে তুবস্ক সেনা আসিলে, তিনি ইংবাজ অপেক্ষা তাহাদিগের সহিত অধিকতর জিদ্বেব সহিত যুদ্ধ করিবেন । সুলতান কখন আর্বিকে খিদিবেব প্রতি এবং কখন খিদিবকে আর্বিব প্রতি বিপক্ষচরণ কবিতে পরামর্শ দেন ; কিন্তু আর্বির স্বদেশানুবাণ পূর্ববৎ প্রগাঢ় বহিল ; তিনি পূর্বের নায় অচল, অটল বহিলেন ।

সুদানে এই সময়ে মহা গোলযোগ । তথায় মেহেদি নামে একজন জাল পয়গম্বব বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহাবে আগমন পূর্বকরণে মিসর সৈন্য পরাস্ত কবেন এবং সুদান অধিকার কবিয়া খার্তুম নগর অধিকার কবিতে ভয় দেখান । মিসবে আর্বিব শাসন চলিতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে

খ্রিষ্টাব্দেব বাংলা নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। ইংলণ্ড আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করেন এবং ১৮৮২ সালের ১১ই জুলাই আলেকজান্দ্রিয়া সহরজী তোপে উড়াইয়া দেন তাহাতে দুর্গটিও বিনষ্ট হয় এবং প্রায় দুই সহস্র মিনবাসীও প্রাণনষ্ট হয়। আববি বিপদ দেখিয়া নগরে আগুন লাগাইয়া দিলেন, বন্দাগণকে মুক্ত করায় দিলেন এবং অচ্যুতবর্গ লইয়া স্বয়ং অন্যত্র গমন করিলেন। খ্রিদিব গণভণ্ডে এক রুটিশ জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বোম্বাই হইতে এংল ভাংতীয় সেনা এই সময়ে মিসরে পৌঁছিত হয় ১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাঘোলেব নিকট একটি ভূমূল যুদ্ধ হয়, তাহাতে অনেকগুলি রুটিশ সৈন্য হত ও আহত হয় এবং অসংখ্য বহুসংখ্যক সৈন্য নষ্ট হয়। পরিশেষে কেমেলবীনে একটি ঘোবতব যুদ্ধ হয়, তাহাতে আববি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন।

তবন্ধেব পোষ্ট টেলিগ্রাফ সহিত মিলিত হইয়া এই সময় আরবি ও তাঁহার অচ্যুতবর্গকে বিদ্রোহী (৭) নির্দেশ করিয়া এক ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। সার্গার্নেট উইলসলিও মিসরে ইংলান্ডের অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে কেবল খাদ্যের ক্ষমতা দৃঢ় করিয়া রাখেন কনিব নিমিত্ত এইরূপ একটি ঘোষণা পত্র মিসরে প্রচার করেন।

আববি ধৃত হইলেন। কোর্টমার্শালে তাঁহার বিচার হইয়া তৎপ্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। কিন্তু খ্রিদিব তৎপরিবর্তে তাঁহাকে চিবকল মিসরের বহির্দেশে এবং ইংলান্ড রাজ্য মধ্যে বাস করিতে হইলে, বলিয়া নির্দেশনেন আজ্ঞা দিলেন। খ্রিষ্টীয় ১৮৮৩ সালের ১০ই জানুয়ারি তাবিথে মেরিওটিস নামক জাহাজ কর্তৃক আববি সিন্ধল দ্বীপে আনীত হন, তদবধি কলকাতা নগরে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল।

ইউরোপীয় প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র মধ্যে এই সময়ে মিসর সম্বন্ধে নানা মুনিব নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ইংলণ্ডকে মিশর স্বাধীন করুক কবিত্তে যুক্ত দেন, কেহ ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত কবিত্তে পরামর্শ দেন ইত্যাদি। কিন্তু ইংলণ্ড মিশর স্বাধীন করুক কবিত্তে, কি ভাগ করিবেন, কিছুই ঠিক কবিত্তে পারিলেন না।

মিসর স্বাধীন করুক কবিত্তে ইংলণ্ডের বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়

এবং সুরাজনীতিব বিকল্পাচরণ করা হয় বিশেষত বন্ধক হইয়া ভরুক হইলে জগতে মহাঅপযায় ঘোষিত হয়। দ্বিতীয়ত ইহাতে ইংলণ্ডের বিশেষ অর্থলাভও হইবে না। কারণ মিসব স্বয়ংক্রিয় ও ইউরোপীয় সৈন্যের ভরণ-পোষণের ব্যয় মিসব হইতে সংগ্রহ করাও সহজ ব্যাপার নয়, তৃতীয়ত একপ কবিলে কয়গন আর্মিনিয়া আক্রমণ করিবে।

পুনশ্চ মিসব তাগি করাও এ সময় ইংলণ্ডের পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয় নহে। ইংলণ্ড মিসবের সহিত একটি বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ আছেন, মিসবে বিদ্রোহ নিবারণ ও তথায় শান্তি স্থাপন এবং সুশাসন আনিয়ন করিবেন বলিয়া ইংলণ্ড পূর্বেই স্বাকার করিয়াছেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ফ্রান্স কর্মক্ষেত্র হইতে অপস্থত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে মিসবের শ্রীবৃদ্ধ সাধন ও উন্নতিবিধান সকলেই ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করিতেছে।

লর্ড ডফরিণ এট সময় মিসবে শাস্ত স্থাপন ও শাসনবিধি সংস্কারের নিমিত্ত প্রেরিত হন। তাঁহার আগমনে মিসববাসী অনেকই অনেক আশা করিয়াছিল। এক্ষণে আর আবর্বা হইতে কোন আশঙ্কা নাই, লর্ড ডফরিণ কতকগুলি শিক্ষা ও নীতি বিভাগ সৃষ্টি করিলেন। তিনি মিসরবাসিগণকে স্বদেশ শাসনের ক্ষমতা গ্রহণের শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি একটি বিচার সভার প্রস্তাব করেন। তাহাতে ১৪টি অধ্যক্ষ থাকিবে, তন্মধ্যে থিবি অর্দ্ধ সংখ্যা নির্বাচন করিতে পারিবেন এবং তৎসঙ্গে তিনি দ্বিতীয় একটি সভা সাধারণের মতামত প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব করেন। তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া এই প্রকাশ করেন যে, মিসবের শাসন শক্তি আর নাই থিবি পার্শ্ব সৈন্য সংখ্যা অতি অল্প; এই নিমিত্ত নূতন সৈন্য সৃষ্টি করা আবশ্যিক। দেশীয় আদালতের সুবিচার সম্বন্ধে ট্যাগার্ড নামক কোন বিলাতী সংবাদ পত্রে প্রশংসা হয় যে, মধ্যে মধ্যে অনেক নির্দোষীও প্রাণদত্ত পর্যাস্ত হইয়া গিয়াছে, কর্তৃক্ষীয়েবা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। অনেক রাজকর্মচারী নির্দোষীগণের প্রাণ লইয়া ব্যবসায় করিয়াও তাহাদের আত্মীয় স্বজনকে শোকাবিত ও ক্ষিপ্ত প্রায় করে এবং অপিনারা অল্পকাল মধ্যে বিপুল ধনশালী হয়।

এই সকল ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়া লর্ড ডফরিণ মিসরবাসিদিগের

অবস্থা উন্নতির নিমিত্ত সর্বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, ঋণ পরিশোধ বন্দোবস্তটি মিসরের উন্নতি পথের কণ্টক স্বরূপ; দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও করভাবে প্রপীড়িত মিসরবাসি অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছে অথচ বিদেশীয়গণ ধনশালী হইতেছে, সুতরাং মিসরবাসী ইংলণ্ডের প্রতি অসন্তুষ্ট।

লর্ড ডফরিণ ইংল্যান্ড গিয়ে কয়েক দিনের বাধ্য করেন। ইহা তাঁহার প্রশংসা-বাক্য বটে। মন্ত্রীরা প্রায়শ্চিন্তে বলিয়াছেন যে, মিসর এক কালীন অর্থ-কল্যাণের পূর্বে খ্রিষ্টাব্দের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করা আবশ্যিক এবং তন্নিমিত্ত মিসরবাসিগণের মনে ইংলণ্ডের প্রতি সন্তোষ ও ভক্তিতাব উদ্রেক করা আবশ্যিক, কিন্তু ঋণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ষৎকাল ইম্ম্যুয়েল পাশা পদচ্যুত হন, তৎকালে যে ঋণ ১৪০০০০০ পাউণ্ড ছিল, লর্ড ডফরিণের রিপোর্টে ঐ ঋণ ২০০০০০০ পাউণ্ডে বৃদ্ধিত হয়। অতএব মিসরের কষ্ট কোনক্রমেই দূরীভূত হইল না।

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, দুঃখ একবার আগমন করিলে শীঘ্র যাইতে চাহে না এবং এক দুঃখ শেষ না হইতে হইতেই দ্বিতীয় একটি উপস্থিত হয়। মিসরে বিদ্রোহের নিবারণ হইলে ঋণশোধের ও স্বশাসনের উপায় স্থিরীকরণ হইতে লাগিল, এমন সময় সুযোগ পাইয়া বিস্মৃতিকারী মহামারী অক্ষয়্যে মিসরে প্রবেশ করিল। এই বোগটা অবিলম্বে এক স্থান হইতে মিসরের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইল। সৈন্যদলও এই বোগাক্রান্ত হইল। এই রোগ হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। অনেক গুলি ব্রিটিশ সৈন্যও শমন সদনে প্রেবিত হইল। মৃত্যু সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া মিসরগণ ভয়ে অকুল হইল। তাহাদিগের কর্মে মহা ব্যাঘাত উপস্থিত। ইংল্যান্ড এই সময়ে মিসর অর্থ-কল্যাণের তথায় অবাক্যকতা উপস্থিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। যাহা হউক, বেকব পাশা এই সময় বিস্মৃতিকাগ্রস্ত বোগীগণের সেবা শুশ্রূষা স্বয়ং করিয়া এক মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। পূর্বে যে মেহেনদিব কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনিও এই সুযোগে স্থানে মিসর সৈন্য গুলিকে রণে পবাস্ত করেন। ১৯শে নবেম্বর স্থানে ইংল্যান্ড সৈন্যদল হেক্স পাশার পবাস্তবর্তী মিসরমধ্যে উপস্থিত হয়।

এক প্রকারে ইংলও হেক্শ পাশাব পবাস্তবকণ অপমান হইতে শীঘ্র উদ্ধার পাইবে ও সম্মানের সহিত মিসব ত্যাগ কবিবে, এতদ্বিষয়ে নানা উপায় স্থির হইতে লাগিল। পরে জেনারেল গর্ডন ১৮ই জানুয়ারি কাইরো যাত্রা কবিলেন।

মিসব বাজমদ্বীপ রাজ্য বিস্তারিত নিমিত্তই স্বদান যুদ্ধে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহাদেব আশা ফলবতী হইল না। স্বদানে হস্তক্ষেপ কবা বাস্তবিক তাঁহাদেব ঘোব বাতুলতাব কর্ম্ম। স্বদান একটি বৃহৎদেশ। ইহাব মধ্যে অধিকাংশ স্থল শুষ্ক ও প্রায়ই মরুভূমি; তথায় আহার দ্রব্যাদি ছুপ্রাপ্য; বিধম বোদ্রে প্রাণ গুষ্ঠাগত হয়; কুরাপি একটি কুপ বা জলাশয়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন ভূভাগ এইরূপ অলহীন, খাদ্য দ্রব্য বিহীন, ছায়াহীন ও নাই। তাহাব উপর মেহেদিও তাহাব প্রতিনিধি ওসমান্দিগুনা যুদ্ধে কতব নহেন। ১৮৮৪ সালে অনেকগুলি যুদ্ধ হইল। বোধহয় স্বদানেব বিষয় ও জেনাবেল গর্ডনেব পবিণাম অরুনা কাতারও অবিস্তিত নাই।

এইরূপ আব্বিকে নির্দাসিত কবিয়া মিসবেব দুর্দশা পূর্ণাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। ফেলাগণ ক্রান্তদাসাবস্থাপন্ন হইল এবং তন্মধ্যে অনেকে মেহেদিবও দলভুক্ত হইল। জাতীয় সম্প্রদায় ক্ষমতালী থাকিলে এরূপ কখনই হইত না। আব্বিকে আশাউন হইতে দামিযান্তা পর্য্যন্ত এখনও সকলে ভক্তি কবে ও ভাল বাসে। মুসলমানদিগের কথা দূবে থাকুক, কপ্টস ও মিসব বাসী ইহুদী পর্য্যন্ত সকলে আব্বি ও জাতীয় সম্প্রদায় হইতে বহু আশা কবিয়াছিল, কিন্তু কালেব অনতিক্রমণীয় শক্তি প্রভাবে এক্ষণে সে আশা-লতা নির্মূল্য হইল। ইহারা বলে, আব্বি থাকিলে, স্বদানে এত গোলমাল হইত না।

ইউরোপীয়গণেব আগমনে মিসবেব দৌভাগ্য স্বর্ঘ্য; কি প্রকারে অন্তিমিত হইল, এই প্রস্তাবে তাহা বর্ণিত হইল। জাতীয় সম্প্রদায় হীনবলও লুপ্তপ্রায় হওয়াতে মিসবেব পুনরায় মস্তক উন্নত কবিবাব আর এক্ষণে ক্ষমতা নাই। বাজকোষ শূন্য হওয়াতে মিসব দেউলিয়া হইয়াছে। সভ্য ইউরোপ কর্তৃক যে জাতীয় ধর্মেব সৃষ্টি হয়, তাহা পবিশোধ হইবাবও আব্বি এক্ষণে আশা

নষ্ট । যদিও, ইংলণ্ড স্বকীয় দায়িত্বের গুরুভার লাঘব কামনার ইন্স্টিটিউশন পালক পূর্ণরূপে ঋণ পরিশোধের উপায় স্থিতিবাক্যার্থে, ক্রান্তি, জয়ন্তি, অগ্নি, কবিয়া ও ইতালী প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান প্রধান ঈরোপীয় রাজ্যের পরামর্শ ও যুক্তি প্রার্থনা কবিয়াছিলেন, তথাপি কেহই কোনরূপে তাহা তর্কপাত অথবা মিশরের কুটিল রাজনীতি মধ্যে হস্তক্ষেপ করেন না ; মরিসের প্রভুত্ব ও লর্ড গ্রান্‌বিল বলিয়াছেন যে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ড মিসরের শুদ্ধ বদান কবি, তৎপরে অন্যান্য রাজগণের মত লইয়া মিসর একক লীনতা গরিব । মিশর ইংল্যান্ড সেনাবলি সংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস কবা হইতেছে । তথাপি এখন পর্যন্ত যে ইংল্যান্ড সেনাদিগের অবস্থিতি আছে তাহা কেবল স্বয়ং প্রতীতি দিয়া নিবারণে জাহাজ গমনাগমন নিমিত্ত ।

এগুলি উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, চতুর্ভুজামণি রাজনীতিতে মন্ত্রিবর প্রিন্স বিসমার্কই মিসরের ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্তটি বিফল কবিবার প্রধান কর্তা । তদীয় জটিল ও কুটিল চক্রের দ্বারা ইংল্যান্ডের পদে পদে যোব অবমাননা ও পৃথিবীর সর্বত্রানেই মহাবিপ্লব ঘটয়াছে । আফ্রিকা প্রদেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে অন্যান্য জাতি সকল এই সময়ে নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপন ও স্ব স্ব রাজ্য বিস্তার করে । বিশ্বগণ মধ্যে অসিয়ার এই সময়ে স্ববাজা বিস্তার কবিবার অবসর পায় ।

উপসংহারে কালে বক্তব্য এই যে অধুনা মিসরের যেকোন অবস্থাব পরিবর্তন হইয়াছে তাহা অতীব শোচনীয় । ইউরোপীয়গণের আগমনকালে মিসরের যেকোন বস্তুর উৎপত্তি হয় তাহা অপ্রতিহতরূপে অদ্যাবধি পূর্ণরূপে বিক্রয় করিতেছে । মিসরের শাসন কার্যে অধুনা একরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত, যে অনেক টিউফিককে পাচুত কবিয়া ইন্স্টিটিউশনকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন এবং অনেকে আত্মবিক্রয় পুনরায়ন করিলে পুনরায় মিসরের স্বাধীনতা উদয় হইবে বলিয়াও আশা করেন ।

শ্রীশশিভূষণ দে ।

কলিকাতা, বহুবার । .

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম প্রচার ।

৩ ।

এক্ষণে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের আলোচনায প্রবৃত্ত হইলাম, যে ধর্ম্মের প্রাবল্য-কাল চিন্তা করিলে ইতিবৃত্ত লেখককে উৎকৃষ্ট হইতে হয়, সেই সুদূর কালের তত্ত্বালোচনায় ভ্রম হইবে বিচিত্র নহে, এই হেতু শঙ্কিত হইতেছি পাছে নিজের ভ্রম অন্যকেও আকৃষ্ট হবে, যদি কোন স্থলে আপনাবা আমাব ভ্রম বিলোকন করেন, উপেক্ষা করিবেন। সত্যের পথ পবিত্র হয় এই আশাব ইচ্ছা, ইহা ভিন্ন অন্য অভিপ্রায় নাই।

পুৰাতত্ত্বাহসন্ধানে পুৰাবৃত্তই চক্ষু স্বরূপ। খ্রীষ্টীয় তত্ত্বালোচনায প্রাচীন গ্রন্থ ও অতীত ঘটনাবলি আলোক সদৃশ। বাইবেল এতৎসম্বন্ধে দর্পণ স্বরূপ, একথা অনেকেই বলেন, কিন্তু বাস্তব তাহা বতর্দূর সত্য তাহা আমি বলিতে পারি না। (১)

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাচার্য্যোবা বলেন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সবল কথাই বাইবেলে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু বোণীষ মণ্ডলী কাহ্নাবা বোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বহুক্ষেপে ও তাঁহা তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই (২)। গুনিতে পাই জনৈক প্রেবিত কর্ক বোমে প্রচাৰিত হইয়াছিল (৩)। সত্য মিথ্যা আমি জানি না, জানেন খ্রীস্ দেশীয় ধর্ম্ম যাজক ইবিনিয়ঃ ও ইউসিবিয়ঃ।

(১) "Little is known of the history of the church for some centuries after the time of the apostles"

Beeton's Dic P. 1488.

(২) "With respect to the origin of this church we have no certain information in the scriptures They do not tell us when or by whom it was founded"

(৩) "The opinion that it was founded by St. Peter does not appear to rest on any satisfactory evidence, the chief authorities for it are Irineus and Eusebius, but if he had indeed preached gospel at Rome, such a circumstance would probably have been noticed in the Acts of the Apostles; nor is it likely that St Paul would have made no allusion in his epistle Perhaps the most reasonable opinion on the subject is that the Gospel was first preached at Rome by the strangers."

তাহাবা বলেন সেন্ট পিতব বোমে খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার কবিয়াছিলেন। কণাটি বাস্তবিক বিশ্বাস যোগ্য নহে। এত বড় কাথলিক ধর্ম, এত আডম্বব, পোপেব এত প্রাধাপ, এবং কাথলিকদিগেব এত বাগাডম্বব, কিন্তু বোমীয় মণ্ডলী কে স্থাপনা কবিয়াছিল, কোন্ সূত্রে এবং কোন্ সময়েই বা উক্ত সমাজেব প্রচার আবস্ত হয়, বাইবেল এবং খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী তাহা বলিতে অক্ষম। প্রেরিতদেব সকল কথা ‘ক্রিয়া’ পুস্তকে উক্ত হইয়াছে, বোমে পিতব আসিয়া ধর্ম প্রচার কবেন, এমন কথা উক্ত গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। সেন্ট পলও রোমীয় মণ্ডলীব পুত্রি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও উক্ত ঘটনার কথা বলেন নাই। কোন্ প্রমাণ বলে, পিতব কর্তৃক বোমে ধর্ম প্রচার হইয়াছিল—এই কথাটি খ্রীস দেশীয় ধর্ম যাজকেবা সম্মান বরিয়া ছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। বোমীয় মণ্ডলীব পুত্রবৃত্ত অন্ধকাবাচ্ছন্ন ও উক্ত খ্রীষ্টীয় যাজকদিগেব বাক্য অসত্য।

বোমীয় মণ্ডলীব পুত্রবৃত্তেব সূত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এ অতীত ঘটনা মন্তব্যশেবে জানিতে পারিবে না, পৃথিবী চিবকাল অন্ধকাবাচ্ছন্ন থাকিবে, ভগবানের একপ অভিপ্রায় নহে, যোন সূত্র হইতে বোমীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, আজি তাহাব কথা বলিব। আমি দীর্ঘকাল বলিয়া আসিতেছি যে পাশ্চাত্যেও বোদ্ধ ধর্মের মহা পাবন উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে দেখ্য কি উড়িয়া গেল, অথবা তাহা কুতীর্থিক (Heretics) দিগের ভ্রান্তে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে? পাশ্চাত্য লোকেবো কি তাহাব কোন পুত্রবৃত্ত বক্ষা কবেন নাই? যদি বক্ষা কবিয়া থাকেন, পৃথিবীর বর্ম্মাকদিগেব বৈর্যানল হইতে কি তাহাব উদ্ধার হইয়াছিল?

আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে, যংকালে বোমীয় সম্রাট্ অড্রিয় (Adrian) তাহাব পূর্ব পুরুষ দিগেব আশুদিক বৃত্তি বর্জন পূর্বক বোমেব মহাত্মকে শস্যস্ত মূর্তিতে শোভা বর্জন কবিত্তে ছিলেন, যে সময়ে ইতালীর সমাজেব শিষ্য দল যত্র তত্র অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়েব সহিত সঙ্ঘর্ষালোক উদ্দীপন করত জনগণেব মোহাক্ষবাব বিনাশ কবিত্তেছিল, যংকালে কাথলিক সম্প্রদায়েব নাম লোকে জানিত না, সেই মহা শুভাবহ একশত ত্রিশ খ্রীষ্টীয় অব্দে বৌদ্ধাচার্য্যগণ বোমেব প্রকাশ্য পথে অত্যাচ্ছ প্রাসংগে দবিদ্রোহ দ্বাবে সঙ্ঘর্ষ প্রচার আবস্ত করেন। রোমেব

তৎকালে প্রবল পিপাসা, কিন্তু ধর্ম পিপাসার নিকট কোন পিপাসাই স্থায়ী হয় না, পবাক্রান্ত বোম ধর্মোপদেশ প্রাপ্ত হইলে, ধর্ম কথা বোমের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা হইল; বোম পৃথিবী বিজয়বাসনা পবিত্রাব পূর্বক ধর্মের অনুসরণ করিলেন, দানব আজি দুরন্ত বাবহাব পবিত্রাব পূর্বক ব্রহ্মচর্যাশ্রম গ্রহণ করিল। পুবারত্তেব এ গুণ্য কথাটি আজি জগতে প্রচার হইলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই। এ ঘটনা মিথ্যা নহে, বাহ্যবও করণা নহে, ইহা মস্তিক ধর্ম প্রচারেব অক্ষয় প্রমাণ ও সত্যের উচ্চ চীংকার (৪)।

বোমে মস্তিক ধর্ম প্রচার হইবার পূর্বে বোমীয় লোকেরা জ্ঞানী হইয়াছিল, তাহাদের মত তত্ত্ব জ্ঞানেব প্রতিধাবমান হই, কিন্তু তাহাদের ধর্মোন্নতি ও জ্ঞানোন্নতির সাময়িক পুবারত্ত আসবা প্রাপ্ত হই নাই। মস্তিকবোমেব ধর্মপুবারত্ত এ পর্যন্ত গোপন বহিয়াছে। ইউরোপের পুবারত্তেব সমধিক উন্নতির শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু গ্রীষ্মের কিছু কাল পূর্বে কতিপয় শতাব্দীর ধর্ম-পুবারত্ত একেবারেই স্তব্ধ, ইহাব কারণ কি ?

খ্রীষ্টীয়ান লেখকেবাই বলেন যে, মস্তিক ধর্ম প্রাচ্য তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এ প্রাচ্য তত্ত্ব কোন জাতির ধর্ম, তাহা প্রাচুর্যরূপে তাহাবা বলেন না। প্রাচ্য দেশ বলিলে চীন দেশ পর্যন্ত যোম, সেইরূপ প্রাচ্য তত্ত্ব শব্দে নানা তত্ত্ব বোধক, প্রাচ্যেব কোন জাতির ধর্ম তত্ত্ব হইতে মস্তিক সম্প্রদায়েব ধর্মোৎপন্ন হইয়াছে, ইউরোপীয় লেখকদিগেব লেখাব ভঙ্গিতে তাহা আশু বোধগম্য হওয়া ছোমোধ্য বোধ হয় (৫) আমি অনুমান করি বৌদ্ধ ও মস্তিক বিভিন্ন ধর্ম নহে।

(৪) "Another sect which took its rise from the opinions of the Gnostics was that of Cerdo and the more celebrated Marcion, who began to propagate their tenets at Rome about A. D. 130. The principal feature of this heresy was the adoption of the oriental belief in two supreme powers the one good and the other evil."

P. C. See Heresy.

(৫) "The origin of the Gnostic system has been traced to various sources. Some have derived their doctrine from the Alexandrian school of philosophy, others from the Jewish Cabbala, and a still greater

যিস্তব দিগেব মুখ হইতে তাহাদিগেব ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইলে তাহাবা কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, তাহা জানিতে পারিতাম । যিস্তকগণ প্রকৃতি ও প্রধান অর্থাৎ জড় এবং চৈতন্য দুইটি পৃথক পদার্থ বিশ্বাস করিত । সাংখ্যতত্ত্ব ব্যতীত এ মত কোন জাতিব কোন ধর্ম্মেই ছিল না । এই জড়ই ছুঃখ ভোগেব মূল, ভাবতঃ বোদ্ধ দার্শনিকগণ ইহা স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছেন । কিন্তু পবিত্রতাপের কথা বলিব কি ইউরোপীয় আধুনিক লোকেরা প্রতিপন্ন করিতে চান যে, পারসিক ধর্ম্মতত্ত্বই উৎকর্ষ এবং অংকর্ষ দুইটি প্রধান গুণেব শিক্ষা দেন । পুরাতত্ত্বেব গবেষণায় এ প্রকার কত শত অবোধেব উকি দেখিতে পাই । কিন্তু হার্সিব বি. য়াঁহাদেব হইতে শিক্ষা লাভ কবিষাছি, তাঁহাটি সেই অবোধ । তাহাটি বলেন যিস্তকগণ আদি খ্রীষ্টীয়ান ও যাস্তবদিগেবই সঙ্গাথে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেব উপর প্রবল আধিপত্য ছিল । (৬) আমাৰ অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে যে যিস্তিক ধর্ম্ম হইতেই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মেব সৃষ্টিয়াছে, এবং বোমেব সেই যিস্তিক প্রচারকগণই বোমীয় মণ্ডলীৰ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ।

কন্যাভার ।

পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ লক্ষণ অনুসারে আনাদিগেব সমাজে যে, যিস্তব পরিমাণে সভ্যতাৰ আলোক প্রদেয় কবিষাছে, তাহা কেহই অস্বীকার করি-
 দেন না । ইংল্যাণ্ডাধিকারের পূর্বে আমাদিগেব অন্নতিব অবধি ছিল না
 এবং যথা সময়ে ভাবতে ইংল্যাণ্ডেব আবির্ভাব না হইলে আমাদিগকে যে,
 আবও হৃদ্যাগ্রস্ত হইতে হইত, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই । কেবল

number from the oriental belief in two great independent principles
 one as the author of good and the other evil "

P C See Gnostics

(৬) "There can be no doubt that the sect became very powerfull
 in the church soon after that time and their opinions exercised a
 great influence upon Christian theology

B eton's Dic. see Gnostics

পাশ্চাত্য সভ্যতার লক্ষণ অনুসাবেই যে আমরা উন্নত হইয়াছি, এমন নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে, শতাধিক বৎসবে আমরা যে, বিস্তর উন্নতি লাভ ও অসভ্যতার বর্জন করিয়াছি, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অনিচ্ছায় সহমরণ, সন্তান বিক্রয়, গঙ্গাস গবে সন্তান নিক্ষেপ, নববলি, বাজপুত প্রভৃতির কন্যাবধ ইত্যাদি বিস্তর পাপক্ৰিয়া নিবারণিত হইয়াছে এবং বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বৌগোনা প্রথা প্রভৃতি সমাজদুষ্কর শিথিল হইয়াছে। আমরা এক্ষণে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া সাধারণের শিক্ষাবিস্তার করিতেছি, অল্প মূল্যে লোকের দ্বাবে দ্বাবে স-বাদ পত্র পাঠাইয়া প্রত্যেককে সকল বিষয়ে বিদিত করিতেছি, সভা সমিতি করিয়া জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতেছি এবং আমাদের সামান্য বস্তু নিবারণের জন্যও বাজদ্বাবে গমন করিতে ক্রটি করি না। ফলত ইংরাজ শাসনের নানা দোষ থাকিলেও আমরা যে, বিস্তর পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছি, তাহা আর উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার আশংক্য নাই।

সমাজ শরীর একদিকে পুষ্ট ও বলষ্ঠ হইতেছে সত্য, কিন্তু নানা প্রকার ক্ষয়কারী ব্যাপি ইহাকে অন্তঃসার শূন্য করিতেছে। রোগ মারাত্মক হইতে না হইতে যদি আমরা তাহার প্রতীকার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমাদের ধ্বংস যে সন্দেহবশিত নহে, তাহা সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের কাহারও সে দিকে দৃষ্টি নাই। ছুই একজন কখন কখন বোগের জ্বালায় “হায়! হায়!” করিয়া বেড়ায় সত্য, কিন্তু যে বোগ সমস্ত সমাজ শরীরে বা সমাজের উত্তমক্ষে, তাহা একেবারে চেষ্টায় কি প্রকারে নিবারণিত হইবে? অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা অদ্য কেবল কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার নিমিত্ত অথবা ব্যয়েব বিষয়টির উল্লেখ করিতেছি। কন্যাকে বিবাহিত করিতে আজ কাল যে প্রকার অত্যাচার করিতে হয়, বোধ হয় কেহই তাহা আন্দিত করেন। বাঁহাব মস্তকে কন্যা হইলে, তাহাকে নিশি সে ভাবে একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া দেন। তাহাকে বহুদূর হইতে, তাহাকে বহুকন্যা তাঁহার দুর্দশা ও দাবিদ্র্যের সাম্য নাই এবং অন্যাগণও যে, অথবা পাত্রে অর্পিষ্ট হইয়া নানা প্রকার ক্রোধ ভোগ করিয়া জীবন যাপন করে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

কন্যাকে বিবাহিত কবিবাব বায় বাহুল্য কোথা হইতে আশাদিগের সমাজে প্রবেশ কবিল, তাহা স্থির কবা যায় না। ইংবাজ সমাজে যেমন বিধি আছে, তেমনই নিষেধও আছে, স্ত্রতবাং ইংবাজ সমাজকে আদর্শ বলা যাইতে পারে না। শাজে আছে, সালঙ্কা কন্যা দান কবিত্তে হইবে; কিন্তু এমন কোন কথা নাই যে, সে অলঙ্কার বহুমূল্য না হইলে পাত্র তাহা গ্রহণ কবিতেন না। ইহাব উপব এক্ষণে পাত্রকে নানাবিধ বহুমূল্য আভরণ ও তৈজসাদি দিবাব প্রথা প্রবর্তিত হওয়াতে, কন্যা-দায় সকল দায়ের শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটি কন্যাব বিবাহে, যেমন কবিষা ইউক, একজন সামান্য মধ্যবিত্ত লোককে প্রায় একসহস্র টাকা ব্যয় কবিত্তে হইতেছে। এক্ষণে আবার সময় গুণে যতী দেবীর অল্পগ্রহে কন্যা সন্তানও কিছু অধিক সংখ্যায় জন্ম গ্রহণ কবিত্তেছে। তবে এত অধিক নহে যে, সকল কন্যাগুলি বিবাহিত হইতে পারে না। বিগত লোক সংখ্যাব হিসাবে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজে পুত্র সংখ্যা ১ হইলে কন্যা সংখ্যা প্রায় ১০ ১২ অর্থাৎ ১০০ পুত্র কন্যাব মধ্যে প্রায় ৪৭টি পুত্র এবং ৫৩টি কন্যা। পক্ষান্তরে, এই অল্পপাতে সকলেব সন্তান জন্মে না। এমন দেখা গিয়াছে যে, কোন একটি পবিবাব মধ্যে ২২টি সন্তানেব মধ্যে একটিও পুত্র নাই। স্ত্রতবাং সেই পবিবাবকে ২২ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া কন্যা গুলিকে বিবাহিত কবিত্তে হইবে। এমন অবস্থায় কন্যাভাব কি ভাবাব ব্যাপাব, তাহা চিন্তা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে! কিন্তু প্রত্যেক হিন্দু পরিবারকেই আজ কাল এই জ্বালায় জলিতে হইতেছে। না জানি এই মহাতাপে কত সংসার জুলিয়া ছাই হইয়া গেল।

আবার যে পবিবাব মধ্যে পুত্র সন্তান অধিক, সে পবিবাবও পুত্রগণকে বিবাহিত করিয়া বিশেষ লাভবান হয় না। তাহাব কারণ এই যে, মধ্যবিত্ত লোকে বিবাহ লব্ধ সামগ্রী বিক্রয় কবিয়া অর্থ সংগ্রহ না করিয়া তাহা অব্যবহারিক ধনেই পবিণত করিয়া বাখে। আবার পুত্র কন্যা সমান সংখ্যক হইলেও তাহাদিগের বিবাহে লাভালাভ সমান হয় না। কেননা পুত্রের বিবাহে যাহা লাভ কবা যায়, তাহাব ষৎসামান্যই কন্যার বিবাহে কার্যোপযোগী হয়। স্ত্রতবাং প্রায় সকল অলঙ্কার ও তৈজসাদিই নুতন করিয়া ক্রয় করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কন্যাকে বিবাহিতা করিতে

হইলেই গড়ে এক সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কন্যাকে সঙ্গতিহীন লোকেও অবিবাহিতা বাধে না এবং বাধাও উচিত নহে। আমাদিগের দেশাচারও তাহার বিবোধী। জীলোক অবিবাহিত থাকিলে চবিত্ত কলঙ্কিত হইতে পারে এবং তাহাতে সমাজেব বিলক্ষণ অমঙ্গল সন্তা-বনা। কিন্তু কন্যাকে পাত্রস্থ কবিবাব ব্যয় বাহুল্য এতই সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে যে, সেই অবিবাহিত গতি বন্ধ না হইলে, লোকে সমাজ বন্ধন ছিন্ন কবিয়া কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিয়া সমাজকে দূষিত ও কলঙ্কিত কবিত্তে বাধ্য হইবে। তখন কি ভয়ানক ব্যাপারই সংঘটিত হইবে, তাহা চিন্তা করিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! অর্থাভাব হইলে লোকে বড় একটা কার্যের উচিত্যানুচিত্য বিচার কবে না; সূতবাং সঙ্গতিহীন লোকে যে, কন্যাকে অবিবাহিতা বাধিতে কুণ্ঠিত হইবে, তাহা কি প্রকাবে অনুমান করা যাইতে পারে।

কাহাকেও অর্থাভাবে কন্যাকে অবিবাহিত রাখিতে এখনও বড় একটা শুন্য যায় না। কিন্তু সেদিন আব সূদ্রবস্থিত নহে। এখনও সঙ্গতি হীন লোকে কোন মতে ষাটী খর বিক্রয় কবিয়া বা ঋণ গ্রস্ত হইয়া অথবা ভিক্ষা কবিয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করিতেছে। কিন্তু বিবাহেব ব্যয় ভাব এতই বুদ্ধি পাইতেছে যে, মধ্যবিত্ত লোকে আব সে ব্যয়ভাব বহন কবিত্তে পারে না। নানা প্রকাবে আমাদিগের দেশ দিন দিন নিধন হইয়া পড়িতেছে। এমন কি, অনেকের দিন ষাপন বিলক্ষণ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। সর্বাপেক্ষা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেব যৎপবোনাস্তি কষ্ট হইয়াছে। তাহারা উপার্জন করিতে অক্ষম হইলেও সাধাবণ লোকেব ন্যায় যে সে কণ্ঠে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থাগম কবিত্তে পারে না। সূতবাং অতি সামান্য আয় হইলেও তাহারা ভদ্রোচিত কার্যেই নিযুক্ত হইয়া কোন প্রকারে কষ্ট সহ্য কবিত্তে দিন ষাপন করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে অধিক ব্যয় বাহুল্য করিয়া কন্যাগণকে বিবাহিত করিতে হইলে, তাহাদিগের যে সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

* কন্যাকে বিবাহিত কবিত্তে কন্যাকর্ত্তাব ঋণ বা ভিক্ষাই যদি এই সামাজিক কুপ্রথার চরম হইত, তাহা হইলেও আমাদিগের অনেকটা সৌভাগ্য বলিতাম। কিন্তু অযথা মূল্য পাত্রগণ বিক্রীত হওয়াতে সমগ্র সমাজের

আর একটি বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। এক্ষণে নির্ধন ভ্রমপরিবারই কন্যা-
গণ প্রায়ই অপাত্রের সম্বন্ধ হইতেছে এবং সম্ভ্রান্ত বংশের হানি হইতেছে।
আজ কাল সুপাত্র হইলেই তাহাব মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে আর ধনহীন ব্যক্তি
তাহাব সহিত কন্যাকে বিবাহিত কবিত্তে পারিতেছে না। সুতরাং তাহাকে
অল্প ব্যয়ে অযোগ্য পাত্রের গলায় কন্যাকে বাঁধিয়া দিতে হইতেছে। সম্ভ্রান্ত
পুৰাতন বংশের আজিও একটু বংশ মর্যাদা থাকিতে নিরুপ্ত বংশোদ্ভূত আধু-
নিক লোক সেই বংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে কক্ষিৎ যত্নবান আছে। এই
জন্য আধুনিক নিরুপ্ত বংশীয় পাত্রগণের মূল্য কক্ষিৎ সুলভ আছে এবং সম্ভ্রান্ত
বংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন জন্য বরকর্তা বড় একটা অতিবিক্ত দাওয়া দাবী
করেন না। নির্ধন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কন্যাকর্তা এ সুযোগ অবশ্যই অবহেলা
করিতে পাবেন না। কাজেই তিনি বংশ মর্যাদাব হানি করিয়া নিরুপ্ত
বংশোদ্ভূত পাত্রের সহিত কন্যাকে বিবাহিত কবিত্তেছেন। যাহাতে তাহাকে
ভিক্ষা কবিত্তে বা ঋণ যন্ত হইতে না হয়, সেই উপায় অবলম্বন করিতে, হয়
তাহাকে অযোগ্য না হব নিরুপ্ত বংশীয় পাত্র কন্যা সমর্পণ কবিত্তে হইতেছে।
ইহাতে সমাজের যে দিন দিন অবনতি হইতেছে, তাহা দেখিয়াও সমাজ
বিক্রাচলের ন্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া এই অযোগ্য সংমিশ্রণে উপেক্ষা করি-
তেছে। পূর্বের ন্যায় সমাজবন্ধন দৃঢ় নাই এবং আহার ব্যবহ রেব দিকো
তাহাব দৃষ্টি নাই। সুতরাং এই অযোগ্য যোজনা বিনা বিঘ্ন ও বিনা আপ-
ত্তিতে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু ফলে যে, সমাজেবই অনিষ্ট হইতেছে, সমাজ
তাহা দৃষ্টি করিতেছে না।

যে কারণেই হউক, বর্তমান সময়ে লোকের অর্থ কষ্ট হইয়াছে তাহাতে
কাহারও সন্দেহ নাই। পূর্বোপেক্ষা উপার্জন বৃদ্ধি হইলেও অভাবের হাস
হয় নাই। সত্যতা বৃদ্ধির সহিত লোকের অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু
ভগ্নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। সুতরাং লোকে কিছুই সঞ্চয়
করিতে পাবে না। ইহার উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাবে নিত্য প্রয়ো-
জনীয় সামগ্রী সকল দিন দিন দুর্মূল্য হইতেছে। এমন অবস্থায়, একজন
মধ্যবিত্ত লোককে প্রত্যেক কন্যার বিবাহে এক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে
হইলে, তাহার পক্ষে কি সর্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহা বাহারা ভুক্তভোগী
নহেন, তাহারা বুঝিতে পারেন। ইহার উপর প্রত্যেক পরিবারের অভি-

ভাবকে তিন চারি বা ততোধিক কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, তাঁহার যে কি পর্য্যন্ত দুর্দশা উপস্থিত হয়, তাহা কি আব তর্ক যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে হইবে ? আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি প্রত্যেক মধ্যবিত্ত বৃহৎ পরিবারকে প্রতি ছয় বৎসরে গড়ে একটি করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে হয় । সুতরাং প্রতি কন্যার প্রতি সহস্রমুদ্রা ব্যয় পড়িলে, সেইরূপ প্রত্যেক পরিবারকে ৬ বৎসরে সহস্রমুদ্রা খরচ করিতে হয় এবং সে খরচ শোধ যাইতে না যাইতে আবার পূর্ব্ববৎ খরচ প্রস্তুত হইতে হয় । অতএব এইরূপ প্রত্যেক পবিবাহস্থ ব্যক্তিদিগকে যে, চিরকাল যৎপরোনাস্তি কষ্টে দিনযাপন কবিতো হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? যাহারা সন্ততিশূন্য, কন্যার বিবাহ তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর না হইতে পারে ; কিন্তু সমাজের পন্থা আনা লোকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । সুতরাং অধিকাংশ লোককেই যে এই দশ কণ কুবীতির দংশনে জলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইতেছে, তাহাতে আব সন্দেহ নাই । কন্যাভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনেক লক্ষ্যেই ভিক্ষা কবিতো ও ঋণজালে জড়িত হইয়া ছাবখাব হইতে দেখা যায় এবং বিশেষ জর্জরিত হইয়া কাহাকে কাহাকেও আশ্রয়ত্যা কবিয়া এই লালম হইতে মুক্ত হইতে গুনা গিয়াছে । ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে ? ইহা অপেক্ষা সমাজে আব কি কুবীতি আছে ?

সমাজের এ প্রকাব নানাবিধ ছববস্থা থাকিলেও আমবা গৌরব করিয়া থাকি যে, আমরা দিন দিন সভ্য ও উন্নত হইতেছি । এমন সভ্যতা ও উন্নতি অতল জলে নিমগ্ন হউক ! হটেণ্টেটের দোব অন্ধকাবও আমাদিগের জ্ঞানালোকের অপেক্ষা প্রেক্ষ । আমাদিগের সভ্যসমিতি আছে, সংবাদপত্র আছে, স্কুল কলেজ আছে, বাল্ডিনাব আছে, বিলাতে দেশীয় বস্ত্র আছে, নামের শেষে বড় বড় খেতাব আছে—নাই কেবল সমাজ-বন্দন । নবজন্মলার একটা অমতী নারী থাকিলে, আমরা কোমর বাণিয়া বাল্যবিবাহ বন্ধ করিতে অগ্রসব হই ; কিন্তু আমাদিগের বিজ্ঞেব শিথিল সমাজটার একটা আলগা গিরা দিতেও যত্নবান নই । ইহা কি সামান্য দ্বিগার কথা ! হে দীর্ঘ বক্তৃতাকারী সংস্কারক শ্রবণ ! মিনতি করি, চক্ষুস্থলন করিয়া নিজের সমাজের প্রতি দৃষ্টি কর । অগ্রে আপন সমাজকে দূর কর, নতুবা তোমার দাঁড়াইবার স্থল থাকিবে না । তোমার শরীর মধ্যে যে দারণ ব্যাধি, তাহার প্রতীকাবে সর্কাস্থে যত্নবান হও । যে সামাজিক কুরীতি দেশবাসী ও

বাস্যক্যকার ন্যায় কয়কারী, তাহাকে শরীর মধ্যে পোষণ করিয়া বেশ ভূষার চটক দেখাইয়া বেড়ান, বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

এই দেশহিতকর কার্যে সকলেবই অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। যিনি হিন্দু, হিন্দুসমাজে যিনি জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন এবং হিন্দুসমাজের সর্বনাশে যিনি কণামাত্রও কাতর, তাহাবই কর্তব্য যে, অগ্রসর হইয়া এই ভয়ানক আসন্ন বিপদ হইতে সমাজকে রক্ষা কবেন। বাহাদিগেব কন্যা আছে, তাহার। যে বন্ধপরিচর হইবেন, তাহা ত বলাই বাহুল্য! যাঁহাদিগের কন্যা জন্মে নাই, তাঁহাদিগেরও হিন্দুসমাজেব বক্ষার জন্য কৃতসংকল্প হওয়া নিতান্ত কর্তব্য। আজই তাঁহাদিগেব স্বার্থ নাই; কিন্তু ভবিষ্যতে যে এই জ্বালায় তাঁহাদিগকে জ্বলিতে হইবে না, তাহা কে বলিতে পাবে? আর এই মহৎ ব্যাপারে তাঁহাব যদি একটু স্বার্থই না তাগ কবিতে পাবেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেব মনুষ্যত্ব কোথায়?

আমরা যতদূর জানিতে পারিবাছি তাহাতে আমাদিগেব এমত বিশ্বাস হইয়াছে যে, সমাজেব সহিত যাঁহাব কিকিছাত্ত সংশ্রব আছে, তিনিই এই কুপ্রথা নিবারণেব জন্য ব্যগ্র আছেন। তবে তাঁহাদিগেব ব্যগ্রতা কার্যে পরিণত না হইবাব প্রধান কারণ এই যে, তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিবাব বেহ নাই। সকলেবই মন প্রস্তুত হইয়া আছে, কেবল পরিচালকের অভাবে কোন প্রতীক্য হইতেছেন। আজ কাল সমাজেব নেতা নাই—সমাজ-শরীর মস্তকহীন, হইয়া এবটা জড়পিণ্ডবৎ পড়িয়া আছে। সুতরাং এই বিষম কন্যাভাব নিবারণেব জন্য বাহাবও উপব নির্ভব করিলে চলিবে না। বিবাহ উপস্থিত হইলে পাত্রের অভাবকে অগ্রসব হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি যোগ্য বংশে যোগ্য পাত্রীব সহিত পাত্রকে বিনা ব্যয় রাহল্যে বিবাহিত করিতে প্রস্তুত আছেন। তন্ত্ৰি আমরা আর একটি সহজ উপায়েব নির্দেশ করিব। তাহা এই—প্রতি মহেব বা গ্রামে অথবা কয়েকটি সহর বা গ্রাম একত্রিত হইয়া এক একটি কমিটি সমিতি সংস্থাপন করিবেন এবং সমিতিব অন্তর্গত ব্যক্তিগণ এইরূপ স্বীকার কবিবেন যে, তাঁহারা বিনা ব্যয় বাহল্যে পরস্পর কন্যা পুত্রেব আদান ওদান করিবেন। কোন সামাজিক কার্য ব্যতিরেকে সে সমিতিব অধিবেশনের প্রয়োজন নাই এবং তথায় বক্তৃতারও কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই। এই একর কুজ

ক্ষুদ্র বেঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়া এই মহৎ উদ্দেশ্য ক্রমে সমস্ত সমাজে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারিবে, আমাদিগের এমত বিশ্বাস আছে। অতএব ভরণা করি, স্বদেশাত্মবাহী মহোদয়গণ যত্ন করিয়া প্রথমে এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতির স্বত্বপাত করিতে আর বিলম্ব করিবেন না। সংবাদ পত্রাদির যদি সমাজ সংস্কার করা একটি ব্রত হয়, তাহা হইলে সংবাদ পত্রাদিতে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক। আমরা প্রত্যেক সংবাদ ও সাময়িক পত্রকে এ বিষয়ের আন্দোলন করিতে ও কি উপায়ে এই বিষম কন্যাভার নিবারণিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। এ নিদারণ ব্যাধি প্রতীকার করিবাব উপায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে পারে; কিন্তু বর্তমান হিন্দুসমাজে কন্যাভারেব ন্যায় যে দ্বিতীয় অনিষ্টকর কুপ্রথা বিদ্যমান নাই, তাহাতে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করিবেন না।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় ।

হিন্দু-হিতৈষী হরিশ্চন্দ্র ১।১)

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর সময়ে বঙ্গ যে সকল বালকের জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা এখন প্রৌঢ় যুবা পুরুষ; অনেকেবই সম্ভান সম্ভতি হইয়াছে। যে সকল বালিকার জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা এখন সকলেই প্রৌঢ়া গৃহিণী, কাহারও কাহারও দৌহিত্র দৌহিত্রী হইয়াছে। এই কাল পবে হবিশেষ জীবনী প্রকাশিত হইতেছে। ইহাও আশাপ্রদ।

(১) হিন্দু পেট্রিষটের ভূত পূর্ব সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী। শ্রীরামগোপাল সান্যাল প্রণীত। রামগোপাল বাবুর বহু পরিশ্রম সাধ্য হরিশ্চন্দ্রের জীবনীর আয়ত্ত। যে মুখবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাই-হরিশ্চন্দ্র চরিত্রের যৎসামান্য সমালোচনা ভাবে প্রকাশ করা গেল।

আমরা এখনও বালেন্টিন জামিবে ডুবা লইয়া ব্যস্ত ; হবিশ রাম-গোপাল, কেশব দাবকানাথ,—এসকলের কথাই আমরা থাকি না । আমরা ঘোবতব আত্ম-বিস্মৃত জাতি । সোণা বাহিবে বাখিয়া শুধু অঁচলে গিরা দিতে, আমাদের মত বোধ হয় আর কেহ নাই । তোমার যদি একটি আকস্মিক মোহব, আধুলি, বা সিকি থাকে, তাহাই লক্ষ্মীর হাঁড়ীতে যত্ন করিয়া রাখিও, পুষ্প চন্দনে পূজা করিও, কালে তাহাতেই তোমার লক্ষ্মী উজ্জ্বলা হইবেন । আব তাহাতে অবদ্ব কবিয়া, তাহা দূবে ফেলিয়া, লক্ষ্য রাশি রাশি সোণা আছে শুনিয়া, কেবল শুধু অঁচলে গিরা দিলে, কখন কিছু হবে না তাই !

হিন্দুহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র সত্য সত্যই দেশ ভক্তিব আকস্মিক মোহর । নিখাদ, পাটি সোণ । এই হরিশ্চন্দ্রে ভক্তি করিতে শিখিলে, সত্য সত্যই তোমার লক্ষ্মী উজ্জ্বলা হইবেন ।

হবিশেব স্বদেশভক্তি তাহাব প্রাণেব প্রাণ ; সেই ভক্তি ভবেই তিনি জীবিত ছিলেন, সেই ভক্তি ভ বই তাহাব লেখনী তেজস্বিনী, ভাষা তেজস্বিনী ও তিনি স্বয়ং মনসী হইরাছিলেন । সেই ভক্তিব বলেই তিনি একাকী, সহস্র চক্রব প্রবল প্রতাপা'স্বত নীলকবেব প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবিয়াছেন, সেই ভক্তি বলেই তিনি লর্ড ডালহৌসিব সর্বগ্রাসিনী বাক্সসী নীতিব তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আবাব সেই ভক্তি বলেই হরিশ্চন্দ্র দাক্ষিণি সিপাহী বিভ্রাট সময়ে “ভাবতেব বোটি কোটি নিঃসহায় লোককব পক্ষ হইয়া একাকী বাজরাবে অবাচিত ঐতিহ্য স্বরূপ দণ্ডায়মান হইরাছিলেন ।” হরিশের মত দেশভক্ত দয়ার ভিখারী না পাইলে, লর্ড কানিংয়ের সার্ক-জনিক দাক্ষিণ্য কার্যে পবিণত হইতে পারিত কি না সন্দেহ । এক দিকে সহস্র সহস্র দানব ভাবতের লক্ষ লক্ষ নব নারীর বক্ত পিপাসায় লালায়িত হইয়া, সহস্র সহস্র লেগিহান জিহবা নির্গত কবিয়া অনবরত “প্রতিহিংসা” “এতিহিংসা” ধ্বনিতে চীৎকার করিতেছে, অন্য দিকে এক সৌম্যমূর্তি বঙ্গ ব্রাহ্মণ যুবা অসীম দেশ-ভক্তি ভবে, সেই অসহায় লক্ষ লক্ষ নর নারীর পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, ‘রক্ষা কর’ ‘ক্ষমা কর’, ‘দয়াকর’ বলিয়া কাতর বক্তে নিবেদন করিতেছে । বলিতেছে ‘যদি ভারতে ইংরাজ রাজ্য স্থাপী করিবে, যদি ইংরাজ আপনাকে রক্ষা করিবে, তবে ইংরাজ, ক্ষমা কর, দয়া কর ;

অতীতের অত্যাচার ভুলিয়া যাও, ভবিষ্যতে ভারতে ইংরেজের প্রতাপছবি মনে কর ; ভারতের সাম্রাজ্যেই ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য ; সেই ভারতকে রক্ষা বরু. ক্ষমা কর, দয়া কর ।” ইংরাজের রাজলক্ষ্মী. ভারত-ভক্ত ব্রাহ্মণ যুবক এই কাতরোক্তি, মহা রাজনীতিকের এই স্বার্থ-পরার্থ মিশ্রিত অপূর্ণ রাজনৈতিক উক্তি, আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিলেন, তিনি লর্ড কানিংজে ভর করিয়া ভারতের সমগ্র দেশে প্রদেলে, গ্রাম নগরে, ঘরে ঘরে ক্ষমা ঘোষণা করিলেন । সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত, ভাবত হঠাতে বিদ্রোহ গিরিশৃঙ্গার বিদূষিত হইল ; শাস্তির সুমিষ্ট বায়ু ভারতে বহিতে লাগিল ; ভারতের প্রাণ ও ইংরাজের মান যুগপৎ রক্ষা পাইল । যথার্থই বলা হইয়াছে, হরিশ্চন্দ্র “লক্ষ লক্ষ নর নারীকে অকাল মৃত্যু হইতে, অশ্রান হইতে, রক্ষা করিয়া ছিলেন, এইজন্য” হরিশ্চন্দ্রের ভাবতর্জিতবী নামের সার্থকতা হয় ।

হরিশ্চন্দ্রের ইংবেজিতে অপূর্ণ বচনা শক্তি, অগাধ পবিত্রমে প্রবৃত্তি, মানা বিশ্বাসী গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইতিহাসেব আলোচনা, অত্যাচারের উপর তাঁহার ভীষণ দ্রুত, বাজপুরুষগণের নিত্য নৈমিত্তিক দুষ্ক্রিয়া কলাপে নিয়ত মর্মান্তিক রূপে অথচ সবস ভাবে উপহাস ও বিদ্রূপ—এ সকলই হরিশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ; বড় সুন্দর, বড় সুললিত, বড় সৌম্য, অথচ সবল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বটে, কিন্তু হরিশের প্রাণ—তাঁহার জলন্ত দেশভক্তি । সেই মহা প্রাণে অচুপ্রাণিত ছিল বলিয়াই, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল লাভণ্যে ঝলমল করিত, সামর্থ্যে দেব পবাক্রম ধাবণ করিত ।

হরিশ্চন্দ্র দেশভক্তির উজ্জল ও জলন্ত অবতাব ছিলেন ; এখনকার দিনে সেই দেশ ভক্তি নানা মূর্তিতে বিবাজ করিতেছে ; আত্ম ভক্তি, যশো-লিপ্সা, পদাকাজ্ঞা, মানভিক্ষা এখন কত মূর্তি কত দিক হইতে দেশভক্তির অঙ্গচ্ছদ অঙ্গে ধাবণ করিয়া, অভিনয়ে বঙ্গ ভূমিকে রঙ্গ ভূমিতে পরিণত করিতেছে ; এই সময়ে প্রকৃত দেশভক্তের জীবনী প্রকাশ বিশেষ সময়ো-পযোগী ও আশাশ্রয় ; সেই অন্য আশাবৃত্তি ছদ্মবেশে আমরা সেই জীবনীর সমালোচনা স্বরূপে হরিশ্চন্দ্রের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলাম ।

আর্য্য জাতির বন্দ্যকাণ্ড ১

“নহি কশ্চিৎ কণমপি জাহু তিষ্ঠতা কর্ম্মকৃতং ।

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ শ্রুতিঃজ্ঞঃঐশঃ ॥”

গীতা ৩ অ। ৫।

ভগবান ঈশ্বর অর্জুনকে কহিতেছেন—পার্থ! কোন কাজে কোন অব-
স্থাতে কণমাত্রও কোন জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকিয়া
অবস্থিতি করিতে শক্ত হইবেন না। যে হেতুক স্বভাবই সমুদয় জনকে অবশ্য
করিয়া কর্ম্ম কবাইতেছে।

১। ভাবা-পরিচ্ছেদে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং
অভাব এই সাত প্রকার পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। (১) উৎক্ষেপণ,
অবক্ষেপণ, আকৃষ্ণন, প্রসাবণ, এবং গমন ভেদে কর্ম্ম পঞ্চ বিধ (২)।

২। উল্লিখিত পঞ্চ প্রকার কর্ম্মের মধ্যে গমন বা গতিবই প্রাধান্য
স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু উৎক্ষেপণাদি অবশিষ্ট চতুর্বিধ কর্ম্মও গতি
সাপেক্ষ।

৩। মীমাংসক মতে কর্ম্ম কণ দ্বয় স্থায়ী। (৩) এই মতে প্রথম
ক্ষেপে কর্ম্মের উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষেপে পূর্ব সংযোগ নাশ ও উত্তর সংযোগের
উৎপত্তি। (তৃতীয় ক্ষেপে কর্ম্মের নাশ)। নৈয়ায়িক মতে বন্দ্য কণ
চতুষ্টয় স্থায়ী। প্রথম ক্ষেপে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষেপে বিভাগ, তৃতীয় ক্ষেপে পূর্ব
সংযোগ নাশ, চতুর্থ ক্ষেপে উত্তর সংযোগের উৎপত্তি। (পঞ্চম ক্ষেপে কর্ম্মের
নাশ)।

(১) দ্রব্যঃ গুণান্তথা কর্ম্ম সামান্যঃ সুবিশেষকং ।

সমবায় স্তথা ভাবঃ পদার্থা সপ্তকীর্তিতাঃ ।

ভাষ্যপরিচ্ছেদ।

(২) উৎক্ষেপণং ততোহবক্ষেপণ মা কৃষ্ণন স্তথা ।

প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চচ ॥

(ঐ)

(৩) কণ, কালের স্বক্ৰান্তম বিভাগ—‘বিভাগা প্রাগভাবাবচ্ছিন্ন কর্ম্ম ।

সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী।

৪। সামান্যত কার্যের অগ্রে “কারণ” এবং শেষে ‘ফল’ অবস্থিতি করে। সুতরাং কারণ ভিন্ন কার্য হয় না এবং কার্য ভিন্ন ফলের উদয় হইতে পারে না। সমস্ত জগৎ অনবরত ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। নিশ্চেষ্টতা ও নিষ্পকতা কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। ক্রিয়াই জগতের নিয়ম। কৰ্ম্ম-অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই নিষ্পত্তি হয় না।

চিত্ত মার্জিত না হইলে, বিজ্ঞ জ্ঞান না জন্মিলে, পরমার্থ তত্ত্বে অধিকারী হওয়া যায় না। সকলই যত্ন বা কৰ্ম্মানুষ্ঠান সাপেক্ষ। অতএব কৰ্ম্ম আবশ্যক।

৬। উপরে সামান্য কৰ্ম্ম মাত্রের যে লক্ষণাদি উল্লিখিত হইল, তন্নিম্ন শাস্ত্রবিহিত ও নিষিদ্ধ কতকগুলি কৰ্ম্ম আছে। কুর্ম্মাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থে যাগ ও হিংসাদিকে কৰ্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (৪) এই সমস্তই কৰ্ম্মকাণ্ডের প্রতীপাদ্য (৫)।

৭। বৈধ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ধৰ্ম্ম ও নিষিদ্ধ কৰ্ম্মের আচরণ দ্বারা অধৰ্ম্ম সঞ্চয় হইয়া থাকে।

বেদাদি বিহিত ক্রিয়াজন্য যে পুরুষের গুণ (অদৃষ্ট), তাহা ধৰ্ম্ম ও বেদাদি নিষিদ্ধ ক্রিয়া জন্য যে পুরুষের গুণ (অদৃষ্ট) তাহা অধৰ্ম্ম (৬)।

* (৪) শব্দকল্পদ্রুম ৪৮০ পৃঃ।

(৫) বেদের যে যে অংশে নানা প্রকার কৰ্ম্মের বিধান ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি নির্ণীত আছে, তাহা কৰ্ম্মকাণ্ড এবং যে যে অংশে বিজ্ঞ আত্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহা জ্ঞান কাণ্ড বলিয়া খ্যাত। বেদে যে সবল গৃহ্য (গৃহস্থ কৰ্ত্তব্য) কৰ্ম্মের উল্লেখ ও মন্ত্র আছে, সেই সবল কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে পদ্ধতি (সামবেদী) গোভিল (যজুর্বেদী) পারশ্বর এবং (ঋগ্বেদী) আশ্ব-লায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ নিবদ্ধ করেন। ঐ সকল পদ্ধতি সামান্যত গৃহ্যস্থত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভবদেব প্রভৃতি পববর্তী নিবদ্ধকারেরা গোভিলাদি গৃহ্য-স্থত্রের অর্থাবলম্বন করিয়া সহজবোধগম্য পদ্ধতি সকল প্রস্তুত করেন। সংহিতা কাবকেরা বর্ণ ও আশ্রম ধৰ্ম্ম কহিয়াছেন। ঐ সমস্তকে ধৰ্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতি কহে। তন্নিম্ন পুরাণাদি ও সদাচারও ধৰ্ম্মের প্রমাণ।

* (৬) বিহিত ক্রিয়য়া সাধ্যো ধৰ্ম্মঃ পুং সাং গুণোমতঃ।

প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোহধৰ্ম্ম উচ্যতে ॥

স্মৃতি।

এতদ্বিন্ন লোকের সহজত যে সকল কর্ম করে, স্থল ভেদে তাহারও পূণ্য-
দীপ-জমকতা আছে ।

৮। সুখ ধর্ম্মেব ও দুঃখ অধর্ম্মেব অবিচ্ছেদ্য অবশ্যাস্তাবি ফল । মহর্ষি
জৈমিনি, তজ্জমাই সুখ দুঃখ সাধকত্ব দ্বাবা ধর্ম্মাধর্ম্মেব লক্ষণ করিয়া গিয়া-
ছেন । উ হার মতে ধর্ম্ম কি ?—না, যাহা সুখের নিমিত্ত উৎপন্ন হয় ;
অধর্ম্ম কি ?—না, যাগা দুঃখের নিমিত্ত উৎপন্ন হয় (৭) ।

৯। বৈধ ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের নাশ হইলেও তাহার একটি অপূর্ব্ব বা
অদৃষ্ট থাকে । সেই অদৃষ্ট ফল জন্মায় । অদৃষ্ট কর্ম্মায়ত্ত ; সুতরাং কর্ম্মই
ফলের মুখ্য কারণ ।

১০। উক্ত অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট বা কর্ম্মেব অস্থবন্ধন নিবন্ধন মনুষ্য পুনঃ
পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ ও যোনি ভ্রমণ কবে । মায়্যা (৮) মোহিত হইয়া বিবিধ

(৭)

কো ধর্ম্মো যো ভূদায়

কোইধর্ম্মো যো নভূদায় ॥

জৈমিনি সূত্রভাষ্য ।

সুখস্ত অগতামেব কাশ্যঃ ধর্ম্মেব জন্যতে ।

অধর্ম্ম জন্যঃ দুঃখঃ স্যাৎ প্রতিকূল সংচেতসাং ॥

(৮) বেদান্ত মধ্যে মায়্যা সং কি অসং ইহা নির্দ্ধারণ করা যায় না । ইহা
ত্রিগুণাত্মক (সত্ত্ব, রজস্তমোগুণময়ী), জ্ঞান বিবোধী ভাবরূপ । মায়্যার নাম
অজ্ঞান । ‘অহমজ্ঞো মামহং ন জানামি।’ ইহা জীবের কারণ শরীর ;
মায়্যার আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুটি শক্তি আছে । আবরণ দ্বারা জীবাত্মার
জ্ঞান শক্তি প্রকৃতি আবৃত হয় । বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা সমুদায় সৃষ্টি নির্বা-
হিত হইয়া থাকে । মায়্যা (অজ্ঞান) দুই প্রকার—মায়্যা ও অবিদ্যা ।
বিগুণ সত্ত্ব প্রধানকে মায়্যা এবং মলিন সত্ত্ব প্রধানকে অবিদ্যা কহে ।
উহা যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের উপাধি ।

বেদান্ত ভিন্ন অন্য কোন মতে মায়্যা নামক কোন পদার্থ স্বীকৃত হয়
নাই । অন্যান্য মতে প্রকৃত বাসনা বা অদৃষ্ট ইহার স্থানীয় ।

বাসনার (৯) অঙ্গস্বরূপ করে। তাহার বাসনা জন্য অভিলাষ, অভিলাষ জন্য কৰ্মে প্রবৃত্তি হয় এবং কৰ্মে জন্য নানা প্রকার ফল ভোগ হইয়া থাকে।

১১। ঐ ভোগ লিপ্ত শরীরেবই (১০) হয়, আত্মাব (১১) হয় না।

ক্রিয়া কলাপেব উৎপত্তির প্রতি জ্ঞানই প্রধান নিদান। ঐশ্বরিক জ্ঞান ঐ অজ্ঞান নাশে সমর্থ। কিন্তু অজ্ঞান জনিত কৰ্ম অজ্ঞানকে নাশ করিতে পারে না (১২)।

(৯) যোগ-বাশিষ্ঠ মতে বাসনা দ্বিবিধ। শুদ্ধা ও মলিনা। শুদ্ধা বাসনা (কেবল ঈশ্বর প্রীতি উদ্দেশ্যে ক্রিয়মাণ উপাসনাদি) জন্ম বিনাশের হেতু স্বরূপ। মলিনা বাসনা (কাম সংকল্পাদি) শরীরোৎপত্তি কাবণ রূপিণী।

বাসনা দ্বিবিধ। প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।

মলিনা জন্মনো হেতুঃ শুদ্ধা জন্ম বিনাশিনী।

যোগ-বাশিষ্ঠ ১ অ। ৯।

(১০) পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, বান) মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পান, পায়, উপস্থ, — চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, চিহ্না, ত্বক্) যুক্ত অপঙ্কীকৃত পঞ্চ মহাভূত (বিশুদ্ধ পঞ্চ মহাভূত) নির্মিত শরীরকে সূক্ষ্ম বা লিপ্ত শরীর কহে। জীবাত্মা এই লিপ্ত শরীরবাসিত হইয়া দেহান্তর গমন করেন।

পঞ্চ প্রাণো মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিতঃ।

অপঙ্কীকৃত ভূতোৎপন্ন সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগ সাধনং ॥

পঞ্চদশী।

(১১) আত্মা সৰ্বদেহে দ্বৈত ও অদ্বৈত দুই মত। প্রায় সমুদয় দার্শনিকেরাই দ্বৈতবাদী। কেবল বেদান্ত অদ্বৈতবাদী। বেদান্ত মতে একই আত্মা অবস্থা ভেদে জীবাত্মা ও পৰমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন। 'মায়াভীত অবস্থাতে পৰমাত্মা ও মায়াচ্ছন্ন অবস্থায় জীবাত্মা'। মায়ার আবরণ শক্তি-ভেদে জীবগণেব পৰম্পর ভেদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মায়া পাশ ছিন্ন হইলেই মেক লাভ হয়।

(১২) অজ্ঞানমে বাস্যাহি মূলকাবণং তজ্জ্ঞান মে বাত্র বিধৌ বিধীয়তে।

বিদ্যৈব তদ্ব্যশ বিধৌ পটীয়সী ন কৰ্ম তজ্জং সবিরোধং মীৰিতং ॥

বায়গীতা। ৯।

১২। কর্ম জন্য পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ, যোনি ভ্রমণ ও নানাবিধ কল ভোগ করিতে হয় বলিয়া কর্মকাণ্ডে অনায়াসা করা উচিত নহে। সচরাচর বিষয়োপভোগ দ্বারা বিষয় বাসনাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু পুনঃপুনঃ উপভোগ দ্বারা উত্তবোত্তর কামনা সংকুচিত হইয়াও আইসে। বাসনার স্বভাব এই যে তাহারা সর্বদা নূতন বিষয়ে ধাবিত হয় এবং যে বিষয় যতই পুরাতন হইতে থাকে, ততই তাহাব আকর্ষণ হইতে নিশ্চূক্ত হয়। যোগীদিগের কথা বলিতেছি না, সাধারণ লোকেব পক্ষে বিষয় অভুক্ত থাকিলেই স্পৃহা থাকিয়া যায়। অতএব পুনঃ পুনঃ উপভোগ দ্বারা পরিণামে তাহাব মূল ছেদন কবা যত সহজ, তত আব কিছুই নহে। ‘দিবাকর যেমন কিরণ জাল বিস্তাব পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহা সংকুচিত কবেন, তদ্রূপ মনুষ্য বিষয় ভোগ কবিয়া ক্রমে ক্রমে বিষয় বাসনা সংকুচিত কবে এবং পবিশেষে নিবহঙ্কাব হইয়া গুণাভীত পবম ব্রহ্মে লীন হয়। অতএব ষাযু যেমন অর্ণবস্থ তৃণাদিবে প্রবাহ দ্বাবা পর পাবে লইয়া যায় তদ্রূপ কর্ম সংসাবে লিপ্ত জীবকে পব ব্রহ্মে লীন কবিয়া থাকে (১৩)।

১৩। জন্ম ভেদে ফলভোগ হেতু কর্ম তিন প্রকাব। সঙ্কিত, প্রারন্ধ ও ক্রিয়মাণ (১৪)। যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত হইয়াছে, তাহা সঙ্কিত; তন্মধ্যে যে কর্মগুলিব ফল ইহ জন্মে ভোগ কবা যায়, তাহা প্রারন্ধ বা প্রাক্তন, এবং যে কর্ম ইহ জন্মে কবা যাইতেছে ও যাহাব ফল প্রায়ই (অত্যাংকট পাপ পুণ্য ভিন্ন (১৫)) জন্মান্তবে ভোগ কবিতে হয় তাহা ক্রিয়মাণ।

১৪। জগতের প্রায় সমুদয় পদার্থই সহজ অবস্থায় মলিন ও অবশুদ্ধ।

(১৩) কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় প্রকাশিত মহাভারতীয় শাস্তিপর্ব্ব মোক্ষ ধর্ম্ম পরীক্ষায় ৩৩১ পৃঃ।

(১৪) তস্য জন্ম ভেদাৎ ত্রিবিধং। সঙ্কিতং প্রাবকং ক্রিয়ামানকং।

ইতিবেদান্ত মতং।

(১৫) ত্রিভিবর্ষে ত্রিভিন্নর্ষে ত্রিভিঃ পঠৈক ত্রিভিঃ দীনৈঃ।

অত্যাংকটে: পাপ পুণ্যৈরিহৈব ফল মনুতে ॥

বেশন আঁকর জাত স্বর্ণাদি ধাতু সহজ অবস্থায় বিমিশ্র ও মলদূষিত, মায়া-
চ্ছন্ন জীবাত্মাও সেইরূপ সত্ত্বরক্তমোগুণ (১৬) দ্বারা সহজত জড়িত রাহি-
য়াছে। বৈকুণ্ঠ অন্যান্য মল হইতে পৃথকভূত ও পরিষ্কৃত হইলে, সুবর্ণাদি
বিগুণ হয়, সেইরূপ রক্ত ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবাত্মা শুদ্ধ
সাত্ত্বিক ভাবে উপনীত হইলেই তাহার বিগুণতা যথার্থ ক্ষুণ্ণি পায়।

১৫। মনুষ্য উল্লিখিত সত্ত্ব বজ্র তমো গুণাশ্রিত হইয়া যে সকল কর্মের
অনুষ্ঠান করে, তাহা ক্রমাশয়ে সাত্ত্বিক, বাজস ও তামস বলিয়া খ্যাত।
আসক্তি রাহিত, রাগদ্বेष শূন্য ও নিষ্কাম হইয়া যে কর্ম করা যায়, তাহা
সাত্ত্বিক (১৭) ফলেছু ও আমি কবিতোছি এবস্ত্রকার অভিমান পরতন্ত্র
হইয়া বহু পরিশ্রমে যে কর্ম করা যায় তাহা বাজস, এবং অনুবন্ধ (পশ্চা-
ত্বাবী শুভাগুত) বিত্ত বায়, পরপীড়া, ও নিজেব ক্ষমতা আলোচনা না
করিয়া মোহপ্রযুক্ত যে কর্ম আবস্ত করা যায় তাহা তামস (১৮)।

সাত্ত্বিক বা নিষ্কাম কর্মে চিত্ত শুদ্ধি ও উর্দ্ধগতি, রাজস বা সাকাম

(১৬) সত্ত্বঃ লঘু প্রকাশকমিষ্টং, উপষ্টম্ভকং চলকং রক্তং, গুরুববণকমেব
তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তি।

সাংখ্যাকারিকা।

লঘু ও প্রকাশক গুণেব নাম সত্ত্ব, উপষ্টম্ভ ও সক্রিয় গুণেব নাম রক্তঃ
এবং গুরু ও আবরক গুণেব নাম তমঃ।

(১৭) সাত্ত্বিক “নাহং কর্তা ক্ৰম্বায় ভূতাবৎ কবোমি।”

মলমাস তত্ত্ব।

(১৮) তত্ত্বু ত্রিবিধং। সাত্ত্বিকং ১ বাজসং ২ তামসং ৩।

সাত্ত্বিকং যথা।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগং দ্বেষতঃ কৃতং।

অফল প্রেপ্সুনাঃ কর্ম যত্ত্বং সাত্ত্বিকমুচ্যতে।

বাজসং যথা।

যত্ত্বু কামেপ্সুনাঃ কর্ম সাহস্কাবেণ বা পুনঃ।

ক্রিয়তে বহলায়াসং তত্রাজসমুদাহৃতং।

তামসং যথা।

অনুবন্ধঃ ক্ষয়ং হিংসা মনপেক্ষা চ পৌরুষং।

মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্ত্বতামসমুচ্যতে।

ইতি শ্রীভগবদ্গীতা।

কর্ণে যথোক্ত ফল লাভ ও মধ্যম গতি এবং তামস কৰ্ণে অধোগতি হইয়া থাকে (১১) ।

(ক্রমশ)

ঐহরচন্দ্র চৌধুরী ।

আর্য্যজাতির জ্ঞানকাণ্ড ।

বাগিনী গোবী—তাল একতাল ।

নাহি কোন গুণ, ওহে গুণাতীত,
তুমি গুণময়, সৰ্ব্ব গুণাধার ॥ ১ ॥

কে বলে সাকাব, নাহি ত আকাব,
কিন্তু প্রভু তুমি নও হে নিরাকাব ॥

নাহি কোন নাম নাহি কোন রূপ,
কিন্তু প্রভু তোমার রূপ অপরূপ,
তব ভক্তগণে ভক্তি যুক্ত মনে,
সংখ্যাভীত নাম রেখেছে তোমার ॥

সৰ্ব্বব্যাপী বলে সকলে বাধানে,
কিন্তু লিপ্ত তুমি নহ ব্যাপ্তিগুণে,

(১২) উর্দ্ধঃ গচ্ছন্তি স্বত্বহা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসঃ ।

অথন্য গুণরতিহা অধোগচ্ছন্তি তামসঃ ॥

ভগবদ্গীতা ।

তোমাকে ধৰিয়া তোমাতে ব্যাপিয়া,
এ বিশ্ব রয়েছে স'ঙ্গ নাহি তাব ॥

সবে বলে তুমি আছ সৰ্গস্থানে,
জ্ঞানাপ্রিত তুমি একথা মানি নে,
তুমি সৰ্গাধার বিশ্বমুলাধার,
তোমাব আধার সম্ভবে না আব ॥

কেহ বলে কাছে কেহ বলে দূৰে,
কেউ বলে অন্তবে কেউ বলে বাহিৰে,
কিন্তু নিকটে দূৰে অন্তবে বাহিৰে,
পূর্ণভাবে তুমি সবে একাকাব ॥

তুমি আদি দেব অনাদি অনন্ত,
অসীম মহিমা নাহি তাব অন্ত,
বাঙ্ৰনচক্ষুব তুমি অগোচব,
তোমাতে গোচব সকল সংসাব ॥

নিত্য জ্ঞানময় সৰ্গ শক্তিমান্,
পবমাত্মা বিভূ পুরুষ প্রদান,
ভূত ভবিষ্যৎ সবই বর্তমান,
দিক্‌কাল বিমান শ্রীঅঙ্গ তোমার ॥

প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তিল ভূলা নয়,
সৃষ্টি স্থিতি লয় কটাক্ষেতে হয়,
তুরীয় চৈতন্য নাহি অন্তোদয়,
দেখে হারাধনেন লাগে চমৎকার ॥

গুরু । বেদান্ত দর্শনে পঞ্চকোষের বিবরণ এইরূপ লেখা আছে ।
যথা ;—১ অন্নময় কোষ । ২ প্রাণময় কোষ । ৩ মনময় কোষ । ৪
বিজ্ঞানময় কোষ । ৫ আনন্দময় কোষ । ৬ পঞ্চ কোষাভীত অল্পপিত
আধাব—চৈতন্য ব্রহ্ম বা পরমাশ্রা । ইনিই সাংখ্যের আদি পুরুষ অথবা
বীজ পুরুষ ।

ক্ষিত্তি, অপ, তেজ, মকৎ, ব্যোম । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস, গন্ধ ।
নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, শ্রোত্র । বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু উপহ (১) ।
সাংখ্যে এই বিংশতি স্থল তত্ত্ব বেদান্তে অন্নময় কোষ নামে কথিত
হইয়াছে ।

শিষ্য । এই সকল তত্ত্বেব মধ্যে পরস্পর কাহার সহিত কি সম্বন্ধ
আছে, তাহা বিশেষ কবিতা জানিতে ইচ্ছা করি ।—

গুরু । আকাশেব গুণ শব্দ । বায়ুেব গুণ স্পর্শ এবং শব্দ । অগ্নির
গুণ রূপ এবং শব্দ, স্পর্শ । জলেব গুণ বস এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ । ক্ষিত্তির
গুণ গন্ধ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস ।

আকাশেব সম্বাংশে কর্ণেব উৎপত্তি এবং কর্ণেব বিষয় শব্দ । বায়ুর
সম্বাংশে ত্বকেব উৎপত্তি এবং ত্বকেব বিষয় স্পর্শ । তেজের সম্বাংশে
চক্ষের উৎপত্তি এবং চক্ষের বিষয় রূপ, অপেব সম্বাংশে জিহ্বাব উৎপত্তি
এবং জিহ্বার বিষয় রস । মৃত্তিকার সম্বাংশে নাসিকার উৎপত্তি, এবং
নাসিকার বিষয় গন্ধ । বস্তুত পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জিয়কে পঞ্চ তন্মাত্রাব ভোক্তা
বা আধার স্বরূপ বলা যাইতে পারে ।

শিষ্য বস্তু থাকিলেই তাহার অতি সূক্ষ্মশক্তি-বিশেষ বা গুণ থাকা
অবশ্যাস্তাবী এবং গুণ থাকিলেই তাহার আধার স্থল ও ক্রিয়া বিশেষ থাকি-
বেই থাকিবে । এস্থলে পঞ্চ ভূতের পঞ্চ সূক্ষ্মশক্তি বা গুণ এবং পঞ্চ
জ্ঞানের ভোক্তা বা আধার স্বরূপ পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জিয় এবং ক্রিয়াস্থল পঞ্চ কণ্ঠে-

(১) ক্ষিত্তি, অপ, তেজ, মকৎ, ব্যোম ইহাদের নাম পঞ্চ মহাত্মত ।
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ গুণের নাম পঞ্চ তন্মাত্র । নাসিকা,
জিহ্বা, চক্ষু, শ্রোত্র, এই পাঁচটির নাম পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জিয় । বাক্,
পাণি, পাদ, পায়ু, উপহ এই পাঁচটির নাম পঞ্চ কণ্ঠেঞ্জিয় ।

ক্রিমের বিবরণ অবগত হইলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মনোমধ্যে আপাতত দুইটি প্রশ্নের উদয় হইয়াছে,—

১। বিজ্ঞান মতে তেজটি মূল পদার্থ বা তেজটি ভূত স্থিবিহীন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও যে হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে? যাহা হউক বর্তমানে তেজটী স্থানে পাঁচটি মাত্র ভূতের উল্লেখ বড়ই ভুল কথা। বিশেষত সে ভূত পাঁচটি আবার মিশ্র পদার্থ, মৌলিক নহে।—

২। আপনি বলিয়াছেন আকাশের গুণ শব্দ কিন্তু আমরা সম্মুখে যে শূন্য দেখিতে পাই, আবহমান কাল হইতে তাহাকেই লোকে আকাশ বলিয়া আসিতেছে। ফলত আকাশ কোন পদার্থ বিশেষ নহে। যাহা বস্তু নহে তাহাব গুণ এবং ক্রিয়া ইত্যাদি থাকে কখনই সম্ভবে না। বিশেষত বিজ্ঞান মতে শব্দ বায়ু গুণ বলিয়া নিশ্চয় হইয়াছে। আর সে কথা কেবল আনুমানিক মাত্র নহে। বায়ু নিরূপিত যন্ত্রের দ্বাৰায় বায়ু পদার্থ স্থানান্তরিত কবিতা, তণ্ডল ঘণ্টা বাজাইলে কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। তজ্জন্য বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা শব্দকে আকাশের গুণ না বলিয়া বায়ুর গুণ বলিয়া স্বীকার কবিতা থাকেন। কিন্তু আপনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিতেছেন কেন?—

শ্রদ্ধ। আমি একে একে হোমাব দুইটি প্রশ্নেই উত্তর প্রদান করিতেছি, মনঃসংযোগ পূর্বক শ্রবণ কর।

১। আমাদের দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে,

“অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যাদাকাশঃ আকাশায়ামুর্ক্যায়োরগ্নি রথেরাপঃ
অন্ত্যঃ পৃথিবী চ্যোৎপদ্যতে।”

অথবা

“আকাশাজ্জান্যতেবায়ুঃ বায়োরুৎপদ্যতেববিঃ রবেকৎপদ্যতে ভোয়ঃ
ভোয়াজ্ৎপদ্যতে মহী।

প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য হইতে প্রথমত আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইয়াছে। যখন একমাত্র হুন্দ্র আকাশ হইতে অপবাপব ভূত সকল ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়াছে, তখন আকাশের পরবর্তী ভূত চতুষ্টয়কে মিশ্র-ভিন্ন মৌলিক পদার্থ বলা যাইতে পারে না। বস্তুত শাস্ত্রেও আকাশাদি পদার্থ সকলকে মূল পদার্থ বলা হয় নাই, ভূত মাত্র বলা হইয়াছে এবং

পরবর্তী ভূতে পূর্ববর্তী ভূতের গুণ সকলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে । সে স্বীকার কেবল কথার কথা মাত্র নহে । তাহা অসোব সত্যরূপে সর্বদা প্রতীয়মান হইয়া থাকে ।—

আকাশের শব্দ গুণ বায়াদি ভূত চতুষ্টয়ে, বায়ুর স্পর্শগুণ অগ্ন্যাদি ভূত ত্রয়ে, অগ্নির রূপ জল স্থল উভয় ভূতে এবং জলের রস ক্ষিত্তিভূতে বর্ত্তমান বহিয়াছে । এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ পূর্ববর্তী ভূত সকলের গুণ যখন পরবর্তী ভূত সকলে বর্ত্তমান বহিয়াছে, তখন পরবর্তী ভূত সকলের উত্তপত্তি সম্বন্ধে পূর্ববর্তী ভূত সকলের যোগ আছেই আছে । একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে । বস্তুত এক পদার্থের যোগে অপর পদার্থের উৎপত্তি হইলে তাকাকে যৌগিক ভিন্ন মৌলিক পদার্থ বলা যাইতে পারে না । অতএব সপ্রমাণ হইতেছে আমাদের শাস্ত্র মতে ভূত শেষে পৃথক্ পৃথক্ এক একটি বিশুদ্ধ মৌলিক পদার্থ বুঝা যায় না । ভূত বলিলে বৈকারিক সৃষ্টিব সমবায়ী কাবণ বুঝায় । এবং গুণানুসারে তাহাদের জাতি নির্দেশ হইয়া থাকে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রেণী বিভাগ অনুসারে গুণেব পরিচায়ক ভিন্ন ভূত শব্দের সহিত বিশুদ্ধ বিমিশ্র ভাবেব কোন সম্বন্ধ নাই ।—

মিল বলিয়াছেন আমবা কোন জড় বস্তু দেখিতে পাই না, কেবল তাহাদের কতকগুলিন গুণ মাত্র অনুভব করিয়া থাকি । বস্তু সকলের গুণ ভিন্ন আর যে কিছুই অনুভবনীয় নহে, ইহা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রেরই মত ।

যাহা হউক আমাদের শাস্ত্র মতে সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে । সেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারায় পঞ্চ আকারে আমাদের বস্তুজ্ঞান জন্মিয়া থাকে ।

যথা ; কর্ণের দ্বাবায় শব্দ, শব্দ গুণানুসারে যে সকল বস্তুজ্ঞান জন্মিয়া থাকে তাহারাই আকাশ পদবাচ্য । স্বকের দ্বারায় স্পর্শ, স্পর্শ গুণানুসারে যে সকল বস্তুজ্ঞান জন্মে তৎসত্ত্বয় মরুৎ শব্দব অন্তর্নিবিষ্ট । চক্ষের দ্বারায় রূপ, রূপগুণানুসারে যে সকল বস্তু জ্ঞান জন্মে তাহাদের নাম তেজ । জিহ্বার দ্বারায় রস, রস আশ্বাদন দ্বাবায় যে সকল বস্তুজ্ঞান জন্মে তাহারাই অপ শব্দে কথিত হয় । নাসিকার দ্বারায় গন্ধ, গন্ধানুসারে যে সকল বস্তুজ্ঞান জন্মে তাহারাই ক্ষিত্তি বলিয়া পরিগণিত । ঐ পঞ্চভূত পরস্পর

সংমিশ্রিত ও সংমিলিত হইয়া এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব রাজ্যের উৎপত্তি করিয়াছে। এক্ষণে অগতে পদার্থ সংখ্যা পাঁচ, তেষট্ঠী বা উনআশী, বাহাই বল, কিন্তু শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ গুণাত্তব ভিন্ন আয়ত্তা জগতের অপব কোন তত্ত্ব অবগত নহি। ঐ পঞ্চ গুণাত্তমারে সমস্ত জড় পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আমাদের শাস্ত্রে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

এক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে কি কি গুণাত্তমারে তেষট্ঠী ভূত নিরূপণ করা হইয়াছে তাহা তুমি বলিতে পাব কি? পৃথক পৃথক তেষট্ঠী ভূত থাকিলে তাহাদের পৃথক পৃথক তেষট্ঠী গুণ ও তেষট্ঠী জ্ঞান ক্ষেত্র এবং তেষট্ঠী কার্যক্ষেত্র থাকা চাই। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিত্ পণ্ডিতেরা কদাচই তাহা দেখাইয়া দিতে সক্ষম হইবেন না। তাহার কারণ বতই কেন পৃথক পৃথক পদার্থ সকল আবিষ্কার করেন না, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধের অমুভব ব্যতীত অন্য উপায়ে তাহাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারিবেন না। —

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ বাহ্য বস্তু সকলের অমুভবের নিয়িত্ত জগদীশ আমাদের পাঁচটি মাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহার সৃষ্টির নিয়মাত্তমারে পঞ্চভূতের সম্বাংশ আমাদের দেহে পাঁচটি মাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারায় সমস্ত বাহ্য বস্তুর অমুভব ক্রিয়া অনায়াসে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি বাহ্য বস্তুর সংখ্যা পাঁচের অধিক তেষট্ঠী বা উনআশী হইত, তাহা হইলে জগদীশ্বর আমাদের তত সংখ্যক জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রদান করিতে পারিতেন। অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর সংখ্যা বত, সৃষ্টির নিয়মাত্তমারে তাহাদের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ হইতে আমাদের দেহে এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইতে পারিত। তাহা যখন হয় নাই, তখন বাহ্য বস্তু সকলের আকৃতিগত বতই পার্থক্য থাকুক তাহাদের মূল তত্ত্ব যে, পাঁচের অধিক নয় ইহা নিশ্চয় কথা। —

আবার দেখ ঐ পঞ্চভূতের ক্রম পর্যায় কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার। প্রথমত আকাশ। এক্ষণে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি যে সকল গ্যাস আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার আকাশেরই রূপান্তরমাত্র। ওজন্য ঐ সকল পদার্থকে মূল আকাশ বল যায়। ঐ মূল আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি;

আকাশেব অগ্রে কদাচই বায়ুর উৎপত্তি হইতে পারে না বায়ুর পর অগ্নি। বায়ু না থাকিলে অগ্নিব অস্তিত্বেব কিছুতেই সম্ভবে না। যে হেতু বায়ুর অভাবে অগ্নি নির্কাপিত হইয়া যায়। অগ্নি হইতে জল; ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় যে, অগ্নিব অভাবে জল কঠিন ওস্তরবৎ হইয়া উঠে। অতএব জলের অগ্রে যে অগ্নিব উৎপত্তি তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য তাহার পর জল হইতে মৃত্তিকা। জলভাবে মৃত্তিকার অণু সকল 'পরস্পর সংমিলিত হইয়া ফুলাকারে পবিণত হইতে পাবে না। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া যার। অতএব মৃত্তিকার অগ্রে যে জলের উৎপত্তি ইহা ভাবতীর শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

এক্ষণে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেবাও স্বীকাব করিয়া থাকেন যে কোন অপবি-
জ্ঞেয় শক্তি হইতে আদিতে ইথবের (আকাশ) উৎপত্তি হইয়াছিল। ইথর বহুকাল পর্য্যন্ত তদাকাবে থাকিয়া কালক্রমে বায়ুতে পবে তেজোতে পরিণত হইয়াছিল। তেজও (heated gas) বহুকাল পর্য্যন্ত তদাকাবে থাকিয়া তরল পদার্থে পবিণত হইয়াছিল। সেই তবল পদার্থ বহুকাল তদাকাবে থাকিয়া পরিণামে কঠিন পদার্থ বা মৃত্তিকায় পবিণত হইয়াছিল; তাহার পব ঐ সকল পদার্থ নানাস্থানে তবল পিণ্ডাকাব ধাবণা কবিয়া কালক্রমে তাহা কঠিন অবস্থার পরিণত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিব্যাদি প্রত্যেক জড়পিণ্ডেবই পর্জন্যুল অদ্যাপি সেই তবলাবস্থাতেই আছে।—আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত প্রাচীন সাংখ্য মতের সৃষ্টিতত্ত্বের কিছুমাত্র অনৈক্য নাই।

অপর গুণাত্মসাবেও ভূত সবলের পূর্ববর্তিতা ও পববর্তিতা কেমন স্পষ্ট রূপে প্রতীমান হইয়া থাকে। আদি ভূত আকাশে (ইথব) একমাত্র শব্দ গুণ। দ্বিতীয় ভূত বায়ুতে শব্দ, স্পর্শ দুইটি গুণ। তৃতীয় ভূত অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ তিনটি গুণ। চতুর্থ ভূত ক্ষিতীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস, গন্ধ এই পাঁচটি গুণ বর্তমান বহিয়াছে।

শিষ্য। আমি এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তেষাউ মূল পদার্থ পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ঐ শ্রেণী বিভাগ হিন্দুশাস্ত্রে ভূত শব্দে কথিত হইয়াছে। আর ঐ তেষাউ মূল পদার্থ বলিয়া যাহা স্থির হইয়াছে তাহারো সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র হইতেই উৎপন্ন। এবং ভূত শব্দের অর্থও বিশুদ্ধ মূল পদার্থ নহে। এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। পৃথিবীর চতুর্দিকে যে ফাক রহিয়াছে তুমি তাহাকে আকাশ বা শূন্য বলিতেছ। কিন্তু আকাশ ও শূন্য একার্থ বোধক শব্দ নহে। শূন্য শব্দে অত্যন্ত অভাব বুঝায়; অভাব কোন বস্তু নহে। সুতরাং অভাবেব অস্তিত্ব নাই এবং তাহার কোন গুণ বা ক্রিয়াবিশেষও থাকিতে পারে না। 'অভাব' স্থলে 'নাই' শব্দ ব্যবহার হয় এই পর্য্যন্ত। আব আকাশ শব্দ একগুণ অভাবার্থ বোধক নহে। তাহা ভাব পদার্থ বিশেষ।

প্রাচীন ন্যায় দর্শনে ও আধুনিক বিজ্ঞান মতে যেমন পদার্থ সকলের অতি ক্ষুদ্রাংশকে পবমাণু বলা হয়। সেইরূপ বেদান্ত ও সাংখ্যমতে জাগতিক পদার্থ সকলের অতিশয় সূক্ষ্মাবস্থাকে আকাশ বলে। এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঐ আকাশকে ইথার বলিয়া বুঝিয়াছেন। যাহা হউক পৃথিব্যাদি জড়পিণ্ড সকলের চতুর্দিকে যে অসীম ফাক অবলোকন করিতেছ, উহা বায়ু, আকাশ এবং স্থান এই তিনটি পদার্থের মিলিত অবস্থামাত্র। তবে বায়ুর অবস্থা সর্বত্র ঐক্য সমান নহে। এবং আকাশ ও বায়ু দুইটি পদার্থ স্থল ধর্ম্মাক্রান্ত। কিন্তু স্থান সূক্ষ্মধর্ম্মী ও স্থানের পবমাণু নাই।

শিষ্য। ঐ স্থানকেই লোকে সচরাচর শূন্য বলিয়া থাকে। তাহা যে কোন পদার্থ নহে এ কথা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। তবে শূন্য ও আকাশ শব্দ আমবা এক বলিয়া জানিতাম এবং একাথেই উভয় শব্দের ব্যবহার করিতাম। কিন্তু পদার্থ সকলের অতি সূক্ষ্মাবস্থাকে আকাশ বলে এবং তাহা শূন্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, এ কথা আপনার মুখে আজ নূতন শুনিলাম।

গুরু। শূন্যও স্থানকে এক বলিতেছ এবং বলিতেছ তাহা কোন পদার্থ নহে। শূন্য নামে কোন পদার্থ নাই সত্য, কিন্তু স্থান পদার্থ নহে এ কিরূপ কথা হইল। মনে কর শূন্য ঘর। শূন্য ঘর বলিলে ঐ ঘরের মধ্যে কোন বস্তু নাই ইহাই বুঝায়। কিন্তু কদাচই ঘরের অভাব বুঝায় না। সেইরূপ শূন্যময় স্থান বলিলে তথায় অপব্যাপক পদার্থ সকলের অভাব বুঝায়, কদাপি স্থানের অভাব বুঝায় না। সুতরাং শূন্য ও স্থান এক নহে। শূন্য শব্দের অর্থ অত্যন্ত অভাব সে কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। আর স্থান অতি মহান্ পদার্থ বিশেষ। এবং তাহা সমস্ত জগতের আধার। স্বর্গা, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, উদ্ভা পিণ্ড, ধূমকেতু প্রভৃতি সমস্ত জড়পিণ্ড ঐ

স্থানেতে অবস্থিতি করিতেছে । স্থান না থাকিলে সূর্য্যাদি জড়পিণ্ড ও তুম্বি
আমি সকলে কোথায় অবস্থিতি বসিতাম । এমন কি তারিয়া দেখ স্থান
ভাবে একটি মাত্র পরমাণুরও অস্তিত্ব সম্ভব হইত না । অতএব স্থানকে
শূন্যের ন্যায় অভাব বলিয়া মনে করিও না । তবে স্থান অতি সূক্ষ্ম এবং
তাহাতে জড়ের কোনরূপ স্থূলত্ব লক্ষণ বা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি
কোন গুণ নাই । সুতরাং তাহা পদার্থ হইয়াও অন্যান্য পদার্থের ন্যায়
ইঞ্জির গোচর নহে ।

শিষ্য । স্থানের পরমাণু নাই তজ্জন্য আমি তাহা অভাব বলিয়া মনে
করিয়াছিলাম । কিন্তু স্থান অতি সূক্ষ্ম অথচ অভাব নয় তাহা এক্ষণে বেশ
বুঝিতে পারিয়াছি । এবং অত্যন্ত শূন্য শব্দের অর্থ অত্যন্ত অভাব তাহাও
বুঝিয়াছি । কিন্তু জড়ের ক্ষুদ্রাংশই হউক আর সূক্ষ্মাংশই হউক তাহাকে
পৰমাণু না বলিয়া আকাশ বলিবার তাৎপর্য্য কি ? আমি ত বিবেচনা কবি
আকাশ শব্দের পবিত্রত পৰমাণু শব্দ ব্যবহার কবাই কর্তব্য ।

পদার্থ সকলে ক্ষুদ্রাংশও সূক্ষ্মানুষ্ঠা বস্তুত এক হইলেও তাহাদেব মধ্যে
কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে । সুতরাং পদার্থ সকলের ক্ষুদ্রাংশের
নাম পৰমাণু এ সূক্ষ্মাবস্থার নাম আকাশ বলাই সম্ভবত বলিয়া বোধ হয় ।

ধাতুকৃত পবিত্রক কাঠের এক মুখ অগ্নিতে প্রদান করিলে ক্রমে তাহা
দগ্ধ হইতে হইতে ঐ কাঠ খণ্ডেব অপব মুখ দিয়া ফেনাকারে জল বাহির
হইয়া পড়ে, তাহা কি তুমি কখন দেখিয়াছ ?

শিষ্য । ইহা দেখিয়াছি ।

শুক । আচ্ছা বল দেখি ঐ জল কাঠ মধ্যে বিকণ অবস্থায় ছিল ?

শিষ্য । কেন পরমাণু অবস্থায় ছিল ।

শুক । পদার্থ সকলের যে সকল ক্ষুদ্রাংশেব আর অংশ হয় না তাহাকেই
পৰমাণু বলে । পরমাণু শব্দে দুইটি, চাবিটি, বা দশ, বিশটি অংশ বুঝায়
না । একটি মাত্র অংশ বুঝায় । এক্ষণে ভিজ্জাসা কি বল দেখি কাঠ মধ্যে
জলের একটি মাত্র অংশ ছিল, কি অনেক অংশ ছিল ?

শিষ্য । একটি কেন থাকিবে, কাঠ মধ্যে সমষ্টিভাবে অনেক পরমাণু
ছিল । একটি পরমাণুতে আর জলের আকার ধারণ করিতে পারে না ।

শুক । ঐ সকল অংশ অতি ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়া এক একটি পৃথক

পৃথক ভাবে ছিল ? কিম্বা অবিচ্ছিন্ন ভাবে জলের অংশ সকল কাঠের সমস্ত অংশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ?

শিষ্য । ঐ জল কাঠের কোন অংশে ছিল, আর কোন অংশে ছিল না,— এমন নহে । সুতরাং কাঠ মধ্যে জলাংশ সকল পৃথক পৃথক ভাবে না থাকিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবেই কাঠের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিব । কিন্তু জল সে অবস্থায় থাকিলে যখন আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয় না । তখন তাহা যে পরমাণুব আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

গুরু । এখানে তুমি একটু স্থির চিন্তে ভাবিয়া দেখ, কাঠের সর্ব্বাংশে জলের ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে অংশাই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কাঠ মধ্যে অবস্থিতি কালে জল পৃথক পৃথক এক একটি অংশে বিভক্ত হইয়া পরমাণুব আকার ধারণ করিয়াছিল না । বহুলাংশ জল অবিচ্ছিন্ন ভাবে অতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর আকার ধারণ করিয়াছিল । ঐরূপ প্রসারিত সূক্ষ্মাবস্থাকে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনে আকাশ বলে । আকাশ এক একটি পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত হইলে পরমাণু হইয়া যায় । কিন্তু তাহা তাহার স্বাভাবিক অবস্থা নহে, মিলিতাবস্থাই স্বাভাবিক । এই জন্য জড়ের অবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্মাবস্থাকে পরমাণু না বলিয়া আকাশ বলাই সঙ্গত । কিন্তু আকাশও পরমাণুর ন্যায় অদৃশ্য বস্তু অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে । তবে আকাশ অবিচ্ছিন্ন, পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন এই মাত্র বিশেষ ।

শিষ্য । আপনি পরিশুদ্ধ কাঠ মধ্যে জলের অবিচ্ছিন্ন যে সূক্ষ্ম অবস্থা দেখাইতেছেন, কাঠের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক কাঠের শতগুণ বা সহস্র গুণ স্থানেতে তাহার প্রসারিত ভাব বহুনা ববিয়া দেখুন, সমস্ত জলাংশ পরমাণুর আকার ধারণ করিবে । সে অবস্থাকে আকাশ না বলিয়া পরমাণুর বলিতেই হইবে ।

গুরু । কাঠ মধ্যস্থিত জলভাগ কাঠের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রসারিত হইয়া যখন প্রসারণের চরম সীমায় গিয়া উপনীত হইবে তখনও তাহার আবশ্যক ভাবের কোন অন্যথা ঘটিবে না । তাহার পর আরও বহু গুণে প্রসারিত করিলে অবশ্য তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে । সেই বিচ্ছিন্ন

অবস্থায় আকাশের প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক আকারে পবিত্র হইলে তুমি তাহাকে পরমাণু বলিতে পার, তাহাতে আমাব কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সেই সকল পরমাণুকে খণ্ডাকাশ বা ছিন্নাকাশ বলিবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। এহলে আব একটি বিষয় বিবেচনা কবিয়া দেখ, পরমাণু সকলের আকর্ষণ শক্তি বর্তমান থাকা সত্ত্বে তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিতে পাবে না। অবশ্যই মিলিত হইয়া থাকে। সেই মিলিত অবস্থায় যে পর্য্যন্ত ঘন হইয়া জমাট না বাড়ে, কেবল পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ মাত্র কবিয়া থাকে, সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আকাশ বলা যায়। আব সৃষ্টির আদিতে পরমাণু সকল যে আকাশ রূপধারণ কবিয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মনেকর পরমাণুবাদীরা বলিয়া থাকেন, জগৎ সৃষ্টির পূর্বে জগতের উপাদান সকল পরমাণু অবস্থায় ছিল। কিন্তু যে শক্তি প্রভাবে পরমাণু সকলের উৎপত্তি সেই অনাদি অনন্তশক্তি সর্বত্র সমভাবে বর্তমান থাকা সত্ত্বে পরমাণু সকল পৃথক পৃথক ভাবে উৎপন্ন হইতে পাবে না। কারণ যে যে স্থানে পরমাণুর উৎপত্তি, সেই সেই স্থানে শক্তি সক্রিয়, আর উভয় পরমাণুর মধ্যগত যে ব্যবধান স্থান, সেই ব্যবধান স্থলে শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকিবে এ কথা কদাচই যুক্তি সঙ্গত নহে। শক্তি সক্রিয় হইলে সর্বত্রই সক্রিয় হইবে। এবং সর্বত্রই পরমাণু সকল উৎপন্ন হইলে তাহাদের পার্থক্য ভাব ঘুচিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া থাকিবে। পরমাণুর মিলিত অবস্থাকে আকাশ বলাই যুক্তি সঙ্গত। অতএব সাংখ্য ও বেদান্ত যে যুক্তি অনুসারে পরমাণুর পরিবর্তে আকাশ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা অতীত প্রশংসনীয়।

শক্তির তাড়নায় ঐ আকাশ ঘনত্ব গ্রাপ্ত হইয়া প্রথমত বায়ু এবং পর অগ্নি, জল ও মৃত্তিকার উৎপত্তি, কবিয়া থাকে। মৃত্তিকার অগ্রে জল, জলের অগ্রে অগ্নি, অগ্নির অগ্রে বায়ু, বায়ুর অগ্রে আকাশ—এ কথা বার বার বলা হইয়াছে। এহলে উক্তর গীতাব একটি বচন শ্রবণ কর।

“আকাশ হ্যবকাশচ্চ আকাশে ব্যাপিতঞ্চ যং ।

আকাশস্য গুণঃ শব্দো নিঃশব্দ ব্রহ্ম উচ্যতে ॥”

এই বচনটিতে আকাশেব ব্যাপ্তি আছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাস্তবিক আকাশ যদি বাপনশীল পদার্থ বিশেষ না হইয়া কেবল শূন্য মাত্র হইত, তবে তাহাব ব্যাপ্তি ও শব্দ গুণের এবং তাহা হইতে বায়ু আদি পদার্থ সকলের উৎপত্তি,--কল্যাচই শাস্ত্রে একপ কথাব উল্লেখ থাকিত না।

জড় পবমাণু সকলের ঘাত প্রতিঘাতেই শব্দের উৎপত্তি। তজ্জন্য জড়ের অতি সূক্ষ্মাবস্থা আকাশ হইতে অতি স্থূল মৃত্তিকা পর্য্যন্ত সকল পদার্থেই শব্দ গুণেব অস্তিত্ব বহিয়াছে। তাহা একমাত্র আকাশ বা বায়ুব গুণ নহে, তবে অন্যান্য ভূত চতুষ্টয়ে একমাত্র শব্দ গুণ ভিন্ন যেমন অপরাপর গুণ সকল বর্তমান আছে, আকাশে তাহা নাই। তজ্জন্য নির্দিষ্টরূপে একমাত্র শব্দই আকাশেব গুণ বলিবা ব্যাখ্যা কবা হইয়াছে।

শিবা। আমিযখন আকাশকে শূন্য অর্থাৎ কোন বস্তু নয় বলিয়া জানিতাম, তখন তাহাব জ্ঞান গুণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পাবিতাম না। এক্ষণে আবাসকে জড় বস্তু সকলের অতি সূক্ষ্ম প্রসারিত অবস্থা বা পবমাণু সকলের মিলিত অবস্থা বলিয়া বুঝিয়াছি। এবং পরমাণুব সকলের ঘাত প্রতিঘাতেই যে শব্দের উৎপত্তি ইহা নিশ্চয় কথা। সূতবাং আকাশেব গুণ শব্দ, এ কথায় আমাব আব কোন আপত্তি নাই; আব শব্দের কাবণ যে ঘাত প্রতিঘাত তাহা বায়ুশূন্য স্থানেও হইতে পাবে। কিন্তু বায়ুশূন্য স্থানে বস্তুর সকলের ঘাত প্রতিঘাত সত্ত্বেও কোনরূপ শব্দ কর্ণগোচর হয় না কেন? তাহাব কারণ কিছুই অসম্ভব করিতে পারিতেছি না।

শুরু। কর্ণেব বিবরণ শব্দ। সূতবাং একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয় (কর্ণ) ভিন্ন, অপব জ্ঞানেন্দ্রিয় চতুষ্টয় শব্দ জ্ঞানের অধিকারী নহে। আর ঐ শব্দ আসিয়া বিগুহ (রোগহীন) কর্ণ পটহকে স্পর্শ ও ক্রিয়ং পরিমাণে আঘাতিত না করিলে আমাদের শব্দ জ্ঞান জন্মে না। কিন্তু তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি আকাশ ও আকাশের গুণ শব্দ তন্মাত্র উভয়ই স্পর্শ গুণের অতীত। যাহা স্পর্শগুণের অতীত, তাহা স্বয়ং সিদ্ধরূপে কোন বস্তুকে স্পর্শ করিয়া স্পর্শজ্ঞান জন্মাইয়া দিতে পাবে না। ফলত শব্দের উৎপত্তির পর তাহা বায়ুর সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ক্রিয়ং পরিমাণে স্পর্শ-গুণ-বিশিষ্ট হয়। এবং বায়ুর সাহায্যে তাহা পবিচালিত হইয়া বিগুহ কর্ণপটহকে আঘাতিত করে। তাহার পর আমাদের শব্দজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই

জুনা আমাদের শাস্ত্রে শব্দবহ বলিয় বায়ুর একটি নামকরণ করা হইয়াছে ।

বায়ুশূন্য স্থানে শব্দ স্পর্শ গুণ প্রাপ্ত হয় না এবং বায়ুব অভাবে তাহা পবিচালিত না হওয়ায় আমাদের কর্ণপট্টে আসিয়া উপনীত হইতে পাবে না । সুতরাং বায়ুশূন্য স্থানে শব্দেব উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহা আমাদের অজ্ঞ-
তবে আইসে না । ইহার পরীক্ষাব নিমিত্ত তুমি কোন বায়ুপূর্ণ ঘরের
ভিতর বসিয়া তাহা হাব লকল অবলোক কব । এবং ঘবেব অভ্যন্তরস্থ বায়ুব
সহিত বহিস্থ বায়ুব কোন আকারে বিচ্ছেদ ঘটাইবা নাও । তাহার পর
তুমি ঐ ঘবেব ভিতর বসিয়া মশাশব্দ বহিতে থাক ; সে শব্দ তুমি অবশ্যই
শুনিতে পাইবে ; কিন্তু বহিস্থ বায়ু-মধ্য স্থিত বক্তিবর্গেব সে শব্দ কিছুতেই
কর্ণগোচর হইবে না । সেইরূপ আবাব বহিস্থ লোকেরাও কোন শব্দ করিলে
তাহাবা অনায়াসে শুনিবে । কিন্তু বায়ু বিচ্ছেদহেতু তুমি তাহা কিছুতেই
শুনিতে পাইবে না ।

এ স্থলে শব্দেব উৎপত্তি হয় নাই এমন কথা কেহ বলিতে পারিবেন না ।
উভয় স্থলে যে শব্দ হয় তাহা অমোঘ সত্য । কিন্তু মধ্যে বায়ু বিচ্ছেদহেতু
সেই শব্দ এক পক্ষ ব্যতীত উভয় পক্ষ শুনিতে পায় না । এই ঘটনাদৃষ্টে
বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে, বায়ুশূন্য স্থানে বস্তু সকলের দ্বারা প্রতিঘাতে
(ঘণ্টা বাজনা ইত্যাদি) কোনরূপ শব্দ যে শুনিতে পাওয়া যায় না ;
শব্দেব অলুৎপত্তি তাহাব কাবণ নহে । বায়ু বিচ্ছেদই তাহার একমাত্র
কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

শিষ্য । শব্দ গুণ সকল ভূতে বর্তমান থাকিলেও তাহা যে নির্দিষ্টরূপে
একমাত্র আকাশেবই গুণ, তাহা এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলাম ।

নবজীবন ।

৪র্থ ভাগ ।

কার্তিক ১২২৪ ।

৪র্থ সংখ্যা ।

হিন্দু বিবাহ ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে মাহুবেব প্রধান উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ । মুক্তিলাভের অর্থ মায়ী মোহ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া বিগুহ চিন্ময় ও আনন্দময় আত্মার স্বরূপ দর্শন । সেই স্বরূপ দর্শনেই পরমাত্মা দর্শন হয় । মাহুয বহু দিন বাহ্যেক্রিয় ও অন্তরেক্রিয়ের অধীন থাকিয়া কাম-ক্রোধাদির বশবর্তী থাকে এবং হৃদয়ে বিষয় বাসনা, ভোগ বাসনা প্রভৃতি বাসনা ও কামনা লোষণ কবে ততদিন তাহার আত্মা মোহাচ্ছন্ন থাকে, তত দিন তাহার আত্মার স্বাধীনতা থাকে না, তত দিন তাহার আত্মাকে সে দেখিতে পায় না । মাহুয সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি দমন করিয়া সমস্ত ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এবং সমস্ত সাংসারিক মায়ী খণ্ডন করিয়া আত্মাব মায়াময় আবরণ উন্মোচন করিলে পর তবে আত্মার স্বরূপ দেখিতে পায় এবং স্বরূপ আত্মার পরমাত্মা দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করে । অতএব মাহুবেব সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য যে মুক্তি সেই মুক্তি, লাভার্থ আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করা একান্ত আবশ্যক । আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করাব অর্থ আত্মার যে মায়াময় আবরণ আছে তাহা বিনষ্ট করা । আত্মার এই যে মায়াময় আবরণ ইহার উৎপত্তি বাহুবেব জড় প্রকৃতি হইতে । মাহুয যে কামক্রোধাদি রিপু কণ্ঠক তাক্তিত হয় এবং ভোগবাসনা প্রভৃতির বশীকৃত হয় তাহার কারণ এই যে মাহুয কেবল মাত্র চিন্ময় আত্মা নয়, মাহুযে জড় প্রকৃতিও আছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট জড় দেহও আছে । অতএব মুক্তিলাভার্থ আত্মার স্বাধীনতা

সম্পাদন করিবার জন্য ইঞ্জিয়াদি বিশিষ্ট জড় প্রকৃতি দমন করা একান্ত আবশ্যিক। কিন্তু মনুষ্যের জড় প্রকৃতি বড়ই প্রবল। মনুষ্যের পার্থিব বাসনা বড়ই বেগবতী। মনুষ্যের ইঞ্জিয়াদি বড়ই দুর্বল। এ হেন জড় প্রকৃতি জয় করা বিশেষ আয়াস সাধ্য প্রতিনিয়ত স্বার্থত্যাগ ইঞ্জিয় নিগ্রহ এবং সংযম ব্যতীত এ হেন জড় প্রকৃতি জয় করা অসম্ভব। এক দিন দুই দিন কি একমাস দুই মাস স্বার্থত্যাগে, ইঞ্জিয় নিগ্রহে বা সংযমে এ হেন জড় প্রকৃতি জয় করা যায় না। সমস্ত জীবন, হয় ত জন্ম জন্মান্তর, স্বার্থত্যাগ, ইঞ্জিয় নিগ্রহ ও সংযম সাধন করিলে তবে এ হেন জড় প্রকৃতি জয় করিতে পাওয়া যায়। এই জন্য গৃহস্থাপ্রমে থাকিয়া হিন্দু'ক প্রতিদিন সংবত হইয়া দেবপূজা, পিতৃ শ্রাদ্ধ, অতিথি সেবা, ভূতপালন প্রভৃতি পাঁচটি মহাযজ্ঞ করিতে হয় এবং সর্বদাই বাগ বজ্র ব্রত প্রভৃতি কর্ম সম্পন্ন করিতে হয়। এই সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মে সংযম আবশ্যিক, ইঞ্জিয় নিগ্রহ আবশ্যিক, স্বার্থত্যাগ আবশ্যিক, ভোগস্পৃহা পরিহার আবশ্যিক। সংযমাদি ব্যতীত এই সকল কর্ম করা যায় না। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকাবেরা বলেন যে গৃহস্থ পঞ্চ মহাযজ্ঞ বা বলিকর্ম শেষ করিয়া যজ্ঞেব যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে তাহা সস্ত্রীক ভোজন করিবে। অর্থাৎ দেব পূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ অতিথি সেবা পশু পক্ষী কুমিকীট প্রভৃতিব জন্য যে অন্ন প্রস্তুত হয় তদ্বারা ঐ সকলের বলি কর্ম সম্পন্ন করিয়া গৃহের সমস্তবান্ধি এবং ভৃত্যাদিকে পর্যাপ্ত ভোজন করাইয়া সর্বশেষে অবশিষ্ট অন্ন সস্ত্রীক ভোজন করিবে। না করিলে সস্ত্রীক মহাপাপে লিপ্ত হইবে। হিন্দু নিত্য কর্মে স্বার্থত্যাগ, ইঞ্জিয় নিগ্রহ, ভোগস্পৃহা পরিহার এবং সংযম কত আবশ্যিক, তাহা এই একটি মাত্র বিধান দৃষ্টেই বুঝিতে পারা যায়। যাহাকে এইরূপ বিধানানুসারে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে হয় তাঁহার বেলা এক গ্রহর পর্যাপ্ত সুকোমল শয্যা পড়িয়া গড়াগড়ি দেওয়া চলে না, শয্যাভাগ করিয়া ছদ্ম শর্করা মিশ্রিত সুগন্ধ চার পিয়লা এবং অর্দ্ধসিদ্ধ পক্ষীডিম উদরস্থ করা চলে না, সকলের অগ্রে স্বয়ং বৃহৎ রোহিত মৎস্যের মুণ্ড ভক্ষণ করিয়া ভোগস্পৃহা পরিতৃপ্ত করা চলে না। এবং এই সকল নিত্য কর্ম করিতে নিরন্তরই কত যে নিষ্ঠা একাগ্রতা ও অধ্যবসায় আবশ্যিক তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আবার এই

সকল নিত্য কর্ম করিবার জন্য সংঘাদি বেদন আবশ্যিক, এই সকল নিত্য-কর্ম করিতে করিতে সংঘাদি করিবার শক্তি ও তেমনি বাড়িতে থাকে। কারণ অভ্যাসে সকল শক্তিই বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত হিন্দুর নৈমিত্তিক কর্ম আছে। বিশেষ বিশেষ ব্রত বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ, বিশেষ বিশেষ পূজা নৈমিত্তিক কর্মের অন্তর্গত। নিত্য কর্মেব ন্যায় নৈমিত্তিক কর্মেও সংঘাদি আবশ্যিক। অতএব নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয় প্রকার কর্মের দ্বারাই সংঘাদি করিবার শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং সম্যক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জড় প্রকৃতি পরাস্ত হইয়া আত্মাব স্বাধীনতা সম্পাদিত হয় অর্থাৎ মাহুষ-আপনার আত্মাকে চিনিতে পাবে অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধি দ্বাৰা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তিলাভের উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য বেদান্ত সূত্রেব তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের ষড়বিংশ সূত্র—‘সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি ঋতের স্ববৎ’ ইহার ভাষ্যে বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান সৰ্ব্বদে আশ্রম কর্মের (অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে যে কর্ম কবা যায় সেই কর্মেব) অপেক্ষা (অর্থাৎ আবশ্যিকতা) আছে কিনা এই প্রশ্নেব মীমাংসায় স্বয়ং ভগবান শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন যে “উৎপত্তিঃ হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিঃ প্রতি ন কিঞ্চিৎ অন্যৎ অপেক্ষতে উৎপত্তিঃ প্রতি অপেক্ষত,” অর্থাৎ বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর ফলসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তিব প্রতি অন্য কিছুই অপেক্ষা করে না, কিন্তু নিজের উৎপত্তির প্রতি অপেক্ষা কবে। কি অপেক্ষা করে? না, যজ্ঞাদি আশ্রম কর্ম। “তমেতৎ বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা” ইত্যাদি শ্রুতি অর্থাৎ বেদবচন দ্বাৰা বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে যজ্ঞাদি আশ্রম কর্ম যে অপেক্ষিত বা আবশ্যিক তাহা প্রমাণ হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে যজ্ঞাদি আশ্রম কর্ম যে অপেক্ষিত বা আবশ্যিক তাহা প্রমাণ হয়। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান একবার উৎপন্ন হইলে মুক্তিলাভের নিমিত্ত আর কিছুই আবশ্যিক হয় না কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি আইসে সেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পক্ষে দান পূজা যাগ যজ্ঞাদি আশ্রম কর্ম আবশ্যিক। অর্থাৎ আশ্রম কর্ম না করিলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সাংখ্যকারের ও এইমত। সাংখ্য প্রবচনের তৃতীয়াধ্যায়ের পঞ্চবিংশ সূত্র—

“নিয়তকাংগত্বাৎ ন সমুচ্চয় বিকল্পো”

ইহাব তাযো পরমজ্ঞানী বিজ্ঞানভিত্তিক কহিয়াছেন, “কৰ্ম্মণো ন শাক্যত
বোক্ষ হেতুত্ব সমুচ্চয়ানুষ্ঠানং প্রতিবন্ধকিত্বাভিনিভিরভ্যুপ পদ্যতে,” অর্থাৎ
কৰ্ম্ম শাক্যত্ব সম্বন্ধে মোক্ষের হেতু নয় কিন্তু অন্ধাভিভাবে কৰ্ম্ম যে মোক্ষের
হেতু ইহা প্রতিতে স্বীকৃত হইয়াছে ।

শাক্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে ফল কামনা করিয়া যে কৰ্ম্ম করা যায়
তদ্বারা স্বর্গাদি ফল লাভ হয় বটে কিন্তু মুক্তির পক্ষে অন্তরায় বা ব্যাঘাত
ঘটে। কিন্তু একটি কথা আছে। মানুষ যখন কৰ্ম্ম করিতে আবদ্ধ করে
তখন ফলকামনা কবিয়া কৰ্ম্ম হবে সত্য। কিন্তু কৰ্ম্মের জন্য যে সংঘম
স্বার্থভ্যাপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি আবশ্যক যত্ন ও একাগ্রতা সহকারে তাহা
অভ্যাস কবিতে থাকিলে, জড় প্রকৃতি হীনবল হইয়া আসিয়া যত কুটিতে
থাকে কৰ্ম্মী ফল কামনা তত কমিয়া কমিয়া শেষ একেবারে অদৃশ্য হয়
অর্থাৎ সকাম কৰ্ম্ম অবশেষে নিকাম হইয়া পড়ে। বালক যখন প্রথম
পাঠ্যবস্তুর করে তখন তাহাকে পুস্তক বা ভাল কাপড় এবং মিষ্টান্নাদির লোভ
দেখাইয়া পড়াইতে হয়। কিন্তু মিষ্টান্নাদির লোভে পড়িতে পড়িতে বালকের
ক্রমে বিদ্যানুরাগ জন্মে এবং তখন সে পুরস্কারাদির অপেক্ষা না করিয়া
কেবল তাত্র বিদ্যানুরাগ বলে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে
থাকে। মানুষও সেইরূপ ফললোভে কৰ্ম্ম করিতে আরম্ভ কবিয়া
কৰ্ম্মের জন্য সংঘর্ষ সাধন কবিয়া ক্রমে জড় প্রকৃতি পরাজয় করত
কামনাশূন্য হইয়া নিকাম কৰ্ম্ম কবিতে থাকে। এবং কৰ্ম্ম নিকাম হইলে
মুক্তিলাভ হয়। যোগ সূত্রেব প্রথমাদ্যায়েব ত্রয়োবিংশ সূত্র—“ঈশ্বর
প্রণিধানাচ্ছা” এই সূত্রে ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে বিশিষ্ট উপাস্য
দ্বারা অর্থাৎ ভক্তিপূর্বক সমস্ত কৰ্ম্ম ফল ঈশ্বরে অর্পণ দ্বারাও মুক্তি
হয়।

অন্যান্য দর্শনেও এই কথা বলে। কেন বলে, তাহাও কিঞ্চিৎ বুঝা-
ইলাম। এক্ষণে বোধ হয় বলিতে পারি যে হিন্দু শাস্ত্রমতে মানুষের
সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য যে মুক্তি তাহা লাভ করিবার জন্য আশ্রম কৰ্ম্ম অপরিসংখ্য
অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজন। কিন্তু মুক্তিলাভ বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারার্থে
আশ্রম কৰ্ম্ম এতই আবশ্যিক সেই আশ্রমকৰ্ম্ম বিবাহ বাতীত অর্থাৎ সঙ্গীক
না হইয়া সম্পাদন করা যায় না। যম্ম বলেন—

বৈবাহিকেক্ষণে কুলীত গৃহ্যং কর্ণ বধাবিধি।

পঞ্চযজ্ঞ বিধানঞ্চ পক্ষিঞ্চান্নাহিকীং গৃহী ॥ (৩—৬৭)

গৃহস্থ ব্যক্তি দৈনিক হোমকার্য্য, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং দৈনিক পাকক্রিয়া বৈবাহিক অগ্নিতেই সম্পাদন করিবে।

এবং বৈবাহিক অগ্নি ভিন্ন গৃহস্থের দৈনিক হোমকার্য্য এবং পঞ্চ মহা-যজ্ঞাদি হয় না বলিয়া মনু আর এক স্থলে বলিয়াছেন—

ভার্য্যাং পূর্ব্বমারিণ্যে দধ্যায়ীনস্ত্যাকম্পি ।

পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেবচ ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বযুতা ভার্য্যাব দাহকম্প সমাধা করিয়া পুরুষ পুনর্দার ক্রী ও শ্রোত অগ্নি গ্রহণ করিবেন। হোম এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির প্রধান উদ্দেশ্য আত্মার মঙ্গলসাধন, মানবেব পারত্রিক সদগতি। অতএব রবীন্দ্র বাবু যে বলেন ‘এখানে সংসারধর্ম্মের প্রতিই মনুর লক্ষ্য দেখা যাইতেছে’ তাহা ঠিক নয়।

এবং মহামুনি কশ্যপ বলেন*—

দারাদীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ ।

দারান্ সর্ব্ব প্রযত্নে বিগুহ্যাহুহেততঃ ॥

গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া ক্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জাতির। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে নির্দোষা কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে।

গোভিল গৃহ্য সূত্রের প্রথম প্রপাঠকের চতুর্থ কাণ্ডের অষ্টাদশ সূত্র—
“ইতি গৃহমোধ ব্রতম্” ইহার ভাষ্যে কথিত হইয়াছে—“ইত্যেবমহরহঃ পঞ্চানাং মহাযজ্ঞানাং মূর্ত্তানম্ গৃহমেধিব্রতম্, গৃহে যযোমেধৌ যজ্ঞোভবতি, তাবিমৌ গৃহমেধিনৌ দম্পতী—ইতি ক্রমঃ। তয়োঃ গৃহমেধিনোদম্পত্যো ব্রতং শাস্ত্রবিহিতোনিয়ম ইত্যর্থঃ।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন দ্বারা মুক্তি লাভার্থে যে আশ্রম কর্ত্তব্য আবশ্যক সঙ্গীক না হইয়া তাহা সম্পন্ন করা যায় না। অতএব এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে যে হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক, সাংসারিক বা পার্থিব নয়। রবীন্দ্র বাবু বলেন যে

* বিদ্যালাপর মহাশয়ের বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তক, ১৭২ পৃষ্ঠা।

“ হিন্দুদের বানপ্রস্থকে আধ্যাত্মিক বলা বাইতে পারে। কারণ তাহা প্রকৃত পক্ষে আত্মার মুক্তিসাধন উপলক্ষেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে।” কিন্তু দেখা গেল যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্য ও মুক্তিসাধন। অতএব ববীজী বাবু আধ্যাত্মিক পন্থের যে অর্থ করিয়াছেন সেই অর্থে হিন্দুবিবাহ এবং গৃহস্থাশ্রম ও আধ্যাত্মিক। কল কথা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে হিন্দুব জীবন যে চারিটি আশ্রমে বিভক্ত, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস, সেই চারিটি আশ্রমই মুক্তির পন্থের চারিটি অগ্রপশ্চাৎ সোপান মাত্র। সেই চারিটি সোপান পরস্পর সংলগ্ন, তন্মধ্যে কোন একটিকে অপর গুলি হইতে পৃথক করিয়া লইলে মুক্তির পথে হানি পড়িয়া যায়। জন্ম গ্রহণ করিবার পর হইতেই হিন্দুকে মুক্তির পথে প্রবেশ করিতে হয়। সেই জন্য হিন্দু পাঠদশায় ও ব্রহ্মচারী, গৃহস্থাশ্রমে ও ব্রহ্মচারী। অতএব হিন্দুব গৃহস্থাশ্রমকে হিন্দুর বানপ্রস্থ হইতে পৃথক করিবার যো নাই। এবং হিন্দুব বানপ্রস্থকে যদি আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে তবে হিন্দুর গৃহস্থালমকেও আধ্যাত্মিক না বলিলে চলে না। তাই বলিতেছি যে হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক, সামাজিক বা পৃথিব্য নয়। আর এ কথাও বলিতে পাওয়া যায় যে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক অন্য কাহাবো বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক নয়। খ্রীষ্টানের বাইবেল বল, মুসলমানের কোরাণ বল, ব্রাহ্মণের সহজ্ঞান বল, কিছুতেই এমন কথা বলে না যে সঙ্গীক না হইয়া ধর্ম্মচর্য্য করিবার যো নাই। খ্রীষ্টান স্ত্রী লইয়া গির্জায় এবং ব্রাহ্মণ স্ত্রী লইয়া সমাজমন্দিরে যান বটে, কিন্তু সেটা তাঁহাদের স্বেচ্ছামাত্র। এ সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম সঙ্গীক না করিলেও তাঁহাদের ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাত বা হানি হয় না। কিন্তু সঙ্গীক না হইয়া হিন্দুর ধর্ম্মচর্য্য একেবারেই হয় না। এবং সেট জন্য সীতা বধন বনে তখন রামচন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে সীতার স্বর্ণময় মুষ্টি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল নতুবা তাঁহার যজ্ঞ হইত না। এবং সেই জন্যই এখনো যেখানে হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান একেবারে লোপ হয় নাই সেখানে পতি পত্নীকে একত্রে দীক্ষিত হইতে, একত্রে উপবাস করিতে, একত্রে বারতৃত করিতে, একত্রে বাগবন্ধ করিতে, একত্রে তীর্থ দর্শন করিতে দেখা যায়। অতএব পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুর বিবাহ প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক, অপরে আপন আপন বিবাহ

আধ্যাত্মিক বলিয়া নির্দেশ করিলেও তাঁহাদের বিবাহ কথায় আধ্যাত্মিক বটে, কাজে নয়। মানব জীবনেব সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। যে মুক্তি সেই মুক্তিলাভ সম্বন্ধে হিন্দু পুরুষ এবং হিন্দু স্ত্রী দুই জনে একজন—হিন্দু পুরুষ ব্যতীত হিন্দু স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব নাই অতএব তাহার কর্মও নাই, পারত্রিক গতিও নাই, এবং হিন্দু স্ত্রী ব্যতীত হিন্দু পুরুষেরও ব্যক্তিত্ব নাই, অতএব তাহার কর্মও নাই, পারত্রিক গতিও নাই। হিন্দু পুরুষ ও হিন্দু স্ত্রী পরস্পরের অংশ, পরস্পরের উপাদান, পরস্পরের ধর্মশরীরের অঙ্গাঙ্গ, পরস্পরের ধর্মজীবনেব জীবনীশক্তি, পরস্পরের মুক্তির কারণ। দেহের জীবন সম্বন্ধে হৃৎপিণ্ডের সহিত শ্বাস যন্ত্রের এবং শ্বাসযন্ত্রের সহিত হৃৎপিণ্ডের যে রকম সম্বন্ধ, মুক্তিলাভ সম্বন্ধে হিন্দু পুরুষের সহিত হিন্দু স্ত্রীর এবং হিন্দু স্ত্রীর সহিত হিন্দু পুরুষের সেই রকম সম্বন্ধ। ইংরাজ বল, ফরাসী বল, খৃষ্টান বল, মুসলমান বল, ব্রাহ্ম বল, আর কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ একেবারেই এমন অঙ্গাঙ্গ-ভাবেব অর্থাৎ organic, constitutional এবং functional রকমের নয়।

হিন্দু পুরুষ ও হিন্দু স্ত্রীর মধ্যে এ রকম অঙ্গাঙ্গভাবেব সম্বন্ধ নিরূপিত হইবার একটি মাত্র কারণ অতি সংক্ষেপে এ স্থলে নির্দেশ করিব। সমস্ত জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়—এক ভাগ পুরুষ আর এক ভাগ স্ত্রী। এই দুই ভাগ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নয়—পরস্পরের অধীন বা সাপেক্ষ। দুইয়ের সংযোগ ও সম্মিলন ব্যতীত কাহারই অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকে না। অতএব পুরুষ বল স্ত্রী বল কেহই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়—দুইয়ে মিলিয়া সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ পুরুষ নিজেও ১ নয় স্ত্রী নিজেও ১ নয়, পুরুষও স্ত্রী সংযুক্ত হইয়া ১ হয়। এই জন্য পুংজগৎ ও স্ত্রী জগৎ বলিয়া দুইটি স্বতন্ত্র জগৎ আছে এমন কথা কোন দর্শনে, বিজ্ঞানে বা শাস্ত্রে বলে না। পুং জগৎ ও স্ত্রী জগৎ দুইয়ে মিলিয়া একটি জগৎ এই কথাই সকলে বলে। এক কথা না বলিলেও চলে না। পুং জগৎ এবং স্ত্রী জগৎ দুই জগৎই সেই এক পরমব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। অতএব পুং জগৎ ও স্ত্রী জগৎ দুইটি স্বতন্ত্র জগৎ নয়, কারণ দুই একে থাকে না এবং এক হইতে যাহা যাহা উদ্ভূত হয় তাহা সেই একের অধিক হইতে পারে না—সে সমস্ত সেই একের পরস্পর-সাপেক্ষ অংশ মাত্র, অতএব সকলে মিলিয়া এক। এই জন্য নর নারী সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে বলে যে “নারা-রণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়া-

ছেন। বিবাহের পর আবার সেই ছই শরীর এক হইয়া যায়।” অতএব স্ত্রী এবং পুরুষ যদি একের পরস্পর-সাপেক্ষ অংশই হইল তবে সে সাপেক্ষতাও আংশিক হইতে পারে না, উভয়েব যতদূর বিস্তার সে সাপেক্ষতাও ততদূর হইবে। উদ্ভিদেব জনন ক্রিয়া পর্য্যন্ত আছে। অতএব জননক্রিয়া পর্য্যন্ত পুং উদ্ভিদ ও স্ত্রী উদ্ভিদ পরস্পরের সাপেক্ষ দেখা যায়। পশু পক্ষীর জনন স্পৃহা ছাড়া অপত্য স্নেহ পর্য্যন্ত আছে। তাই পশু পক্ষীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষের যোগ বা সাপেক্ষতা কেবলমাত্র জনন ক্রিয়ার পর্য্যবসিত না হইয়া অনেকস্থলে অপত্যপালন পর্য্যন্ত থাকিতে দেখা যায়। মানুষের ধর্মবৃত্তি পর্য্যন্ত আছে। অতএব পুং মানুষ ও স্ত্রী মানুষ ধর্মচর্য্যা পর্য্যন্ত পরস্পরের সাপেক্ষ না হইলে চলিবে কেন? এই জন্য হিন্দু শাস্ত্রাঙ্ক-সারে স্ত্রী ও পুরুষ বিবাহ দ্বারা এক এবং একত্র না হইলে ধর্মচর্য্যা হয় না। হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যায় যে কথা বলে হিন্দুর ক্রিয়া কর্মের আচাৰ অমুঠানে সেই কথাবই প্রয়োগ ও স্বার্থকতা থাকে। তত্ত্ববিদ্যায় এবং আচার অমুঠানে এমন মিল আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মিল হিন্দু এবং অপরাপর জাতিব মধ্যে একটি বিষম প্রভেদের কাবণ। এবং সেই জন্য অপরাপর জাতি হিন্দুকে বুঝিতে পারে না।

সঙ্গীক না হইয়া ধর্মচর্য্যা হয় না হিন্দু শাস্ত্রেব এই বিধানের মর্ম এখন বোধ হয় কতক কতক বুঝা গেল। ইহার মর্ম এই যে মানব জীবনের এত বড় উদ্দেশ্য যে যুক্তি তাহা লাভ করিতে হইলে জ্ঞা ভিন্ন পতি নাই। অতএব এখন নির্ভয়ে বলিতে পারি যে পুরুষ সম্বন্ধে স্ত্রীর পদ হিন্দুর মধ্যে প্রকৃত পক্ষে যেমন সম্মানের ও গৌরবের কি স্ত্রীটান কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কাহারও মধ্যে তেমন নয়। হিন্দু কেবল etiquette ভ্রষ্ট নয়। তাই আজ স্ত্রীর জন্য হিন্দুকে এত কথা শুনিতে হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত বাহা আলোচনা করা গেল তাহাতে তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। প্রথম—হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক। দ্বিতীয়—হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্ত্রী এবং পুরুষ মিলিয়া এক হওয়া আবশ্যিক। তৃতীয়—হিন্দু বিবাহের প্রকৃতি বিবেচনায় হিন্দু পুরুষের সম্বন্ধে হিন্দু স্ত্রীর বড়ই সম্মানের ও গৌরবের পদ। প্রত্যেক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এখন কিছু কিছু বলা আবশ্যিক।

প্রথম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এই কথা বলি যে হিন্দু বিবাহেব উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক হইলেও ঐ বিবাহেব যে অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই বা থাকিতে পারে না একপ অলুমান কবা অনায়াস । মৃত মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্ত বিদ্যালোচনা আপন জীবনেব উদ্দেশ্য কবিয়াছিলেন এ কথা বলিলে এমন বুঝায় না যে তিনি বিদ্যালোচনা ভিন্ন আর কোন কাজই করেন নাই; আহাবও কবেন নাই, নিদ্রাও যান নাই, সংসার ধর্মও কবেন নাই । অথবা বিদ্যালোচনা ছাড়া তিনি আচার বিহাৰ ও সংসার ধর্ম কবিয়াছিলেন বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে বিদ্যালোচনা তাহার জীবনেব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না । হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহেব উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক । অঞ্চ সেই শাস্ত্রেই পতি পত্নীৰ পবম্পবের মনোবঞ্জন কবিবাব এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি কবিবাব ব্যবস্থা আছে । একপ ব্যবস্থাব দোষ বা অসঙ্গতি কি বুঝিত পাবি না । উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য আছে বলিয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধন কবিত্তে পাবা যাব না, এ কথাব কোন অর্থই নাই । তবে যেখানে উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য থাকে সেখানে যত্নেতে সেই উদ্দেশ্য সাধনেব ব্যাঘাত হয় এমন ববিয়া নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধন কথা উচিত নব । হিন্দুশাস্ত্রে জীৱনময় সন্তানোৎপাদন বেশ ভূষা প্রভৃতি বিষয়ে সেইরূপ ব্যবস্থা আছে । তবে আব হিন্দু বিবাহেব অনাধ্যাত্মিকতা ওমাণ কবিবাব অভিপ্রায়ে প্রজাবৃদ্ধি কবাাদি বিববক ব্যবস্থা ধবিয়া টানাটানি করা বেন ?

আমাদের বিত্তীয় সিদ্ধান্ত এই যে হিন্দু বিবাহেব উদ্দেশ্য সাধনার্থ জীৱি এবং পুঙ্ক্ষ মিলিয়া এক হওয়া আবশ্যিক । এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এখন এই মাত্র দেখা আশ্যক যে আমাদের বিবাহ প্রক্রিয়া দ্বারা পতি পত্নীৰ একত্ব সম্পাদিত হয় কি না । আমাদের বিবাহেব অনেক মন্ত্ৰেব উদ্দেশ্য পতি পত্নীৰ একত্বসাধন, এ কথা আমি আমার “বিবাহেব ধৰ্ম ও উদ্দেশ্য” নামক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি । অতএব এ স্থলে সে সৰল মন্ত্ৰেব পুনৰুল্লেখ কবিব না । কেবল একটি মন্ত্ৰেব উল্লেখ কবিবঃ—

“প্রাথেষ্টে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিবহ্নীনি মাংসৈর্মাংসানি স্বচা স্বচম্—” প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে এবং চৰ্ম্মে চৰ্ম্মে যোড়া লাগিয়া এক হউক । ইহা যদি একীকরণ না হয় তবে জানি না কি করিয়া

একীকরণ হইতে পারে। অতএব হিন্দুবিবাহ প্রক্রিয়াব উদ্দেশ্য যে পতিপত্নীর একীকরণ এ কথা অস্বীকার করিবাব যো নাই। তুমি বলিবে যে পতি পত্নীর একীকরণই যদি হিন্দু বিবাহ প্রক্রিয়ার অর্থ ও উদ্দেশ্য হয় তবে আবার হিন্দুর মধ্যে বহুবিবাহ হয় কেমন কবিয়া? কেমন কবিয়া হয় তাহা বুঝা বড় কঠিন নয়। সর্ব প্রথমে লোকাচার শাস্ত্র অবলম্বন কবিয়া উৎপন্ন হয় না। শাস্ত্র বিধিবদ্ধ হইবাব পূর্বে অনেক লোকাচার উৎপন্ন হয়। সে উৎপত্তির নানা কারণ থাকে। সেইরূপ কোন কারণে এ দেশে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই এক সময়ে বহুবিবাহ কবিত। ক্রমে সমাজে ধর্মজ্ঞান বৃদ্ধি হইলে পব স্ত্রী বহুবিবাহ বন্ধ হয়। পুরুষের বহুবিবাহ এখনও বন্ধ হয় নাই। কিন্তু পুরুষের বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত নয় পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তকে স্পষ্ট প্রমাণ কবিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে কেবল কতকগুলি নির্দিষ্ট কাবণে পুরুষ ভাৰ্য্যাশ্চর্য গ্রহণ করিতে সমর্থ। অর্থাৎ স্ত্রী চিরকথা হইলে এবং পুত্র সন্তান প্রসব না কবিলে পতি দারাস্তব পবিশ্রম কবিতে পাবে। ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা’ ববীজ বাবু কেবল এট কয়টি শব্দ উদ্ধৃত কবিয়া বলিয়াছেন যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কবাই হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ কয়টি শব্দেব পবেই “পুত্র পিও প্রযোজনঃ” আবে এই যে কয়টি শব্দ আছে ববীজ বাবু তাহা উদ্ধৃত কবেন নাই। কাণ টানিলে মাথা আসে—চিব কাল এই কথা শুনা আছে এবং কথাটা সত্য কি না কাণ টানিয়া দেখাও গিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবু তিন চাবি বাব একটা শ্লোকেব কাণ ধবিয়া টানিয়াছেন, কিন্তু একবাবও শ্লোকের মাথাটা আসে নাই। মাথাটা আসিলেই জানা যায় যে পিতৃলোকের পারলৌকিক মঙ্গলার্থ পুত্রোৎপাদনের জন্য পত্নী আবশ্যক। এবং সেই জন্য শাস্ত্রে প্রথম পুত্রকেই পুত্র বলে, অন্যান্য পুত্রকে কামজ পুত্র বলিয়া নিন্দা কবে। অতএব পুত্রার্থে যে দারাস্তবের ব্যবস্থা আছে তাহারও উদ্দেশ্য পারলৌকিক, পার্থিব নয়। কিন্তু বোধ হয় যে এ ব্যবস্থা সত্বেও অনেকে দারাস্তব পবিশ্রম না কবিয়া দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের উপায় বিধান কবিয়া থাকেন। এবং হিন্দুর রাজশক্তি বিনষ্ট না হইলে বোধ হয় কালে দত্তক গ্রহণের নিয়ম বেশী প্রচলিত হইয়া দারাস্তব পরিগ্রহের প্রথা বহু পরিমাণে রহিত হইয়া যাইত। এরূপ বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে একটি প্রধান কাবণ

এই যে কোন ব্যক্তি অপুত্রক মরিলে তাহার পারলৌকিক মঙ্গলার্থ তাহার বিধবা পত্নীর গর্ভে নিয়োগ ক্রমে অনেকের দ্বারা পুত্র সন্তান উৎপন্ন করিবার এক সময়ে যে বিধি ছিল তাহা বহিত হইয়া গিয়াছে এবং বিবাহের বিপুলতা রক্ষার্থ পূর্বে যে অহুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। মোট কথা, বৃহৎ ও বহু প্রাচীন সমাজে অনেক রকম লোকাচার থাকে। সে সকল লোকাচারের মধ্যে সকলগুলিই যে শাস্ত্রানুমোদিত হয় তা নয়। কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত না হইলেও সেগুলি শীঘ্র লোপ হয় না। এবং হিন্দুশাস্ত্রকারেরাও বিশিষ্ট কারণে লোকাচারের প্রতি কিঞ্চিৎ আস্থা বলিয়া তাহা শীঘ্র বহিত কবিত্তে ইচ্ছুক নহেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে বহুবিবাহ ক্রমে যে পক্ষীকরণ বড়ীকরণ ঘটয়া থাকে উদ্ভাবা একীকরণ অপ্ৰ-মানীকৃত হয় না।

হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু পার্থিব নয়, পারলৌকিকও বটে। সেই জন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন যে বিবাহ দ্বারা পতি পত্নীকে যে সংযোগ সম্পাদিত হয় তাহা পবলোকেও থাকে, ইহলোকে শেষ হয় না। রবীন্দ্র বাবু বলেন, এহাটি শাস্ত্রকারদিগের ভুল। কেন না তাঁহাদেরই কর্মফলবাদের অর্থ এই যে ইহলোকে যে যে বস্তু কর্ম করিবে সেই কর্মের ফল স্বরূপ পবলোকে সে তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, অতএব পতি পত্নী আপন আপন কর্মের ফল স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দাম্পত্য যোগ হইতে স্থলিত হইবাবই কথা। তবেই কর্মফলবাদ মানিতে হইলে পতি পত্নীর যোগ পরলোকে থাকিতে পাবে বলিয়া স্বীকাব করা যায় না। কিন্তু বিবাহেব যে একীকরণ উদ্দেশ্য পতি পত্নীকে যদি যথার্থই সেই একীকরণ হয়, অর্থাৎ পতি পত্নীকে যদি এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক রুচি, এক প্রবৃত্তি, এক কর্ম, এক ধর্ম হয় তবে ত কর্মফলবাদানুসাবেই তাহা পবলোকে এক ফল প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ সেই পতি পত্নীরূপেই থাকিবে। এবং সেই জন্যই ত মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন যে যে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর অনু-গামিনী হন তিনি ইহলোকে ত্যাগ করিয়া সেই স্বামীলোকেই গমন করেন। কর্মফলবাদের বিবাহের পারলৌকিকতা নাশ করে না, দূত করে। বিবাহের পারলৌকিকত্ব কর্মফলবাদের অবশ্যজ্ঞাবী ফল।

সীতা না কি রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—পবলোকে যেন তোমারই মতন

পতি পাই। ববীজ বাবু বলেন যে দাম্পত্য সম্বন্ধ পরলোকবাপী হইলে সীতা ‘তোমার মতন পতি পাই’ ও কথা না বলিয়া ‘তোমাকেই পতি পাই’ এই কথা বলিতেন। অতএব হিন্দুব দাম্পত্য সম্বন্ধ যে পরলোকবাপী নয় সীতার এই কথাটাও তাহার এতটা প্রমাণ। কিন্তু বামচন্দ্রের প্রতি সীতার কথা, এই হিসাবে বিবেচনা করিলে—‘তোমার মতন পতি পাই’—এ কথার ‘তোমাকেই পতি পাই’ ইহা ভিন্ন আর কি অর্থ হইতে পারে? বামচন্দ্র ভিন্ন বামচন্দ্রের মতন আর কে হইতে পারে? সাধী স্ত্রী মাত্রই আপন আপন পতিকে অতুলনীয় মনে করে। অতএব সাধী স্ত্রী যদি পতিকে বলে যে পরলোকে যেন তোমার মতন পতি পাই, তাহার অর্থই এট হই যে পরলোকে যেন তোমাকেই পতি পাই। আবাব ভাষার্থ বিবেচনা করিলেও সীতার কথাব সেই অর্থই হয়। ‘তোমার মতন লোকেব এ বকম কাজটা করা ভাল হয় নাই’ এই কথার ‘তোমার এ বকম কাজটা করা ভাল হয় নাই’ ইহাই বুঝায়। সম্মান বর্ধনার্থ শুধু ‘তোমার’ না বলিয়া ‘তোমার মতন লোকেব’ বলা যায়। অতএব যে দিক দিয়াই দেখ, সীতার কথাব অর্থ এই যে হিন্দুব দাম্পত্য সম্বন্ধ পরলোকবাপী, ইহলোক সম্বন্ধ নয়।

আমাদের তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই যে হিন্দু বিবাহের প্রকৃতি বিবেচনায় হিন্দু পুরুষের সম্বন্ধে হিন্দু স্ত্রীর বড়ই সম্মানের ও গোঁববেব পদ। হিন্দু বিবাহ প্রক্রিয়া দ্বারা হিন্দু পত্নীকে অতি পবিত্র ও পূজ্য পদার্থ করা হয়। এ কথা আমার ‘হিন্দু পত্নী’ নামক প্রবন্ধে বিশেষরূপে বুঝাইয়াছি। এখানে এট পর্য্যন্ত বলিলেই চলিবে যে বঙ্গের স্মার্ত শিবোন্নয়ন বসুনাথস্বামীর আমাদেব বিবাহ প্রক্রিয়াব অর্থ এই যে সপ্তপদী গমন বৈবাহিক হোম প্রভৃতি অলৌকিক ক্রিয়াব গুণে হিন্দু স্ত্রী অস্বাভাবিক ও যজ্ঞের যুগ কাষ্ঠের ন্যায় অলৌকিক পদার্থ হইয়া থাকেন। অলৌকিক শব্দেব অর্থ মানবদৃষ্টান্ত নয়, মানবদৃষ্টান্তের অতীত যে দেবদর্শন সেই দেবদর্শনক্রান্ত। অতএব হিন্দু পত্নী অলৌকিক সংস্কার সম্পন্ন অতি পবিত্র ও পূজনীয় অলৌকিক পদার্থ বলিলে সাদা কথায় এই বুঝায় যে হিন্দু পত্নী দেবতা। ভগবান মনুও বলিয়াছেন—

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেশু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন।

গৃহে স্ত্রীতে ও শ্রীতে অর্থাৎ সস্ত্রীতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

সতী স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, ‘যেখানে যেখানে তাহাদের পাদস্পর্শ হয়, সেইখানে সেইখানেই পৃথিবী মনে কবেন যে আমার আর ভাব নাই, আমি পবিত্রকারিণী হইলাম।’ এবং পাণচাবিণী ভিন্ন স্ত্রীলোক মাত্রেবই সম্বন্ধে লিখিত আছে যে ‘হোম তাহাদিগকে শৌচ প্রদান কবিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব তাহাদিগকে যধুরবাক্য প্রদান করিলেন, পাবক তাহাদিগকে সর্ষ প্রকায়ে পবিত্র কবিয়া দিলেন। অতএব যোষিদগণ সর্ষ প্রকায়ে পবিত্র হইল।’ সংস্কৃত পুৰাণ স্মৃত্যাদিব কত স্থানে যে এই রকম উক্তি আছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। ফল কথা, হিন্দু শাস্ত্রকারদিগেব মতে হিন্দু স্ত্রী বধার্ণই অতি পবিত্র দেবতা। এবং আমরা আজ এত যে হীন হইয়াছি, আমাদের মধ্যে এখনও সেই সংস্কার বর্তমান। অতি মুখ নিয়মজাতীয় হিন্দু বোন ব্যক্তি বোন স্ত্রীকে—ওধু আপন পত্নীকে নয়, যে কোন এবং বত স্মরণ স্ত্রী হউক না কেন—তাহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিলে, নিবতিশয় আগ্রহ সহকায়ে এই বলিয়া তাহাকে নিষেধ কবে— ‘আহা, বব কি, কব কি, স্ত্রীলোক লক্ষ্মী, লক্ষ্মীব গায়ে হাত তুলিতে নাই।’ সে দেশে আজও অপামব সাধাবণেব মুখে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায় সে দেশেব শাস্ত্রানুসারে এবং প্রকৃতজ্ঞানীগণের মতে স্ত্রী যে যথার্থই দেবতা এ কথা না মানিয়া কেমন কবিয়া থাকে? ফলতঃ যে দেশে সীতা স্বয়ং কমলাপতিব কমলা বলিয়া পূজিতা, সাবিত্রী সৌভাগ্যকামিনী ব্রতধিষ্ঠিতা ব্রতফলদায়িনী দেবী বলিয়া অর্চিতা, যে দেশে কুমারী পূজা বাতীত দেব পূজা ও দেব দর্শন ‘সকল হয় না, যে দেশে মঙ্গল খট কক্ষে লইয়া সতী স্ত্রী গৃহদ্বায়ে দাঁড়াইয়া মহাশক্তিকে আহ্বান না কবিলে স্বয়ং মহাশক্তিব গৃহ প্রবেশ হয় না সে দেশে স্ত্রীলোক পবিত্র পূজনীয় ও দেবীপদাক্রান্ত নন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অসম্ভব সঙ্গার হয়।

মোক্ষ সাধনরূপ জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যসাধন সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষেব যে রূপ সম্বন্ধ দেখা গিয়াছে তদ্বাবাই বুঝা যায় যে, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী বড়ই আদরের, বড়ই গৌরবেব সামগ্রী। স্ত্রী হিন্দু শাস্ত্রকারদিগেব দ্বারা অসংখ্যব জিনিষ হইলে তাঁহাবা কখনই স্ত্রীকে পুরুষেব মোক্ষসাধনেব সহকারিণী কবিচেন না—কখনই স্ত্রীকে অত উচ্চ পদে ও উচ্চ কার্যে প্রতিষ্ঠিত করিতেন না। স্ত্রীকে বাসন মাজা সবড়ি লওয়া প্রভৃতি দাস্য বৃত্তির

অধিক অধিবার দিডেন না। কিন্তু যে শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের এত আদব ও গৌরব
 'সেই শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের নিন্দাও ত আছে। না থাকিবে এমন কোন কথা নাই।
 স্ত্রীলোকের রূপমোহে ও মাধুর্য্যকুহকে অনেক সংযমীর সংযম নষ্ট হইয়া
 যায়। এই জন্য সংস্কৃত গ্রন্থে স্ত্রীলোকের যে সকল নিন্দাবাদ আছে তাহার
 উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রণীত ' ভারতমহিলা'
 নামক অতি সুন্দর গ্রন্থে অনেক দিন হইল লিখিয়াছিলেন যে 'এ সকল
 সংসারবিবাগী যোগী প্রভৃতি লোকের উক্তি; তাঁহাদের মন অন্য দিকে
 আসক্ত, স্ত্রীলোক পাছে তাঁহাদিগকে সংসারে বন্ধ কবে, এই ভয়ে তাঁহারা
 বনে বাস করিতেন।' স্ত্রী নিন্দার অন্য কারণও ছিল। স্ত্রী পুঙ্জনীয়া হইলেও
 স্ত্রীলোকের মধ্যে যে অনেক নীচ বা ছুট স্বভাবসম্পন্ন আছে তাহার সন্দেহ
 নাই। পুরুষের মধ্যে যাহা স্বভাবত দোষাশ্চেষ্টী নিন্দাপ্রিয় ও তিক্তস্বভাব
 তাহা কোন জিনিসের ভাল ভাগটা দেখে না, মন্দ ভাগটা দেখিয়া জিনি-
 সটা একেবারেই মন্দ বলিয়া বর্ণনা কবে। এবং সে রকম লোকে দুই পাঁচ
 জন ছুটা স্ত্রী দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতির যৎপরোনাস্তি নিন্দা করে। প্লাচীন
 ভারতেও সে প্রকৃতিব লোক ছিল। এবং তাহাবাই স্ত্রীলোকের নিন্দা
 করিয়া গিয়াছে। অতএব তাহাদের স্ত্রীনিন্দার উল্লেখ করিয়া হিন্দু শাস্ত্রানু-
 সারে ও হিন্দু সমাজে স্ত্রীজাতির পদ গোঁবরের পদ নয় এরূপ প্রমাণ করি-
 বার চেষ্টা করা বোধ হয় বড় একটা ন্যায্য কাজ নয়। ঘাঁহাবা বিলাতি
 সভ্যতার পক্ষপাতী তাহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে ইংবাজদিগের মধ্যে
 স্ত্রীলোকের খুব বেশী সম্মান। কিন্তু কোন কোন ইংরাজকে এমন কথা
 বলিতে শুনিয়াছি যে বিলাতি স্ত্রী মাত্রই ব্যভিচারিণী। ইংবাজদিগের মধ্যে
 স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে মুখে অসম্মানের কথা কহিলে কোন দোষ হয় না,
 পুস্তকাদিতে লিখিলে বড়ই দোষ হয়। কিন্তু লিখিলে যদি দোষ না
 হইত তাহা হইলে সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় ইংবাজ সাহিত্যেও স্ত্রীজাতির
 বিষয় নিন্দাবাদ দেখা যাইত। আবার ইংরাজ সাহিত্যে স্ত্রীজাতিব
 নিন্দা যে একেবারেই দেখা যায় না তা নয়। পুৰাতন ইংরাজি
 সাহিত্যে বিস্তর নিন্দা দেখা যায়। চূড়ান্ত উদাহরণ সেক্সপীয়ারের
 Faulty, thy name is woman. স্ত্রীজাতির নিন্দা লেখা হইবে না বলিয়া
 ইদনীং ইংবাজদিগের মধ্যে একটা ধর্ম্মঘট হইয়াছে। কিন্তু সে ধর্ম্মঘট সশেষও

এখনকার ইংরাজি সাহিত্যে স্ত্রীলোক নানা অনর্থের মূল এইরূপ অনেক স্ত্রীনিন্দা দেখা যায়। কিছু সে নিন্দা দেখিয়া ইংরাজদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির পদ সম্মানের পদ নয় এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিশ্চই ন্যায় সম্ভব হইতে পারে না। তবে সংস্কৃত সাহিত্যে স্ত্রীজাতির ছুই চাবিটা নিন্দাবাদ দেখিয়া হিন্দু ব মধ্যে স্ত্রীজাতির পদ গোববের পদ নয় এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন নীতি অনুসারে যে ন্যায় সম্ভব হয় তাহা এবে বাবেই বুঝিতে পারি না।

পুরুষ স্বতাবতঃ স্ত্রীজাতির কিছু বশ হইয়া থাকে। অতএব পুরুষকে সতর্ক কবিবার জন্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে কোন কোন স্থলে স্ত্রীনিন্দা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে।

ফল কথা, সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় অকপট সাহিত্যে সকল বিষয়ের সকল দিকই আলোচিত হইয়া থাকে—ভালদিক্ মন্দদিক্ আধ্যাত্মিক দিক্ অনাধ্যাত্মিক দিক্ আদর্শের দিক্ আচান আচরণের দিক্, সকল দিকই আলোচিত হইয়া থাকে। অতএব একপ সাহিত্যের এক দিক ধরিয়া অশব্দ দিকেব অসত্যতা বা অসাব্যতা অনুমান বলা নিতান্তই ন্যায় যুক্তি ও সুনীতি বিরুদ্ধ। একপ সাহিত্যের সকল দিকেব সামগ্র্য কবাই ন্যায়বান ব্যক্তির প্রধান ও প্রকৃত বর্জ্য। নহিলে বিষম গোল বাধিবাব সম্ভব না। কারণ তুমি যেমন স্ত্রীজাতির নিন্দাবাদের উল্লেখ করিয়া বলিতেছ যে শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির স্তুতিবাদের যে কথা আছে তাহা কোন কাজেব নয়, তোমার প্রতিপক্ষও তেমনি স্ত্রীজাতির স্তুতিবাদের উল্লেখ করিয়া বলিতে পারে যে সংস্কৃত গ্রন্থে স্ত্রীজাতির যে নিন্দাবাদ আছে তাহা কোন কাজেব নয়। এবং বলিলে তোমারও কথাটি কহিবাব যো থাকে না।

ইংরাজের মধ্যে স্ত্রীজাতি সম্মানের সামগ্রী। তাই বলিয়া সকল ইংরাজই যে স্ত্রীজাতিকে সম্মান কবে তা নয়। এবং বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ এক শত কি এক সহস্র ইংরাজ স্ত্রীজাতিকে অসম্মান করিলেও ইংরাজজাতির ধর্ম-শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীজাতি সম্মানিত এই মূল কথাব বিপর্যয় ঘটে না। হিন্দু ব মধ্যেও তেমনি যদি কেহ স্ত্রীজাতির প্রতি অবজ্ঞানুসার ব্যবহার কবে তবে তদুদ্যম হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্ত্রীজাতি যে অতি পবিত্র ও পূজনীয় এ কথাব বিপর্যয় ঘটে না। অতএব যুক্তি শাস্ত্রানুসারে একজন যুধিষ্ঠির একটি দ্রৌপদীকে দ্যুতক্রীড়ায় বিক্রয় করিলেও শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির যে গোবব কথা

আছে তাহাব বিপর্যয় ঘটে না। কিন্তু যুধিষ্ঠির যে দ্রৌপদীকে দ্বাভে পণ করিয়াছিলেন তাহাব প্রকৃত অর্থ কি একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। ধার্মিক যুধিষ্ঠির বর্ষন শাস্ত্রদুষিত ধর্মবিগর্হিত দ্যাতক্ৰীড়ায় গমন কবেন তখন ভাব-
তের বাকবংশের উপর কালের কাল ছায়া পড়িয়াছে। সেই ছায়ায় লুকা-
ইয়া এক অতি ভীষণ নিয়তি কুরুবংশ ও পাণ্ডুবংশ এবং ভাবতের অপব
সমস্ত বাক্যন্যবর্ণকে সেই কবাল কুবক্ষত্রেব দিকে টানিতেছে। নিয়তি
সকল দেশে সকলকেই এক সময় না এক সময় এই বকম কবিতা টানিয়া
থাকে। সেই কালের ছায়ায় ধর্মপুত্রের মতিবুদ্ধি আচ্ছন্ন, সেই নিয়তির
টানে ধর্মপুত্র অত্মকর্তৃত্বহীন, অত্মহাব। উচ্ছন্নমতি বলিয়া, নিয়তির নিষ্ঠুর
নিগড়ে আবদ্ধ বলিয়া তিনি আত্মত্যাগ ধর্মপত্নীকে দ্বাভে বিক্রয় কবিতো-
ছেন, এবং আপনাকে আপনি বিক্রয় কবিতোছেন। উচ্ছন্নমতি না হইলে
নিয়তির নিতান্ত অধীন না হইলে এ সংসারে কে আপনাকে আপনি বিক্রয়
করিয়া থাকে? মৃগ আবাদ বখনও সোণা কপাব হইয়া থাকে? কিন্তু
আজ সেই ভীষণ বাক্য সমবেব দ্বাবদেশে উপনীত হইয়া স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা
দেবী পঞ্চবটী বনে সোণাব মৃগেব জন্য লালায়িত আব স্বয়ং বিষ্ণু বামচন্দ্র
ধনুর্ধারণ লইয়া সোণাব মৃগ মাঝিতে উদ্যত। এ সকল জীবনেব মহানাটবেব
কথা। এত বড় কবি হইবা ববীজ্ঞনাথ কেমন কবিতা মহাভাবতের মহানাট-
কের এমন অর্থ কবিলেন আমি ভাববা পাই না। তবে ত তিনি এ কথাও
বলিতে পাবেন যে নলগাজা নিতান্ত অশ্রোমিক ও স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন
বলিয়া নিমিড় অরণ্য মধ্যে নিতান্ত ককণাপ্রাথিনী বায়মনোবাবো একান্ত
অমুগামিনী সেই অঙ্কশায়িতা নিদ্রাভিত্ততা দমরস্তীকে ফেলিয়া গিয়াছিলেন!
আর মহাভারতের যে স্থান ইচ্ছা সেই স্থান খুলিয় দেখ- দেখিবে হয় ভীষ্ম,
নয় বিদূর, নয় ধৃতরাষ্ট্র, নয় গান্ধারী, নয় পাণ্ডবগণ বলিতেছেন যে
কৌরবেরা দ্রৌপদীকে অপমান না কবিলে এত ডুমুল কাণ্ড হইত না! এক
স্থল হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি:—

সজ্জয় কহিলেন, হে মহাবাজ! তোমাবই অদৃষ্টক্রমে এই মহতী শত্রুতা
সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনববত লোক বিনাশ হইবে। যৎকালে
তোমার পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডব সহধর্মিণী ধর্মচারিণী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে
আনয়ন করবাব পরামর্শ কবে, মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদূর তাহাকে

হারবার নিবেদন করিয়াছিলেন। দুরাশ্বা উহারদের বাক্যে কর্ণপাণ্ডও না করিয়া পাঞ্চালীকে আনয়ন করিতে আদেশ দিয়া হৃতপুত্র ঐতিহাসিককে প্রেরণ করিল। * * * দুরাশ্বা সভামধ্যে পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়া এই অতি ভয়ানক তুহল কাণ্ড সমুপস্থিত করিয়াছে।” এই কথা শুনিয়া যুতরাষ্ট্র সজ্জকে কহিতেছেন:—“হে সজ্জ! তদনন্তর সর্বদম্বিৎ বিহুর আমাকে কহিলেন যে, পঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ণা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তিনি যখন সভামধ্যে আনীতা হইয়াছেন, তখন আর নিস্তার নাই; কুলবংশের এই পর্যন্ত শেষ হইল। ঐ দেখ পাঞ্চালী পাণ্ডবগণের সহিত গমন করিতেছেন; উহার এতাদৃশ রূপ দর্শন করিয়া পাণ্ডবেরা কখনই ক্রান্ত থাকিতে পারিবেন না। * * অর্জুন পঞ্চালগণ পবিত্র হইয়া আসিবেন এবং মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তাহারিগের মধ্যে যমদণ্ডেব নায় গদা ঘূর্ণন করিতে করিতে আগমন করিবেন। যখন ভূপতিগণ কখনই অর্জুনের গাণ্ডীব নির্ঘোষ ও ভীমেব ভীম গদা বেগ সহ্য কবিত্তে পারিবেন না। অতএব আমার মতে পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহ অপেক্ষা সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ।” (কালীপ্রসন্ন সিংহের মছান্তরত, সভাপর্ক, অগ্নিদূত পর্কাদ্বায়, ৯৭ অধ্যায়।)

দেখা গিয়াছে যে হিন্দুবিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক এবং উন্নয় যে সাংসারিক বা ব্যাবহাবিক উদ্দেশ্য আছে তাহা ঐ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের অধীন। এই সিদ্ধান্তের ফলে রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া বাইতেছে। কারণ হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সাংসারিক এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্র বাবুর প্রায় সমস্ত কথাই লিখিত। অতএব হিসাব মত এই স্থানেই আমার প্রবন্ধ শেষ হয়। তথাপি আরও ঐকটিকতক কথা বলিব। হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক বলিয়া উহার বন্ধন ইহলোকে ছিন্ন হয় না, পরলোকেও থাকে। “এতদ্ব্যং কারণাত্মাজন পানিগ্রহণমিচ্ছাতে। বদাপ্রোতি পতিভার্যামিহলোকে পবত্র চ ॥” (মহাভারত) যে বিবাহের বন্ধন ছিন্ন হইবার নয় সে বিবাহ জীপুরুষের চুক্তিমূলক হইতে পারে না। কারণ চুক্তির গোড়ার নিয়ম থাকে এবং সেই নিয়ম ভঙ্গ হইলে চুক্তি ভাঙ্গিয়া যায়। অতএব কোন কারণে ভঙ্গ হইবে না এমন চুক্তি হইতেই পারে না। আবার বাহ্যিক চুক্তিতে বন্ধ হয় তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক

আবশ্যক, কিন্তু বিবাহ হইলে হিন্দু স্ত্রী ও পুরুষের স্বাভাব্য থাকে না, তাহাদিগকে দুই জনে মিলিয়া একজন হয়। চুক্তিতে দুই জনে মিলিয়া কিছুতেই একজন হইতে পারে না। অতএব হিন্দুর বিবাহে চুক্তির নিয়ম বাটে না। চুক্তির নিয়ম যদি না থাকিল, তবে বিবাহার্থ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পরকে পছন্দ করিবার আবশ্যকতা থাকে না। অতএব হিন্দু স্ত্রী ও হিন্দু পুরুষ উভয়েরই অল্প বয়সে বিবাহ হইতে পারে। হইলে সে বিবাহ অসিদ্ধ হয় না।

হিন্দু বিবাহ যদি অল্প বয়সে হইতে পাবিল তবে ঐ বয়সে কিসে রকম হওয়া উচিত, এই কথাটা একটু বিশেষ কবিতা বিবেচনা করা আবশ্যক। দেখা গিয়াছে যে ধর্মচর্যা দ্বারা মুক্তি লাভ কবিবার জন্য হিন্দু দার পরিশ্রম কবে। এ বড় সামান্য উদ্দেশ্য নয়। সামান্য কথায় যাহাকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা বলে, তদপেক্ষা এ উদ্দেশ্য যে কত উচ্চ তাহা বলিয়া উঠা যায় না। যাহাকে লইয়া এত বড় উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে তাহাকে নিজে গড়িয়া লওয়াই ঠিক পদ্ধতি। কোন একটা বড় কাজ কবাইয়া লইতে এ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করাইতে হইলে সকলেই আপনার আপনার ‘বনামা’ লোক দ্বারা তাহা কবাইয়া থাকেন। সন্তান পিতার বংশের অমুখ্যারী, পিতার ধর্মাক্রান্ত, পিতার কচি প্রবৃত্তি বাবসায় রুজিব অমুগামী হইবে বলিয়া পিতা শৈশব হইতেই সন্তানকে স্বয়ং শিক্ষা দিয়া থাকেন। সন্তান বড় হইয়া আপনিই পিতৃবৎ ও পিতৃবংশামুখ্যারী হইয়া উঠিবে, এরূপ ভাবিয়া কোন পিতাই সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকিতে সাহস করেন না। পরের ছেলেকে আপনার কবিতে হইলে শৈশবেই পবের ছেলেকে দত্তক গ্রহণ করিতে হয়। শৈশব হইতে শিক্ষা পাইয়া ব্যয়কেও মনুষ্যের অমুগামী হইবার কথা শুনা গিয়াছে। অতএব পত্নীকে আপন মহৎ উদ্দেশ্যের অমুগামিনী কবিতে হইলে তাহার সমস্ত শিক্ষা আপনার হাতে রাখা আবশ্যক এ কথা অবশ্যই স্বীকার কবিতে হইবে। নিজের শিক্ষিতা নয় এমন বেশি বয়স্ক স্ত্রীলোকের মধ্যে সর্ব রকমে ও সকল অবস্থায় ও চিরকালের মতন নিজের অমুগামিনী হইতে পারে, এমন স্ত্রী যে একেবারেই পাওয়া বাইতে পারে না, এমন কথা বলি না। কিন্তু পাইবার সম্ভাবনা বড় কম। কিন্তু সেরূপ স্ত্রীর প্রয়োজন সকলেরই, আর যে উদ্দেশ্য

দেহপত্নীর প্রয়োজন, তাহা যার পর নাই উচ্চ ও গুরুতর। এমন
 স্থলে সম্ভাবনার পথে না গিয়া নিশ্চয়তাব পথে অথবা কম
 সম্ভাবনার পথ ছাড়িয়া বেশি সম্ভাবনাব পথে যাওয়াই কর্তব্য।
 অর্থাৎ অন্যের শিক্ষিতা স্ত্রী না লইয়া নিজে স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া
 প্রস্তুত করিয়া লওয়া ভাল। অতএব স্ত্রী যৌবন প্রাপ্ত হইবার এবং
 শৈশবের সীমা অতিক্রম করিবার পূর্বে তাহার পাণি গ্রহণ করা কর্তব্য।
 বিবাহ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য যে পতি পত্নীর একীকরণ তাহা সিদ্ধ হওয়ার পক্ষেও
 এইরূপ স্ত্রী গ্রহণ করা অধিকতর বিহিত বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রী দেহ মন হৃদয়
 আত্মা সব যখন শূন্য, কিছুই কোন বকমে অধিকৃত হয় নাই, তখন হইতে
 পতির শিক্ষাধীন হইলে তাহাব সেই দেহ মন হৃদয় আত্মা সমস্তই
 তাহাব পতি কর্তৃক অধিকৃত হইবার যত সম্ভাবনা, কোন রকমে অধিকৃত
 হইবার পর, পতির শিক্ষাধীন হইয়া পতিকর্তৃক অধিকৃত হইবার
 তদপেক্ষা অনেক কম সম্ভাবনা। আমাদের সম্ভানাদি যে
 আমাদের এত অলুপ হয় তাহার কাবণই এই যে শৈশব হইতে
 আমরা সম্ভানদিগকে আমাদের মনোমত শিক্ষা দি। এইরূপ শৈশব
 হইতে শিক্ষা দিয়া জেমস্ মিল্ আপন সম্ভান জন ট্যুয়ার্ট মিলকে
 দোষে গুণে কেমন ঠিক্ আপনাব মতন কবিতা তুলিয়াছিলেন, তাহা
 কাহারো অবদিত নাই। অন্যকে আপনাব মতন করতে হইলে শৈশব
 হইতে অন্যকে শিক্ষা দ্বারা গড়িয়া লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। এইরূপে
 গড়িয়া লইলে সম্ভাব ও প্রণয়ও খুব বেশি হয়। কাবণ সম্ভাব ও প্রণয়
 লক্ষ্য রকমে এক হইবারই ফল স্বরূপ। মাছুষে মাছুষে যত এক হইবে
 তাহাদের প্রণয়ও তত বাড়িবে। ইহা মাছুষের প্রকৃতিগুণে হয়—ভগবানের
 নিয়ম গুণে হয়। ইহাকে জাঁতায় পেয়া প্রণয় বলে না। অথবা ইহাকে যদি
 জাঁতায় পেয়া প্রণয় বলা ঠিক হয়, তবে জগতের কি যে জাঁতায় পেয়া নয়, তাহা
 নির্ণয় করা যাক না—মাছুষের বুদ্ধিও জাঁতায় পেয়া, শিক্ষাও জাঁতায় পেয়া,
 শ্রম ও জাঁতায় পেয়া, কৃতিও জাঁতায় পেয়া, সবই জাঁতায় পেয়া। অতএব
 জীবনের মহত্বদেয় সাধিবার জন্য পতিপত্নীর যে একীকরণ আবশ্যক তাহা
 সম্ভাবনার বালিকা স্ত্রী বিবাহ করা একান্ত কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ বাবুও প্রকার-
 ক্তরে সেই কথা বলেন। তিনি বলেন, যে একান্তবর্তী পতিবারে বালিকা স্ত্রী

আবশ্যক, কারণ সে পরিবারে জীকে অনেকের সহিত মিলিতে মিলিতে হয় । কিন্তু অন্যের সহিত মিলবার মিশিবার জন্য জীর যদি বালিকা হওয়া আবশ্যক হয় তবে পতির সহিত মিলিবার মিশিবার জন্য বালিকা হওয়া আবশ্যক না হইবে কেন ? বরং বেশি আবশ্যক হইবে । কারণ জীর অন্যের অপেক্ষা পতির সহিত অনেক বেশি মিলিতে মিলিতে হইবে । কিন্তু রবীন্দ্র বাবু বলেন যেখানে পরিবাব একান্তবর্তী নয়, সেখানে জী বালিকা হইলে চলে না, কারণ বালিকা জীর রক্ষণাবেক্ষণাদি করে কে ? কাজেই সে রকম পরিবারে একেবারে ঘর করা করিতে পারে, এমন বড় মেয়ে বিবাহ করা আবশ্যক । আজ কাল এ দেশে অনেক একান্তবর্তী পরিবার ভাঙিতেছে । কেন ভাঙিতেছে, ভাঙা উচিত কি না ও ভাঙা বন্ধ হইতে পারে কি না, এ স্থলে সে সব বখাব বিচার নিম্প্রয়োজন । কারণ উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র দেখা আবশ্যক যে যেখানে একান্তবর্তী পরিবার নাই, সেখানে মা বাপও কি নাই ? মা বাপ থাকিলে, বালিকা জী বিবাহ করিয়া ঘরে আনিবাব আপত্তি কি ? তবে যদি আজ কালিকার বিলাতি শিক্ষার গুণে মা বাপের সঙ্গে থাকিতেও কষ্ট হয় তবে আপনি যেমন মা বাপের দ্বারা মানুষ হইয়াছি, তেমনি জীটিকেও তাঁহাদের সাহায্যে মানুষ করিয়া লইয়া তাঁহাদের কাছ থেকে সবিস্ময় পড়ায় ক্ষতি কি ?

ধর্মচর্চার দ্বারানৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যদি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত হয়—উচিত নয় এমন কথা কে বলিবে ?—তাহা হইলে খুব বেশি বয়স প্রাপ্ত হইয়া নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ না করাই কর্তব্য । নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলে, অতি অল্প সংখ্যক উৎকৃষ্ট নয় নারী ছাড়া লোকে সাধারণত আপন আপন সুখ সম্বন্ধে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে শিখে । আমাদের মধ্যে বাহারা ধর্মবান বিবাহের পক্ষপাতী, তাহারা সেই জন্য এই বলিয়া বাল্যবিবাহের নিন্দা করে যে যে বিবাহের উপর লোকের সমস্ত সুখ দুঃখ নির্ভর করে ও বাল্য বিবাহে সেই বিবাহ সম্বন্ধে লোকের নিজের মতামত চলে না ।

* পিতা মাতাকে সন্তানের বিষয় সম্পত্তির উপর বন্ধন অসমর্থতা অধিকার দেওয়া হইতেছে না, তখন তাহার অধিকতর বুল্যবান সম্পত্তি—স্বত্বের

কিন্তু নিজের সুখ সচ্ছন্দ বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য এই সংস্কার অবলম্বনে
বিবাহের যে একটা উচ্চতর আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে বা থাকে উচিত
এ সংস্কার লোকের মনে স্থান পায় না এবং পাইলেও শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়।
এ বড় কম অনিষ্ট নয়। একরূপ ঘটিলে বিবাহ পণ্ড পক্ষীর মিলন অপেক্ষা বড়
একটা উৎকৃষ্ট হয় না, এবং বিবাহ যদি পণ্ড পক্ষীর মিলন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট
না হয়, তবে বিবাহ না হওয়াই ভাল। আবার নিজের সুখসচ্ছন্দের জন্য
বিবাহ—একরূপ সংস্কার হইলে নিজের সুখসচ্ছন্দকেই সমুহ ব্যাঘাত ঘটে।
নিজের সুখসচ্ছন্দ নিজের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইলে সুখ-
সচ্ছন্দে আকাঙ্ক্ষা কেবল বাড়িতে থাকে, সুখের পিপাসা কিছুতেই মিটে
না, সুখসচ্ছন্দে পরিবর্তে অসুখ ও অসন্তোষই বৃদ্ধি হয়। নিজের ভোগ
স্বচ্ছন্দ পরিভূতির জন্য মানুষ যেটা বেশি অনুষণ করে সেইটাই মানুষ পায়
না, সেইটা সম্বন্ধে বেশি বঞ্চিত ও আত্মপ্রতারিত হয়। এইজন্যই হিন্দু
শাস্ত্রে বাসনা বিসর্জন ও নিকাম কর্মের ব্যবস্থা, খৃষ্টধর্মে resignation বা
ঈশ্বরে আত্মা সমর্পণের কথা এবং ইরোপীয় সাহিত্যের আত্মিক অংশে
contentment বা তৃপ্তিভাৱের উপদেশ। অতএব বিবাহের উচ্চ আধ্যাত্মিক
উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে হইলে এবং বিবাহ করিয়া সাধারণত সুখ সন্তোষ
লাভ করিতে হইলে, বেশি বয়সে নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ না করাই
উচিত। বয়স বেশি হইবার পূর্বে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনে দেখিয়া
তিনিয়া বিবাহ দিলে, লোকের মনে স্বভাবতই এইরূপ সংস্কার জন্মে যে
বিবাহ নিজের নিজের সুখ সচ্ছন্দে জন্য নয়, বিবাহের অন্য উচ্চতর উদ্দেশ্য
আছে। 'এইজন্য হিন্দুর মধ্যে পতিপত্নী পরস্পরের নিকট আপন আপন
সুখসচ্ছন্দ অনুষণ করে না, পরস্পরে পরস্পরের ক্রটি খুঁজিয়া বেড়ায়
না, পরস্পরে কেবল পরস্পরের জন্যই আছি, এইরূপ ভাবিয়া সংসার ধর্ম
করে না, উভয়ে মিলিয়া ধর্ম কর্ম করিয়া এবং সমস্ত পরিবারবর্গের
সেবার জীবন উৎসর্গ করিয়া অনার্যাসে সুখ ও সন্তোষ লাভ করে। এইজন্য

সুখ হুঃখের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করিবার অধিকার পিতা মাতাকে দেওয়া কি
একবারে সম্ভব হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। শ্রীকবী, ২২শে
আশ্বিন ১২৩৪।

হিন্দু সাত পত্নীৰ ৰূপ খুঁজে না, বৈশভূষা খুঁজে না, ঈশক্ ঈশক্ খুঁজে না, চোৰকো চোৰকি, মুখোমুখি, বৈৰাঘ্যেৰি, হাত ধৰাধৰি পা-চলাচলি খুঁজে না।
এবং নিজৰ নিজৰ বেশি ধোঁজা খুঁজি নাই বলিয়া তাহাদেৱে নিজৰ নিজৰ জন্য জালা যন্ত্ৰণা অস্ত্ৰ অসন্তোষও বড় একটা নাই। এই জনাই এত অধঃপতনেৰ দিনে এবং প্রকৃত হিন্দু শিক্ষাৰ এত অভাবেও, এমণে সাধাৰণত এবং নিম্ন শ্ৰেণীৰ মধ্যেও স্ত্ৰী পুৰুষেৰ ভিতৰ বে পরিমাণ অস্থ সন্তোষ ও সন্তাব আছে, ইংৰাজাদি আজি কালিকাব পূৰ্ব সন্তাও শিক্ষিতদিগেৰ স্ত্ৰীপুৰুষেৰ ভিতৰ সে পরিমাণ নাই *। সামাজিক শাস্তি ও শৃঙ্খলাৰ হিসাবে হিন্দু বিবাহ প্ৰণালীৰ এ বড় কম উপকাৰিতা নহয়। সে প্ৰণালী পৰিত্যাগ কৰিলে হিন্দু দম্পতীৰও যেন অস্থ অসন্তোষ অনাশ্চি

* "The proportion of unhappy marriages is larger in England than in India, still larger in America. After close observation during six years devoted especially to the study of social phenomena in the west I have come to the conclusion that the proportion of unhappy marriages in England and America is due to the very conception of marriage upon which the present reform agitation is based, namely, as an instrument of attaining personal happiness, and not as a means of, serving family and society, of making others happy besides the couple themselves. I hold it as a strong conviction that this desire of personal gratification is an utterly unsafe thing to be trusted, even in the accomplishing of that which is its avowed object, namely, happiness. For being increased by cultivation it never succeeds in gratifying itself, while it encroaches upon the rights of others, even of the object of its own love. Facts and phenomena in modern Europe are obtruding illustrations of this truth, not only in the home, but also in the relations of the outside world."

Amrita Lal Ray.

The Speeches of Eminent Indian gentlemen on "Hindu marriage customs" delivered at the meeting held on the 6th August, 1887, at Sobhabazar Rajbati. Appendix B p. 96

ও 'মানসিক অস্থিরতা' বৃদ্ধি হইবে কিন্তু সন্তানের ও তেমনি অল্প অশান্তি ও অশান্তি ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হইবে । অল্প অশান্তি ও অশান্তি ও অস্থিরতা কি শারীরিক জীবন কি নৈতিক জীবন সকল প্রকার জীবনের প্রতিকূল । এবং হিন্দু জাতিব ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বৃষ্টিতে পারা যায় যে এই সমস্ত বিঘটনা হিন্দু প্রকৃতির কিছু বিশেষ বস্তু বিরোধী । অতএব হিন্দুর বিবাহ প্রণালী পরিবর্তন করিলে হিন্দুর শারীরিক জীবন ও ধর্ম জীবন উভয় জীবনই ক্রমে ক্রমে ও খর্ব হইয়া শেষে লয় প্রাপ্ত হইবে ।

তবেই বুঝা যাইতেছে যে বিবাহের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল বাধিবার জন্য, পতিপত্নীর স্তব্ধ, সন্তোষ ও সন্তাব গৃহ ও সহজ-লজ করিবার জন্য, এবং পাবিব্যিক ও সামাজিক শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য বিবাহ বেশি বয়সে নিজ নিজ পছন্দানুসারে না হইয়া অপেক্ষাকৃত কম বয়সে পিতা মাতা প্রকৃতি শুদ্ধজনেব পছন্দানুসারে ও কর্তৃধাবীনে সম্পন্ন হওয়াই কর্তব্য ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহের যে প্রকার প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়াছে তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে হিন্দু বিবাহ স্বৈচ্ছাধীন ও সখের কাজ নয় । বিবাহ মানবের একটি গুরুত্ব নির্বন্ধ । তাই আমাদের বিবাহ, কার্য্য নিজেব নিজেব হাতে নাই এবং আমাদের বিবাহ বন্ধনের ছেদও আমাদের স্বৈচ্ছাধীন নয় । বিবাহের এই নির্বন্ধ রূপ ভাব এবং বাহাদের বিবাহ, বিবাহে তাহাদেব এই আত্ম কর্তৃত্ব-হীনতা—এই দুয়ের মধ্যে যে গূঢ় গুহা ও গভীর একতানতা আছে, তাহা জগৎপতির স্থাপিত জাগতিক নির্বন্ধ ও জীবের জাগতিক নির্বন্ধাধীনতা এই দুয়ের মধ্যস্থিত গূঢ় গুহা ও গভীর একতানতার সম্পূর্ণ অনুরূপ । এবং জগৎ ও জীবের নির্বন্ধ মূলক একতানতা যেমন জীব ও জগতের সন্তাব ও প্রণয়ের গূঢ় অপরিচ্ছেদ কারণ, বিবাহ ও বিবাহিতের নির্বন্ধ মূলক একতানতাও তেমনি পতি পত্নীর সন্তাব ও প্রণয়ের গূঢ় অপরিচ্ছেদ কারণ । এই জন্যই হিন্দুর ভিতর এত বেশী সম্পত্তির মধ্যে এত বেশী প্রেম ও সন্তাব । হিন্দুর দাম্পত্যবিবাহ বলিয়া বাহারা বলে, যে হিন্দু দাম্পত্যের মধ্যে প্রণয় নাই তাহারা জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা কথা কয় । হিন্দুর বিবাহ প্রণালী, জগৎ পতির গূঢ় জাগতিক নির্বন্ধ-প্রণালীর অনুরূপে রচিত—মহানৈতিকতার মহানৈতিকতার, আত্মসং

করিতে। আদর্য হইয়াও, এই সকল বিবাহের আদর্য করিয়া দিয়া
কিমে বিবাহের কথা কইরা আদর্য করিয়া করিয়া করিয়া করিয়া
দাড়া করিতাম না।

পূর্বেই বলিয়াছি যে হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক বলিয়া উহার
সে ক্ষণে কোন উদ্দেশ্য নাই তা নয়। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা এমন মূর্খ ছিলেন
কাকে মহাব্যবস্থা মধ্যে ভোগ-স্পৃহা রূপ-তৃষ্ণা প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পান
নাই। বহু বলেন:—

অধ্যাত্মীং সৌমানসীং হংসবারণগামিনীং।

তদুলোমকেশদশনাঃ মৃদুকীমৃদুহেং ত্রিভং ॥

(৩ অ—১০)

কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য কেবল শারীরিক সৌন্দর্য বলিয়া উপভোগ করিলে
মহাব্য ভোগ স্পৃহা ও অজ্ঞ প্রকৃতির দাস হইয়া পড়ে এবং তাহার নৈতিক
উন্নতির পথ ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য নৈতিক
ও আধ্যাত্মিক। অতএব শুদ্ধ শারীরিক রূপ দেখিয়া বিবাহ করিলে হিন্দু
বিবাহের মহত্বদেশ্য বিকল হইবার কথা। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা
করিয়াছেন যে শারীরিক সৌন্দর্য মানসিক সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি বলিয়া
শারীরিক সৌন্দর্য খুঁজিতে হইবে। বহু বলেন:—

উদহত বিজো ভাৰ্য্যাং সৰ্বণাং লক্ষণাদিতাং।

(৩ অ—৪)

ব্রাহ্মণ লক্ষণাক্রান্ত সৰ্বণা স্ত্রী বিবাহ করিবেন।

জানীয়াত্রেই এ ব্যবস্থার সারবত্তা স্বীকার করিবেন। আমাদের
মধ্যে প্রায় সকল পিতা মাতারও স্ত্রীলোক বউ করিবার সাধ। এবং জাতি
বন্ধন ও কন্যার লক্ষণাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বউ স্ত্রীলোক বধু পাওয়া
যাই, প্রায় সকল পিতা মাতাই সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেবল পিতা
মাতার প্রতি প্রকৃত ভক্তি প্রভা নাই বলিয়া এবং রূপ ছাড়া আর কিছুই
এতি শিকিত যুবকদের লক্ষ্য নাই বলিয়া, আজ কাল অনেক পিতা
মাতার কন্যা বিবাহের অলঙ্কার এবং নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ
করিবার জন্য উদ্যত। ইহা নৈতিক অবস্থার লক্ষণ এবং বহু দিখাই

প্রথা প্রবর্তিত কবিলে এই নৈতিক অবনতি ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে। বাহাকে গৃহের লক্ষ্য স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত কবিত হইবে, তাহাব শুধু রূপ দেখিলে চলিবে না, তাহাব জাতি, কুল, ঘর ও সুলক্ষণাদিও বিশেষ কবিয়া দেখা আবশ্যক। নিজে কন্যা নির্বাচন কবিলে এসকলেব প্রতি দৃষ্টি থাকে না, অতএব সর্বাঙ্গীন মঙ্গলার্থ পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন কর্তৃক কন্যা নির্বাচিত হওয়া উচিত। এবং পিতা মাতা প্রভৃতিব নির্বাচনের কেহ বিবোধী না হয় এই জন্য পুত্র কন্যা উভয়েবই অপেক্ষাকৃত কন বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত এবং পিতা মাতাব প্রতি বাহাতে প্রকৃত ভক্তি হয় পুত্র কন্যা উভয়েকেই এই বকম শিক্ষা দেওয়া অ বশ্যক।

কম বয়সে বিবাহেব ফল স্বরূপ শারীরিক অপকাব হয় কি না এখন এই কথাব আলোচনা আবশ্যক। যাহাবা বালাবিবাহেব বিবোধী তাহাবা বলিয়া থাকেন যে, সেখানে বালাবিবাহ প্রচলিত থাকে, সেখানে লোকেব শরীর দুর্বল হয়, এবং উদাহরণ স্বরূপ তাহাবা বাঙ্গালীব শারীরিক দুর্বলতার উল্লেখ কবিয়া থাকেন। এই নত সম্বন্ধ কয়েকটি কথা বিবেচনা বলা আবশ্যক।

প্রথম কথা এই যে উত্তর পশ্চিমে বালাবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু সেখানকাব লোক বেশ বলিষ্ঠ—বাহবলে ইউরোপীয়দিগেব সমকক্ষ। বিজ্ঞানেব inductive প্রণালী অনুসাবে এই একটি মাত্র ব্যতিক্রমে এই মতটি অসিদ্ধ হইতেছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, যদি বল উত্তর পশ্চিমেব জল হাওয়ার স্থানে তথায় বালাবিবাহেব দবণ শারীরিক অপকাব ঘটিতে পাবে না, প্রত্যুত্তবে বলা যায় যে বাঙ্গালাব জল তাওয়া উত্তর পশ্চিমেব জল হাওয়া অপেক্ষা অনেক পবিমাণে খাবাপ। অতএব বাঙ্গালাব জল হাওয়াব দোমে তথায় লোকেব শরীর দুর্বল হয়, বালাবিবাহেব অন্য হয় না।

তৃতীয় কথা এই যে বাঙ্গালাব শুধু মানুষ যে দুর্বল তা নয়, ছাগ, মেঘ, গো মহিষাদিও দুর্বল। ইহাতেই বোধ হয় যে বাঙ্গালায় এমন একটা কিছু আছে যাহা বাঙ্গালার শুধু মানুষকে নয় গো মেঘাদিকেও দুর্বল করে। সে জিনিসটা বালাবিবাহ নয়, কারণ গো মেঘাদিবি বাণ্য বিবাহ নাই। ববীজ বাবু বাঙ্গালাব বাঘেব দৃষ্টান্ত দিযা এই যুক্তিটা কাটিয়া ফেলিতে

চান। কিন্তু বাঙ্গালাব জল হাওয়া বা বনজল বাঘের স্বাস্থ্যকর বা উপ-
যোগী হইতে পারে, মানুষের বা গো মেষাদি ন। হইতে পারে। এঁদো
স্যাংসোতে জায়গায় মশা মাছি কুনি কীট খুব বাড়ে, কিন্তু মানুষ ও গো
মেসাদি স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ববীন্দ্র বাবু অনুমান কবেন যে বাঙ্গালী গো
মেসাদি পালন কবিতো জানেন না বলিয়া বাঙ্গালাব গোমেসাদি দুর্বল ও খর্ব।
কিন্তু উত্তরপশ্চিমের লোকও ত পশুপালন বিদ্যায় অনভিজ্ঞ, অথচ উত্তর-
পশ্চিমের গো মেসাদি বিলক্ষণ বলবান। আব বাঙ্গালী পশুপালনে অন-
ভিজ্ঞ বলিয়াই যদি বাঙ্গালাব গবাদি দুর্বল হইয়া থাকে তবে বাঙ্গালী
নিজের শবাব পালনে অনভিজ্ঞ বলিয়া বাঙ্গালাব লোক দুর্বল, একথা বলাই
বা চলিবে না কেন?

চতুর্থ কথা এই যে বাঙ্গালাব জল হাওয়ার দোষে বাঙ্গালাব লোক যে
দুর্বল হইয়াছে একপ অনুমান কবিবাব এটি বিশিষ্ট কারণ আছে। বিশ
ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালাব এখনকার ন্যায় প্রবল ও ব্যাপক ম্যালেরিয়া
ছিল না। তখন এই বাঙ্গালাব লোকই এখনকার অপেক্ষা অনেক গুণে
বলিষ্ঠ সুস্থকায় কার্যক্ষম ও শ্রমশীল ছিল। আমি সে সময়ও
দেখিয়াছি এবং সে সময়ের বাঙ্গালীও দেখিয়াছি। আব এই কয়েক
বৎসরের ম্যালেরিয়াতে বাঙ্গালী কি হইয়া গিয়াছে, তাহাও দেখিতেছি।
একটা জলপূর্ণ মশকের মুখ খুলিয়া দিলে তাহার জলটা যেমন
হুড় হুড় করিয়া বাহির হইয়া যায় এবং মশকটা দেখিতে দেখিতে
চূপ্শে যায়, এই কয় বৎসরের ম্যালেরিয়াতে তেমনি বাঙ্গালীর শারীরিক
বল যেন হুড়হুড় কবিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে এবং তাহাব দেহটা দেখিতে
যেন চূপ্শে গিয়াছে। জল হাওয়ার এমন সর্ব্বনেশে প্রভাব চক্ষে দেখিয়া
কেমন কবিয়া বলি যে বাঙ্গালার জল হাওয়ার দোষ বাঙ্গালীর দুর্বলতার
অন্তত একটা অতি প্রবল ও গুরুতর কারণ নয়। আব বাঙ্গালীর দুর্বলতার
এমন প্রবল কারণ চক্ষের উপর থাকিতে যাহাবা ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা
না কবিয়া বাঙ্গালীকে বীব কবিবাব জন্য বালাবিবাহ উঠিয়া যাইবাব
অলীক আশায় বসিয়া থাকেন, তাহাবা যে নিতান্তই কর্তব্য পরাঙ্মুখ—এ
কথাই বা না বলি কেমন করিয়া?

পঞ্চম কথা এই যে, বাঙ্গালাব ট্যাস ফিবিশ্বেরা বালাবিবাহ কবে না—

ইংরাজদের না য বেশি বয়সে বিবাহ কবে। কিন্তু তাহাব। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা বলবান্ নয়। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে বাঙ্গালার জল হাও-
য়ার কি অপর কিছুর দোষে বাঙ্গালার মানুষ দুর্বল হয়, বাল্যবিবাহের
জন্য হয় না।

ষষ্ঠ কথা এই,—(১) বাঙ্গালীর আঁতুড় প্রণালীর দোষে বাঙ্গালার
অনেক শিশু মরে এবং বাঙ্গালীর শবীর প্রথম হইতেই দুর্বল ও কণ্ড হয়,
এ কথা সকলেই বলিয়া থাকেন। (২) বাঙ্গালী সন্তান পালন কবিত্তে
জ্ঞানে না বলিয়া বাঙ্গালার অনেক বালক বালিকা মবে এবং বাঙ্গালী প্রথম
হইতেই দুর্বল ও কণ্ড হয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। (৩) বাঙ্গালীর
খাদ্য খুব পুষ্টিকর নয় এবং বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট পরিমাণ আঁহাব
পায় মা বা কবে না,—এ কথা সকলেই জ্ঞানেন। (৪) বাঙ্গালী ব্যায়াম
অভ্যাস কবে না এবং সেই জন্য বাঙ্গালীর দেহ স্তব্ধ ও বলিষ্ঠ হয় না, বাঙ্গা
লীর মধ্যে লাঠিয়ালদিগের ন্যায় যাঁহাবা ব্যায়াম অভ্যাস কবে তাঁহাবা বেশ
বলিষ্ঠ এ কথা সকলেই জ্ঞানেন ও বলিয়া থাকেন। (৫) স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে
অনভিজ্ঞতা হেতু বাঙ্গালি স্বাস্থ্যকর প্রণালীতে জীবনযাপন কবে, এ কথা
সকলেই বলিয়া থাকেন। (৬) এখনকার শিক্ষাপ্রণালীর দোষে বাঙ্গালী
কণ্ড হইতেছে এ কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। (৭) বাঙ্গালীর দুর্বল
হইবার আরও অনেক কারণ আছে। জড়বিজ্ঞানের inductive প্রণালীতে
যদি বাঙ্গালীর দুর্বলতার কাবণ নিকূপণ হয়, তবে এই সমস্ত কাবণ গুলি
হইতে কতটা দুর্বলতা উৎপন্ন হয় তাহা নির্ণয় কবিয়া যদি দেখা যায় যে
আরও দুর্বলতা আছে তখন সেই অবশিষ্ট দুর্বলতা বাল্যবিবাহ ঘটতি কি না
বিচার করিতে হইবে। এই সমস্ত কাবণ হইতে কতটা দুর্বলতা উৎপন্ন হয়,
এই সমস্ত কারণ নষ্ট করিলেই নির্ণয় কবিত্তে পারা যায় নতুবা পারা যায়
না। অতএব অগ্রে এই সকল কারণ নষ্ট করাই সংস্কারকদিগের যুক্তিসঙ্গত ও
বিজ্ঞানসম্মত কাজ।

কোন কোন দেহ বিজ্ঞানবিদ বলিয়া থাকেন যে স্ত্রীলোক প্রথম বজ্রস্থলা
হইবার পর কিছু দিন না গেলে গর্ভ ধারণের উপযোগী হয় না এবং রজ-
স্থলা হইবার পবই গর্ভধারণ কবিলে সেই গর্ভজাত সন্তানও দুর্বল হয় এবং
তাহাদেব নিজেরও শারীরিক অনিষ্ট হয়। প্রথমে তাহাদেব গর্ভধারণের

উপযোগী হইবার এবং গর্ভজাত সন্তানের কথা বিবেচনা করা যাক্ । প্রথম রক্তস্রাব হইবার পবই জীলোক গর্ভধাবণেব উপযোগী হয় না এই মতের পক্ষে সাধান-কথাব যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু পরীক্ষাব বা experiment-এব ফল প্রদর্শিত হয় না । কিন্তু বিজ্ঞানেব যুক্তিব সফলতা যে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহা সকলেবই জানা আছে । তা ছাড়া অনেক বিষয়েই দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের মতামতের স্থিতি বা ঠিকানা নাই । মাংস খাওয়া ভাল কি মন্দ, ঘি খাওয়া ভাল কি মন্দ, পশমী বস্ত্র ব্যবহার কবা ভাল কি মন্দ, জব হব কেন, ম্যালেরিয়া কি, মাথা ধবে কেন, খোষ হয় কেন—এইরূপ ছোট কথা বল, বড় কথা বল, বিজ্ঞানে কোন কথারই ত একটা মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায় না, সকল কথাতেই ত theory, hypothesis, মতের মারামারি ঠেঙ্গাঠেঙ্গি দেখিতে পাই । তবে এই বিবাহেব বয়স ও গর্ভধাবণেব বয়স সম্বন্ধে জড়-বিজ্ঞানে যাহা বলে কেমন কাঁবয়া তাহা বেশবাক্য বলিয়া গ্রহণ কবি ? আব এ বিষয়ে জড়-বিজ্ঞানেব মতট যে কি তাহাও বুঝিতে পাবা যায় না । কোন বিজ্ঞানবিদ্ যোল বৎসবে জীলোকেব বিবাহেব ব্যবস্থা দেন । ইহাব অর্থ এই যে যোল সতব বৎসরে গর্ভধাবণ কবিলে অনিষ্ট হয় না । আবাব অপব কোন বিজ্ঞানবিদ্ বলেন গে কুড় বৎসবেব পূর্বে গর্ভধাবণ বিষম অনিষ্টকর । অতএব কোন বিজ্ঞানবিদেব মত অনুসরণ কবিত্তে হইবে তাহাও ঠিক কবা যায় না এবং বিজ্ঞানবিদেবা কি প্রণালীতে আপন আপন মত স্থিতি করেন তাহাও বুঝিতে পাবা যায় না । বিজ্ঞানেব একটা যুক্তি এই যে দাঁত বাহিব হইলেই কঠিন দ্রব্য খাইতে দেওয়া বা খাইতে পাবা যায় না । কিন্তু যাহাবা দাঁতদন্ত বশত ছেলেকে দুধ খাইতে দিতে পাবে না, তাহাদেব ছেলোব দাঁত বাহিব হইলেই অনেক স্থলে দাঁত বাহিব হইবার পূর্বে হইতেই কঠিন দ্রব্য খাওয়া থাকে । তবে যে বয়সে দাঁত বাহিব হয়, সে বয়সে কঠিন দ্রব্য ভাল পরিপাক হয় না বলিয়া যাহাবা দুধ কিনিতে পাবে তাহাবা দাঁত বাহিব হইবা মাত্র ছেলেকে কঠিন দ্রব্য খাইতে দেয় না । তা ছাড়া প্রথম যে দাঁত উঠে, আট নম্ব বৎসরে তাহা পড়িয়া গিয়া আবাব নূতন দাঁত হয় । অতএব দাঁতেব উপমা খাটাইতে হইলে বৈজ্ঞানিকে প্রণয়ন কবিয়া দিতে হইবে যে, উনিশ কুড়ি বৎসবে জীদিগেরও নূতন

রকম একটা সম্ভাব হয়। পশু পক্ষী ঐচ্ছিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই গর্ভধারণ করিয়া থাকে এবং গর্ভধারণ বশত তাহাদের কোন ক্ষতি হয় নলিয়া বোধ হয় না। মানুষ সহজে ভিন্ন নিয়ম, জড়বিজ্ঞানবিদ যদি এই কথা বলেন, তবে তাহাকে এই ভিন্নতাব কাবণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষাব কবিয়া বুঝাইতে হইবে। বুঝাইলে তাহার কথা মাথা পাতিয়া লইব, নচেৎ লইব না। ঐচ্ছিক-পূর্ণতা প্রাপ্তির পথই যে সম্ভাবন জন্মে, তৎসম্বন্ধেও ঠিক এই বকম কথা বলি। এরকম সম্ভাবন দুর্বল হইবে বলিয়া শুধু সাজান কথাব যুক্তি দিলে চলিবে না, পরীক্ষাব ফল দেখাইতে হইবে। বাঙ্গালীর ছেলে দুর্বল হইয়া থাকে ইহা পরীক্ষাব ফল বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পাবেনা। বাঙ্গালীর ছেলে দুর্বল হইবার অনেক কাবণ পূর্বে নির্দেশ করা গিয়াছে। অতএব বাঙ্গালীর ছেলে দুর্বল হয়, ইহা একরূপ গর্ভজাত-সম্ভাবনাব দুর্বলতাব প্রমাণ বলিলে না। শাস্ত্রাঙ্ক-সাবে সাধ্য-সম দোষ অর্থাৎ Begging the question যাহাকে বল, সেই দোষ ঘটিবে। অপব দিকে গাভী ভূতি গৃহ-পালিত পশুব মধ্যে দেখা যায় যে ঐচ্ছিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পথ তাহারা প্রথম যে বৎস গ্রাসব কবে, তাহা দুর্বল হওয়া দুর্বল থাক, তাহাদের অপব সমস্ত বৎসাপেক্ষা বলিষ্ঠ হয়। মানুষের বেশ কেন অন্যকপ হইবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে না বুঝাইলে, তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে না।

এখন তর্কের অমুবাধে স্বীকার করা যাউক যে ঐচ্ছিক-পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পথই গর্ভধারণ কবিলে গর্ভধাবিনীর স্বাস্থ্যর হানি হয় এবং সেই গর্ভজাত সম্ভাবনও দুর্বল হয়। শুধু ইহাই নয়। এই প্রসঙ্গে আরো গুটিকতক কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। এখন কলিকাতা অঞ্চলে জীলোকের বিধ ত্রিশ বৎসব বয়সের মধ্যেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে দেখা যাইতেছে। ইহাব অনেকগুলি কাবণ আছে। কলিকাতার নায় সহবে এখন জীলোকেরা, বিশেষ ভাঙ্গ বয়স্ক জীলোকেরা বড়ই শ্রম-বিস্রুখী হইয়াছে। তাহারা রন্ধন, গৃহ মার্জন ও ভূতি শ্রমসাধ্য গৃহকার্য্য কবে না। যে সকল কার্য্য তাহাদের আপনাদের কবা উচিত তাহা দাস দাসী দ্বারা কবাইয়া লয়। আপনারা শুইয়া বাসিয়া বেশ-বিন্যাস করিয়া নাটক নবেল পড়িয়া গল্প শুদ্ধব করিয়া তাস খেলাইয়া দিন কাটায়। এখন তাহারা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তাহাদেব অন্নবোপ, অন্নো-বোপ, অপন্নাব বোপ, প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি বোপেব জন্মায় আমবা বাতিবাস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আর তাহাদের স্তন্যপান কবিয়া তাহাদেব সন্তানাদি ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে। আবাব তাহাদেব এখন বৎসবে বৎসবে সন্তান হইতেছে, স্তন্যকাগাব হইতে বাহিব হইতে না হইতে আনাব স্তন্যকাগাবে যাইবাব বন্দোবস্ত করা হইতেছে। তাহাদের বাবু মহাশয়েবাও (আগ্ন কাল সহরে নবীনাবা পতিকে বাবু বলিয়া বকেন) তাহাদেব বাবু মহাশয়েবাও স্বেচ্ছাচারী হইয়াছেন। তাঁহাদের নীতিজ্ঞানও নাই, ধর্মজ্ঞানও নাই। আছে কেবল এক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা জ্ঞান। ভোগস্পৃহা চবিতার্থ কবা ভিন্ন বিবাহে তাহাদের অন্য উদ্দেশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাই তাঁহাবা আপন আপন পক্ষী মহোদয়াদিগকে মোমেক পুতুল কবিতেন। আবাব তাঁহাবা সকাল সন্ধ্যা বিচার কবেন না, দিবা বাজি বিচার কবেন না, অমৃষ্য অমৃষ্যতা বিচার কবেন না, তিথি বিচার কবেন না, ঋতুকাল বিচার কবেন না, স্তন্যকাগাব বিচার কবেন না। তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে না ত, হইবে কাহাব ? তাঁহাদের মহিষী মহাশয়েবা যৌবনে রুগ্ন হইবেন না ত, হইবে কে ? তাঁহাদের ছেলে মেয়ে রুগ্ন হইবে না ত হইকে কে ? বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দিলে ইহাব প্রতীক্য হইবে না। যে যশ্বেচ্ছাচারী অসংযমী ধর্মজ্ঞানহীন সে চল্লিশ বৎসর বয়সে ত্রিশ বর্ষ বয়স্কা স্ত্রী বিবাহ করিলেও পাঁচ বৎসরের মধ্যে আপনি বুড়া হইবে, স্ত্রীকে বুড়ী কবিবে এবং পাঁচটা ছেলে মেয়েকে যেনেব বাড়ী পাঠাইয়া দিবে। স্ত্রীসঙ্গ অতি ভয়ানক কাজ। খুব সাবধানে নানা দিক দেখিয়া, বিশেষ সংযমী না হইয়া স্ত্রী-সঙ্গ করিলে, যে বয়সেই স্ত্রী সঙ্গ কব, স্ত্রীসঙ্গমেব ফল অতি ভয়ানক হইবে। সেই জন্য মন্বাদি শাস্ত্রকাবেবা স্ত্রীসঙ্গ সম্বন্ধে অতি কঠোর নিষেধ করিয়াছেন। আমবা নাকি তাবি সভ্য হইয়াছি তাই মন্বাদিকে বর্জন বলিয়া উপহাস কবি। মন্বাদিব কথা পুরাতন কথা বলিয়া তুচ্ছজ্ঞান করি। কিন্তু দেখিতেছি যে, পুরাতন কথা না মানিলে চলে না। দেখিতেছি যে, “আমরা পুরাতন কথা যতই ছাড়িতে চাই সে আমাদেরকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না ! পুরাতন কথা বার বার তুলিতেই হইবে—নাচার।”

বোধ হয়, এখন বুঝা গেল যে, স্ত্রীগমনাদি শারীরিক ক্রিয়া শুধু শারীর বিজ্ঞানেব নিয়মধীন হইলে দোষশূন্য হয় না। শারীরিক ক্রিয়াসম্বন্ধে শারীর

বিজ্ঞানেব যে ব্যবস্থা তাহা সমাজ,নীতি ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ব্যবস্থার অধীন না হইলে, শাবীববিজ্ঞানের ব্যবস্থা কিছুমাত্র বার্থ্যকর হয় না। অতএব জীগমনাদি শাবীবিক ক্রিয়া সর্বপ্রকারে দোষ শূন্য কবিবাব জন্য নীতি শিক্ষা ও কঠোর নৈতিকশাসন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। পূর্বে আমাদের মধ্যে তাহা ছিল। পূর্বে শৈশব হইতে নীতি ও ধর্ম শিক্ষা হইত, পাবিবাবিক নিয়মে, শৃঙ্খলায় ও শাসনে বাল্যকাল হইতে সংযম অভ্যাস হইত, এবং জীবন প্রণালীব গুণে চবিত্র গঠিত হইত। এখন সে সমস্তবই অভাব হইতেছে। এখন সুশিক্ষা নাই, ধর্মচর্য্যা নাই, সংযম সাধন নাই, চরিত্র গঠন নাই। ইংবাজি শিক্ষার গুণে ও প্রভাবে আজবাল স্বয়ং পিতা মাতাই সন্তানের সর্জনশ করিতেছেন। পিতা মাতা আপনাবাই যথেক্ষাচাবী, সন্তানকে সংযমী ও ধার্মিক কবিবেন কি কবিয়া ? শিক্ষা, ধর্মচর্য্যা এবং পাবিবাবিক শাসনেব অভাবে সন্তান আজ পিতা মাতাকে গ্রাহ্য করে না, যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। বিবা হব বয়স বাড়াইয়া দিলে, যথেক্ষাচারতা বাড়িবে বই কমিবে না, বিবাহেব ফল আবে মন্দ হই ভাল হইবে না। অতএব নীতিশিক্ষা, ধর্মচর্য্যা ও কঠোর পাবিবাবিক শাসন পুনঃপ্রবর্তিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বিবাহ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া। অতএব বিবাহেব যে পার্থিব উদ্দেশ্য আছে তাহা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মে সাধিত হওয়া আবশ্যক। শাবীব বিজ্ঞান জীগমন সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি শারীরিকক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণ করিয়া দিবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়েই তাহা পালন করা সম্ভব ও কর্তব্য। শাবীববিজ্ঞান মানিতেই হইবে। কিন্তু শাবীববিজ্ঞানকে সমাজ, নীতি ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানেব অধীন না কবিলে শাবীর-বিজ্ঞান একেবারে নিরর্থক হইবে। দেখা গিয়াছে যে বিবাহের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধনার্থ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া আবশ্যক। অতএব অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে সন্তানাদির বিবাহ দিয়া সন্তানাদি যাহাতে নির্দোষ প্রণালীতে বিবাহেব শাবীবিক ও পার্থিব উদ্দেশ্য সাধন কবে, শিক্ষার সাহায্যে ও কঠোর পারিবাবিক শাসন দ্বারা পিতা মাতা প্রভূত গুরু ভনের তর্দ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন কবিতে হইবে। পিতা মাতা যদি তাহা না কবিতে পারেন, তবে বুঝিতে হইবে যে আমাদের আর বক্ষা নাই—বিবাহেব বয়স

বাড়াইয়াই কি আর আকাশ পাতাল ভেদ কবিয়াই কি, কোন বকমেই আমাদের আর কোন বিষয়ে আশা ভরসা নাই। সুশিক্ষা ও ধর্মচর্যা আমাদের আজ এত আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া হিন্দু ধর্মের এই নূতন আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ইহাকে যাহা বা নব্যধর্মের অকাল বার্কিকা বা বাঙ্গালা সাহিত্যে শীতের বাতাস বলিয়া বিক্রপ বা ক্ষোভ বহেন, তাঁহা বা বিষয় ভুল বুঝিয়াছেন।

এখন স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহের বয়স এক বকম নিকপণ করিলেই আজিকার কাজ শেষ হয়। বিবাহের কথা যে কণ পর্য্যালোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত। কাহা বক্ত বয়সে বিবাহ হইলে ভাল হয় এখন তাহাই বিবেচনা করা উচিত। পুরুষের সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে অধ্যয়ন শেষ কবিয়া পুরুষ বিবাহ কবিবে। আজ কাল কুড়ি হইতে পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে অধ্যয়ন শেষ হয়। অতএব কুড়ির পর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত। তদগ্রে হওয়া উচিত নয়। কারণ নিজে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে পুরুষ স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া গড়িয়া লইতে পারিবে না। স্ত্রীর সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে প্রথম বজ্রোদর্শনের পূর্বে স্ত্রীর বিবাহ হওয়া উচিত। শারীর বিজ্ঞানে বলে এবং আমরা নিজে নিজেও বুঝিতে পারি যে স্বাভাবিক গতিতে বার বৎসরের পূর্বে প্রায়ই বজ্রোদর্শন হয় না। অতএব কন্যার শারীরিক গঠনাদি বিবেচনা কবিয়া ১০ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে বিবাহ দেওয়া কর্তব্য। তাহার পূর্বে বিবাহ দিলে কন্যা বীভীষিত পতি গৃহে বাস কবিয়া পতিব এবং পতিব পিতা মাতা প্রভৃতির নিকট শিক্ষা লাভ কবিতোও পাবে না। অতএব অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিবার যে উদ্দেশ্য তাহা ও ভাল সিদ্ধ হয় না। কিন্তু ব.ব. তেব বৎসরের পরেও বিবাহ হওয়া উচিত নয়। যে বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক, শিক্ষা সম্বন্ধীয় স্মরণ্য বিবেচনা কবিয়াই সে যেরূপ হব বয়স নিকপিত হওয়া আবশ্যক।

যে বয়সের কথা বলা গেল সেই বয়সে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে নবদম্পতীকে কিছু দিন কঠিন শাসনাধীন রাখিতে হইবে এবং উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও রুক্ষের দ্বারা জীবনযাত্রা সম্বন্ধীয়

সকল বিষয়ে গুট ও গুহ্য কথা সকল শিখাইতে হইবে । গুরুজনের কাছে একপাশ শিক্ষা না পাইলে পদে পদে বিষয় ভ্রমে পতিত হইতে হয় । পুস্তকে একপাশ শিক্ষা পাওয়া যায় না । আজকাল আমাদের একপাশ শিক্ষার নিতান্ত অভাব হইয়াছে । আমাদের সম্মুখে একপাশ শিক্ষা পাশ, যেমন কবিয়া হউক, আমাদের সকলেরই তাহা উপায় কবিত্তে হইবে । নহিলে আমাদের মঙ্গল নাই । মুশিক্ষা ও মুশাসনের দ্বারা নবদম্পতীকে ধর্ম্মের পথে ক্ষুদ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত কবিয়া সমাজে বর্জিত হইতে হইবে । তবেই তাহারা বিবাহের মহত্বদেয়া সাধন কবিত্তে সক্ষম হইবে । আর সংঘনী হইয়া সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের বোগ শোক ও শারীরিক দুর্বলতাও উৎপন্ন হইবে না । বোগ শোক ও দুর্বলতাব প্রধান কারণ—অনিয়ম অসংযত ও অত্যাচার—অল্প বয়স নয় । বয়স অল্প হইলে ও ভেগে যদি সংঘন শুদ্ধাচার ও সুনিয়ম থাকে, তাহা হইলে ভোগ হইতে বোগ শোক ও শারীরিক দুর্বলতা উৎপন্ন হয় না ।

যুবক মহলে এতটা কথা উঠিয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত হাঁপস্বকে প্রতিপালন কবিবার ক্ষমতা না হয়, সে পর্য্যন্ত বিবাহ করা উচিত নয় । এটা ইংরাজী মত । কিন্তু মতটা পাকা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে । পাকা হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় বাব আনা ভাগ নোকেব বিবাহ নিষেধ কবিত্তে হয় । কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে সর্ব্বত্রই অত্যন্ত অধিক, সমাজের প্রায় বাব আনা ভাগ । স্ত্রী এবং চারি পাঁচটি কন্যা সম্মানকে অল্প বস্ত্র দিয়া সজ্জানন্দ দেখা কবিত্তে পারে, এমন সম্মতি তাহাদের কখনই হয় না । অতএব উল্লিখিত মতট যদি পাকা হয় তবে পৃথিবীর বাব আনা লোকের বিশাহ হওয়া উচিত হয় না । কিন্তু বিবাহ অস্বচিত বসিয়া বিপুল লোপ হয় না ; কাজেই যথেষ্ট বিবাহ ও সম্মান বধ ভিন্ন আর উপায় থাকে না । যে মত অবলম্বন কবিয়া বার্ষিক কবিতে সমাজ যথেষ্টাচার ক্ষেত্র হইয়া পড়ে, সে মতের সত্যতা বা সাবলম্ব্য বিনয়ে যৌব সান্দহ উপস্থিত হয় । ফল কথা, যে দেশে এই মত সে দেশেও এই মতানুসারে বার্ষিক হয় না । হইলে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের লক্ষলক্ষ দরিদ্র এবং নিতান্ত দুঃখবস্থা পন্ন কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা দেখিতে পাওয়া যাইত না । এবং তাহাদের মধ্যেও যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত এবং যথেষ্টাগমন নিষিদ্ধ দেখিতে পাওয়া

যায়, তাহার অর্থ এই যে মানবের নীতি ও সমাজের শৃঙ্খলা বক্ষাই বিবাহের উদ্দেশ্য, বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপন্ন করিয়া সন্তানাদির ভরণপোষণ করা বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। তবে কেন বল যে, যে পর্য্যন্ত স্ত্রী পুত্রাদিকে প্রতিপালন কবিবাব মতন সম্ভ্রতি না হয় সে পর্য্যন্ত বিবাহ কবিব না, বা বিবাহ করা অন্যায্য? তবে কি স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনের কথাটা একেবারেই পবিত্র্যাগ কবিতে হইবে? না, তা নয়। কিন্তু ভিন্ন বকমে উহা ব্রীমাংসা করিতে হইবে। অর্থাৎ বিবাহের নৈতিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধনার্থ বিবাহের যে বয়স প্রশস্ত হয় সেই বয়সে বিবাহ কবিয়া স্ত্রীপুত্রাদি প্রতিপালনের ভার যত লবু কবিতে পাবা যায় তাহা উপায় করা কর্তব্য। উপায়ও অনেক আছে। এক উপায় পারিবারিক সাহায্য। যে প্রকার পারিবারিক প্রণালী হইলে আগুনীর স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিপালনার্থ পিতা পিতৃব্য বা সহোদবাদের সাহায্য পাওয়া যায়, পারিবারিক প্রণালী সেই প্রকার হওয়া উচিত। আমাদের পারিবারিক প্রণালী সেই প্রকার, ইহা আমাদের বড় সুবিধা ও মোতাগোর বখা। আমরা নিতান্ত দৃষ্টিহীন হইয়াছি বলিয়া এখন বলিতে আবস্ত কবিয়াছি যে আমাদের পারিবারিক প্রণালী ভাঙ্গিয়া যাওয়া উচিত। আমাদের প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে বুঝিতে পারিতাম যে আমাদের পারিবারিক প্রণালীর বিনাশ বাঞ্ছনীয় নহ, ক্ষয়ংসারমাত্র আশঙ্ক্য। ইংলণ্ডাদি দেশে আমাদের ন্যায় পারিবারিক প্রণালী নাই। ইহা তথাকার ছুর্ভাগ্য। ইহা বর্ণ এই যে ঐ সকল দেশ চিরকাল পার্শ্ববর্তী লইয়াই থাকিবে, সভ্যতা কখনই তথায় নীতি ও ধর্মমূলক হইতে পারিবে না। আর এক উপায় বিপুল সেবার সংঘম—যাহাতে বেশি সন্তান না হয় তাহার উপায় বিধান। সন্তানোৎপাদন অনেক পরিমাণে মানুষের স্বেচ্ছা-বীন কাম। সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে পিতা মাতার সন্তানকে সর্বদা স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া উচিত। কুকচিব ধূয়া তুলিলে চলিবে না। ঐ ধূয়া ইউ-বোপের সর্বনাশ করিয়াছে, আমাদেরও কবিতে আবস্ত করিয়াছে। এবং সন্তান যাহাতে সেই সকল উপদেশ পালন করে পিতামাতাকে তেমনি করিয়া গৃহের ব্যবস্থা কবিতে হইবে। আর এক উপায় জীবনব্যাপী কঠোর ত্রুক্ষর্য্য। পানে, ভোজনে, পবনে, শয়নে, বিলাসে, বিহারে,—সকল বিষয়ে কঠোর ত্রুক্ষর্য্য। ছই টাকা ঘোড়া কাপড় পরিলে যদি চলে, তবে

আট টাকা ষোড়া কাপড় পরি কেন ? দুই টাকার জুতায় যদি চলে, তবে দশ টাকার জুতা পায়ে দি কেন ? দাল ভালনায় যদি দেহেব পুষ্টিসাধন হয়, তবে কালিয়া পোলাও খাই কেন ? রুটি খাহলে যদি শরীরে বেশী বল হয় তবে কেবল খাইতে ভাল বলিয়া, অথবা লোকে বাবু বলিবে বলিয়া লুচি খাই কেন ? হাঁটিতে যদি পারি, তবে গাড়ি ঘোড়া চড়ি কেন ? সাধ কবিয়াই ত সৰ্বনাশের পথে যাইতেছি। ইউরোপ যাইতেছে বলিয়া আমরাও ত দেখাদেখি যাইতেছি। কিন্তু ও পথ হইতে ফিৰিতে হইবে। যদি মাছুষ হইতে চাই, যদি জাতি হইতে চাই, যদি মোক্ষ পথের পথিক হইতে চাই তবে ঐ সৰ্ব্বমেশে পথ হইতে ফিৰিতেই হইবে। ইউরোপে প্লাডষ্টোন প্রভৃতি মহাপুরুষেরা ও পথে চলেন না। চলেন না বাল্যাই তাঁহারা মহাপুরুষ। ও পথের শেষ এই পৃথিবীতেই—পৃথিবীর বাহিবে যাইতে হইলে অন্য পথে—কঠোর ব্রহ্মচর্যের পথে চলিতে হইবে। পার্থিবতা পবিত্র্যাগ করিতে হইবে। পৃথিবী নয়, পার্থিবতা পবিত্র্যাগ করিতে হইবে। পৃথিবী অসীম নয়। অতএব পার্থিবতার পথে চলিলে আজ না হয় বাল, বাল না হয় পবন ফাঁপরে পড়িতেই হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকাও পড়িবেন—ঐ বিষম পার্থিবতার পথ না ছাড়িলে আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশ্ব ইউরোপ এবং আমেরিকাকেও ফাঁপরে পড়িতে হইবে—এখন কোন্ না তাহাব আভাস পাইতেছেন ? ঐ সব socialism, communism, demonstrations of the unemployed—এব আব অর্থ কি ? তাই বলিতেছি—এই বেলা আমাদের সেই পুৰাতন ব্রহ্মচর্য গ্রহণ কবিতে হইবে। বিলাতি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে সেই ব্রহ্মচর্য নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া social evolution বা কালোচিত পরিবর্তনের নাম স্ববিদ্যা উহার বিনাশ নিবারণ করিব না,—ইহাই বা কেমন কথা ? কেন আমরা ত গুপ্তপক্ষী নহি, যে বড় বৃষ্টি আঁদল বলিয়া দোড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজি বা গাছেব ডাল থেকে পড়িয়া পড়িয়া মাঝে যাইব ? আমরা মাছুষ—গৃহনিৰ্মাণ কবিয়া আমরা বড় বৃষ্টি ব্যর্থ কবিতে পারি। তাই বলিতেছি, কে কোন প্রকারে আমাদের আব এত অভাব থাকিবে না। আজ কাল যে অভাবের কথা উঠিয়াছে তাহাব বার আনা ভাগ বাবুগরি। ও বাবুগরি

দুর্চলে জীবন সংগ্রাম প্রভৃতি বড় বড় আমদানি করা কথাগুলোও বড় একটা
 অনিতে হইবে না । আব যদিই ইংবাজের সহিত জীবনসংগ্রাম চলে,
 তথাপি ঐ বাবুগিবি না ছাড়িলে সে সংগ্রামে আমাদের জয়লাভ হইবে না ।
 বাবুগিবি লইয়াই ত ইংবাজের সহিত আমাদের প্রবৃত্ত যুদ্ধ । ভাল, বাবু-
 গিবি ছাড়িলে আব যুদ্ধ চলিবে কেমন কবিয়া ? সম্মাসীব মতন সর্কজয়ী ও
 দিগ্বিজয়ী আব কে আছে ? আত্মরয়েট দিগ্বিজয় । অনএব বঠে ব ব্রহ্মচর্য্য
 গ্রহণ কবিয়া আনাদের আত্মজয় কবিত্তে হইতেছে । আত্মজয়ী ব্রহ্মচারী
 হইলে আমাদের এত অভাব থাকিবে না । অভাব কমিলে জীপুত্রাদির প্রতি
 পালনের ভারও লঘু হইয়া পড়িবে । সেইরূপ ববাই প্রকৃত পদ্ধতি । অভাব
 বেশি বলিয়া বিবাহ না বন্য বা বিবাহ কবিত্তে অধিক বিলম্ব করা প্রকৃত
 পদ্ধতি নয় । ইংবাজের মধ্যে যাঁহারা আনারী তাঁহারা স্বজাতীয় দ্বিজদিগের
 মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠা কবিবার চেষ্টা করেন না, দ্বিজেরা যাঁহাতে স্ত্রী-
 গানাদি দ্বারা অর্পণ নষ্ট না করে, সেই চেষ্টা করেন । আর এক উপায়
 উপাঙ্গর ও কামরী পদ্ধতায়ী হইলে উপার্জন কবিত্তে হইবে না এমন কোন
 কথা নষ্ট । উপচারীর বিলাসিতা বাবুগিবিট নাট, বস্ত্রব্য কামত আছে—
 পরিবার পালন, সমাজ সেবা, ধর্মচর্য্য এবং তদন্তর্গত লোকহিতানুষ্ঠান
 প্রভৃতি বস্ত্রব্য সাধ্য কামত আছে । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিলাসিতা
 বাবুগিবি নাই নিজের অহং পরিত্যাগে তিনি ব্রহ্মচারী । তিনি
 সুনির্মিত দ্বিতল গট্টালিয়ার বাস করেন মত্যা । সে বিস্তৃত ভোগ স্পৃহা
 চরিতার্থ কবিবার জন্য নয়, স্বাস্থ্য বক্ষার জন্য । তিনি ব্রহ্মচারী বটে কিন্তু
 তাঁহার উপার্জনও যেনন বেশী, তাহার লোকহিতের কাঁধে তেমনি
 অতুলনীয় । তিনি বিলাসি পিয় ব বৃহৎসে আজ যেহ তাহার প্রান্তঃস্বর্গীয়
 নাম অনিতে পাইত না, তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহার ধনে আজ এত উপকৃত
 হইত না । বাবু অপেক্ষা ব্রহ্মচারীর অর্থে অবিকার বেশি, স্বদেশের আব-
 শ্যকতাও বেশি । ব্রহ্মচারী হইলে—বৃহৎসবাদী, ভগ্নমাথা ভিক্ষাপঞ্জীবী
 ন্যাটা সম্মাদী নয়—জিতেন্দ্রিয় বিলাসবিদ্বেষী ধর্ম্মচর্য্যবাসী কর্তব্যপরায়ণ
 সর্লোকহিতৈষী ব্রহ্মচারী হইলে আমাদেরই বেশি অর্থ আশংক্য হইবে ।
 অথচ সাধ্যমত চেষ্টা কবিয়া বেশি অর্থ উপার্জন কবিত্তে না পারিলে
 ভগ্ন স্বদেশেও মবিত্ত হইবে না অথবা সিংহ বাঘ বা ইউরোপ বাসীদিগের

ন্যায় আপনা আগনি মাঝে মারি শূঁতো শূঁতি কামড়া কামড়ি করিত ও
হইবে না। আবার বাবুগিরি পবিত্র্যং কবিতা ব্রহ্মচারী হইতে পাবিধি
আমাদেব অর্থোপার্জনেব স্রাবধাও হইবে। যেখানে বাবুগিরি সেখানে
বিষয় বুদ্ধি থাকে না। এখন আমবা অর্থোপার্জনে যে এত অক্ষম হইয়াছি
তাৎপৰ্য্য একটি প্রধান বাবণ এষ্ট যে বাবুগিরি কবি বলিয়া আমবা অর্থসঞ্চয়
বৰিতে পাবি না। বরং ধন হস্ত হইয়া পড়ি। এষ্ট জন্য আমাদেব মধ্যে
মূলধনেবও সৃষ্টি হইতে পাবিতে ছ না। অতএব অর্থোপার্জনেব পথ প্রস্তুত
কবিতা লোকহিতাত্ত্বান, পবিবার পাশন, শবীব বক্ষা, আত্মমর্য্যাদাবৰ্দ্ধন
প্রভৃতি অবশ্য পালনীয় ধৰ্ম্ম সাধন কবিতে হইলে ব্রহ্মচারী হওয়া—
harsh ascetic নথ—উন্নতমনা বিত্ত দিত লোকহিতৈষী অনন্তপথাত্ত্বগামী
ব্রহ্মচারী হওয়া—নিত্যন্ত আবশ্যক। মনবা জীবন স্বপ্নও নয়, মবীচিবাও নথ।
উহাৰ অদি অস্ত পঞ্জিবা পাওসা যায় না। উহা একটি অতি কঠিন সমস্যা।
অসাধাৰণ সাধনা ভিন্ন উহাৰ উপেয়া নিক হইবাব নথ। আৰ সে সাধনা
শুধু এই পৃথিবীৰ জন্য হইলে লিখ না—অনন্তকালৈব উপযোগী হওয়া
চাই। অনন্তকালৈব উপযোগী হইলে এই পৃথিবীৰও উপযোগী হইবে।
পৃথিবী অনন্ত কালসম্ভ্রম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিন্দু বই নথ। সেই বিন্দুকে
সেই কাল সমুদ্রে মিশিতেই হইবে।

কিন্তু যদি কোন কাৰণে কোন ব্যক্তি অশস্ত কালৈব মধ্যে বিবাহ
কবিতে না পাবেন, অর্থাৎ যদি তাহাকে ত্রিশ বা পঁয়ত্ৰিশ বৎসব বয়স
বিবাহ কবিতে হয়, তবে িনিও কি সেই বাব বা তেব বৎসবেৰ মেয়ে বিবাহ
কবিবেন ? কবিবেন বৈ কি, তদপেক্ষা বেশী বৎসবেৰ মেয়ে পাইবেন কেথা ?
কিন্তু তাহা হইলে বৎসবে কিছু বেশী প্রভেদ হইবে না ? হইবে কিন্তু নাচাব।
সাধাৰণ নিয়মাত্মসৰণ কবতে না পাবিলেই কিছু না কিছু গোলযোগ ঘটয়া
থাকে। আৰ অমন প্রভেদ, পছন্দেব বিবাহও অনেক স্থলে ঘটয়া পড়ে।
তাই সাহেবদেব মধ্যে অনেক ত্রিশ বৎসবেব বয় ও ষাট বৎসবেব কন্যা এবং
কুড়ি বৎসবেব কন্যা ও পয়ষটি বৎসবেব বব দেখিতে পাওয়া যায়। এককম
হই টা দশটা অসদৃশ বিবাহ সৰ্ব্বত্রই হইয়া থাকে। তজন্য গণগোল করি-
বার প্রয়োজন নাই *।

* কন্যার বিবাহেব বয়স ১০ হইতে ১৩ বৎসব পর্য্যন্ত নিদ্ধিষ্ট হইয়াছে।

শাশানে শিব ।

বড ভালবাসি ভোগ্যাবে,

প্রেমেব প্রতিমা হেন দেখি না পারে !

কি জানি কি মনে লয়

পবাণ পাগল হয়

দেখিলে ও কপবাশি (ভাসি) নয়ন-ধাবে !

ইহা শাস্ত্রসম্মত বলিয়া বোধ হয় । ১২ বৎসবে বিবাহ হইতে পানিবাব পক্ষে মনুৰ স্পষ্ট বিধান আছে ।

ত্রি শব্দর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং ।

ত্র্যষ্টবর্ষোহষ্ট বর্ষায়া ধর্ম্মসীদতি সত্ৰব ॥ (৯অ—৯৪)

ত্রিশ বৎসবেব পুরুষ মধুর দর্শনা দ্বাদশবার্ষিকা কন্যাকে বিবাহ করিবে । চব্বিশ বৎসবেব পুরুষ আট বৎসবেব বন্য কে বিবাহ করিবে । তবে যদি গৃহস্থান্নমেব হানি হয়, তাহা হইলে আবো সত্ৰব বিবাহ করিতে পারিবে ।

ফলতঃ মনুসংহিতা পাঠ বলিলে স্পষ্টষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে মনুৰ মতে কন্যাব বিবাহের বয়সেব ৮ কি ১০ কি ১২ একপ একটা বড়াকড় নির্দেশ নাই । কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্বে পিতা কর্তৃক তাহার সম্প্রদান হইলেই হইল, এ সম্বন্ধে মনুসংহিতাব ইহাই পরিষ্কার তাৎপর্য্য । পক্ষাণ্ডবর্তী কোন কোন ঋষি দশ বৎসবেব মধ্যে কন্যাকাণ নির্দেশ করিয়াছেন এবং দশ বৎসবের পব কন্যা ঋতুমতী হয় বলিয়া দশ বৎসবেব পূর্বে বিবাহেব প্রশস্ত কাল বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন । মনুৰ সহিত এ ব্যবস্থাব প্রকৃত বিরোধ নাই । মনুৰ এবং অন্যান্য সকলেবই মত এই যে বন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্বে তাহার বিবাহ আবশ্যিক । তবে পববর্তী ঋষিরা তৎপব ঋতু হওয়া সম্বন্ধে একটু বেশী আশঙ্ক্যবৃত্ত হইয়া দশ বৎসবেব পূর্বে কন্যাব বিবাহের প্রশস্ত কাল বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন । আমরা যদি তত আশঙ্ক্যবৃত্ত না হই, আর হইবাবও বিশেষ কাৰণ দেখা যায় না, তাহা হইলে মনুৰ ব্যবস্থামতে কন্যাব বয়োদর্শনেব প্রাত লক্ষ্য বাধিয়া তাহার শারীৰিক গঠনাদি বিবেচনা করিয়া ১০ হইতে ১৩ বৎসবের মধ্যে তাহার বিবাহ দিলে বোধ হয় শাস্ত্র সম্মত কাজই হইবে—কোন ঋষিবই বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে না । পুরুষের বিবাহের বয়স ২০ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত নির্দেশ করিয়াছি । ইহা সাধারণ নিয়ম । আবশ্যিক হইলে বা কোন রকমে অসম্মত না হইলে দুই এক বৎসর এদিক ওদিকও হইতে পারে । সকল নিয়ম সম্বন্ধেই সেরূপ হইয়া থাকে । সে কথা বলা বাহুল্য ।

তুমি হে পাগল ভোলা
 দয়াব ছয়ার খোলা
 জগতে জান না পর কখনো বাসে !
 নিষ্ঠুর মাহুয় হায়
 পোড়াইয়া ফেলে যাম
 •ভুলিয়া সে দয়া মায়া যখন যারে,
 হে দেব তখনি তুমি
 বেয়ে সে ঞ্জান ভূমি
 আকুল—অস্থির হও ভাবিয়া তাবে !
 হেবি সেই ছাই পাঁশে
 নয়ন মুদিয়া আসে
 দয়াব অর্থি কি তব দেখিতে পাবে ?
 তাই হে কাতব প্রাণে
 চেয়ে আছ শূন্য পানে,
 কে বোঝে হৃদয় তব স্রাব কাবে ?
 এত প্রেম এত স্নেহ
 জগতে জানে না কেহ,
 মাথ সে বিভূতি বুকে আদবে তারে !
 পবেব জন্য সন্ন্যাসী
 তুমিহে ঞ্জানবাসী
 পব মহাশয় মালা সে মবাব হাড়ে !
 এমন হৃদয় আব
 আছে কোন্ দেবতাব
 কে হেন পবেব হুখে কানিতে পাবে ?
 অর্থ শাস্তি পায় ঠেলি
 স্বর্গের সাম্রাজ্য ফেলি
 উলঙ্গ সন্ন্যাসী—বেশে (কে) স-সার ছাড়ে
 কাব হেন দয়া বুকে,
 কে হেন পবেব হুখে

আঃ গবল পান কবিত্তে পাবে ?

কাদ্ধালব এই ভিক্ষা

দেও দেব এই শিগা

শোষিব গ ল সিন্ধু পব উপধাবে ।

শ্রী গোবিন্দচন্দ্র দাস ।

পাতঞ্জল যোগসূত্র ।

২ ।

অনুমান জিনিষটা কি তাহা পূৰ্ণ সংখ্যায় বলা হইয়াছে । এখানে অনুমান সম্বন্ধে কতকগুলি প্রাচীন পারিভাষিক বলা বাইতেছে । যাহা দেখিয়া অনুমান করা হয় প্রাচীনেবা তাহাকে হেতু বলেন । যেমন ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করা হইল ধূম—হেতু । যাহার অনুমান করা হয় তাহার নাম সাধ্য । যেমন বহ্নি সাধ্য । হেতু এবং সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ আছে ; হেতু ব্যাপ্য, অর্থাৎ সাধ্যের সহিত সমান বা কম স্থানে বর্তমান, এবং সাধ্য ব্যাপক, হেতুর সহিত সমান স্থানে অথবা হেতু অপেক্ষা অধিক স্থানেও বর্তমান হয় । যেমন ধোঁয়া আর বহ্নি । ধোঁয়া হেতু, এবং সাধ্যের ব্যাপ্য ; যেমন ধোঁয়া বহ্নি অপেক্ষা অধিক স্থানে কখনই থাকে না । বহ্নি কিন্তু ধোঁয়া অপেক্ষা অধিক স্থানে থাকে । দেখুন তন্তু লৌহ পিণ্ড বা গুলের আগুণ, উহাতে ধোঁয়া নাই, অগচ বহ্নি আছে । অতএব বহ্নি ব্যাপক । যখন হেতু সাধ্য অপেক্ষা অধিক স্থানে বিদ্যমান হয়, তখন ঐ হেতুকে অসং হেতু বলা যায়, কারণ উহা দ্বারা অনুমান সিদ্ধ হয় না । বহ্নিকে হেতু কবিত্তা যদি কেহ ধোঁয়ার অনুমান কবিত্তে যায়, তাহা হইলে হেতু অসং হওয়াতে অনুমান অসিদ্ধ হয় । বহ্নি ও ধোঁয়ার পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু বহ্নির সহিত ধোঁয়ার যে সম্বন্ধ, ধোঁয়ার সহিত বহ্নির সেরূপ সম্বন্ধ নয় । বহ্নি ভিন্ন ধোঁয়া থাকিতে পাবে না, কিন্তু

ধোঁয়া ভিন্ন বহি থাকিতে পারে। এই নিমিত্ত ধোঁয়া বাপ্য, বহি ব্যাপক। যদি পূর্বে আমবা সর্বত্র ধোঁয়াব সহিত বহির একত্রাবস্থিতি দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে ধোঁয়া দেখিয়া বহিব অনুমান হয়; কিন্তু যদি বহির সহিত ধোঁয়াকে কখন একত্র থাকিতে দেখি, কখন নাও দেখি, তাহা হইলে পূর্বে ‘যেখানে বহি সেটখানে ধোঁয়া’ একপ নিশ্চয় না হওয়ায় কাজেই বহি দেখিয়া ‘ওখানে অবশ্য ধোঁয়া আছে’ একপ নিশ্চয় হয় না। যেখানে সাধ্যের অবস্থিতি স্থির করা হয়, তাহাকে পক্ষ বলে। যদি কলেব ধোঁয়া দেখিয়া বহির অনুমান করা হয়, তাহা হইলে কল পক্ষ। পক্ষে সাধ্যের অবস্থিতি জ্ঞানকে পরামর্শ বলে। এই জনা সাধারণত অনুমানের লক্ষণ এই রূপ কবা হয় যে, ‘হেতু দেখিয়া পক্ষে সাধ্যের সত্তা জ্ঞানের নাম অনুমান।’ মূল সূত্রের ভাষ্যে মহর্ষি বেদব্যাস অনুমানের লক্ষণ এইরূপ কবিয়াছেন— ‘অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েষ্বনুবৃত্তোৎতুল্যজাতীয়েভ্যাব্যাবৃত্তঃ সঙ্কোচো বস্ত-
দ্বিষয়া সামান্যাবধারণপ্রধান। বৃত্তিবহুমানম্।’ বিজ্ঞানভিক্ষু উপরি উক্ত ব্যাস-বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। সাধ্যবিশিষ্টঃ পক্ষঃ অনুমেয়ঃ, তস্য সাধ্যবস্ত্বেন তুল্যজাতীয়েনু সপক্ষেনু অনুবৃত্তোবিজ্ঞাতীয়েভ্যো বিপক্ষেভ্যো-
ব্যাবৃত্তো যঃ সঙ্কোচোৎপত্তিঃ তত্রৈবানুমেয়ে পক্ষবৃত্তিবিধি বাবং তদ্বিষয়া, তদ্বিষয়-
জ্ঞানজন্য। যা সামান্যাবধারণপ্রধানান্তিঃ তদনুমানমিত্যর্থঃ।

অনুমেয় বলিতে সাধ্য বিশিষ্ট পক্ষ বুঝায়। যেখানে সাধ্যের অনুমান কবা হয় একপ পক্ষ। যদি পরন্তে বহিব অনুমান কবা হয় তাহা হইলে, পরন্তে অনুমেয়। যদি বস্তুই যবে বহিব অনুমান করা হয় তাহা হইলে রস্তুই যব অনুমেয়। সেই অনুমেয়েব তুল্যজাতীয় সাধ্যের অধিকরণ সমুদয় সপক্ষ বলিয়াও অভিহিত হয়। পরন্তে বহির অনুমান কবিলে রস্তুই যব, কল যব ইত্যাদি যাবতীয় বহিব অধিকরণই উহাব সপক্ষ বা তুল্যজাতীয়। বিজ্ঞাতীয় বলিতে যাহারা সাধ্যের অধিকরণ নয়, গর্থাৎ বাহাতে কখন সাধ্য অবস্থিতি করে না, তাহারা বিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন বহির অনুমান স্থলে হ্রদ, পুষ্করিণী, জলাশয় ইত্যাদি সমুদয়। এক্ষেপে দেখ, পক্ষের সমুদয় সঙ্গাতীয়ে বর্তমান, এবং বিজ্ঞাতীয়ে অবর্তমান, এমন যে একটি সমষ্ক অর্থাৎ সেই হেতু জ্ঞান জন্য যে অপর একটি সামান্য-জ্ঞানের উৎপাদক মানসিক বৃত্তি, তাহার নাম অনুমান। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের মধ্যে

একটি মোটামুটি ভেদ এই যে প্রত্যক্ষ বস্তু বিশেষের, অর্থাৎ বাহ্যিক সহিত ইন্দ্রিয় সঙ্গর্ষ হইবে, সেই বস্তুরই বোধ হয়। অহুমানের দ্বারা বস্তু-সামান্যের বোধ হয়। পরন্তু বহিঃমাত্রেরই অহুমান হয়, বিশেষ বহিঃ নয়; অর্থাৎ পরন্তু আশুপ আছে, এইরূপ একটা মোটামুটি জ্ঞান হয়, এইরূপ আশুপ আছে বা সেইরূপ আশুপ আছে, এমন একটি বিশেষ জ্ঞান হয় না। প্রত্যক্ষস্থলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে যেরূপ বস্তু নিপাতিত হইবে সেই-রূপেই জ্ঞান হইবে, যদি কাল ঘট ইন্দ্রিয় সম্মুখে পতিত হয়, তাহা হইলে ঐ কাল-ঘটেরই জ্ঞান হইবে, শাদা ঘটের নয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষকে বিশেষাবধাবণ-প্রধান। এবং অহুমানকে সামান্যাবধাবণ-প্রধান হুতি বলিয়াছেন।

আগম। প্রত্যক্ষ এবং অহুমানের বিষয় একপ্রকার বলা হইল। এই ক্ষণে আগমের বিষয় কিছু বলিব।

পূর্বোক্ত দুইটি বৃত্তি ভিন্ন আমাদের জ্ঞানের উপায় স্বরূপ আর একটি বৃত্তি আছে। উহা দ্বারা পূর্বোক্ত-উভয়বিধ-বোধ হইতে ভিন্নরূপ বোধের উদ্ভব হয়। এই বৃত্তি শব্দ-শ্রবণ-জন্ম, আগম নামে প্রসিদ্ধ, এবং ইহা দ্বারা শব্দার্থের জ্ঞান হয়। পূর্বোক্ত উভয়বিধ প্রমাণ-দ্বারা সামান্য বা বিশেষরূপে বস্তু স্বরূপ জ্ঞানিতে পারি। অহুমান দ্বারা বস্তুর সাধাবণ স্বরূপ, এবং প্রত্যক্ষ দ্বারা বিশেষ স্বরূপ জ্ঞাত হই। কিন্তু বস্তুর নাম বা প্রতিপাদ্যের স্বরূপ উভয়ের একটি দ্বারাও জানা যায় না। ঐ স্বরূপ জ্ঞানের কারণ আগম নামে আর একটি মানসিক বৃত্তি স্বীকৃত হয়। বিবেচনা কর, আমি সম্মুখে একটি শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট-প্রকাণ্ড পদার্থ দেখিলাম। উহার বাদৃশ স্বরূপ ঐ ইন্দ্রিয়-সঙ্গীকৃত হইল, অন্তঃকরণে তাহাই প্রতিভাত হইল। তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই হইল না। একটা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট-প্রকাণ্ড বস্তু, এই মাত্র বোধ হইল। কিন্তু উহা কি, তাহা জানা গেল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা কি? উত্তর পাঠিলাম, বৃক্ষ। অত্র বৃক্ষ বা অশ্বথ বৃক্ষ। এইরূপ এই বিচিত্র-নিয়মানুগত জগৎকার্য্য দেখিয়া অহুমান করিলাম, ইহা যখন কার্য্য, তখন অবশ্যই ইহার কারণ আছে। তাহার কারণ আছে, এই অবধি মাত্র অহুমানদ্বারা বোধ হইল। কিন্তু তাদৃশ কারণের স্বরূপ কি, তাহা না প্রত্যক্ষ দ্বারা, না অহুমান দ্বারা জানা গেল। ঐ স্বরূপ

জানিবার নিমিত্ত বেদ বা পুৰাণাদি মহর্ষি বাক্যের অনুসরণ করিতে হইল।
ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ‘জগতের কারণ এইরূপ এইরূপ’ জানিতে
পারিলাম।

এই আগমই আমাদের সমুদয় জ্ঞানের মূল। আগম না থাকিলে
আমরা জগতের কোন পদার্থেই প্রতিপাদ্য নির্দেশ করিতে পারিতাম না।
কেবল বাহ্য আকসরেই আমাদের জ্ঞান পর্য্যবসিত হইত। বিবেচনা
কর কেবল বাহ্য আকার দেখিয়া আমাদের জিজ্ঞাসার সম্যক্ পূরিভূত না
হওয়ার, অতি শৈশবকাল হইতেই বস্তু সকলের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া
আমরা “কি কি” বলিতে আবস্ত করিয়াছি। অন্যদূবে থাক, নিজের
হাত, পা, নাক, কাণ, মুখ, চোখ ইত্যাদি প্রত্যেক অবয়ব ধরিয়াই
‘এতা কি’ ‘এতা কি, বলিয়া পিতা মাতাকে কতই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছি।
তাহারা ঐ সকল কি-র উত্তর দিয়াছেন বলিয়াই আমরা ঐ সকল পদার্থ
সম্যক্রূপে জানিতে পারিয়াছি এখনও অনেক কি—র উত্তর পাই নাই।
আবার প্রত্যহ অনেক নূতন নূতন কি—ব সৃষ্টি হইতেছে। এট সমুদয়
কি—র চরিতার্থ হইবার উপায় এক মাত্র আগম। আগমদ্বারা আমরা
তিন প্রকাব-বোধ প্রাপ্ত হই। (১) ‘কি?’ এই প্রশ্নের উত্তরে (২) জ্ঞানী
ব্যক্তির স্বয়ং প্রবর্তিত শিক্ষা দ্বারা (৩) ব্যোমবুদ্ধ ও জ্ঞান বুদ্ধদিগের
পবম্পব বাক্যালাপ শুনিয়া।

মহর্ষি বেদব্যাসমূলসূত্রেব স্তাষ্যে আগমের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন।
‘অপ্তেন দৃষ্টোহুমিতার্থঃ পরম স্ববোধ-সংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে।
শব্দান্তদর্থ-বিষয়াবৃত্তিঃ শ্রোতুবাগমঃ, যস্যাগমস্যাপ্রক্কেয়ার্থে, বক্তা, ন দৃষ্টা-
হুমিতার্থঃ, স আগমঃ প্লবতে, মূলবক্তবি তু দৃষ্টাহুমিতার্থে নির্বিপ্লবঃ স্যাৎ।’

যে ব্যক্তিতে ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনেষ্টা, বা ইন্দ্রিয়ের শৈথিল্য ইত্যাদি দোষ
নাই, তাহাকে আপ্ত বলা যায়। মোটামুটি বলিতে গেলে যাহাব কথায়
কোনরূপ অবিচ্ছাদের কারণ দেখান যাইতে পারে না, সেই ব্যক্তি আপ্ত।
আপ্ত ব্যক্তি অহঙ্কশ-পর হইয়া, ‘অন্যেরও আমার সদৃশ বোধ হউক’
এই অভিপ্রায়ে আপনি প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা যে সকল বিষয়ে জ্ঞান
লাভ করিয়াছেন ঐ সকল বিষয় শব্দের দ্বারা উপদেশ করেন, অর্থাৎ
কথায় ব্যক্ত করেন। ঐ কথা শুনিয়া শ্রোতার অন্তঃকরণে একটি বৃত্তির

উদয় হয়, যাঁহা দ্বারা ঐ সকল কথাব অর্থ বোধ হয়। ঐ বৃত্তিই আগম। যে আগমেব বক্তা নিজে প্রত্যক্ষ বা অনুমানদ্বারা কোন অর্থ জানেন নাই, তাঁহার কথাব উপব স্ততবাং বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সে আগমকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না, কারণ তাঁহা-দ্বারা বস্তুব ঠিক স্বরূপ-বোধ হয় না। যেখানে প্রথম বক্তা স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা পদার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হন, সেই খানেই আগমেব প্রমাণ্য জানিবা। বিজ্ঞান ভিক্স আগমের একটি বেস্ ছোট খাট লক্ষণ কবিয়াছেন—“আপ্তোক্তার্থ-বিষয়িনী-শব্দ জন্যা বৃত্তিঃ” যে বৃত্তি শব্দ শ্রবণে উৎপন্ন হয়, এবং আপ্ত কথিত বাক্যের অর্থ যাঁহাব বিষয়, তাঁহাব নাম আগম।

এই তিন প্রকাব বৃত্তিব মধ্যে প্রত্যক্ষই অপব বৃত্তিদিগের মূলস্বরূপ। এই নিমিত্ত প্রথমে প্রত্যক্ষের নির্দেশ করা হইয়াছে।

আমাদের অন্তঃকরণে জ্ঞানোদয়েব কাবণ যতগুলি বৃত্তি আছে, তৎ-সমুদযই এই তিন প্রকাবের মধ্যে কোন না কোন প্রকাবের অন্তর্গত। এই তিনের অতিবিক্ত আব কোন প্রকৃব জ্ঞানের উপায় মানিবাব আবশ্যাব তা নাই। উক্ত তিন প্রকাব প্রমণের অতিবিক্ত আবও কতক-গুলি প্রমাণ শাস্ত্রান্তবে স্বীকৃত হইয়াছে। সেইগুলি উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভাব এবং ঐতিহ্য।

উপমান একটি বৃত্তি যাঁহা দ্বারা এক জাতীয় বস্তুব মধ্যে পবস্পবের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেমন আমবা চক্ষু দ্বারা গোক এবং বনগোক এই দুইটি বস্তু দেখিলাম। প্রত্যক্ষ বৃত্তি দ্বারা এই দুইটি পদার্থের জ্ঞান হইল, কিন্তু ঐ দুইটি পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পদার্থের জ্ঞান হইল, তাঁহা আব কিছুই নয়, ঐ উভযের সাদৃশ্য। আমবা বুঝিলাম বনগোক এবং গোক এক রকম। এই সাদৃশ্য জ্ঞানের প্রতি প্রত্যক্ষকে কারণ বলিতে পাব না, কারণ উহা কোন ইন্দ্রিয়েব সন্নির্কর্ষ জন্য নয়, এবং অনুমানও কারণ নয়; কোন হেতু দেখিয়া উহাব সত্ত্বা নির্দ্ধারিত হয় নাই, আর উহা কোন ব্যক্তি কর্তৃক কথিত না হওয়ায় আগম জন্যও নয় কাষেই সাদৃশ্য জ্ঞানের নিমিত্ত উপমান নামক একটি অতিবিক্ত বৃত্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

অর্থাপত্তি।—প্রাচীনেরা অর্থাপত্তি নামক আর একটি প্রমাণ স্বীকার

কবিয়াছেন। ইহা দ্বারা একটি কথিত অর্থের সহিত অপর একটি অনির্দিষ্ট অর্থের জ্ঞান হয়। বাদ বলা যায় “ভুঁড়ে রামকৃষ্ণ দিনেব বেলা কিছু খায় না” তাহা হইলে যে বৃত্তি দ্বারা এই উক্ত অর্থের সহিত “বামকৃষ্ণ রাত্রে চৰ্মাচোষা আদি কবিয়া নানাবিধ ভোজ্যেব ধ্বংস কবে” এই অনির্দিষ্ট অর্থের বোধ হয়, তাহাব নাম অর্থাপত্তি। এইরূপ, “অমুক জীবিত ব্যক্তি ঘরে নাই, এই কথা বলিলে যে বৃত্তি দ্বারা সে বাহিবে আছে এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহাব নাম অর্থাপত্তি। বামকৃষ্ণ রাত্রে খায়, এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ জন্ম নয়; কাবণ কেহই উহা চক্ষে দেখে নাই। অহুমান জন্মও নয়, কাবণ তাহাব প্রতি কোন হেতুর নির্দেশ নাই। আব ঐ জ্ঞানকে আগমের অন্তর্গতও বলিতে পার না, কারণ ঐ অর্থের প্রতিপাদক কোন শব্দ নাই। অতএব উহাব নিমিত্ত অর্থাপত্তি নামে আর একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছিল।

সাংখ্যাচার্য্যেবা বলেন অর্থাপত্তি নামক আব একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার কবিবাব আবশ্যকতা নাই, উহা অহুমানের কপাস্তবমাত্র।

যে ব্যক্তি ভোজন কবে সেই ভুঁড়ে হয়, যে কিছু খায় না সে বোণা হয়। বামকৃষ্ণ বখন ভুঁড়ে তখন ঐ ব্যক্তি অবশ্য ভোজন কবে। এইরূপ ব্যাপ্তি হিব কবিয়া ভুঁড়ে ব্যক্তির দিবসে ভোজনাভাবকে হেতু কবিয়া অহুমান দ্বারা বাস্তব ভোজন সিদ্ধ কবা যাইতে পাবে। এইরূপ—উপমানও অহুমানের অন্তর্গত।

অভাব—কেহ কেহ অভাব নামক আব একটি প্রমাণ স্বীকার করিয়াছিলেন। সাংখ্যাচার্য্যেবা উহাকে প্রত্যক্ষের অন্তর্গত করিয়াছেন। তাঁহাবা বলেন, অভাব আব কিছু নয়, বস্তুব পরিণাম বিশেষ, কাষেই ইঞ্জিয় গ্রাহ্য। এইরূপ সম্ভবও অহুমানের অন্তর্গত। সম্ভব একটি প্রমাণ, যাহাদ্বারা বড় পরিমাণের উক্তি করিলে তদন্তর্গত ক্ষুদ্র পরিমাণ-নিচয়ের জ্ঞান হয়। যেমন মণ বলিলে সের, পোষা, ছটাক, কাঁচা এই সকলের জ্ঞান হয়। সাংখ্যাচার্য্যেবা বলেন, ঐরূপ জ্ঞান আব কিছুই নহে, অহুমান সিদ্ধ। অহুমানের আকার এইরূপ—মণ সের ছাড়া হয় না, অতএব যেখানে মণ সেইখানে সেব।

ত্রিতিয়া, কিম্বদন্তী। যেমন ঐ গাছে ভূত আছে, ঐখানে একটা

রাক্ষস ছিল। সাংখ্যাচার্য্যোবা বলেন এই সকল কিম্বদন্তীব বক্তা যদি প্রামাণিক হয়েন, তবে ইহারা আগ্নেব মধ্যে গণ্য ; আর যদি ইহাদের বক্তা অপ্রামাণিক হয়েন, তবে উহাৱাৱা একটা নিশ্চয় জ্ঞানই হয় না। সে জ্ঞান কখন প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না, তখন তাহাব কারণ কি রূপে প্রমাণ হইবে।

প্রমার মত ভ্রম-জ্ঞানেব প্রতিও ঐক্য প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও আগ্নেব কারণতা আছে বটে, কিন্তু ভ্রমস্থলে উহাবা সকলেই দোষ স্পষ্ট হয়। প্রত্যক্ষের সময় ইন্দ্রিয় ভুট হয়, অনুমানেব সময় হেতুতে দোষ ঘটে, এবং আগ্নেব সময় বক্তা সদোষ হয়েন। ভ্রম শব্দেব অর্থ এক প্রকার বস্তুকে অন্য রূপে গ্রহণ কবা। হেতুতে দোষ না থাকিলে আব ঐক্য জ্ঞান হয় না, সুতবাং ভ্রম জ্ঞান স্থলে প্রমাণেব ভুটতা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞান মতক্রপপ্রতিষ্ঠম্ । ৮ ।

পদচ্ছেদঃ ।—বিপর্য্যয়ঃ, মিথ্যাজ্ঞানম্, অ-তদ্ রূপ প্রতিষ্ঠম্ ।

পদার্থঃ ।—বিপর্য্য যঃ = বিপর্য্যয়াথাবৃত্তিঃ ; মিথ্যাজ্ঞানঃ = অতথা-ভূতেহর্থো ভথোৎপদ্যমানঃ জ্ঞানম্, অতদ্বিতি তৎপ্রকাববাং জ্ঞানমিত্যর্থঃ অতক্রপপ্রতিষ্ঠম্ = তক্রপে (স্ববিষয়ে) প্রতিষ্ঠা শূন্যম্, তস্য (স্ব গোচরী ভূতস্যার্থস্য) যক্রপম্ . ন তস্মিন্ রূপে প্রতিষ্ঠতে, তস্যার্থস্য যৎ পাবমার্থিকং রূপং ন তৎ প্রতিভাসবতীতি যাবৎ ।

ভাবার্থঃ ।—বিপর্য্যয়ো লক্ষ্যম্, মিথ্যাজ্ঞান মিত্তি বিপর্য্যয়স্য লক্ষণম্, অতক্রপপ্রতিষ্ঠমিত্তি মিথ্যাজ্ঞানস্য বিবৰণম্, তথাহি বিপর্য্যয়ো নাম মিথ্যাজ্ঞানম্, তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানং কিং স্বরূপমিত্যত আহ—অতক্রপ প্রতিষ্ঠ মিত্তি জ্ঞানাসমানাকাববিষয় বিশষাকম্ (জ্ঞানস্য অসমানাকারো বা বিষয়ঃ, স্বাত্বশং জ্ঞানং ভবতি তদ্বিপরূপো যোবিষয়ঃ জ্ঞেয় বস্তু, তবিশেষাকম্ তৎপ্রকাবম্) ইতি তদর্থঃ । বিপর্য্যয়েত্যস্যাক্ষরার্থঃ বিবুদ্ধ রূপঃ, উল্লুপুৰ্ণস্য প্রমাণস্য বিবুদ্ধা বা বৃত্তিঃ, স বিপর্য্যয়ঃ । তচ্ছাত্ত জ্ঞানং ভ্রম এব, ভ্রমস্থলে হি জ্ঞানাকারসৌব বিষয়ে সমাবোপো, নতু বিষয়াকারস্য জ্ঞানে, যথা শুক্তিকার্যাং রক্তজ্ঞানম্ । অত্র রক্তত জ্ঞানস্য শুক্তিকার্যাং সমারোপো নতু জ্ঞানস্য শুক্তিকাকারেণ পরিণামঃ । যদা বৃত্তাৱা বংকিমপি বস্তু ভিন্ন স্বরূপেণ জায়তে স এব বিপর্য্যয়ঃ তদাথাবৃত্তিঃ,

তজ্জাত জ্ঞানমেব জ্ঞানসাপি চিত্তপরিণামবিশেষঃ । মণিপ্র
অতরূপ প্রতিষ্ঠ মিতাস্য বাধবিরোধীভার্থং কবোতি, বাদৃশং জ্ঞান
তন্ন চিরং তজ্জপে প্রতিষ্ঠতে বাধোত্তবং তদন্যথারূপং ভবতীতি তদ
যথা—শুদ্ধিকার্যঃ রজতমিতাত্ত্ব শুদ্ধিকাজ্ঞানান বজ্রতজ্ঞানস্য বা
মিতজ্ঞানং ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । অনেন সংশয়োহপি গৃহীতস্তস্য
প্রতিষ্ঠাৎ ; যথা, দুঃস্বপ্না পুরুষোবেতি । অসৌব বিপর্যয়স
পঞ্চ ক্রেশা ইতি বক্ষ্যতে ।

নিবেশ
উপরি
তামিহ

করিয়া

অনুবাদ—মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমেব নাম বিপর্যয় । যেজ্ঞান
প্রতিষ্ঠ—বে বস্তু যেকপ নয় তাহাকে সেইরূপে প্রকাশ করে, তা
মিথ্যাজ্ঞান । যেমন কিছুকে রূপা বলিয়া জ্ঞান । মণিপ্রভা নামক
অতরূপ প্রতিষ্ঠ শব্দের অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে যে, যে জ্ঞান ব
রূপে থাকে না, তাহাব নাম অতরূপ প্রতিষ্ঠ । কিছুকে যে রূপ
জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞান ববাবব ঐরূপে থাকে না ; একবাব কিছুক বলিয়া
পারিলে, আব রূপা জ্ঞান থাকে না ।

সমালোচনা ।—বিপর্যয় শব্দে অর্থ বিপর্যয়াখ্য বৃত্তি । ঐ
কিছু নয়, ভ্রমজ্ঞান । যে বৃত্তি বা চিত্তেব পরিণাম বিশেষ
স্বরূপ, তাহাকে বিপর্যয় বৃত্তিবলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহাই
অভিপ্রায় ।

ভিনমায়

বিপর্যয় শব্দেব অক্ষবর্থ বিপরীত বা উল্টা ; পূর্বে যে প্র
বলা হইয়াছে উহার উল্টা বা বিপরীত বৃত্তিকে বিপর্যয় বলে
বৃত্তি দ্বাৰা যে বস্তু যেকপ, তাহাকে ঠিক সেইরূপে জ্ঞান করা হ
য্য বৃত্তি দ্বাৰা যাচা যেকপ নয়, তাহাকে ঠিক সেইরূপে জ্ঞান
প্রমাণ বৃত্তি দ্বাৰা কিছুককে কিছুক বলিয়া বোধ হয়, দড়িকে দড়ি
বোধ হয়, কিন্তু বিপর্যয় বৃত্তি দ্বাৰা কিছুককে রূপা, দড়িকে সা
বোধ হয় । ইন্দ্রিয়াদিতে জ্ঞানসাধনেব অসম্পূর্ণভাদি দোষ ঘট
দেব চিত্তের অবস্থা-বিশেষ হয়, যাহাতে একরূপ বস্তুকে অন্য
বোধে হয় । চিত্তের সেই অবস্থান্তর বা বৃত্তিব নাম বিপর্যয় । এ
অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান (যাহা বেকপ নহে তাহাকে সেইরূপে জ্ঞান
ক্রম বলিয়া অভিহিত হয় ।

জনমাসের

কোন

না। আর

াবশ্যক ;

০ বৎসর

স হইতে

সাধারণত

তিনমাস

দ্বারান্তর

ব্রহ্মচর্য

জন না

রাক্ষস ছিল। সাংখ্যাচার্য্যোবা বলেন এই সকল কিছদস্তীর বক্তা যদি প্রামাণিক হয়েন, তবে ইহারা আগনের মধ্যে গণ্য ; আর যদি ইহাদের বক্তা অপ্রামাণিক হয়েন, তবে উহাদ্বাৰা একটা নিশ্চয় জ্ঞানই হয় না। সে জ্ঞান কখন প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না, তখন তাহার কারণ কি রূপে প্রমাণ হইবে।

প্রমার মত ভ্রম-জ্ঞানের প্রতিও ঐকপ প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও আগমের কারণতা আছে বটে, কিন্তু ভ্রমস্থলে উহাৰা সকলেই দোষ স্পষ্ট হয়। প্রত্যক্ষের সময় ইন্দ্রিয় দুষ্ক হয়, অনুমানের সময় হেতুতে দোষ ঘটে, এবং আগমের সময় বক্তা সন্দোষ হয়েন। ভ্রম শব্দের অর্থ এক প্রকাৰ বস্তুকে অন্য রূপে গ্রহণ কৰা। হেতুতে দোষ না থাকিলে আর ঐরূপ জ্ঞান হয় না, সুতৰাং ভ্রম জ্ঞান স্থলে প্রমাণের দৃষ্টতা অবশ্যই স্বীকাৰ্য্য।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞান মতদ্রুপপ্রতিষ্ঠম্ । ৮ ।

পদচ্ছেদঃ।—বিপর্য্যয়ঃ, মিথ্যাজ্ঞানম্, অ-তদ্ রূপ প্রতিষ্ঠম্।

পদার্থঃ।—বিপর্য্যয়ঃ=বিপর্য্যয়াধাবৃতিঃ; মিথ্যাজ্ঞানং=অতথা-ভূতেহর্থো ভ্রমোৎপদ্যমানং জ্ঞানম্, অতদ্বিত তৎপ্রকাৰং জ্ঞানমিত্যর্থঃ; অতদ্রুপপ্রতিষ্ঠম্=তদ্রূপে (স্ববিষয়ে) প্রতিষ্ঠা শূন্যম্, তস্য (স্বগোচরী ভূতস্যার্থস্য) যদ্রুপম্, ন তস্মিন্ রূপে প্রতিষ্ঠিতে, তস্যার্থস্য যৎ পাবমার্থকং রূপং ন তৎ প্রতিভাসয়তীতি যাবৎ।

ভাবার্থঃ।—বিপর্য্যয়ো লক্ষ্যম্, মিথ্যাজ্ঞানমিতি বিপর্য্যয়স্য লক্ষণম্, অতদ্রুপপ্রতিষ্ঠমিতি মিথ্যাজ্ঞানস্য বিবরণম্, তথাহি বিপর্য্যয়ো নাম মিথ্যাজ্ঞানম্, তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানং কিং স্বরূপমিত্যত আহ—অতদ্রুপ প্রতিষ্ঠমিতি জ্ঞানাসমানাকাববিষয় বিশেষাকম্ (জ্ঞানস্য অসমানাকাবো যো বিষয়ঃ, স্বাভূতং জ্ঞানং ভবতি তদ্বিপরূপো যোবিষয়ঃ জ্ঞেয় বস্তু, তদ্বিশেষাকম্ তৎপ্রকারম্) ইতি তদর্থঃ। বিপর্য্যয়েত্যস্যাক্ষরার্থঃ নিরুদ্ধ রূপঃ, উক্তপূৰ্ণস্য প্রমাণস্য বিরুদ্ধা বা বৃতিঃ, স বিপর্য্যয়ঃ। তচ্চাত্ত জ্ঞানং ভ্রম এব, ভ্রমস্থলে হি জ্ঞানাকারস্যোৰ বিষয়ে সমাবোপো, নতু বিষয়াকারস্য জ্ঞানে, যথা শুক্তিকায়্যং রজতজ্ঞানম্। অত্র রজত জ্ঞানস্য শুক্তিকায়্যং সমারোপো নতু জ্ঞানস্য শুক্তিকাকারেণ পরিণামঃ। যদা বৃত্তাঃ যৎকিমপি বস্তু ভিন্ন স্বরূপেণ জায়তে স এব বিপর্য্যয়ঃ তদাধ্যবৃতিঃ,

নবজীবন ।

উক্তাত্ম জ্ঞানমেব জ্ঞানস্যাপি চিত্তপরিণামবিশেষাৎ । মণিপ্র
অতরূপ প্রতিষ্ঠা মিত্যস্য বাধবিবোধীভ্যর্থং কবোতি, স্বাদৃশং জ্ঞান
তন্ন চিরং তরূপে প্রতিষ্ঠিতে বাধোত্তরং তদন্যথারূপং ভবতীতি তদ
বধা—গুক্তিকায়াং রজতমিত্যত্র গুক্তিকাজ্ঞানেন রজতজ্ঞানস্য বা
মিতিজ্ঞানং ন প্রতিষ্ঠীত্যর্থঃ । অনেন সংশয়োহপি গৃহীতস্তস্য
প্রতিষ্ঠিত্বাৎ ; যথা, স্থানুর্ভূতা পুরুষোবেতি । অসৌব বিপর্যায়স
পঞ্চ ক্লেশা ইতি বক্ষ্যতে ।

অনুবাদ—মিথ্যাজ্ঞান অর্থ্যাৎ ভ্রমেব নাম বিপর্যায় । যেজ্ঞান
প্রতিষ্ঠ—যে বস্তু যেকপ নয় তাহাকে সেইরূপে প্রকাশ কবে, তা
মিথ্যাজ্ঞান । যেমন কিছুকে রূপা বলিয়া জ্ঞান । মণিপ্রভা নামব
অতরূপ প্রতিষ্ঠা শব্দেব অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে যে, যে জ্ঞান ব
রূপে থাকে না, তাহাব নাম অতরূপ প্রতিষ্ঠা । কিছুকে যে রূপ
জ্ঞান হয়,ঐ জ্ঞান ববাবব ঐরূপে থাকে না ; একবার কিছুক বলিয়া
পারিলে, আব রূপা জ্ঞান থাকে না ।

সমালোচনা ।—বিপর্যায় শব্দেব অর্থ বিপর্যয়াখ্য বৃত্তি । ঐ
কিছু নয়, ভ্রমজ্ঞান । যে বৃত্তি বা চিত্তেব পরিণাম বিশেষ
রূপ, তাহাকে বিপর্যায় বৃত্তিবলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহাই
অভিপ্রায় ।

বিপর্যায় শব্দের অর্থার্থ বিপরীত বা উল্টা, পূর্বে যে প্র
বলা হইয়াছে উহাব উল্টা বা বিপরীত বৃত্তিকে বিপর্যায় বলে
বৃত্তি দ্বারা যে বস্তু যেকপ, তাহাকে ঠিক সেইরূপে জ্ঞান কবা হ
য্যে বৃত্তি দ্বারা যাচা যেকপ নয়, তাহাকে ঠিক সেইরূপে জ্ঞান
প্রমাণ বৃত্তি দ্বারা কিছুককে কিছুক বলিয়া বোধ হয়, দড়িকে দড়ি
বোধ হয়, কিন্তু বিপর্যায় বৃত্তি দ্বারা কিছুককে রূপা, দড়িকে সা
বোধ হয় । ইন্দ্রিয়াদিতে জ্ঞানসাধনেব অসম্পূর্ণতাদি দোষ ঘটি
দেব চিত্তের অবস্থা-বিশেষ হয়, যাহাতে একরূপ বস্তুকে অন্য
বোধে হয় । চিত্তের সেই অবস্থাক্তব বা বৃত্তিব নাম বিপর্যায় । এ
অর্থ্যাৎ মিথ্যাজ্ঞান (যাহা বেকপ নহে তাহাকে সেইরূপে জ্ঞান
ভ্রম বলিয়া অভিহিত হয় ।

পাতঞ্জল যোগসূত্র ।

যদি একশ আশঙ্কা কবেন—তুমি বিপর্যয়ের লক্ষণ করিলে মিথ্যা-
 ধ্যাজ্ঞানের অর্থ কবিলে “অতদ্রূপ প্রতীষ্ঠ” অর্থাৎ যে যেক্রপ
 হ্যাক সেইরূপে জ্ঞান ; তোমার উদাহরণ—ঝিহুকে কপাব জ্ঞান,
 পা নয়, উহাকে কপা বলিয়া জ্ঞান। ভাল, আমি বলি তুমি যে
 দিলে উহা বিপর্যয়ের উদাহরণ নয় উহাকে ববং প্রমাণের উদা-
 ৷ যাটতে পায়। কাবণ উহা অতদ্রূপ-প্রতীষ্ঠ হয় নাই। ঝিহুকে
 প্রতীতি হইতেছে, ঐ প্রতীতি বশতই কপাব সিদ্ধি হইতেছে।
 প্রতীতি হওয়াই অসম্ভব, অতএব যদি প্রতীতি বশত বস্তুব সিদ্ধি
 ব ত ঠিক বস্তুতেই জ্ঞান হইতেছে, “অতদ্রূপ প্রতীষ্ঠ” হইল কই ?

উত্তবে ভাষ্যকার বলিতেছেন—“যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে, তুতার্থ
 প্রমাণস্য। তত্র প্রমাণেন বাধনমপ্রমাণস্য দৃষ্টম্, তদ্বথা দ্বিচক্স
 ষ্বেবেণৈক চক্স—দর্শনেন বাধ্যতে ঠিতি।” ইহার অর্থ—প্রতীতি
 স্ত সিদ্ধিব কথা বলিতেছে, তাহা হইতে পাবে বটে, যদি সেই
 পাবে কোনরূপ বাধা না ঘটে। প্রকৃত স্থলে এরূপ হয় নাই।
 যে বজত জ্ঞান হইতেছে, ঐ জ্ঞান চিবস্থায়ী নহে। শুক্তিকে
 যা একবার জ্ঞানিতে পারিলে আর বজত জ্ঞান থাকে না, তাহাব
 । এক্ষণে দেখ, যখন প্রমাণ সিদ্ধ শুক্তি জ্ঞান দ্বাবা বজত জ্ঞানের
 ছে, তখন আব ঐ পূর্বেব বজত জ্ঞানকে প্রমাণ সিদ্ধ বলিয়া
 বিতে পাব না, কাবণ প্রমাণের কখন বাধ হয় না। পূর্বে ইহা
 ছে যে, যাহা দ্বাবা বস্তুব প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান্য যায়, তাহাব নাম
 অতএব তাহাব আব কোনরূপে বাধ হইতে পাবে না। যাহা
 হার এদিক ওদিক নাই। আর লোকের বুদ্ধিও যথার্থের পক্ষ-

যাহাকে একবার যথার্থ বলিয়া ঠিক ঠিক জ্ঞানিতে পারিয়াছে,
 আর অন্যরূপে গ্রহণ কবিতে ইচ্ছাই হয় না। ববং আমবা সর্ব-
 দ্বারা অপ্রমাণের বাধ দেখিতে পাই। দেখ, কখন কখন চক্সব
 ৷ আমবা একটি চক্সকেই দুটি চক্স রূপে দেখিতে পাই। বিস্ত
 বস্থা প্রাপ্ত হইলে যে এক চক্স সেই এক চক্সই থাকে। তখন
 ক দুই বলিয়া বোধ হয় না। এই বিপর্যয় বৃত্তিকেই ভাষ্যকার
 নর্থ ঘটনার মূল, প্রধান অবিদ্যা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ইহা

(১) অবিদ্যা, (২) অস্বিতা, (৩) রাগ, (৪) দেহ, (৫) অভিনিবেশ।
এই পাঁচ ক্লেশ সঙ্কুল পর্ক অর্থাৎ শাখাতে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ উপরি
উক্ত পাঁচ পর্ক আবার তমো, মোহ মহামোহ, তামিস্র, এবং অন্ধতাবিশ্র
নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। যথা—বিষ্ণুপুরাণে—

‘তমোমোহো মহামোহ স্তামিশ্রোহীক্সংজ্ঞকঃ।

অবিদ্যা পঞ্চপট্টেষা প্রাচুর্ভূতা মহাস্মনঃ।

অবিদ্যাদির লক্ষণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া
ক্রমান্বয়ে সূত্রপঞ্চক দ্বারা উক্ত হইয়াছে।

হিন্দু বিবাহের ব্যবস্থা।

যমুরবিধান সুপালনীয়।

ব্রাহ্মণ বাসকেব বিদ্যাবাস্তব সাধাবণত প্রশস্ত সময় চরবৎসর তিনমাস
হইতে সাত বৎসর তিনমাস বয়স পর্যন্ত। বিশেষ স্থলে, তিন বৎসর তিনমাসের
পর হইতে চারি বৎসর তিনমাস পর্যন্ত বিদ্যাবাস্তব সময়। অর্থাৎ কোন
স্থলেই তিন বর্ষ তিন মাসের পূর্বে ব্রাহ্মণ বালকের বিদ্যাবাস্তব হইবে না। আর
ষোড়শ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণ বালকের বিদ্যাবাস্তব হওয়া একান্ত আবশ্যিক;
তদন্যথাঃ ধর্ম নষ্ট কর্ম নষ্ট হইবে। ৯ বৎসর তিনমাস হইতে ১০ বৎসর
তিনমাস ক্ষত্রিয়ের প্রশস্ত কাল। বিশেষ স্থলে ৫ বৎসর তিনমাস হইতে
৫ বৎসর তিনমাস; অপারগ স্থলে বাইশ বৎসরের মধ্যে। বৈশ্যের সাধারণত
১০ বৎসর তিনমাস হইতে ১১ বৎসর তিনমাস; বিশেষ স্থলে, ৬ বৎসর তিনমাস
হইতে ৭ বৎসর তিনমাস; আপং স্থলে, ২৪ বৎসরের মধ্যে। বিদ্যাবাস্তব
কালনিয়ম এইরূপ।

এখন দেখিতে হইবে শিক্ষার কাল নিয়ম কিরূপ; আজীবন ব্রহ্মচর্য
করিয়া, স্তত্রাং দায়গরিগ্রহ না করিয়া, স্তত্রাং গৃহস্থপ্রথম অবলম্বন না

করিয়া বিদ্যালয়শীলন করিব, এক্ষণ তাঁহাদের সংকল্প, তাঁহাদের পক্ষে তাহাই নিয়ম । সাধারণত সবলই গৃহঘর্ষে প্রবেশপ্রার্থী । তাঁহাদের পক্ষে নিয়ম এই যে, তাঁহারা উক্ত হ্রদ্রিশ বৎসর অন্তত নয় বৎসর বিদ্যালয়শিক্ষা করিবেন ।

যাঁহারা অধিক কাল বিদ্যালয়শিক্ষা করিবেন, তাঁহাদের জন্য বিদ্যালয়ের বিশেষ কাল নিয়ম পূর্বেই বলা হইয়াছে । এইরূপ স্থলে ব্রাহ্মণের চল্লিশ বৎসরে পঠদশর পরিসমাপ্তি হয় । আপৎপাতে তাঁহাদের বিদ্যালয়ে বিলম্ব হইয়াছে, তাঁহাদিগকে কাজে কাজেই অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে পাঠ সমাপ্তি করিতে হইবে । আপৎপাতে ব্রাহ্মণ ষোড়শ বৎসরেও বিদ্যালয় করিতে পারেন, তাহাব পব অন্তত নয় বৎসরকাল তাঁহাকে বিদ্যালয়শিক্ষা করিতেই হইবে ; স্তববাং এরূপ স্থলেও তিনি ২৫ বৎসরের পূর্বে শিক্ষার অবস্থা ত্যাগ করিতে পারেন না । হ্রদ্রিশ বৎসর ও নয় বৎসরের গড় গড়তাই বাইশ তেইশ বৎসর । যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে সাধারণত ব্রাহ্মণ এই সুদীর্ঘকাল গুরুগৃহে বিদ্যালয়শিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে, তাহার সহিত ব্রাহ্মণের বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত বাল ছয়, সাত বর্ষ ধরিলে, সাধারণত ব্রাহ্মণ ২৮।৩০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যে থাকিয়া বিদ্যালয়শিক্ষা করিতেন, ইহাই বুঝা যায় । কচিং কেহ ৩৯।৪০ বর্ষ পর্যন্তও থাকিতেন, আবার কচিং কেহ ২৪।২৫ বৎসরেই পাঠ শেষ করিতেন ।

এখনকার দিনে জ্ঞানকরী শিক্ষাব কোন নিয়মই এদেশে নাই । ইংরাজি ত অর্থকরী শিক্ষাই বটে, চতুর্থাঠার শিক্ষাও অর্থকরী হইয়াছে । এই বঙ্গদেশে সর্বোচ্চ অর্থকরী শিক্ষা অর্থাৎ ইংরাজি ভাষা ও আইন শিক্ষা, আপাতত বন্ধ হয়, ২১।২২ বৎসরেই সমাপ্তি হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে । ২১।২২ বৎসরে এম্. এ, বি এল্. হইলেও, তাহার পর হাইকোর্টের কোন উকীলের চিহ্নিত কেরানী হইয়া (Articled clerk) অথবা মক্কেল বারে নাম মাত্র লেখাইয়া অন্তত তিন বৎসর কাল, যে বখামি ও বকামি শিক্ষা, ব্যবহার মতে একান্ত কর্তব্য, তাহাও শিক্ষার কাল বলিতে হইবে । কেন না, ঐরূপ বিচিত্রা শিক্ষা তিন বৎসর না পাইলে, হাইকোর্টের বারে বসিবার বা-মুনসেফির জন্য রেজিষ্টার মহোদয়কে পক্ষান্তে স্লেম করিবার অধিকারই পাওয়া যায় না, এবং আইনের ব্যবসারে কোন

রোজগারই হয় না। রোজগারই এখনকার দিনে গার্হস্থ্য ধর্মের প্রাপ। রোজগারের জন্য, রোজগারের পূর্বে যে কিছু শিক্ষা, তাহাই তখনকার কালের বিল্যাশিক্ষা। এই শিক্ষা এখনকার দিনে, স্মৃতরাং ২৪।২৫ বৎসরে শেষ হয়। অর্থাৎ প্রাচীন কালের অপেক্ষা ৪।৫ বৎসর পূর্বে শেষ হয়। আমাদের আত্মর স্তারতম্য দেখিলে, এই বিভেদ অবশ্যস্বামী বলিয়াই বোধ হইবে।

পাঠ সমাপন হইলে, গুরুর অনুমতি লইয়া, ব্রাহ্মচর্য্য ব্রত শেষ করিয়া বিদ্যাভিতরা সর্বণ লক্ষণাধিতা ভার্য্যা বিবাহ করিবেন।

কত বয়সেব ? কত বয়সের পাত্র কত বয়সের পাত্রীকে বিবাহ করিবেন, জাহার কোন বাঁধা বাঁধি নিয়ম নাই—দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি কথা বলা আছে। ত্রিশ বৎসরের পাত্র বাব বৎসবের কন্যা কন্যাকে বিবাহ করিবেন। গার্হস্থ্য ধর্মে ব্যাঘাত হইতেছে এমন হইলে, শীঘ্র বিবাহ করিতে পারেন—চক্ৰিশ বৎসরের পুরুষ অষ্ট বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সাধারণত ব্রাহ্মণ ২৮।৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রাহ্মচর্য্যে থাকিয়া পাঠ সমাপন করিতেন, আবার কটিং কেহ ২৪।২৫ বৎসরেই পাঠ সমাপন করিতেন। স্মৃতরাং ৩০ বর্ষের পুরুষে ১২ বৎসরের কন্যা, ও ২৪ বৎসরের পাত্রে ৮ বৎসরের পাত্রী—এই দৃষ্টান্ত দুটটি—অকাল্প আনীত উদাহরণ নহে। যে বয়সে সকলে সচরাচর বিবাহ করিত, সেই বয়সের দৃষ্টান্তই দেওয়া হইয়াছে। সে সময়ে বালিকার বিবাহকাল ৮।৯ হইতে ১২।১৩ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল, বলিতে হইবে।

উৎকৃষ্ট, স্বরূপ, এবং কন্যার যোগ্য বর প্রাপ্ত হইলে, কন্যা যদি অপ্রাপ্ত-বয়স্কও হয়, তথাপি তাহাকে সেট বরে যথাবিধি দান করিবে। অর্থাৎ কন্যা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলিয়া ইতস্তত করিবে না। কিন্তু কত বয়স পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলা যাবে ? অববহিত পদের বচনে তাহা বুঝা যায়। প্রকৃত্তমতী হইয়াও কন্যা যাবজ্জীবন গৃহে বাস করিবে, সেও বরহীন, তথাপি ক্ষণহীন পাত্রের কন্য কন্যাকে প্রদান করিবে না। ‘সেই বরঃ ভাস’ এই কথ্য বলাভেই বুঝা যাইতেছে, সে প্রকৃত্তমতী হইয়া পিতৃগৃহে বাস কন্যার পক্ষে নিষিদ্ধ।

উৎকৃষ্ট বর পাইলে, কন্যাকে আর বয়সেই দান করিবে,—প্রকৃত্তমতী।

কখনই দান করিবে না—বয়ঃ ঋতুমতী হইয়া চিরকাল ধরে থাকুক—এই তিন কথায় বুঝা যায় যে সাধাবশত মধ্যম রাশি বর সদ্য-সম্ভাবিত ঋতু কন্যাকে যথাবিধি দান করিবে । ত্রিশ বৎসরের পাত্র বার বৎসরের কন্যা কন্যাকে বিবাহ করিবে—এ স্থলে কন্যা বিশেষণে বোধ হয়—কন্যাকে বার বৎসরের পরই সদ্য-সম্ভাবিত ঋতু বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে । রস-গ্রীষ্ম-প্রধান বঙ্গদেশে এখনও সেইরূপ সময়েই ঋতুর কাল বলিয়া বোধ হয় ।

বিবাহের কাল নিয়ম একরূপ মোটামুটি বুঝা গেল ; তবে এই সঙ্গে আর একটি কথা আছে—জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইলে, কনিষ্ঠ কখনই বিবাহ করিবে না—তবেই প্রাপকাল হইলেই যে বিবাহ করিতে পারিবে এমন নহে—কাল যিলম্ব করিতে হইবে । বোধ হয় জ্যেষ্ঠ চির ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, এ বিধি খাটে না ।

এই কাল নিয়মের দুল তাৎপর্য্য এই যে যথাসাধ্য বিদ্যা অর্জন করিয়া পুরুষ সদ্য-সম্ভাবিত ঋতু বালিকার পাণ গ্রহণ করিবে । ইহাতে গর্ভাধানের নিয়ম কি তাহা এখনও জানা যায় নাই । বিবাহ কালের এই নিয়ম এখনও চলিতেছে বলিতে হইবে, অথবা চলিবার কোন বাধা দেখা যায় না । স্ত্রীরাং অনর্থক আমরা বয়োনিয়ম লওয়া গোল কাব কেন ? ডাক্তারেরা বলিতে পারেন, গর্ভাধানের সময়ের পক্ষে বালিকার বয়স প্রচুর নহে ; কিন্তু তাহার জন্য বিবাহের কাল নিয়ম লইয়া আমরা গোল করি কেন ? গর্ভাধানের সময় পুরুষ যদি আধুনিক বিজ্ঞান বা অবিজ্ঞান মত রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে, তাহার ত সে বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এখনকার দিনে আছে ।

শ্রুতির পরেই মহুসংহিতা হিন্দুদিগের সর্বপ্রধান শাস্ত্র । বিংশতি জন ধর্মি আমাদের ধর্মশাস্ত্র প্রয়োজক । মহুসংহিতা অন্য সকলের মত বিরোধ হইলে, মহুসংহিতাই আমাদের অনুসরণ করিতে হইবে, ইহাও শাস্ত্রের অঙ্গ-শাসন বাক্য । মহু প্রবৃত্ত বিবাহের নিয়মগুলি—প্রাঞ্জল, পরিকার, প্রোষিত এবং উদার । আমরা দেখাইলাম, যে সেই সব নিয়ম অনুসরণ করিলে, এখনকার দিনে সজ্ঞে চলিতে পারে—প্রায় কিছুই ভাঙ্গ-গড় করিতে হয় না, কোনরূপ সামাজিক বিপ্লবই সংঘটিত করিতে হয় না । আসল কথা—

আমরা সরলভাবে, শাস্ত্র, বিজ্ঞান, বা যুক্তি কোন কিছুই অতুলন করিতে প্রস্তুত নহি—আমরা এখন চাই, কেবল আন্দোলন, আন্দোলন, আন্দোলন এবং আন্দোলন ।

যে বাহা কিছু বলিবে, তাহাতে অন্যের আপত্তি আছেই আছে। আপত্তি না করিলে discussion, percussion, concussion, ঘর্ষণ, মর্ষণ, লোমহর্ষণ ঘণ প্রত্যায়ান্ত কোন কিছুই হয় না। ঘর্ষণ মর্ষণ, না হইলে অগ্নির উৎপত্তি হয় না। সমাজ যদি আশুগ উঠাইতেই না পারিলাম, তাহা হইলে এ জীবনেও দিক, এ লেখনেও দিক, এ রসনেও দিক! সুতরাং আপত্তি কবিতাই হইবে;—আশুগ উঠাইতেই হইবে। আমবা বলি তাই! আশুগ উঠাইলে, কিন্তু সে আশুগ বাধিত ত পাবিবে না—তোমার ত শোলা ধরান নাই। আর এক কথা—বঠোর প্রস্তুত, কঠিন লৌহে ঠকাঠকি কবিলে, তবে আশুগ উঠে,—পোড়ান পুরাণ ভাঙে, আর কাঁচা নুতন ভাঙে ঠকাঠকি কবিলে ভাঙ ছইটাই চূর্ণ হইবে মাত্র ।

মহুস-হিতার সহজ-সোধ্য, সমাজ-সঙ্গত, যুক্তিপূর্ণ, উদারতাপূর্ণ বিবাহের কাল নিয়মে তুমি আমি বলিলেই, উহার তাঁহার আপত্তি আছে। বজ্রের সম্বন্ধ পরিবার সকলের মধ্যে মহুস ব্যবস্থিত কনার বিবাহ কাল নিয়ম সহজেই প্রতিপালিত হইতে পাবে, সমাজেব গতিও গোধ হয় সেই দিকে,—কিন্তু তথাপি সেই নিয়মের কথা তুমি আমি যে কেহ স্পষ্ট করিয়া বলিলেই উহার তাঁহার আপত্তি আছে। তাহার প্রথম কাবণ আপত্তি করাই অভ্যাস। দ্বিতীয় কারণ ভাল মন্দ—সঙ্গত অসঙ্গত—কোনরূপ নিয়ম মানিতেই আমরা প্রস্তুত নহি ।

কন্যার বিবাহ কাল নিয়ম সম্বন্ধে মহুব ব্যবস্থায়, দেখা যাইতেছে যে, প্রবীণ নবীন উভয় সম্প্রদায়েরই আপত্তি আছে। মহু বয়সের দৃষ্টান্ত স্থলে পবিত্র ভাষায় বলিয়াছেন ষাটশ বার্ষিকীঃ। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিশেষণ দিয়াছেন “কন্যাঃ”। “কন্যাঃ ষাটশ বার্ষিকীঃ” ৭ এই কন্যা বিশেষণটি যে কেবল পাদপুরণার্থ বলিয়াছে, এমন বোধ হয় না। কন্যা শব্দের সার্থকতা আছে, কাহার কন্যা? ত্রিশ বৎসরের বয়সের এখনকার ভাষায় বলিতে হইলে, বলিতে হইবে—বার বছরের বেশ সেয়ানা মেয়ে। কাহার মনে অহুরাগের সঞ্চার সম্ভব, তাহাকেই বিদ্যাপতি ‘সেয়ানো’

পৃথিবীরাও সেইরূপ কন্যাকে সেয়ানা বলেন। একরূপ সেয়ানা মেয়ে না হইলে ত্রিশ বৎসরের বর ব হৃদ্যা হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হই-
তেছে যে, “দ্বাদশ বার্ষিকী” পদের ভাবার্থ পরিস্ফুট করিবার জন্যই হৃদ্যা
পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

মম্বুর শ্লোকটি সম্বন্ধে আর একটি কথা বুঝা আবশ্যিক। দ্বাদশ বার্ষিকী পদের
অর্থ কি? এগার হইতে বার বছরের? না বার হইতে তের বছরের? হৃদ্যা
শব্দের সার্থকতা বুঝিলে, এবং শ্লোকের অপরাধ ‘অষ্ট’ পদ আছে, ‘অষ্টম’
একরূপ পদ নাই। বলা দেখিলে, এইরূপ মনে হয়, যে পূর্ণ বার বৎসর বয়স
কন্যার কথায় মম্বু বলিয়াছেন।

মম্বুর এই মতে প্রবীণেব আপত্তি এই যে “তা হ’লে মেয়ের বয়স বড়
বেশী হয়।” নবীনব আপত্তি এই যে, “তা হ’লে মেয়েব বয়স বড় কম
হয়।”

বহুসংখ্যক কথা এই যে, প্রবীণেব মম্বুর মত খণ্ডন করিবার জন্য ‘শাস্ত্রের’
দোহাই দিয়া থাকেন! শাস্ত্রবাদের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর
নাই।

বিবাহ সম্বন্ধে ভৃগুশ্রোত্র মম্বুসংহিতার সমগ্র প্রধান ব্যবস্থা আমরা
পূর্বে দিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, মম্বুর মতে কন্যার বিবাহের
ব্যাপারাদি কিছু কাল নিয়ম নাই—‘ববং ঋতুমতী হইয়া পিতৃ গৃহে থাকুক,
বলাতেই ঋতুকালের পূর্বেই কন্যার বিবাহেব প্রশস্ত কাল বলিয়া উপদেশ
করা হইয়াছে। এবং পরে, পূর্ণ আট বছরের হইতে পূর্ণ বার বছরের পর্যন্ত
বয়সের কন্যা বিবাহ যোগ্য একরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে অন্যান্য দুই একটি সংহিতায় কি আছে, তাহা দেখিলে
জ্ঞতি নাই। দেশে অষ্ট বর্ষে গোঁরীদানের ফলশ্রুতি প্রচলিত আছে।
আঙ্গিরসী এবং পারাশরী স্মৃতিতে তাহর অঙ্কুর পাওয়া যায়।

অঙ্গিরসর বচন.—

অষ্ট বর্ষা ভবেদগোঁরী নব বর্ষাতু রোহিণী।

দশম কন্যাকা শ্রোত্রা অতউর্দ্ধং রজস্বণা ॥

তদ্বাৎ সপ্তমসরে শ্রোত্রে দশমে কন্যাকাবুধেঃ।

হনাতব্যো প্রযজেন ন দোষঃ কাল দোষতঃ ॥

অষ্ট বর্ষ, কন্যাকে গৌরী, নববর্ষকে বোহিণী দশমে কন্যাকা, ও তার পর রজস্বলা বলে। সেই জন্য পাণ্ডুতেরা কন্যার দশম বৎসরে বিনাই দিবেন, তাহাতে আর কাল দোষ জন্য দোষ হয় না।

এই কথাটি একটু বিস্তারিত করিয়া বুঝিতে হইবে। পূর্ণ আট বৎসর হইতে আট বৎসব এগার মাস ঊনত্রিশ দিন পর্য্যন্ত গৌরী; পূর্ণ নয় বৎসর হইতে নয় বৎসর এগার মাস ঊনত্রিশ দিন পর্য্যন্ত বোহিণী; দশমে কন্যাকা অর্থাৎ দশ বৎসব পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যাকা; তাব পর রজস্বলা। এই শ্রোত্রী স্পষ্টত পারিত্রাষিক। কিন্তু পরিভাষায়ও দোষ পড়িয়াছে। ‘অষ্ট বর্ষ’ ‘নববর্ষ’ প্রথমে বলিয়া পরে ‘দশমে’ বলাতে ‘বোহিণী’ ও ‘কন্যাকা’ একই বয়সের কন্যাকে বুঝাইতেছে অথবা কন্যাকাল গণিতের বিদ্যু পরিমিত কাল হইতেছে। এইরূপ গোলযোগ দেখিয়াই বোধ হয়, পরাশর ঐ শ্রোত্রকে সংস্করণ করেন, পরাশরের বচন এইরূপঃ—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাতু বোহিণী ।

দশবর্ষা ভবেদ্ কন্যা অতউর্দ্ধঃ রজস্বলা ॥

প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাঃ ন প্রযচ্ছতি ।

মাসি মাসি রজস্বলা পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ং ॥

অষ্ট বর্ষা কন্যাকে গৌরী, নববর্ষকে বোহিণী দশ বর্ষকে কন্যা ও তার পর রজস্বলা বলে। দ্বাদশ বৎসব (প্রাপ্ত) হইলে, যে কন্যাদান না করে তাহাব পিতৃলোকেবা ইত্যাদি।

দেখা যাইতেছে যে পরাশর অজ্ঞার গোলযোগের সংস্কার করিতে গিয়া মনুষ্য পথেই অগ্রসর হইয়াছেন। যুর ফিরে দ্বাদশ বৎসরে আসিয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিক—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাতু বোহিণী ।

এই আধখানা বচন যদি বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে ‘দশ বর্ষা ভবেৎ কন্যা’ এইরূপ না বলিলে চলে না। সুতরাং দশ হইতে এগার বৎসর পর্য্যন্ত খাস কন্যাকাল; তাহাব পর অর্থাৎ একাদশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর হইতে পারিত্রাষিক রজস্বলা কাল। এই পারিত্রাষিক রজস্বলা কালে অর্থাৎ কন্যার পূর্ণ এগার বৎসর বয়স হইলে পর তাহার বিবাহ দেওয়া চলিবে না কি? চলিবে, কিন্তু এগার পর বার পূর্ণ হওয়ার মধ্যে দিতে

হইবে—ইহার মধ্যে যদি না দেও, তাহা হইলে তোমার পিতৃপুরুষের বড়ই দুর্গতি হইবে । তবেই পরাশরের মতে দশ হইতে এগার বৎসর পর্য্যন্ত খাস কন্যাকাল সেই সময় কন্যাব বিবাহ দেওয়া কর্তব্য অস্তুত এগার হইতে বার বৎসরের মধ্যে কন্যাব বিবাহ দেওয়া আবশ্যক ।

এই মতেব সহিত মনুর মতের বিশেষ বিবোধ নাই । তবে মহাত্মা মনু কন্যাকর্তাকে সংপাত্ত পাওয়াব দিকেই লক্ষ্য রাখিতে বলেন, কাল্যাকালের বিশেষ নিয়ম ক'বন নাই এইমাত্র । আমরাও বলি, ইহাই সমুদ্রিক কথ্য, ইহাই শাস্ত্র, ইহাই ধর্ম ।

দশ বার বৎসবে কন্যাব বিবাহ দেওয়ায় নব্য ^{মো}দায়ের আপত্তি আছে ; আপত্তি বৈজ্ঞানিক । নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই বিবেচনা করেন, যে বিবাহ হইলেই দম্পতির শারীরিক সম্মিলন হইবে । এগাব বার বৎসরের বালিকার গর্ভধান, তাঁহারা বিশেষ অনিষ্টকব বলিয়া বিশ্বাস কবেন, কাজেই এগার বার বৎসরের কন্যাব বিবাহে তাঁহাদিগের আপত্তি ।

আমরা বলি, নব্য সম্প্রদায় ঐরূপ বিবাহে আপত্তি না করিয়া, যদি আপন আপন পুত্র কন্যাব বধূভামাতার সহিত বাল্যমিলন নিবারণের যত্ন করেন, তাহা হইলে ভাল হয় । যদি তাঁহারা বলেন, যে বিবাহ দিয়া বর বধূর শারীরিক সংঘটন নিবারণ কবা অসাধ্য, তাহা হইলে আমরা বলি,—যদি সম্পূর্ণ আয়ত্তিগত বধুব সহিত পুত্রের সংঘটন অনিবার্য্য হয়, তাহা হইলে আয়ত্তিব একান্ত বহির্ভূত বাববনিতাব সহিত পুত্রের অধিগমনও অনিবার্য্য হইবে । যদি বলেন, সংশিক্ষায় ও সদ্ধৃষ্টান্তে বৈশ্যগমন নিবারণ কবা যায়; তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, সেইরূপ সংশিক্ষা ও সদ্ধৃষ্টান্তে কি বাংলা সংঘটন নিবারণ কবা যায় না ? অবশ্যই যায় । ওদিকে আমাদের দৃষ্টি নাই বলিয়াই যত গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে ।

বঙ্গের প্রাচীন নবীন সকল সম্প্রদায়কেই আমরা বলি, বাহাতে কন্যার দ্বিতীয় সংস্কারের পূর্বে বরবধূর সংঘটন না হয়, সে পক্ষে সকলেরই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । ঐরূপ সংঘটন অস্বাভাবিক, অশাস্ত্রীয়, অনাচার । কিছু কাল পূর্বে—এরূপ সংঘটন গৃহিণীরা পুত্রের অন্নচুকর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন ; দ্বিতীয় সংস্কার না হইলে দ্বিরাগমন হইত না ; হইলেও, বিবাহের এক বৎসর মধ্যে দ্বিরাগমন হইত না । এক বঙ্গদেশ ছাড়া, উৎকল

উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি সকল দেশেই এখনও দ্বিতীয় সংস্কার না হইলে, 'গহনা' বা দ্বিরাগমন হয় না, বা দ্বিরাগমন না হইলে, কখনই বর বধূর মিলন হয় না । বাস্তবিক তাহাই—ধর্ম, তাহাই বিজ্ঞান, তাহাই সচ্চারণ । আমাদের দেশে দেখিতে দেখিতে এই বিষয়ে অনাচার প্রবেশ করিতেছে । সর্বশেষে ধূলা পায়ে দিন করা, সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । এই প্রথমে বিস্তৃতি রোধ কবিতো হইবে, অস্বাভাবিক সংঘটন নিবারণ করিতে হইবে ।

গারিবল্‌ডি ।

১ ।

১৮০৭ সালের ২২ শে জুলাই ইটালি দেশের নাইস্‌ নগরে নাবিকগৃহে শুভকর্মে গারিবল্‌ডি জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁহার পিতা নৌ-ব্যবসায়ী ছিলেন । কিন্তু তৎকালীন তদদেশস্থ সামান্য নাবিকগণ অপেক্ষা তিনি সমধিক উন্নতমনা এবং অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন । অতিক্রমে জীবিলা নির্বাহ ও পরিবার প্রতিপালন করিতেন । আপনাবা কষ্টে-মৃষ্টে দিনপাত করিয়া সম্ভ্রান্তকে বিশেষরূপে শিক্ষিত করেন, তাঁহার পিতার নিত্যন্ত বাসনা ছিল । তাঁহার মাতা সর্বদা সামান্য মৎস্য ব্যবসায়িনী নাবিক রমণীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন এং সতত অসংস্কার্য কলভাসুরতা অধনতমনা নাবীদিগের মধ্যে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বভাব দূষিত কবিতো পারে নাই । তাঁহার মানসিক তেজ ও দর্প, তাঁহার স্বাভাবিক কোমলতা ও গান্ধীর্ষ্য চিহ্ন দিন অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান ছিল । তাঁহার দয়া ও সহানুভূতি সকলের উপর সমান ছিল । তাঁহার নিকট হইতে গারিবল্‌ডি অতি শৈশবাবস্থাতেই দেশ-ভক্তি শিক্ষা করেন, এবং সেই ভক্তিই কালে দেশোদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল । তাঁহার মাতা এক দিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ গুণবাণিতে বিভূষিতা ছিলেন অপর দিকে তাঁহার মেহ বাৎসল্যাগ্নি ক্রী-মূলত ওগেরও অভাব

ছিল না। গারিবল্ডি ভবিষ্যতে যে অসাধারণ নির্ভীকতার সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ হন, তাহার একমাত্র নিগূঢ় কারণ তাঁহার মাতার একান্ত সন্তান-বাৎসল্য। তিনি স্বয়ং একদা বলিয়াছেন, ‘লোকে আমার মাহাত্ম্য দেখিয়া বিস্মিত ও চকিত হন, তাঁহারা জানেন না যে যখন মাতার ন্যায় পরম পবিত্রস্বভাবী বমণী আমার মঙ্গলেক্ষায় দৃশ্যবৈব নিকট সতত প্রার্থনা করিতেছেন, তখন আমার কোন প্রকার অমঙ্গল হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই সুদৃঢ় ধারণাই আগাব অলৌকিক সাহসের একমাত্র কারণ।’

পিতার অবস্থা সামান্য, অথচ তিনি গারিবল্ডিকে রীতিমত শিক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ও সযত্ন ছিলেন। কিন্তু গারিবল্ডি পিতার চেষ্টায় ও যত্নে বিশেষ শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। কালে তিনি বীবজ্ঞানগণ মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাল্যকালে বিশেষ বুদ্ধির প্রাথমিক বা শিক্ষণীয় তৎপরতা দেখান নাই। তাঁহার সমপাঠীগণ অপেক্ষা তিনি কিছুতেই অধিক উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন না; বরং অনেক বিষয়ে তাহাদেব অপেক্ষা তিনি নিম্নে ছিলেন। তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে নির্বোধ অকর্ম্মণ্য বালক বলিয়া তাঁহার শিক্ষার জন্য অধিক যত্ন লইতেন না। তিনি একস্থলে লিজেই স্বীকার করিয়াছেন ‘বাল্যকালের প্রথমাবস্থায় আমি শিক্ষা অপেক্ষায় আমোদ আহ্লাদ ভাল বাসিতাম। এই কারণে পিতা মাতা আমার জন্য যে পরিমাণে যত্ন ও ব্যয় স্বীকার করিয়াছিলেন, আমি সে পরিমাণে শিক্ষালাভ করিতে পারি নাই।’ অথচ বাল্যকালে তাঁহার হৃদয় সত্যতা ও কোমলতাব আবাসভূমি ছিল। তাঁহার এমনই কেমন এক প্রকার পবিত্র কোমল স্বভাব ছিল, একবার তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার প্রতি স্নেহের উদ্বেক হইত। আবার এদিকে তাঁহার সমবয়স্কদিগের ভিতর তাঁহার ন্যায় একাগ্রচিত্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেহই ছিল না। প্রতিবেশির প্রাচীর অতিক্রম করিয়া বাগান হইতে ফল মূল চুবি করিতে গারিবল্ডি বালকদিগের অধিনায়ক হইতেন। পুস্তকের প্রতি তাঁহার বড় বিতৃষ্ণা ছিল। স্বভাবত অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকের পুস্তকের উপদেশে আস্থা থাকে না। তাঁহারা বাহ্যপ্রকৃতি হইতে যথার্থ অকৃত্রিম জ্ঞান লাভ করেন। অত্যাচ্ছন্ন শৈল শিখরমালা কালের সর্বনাশকর দর্প অতিক্রম করিয়া চির দিন সমস্তাবে দণ্ডায়মান, গভীর তরঙ্গময় সমুদ্র চিরকাল অপ্রতিহত ভাবে প্রা-

হিত, দেখিয়া তিনি যে শৈথল্য, গাঙ্গীর্ষ্য, অচলতা, অক্ষুণ্ণতা শিক্ষা করিয়া-
ছিলেন, সে শিক্ষা বাহ্যপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ না করিলে পাওয়া যায় না, এবং
সে প্রকার শিক্ষা না পাইলে গারিবল্ডির জীবন অত্যন্ত হইত কি না
সন্দেহ ।

নাবিকদিগেব মধ্যে সতত বাস করায় অতি অল্পকাল হইতেই তাঁহার
সমুদ্র গমনে ইচ্ছা জন্মিল। বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে পিতাব সন্তিত
নৌকায় যাইতেন, এবং সেই অল্প বয়সেই এবীণ নাবিকদিগের ন্যায় নৌ-
বিদ্যায় নিপুণতা লাভ কবেন। তাঁহার আট বৎসব বয়সেব সময় তিনি
জন্মগ্রহণ হইয়া একটি বৃদ্ধা রমণীকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কবেন। পাঠে বিবস্ত
হইয়া ও শিক্ষকদিগেব প্রতি বোষ পববণ হইয়া, তিনি বাল্যকালে একদিন
সমুদ্র পথে জেনোয়া বন্দবে যাত্রা কবিবেন মনস্থ কবিলেন। জেনোয়া বন্দর
তাঁহার জন্মভূমি হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে সমুদ্রকূলে অবস্থিত। সমা-
ধ্যায়ী কতকগুলি বালককে সঙ্গী কবিয়া মৎস্যজীবীদিগেব একখানি ক্ষুদ্র তরি
সমুদ্রে বন্ধে ভাসাইলেন। এমত সময়ে একজন ধর্ম্মযাজক তাঁহার পিতাকে
এই সকল সংবাদ দিলেন, তাঁহার পিতা পক্ষাৎ ধাবমান হইয়া সন্তানকে
গৃহে প্রতিনিবৃত্ত কবিলেন। কথিত আছে যে এই সময় হইতেই গারিবল্ডি
ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়েব উপব খজাহস্ত হইলেন, এবং পরিশেষে পোপ ও
অন্যান্য ধর্ম্মযাজকদিগেব ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই
ঘটনা হইতেই যে তাঁহার মনে ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়েব উপব বৈবনির্ঘাতন
স্পৃহা উদ্ভিক্ত হইয়াছিল, এ কথা নিশ্চয় বলা যায় না।

তাঁহার সমুদ্রযাত্রাব প্রথম উদ্যোগে পিতা বাধা দিলেন, এবং বাটতে
লইয়া আসিয়া ক্রমাগত সমুদ্রযাত্রার ক্লেশ, দুঃখ ও বিপদ সকল বর্ণনা
কবিত্তে লাগিলেন এবং যাহাতে বালকের মনে সমুদ্র গমনে ভয় ও বিবাগ
জন্মে তাহার বিধিষত চেষ্টা করিত্তে লাগিলেন। কিন্তু গারিবল্ডি সামান্য
বালক নহেন, যত বিপদ ও ক্লেশের কথা শুনেন, ততই তাঁহার মন সমুদ্রের
দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। পিতা তাঁহার সমুদ্র গমনে একান্ত স্পৃহা ও
সুদৃঢ়াহরণেব প্ররোচনা কবিত্তে পারিলেন না। পরিশেষে উপায়ান্তর না
দেখিয়া পিতা নিজের জাহাজ লইয়া যাত্রা কবিত্তে প্রথমে অল্পমতি দিলেন।
তিনি এক একবার করিয়া ওদেশা, বোম, লিবাণ্ট, গ্রীস ও অন্যান্য প্রদেশ

প্রধান স্থানে গমন করিলেন। এই সকল জলযাত্রা কালে কতবার দম্ভ্য-
দলের সম্মুখীন হইয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনে সাহস ভিন্ন ভর
উৎপাদন করিতে পাবে নাই। এই প্রকারে মহাবীর যোসেফ গারিবল্ডির
সুমহৎ জীবনের ঐখমাংশ অতিবাহিত হইল।

গারিবল্ডি ১৮৩৩ সালে মাসেলি নগরে যোসেফ মাট্‌সিনির সহিত
প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইটালীতে পক্ষে এটি মাহেত্র যোগ, দুই গুভগ্রহ
একত্র আসান। দুই জনেব জীবনেব একই উদ্দেশ্য, উভয়েই একই ভাবে
উত্তেজিত। ইটালীর স্বাধীনতা উভয়ের জীবনেরই সূদৃঢ় সংকল্প। উভয়ে
পরস্পর প্রথম সাক্ষাৎ কাল হইতে সূদৃঢ় প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও নিজ নিজ
সঙ্কল্পে দৃঢ় বদ্ধ হইলেন। মাট্‌সিনি এমন একজন দেশভক্ত পাইলেন,
যাঁহাব বিপদই সম্পদ, দুঃখই সুখ, স্বদেশোদ্ধাব যঁাহার জীবনের একমাত্র
উদ্দেশ্য, যিনি স্বদেশেব স্বাধীনতার জন্য যতক্ষণ শবীরে বিদ্যুন্মাত্র শোণিত
ধাকিবে, ততক্ষণ বিমুখ ও হতাশ হইবার নহেন। এ প্রকার অমিত্তেতজ্ঞা,
অলৌকিক সাহসী, অকপট দেশভক্তের সহিত মিলিত হইয়া মহাত্মা মাট্‌-
সিনির মন অধিকতর নাচিয়া উঠিল। এই সময়ে গারিবল্ডি মাট্‌সিনির
নিকট সত্য-বন্ধ হন, যে, যাহাতে ইটালিতে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রচলিত হয়,
তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা কবিবেন।

এই সময়ে মাট্‌সিনি পায়দমস্ত নগর আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন;
এবং গারিবল্ডিকে তাহার ভার্য্যাপণ কবিলেন। গারিবল্ডির চেষ্টা
বিফল হইল। প্রথমে অবরুদ্ধ হইবেন এবং পরে তাহার প্রাণ বিনষ্ট
হইবে, এই আশঙ্কায় গারিবল্ডি তথা হইতে দূরদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য
হইলেন। তাঁহার জীবনেব এই অংশেব ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য। নিশাযোগে
অজানিত পর্ব্বতময় দুর্গম পথে ভ্রমণ এবং দিবাভাগে শৈবালাজ্বর বা
অনাচ্ছাদিত ভূপৃষ্ঠে শয়ন কবিতো লাগিলেন। কতদিন অনাহারে ঘাপন
করিতেন, কখন বা ক্লষক বমণীগণ দয়া করিয়া অতি অল্প পরিমাণে
যৎকিঞ্চিৎ যাহা দান করিতেন, তাহাতেই প্রাণ ধারণ করিতেন। এই
সময়ে তাঁহার চৈতন্য হইল যে, প্রকৃত দেশভক্তের জীবন কষ্টময় ও বিপদ
সঙ্কুল। যিনি স্বদেশেব মঙ্গল সাধন করিয়া নরজন্মে অববতা লাভ করিতে
চাহেন, তাঁহাকে অতি কঠোর ক্রেশ, অনেক দারুণ যাতনা সহ্য করিতে

হয়। সামান্য লোকের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট হইলে গারিবল্ডি এত দিন বহুকাল এ সকল কষ্ট বিসর্জন দিয়া, সুখে নিজ কুটারে আশ্রয় লইতে পারিতেন। কিন্তু বিপদে অটল, কষ্টে অক্লান্ত, মহাবীরের দৃঢ়তা, পর্বতের ন্যায় অচল। যতই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন ততই তাঁহার মন অধিকতর উত্তেজিত হইতে লাগিল। পদে পদে বিপদ, প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর আশঙ্কা, প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন, নাশের ভয় অতিক্রম করিয়া স্বকাৰ্য্য সাধনে অগ্রসর হইলেন। এই প্রকারে সুদারুণ কষ্টে প্রায় বিশ দিবস পথ অতিক্রম করিয়া অষ্ট্রিচর্শ্চনার দেহে কর্ণাশি দেশের সীমায় উপস্থিত হইলেন। এখন আর শত্রু ভয় রহিল না। কিন্তু তথায় তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবার নহেন। শীঘ্রই টিউনিস্ নগরের একখানি জাহাজে উঠিয়া আবার মার্সেইলিতে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে নগর-বিস্তৃতি বোগেব ভয়ানক প্রাচুর্ভাব হইয়াছিল। এই অবসরে তিনি স্বাভাবিক দয়া ও স্বজাতিবাৎসল্য দেখাইবার সুযোগ পাইলেন। তিনি চিকিৎসালয়ে বোগীদিগকে বিনা বেতনে স্বৈচ্ছাক্রমে স্বহস্তে ঔষধ সেবন ও সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের পবণাবে স্বাধীনতা লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত। বায়গ্রান্সি বাসীরা ব্রেজিলেব অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া উহাব কর্তাব শাসন হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। গারিবল্ডি এই কথা শুনিবামাত্র যাব পবনাই আক্লাদিত হইলেন। তিনি আমেরিকা যাইয়া আপনার স্বভাব সুলভ শৌর্ষা বীর্য্য দেখাইবার লক্ষ্য পাইলেন। এদিকে দেখিলেন, যে রাজবিদ্ৰোহের জন্য তিনি ও মাট্-সিনি অপেক্ষা করিতেছেন, তাহা শীঘ্র ঘটবার নহে এবং তৎকালে ঘটিলে তাঁহাদের পক্ষে অনর্থক মূল হইবে, সুতবাং কিছু দিনের জন্য স্বদেশ ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একখানি সামান্য ধীরের জলযান অবলম্বন করিয়া বোল জন মাত্র যাত্রী সমভিব্যাহারে গারিবল্ডি আমেরিকার হুদাস্ত ব্রেজিলের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। এই সামান্য জাহাজে থাকিয়া এবং জন কতক লোকের সাহায্যে তিনি অনেকগুলি বণিক পোত লুণ্ঠন করিলেন। তাহাতে তাঁহার বলবৃদ্ধি হইল, কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে একখানি জাহাজ আক্রমণ করিতে গিয়া অয়ঃ ধূত, আহত ও কারারুদ্ধ হইলেন। এই সময়ে তিনি ক্রণকাল সামান্য লোকের ন্যায় অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন।

ছয় মাস কাবাবাসেব পর এক দিন কয়েক জন কর্মচারীব সাহায্যে পলায়ন কবিত্তে মনস্থ কবিলেন। শীঘ্রই ধৃত হইলেন। নিষ্ঠুর রাজপুরুষগণ তাঁহাকে নানাবিধ কঠোর যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে জানিতে চাহিল কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাব পলায়নের সহায়তা কবিয়াছিল। দুই ঘণ্টা তাঁহাকে উপব দিকে পদ ও নিয়ম দিক মস্তক করিয়া বাধিল কিন্তু তিনি কিছুতেই উপকারকদিগের অপকাব হইবে, এমত কার্য্য কবিলেন না। দুই মাস ধবিয়া অতি কষ্টে কাবাগাবে অবস্থিতি কবাব পব কোন সুযোগে নিষ্কৃতি পাইলেন। কাবাবাস বিমুক্ত হইবা মাত্র রায়গ্রামে আসিয়া অস্ত্র ধাবণ কবিলেন। সকল কষ্ট, সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। ক্রমাগত ছয় বৎসব ধবিয়া অসীম সাহসেব সহিত ব্রেজিলের বিপক্ষে অস্ত্র চালনা কবিয়া যখন দেখিলেন তিনি আব কিছুতেই তাঁহাব আশ্রিতদিগকে রক্ষা কবিত্তে পাবিত্তেছেন না, তখন তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ কবিত্তে বাধ্য হইলেন। বিশেষত তথাকাব অধিবাসিগণ তাঁহাব প্রতি যে প্রকাব অসহ্যাবতার কবিত্তেছিল, তাহাতে আব অধিক কাল থাকিত্তে পাবিলেন না।

ব্রেজিলেব সহিত যুদ্ধ একদিন অনেকগুলি স্বদেশস্ত সৈন্যক্লে হতাশ হইয়া মনে মনে বিবাহেব কল্পনা কবিত্তে লাগিলেন। ভাবিলেন মনেব মত একজন সহবাসিনী পাইলে জদয়েব ভাব অনেক লাঘব হইবে। পবে তিনি আনিটা নাম্নী বমণীকে নিজ প্রকৃতিব অবিকল অমুকপ দেখিয়া তাহার প্রতি প্রণয় পববশ হইলেন। আনিটাও তাঁহাব প্রতি অমুবক্ত হইলেন। এমন কি উভয়েব প্রথম সাক্ষাৎ দিবসেই পবম্পবেব মধ্যে এক প্রকাব সৌহার্দ স্থাপিত হয়। কিন্তু উভয়েব মিলনেব একটা ঘোরতব বাঘাত ছিল। আনিটা পবিণীতা। গারিবল্ডি আনিটাকে লইয়া দেশান্তবিত হইলেন। তুমুল সংগ্রাম ক্ষেত্রেও আনিটা প্রণয়ী পাশ ত্যাগ কবিত্তেন না, অনেক সময়ে বীবববেব সহকাবিণী হইয়া স্বয়ং অস্ত্র ক্ষেপ কবিত্তেন।

গারিবল্ডি বায়গ্রান্সি ত্যাগ কবিয়া এক্ষণে মন্দবিদায় নগবে উপস্থিত হইলেন, এখানে ইটালি হইতে রাজ বিদ্ৰোহ অপরাধে নির্বাসিত কতকগুলি লোক বাস কবিত্ত ইত্যাদিগকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা কবিত্তে মনস্থ কবিলেন। একদিন মান অন্তনীয় নামক স্থানে যুদ্ধ কালীন সৈন্যগণকে বিমনা

দেখিয়া বলিয়াছিলেন “ শত্রু সংখ্যা অধিক, আমাদের লোকবল কম, ইহা আমাদের মোভাগোর কথা । আমরা যত কম সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করত জয় লাভ করিব, তত অধিক গৌরবের কথা । ” এই কথায় সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়া মাহসে ভর করিয়া শত্রুদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল । তাঁহার দল জয়ী হইল, ইহাতে তাঁহার যশ বিস্তার পাইল এমন কি এই অবধি তাঁহাকে লোকে মন্দবিদ্যেব বীর বলিতে লাগিল ।

১৮৪৮ সালে ইটালিতে বিদ্রোহাগ্নি আবার প্রজ্জ্বলিত হইল । সার্দিনিয়াধিপতি চার্লস আলবার্ট সৈন্যাদিগের নেতা হইলেন । এই কথা গারিবল্দিব কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি শত সজ্জাক সৈন্য সমভিব্যাহারে সার্দিনিয়াধিপতির সাহায্যার্থ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া অস্ত্রিয়ার বলক্ষয় কবিত্তে মনস্থ করিলেন । চার্লস কিন্তু বীরবীরের সাহায্য লইলেন না । তাঁহার মনোগত ভাব ছিল যে অস্ত্রিয়া হইতে ইটালি বাহ্য বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বয়ং রাজ মুকুট ধারণ কবেন । গারিবল্দি সঙ্গে থাকিলে সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না, এই আশঙ্কায় গারিবল্দি সাহায্য কবিত্তে প্রস্তুত হইলেও সাহায্য গৃহীত হইল না । গারিবল্দি ক্ষুব্ধ হৃদয়ে কর্ণেল মেদিসিনি সহিত মিলানে যাইয়া লম্বার্ডি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিবেন মনস্থ করিলেন । অনতিবিলম্বে লম্বার্ডি ও পায়দমন্ড হইতে অন্যান্য পাঁচ সহস্র যুবক গারিবল্দিব দলভুক্ত হইল । মাটসিনি স্বয়ং দলগ্ৰ হইলেন । এই দেখিয়া গারিবল্দির আব আত্মদেব সীমা বহিল না । সৈন্য সমভিব্যাহারে তিনি শত্রু পক্ষ আক্রমণ জন্য যেনন অগ্রসর হইবেন, অমান শুনিলেন যে নেপল্‌স পরাজিত হইয়াছে । সুতবাং অস্ত্রিয়ার সৈন্য ভেদ করিয়া সুইজলন্ডে পলায়ন ভিন্ন তাঁহার আব গত্যন্তর বহিল না । এই ব্যাপাবে অনেক সৈন্যক্ষয় হইল, শত্রু সৈন্যও অনেক বিনষ্ট হইল । সুইজলন্ডে পৌঁছিয়া দেখিলেন, তাঁহার পাঁচ সহস্রের মধ্যে কেবল পাঁচশত মাত্র জীবিত আছে ।

১৮৪৯ অজিতচেতা গারিবল্দি আবার রোমানদিগকে উত্তেজিত করিয়া বণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । ফরাশি সৈন্য বোমে প্রবেশ কবিত্তে উদ্যত হওয়াতে প্রথমে তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন ; কিন্তু অসংখ্য অস্ত্রিয় সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যখন দেখিলেন জয়ের আশা নাই, তখন পাঁচ সহস্র সৈন্য লইয়া পলায়ন করিলেন এবং সান মরিনো নামক স্থানে

পুঁহছিলা সৈন্যদিগকে বিদায় দিলেন। বাহারা নিতান্ত তাঁহার নজ ছাড়িল না, তাহাদিগকে লইয়া সাদি'নিয়া যাইবেন মনস্থ করিলেন।

পথিমধ্যে আত্মরাতাবে ও পথ নষ্টে একে একে প্রায় সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইল। গার্লিবল্‌ডের তর্কে বিষাদ; এই সময়ে একটি শিশু সন্তানকে প্রসব করিয়া তাঁহার স্তন্যদুঃখ ভাগিনী শ্রিয় সহচরী লীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার দুঃখের পবিসীমা বহিল না। আবও দুঃখের বিষয় যে, যাঁহাকে তিনি আপনার হৃদয় অপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন তাঁহার অন্তেটিকিয়া সমাপ্তি পর্য্যন্ত স্বয়ং দেখিতে পাইলেন না। কণকাল বিলম্ব না করিয়া গ্রামবাসীগণকে সংকাবের ভাবাপর্শ কবিয়া সমভিব্যাহারীগণের প্রাণ রক্ষার্থ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই প্রকার প্রায় পঞ্চত্রিংশ দিবস ভ্রমণ কবিয়া নিদারুণ শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা অর্জরিত, জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে সাদি'নিয়ায় উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে যখন মনে হইত যে যে ব্যক্তি তাহার সর্বস্বত্যাগ কবিয়া তাঁহাব হস্তে জীবন সমর্পণ করিয়াছিল যে ব্যক্তি স্বদেশ, অজন ভাগ কবিয়া তাঁহাব প্রাণ পববশ হইয়া থাকিত, যে ব্যক্তি স্থখে দুঃখে তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষের অন্তর করিত না, তাঁহাকে পথিমধ্যে চিব দিনেব' জন্য ফেলিয়া যাইতেছেন, তখন বীভৎস কঠিন হৃদয়ের ভিতর হইতে অশ্রু প্রবাহ বিগলিত হইত। যখন ভাবিতেন যে সেই প্রণয়িনীর সংকাব পর্য্যন্ত স্বয়ং করিতে পারিলেন না, তখন এই কথা মনে কবিতেন, স্বদেশেব জন্য স্নেহ, দয়া মায়া সকলই ত্যাগ করিতে হয়। স্বদেশেব মঙ্গলসাধন কবা নিতান্ত কঠোর ব্রত।



নবজীবন ।

৪র্থ ভাগ। } অগ্রহায়ণ ১২৯৪। } ৫ম সংখ্যা।

গারিবল্‌ডি ।

২।

১৮৫৯ সালে ইটালির অবস্থা অতি শোচনীয়। ইটালির স্থানে স্থানে যে সকল রাজপুরুষগণ বাজ্ঞাশাসন কবিতেন তাঁহাদের অত্যাচাৰেব, তাঁহাদের প্রজানিগ্রহেব ও যথেষ্টাচাৰেব পৰাকাষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহাবা কোনপ্রকার দৃষ্কর্ষ, অন্যায়, অসম্ভাবহাব কবিতেন লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা মুক্তি ধাবণ কবিয়া অস্ত্রিয়ার বাজপুরুষগণেব সহিত বিরাজ কবিত। ইটালিৰ এক প্রান্ত হইতে অপৰ প্রান্ত পর্যন্ত কেবল দুঃখেৰ ও সন্তাপেব ধ্বনিত্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। যে ইটালি এককাল পাশ্চাত্য দেশেব শীর্ষস্থানীয় ছিল, যে ইটালি, কি বিদ্যাগৌৰবে, কি শিল্প-কৌশলে, কি রাজনৈতিক বলে, এককাল সভ্যজগতে বঙ্গীয় ছিল, এখন সেই ইটালি ঘোব তাহসে আচ্ছন্ন, অত্যাচাৰে জর্জবিত। কিন্তু অধ্যক্ষের দিন শীঘ্রই শেষ হয়। ইটালির দুঃখ রজনী প্রভাত হইয়া আসিয়াছে।

এই সময়ে সার্দিনিয়ার প্রধান মন্ত্রী বাজ্ঞনৈতিক শ্রেষ্ঠ কনব দেখিলেন যে অস্ত্রিয়ার বিপক্ষে অস্ত্র ধাবণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। যদিও ইটালি বাসীগণ এত পীড়নেও স্বাধীনতা-প্রিয়তা ভুলে নাই কিন্তু ইটালিতে এখনও এত অধিক অস্ত্র সৈন্য থাকিত যে কনব তাহাদিগকে পবাজয় করা দুঃসাধ্য জ্ঞান করিলেন! ১৮৬১ সালে ফরাশিৰাজ তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ত্রিয়া বর্জক

অপমানিত হইয়াছিলেন, কনব সম্প্রতি তাঁহাকে উত্তেজিত কবিয়া তাঁহার সাহায্যে অস্ত্রিয়াব বিকল্পে যুদ্ধ কবিত্তে পাবিবেন ভাবিলেন। এই সময় কনব গারিবল্‌ডিকে টিউবিনে আহ্বান কবিলেন। গারিবল্‌ডি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া টিউবিনে বাজা ও বাজমন্ত্রীসহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কনব এই অবসরে গারিবল্‌ডিকে কহিলেন, “আমবা বে সময়বে প্রত্যাশায় বসিয়া-ছিলাম, আজ সে দিন উপস্থিত; আমাদিগকে সাহায্য কবা তোমার কর্তব্য।” গারিবল্‌ডি উত্তর কবিলেন “আমি চির দিন দেশের কার্য্য করিতে নিরত।” ইতিমধ্যে গারিবল্‌ডিব বাজনৈতিক মতের বিচুপবিবর্তন ঘটয়াছে। মাট্‌সিনিব ন্যায় সাধাবণ তত্ত্ব স্থাপনের চেষ্টা না করিয়া তিনি ইংলণ্ডের ন্যায় মিশ্র তত্ত্ব স্থাপনের চেষ্টা কবিত্তেছিলেন। সার্দিনিয়াধিপতি বিকটর ইমানুয়েল সাহসী, বদান্য ও প্রজাবৎসল, স্তত্রাং ইটালি অস্ত্রিয়াব হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন কবিয়া তাঁহাৰ হস্তে অর্পণ করিলে ক্ষতি নাই। এই প্রকারে গারিবল্‌ডি সার্দিনিয়াধিপতির সহিত মিলিত হইয়া স্বদেশোদ্ধারে মনোনিবেশ কবিলেন। কনব যে ক্ষবাসিদের সাহায্য প্রার্থনা কবিত্তে কল্পনা কবিয়াছিলেন, গারিবল্‌ডি তাহাতে অনুমোদন কবিলেন না। তিনি বলিলেন বিদেশীয় অত্যাচার হটতে বিমুক্ত হটতে বিদেশীয় সাহায্যের প্রয়োজন নাই। সত্যের জয় অবশ্যই হইবে।

গারিবল্‌ডি প্রাণন সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। তিনি ক্রমশ দলবুদ্ধি করিতে লাগিলেন। উচ্চ বংশজ যুবকগণ দলে দলে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিলেন। নগবে নগরে গ্রামে গ্রামে সংবাদ পৌছিল। ইটালি উত্তেজনায় মাতিয়া উঠিল। ছাত্রগণ বিদ্যালয় ত্যাগ কবিল, শিল্পী ব্যবসায় ত্যাগ করিল, সকলে আসিয়া গারিবল্‌ডিব নিকট উপস্থিত। সকলেই দেশ উদ্ধার জন্য প্রাণপণ। নির্ধাপিত দেশভক্তি পুনর্বার ভয়ানকরূপে ইটালিব সর্বত্র ধুধু করিয়া প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। অবিলম্বে অন্যান্য ১৭ সহস্র সৈন্য গারিবল্‌ডির নিকট সমবেত হইল। অর্থেরও অভাব বহিল না। বর্মণীগণ দেশ উদ্ধার জন্য মাতিয়া উঠিলেন। তাহারা আপনাদের স্বর্ণ, রৌপ্য অলঙ্কার সকল গারিবল্‌ডির নিকট যুদ্ধ বায় নির্ধাৰ জন্য প্রেবণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইটালি পরাধীনতারূপ নিগড় ছিন্ন করিতে প্রস্তুত হইল।

গারিবল্‌ডি একটির পর আর একটি যুদ্ধে অস্ত্রিয়ায় সেনাধ্যক্ষ মার্শল

অবশ্যে পবিত্রিত করিলেন, অবশেষে বর্শেলি, ফোমো, বেরিশি, মাগনিটা, ও বারগামো যুদ্ধে অস্ত্রিয়া সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করেন। মাগনিটা সময়ে গারিবল্‌ডি অস্ত্রিয়ায় আধিপত্য একেবারে উচ্ছিন্ন কবিতা দেন। প্রায় সকল যুদ্ধেই গারিবল্‌ডিকে প্রভূত সৈন্যের বিপক্ষে ধারমান হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অপারিসীম সাহসে, ও অতুল্য রণনৈপুণ্যে সকলগুলিতেই তিনি জয়লাভ কবিয়াছিলেন। কএক মাস মধ্যেই ইটালি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল, ইটালিতে শান্তি সংস্থাপিত হইল এবং গারিবল্‌ডি নিজ জ্ঞান হইয়া স্বর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

কিছু দিন পরে আবাব সিসিলিতে যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। আবাব গারিবল্‌ডিকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। অল্পকাল মধ্যে সিসিলির তিনটি প্রধান প্রধান নগর, পালামো, মেসিনা ও বিজিও বশ্যতা স্বীকার করিল; তৎপরে একে একে নিকোটোবা, পাইনো, মাগানে! ও অন্যান্য স্থান সকল তাহাদের অনুগামী হইল। এই প্রকারে সৈন্য সকলকে পবাস্ত কবিতা তিনি সিসিলির রাজধানী নেপলস্‌ যাত্রা কবিলেন। তাঁহার আগমন বার্তা শুনিবামাত্র দুরাচার দ্বিতীয় ফ্রান্সিস্‌ রাজধানী ত্যাগ কবিতা পলায়ন কবিলেন। গারিবল্‌ডি পলায়িত রাজার দুর্গ অধিকার কবিতা যাইতেছেন, পথিমধ্যে বিজিত ইমানুএলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গারিবল্‌ডি তাঁহাকে ইটালির রাজা বলিয়া সম্বোধন কবিলেন। বিজিত ইমানুএল ও গারিবল্‌ডি হর্ষোৎফুল্ল জন স্রোতের মধ্য দিয়া নেপলস্‌ প্রবেশ করিলেন। নগরের সকল স্থানেই কেবল গারিবল্‌ডির জয় হটক, গারিবল্‌ডি দীর্ঘজীবী হউন, এইবৎ শুনা যাইতে লাগিল। গারিবল্‌ডি এক্ষণে পুনরায় তাঁহার নিভৃত নিবাসে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। জন্ম ভূমির নিকটস্থ হইয়া বিশ্রান্ত হইলেন। যেখানে তাঁহার পৈতৃক কুটুম্ব ছিল সেই স্থানে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে; যে নিভৃত পল্লীতে তাঁহার বাস করিতেন, এক্ষণে তাহা একটি রীতিমত সহর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরে শুনিতে পাইলেন যে বিক্টর ইমানুএল তাঁহার সম্মানার্থ সেই সকল প্রস্তুত কবিতাছিলেন। মধ্যে মধ্যে তথায় তাঁহার ইংরাজ ও মার্কিন বজুগণ সাক্ষাৎ করিতে বাহিতেন। অন্য সময় প্রায় একাকী বাস করিতে হইত। এজন্য শীঘ্রই নিষ্কর্ম জীবনে বিরক্ত হওয়াতে পোপের প্রতি তাঁহার আশ্রয় যে

বিদ্রোহ ছিল, তাহার স্মৃতি পাইল। পোপের অধিকার আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ইটালিয়ানী ও ফরাসিগণ তাঁহার সম্মুখীন হইল। ধোর যুদ্ধ বাধিল। বিজয়লক্ষ্মী কোন দিকে অগ্রগতি করেন ঠিক নাই, এমন সময়ে গারিবল্ডি উকদেশে একটা গোলা লাগিল, তাহাতে তাঁহাকে পবিত্র স্বীকার করিতে হইল। যাহাদিগকে তিনি শত্রুহস্ত হইতে নিশ্চুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ই অব্যব তাহার জীবন মৃত্যুব কর্তা হইলেন। স্পেনিয়া কারাগারে দুই দিন ধাবিয়া মহাবীর অটুতন্য ভাবে যাপন করেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ইটালি প্রাপ্তি স্নেহ প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। সময়ে সময়ে প্রলাপচ্ছলে বলিয়া উঠিতেন “ইটালি এক হইল।” তাঁহার তুর্ঘটনাব সংবাদ দেশ দেশান্ত্রে অতি অল্পকাল মধ্যে ঘোষিত হইল, স্বদেশ বিদেশ হইতে লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ক্রিতে আসিল। মৃত্যুশয্যাশায়ী গ্যারিবল্ডিকে দেখিবার জন্য স্পেনিয়া জেল প্রত্যাহ লোকে লোকাবণ্য। বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলের মুখে এককথা “এখন গ্যারিবল্ডি কেমন আছেন” ইংলও ও ফ্রান্স হইতে ভিষকগণ দলে দলে আসিতে লাগিলেন। গারিবল্ডি সকলকে স্নমধুর বাক্যে সাধনা কবিয়া বলিতেন “এখনও গারিবল্ডি জীবিত আছে।”

১৮৫৯ ও ৬০ সালে তিনি যে সকল অলৌকিক সাহস ও বীরত্বের কার্য্য কবিয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্মরণ কবিয়া ইটালিয়ানরা তাঁহার অপবাদ ক্ষমা করিলেন। এই সময়ে একজন ইংবাজ চিকিৎসক ত্রিশ সহস্র ফ্রাঙ্ক দিয়া পাইজাতে গ্যারিবল্ডির উকদেশ হইতে বিদ্রগোলা বাহির কবিলেন। ১৮৭০ সালে ফরাসি দিগেব জন্য গ্যারিবল্ডিকে পুনরায় অন্ত্র গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তদবধি কথেক বৎসর ধাবিয়া তিনি অসুস্থ শরীরে দিন যাপন করিতে ছিলেন। ১৮৮৩ সালে ৩রা জুনে তাঁহার জন্মভূমি ইটালিকে ও তৎসঙ্গে সমগ্র সভা জগৎকে দুঃখাপ্রস্তে পরিণামিত করিয়া গ্যারিবল্ডি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

পাতঞ্জল যোগসূত্র ।

৩।

এক্ষণে বিপর্যায় কি তাহা বোধ হয় পাঠক এক রকম বুঝিতে পারিলেন। এই বিপর্যায়, প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ সকল স্থলেই ঘটিতে পারে। যখন আশাদেব চোখের দোষ বা আবশ্যক মত আলোকা-
দিব অভাব বশত শাদা বস্তুকে লাল বলিয়া বোধ হয়, তখন আমাদের বিপর্যায় বা ভ্রম প্রত্যক্ষ হয়। উহা প্রমাণ নহে, কারণ পূর্ণোক্ত চোখের দোষ বা অনাক্রম্য অভাব দূরীভূত হইলে আমরা উহাকে শাদাই দেখি, লাল দেখি না। এইরূপ যখন আমরা অসংস্কৃত দেখিয়া সাধারণ অনুমান করি, তখন আশাদেব বিপর্যায় বা ভ্রম অনুমান হয়। এবং অপ্রা-
মাণিক লোকের কথায় বিশ্বাস করিলে আমাদের বিপর্যায় বা ভ্রম শব্দ হয়। অগতঃ যত প্রকার ভ্রম আছে উহাও সকলেই বিপর্যায় বৃত্তিজন্য।

বিপর্যায় শব্দের অর্থ ভ্রম হইলেও যোগাচার্য্যেরা সংশয়কেও ইহাৰ অন্তঃ-
পাতি করিয়াছেন। কারণ সংশয়ও অতক্রম-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা (সংশয়) দ্বাৰাও যে বস্তু যেক্রম, তাহাও ঠিক সেইরূপে জ্ঞান হয় না। অন্ধকারে একটা গাছের গুঁড়ি দেখিয়া ‘ইহা গাছের গুঁড়ি কি মানুষ’ এইরূপে জ্ঞান হয় তাহাকে সংশয় বলে। এখানে দেখ, গাছের গুঁড়িকে ঠিক গাছের গুঁড়ি বলিয়া জ্ঞান হইতেছে না। ‘গাছের গুঁড়ি কি মানুষ’ এই-
রূপ জ্ঞান হইতেছে। সুতরাং সংশয়ও তক্রম-প্রতিষ্ঠ না হওয়ায় বিপর্যায়ের মধ্যেই নির্বিষ্ট হইয়াছে। বিপর্যায়ের পব বিকল্প।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তু শূন্যোবিকল্পঃ । ৯ ।

পদভেদঃ।—শব্দ জ্ঞান অনুপাতী, বস্তু-শূন্যঃ, বিকল্পঃ।

পদার্থঃ।—শব্দজ্ঞানিতঃ জ্ঞানং শব্দজ্ঞানং, তদনুপাতিতং শীলং যস্য স শব্দজ্ঞানানুপাতী, বস্তুশূন্যঃ নির্বিকল্পঃ, এবভূতো যোহধ্যবসায়ঃ স বিকল্প ইত্যুচ্যতে।

ভাবার্থঃ।—বস্তু ন বিদ্যাতে তদর্থঃ শব্দো বিদ্যাতে। তেন যজ্ঞজ্ঞান-
মুৎপদ্যাতে তদ্বিকল্প অন্যান্য। যথা পুরুষস্য চৈতন্যং স্বরূপমিত্যত্র দেব-
দত্তস্য কথন ইতি বৎ শব্দ জ্ঞানিতে জ্ঞানে বস্তু যোহধ্যবসিতো তেন বস্তুমিহা-

বিদ্যামানমপি সমাবোপা বর্ততেহধ বসায়ঃ । বস্তুতস্ত চৈতন্যমেব পুরুষঃ ।
এষং বাহোঃ শিবঃ ইত্যাদৌনি বিকল্পজ্ঞানানি । যয়া বৃত্তাঃ প্রযুক্তশব্দ
প্রতিপাদ্যস্য বস্তুনোহ ভাবেহপি তথাবিধশব্দপ্রয়োগমাত্রজ্ঞান্যঃ কিমপি
জ্ঞানং ভবতি স বিকল্পঃ ।

অনুবাদ ।—বিকল্প একটি মানসিকবৃত্তি, যাহা দ্বাৰা যে পদার্থ আদৌ
নাই, অথচ কেবল বাচক শব্দ প্রয়োগ বশত সেই পদার্থ বিষয়ে (মিথ্যা)
জ্ঞানের উৎপত্তি হয় ।

সমালোচনা ।—বিকল্প শব্দ সচবাচব দুই অর্থে প্রসিদ্ধ । এখানে ইহার একটি
পারিভাষিক অর্থ কল্পিত হইয়াছে । এস্থলে ইহা একটি মানসিক বৃত্তি বা
অবস্থার বাচক । সংস্কৃতে অনেক শব্দ আছে যাহার অভিধেয় কোন একটা
প্রকৃত বস্তু নাই । যেমন শশশৃঙ্গ (শবগোসেব শিং) আকাশ কুসুম (আকা-
শেব ফুল) ইত্যাদি, এবং কোন কোন স্থানে একার্থক শব্দ দ্বয়কে ভেদ বাচক
বিভক্তি যুক্ত করিয়া ভিন্নার্থক রূপে কল্পিত করা হয় ; যেমন বাহর মস্তক ।
এখানে দেখ, মস্তক ও রাহ একই পদার্থ—কিন্তু ভেদ বাচক সম্বন্ধ-বিভক্তির
যোগ থাকায় মস্তক ও বাহ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহাই জানা যায় । এইরূপ
‘পুরুষস্য চৈতন্যম্’ এস্থলে পুরুষ ও চৈতন্য দুটী এক জিনিষ হইলেও সম্বন্ধ
বিভক্তিব যোগে দুটীর মধ্যে সম্পূর্ণ ভেদ প্রতীয়মান হইয়া থাকে । আবও
দেখ, গগনকুসুম নামে কোন একটা বস্তু না থাকিলেও গগনকুসুম এই শব্দ
শ্রবণমাত্র আমাদের চিত্তেব একটি অবস্থাস্তব হয়, যাহাতে গগনকুসুমনামক
যেন বাস্তবিক কোন বস্তু আছে বলিয়া বোধ হয় । এইরূপ পুরুষ ও চৈত-
ন্যের মধ্যে বাস্তবিক কিছুমাত্র ভেদ না থাকিলেও ‘পুরুষস্য চৈতন্যম্’
এইখানে ভেদ বাচক ষষ্ঠী বিভক্তি শুনিবামাত্র আমাদের চিত্তের একপ
অবস্থাস্তব হয়, যাহাতে উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় ।
চিত্তের উক্ত রূপ অবস্থাস্তবেব নাম বিকল্প । ইহা যে প্রমাণ বা বিপর্যয়
এই দুয়ের মধ্যে একটিবও অন্তর্গত হইতে পাবে না, তদ্বিষয় ভাষ্যকার যাহা
বলিষাছেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে ।

‘স ন প্রমাণোপাবোহী ন বিপর্যয়োপাবোহী বস্তু শূন্যেহপি শব্দজ্ঞান
মাষ্টান্মানিবন্ধনো ব্যবহাবোদৃশাতে । তদ্ব্যথা চৈতন্যঃ পুরুষস্য স্বরূপ
মিতি বদা চিত্তিরেব পুরুষঃ তদা কিমত্র কেন ব্যপদিশতে ? ভবতি চ ব্যপ-

দেশে বৃত্তিঃ, যথা চৈতন্য গৌরিত্তি । তথা প্রতিষিদ্ধবস্তু' ধর্ম্মা নিষ্ক্রিয়ঃ
পুরুষস্তিষ্ঠতি বাণঃ, স্থাস্যতি, স্থিত ইতি গতিনিবৃত্তৌ ষাৎত্বর্থাভ্রং গম্যতে,
তথাহুৎপত্তিধর্ম্মা পুরুষ ইতি উৎপত্তি ধর্ম্মস্যাত্ত্ববমাভ্রমবগমতে, ন পুরুষা-
দ্বয়ী ধর্ম্মঃ তস্মাৎ বিকল্পিতঃ স ধর্ম্ম স্তেন চাস্তি ব্যবহাব ইতি ।'

এই বিকল্পকে প্রমাণান্তর্গত বা বিপর্যয়ের অন্তর্গত করিতে পার না ।
কারণ প্রমাণান্তর্গত করিতে হইলে এক শব্দ মাত্র প্রমাণেব অন্তর্গত করিতে
হয় । তাহা হইতে পাবে না, কারণ শব্দপ্রমাণ স্থলে বাচকশব্দের
দ্বারা একটা নির্দিষ্ট বস্তুব জ্ঞান হয়, বিকল্প স্থলে সেকপ নির্দিষ্ট বস্তুই
নাই । আর ইহাকে বিপর্যয়েব অন্তর্গতও বলিতে পার না । তাহাব প্রতি
হুইটা কাব্য । বিপর্যয়স্থলে একটা বস্তু অন্যরূপে জ্ঞাত হয়, অর্থাৎ যে যাহা
নহে সেইরূপে জ্ঞাত হয়, কিন্তু যে বস্তু একেবাবেই নাই তাহাব জ্ঞান
হয় না, বিকল্প স্থলে যাহা নাই তাহাবই জ্ঞান হয় । দ্বিতীয়, শব্দ প্রমাণ
স্থলে যেমন শব্দ প্রয়োগেব কোনরূপ বাধা ঘটে না, একই প্রকাব শব্দ ববা-
বর প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ বিকল্প স্থলেও শব্দ প্রয়োগেব কোনরূপ বাধা
ঘটে না, একই প্রকাব শব্দের ববাবব প্রয়োগ হইয়া থাকে । যেমন 'চৈতন্যই
পুরুষ' এইরূপ উভয়েব অভেদ নিশ্চয় থাকিলেও পুরুষস্য চৈতন্যম্, এইরূপ
ভেদ প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু বিপর্যয় স্থলে সেকপ হয় না, এস্থলে একই
প্রকাব শব্দের ববাবব প্রয়োগ হইতে পাবে না । ততক্ষণ অবধি ভ্রম
থাকিবে ততক্ষণ অবধিই গুতিকাতে 'ইদং বজ্রতম্' এরূপ শব্দের
প্রয়োগ হইবে । কিন্তু ভ্রম অপসৃত হইলে আব 'ইদং রজতম্' এইরূপ
শব্দের প্রয়োগ হইবে না । অতএব বিকল্পকে প্রমাণ ও বিপর্যয় এই উভয়
হইতে অতিবিক্ত বলিতে হইবে । এক্ষণে বিকল্পের উদাহরণ দেখা-
ইতেছেন । 'চৈতন্য পুরুষেব স্বরূপ' এখানে যখন চৈতন্য ও পুরুষ একই
পদার্থ, তখন ইহাদের একটা বিশেষণ বা একটা বিশেষ্য এইরূপ ভেদ
নাই ; তবে 'চৈতন্য পুরুষেব স্বরূপ' এই বাক্যে যে ভেদ জ্ঞান হই-
তেছে তাহা অবাস্তবিক ।

অভাব প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিনিদ্রা । ১০ ।

পদচ্ছেদঃ ।—অভাব প্রত্যয়-অবলম্বনা, বৃত্তিঃ, নিদ্রা ।

পদার্থ ।—কার্য্যঃ প্রত্যয়তে গচ্ছতীতি প্রত্যয়ো হেতুঃ, আগ্রাৎত্বম্

প্রবৃত্তীনানভাবস্যাভাবে যা হেতুঃ (নিমিত্তীভূতং ভূমঃ) আলম্বনং
বিষয়োযস্য্যাঃ সা বৃত্তিনিদ্রা । যা সততমুদ্রিত্ত্বাত্তমসঃ সমস্তবিষয়
পবিত্যাগেন প্রবর্ত্ততে বৃত্তিঃ সা নিদ্রা ।

ভাবার্থঃ ।—নিদ্রেকা বৃত্তিঃ । সাচ চিত্তসৌকাবস্থা । তস্যামবস্থায়ঃ
বুদ্ধিসঙ্কাজাদকস্য তমসঃ সর্বতশ্চিত্ত বিষয়ীভূতস্বারকিঞ্চিজ্জাযতে, ন
কিঞ্চিদভূয়তে । বুদ্ধির্হি ত্রিগুণতয়া, যদা সত্ত্ববজ্রসী অভিভূয় সমস্ত
করণাবরকং তম আবির্ভবতি, তদা মলিনসা চিত্তসত্ত্বস্য তম আকায়ৈব
বৃত্তিঃ অপিমীত্যাকাবা জাযতে । আপশ্চাত্ত জাগ্রৎস্বপ্নপ্রবৃত্ত্যভাবঃ
ততশ্চ বুদ্ধে বিঘ্নাকাব পবিণামাভাবাং তমোময়ীং বুদ্ধিমববুধ্যমানঃ
পুরুষঃ সুবুশ্ণোন্তঃ সংজ্ঞ ইত্যাচ্যতে । অস্যাশ্চ (নিদ্রায়াঃ) সূৰ্ণমহমস্বাপ্ন
মিতিস্থিতিনিদর্শনাৎ স্বতেচ্ছাহুভবব্যাতিবেকেনাহনুপপত্তেবৃত্তিভ্রম্ ।

অনুবাদ।—নিদ্রা একটী মানসিক বৃত্তি বা অবস্থা । ইহা জাগ্রৎ
ও স্বপ্নাবস্থায় উথিত প্রবৃত্তি নিচয়ের অভাব হেতু তমোগুণকে আলম্বন
করিয়া প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ যখন তমোগুণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া চিত্তকে
সম্পূর্ণরূপে আবরণ কবে, উহাতে আব অন্য বিষয়ের ক্ষুর্তি হয় না,
চিত্তের তাদৃশ অবতাকে নিদ্রা বলে ।

ওই সে পাষণী ।

“ বাছনি রে ! না কাঁদিস্, আব—

এ ধরা নহেক তোব, পাপে সদা এ যে ভোর,

স্বাণেব জ্বলন্ত মূর্ত্তি হেথা বিদ্যমান ।

• স্মৃতিঙ্ক কুপাণ কবে ভ্রমে সন্ন্যস্থান ॥

শঠতা বঞ্চনা যাব, সর্ব কাজে জয় তার,

গুণীগেব অনাধব হেথা চিব রীতি ।

স্বজন ধার্মিক সদা পায় হুঃখ ভীতি ॥

পরিহাস পরবাদ,

হিংসা ঘেব বিসম্বাদ,

নিদ্রারূপ বিজ্ঞাষণ রিপূর পীড়ন,
 সম্মত-জগতে এই সৌন্দর্য্য ভূষণ ।
 দয়া রেহ মমতার, নাহি লেশ কণাকার,
 হৃদয় সবভূ সম অতীব কঠিন,
 নীরস প্রকৃতি সবে ন্যায় ধর্ম্ম হীন ।
 পাশবীয় অত্যাচাবে, জর্জরিত পবনপরে,
 সুধা বোধে বিষ পানে উন্নত সবায়,
 মোহিনী মায়াব চক্র পাতিত হেথায় ।
 অধঃ পথে অগ্রসর, পলে পলে নিবস্তর,
 হতেছে, দেখবে বাছা গভীর আঁধার,
 কেমনে হইবে হেথা আলোক বিচার ?
 কাচ বিনিময়ে এবা, না দিবে বে কেন হীরা ?
 অমূল্য রতনে কেন কবিবে যতন,
 তা হ'লে যে মায়া-বাজো হ'বে অনিষম ।

রে বাছনি !

যে জগতে হেন বীত, না বুঝি আপন হিত,
 আপন পায়েতে মারে আপনি কুঠার,
 সে জগতে কিবা তুমি আশা কব আর ?
 কাঁদিতে জনম তব, কেঁদে কর শেষ সব,
 আশা-বাসা হোক ভস্ম নিবাশা অনলে
 ধন অর্থ মান যশ যাক রসাতলে ।
 অপমান নির্যাতন, দরিদ্রতা বিতীষণ,
 হুর্নিসহ মন্দপীড়া নিত্য শোক তাপ
 হউক বিজ্ঞপ্তর বিচ্ছেদ সম্ভাপ ।
 পাগল বলিয়ে তোরে, যেন সনে স্থণা করে,
 নারকী দুর্জনে বলে সাথে যেন বাদ
 এই মাত্র অকৃত্রিম করি আশীর্বাদ ।
 ইথে যে-বাড়িবে পুন, তজ্জি-ভবা শতভগ,

বাকুল-পর্যণ তোর কাঁদিয়ে নিশ্চয়,
লভিবারে এ রাজ্যের শান্তি মধুময়।

কিস্ত বৎস!

রহে ঘেন ঘেন ভাব, তোর মনে সমভাব,
বিপরীত কিছুমাত্র না হয় তিলেক
সাবধান—ক্ষণকাল তোজ না বিবেক।

বাছনি রে!

ধৈর্য্য ধর কিছু দিন, পাবি শান্তি চির দিন,
হতেছে রে হেথা তোব আবাস নির্মাণ
শ্রীতি প্রেম শান্তিপূর্ণ ভিত্তি স্মহান্!
ছ'দিনেব সূখ তবে, কি কাজ রে ভেক ধরে',
বিশাল ও মহীতল স্থান পবীক্ষার,
জেনো স্থির, প্রিয় বৎস এ লীলা আমাব!
পাপী হাঙ্গামে পাপ কবে, কবি সূখী আবো তারে,
অভীপ্সিত কার্য্য তাব সাধি সযতনে,
কে বুঝিবে এ বহস্য পার্থিব-ভুবনে?

বৎস!

তুই যে ভুঞ্জিস্ হেন এও মঙ্গল কারণ,
মঙ্গলময়ী রে আমি ভক্তেব দুয়ারে—
ভ্রমি অনিবার তথা এবোধি সবান্নে।
ভূষিত চাতক সম, ডাক আবো পুনঃ পুনঃ—
কুখা নিদ্রা পরিহরি ডাকরে সঘনে
অনন্ত পীযুষ পূর্ণ 'মা' নাম বদনে।
মা তোরে করিবে বৃকে, ছেলে ফেলে মা কি থাকে,
মায়ে রে যদি বে চান্ কাঁদে উত্তরায়—
কান্না বিনে জননীকে কে কোথা রে পার?

তাই বলি বাছা—

ডাক ডাক আরো ডাক, হৃদয় শান্তিরে বাক্—

‘মা মা ... নাম অমিত্র-ভাষায়—

কুচিবে ভরের ছুঃখ আসিবি হেথায়!’

স্বপ্নের স্বপন মোর,

সহসা হইল ভোর,

চকিতের মত উঠি বলিছ এ বাণী—

‘দেখ রে মা ডাকে ভাই—ওই সে পাষাণী!’

শ্রীহারাগচন্দ্র রক্ষিত ।

(কর্ণধার সম্পাদক)

মাতর্গঙ্গে ।

মাতর্গঙ্গে তোমার ঐ কুল-কুল-ধ্বনি—ঐ মধুর স্বর্গীয় সঙ্গীত—তুনিতে
বহু ভাল বাসি। মা, তুমি অনন্ত শান্তি-প্রসবিনী। তোমার ঐ স্বর্গের
ছবি, প্রেমমাখা বিষবিমোহন রূপ দেখিলে, এই সংসার বিষজর্জরিত
পাপ হৃদয়ের রক্ত শান্তি পাই। তাই, নিশীথ সময়ে নৈব শ্য-দণ্ড এই পাপ-
প্রাণের আশা জুড়াইতে তোমার এই পবিত্র কূলে আসিয়া বসি। মাথার
উপর—ঐ সুদূর নীলাকাশে মোহন-চাঁদ জ্যোতিষ্ময় রূপের ছটায় বিশ্ব
ব্রহ্মাণ্ড মতাইতেছে;—আব তুমি সোধাগ-ভরে ঐ চাঁদেব হাস মাথিয়া
যেন আপন ভাবে-আপান-বিভাব হইয়া কুল-কুল-ধ্বনিতে মধুর সঙ্গীত
গাহিতে গাহিতে চলিয়াছ।—স্রগং-প্রাণ সমীরণের সহিত আমাদেব জ্ঞানেব
অতীত কি এক অনন্ত খেলা খেলিতে খেলিতে সৈকতভূমির উপর দিয়া
আপন মনে আপনি চলিয়াছ!—তোমার ঐ কবি-কল্পিত অমানুষিক গভীর
অকৃত-চকল-ভাব দৈর্ঘ্যে, আমাতে আর আমি থাকি না—হৃদয় আমার
স্তম্বিত হয়। তোমার নিকট যে, মর্ষবেদনার কাঁদিতে আসি তাহা কেমন
ভুলিয়া যায়!—তখন তোমার ঐ অকৃত-ভাব-সাগরে আমার এই ক্ষুদ্র ভাব-
বিন্দু মিলাইয়া যায়।

তোমার ঐ অমানুষিক মধুর সঙ্গীতের কেমন এক মোহিনীশক্তি আছে,

যাহাতে এই দগ্ধ হৃদয় সকল জালা যন্ত্রণা তুলিয়া কি জানি—কেমন এক স্বর্গীয়ভাবে বিমোহিত হয়। মনব যে দিন ঐ অসামান্য কথার নিগূঢ় ভাব বুঝিতে সমর্থ হইবে, সে দিন ত মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে;—সে দিন ত মানুষ ভাষাআদে মত্ত হইয়া জ্ঞানের অতীত অনন্ত-শান্তি-লোকে মহা-শক্তির অনন্ত-প্রেম-জ্যোতি দেখিতে পাইবে। তোমার ঐ স্বর্গীয় সঙ্গীতের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে এই ক্ষীণ-মনা মানব ত পাগল হইয়া যায় মা ! মানুষ কোন অকিঞ্চিৎকর,—তোমার এই—জগৎ-বিমোহন মহাসঙ্গীতের মহাতত্ত্ব সন্ধান করিতে সেই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহাদেবও পাগল হইয়াছিলেন।

যে মহাঘোর ভারসাগরে আপনাব সত্তা মিশাইতে পারে, যে আপনা হইতে এই বাহ্যজগতকে পৃথক্ জ্ঞান না করিয়া আমার আনিত হারাইতে পারে, যে ভাবপ্রবাহে গা ঢালিয়া আত্মহার্য্য হইয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল বাহ্য বস্তুতেই আপনাব সত্তা উপলব্ধি করিতে পাবে, এ অন্ধ-সংসারে সেই ত পাগল মা ! যে অনন্ত-বিশ্বপ্রেমে মজিয়া সাম্যের চক্ষে সকলকেই সমাদরে হৃদয়ে ধরিতে পাবে, যে পুষ্টিগন্ধময় অতি বিকট-দর্শন-শবকেও আত্মজ্ঞানে বক্ষে তুলিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে পারে, এ পাপলোকে সেই ত অস্পৃশ্য মহাপাগল মা !! আজ মহামূর্খ আমার নিকট—এই তত্ত্বজ্ঞানহীন পাপী চক্ষে—মহাসন্ন্যাসী আত্মহার্য্য ভাববিভাব ভোলানাথ মহাপাগল, ঘোব পিষাচাবতার !! কিন্তু তত্ত্বদর্শী সাধুব নিকট এই পাগল ভোগাই আবাব দেবাদিদেব মহাদেব !! তাই বলি মা, আমি কীটগুণী অতি অকিঞ্চিৎকর,—তোমার অনন্ত মহিমা—তোমার ঐ মহাসঙ্গীতের মহাতত্ত্ব কি বুঝিব ? যখন দেবাদিদেব মহাদেবও কেবল তোমারই ঐ অনন্ত মহাসঙ্গীতের নিগূঢ় মহাতত্ত্ব বুঝিবার জন্য আশান-বাসী হইয়া তোমারই কূলে কূলে দিবাবাতি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন—তখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি কে ? * * * *

কি স্বর্গীয় সঙ্গীত !! কবি এ সঙ্গীতের মর্মেদ্বাটন করিতে মত্তক অবনত করে। কোথায় মধুপানমত্ত মধুকবের মধুর বক্তার ? কোথায় বাসন্তী কোকিলের আকাশভরা পঞ্চমস্বব ? কোথায় সপ্ততাব বীণার প্রাণ-হরা ধ্বনি ? কোথায় কবি-কল্পনা-প্রসূত প্রেমমাথা অঙ্গুরা-কণ্ঠ গীতি ? কোথায়ই বা এই সব স্বর্বার ধরী স্বর-সহবীর কল্পনাতীত স্বর্গীয় স্তমধুর মমতা ?

ঐ যে সঙ্গীত—ঐ যে হৃদয়োগ্নতকারী কুল কুল হৃদি, কিছুই এ সঙ্গীতের তুলনায় আসিতে পাবে না। অধম মানব তোমার এই মহা সঙ্গীতের অর্থ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পাবে না। এ জ্বলন্ত-হৃদয়ে—এ বিরক্ত-মস্তিকে—সে শক্তি নাই যে, মহাশক্তির মহালীলা বুঝিতে সমর্থ হইবে। অবিশ্বাসী মহাপাতকী মানব কোন্ পুণ্যকলে শাস্তির উৎস এই মহাসঙ্গীতের মহাতত্ত্ব বুঝিতে পাবিবে ?

এক দিন কেবল জগৎপুঞ্জিত আর্দ্রাধ্বনিগণ তোমার এই মহাসঙ্গীতের প্রকৃতভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্তির অনন্তপ্রবাহ তোমার ঐ সঙ্গীতলহরীর পশ্চাতে স্বর্গেব জ্বলন্ত ছবি—প্রেমময়ীর প্রেমরাজ্যের মহান দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা জগৎ-সংসার বিন্দুত হইয়া কলুষধ্বংস-কারিণী শাস্তিদায়িনী নামে তোমারই মহিমা প্রচার কবিতা গিয়াছেন। বাস্তবিকই মা তুমি কলুষধ্বংসকারিণী! যখন পাপানলে হৃৎপিণ্ড জ্বলিতে থাকে—যখন সংসারকুণ্ডেব প্রজলিতাভিষণ শিখার সর্ব শবীর ঝলসিতে থাকে, তখন একবার নয়ন ভবে তোমার ঐ স্বর্গের ছবি, ভুবনমোহন রূপ দেখিলে—তোমার ঐ প্রেমভরা সঙ্গীতধারা কাণের ভিতর প্রবেশ করিলে, এ পাপদগ্ধ হৃদয় বড় শীতল হয়—প্রাণের ভিতর যেন শাস্তির উৎস ছুটিতে থাকে। তখন সংসার জ্বালা কণেকের জন্য ভুলাতে, তোমারই ঐ মহিমাময় সৌন্দর্যাসাগরে ক্ষুদ্রপ্রাণ ডুবিয়া যায়।

তোমার ঐ সঙ্গীতসুধা কাণের ভিতর প্রবেশ করিলে, হৃদয়কন্ডর শূন্য হইয়া মন কোথায় উঠাও হইয়া যায়—বাহ্যবস্তুর সকল চক্ষের উপরি থাকিলেও, তখন তাহাদের প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি হয় না। ঐ যে বায়ুব বিকম্পিত তরঙ্গজি তোমার তীরে দাঁড়াইয়া নাচিতেছে,—আব মাথা নাড়িয়া তোমার বক্ষবিহারী ক্রীড়াশীল তরঙ্গমালাকে সোহাগভরে ডাকিতেছে, দেখিতেছে;—ঐ সুনীল নভঃতলে শশক সুধার হাসি ছড়াইয়া বিশ্বসংসার অমুপ্রাপিত করিতেছেন,—আব মদ্যক মনুষ্যচক্ষে অতি ক্ষুদ্র ঐ তেজঃপিণ্ড নক্ষত্রপুঞ্জ সূর্যর নীল গগনপটে যেন জ্বলন্ত ফুলের ন্যায় চিত্রিত হইয়া, এ পাপ মর্ত্যলোকে যেন এ ছার মনুষ্য ভাগ্য দেখিযাই মিটি মিটি হাসিতেছে, দেখিতেছে;—কিন্তু হায়, এ সকল কি! কৈ কিছুই যে মনে ধারণা করিতে পারি না মা ? তোমার ঐ স্বর্গীয় সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি প্রবাহে আমরা

সংজ্ঞা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আইসে। জ্ঞাতভেদে যেন সব স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। সবই যেন ছায়াবাচ্ছ। চাবি দিকে যেন সবই ছায়া—যেন বিশ্বপ্রাসী অনন্ত ছায়াতে নিমগ্ন হইয়া আছি। আমিও কি তবে ঐ অনন্ত ছায়া-রাশির একটু সামান্য অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহি !!

মা, তোমার ঐ স্বর্গীয় দল্লীতের মহিমা অমন্ত অসীম। ক্ষীণ-মনা দ্রাক্ষ-মানব উহা কি বুঝিবে? কেবল আর্য্যাবিগগই তোমার ঐ মহাসল্লীতের মহাতত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা আখ্যান, পুরাণে, কাব্যে, ইতিহাসে, গানে কীর্ত্তনে,—তোমার মহিমা বর্ণন করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই। প্রাতে ও সন্ধ্যায় তোমার এই সৌন্দর্য্য-সার দিব্যরূপ দেখিলে তাঁহারা ভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। আর তাঁহাদেব সেই জ্ঞান-জ্যোতি এই কলুষ-নাশিনী জ্ঞানদায়িনী মহাসল্লীত লহরীর সহিত মিশিয়া, মলুষা জ্ঞানাতীত এক অপূর্ব্ব অনন্ত প্রদেশে প্রস্থান করিয়া, সেই মহামারা মহাশক্তির অনন্ত-জ্যোতি সন্দর্শন করিত। তাই তাঁহারা আত্মহারা হইয়া “মাতর্গঙ্গা জাগীরধি” বলিয়া আজীবন তোমারই অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়া-ছেন। স্বর্ঘ্যকূল-গৌবব বাজর্ষি ভগীরথ বুঝি সর্ব্বপ্রথমে তোমার এই পবিত্র সল্লীতে মোহিত হইয়া, স্বর্ঘ্যসেবিত বাজপ্রাসাদ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া বহুকাল কঠোর তপস্যাসাধনে তোমার ঐ মহাসল্লীতের মহাজ্ঞান লাভ করিয়া-ছিলেন। তোমারই স্বরূপ আদি অন্ত নির্ণয় করিতে সেই পুণ্যাত্মা সংসার মায়ী বিশ্বতির অতল জলে ডুবাঁইয়া সাগর সঙ্গম হইতে হবিষ্যার গোমুখী পর্য্যন্ত দিবানিশি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। ধন্য সেই মহাত্মা, যিনি তোমা হইতে মহাজ্ঞান লাভ করিয়া লোকে তোমার অনন্ত মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাই মা, তোমার সেই হুসন্তামের নাম চিত্রবর্ণীর করিতে আজ ছুমি নিজে এট ভরসংসারে “ভাগীবতী” নামে প্রসিদ্ধ হই-য়াছ। ব্রাহ্ম বদগর্ভিত আমরা তোমার মহিমা কি বুঝিব মা?

মা, একবার চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া দেখ। তোমার বিহারভূমির আজ কি শোচনীয় দশা—একবার দেব, সেই শাস্তির আগার, জ্ঞানের ধনি, স্বর্গীয় প্রভার উদ্ভাসিত অজুগল দেশ আজ নরকের ঘোর-ভাস্মে আচ্ছন্ন, কতি ভীষণ অন্ধভূমি!! মা, তোমার সেই অতি আদরের ধন জগৎপুঞ্জিত আর্য্যগণ আজ কোথায়! দেব মা, সেই বিশ্বপুঞ্জিত আর্য্যজাতির আজ কি

শোচনীয় পরিণাম। তাই মা, এ দক্ষ কন্যার কথা তোমাকে এই নিশীথ সময়ে জানাইতে আসি। যদি এ দারুণ দুঃখগাথা তোমার ঐ স্বর্ণীর স্বর্ণ-লহরীর সহিত মিশিয়া সেই অনন্ত প্রেমধামে গিয়া দয়াময়ীর দয়া আকর্ষণ করিতে পারে!

* * * * *

আহা! ও কি সাজে সাজিয়াছ মা? মরি, মরি, এ সুনন্দর হইতে সুনন্দর তরু অপক্লপ সাজে কে তোমাকে সাজায়েছে মা? নক্ষত্র-খচিত কৌমুদী বসন পরিয়া, চাঁদের মালা বুকে দোলাইয়া, এ বঙ্গভরে হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে কোথায় চলেছ মা? এ তোমার কি রঙ্গ মা? এই মহাছদ্দিনে কে তোমার এই মহাবঙ্গ দেখিবে বা বুঝিবে মা? আর কি তোমার সেই ধর্ম-প্রাণ আর্য্যসন্তানগণ আছে যে, তোমার এই ভুবন ভোলানী ভাবে বিভোর হইয়া উদাত্ত স্ববে সামগান গাইতে গাইতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া তোমার সম্মুখে নৃত্য করিয়া বেড়াইবে? আর কি সেই মহাবীরাশালী আর্য্যগণ দিগ্বিজয় করিয়া, অবাতিল পদ দলিত করিয়া, মেদিনী বীর পদ ভরে বিক-স্পিত করিয়া, জয় জয় রবে জয় পতাকা উড্ডীন কবিয়া, সমর-শ্রান্তি দূর করিতে তোমার এই পবিত্র কূলে আসিয়া বসবে এবং জয়নাদে তোমার নিকট বিজয়বার্তা প্রচার করিবে?

মা, তোমার আজ সে দিন গিয়াছে। প্রকৃত আর্য্যগজ্ঞান আর ভারতে নাই। আমরা পতিত পাতকী; তাই বলি মা! এই পতিত সন্তানগণকে উদ্ধার করিয়া তোমার পতিতপাবনী নামের স্বার্থকতা সম্পাদন কর।

—

বাইবেলের কথা

হিন্দুর সমালোচ্য ।

ইংরাজ কবি শেলী এক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন যে পরমেশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করেন নাই, মনুষ্যই পরমেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছে।' এট কথ্য শুনিতে হঠাৎ বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু উপহাস ও তাম্বিল্য না করিয়া ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা যে সাবগর্ভ বাক্য তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। অনেকে শেলী এবং শেলীর মতাবলম্বী ব্যক্তিকে নাস্তিক বলিয়া অবিহিত করেন কিন্তু কলত তিনি নাস্তিক ছিলেন না এবং নাস্তিক হইলেও শেলীর ন্যায় নাস্তিক অনেক আন্তিক হইতে আদরণীয় ব্যক্তি।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবিধ শাস্ত্রের আবিষ্কার, অমূল্যলন এবং উন্নতি হইয়াছে কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ব ভিন্ন আব কোন বিষয়ে মনুষ্য মধ্যে এত অধিক মতভেদ নাই। কোন জাতিমধ্যে ঈশ্বর পুরুষ এবং কোন জাতিমধ্যে স্ত্রী স্বরূপে পূজিত। কেহ তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় দ্বিহস্ত ও দ্বিপদ বিশিষ্ট এবং কেহ তাঁহাকে চতুর্ভূজ, ষড়ভূজ এবং কেহ বা তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কেহ তাঁহাকে উগ্রচণ্ডী, কেহ করুণাময়, কেহ ভক্তবৎসল এবং কেহ তাঁহাকে এককালে নিগূর্ণ এবং নির্বিকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

পূর্বকালে গ্রীকদেশের লোকেরা জোব নামক এক মহাপুরুষকে জগতের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া জানিত এবং সেই জোবের জুনো নানী স্ত্রী এবং আপলো, মিনার্বা, মাস', বীনস, প্রভৃতি সম্ভান সম্ভতি ছিল। ইহারা সকলে গ্রীক দেশের উত্তরস্থিত ওলিম্পস্ নামক পর্বতের শিখরে বাস করিতেন এবং সেই স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া মনুষ্যদিগের উপরে কর্তৃত্ব করিতেন। জোবের প্রধান অস্ত্র ছিল বজ্র এবং তাঁহার বাহন ছিল এক দ্বিগল অর্থাৎ বাজপক্ষী। শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে জোব বজ্র দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিতেন। গ্রীকদিগের জোব প্রভৃতি আমাদের পৌরাণিক দেবতাপ্রণের সদৃশ। প্রকৃতদেবিত্ব পণ্ডিতগণের প্রস্তাব যদি সত্য হয় যে হিন্দু গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি

জাতি, এক আখ্যাজাতিব ভিন্ন ভিন্ন শাখা, তাহা হইলে তাহাদিগের ভাষার ন্যায় আবাধ্য দেবভাগণও সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে এবং ফলেও তাহাই দৃষ্ট হয়। কাবণ হিন্দুব ন্যায় গ্রীকদিগেব দেবভাগণের মধ্যে মিনর্বা বিদ্যাব্যাস' যুদ্ধের ইত্যাদি প্রত্যেক কার্যের এক একজন পৃথক দেবতা ছিল।

ইহুদী অর্থাৎ হিব্রুদিগেব ধর্ম্মই মূল ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম হইতে খ্রীষ্টান ও মহম্মদীয় ধর্ম্মেব উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল ধর্ম্মে একেব অধিক ঈশ্ববেব পূজাব বিধি নাই এবং তাহাতে বহু ঈশ্ববেব পূজা মনুষ্য মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। এই ধর্ম্মে ঈশ্ববেব কোনরূপ মূর্তি গড়িয়া পূজা কবা অতিশয় পাপের কার্য্য।

তাহাদিগের সেই এক ঈশ্বব স্বর্গ নামক স্থানে এঞ্জেল অর্থাৎ ফেবিস্তা নামক অমব জীব সকলেব সংসর্গে অবস্থিতি কবেন। ঈশ্বব এবং তাঁহাব স্বর্গীয় সহবাসীবা মনুষ্যেব আকাব বিশিষ্ট; কাবণ বাটবেলে লিখিত আছে যে “ঈশ্বব তাঁহাব আপন মূর্তিবে অনুরূপ মনুষ্যকে সৃষ্টি কবিয়াছেন।” তবে এঞ্জেলদিগেব পৃষ্ঠদেশে পক্ষীব ন্যায় বড় বড় দুইটা পক্ষ আছে, তদ্বা বা তাহারা ইচ্ছামতে ইতস্তত শূন্য মাগে ভ্রমণ কবিতে পাবে। ঈশ্বব তেজোময়, সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকন এবং ফেবিস্তাবা তাঁহাব চতুর্দিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া নতশিবে উল্লাসেব সহিত ঈশ্ববেব বন্দনা এবং গুণগান কবে। কিন্তু স্বর্গে এই ঈশ্ববেব বাজত সকল সময়ে এবং সর্বতোভাবে শাস্তিপূর্ণ হয় নাই কাবণ সয়তান নামক একজন প্রধান ফেবিস্তা তাহাব আজ্ঞাধীন অসংখ্য ফেবিস্তা লইয়া ঈশ্ববে স্বর্গেব সিংহাসন হইতে দূরীকৃত এবং তাঁহার স্থানে নিজে প্রভুত্ব করিবা মানসে বিদ্রোহ উপস্থিত কবিয়া বহু কাল ধরিয়া ঈশ্ববেব সহিত ঘোবতব যুদ্ধ কবিয়াছিল। অবশেষে ঈশ্বব বজ্র বাণ সৃষ্টি করিয়া তাহা সয়তান এবং তাহাব সঙ্গীগণেব উপবে নিক্ষেপ কবত তাহাদিগকে পবাস্ত কবেন এবং চিবকালেব নিমিত্ত তাহাদিগকে এক অন্ধকারময় বহু কষ্টদায়ক নবকে নির্বাসিত কবেন। কিন্তু ঈশ্বব তাঁহাব শত্রুদিগকে এমন ঘোবতর অপবাধেব প্রতিকূল নবকে নির্বাসনেব শাস্তি প্রদান করা ভিন্ন, তাহাদিগকে এক কালে বিনাশ কবিত্তে পারিলেন না; কাবণ সয়তান এবং সমুদায় ফেবিস্তাগণ ঈশ্বরেব ন্যায় অমর। এই যুদ্ধে সয়তান যদিও পরাজিত হইয়া স্বর্গবাসেব স্থখে চিরকালেব নিমিত্ত বঞ্চিত হইল, এবং

পুনরায় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত বহিল তথাপি সে আর ঈশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিল না, শত্রুভাবে রহিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। ঈশ্বরের সদগুষ্ঠান সমূহে যাহাতে বিশ্ব জন্মে, যাহাতে ঈশ্বরের মনে কষ্ট হয়, এবং যাহাতে তাঁহার কল্পনা সকল নিফল হয়, তাহা করিতেই সম্মতানব পবমানন্দ, এবং তাহাতে সে কি প্রকারে রুতকার্য্য হইবে, সতত সেই চেষ্টায় সে স্বর্গ মর্ত পাতালের সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে। মোট কথা সম্মতান ঈশ্বরের অদম্য শত্রু হইয়া বহিয়াছে।

সম্মতানব সহিত ঈশ্বরের এই যুদ্ধের পবে ঈশ্বব এক নূতন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া ৬ দিবসে অর্থাৎ সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত বহু পরিশ্রমে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র এবং পৃথিবী নির্মাণ করিয়া ক্রান্তি দ্বীকরণেব জন্য সপ্তম অর্থাৎ ববি বাসরে বিশ্রাম করিলেন। তখন জগৎ ঘোর অন্ধকারে আবৃত ছিল, কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টিব পবে তাঁহার ইচ্ছানতে জগতে আলো-কেব আবির্ভাব হইল। শুদ্ধ পৃথিবী নির্মাণ করিয়া ঈশ্বরের সকল স্পৃহা পূর্ণ না হওয়াতে তিনি পৃথিবীর মৃত্তিকা দ্বারা আপন অবয়বের অনুরূপ এক মূর্তি প্রস্তুত করিলেন এবং অবশেষে সেই মূর্তিব নাসিকারকে ফুঁ দিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ তেজ প্রবিষ্ট কবত তাহাকে সজীব করিলেন। এইরূপে প্রথম মানবের সৃষ্টি হইল, ঈশ্বব তাহার নাম রাখিলেন আদম। অতঃপর আদমেব ভোগার্থে পৃথিবীর নানাবিধ জীব ও উদ্ভিদ নিয়োজিত এবং তাহার বাসস্থানের জন্য এক মনোবম উদ্যান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন, তাহাকে ইংবা-জীতে ইডেন ও মুসলমানেরা জীন্নত বলে। কিন্তু যদিও পৃথিবীর সমুদায় জীব এবং বস্তু ঈশ্বরের আজ্ঞাবীন এবং ভোগেব নিমিত্ত নিয়োজিত হইল এবং প্রত্যহ ঈশ্বর আসিয়া সেই উদ্যানে আদমেব সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, তথাপি আদমেব স্থখ সম্পূর্ণ হইল না; তাহার অন্তরের মধ্যে যেন কি একটা অভাব বোধ হইতে লাগিল। ঈশ্বব তাহা বুঝিতে পারিয়া আদ-মেব একটা দোসব দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। এবং সেই জন্য তিনি আদমকে এক দিন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত করিয়া তাহার পঞ্জরের এক খানা অস্থি খুলিয়া লইয়া তদ্বারা একটা স্ত্রী নির্মাণ করিলেন। আদম তাহা দেখিয়া বলিল যে ইহা আমার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস অতএব

পুরুষ পিতা মাতা তাগ কবিতা ইহাতেই লিপ্ত থাকিবে; ইহাতেই স্ত্রী পুরুষ অন্তর্ভুক্ত হইল। এই স্ত্রীব নাম ইংরাজীতে ইব্ কিস্ত হিজ্র এবং আরবী ভাষায় তাহাকে হাওয়া বলিয়া ডাকে। উক্ত ইডেন উদ্যানের মধ্যে দুইটা বৃক্ষের ফল ভিন্ন আব সকল দ্রব্যই আদম ও হাওয়ার ভক্ষ্য ছিল। ইহার এক বৃক্ষেব নাম জ্ঞান-বৃক্ষ অপব বৃক্ষেব নাম জীবন-বৃক্ষ। এই দুই বৃক্ষের ফলই ঈশ্বর আদম ও হাওয়াকে স্পর্শ কিস্তা আহাব কবিতো দৃঢ়রূপে নিষেধ কবিতা দিলেন। ঈশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন যে, যে পর্যন্ত তাহাবা এই দুই ফলে হস্তক্ষেপণ না কবিতো সে পর্যন্ত তাহাদেব শবীবে মৃত্যু বিধা অন্য প্রকাব কষ্ট ক্লেশ প্রবেশ কবিতো না এবং তাহাদেব প্রাতি তাঁহার সম্পূর্ণ রূপা থাকিতো। এইরূপে প্রথম পুরুষ ও স্ত্রী উক্ত ইডেন উদ্যানে মহাবল্লভে কালযাপন কবিতো লাগিল। তখন হিংস্রক জন্তুবা জীব ধ্বংস কবিতা উদর পোষণ কবিত না, সর্পে দংশন কবিত না। সিংহ শাব্দূলেব সহিত মৃগ মেঘ, শৃগালেব সহিত হংস কুক্কুট, মার্জ্জাংব সহিত কপোত চকু ও সর্পেব সহিত ভেক—একত্রে ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদ কবিত। জীবের মধ্যে মৃত্যু কিস্তা কোনরূপ কষ্ট কিস্তা যাতনা ছিল না, সমস্ত জগতে শান্তি বিরাজমান ছিল। ঈশ্বরও স্বয়ং অবকাশ নতে ইডেন উদ্যানে উপস্থিত হইয়া আদম ও হাওয়ার সহিত মিষ্টালাপ কবিতেন ও তাহাদিগকে সত্বপদেশ দিতেন। সমস্তান পৃথিবীতে আগমন কবিতা কোন বিষয় ঘটাইতে না পারে তজ্জন্ম ঈশ্বর কয়েক জন তাঁহার প্রিয় কবিতস্তাকে ঐ উদ্যানেব এবং পৃথিবীব চতুর্দিকে প্রহরী নিযুক্ত কবিতা রাখিলেন। বাইবেল মতে সেই সৃষ্টি হইতে ৫৬৪৭ বৎসর বয়স হইয়াছে অর্থাৎ আমাদিগেব কলিযুগেব বর্তমান বয়স ৪২৮৭ বৎসর অপেক্ষা ৬৬০ বৎসর অধিক।

ঈশ্বর এত সাবধান হইয়াও কিস্ত সমস্তানকে দমন কবিতো পারিলেন না, কাবণ সমস্তান নরকে বসিয়া পরম্পরায় এই নূতন সৃষ্টিব সংবাদ অবগত হইয়া ছদ্মবেশে প্রহরী ফেরিতাদিগকে বঞ্চনা কবিতা পৃথিবীতে উপস্থিত হইল এবং ঈশ্বরের কার্যে বিঘ্ন ঘটাইবাব জন্য সর্পকপ ধাবণ কবিতা হাওয়ার সম্মুখে নির্জনে উপস্থিত হইল এবং মিষ্ট বাক্যেব দ্বাবা হাওয়াকে এবং হাওয়ার দ্বারা আদমকে মোহিত কবিতা ঈশ্বরেব নিষেধিত ঐ দুই বর্জিত বৃক্ষেব মধ্যে জ্ঞান-বৃক্ষেব ফল খাওয়াইতে কৃতকার্য হইল। দুঃখেব বিষয় এই যে

জীবন বৃক্ষের ফল যাহা খাইলে তাহারা এবং তাহাদের সন্তান সন্ততি এবং ধারাবাহিক ক্রমে এক্ষণে আমবাও অমবত্ত লাভ কবিতাম, মূখেরা অগ্রে সে ফল না খাইয়া জ্ঞানের ফল খাইয়াছিল। ঐ ফল খাইবামাত্র তাহাদের জ্ঞানের সঞ্চাব হইল এবং তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের পল্লব এবং বল্কল দ্বাৰা তাহাদের শবীর আচ্ছাদন কবিল এবং যখন ঈশ্বর অন্য দিনের ন্যায় সেই দিনও ইডেন উদ্যানে আসিয়া আদম ও হাব্বাকে তাহাব সম্মুখে উপস্থিত হইতে ডাকিলেন, তখন তাহারা এক জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া উত্তর করিল যে ঈশ্বরের সম্মুখে যাইতে তাহাদের লজ্জা বোধ হইতেছে কারণ তাহারা উলঙ্গ। তখন ঈশ্বর তাহাদের অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপে তাহাদিগকে অভিসম্পাত কবিলেন এবং ছাগ চন্দ্রের পোষাকের দ্বাৰা তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ইডেন উদ্যান হইতে বাহির কবিয়া দিলেন এবং উহাতে পুনরায় শ্রবেণ কবিয়া জীবনের ফল খাইয়া অমব না হইতে পারে তজ্জন্য ফেবিস্তা গ্রহবী এবং এক অগ্নিময় অসি ঐ উদ্যানের চতুর্দিকে স্থবিত্তে নিযুক্ত কবিয়া রাখিলেন। এই ধর্ম্মে তাহাদের বিশ্বাস, তাহাবা এই উদ্যান পৃথিবীর কোন স্থানে ছিল, তাহা নিশ্চয় কবিয়া কহিতে পারে না। মুসলমান-দিগের বিশ্বাস যে আমাদের সিংহল দ্বীপে সেই উদ্যান ছিল, কিন্তু ইংরাজেরা কেহ কেহ বলেন যে কাশ্মীর উপত্যকাই ঐ উদ্যানের স্থান।

আদম ইডেন উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সর্গ শুদ্ধ ৯৩০ বৎসর জীবিত ছিল এবং তাহাব ১৩০ বৎসব বয়সে সেথ নামক এক পুত্র জন্মে। সেথ ২১২ বৎসর জীবিত ছিল এবং তাহার ১০৫ বৎসব বয়সে ইনস্ নামক এক পুত্র হয়। ইনস্ ৯০৫ বৎসব বাঁচিয়াছিল এবং ৯০ বৎসবে তাহাব কৈনান নামক এক পুত্র হয়। কৈনান ৯১০ বৎসর জীবিত ছিল এবং ৭০ বৎসবে মহালীল বলিয়া তাহার এক পুত্র হয়। মহালীল ৮২০ বৎসরে লোকান্তরিত হয় এবং তাহাব ৬৫ বৎসবে জাবদ নামে পুত্র জন্মে। জাবদের ৯৬২ বৎসবে মৃত্যু হয় এবং ১৬২ বৎসব বয়সে এনক নামে পুত্র হয় কিন্তু এনক বড় ধার্মিক ছিল বলিয়া ঈশ্বর তাহাকে মৰিতে না দিয়া নিজে তাহাকে লইয়া গেলেন। এনকের ৬৫ বৎসরে মেথুশালা নামক পুত্র হয়। মেথুশালা ৯৬৯ বৎসর বাঁচিয়া মরে এবং তাহার ১৮৭ বৎসরে লামে নামক পুত্র জন্মে এবং লামে ৭৭৭ বৎসব বাঁচিয়াছিল এবং তাহার ১৮২ বৎসব বয়সে নোয়া নামে যে

পুত্র হয়, তাহাকে মুসলমানেরা নূ প্যাগছর বলিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে আদমের ১০৫৬ বৎসর পরে নূ জন্ম হয়।

এই সময় স্বর্গবাসী পুরুষেরা পৃথিবীতে আসিয়া মানবীদিগেব স্ফুট লহবাদ কবিতেন এবং মনুষ্যের সংখ্যা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের পাপ এবং অধর্ম এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তাহা দেখিয়া ঈশ্বর কি জন্য মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা মনস্তাপ উপস্থিত হইল এবং অন্য কোন উপায় না দেখিয়া পৃথিবীর সমস্ত স্থাবর জঙ্গম বিনাশ করার অভিপ্রায় কবিলেন। কিন্তু কেবল নূ তাহাব আজ্ঞাধীন এবং ধার্মিক ছিল বলিয়া পুণ্যের স্বরূপে তাহাকে ও তাহাব পবিত্রদিগকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাহাকে ৩০০ হস্ত দীর্ঘ এবং ৫০ হস্ত প্রশস্ত এবং ৩০ হস্ত গভীর একখানি নৌকা প্রস্তুত করিতে ও তাহাব মধ্যে নূ ও নূর স্ত্রী ও তাহাদের তিন পুত্র এবং তাহাদের স্ত্রীদিগকে এবং তাহাদের সমভিষ্যাহারে সকল জীবের এক একটা পুরুষ ও এক একটা স্ত্রী এবং তাহাদের সকলের খাদ্যোপযোগী আহাবের দ্রব্যাদি লইতে আদেশ কবিলেন। তদনন্তর ঈশ্বর বিমানের সমস্ত দ্বার ও গবাক্স খুলিয়া পৃথিবীর উপরে ৪০ দিন পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে এত জল বর্ষণ কবিলেন, যে তাহাতে অতি উচ্চ পর্যন্তও জলে ডুবিয়া গেল এবং সকল মনুষ্য এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সকল জীব জন্তু ও উদ্ভিদ বিনষ্ট হইল। কেবল নূ ও তাহাব সঙ্গীবা সেই নৌকায় মধ্যে বাস করিয়া জলের উপরে ভাসমান অবস্থায় রক্ষা পাইল। এই জলপ্লাবনের সময় নূ ৬০০ ও পৃথিবীর ১৬৫৬ বৎসর বয়স।

নূ তাহাব সঙ্গীগণেব সহিত ভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া যজ্ঞেব এক উচ্চ বেদী প্রস্তুত কবিল এবং তাহাতে অগ্নি জ্বালাইয়া সকল পবিত্র পশু এবং পক্ষীর এক একটা লইয়া সেই যজ্ঞেব আহুতি প্রদান কবিল। সেই যজ্ঞের ধূম ঈশ্বরের নাসিকার অন্তি উপদেয় বোধ হওয়াতে তিনি নূকে আশীর্বাদ করিলেন এবং মনে মনে স্থির কবিলেন যে মনুষ্যেব পাপের জন্য তিনি আর জীব-ধ্বংস করিবেন না। তদনন্তর ঈশ্বর নূকে বলিলেন যে, “দেখ নূ, আমি তোমার সঙ্গে এবং তোমাকে উপলক্ষ কবিয়া সকলের সহিত চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি আর কখনও জলপ্লাবনের দ্বারা সমুদায় মাংস অর্থাৎ জীব ধ্বংস করিব না। এবং আমার এই চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞার সাক্ষি

স্বরূপে এক ধনুক সৃষ্টি করিয়া আকাশে মেঘের মধ্যে তাহা স্থাপিত করিলাম, যে তাহা দেখিলেই আমার মনে পড়িবে যে জলপ্লাবনের দ্বারা আমি জীব ধ্বংস করিব না বলিয়া আমি অদ্য তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম।” এই ধনুক আমবা পৌত্তলিকেবা বামধনু বলি এবং ইহাই বাইবেলের মতে মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের প্রথম চুক্তির কিম্বা প্রতিজ্ঞাব নিদর্শন ।

কিন্তু এমন জাজ্জলামান সাক্ষি থাকিলেও ঈশ্বরের সেই চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞাব উপরে মনুষ্যের বিশ্বাস হয় নাট কাবণ কিছুকাল পবে যখন মনুষ্যেবা ইট প্রস্তুত করাব প্রণালী আবিষ্কার করিতে পাবিল, তখন তাহাবা একস্থানে আসিয়া এক নগর স্থাপনা করিয়া ভবিষ্যতে জলপ্লাবনে তাহাদের মর্মেতে না হয় এবং পৃথিবীর নানাস্থানে তাহাবা বিদূরিত না হয়, বিশেষত তাহাদের গৌরব চিরস্থায়ী করাব উদ্দেশ্যে এবং স্বর্গ গমনের উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ এবং বৃহৎ ইটের স্তম্ভ নিৰ্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল । ঈশ্বর ইহার সংবাদ পাইয়া এই নগর এবং স্তম্ভ দেখিতে আসিলেন এবং দেখিলেন যে মনুষ্যেবা তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম হইবে অতএব এমন স্পর্দ্ধা এবং অহঙ্কার দমনার্থ তিনি এক কৌশল করিলেন । মনুষ্যেবা সেই সময়ে সকলে এক ভাষী ছিল এবং সকলের কথা সকলে বুঝিতে পারিত ; ঈশ্বরের কৌশলে প্রত্যেকেব ভাষা তৎক্ষণাৎ পৃথক পৃথক হইয়া পড়িল, পরস্পর পরস্পরের কথা বুঝিতে পাবিল না সুতরাং স্তম্ভ সমাপ্ত হইল না এবং মনুষ্যেবা ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা দেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল । সেই কাবণে এবং সেই সময় হইতে মনুষ্য মধ্যে ভাষাব প্রভেদ হইয়া আসিতেছে ।

ইহাব পরে নূব বংশে ইব্রাহিম নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয় । ঈশ্বর তাহাব প্রতি সদয় হইয়া তাহাব সহিত এক চুক্তি করিয়া বলেন যে “তুমি এবং তোমার বংশোদ্ভব সকল পুরুষে স্মরণ করিবে এবং তাহা হইলে আমি তোমার উত্তর পুরুষকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিব এবং তাহাদের বাসস্থানের নিমিত্ত এক স্বন্দর দেশ প্রদান করিব।” তৎপরে তিনি ইব্রাহিমের পুত্র ইসাকেব, ও ইসাকের পুত্র ইয়াকুবেব ও ইয়াকুবেবের পুত্র ইউসফের সহিতও এইরূপ প্রতিজ্ঞা এবং চুক্তি করেন কিন্তু ইউসফের পুত্র

মুসা কে তিনি বিশেষ অহুগ্রহ করিয়া হিজ্রাতিকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত করেন। মুসা এবং সহস্র সহস্র হিজ্র ইস্রাকের সময় হইতে ইজিপ্ট অর্থাৎ মিসর দেশে যাইয়া বাস করিতেছিল এবং সেই দেশের রাজা তাহাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিত। কিন্তু ঈশ্বর মুসার দ্বারা অনেক অদ্ভুত কার্য্য করিয়া অবশেষে সমুদ্র হিজ্রদিগকে মিসর হইতে উদ্ধার করেন, তন্মধ্যে দুইগী কার্য্যের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। মিসরের রাজা ফারুণ হিজ্রদিগকে তাহাব দেশ পাবতাগ করিতে অহুমতি দিয়া বারম্বার তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ কবাতে, ঈশ্বর মিসর দেশে নানা প্রকার বিদ্রোহ উপস্থিত কবিয়া, অবশেষে মিসরবাসীদিগের প্রত্যেকের প্রথম সন্তান এবং তাহাদের পালিত পশুাদিব প্রথম বৎস বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তজ্জন্য এক বাজি নির্দিষ্ট কবিলেন। কিন্তু পাছে ঈশ্বর যাত্রা অকৃতাবে মিসরবাসী এবং হিজ্রব গৃহেব প্রভেদ কবিতো না পারিয়া হিজ্রদিগের গৃহেও সেই বিপদ উপস্থিত কবেন, এই আশঙ্কার সকল হিজ্রকে সেই দিবস সন্ধ্যাব সময় এক একটা সন্ধ্যা সূন্দর মেঘ বৎস বধ করিয়া তাহার শোণিত লইয়া তাহাদের স্বীয় স্বীয় গৃহেব বহির্দ্বারে চৌকাঠের শিরোভাগের এবং দুই পার্শ্বের কাঠে লেপন করিতে আজ্ঞা করিলেন, যে মধ্য যাত্রা যখন তিনি মিসরবাসীদিগের শিশু এবং বালকদিগকে বধ কবিতো মিসর দেশেব মধ্যে পর্য্যটন কবিবেন, তখন তিনি যে সকল গৃহের চৌকাঠে বন্ধ লেপিত দেখিবেন, তাহা হিজ্রগৃহ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ কবিবেন না এবং যে গৃহেব দ্বারে এই চিহ্ন দেখিতে পাইবেন না, তাহা মিসরবাসীর গৃহ বুঝিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ কবত সেই গৃহেব শিশু প্রাণ সংহার কবিবেন। সেই যাত্রা গভীর নিশার সময় সমস্ত মিসর দেশ ভরিয়া ক্রন্দনের মহা এক বোল উঠিল। কেবল একমাত্র বাজাব দোষে সহস্র সহস্র অবোধ এবং নির্দোষী শিশু এবং বালকের এবং গো মেঘ ছাগ অশ্ব গর্দভ এবং উষ্ট্র বৎসেব প্রাণ ইচ্ছা ক্রীড়ার পিতা ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই ঘটনা বাহাতে হিজ্রদিগের চিরকাল স্মরণ থাকে তজ্জন্য প্রতি বৎসব এই দিবসে এক উৎসব করিতে ঈশ্বর হিজ্রদিগকে আজ্ঞা করিলেন এবং এখনও তাহারা সেই দিবস ‘পাসোব’ নামক একজনকে অনেক উৎসাহের সহিত পালন করে।

এই শোচনীয় ঘটনাতে রাজা ফার্নান্দ্রো হাইয়া হিজ্রাদিগকে তাঁহাব দেশ পরিত্যাগ করিয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং হিজ্রাবও ঈশ্বরের পরামর্শ মতে ছলে মিসরবাসাদিগের শুল্যবান অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যাদি হস্তগত করিয়া লোহিত সাগরের উপকূলে উপস্থিত হইলে রাজা ফার্নান্দ্রো তাহা দিব যাত্রায় বাধাত দেওয়ার জন্য বহু রথ ও যোদ্ধা সমবেত করিয়া তাহাদেব পশ্চাতে ধাবমান হইলেন ; কিন্তু ঈশ্বর সাগরের এক স্থানের জল ছুই পার্শ্ব স্রুপীকৃত কবত সাগরের মধ্য দেশ শুষ্ক করিয়া দিলেন । তাহাব উপর দিয়া হিজ্রা অনায়াসে সাগর পার হইয়া অপব পারে উত্তরণ হইল । ফার্নান্দ্রোর সৈন্য সমস্ত ঐকপ দেখিয়া সেই পথ অবলম্বন করিল কিন্তু তাহাব অপব পাবে পৌছিবাব পূর্বেই ঈশ্বর সেই পথের চুই পার্শ্বের জল ছাড়িয়া দিব সমুদায় মিসর সৈন্যকে জলে ডুবাইয়া মাঝিলেন ।

লোহিত সাগরের পূর্ণ পাবে হিজ্রাব একমুহূর্ত্তে উপস্থিত হইয়া দিশাহাব হইল, কাজেই ঈশ্বর তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া তাঁহাব অঙ্গীকৃত স্থানে লইয়া যাওয়ার নিমিত্ত তাহাদেব অগ্রে অগ্রে দিবাভাগে এক ধূমেব স্তম্ভ এবং বাত্রিকালে এক অগ্নিব স্তম্ভ হইয়া পথ দশক স্বরূপে চলিতে লাগিলেন, এবং সিনাই নামক পর্বতে আসিয়া তাহাব চূড়ার উপর ভাগে তিনি অগ্নি মধ্যে থাকিয়া মুসাকে দর্শন দিলেন এবং ছুই খণ্ড প্রস্তরে তাঁহাব আজ্ঞা সমস্ত লিপি বন্ধ করিয়া হিজ্রাদিগকে দেখাইতে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে মুসাব হস্তে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে “হিজ্রাজাতিব সহিও পুনবায় চুক্তি ও প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে যেহেতু তিনি অনেক বষ্টে ও অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া হিজ্রাদিগকে মিসরবাসীরা দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছেন অতএব যে পর্য্যন্ত তাহারা অন্য ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া কেবল তাঁহাকেই পূজা করিবে এবং তাঁহাব আজ্ঞানুসারে চলিবে সে পর্য্যন্ত তিনি তাহাদিগের প্রতি সদয় থাকিয়া তাহাদিগের শত্রু সমস্ত নিপাত করিবেন এবং ছুধে ঘূতে পূর্ণ এক দেশে লইয়া যাইয়া তাহাদিগকে স্থাপিত করিবেন এবং চিবকাল তাহাদিগেরই ঈশ্বর হইয়া থাকিবেন ।” পবস্ত হিজ্রাব যে ঐশ্বর্য্যমীতে তাঁহাকে পূজা করিলে এবং যে যে আচার ব্যবহার অবলম্বন এবং পালন করিলে

তিনি তাড়াতাড়ি প্রতি সৃষ্টি খানিবেন তাহান পবিত্র উপদেশ মুসাকে
 দিলেন এবং যে বাক্তিৎ বংশোদ্ভব বাক্তিয়া তাহাব পবিত্র বেদী
 স্পর্শ ও তাহাতে বলিদান হোম যাগ পূজা ও মচ্চনা প্রভৃতি কবিত্তে খানিবে
 তাহাও তিনি নির্দিষ্ট কয়িয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে সিটিম নামক
 কাঠেব ২৥০ হস্ত লম্বা ১৥০ হস্ত প্রশস্ত এবং এক হস্ত উচ্চ পবিমানে এক
 আক অর্থাৎ নোকব নাম্ব বাক স নির্মাণ কবিত্ত, তাহান ভিত্তব এবং
 যাহিবে খাটি স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত কবিত্তে হইবে এবং তাহাব চারি কোণে
 চারিটা সোণাব ফড়া (অঙ্গুলী) লাগাইয়া তাহাব মধ্যে দুইটা স্বর্ণ বেষ্টিত
 কাঠেব দণ্ড (বাঁট) লাগাইতে হইবে, যে আবশ্যক হইলে সেই দণ্ড
 অবলম্বন কবিত্তা “আর্ক” স্তানাত্তব ববা খাটতে পারে। তদ্বিন্ন আর একটা
 “দয়ার আসন” নির্মাণ কবিত্তে হইবে। সেই আসনও খাটি সোণাব ২৥০
 হস্ত লম্বা ও ১৥০ হস্ত প্রশস্ত পবিমানে বিশিষ্ট হইবে এবং তাহার দুই পার্শ্বে
 দুইটা চেকবিন (অপ্সবাব) মন্দি গড়িয়া পদস্পদ সম্মুখবর্তী কয়িয়া
 বসাইতে হইবে। অপ্সবা দ্বয়েব পুরে দুইটা কয়িয়া পক্ষ থাকিবে এবং
 প্রত্যেক পক্ষ মস্তকেব উপর দিয়া সম্মুখে আসিয়া অপ্সব মূর্তিৰ পক্ষ স্পর্শ
 কবিত্তে এবং এই দয়ার আসন উক্ত দ্বারেব উপরে স্থাপিত হইবে
 এবং ঈশ্বর তাহাব প্রতিজ্ঞাব সাক্ষি দকলে যে এক ত্রয়া প্রদান
 কবিত্তেন, তাহা এই আত্মের মধ্যে বন্ধ বয়িয়া বাগিত্তে হইবে। এই
 সকল কাণ্য সম্পাদিত হইলে পরে তিনি আসিয়া দবার আসনে ঐ
 দুই অপ্সবা মূর্তিৰ মধ্য স্থলে অবতান কবিত্তেন এবং সেই স্থানে বসিয়া
 গুজা গ্রহণ ও কাণ্যপকথন কবিত্তেন। পবিত্র উহার সম্মুখে আব
 একটা মঞ্চ প্রস্তুত কবিত্তা তাহা ও সোণাব চানচ, সোণাব কাঁটা ও
 এক খণ্ড কাঁটা বাগিত্তে এবং একটা নিবর্ত খাটি সোণাব ছয় শাখার
 গাছ-প্রদীপ প্রস্তুত কবিত্তে ও তাহা আক ও আসনের সম্মুখে স্থালিত্তে এবং
 ধূপ ধুনা পোডাইতে আদেশ কবিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে নীল,
 লাল এবং ধূমল বস্ত্রের উত্তম বস্ত্রের ১০খানি যবনিবা প্রস্তুত কবিত্ত
 আর্কেব চতুর্পার্শ্বে ঝুলাইয়া ভাগ বোমের বস্ত্র দ্বারা উপবিভাগ আচ্ছাদন
 কবিত্তে হইবে। পবিত্র এই আবেশণেব মধ্যে চারিটা সিটিম কাঠেব স্তম্ভ
 গুড়িয়া তাহাতে চাঁদোয়ার মত নীল ও বনল বস্ত্রের উত্তম বস্ত্র

ফুলাইয়া তন্মধ্যে আর্ক ও আসন সংস্থাপন করিতে হইবে এবং এই চন্দ্রা-
 ত্তপের মধ্যস্থিত স্থানই মন্দিরের সকল স্থান অপেক্ষা পবিত্র হইতে
 পবিত্রতম স্থান বলিয়া পরিগণিত হইবে। তন্মধ্যে যেকপে বলিদানের ও হোম
 যজ্ঞের স্থান প্রস্তুত করা উচিত তাহাবও উপদেশ ঈশ্বর প্রদান করেন। পবে
 ঈশ্বর মুসাব ভ্রাতা এবং ও তাহার পুত্রদ্বিগকে তাহাব পূজাব পৌৰহিত্য
 কার্যে নিয়োজিত করিয়া তাহারা যে প্রকাব পোষাক ও অলঙ্কার পরিয়া
 এই কার্য সম্পাদন করিবে, তাহাও তিনি বিবৃত করিলেন। তদনুসাবে মুসা
 এক মেঘ বৎসকে বলি দিয়া তাহাব কতক মাংস দিয়া হোম কবাত্রে সেই
 হোমের ভ্রাত্রে ঈশ্বর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পবে মুসা আর একটা মেঘ
 বৎস বধ করিয়া তাহাব বক্ত লব্ধ এবং ও তাহাব পুত্রদ্বিগের দক্ষিণ কণ্ঠের
 উপবিভাগে ও দক্ষিণ হস্তের ও দক্ষিণ পাদেব বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে তিলক স্বরূপে
 ফোঁটা দিয়া অন্তর্গত বস্ত্র বেদীর উপবে নিষ্ক্ষেপ করিলেন এবং পবিত্র
 তৈল লইয়া এবং ও তাহাব পুত্রদ্বিগের মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। এইরূপে
 তাহাদ্বিগকে পৌৰহিত্য কৰ্ত্তা এবং করিয়া মুসা মেঘ বৎসের এক খণ্ড
 মাংস হস্তে করিয়া স্বৰ্গে সন্মুখ পুত্রদ্বিগের উপস্থিতি করিলেন
 এবং তাহাদ্বিগের ঈশ্বর শিখা তৃপ্ত হোম করিলেন।

এরূপে পূজা প্রদত্তি উপদেশ দিয়া ঈশ্বর তাহাদ্বিগকে আনন্ড প্রদান
 করিলেন যে, যে সকল পশু গিলিত চৰ্ণণ হবে এবং যাহাদেব খুর আছে
 এই উভয় গুণ বিশিষ্ট সকল প্রকাব ভূচর এবং লৈ শব্দ নী, হাড়গিলা, শিশু, বা,
 কাক, বক, পেঁচা, বাজ, পক্ষি বর্গের প্রকাব পক্ষী ভিন্ন সমুদায় খেচর এবং
 যাহাদেব পৃষ্ঠে আঁইষ ও ডানা আছে, এমন সমুদায় মৎস্য হিংস্রা খাইতে
 পারিবে। আর সকল জীব জন্তু তাহাদেব পক্ষে অপবিত্র স্ত্রীমাংস অথবা
 এবং হারাম যথা শূকর, বাঘ যদিও শব্দেব বিভক্ত খুর আছে তথাপি
 গিলিত চৰ্ণণ হবে না, ও ককট কচ্ছপ প্রভৃতিও হারাম—কাবণ ইহাদেব
 শরীরে আঁইষ ও ডানা নাই। যদি কোন গতিবে তাহাবা এই সকল নিষিদ্ধ
 জীবের মৃত দেহ স্পর্শও হবে তাহা হইলে তাহাবা সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি
 থাকিবে এবং সন্ধ্যার সময় স্থান এবং বস্ত্র ধৌত করিয়া পুনৰাব
 পবিত্র হইতে পারিবে। এইরূপ নিষেধ করার কারণ ঈশ্বর নিজেরই লেবি-
 টিক্স পুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে বলিয়া গিয়াছেন যে “কাবণ

আমি সেই প্রভু, যে তোমাদিগের ঈশ্বর হওয়ার নিমিত্ত তোমাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি' অতএব তোমাদের গুরু থাকি উচিত কারণ আমি নিজেই গুচি।" হিব্রু কি ভাগ্যবান জাতি যে তাহাদিগের প্রভু হইয়াছেন বলিয়া তাহাদিগকে পবিত্র বাখার নিমিত্ত স্বয়ং ঈশ্বর এত যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখেব বিষয় এই যে, কয়েক শত বৎসর পাবে হিব্রুদিগের ওচলাবা খাদ্যাখাদ্যের বিচাৰ উঠাইয়া দিয়া মৃত্যুযন্ত্ৰে যথেষ্ট আহার্য প্রবৃদ্ধি দিয়া দেউতাইতেছেন !

আচার্য্য বাবুসাহ সন্থক্কে ঈশ্বর হিব্রুদিগকে অনেক উপদেশ দেন এবং নিয়ম দিবা কবিয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ত্রালোক সন্থক্কে তিনি বিধান করিলেন যে স্থীলোক পুনঃস্থান পসব করিলে দুই সপ্তাহ অপবিত্র ও ৩৭ দিবস অশুচি এবং বন্যা স্থান পসব করিলে দুই সপ্তাহ অপবিত্র এবং ৬০ দিবস অশুচি থাকিবে। ইহা মধ্য যোনিও বিদ্র বাধা কবিত্তে কিস্বা দেব মন্দির মনে পবেশ করিলে অথবা কোন পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ কবিত্তে তাহাদের অপবিত্র থাকিবে না। অশুচি কাল অতীত হইলে পবে সেই স্থী যোন এক বস্ত্র লম্বা মন্দিরে উৎসিত হইয়া তাহা ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গ করিয়া শুচি হইবে। প্রাচীনতম স্ত্রীলোকেব প্রতিও ঈকপ অশুচি থাকিব ব বশ্য করিলেন। তিনি আ ও আদা করিলেন যে হিব্রুদিগের মধ্যে কেহ কোন পশু বসন পরা তাহাব বিষদংশ মাংস লইয়া অগ্নে উত্তর নিকট পংসা না করিয়া বৃথা মাংস তক্ষণ করিলে, সে জীব জন্তুর পতী হইবে এবং ওচলাক সমাজচ্যুত ববিত্তে হবে। সকল জীব বিশেষতঃ মনুষ্যের এবং মনুষ্যের গুরু জাত পশু সকলের পংসা সপ্তন এবং পংসা উপবে ঈশ্বরের অধিকার, অতএব তাহা আনিয়া মন্দির ঈশ্বরের নিমিত্ত উৎসর্গ করিতে হইবে। মনুষ্যব সন্তানব পদবর্ত্ত কন এক পশু পি দিয়া সেই পশু পরিশোধ করিতে হইবে কিন্তু গোমেষ পদ্ধতির পথন বংস আনিয়া মন্দিরে বজ্র প্রদান করিতে হইবে। গর্দভের বংসের পদবর্ত্ত এক মেঘ বংস দিলে চলিবে, মেঘ বংস দিতে অসমর্থ হইলে সেই গর্দভের বংসেব ঘাড় ভাঙ্গিয়া মাঝিতে হইবে। বর্ষিবার দিবস পবিত্র বার বলিয়া তাহাতে কোন কর্ম্ম কাঙ্ক্ষ করিতে নিষেধ করিলেন, কেহ করিলে তাহার পংদণ্ড ববিত্তে হইবে।

সুত্র সম্বন্ধে জন্মিলে শিশুর অষ্টম দিবসে তাহার স্নান কবিতো বিশেষ শ্রদ্ধা
সংস্থাপন করিলেন। জীব সতীত্বের প্রতি স্বামীর স্নেহ উপস্থিত হইলে
সে তাহাকে মন্দিরে লইয়া যাইয়া বেদীর চরণামৃত পান কবাইয়া পরীক্ষা
করিতে পারিবে। এক যুবা রথ উৎসর্গ কবিলেই অজ্ঞাত পাণেব প্রায়শ্চিত্ত
হইবে।

এবমুখাবে মনুষ্য সমাজেব আবশ্যকীয় সকল বিষয়েব বীতি নীতি
প্রস্তাব কবিয়া ঈশ্বর হিত্রদিগের নিকট ব্যক্ত কবিলেন যে যদি তাহাব
জ্ঞাহাব আজ্ঞা সমস্ত বিধিনেত পালন কবে, তাহা হইলে তিনি তাহাদের
দেশে উচিত মনুষ্য পথ্যাপ্ত বৃষ্টি, ভূমিতে প্রচুর শস্য ও বৃক্ষে ফল প্রদান
করিবেন। দেশে শান্তি বিবাজ কবিবে এবং তাহাবা সুখে এবং নির্ভয়ে
নিদ্রা যাইতে পারিবে। এবং তিনি তাহাদিগকে এত বল বীৰ্য্য প্রদান
কবিবেন যে পাঁচ জন হিত্রতে একশত জন শত্রুক ও ১০০ এক শত জন
হিত্রতে সহস্র জন শত্রুক পরাজয় কবিতো পারিবে। ফলে সকল বিষয়ে
তিনি তাহাদিগকে সুখী কবিবেন, এবং তিনি তাহাব আসন তাহাদিগের
মধ্যে সংস্থাপন কবিয়া তাহাদিগেবই প্রভু হইয়া থাকিবেন। এবং হিত্র-
জাতিকে পৃথিবীর অন্য জাতিব সহিত পৃথক কবিয়া তাহাদিগকে জ্ঞাহার
নির্দাচিত এক প্রিয় জাতি কবিবেন। কিন্তু তিনি হিত্রদিগকে অন্য
ঈশ্বর কিম্বা হস্ত নির্মিত কোন মূর্ত্তিৰ অচ্চনা করিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ
করিয়া দিলেন, কারণ তিনি বললেন যে “আমি তব ঈর্ষাভাবপন্ন ঈশ্বর”
“অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলয়া পূজা কবিলে আমান সহ্য হইবে না।”
এই ঈর্ষাভাবপন্ন হাতেই যবনদিগের করিত ঈশ্ববেব সহিত আৰ্য্যপাণ্ডিত
গণের ঈশ্ববেব পার্থক্য। বাইবেলেব ঈশ্বর যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠকগণ
ভনিলেন কিন্তু ভগবদীত্য শ্রীকৃষ্ণ সেই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও
প্রবণ করুন।

যেহ পন্য দেবতা তন্ত্য্য যজন্তে শ্রদ্ধাবান্বিতা ।

তেপি নামেব কোন্তেষ যজন্ত্যবিধি-পূর্নকঃ ॥

অর্থাৎ যে অন্য দেবতাকে শ্রদ্ধার সহিত ভক্তি কবে, সে আমাকেও
পূজা করে, কিন্তু তাহা বিধিপূর্নক হয় না।

এবং সেটী তাব অনুকরণ কবিতা আমাদের ঈশ্বরগুপ্ত কবি তাঁহাব এক সগীমদ্বাদ গীতে যথার্থই বিবৃত কবিতাছেন যে,—

‘আমায় যে ভাবে যে ভাবে, সেই ভাবেও প্রভাবে
পুৰাই তাব মনস্কাম ।

আমি ভক্তের হৃদি নবীন ত্রিভঙ্গ শ্যাম ॥”

এই দুই ভাবে মধ্য কোন ভাবটী ঈশ্বরের যথার্থ উপযুক্ত ভাব, তদ্বিবন্ধে আমি কোন বাক্যব্যয় না কবিতা, তাহাব বিচাবের ভাব বিজ্ঞ পাঠকগণের উপরে বাখিলাম ।

অবশেষে ঈশ্বর হিক্রুদিগকে সতর্ক কবিতা দিলেন, যে তাহারা যদি তাঁহাকে অবজ্ঞা কবিতা তাঁহাব নিয়ম সকল লঙ্ঘন কবে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের মধ্যে নানাকণ পীড়া ও বোগ প্ৰেবণ কবিতা তাহাদিগকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দিবেন ও তাহাদের প্রতি তিনি বৈমুখ হইয়া তাহাদের এমন দর্প চূর্ণ কবিতেন যে তাহাদের শত্রুতা তাহাদের উপরে প্রভুত কবিতবে, এবং তাহাদের মধ্যে হিন্দু সকল প্ৰেবণ কবিতেন, যাহাবা তাহাদের বালক বালিকা ও পশুদি ভক্ষণ কবিতা ফেলিবে, এবং তাহাদের মধ্যে এমন দুভিক্ষ উপস্থিত হইবে, যে তাহাবা আপন আপন বালক বালিকাদিগের মা স ষাইবে ও তাহাদের দেশ ছাড়খাব হইবে ও তাহাবা নানা দেশ এবং কাকের অর্থ ও পৌত্তলিকদের মধ্যে বাস কবিতা বাধ্য হইবে ও তাহারা এমন বল বীয়া হীন হইবে যে বৃক্ষেব একটী পল্লব কম্পিত হইলে, তাহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে, এবং শত্রুতা আশঙ্কায় তাহারা পলায়ন কবিতবে । এইকণ বহুণা ভোগ কবিতা অবশিষ্ট হিক্রুদিগেন যখন অনুতাপ উপস্থিত হইবে এবং যখন তাহারা বুঝিবে যে তাহাদের পূর্বপুরুষের ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন কৰাতে ঈশ্বর তাহাদিগেব বৈমুখ হইয়া তাহাদিগের প্রতি এইকণ দুর্গতি উপস্থিত কবিতাছেন, তখন ঈশ্বরের পুনবায় রূপা হইবে এবং ইসাক ইয়াকুব ইব্রাহিম ও মুসাৰ সহিত তিনি চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাব মনে পড়িবে এবং ইহাও তিনি অবগত কবিতেন যে হিক্রুদিগেব ঈশ্বর হওয়ার জন্য তিনি পৌত্তলিকদিগেব চক্ষু উপর দিয়া তাহাদিগকে মিসর দেশ হইতে উদ্ধার কবিতা আনিয়াছিলেন ।

সেনাই পক্ষতের উপরে ঈশ্বর এই সকল আজ্ঞা মুসাৰ নিকট প্রচার

কর'র পরে তিনি কানানাইট, শোয়বাইট, ও ফিলিস্তিনীদিগকে পবাস্ত করিয়া তাহাদের দেশে হিজ্রদিগকে সংস্থাপিত করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের এত অলুগ্রহ এত যত্ন এবং এত আকিঞ্চন থাকিলেও হিজ্রবা তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া রহিল না। মধ্যে মধ্যে তাহারা অন্য দেব দেবী ও হস্ত নির্মিত মূর্ত্তি সকল পূজা কবিত্তে প্রবৃত্ত হইত। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগকে অনেক শাস্তি দিতেন এবং তাহাদের অশুভাপ উপস্থিত হইলে পুনর্বার তিনি সদয় হইয়া তাহাদিগকে ক্রোড়ে টানিয়া লইতেন। বখন হিজ্রা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিত, তখনই তিনি এক এক জন বাজা কিম্বা ভবিষ্যদ্বক্তার মুখে হিজ্রদিগের নিকট মহা আক্ষেপ কবিতেন এবং ক্রোধে তাহাদিগকে দণ্ড কবাব ভয় দেখাইতেন। এইরূপ কিছুকাল গতে হিজ্রদিগের মধ্যে দাউদ (ডেভিড) নামক এক ব্যক্তি বাজা হইলে ঈশ্বর তাহাকে অত্যন্ত অলুগ্রহ কবিতেন এবং তাহার নিকট তিনি এক দিবস আক্ষেপ কবিয়া বলিলেন যে হিজ্রদিগকে তিনি মেহ করিতে আবন্ত কবাব সময় হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার উপযুক্ত এতটা মন্দির হইল না। তিনি হিজ্রদিগের সঙ্গে মিসর দেশ হইতে বাহিব হইয়া মাঠে মাঠে মকভূমে কেবল এক শিবির অথবা পট্টাবাসের মধ্যে অবস্থিতি কবিয়া আসিতেছেন, অতএব তাঁহার নিমিত্ত এক উপযুক্ত মন্দির করা হিজ্রদিগের উচিত। কিন্তু দাউদের ভাগ্যে তাহা ঘটয়, উঠবে না। দাউদকে ঈশ্বর সুলেমান নামক যে এক অদ্বিতীয় পুত্র দিয়া আশীর্বাদ কবিবেন এবং যাহাকে তিনি পৃথিবীর মধ্যে সকল বাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতন করিবেন, সেই সুলেমান কর্তৃক ঐ মন্দির সংগঠিত হইবে। ঈশ্বরের এমন অলুগ্রহের পাত্র সুলেমানের জন্ম বৃত্তান্ত এই স্থানে বিবৃত করা উচিত। বাথশীবা নাম্নী এক স্ত্রীলোকের কপ লাবণ্যে রাজা দাউদ বিমোহিত হইয়া তাহার ধর্ম্য নষ্ট কবেন এবং বাথশীবাকে তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি কবিবার অভিপ্রায়ে তাহার স্বামী উবিয়াকে দাউদ প্রকাবাস্তবে বধ কবেন। এই সংযোগে বাথশীবার গর্ভে দাউদের এক পুত্র জন্মে, কিন্তু ঈশ্বর এত ব্যাপার অবগত হইয়া দাউদকে ধিকার দান কবেন এবং দণ্ড স্বরূপে সেই শিশুটাকে অভিসম্পাত দিয়া নষ্ট কবেন। ইহাতে দাউদ এবং বাথশীবার অত্যন্ত শোক হওয়াতে ঈশ্বর তাহাদিগকে সাহায্য করার নিমিত্ত দাউদকে বলিলেন যে পুনর্বার বাথশীবার গর্ভে যে একটা পুত্র

জান্নাবে, তাহাকে তান হিক্রদিগের বাজকুলেব ভিলক বিশেষ করিবেন, এমন কি পৃথিবীর মধ্যে চিরকাল সকল মনুষ্যের নিবট সুলেমান উপমার স্থল হইবে। ফলেও তাহাই হইয়াছিল। দাউদ গত্যস্থ হইল পরে। সুলেমান সি হাসনে আবোহুণ বরিয়া অন্যান্য অনেক দেশের রাজ্য-দিগকে পরাভূত করিলেন এবং তাহাদেব প্রদত্ত কব ও স্রব্যাদি দ্বারা জেরুসিলাম নগরে এক বৃহৎ এবং সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে মুসাব কুঁত উপবি উক্ত আর্ক প্রভৃতি সংস্থাপন করিলেন। সুবিচার সুবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যোব জন্য বাজা সুলেমান অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন এবং সেই সময় হিক্রজাতিব গোববেব চবমাবস্থা হইয়াছিল।

প্রাচীন বাইবেলের সমালোচনায জোবেব উপাখ্যানের উল্লেখ না করিলে সমালোচনা সম্পূর্ণ হয় না। হিক্রদিগের চবম গোববেব সময় জোব নামক এক ব্যক্তি ছিল। ঈশ্বর তাহাকে ধনে ধনে পুত্র ভাগ্যধর করিয়া-ছিলেন। তাহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা ছিল ও সে সাত সহস্র মেঘের তিন সহস্র উষ্ট্রের, পাঁচ শত জোড়া বলদেব ও পাঁচ শত গর্দভীও অধিকারী ছিল। কিন্তু এত ঐশ্বর্য্যালী হইয়াও জোব ঈশ্ববেব সেবার সম্পূর্ণ রূপে অনুবক্ত ছিল। প্রভাহ ঈশ্ববেব পৃষ্ঠা ও নন্দিবে বলিদান করিত এবং কেন অন্যায ও গর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিত না। আমা-দেব বড় লাটের লেবি অর্পাৎ দববাবেব নায় স্বর্গেও এক এক দিবস ঈশ্ব-বেব দববার হইয়া থাকে। এইরূপ এক দববাবে যখন ঈশ্ববেব পুত্রেরা অর্থাৎ স্বর্গবাদীরা ঈশ্ববেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শয়তানও ছিল। ঈশ্বব শয়তানকে দেখিয়া সে কোণা হইতে আসি-তেছে বলিয়া জিজ্ঞাসা কবাত শয়তান উত্তর করিল যে, সে পৃথিবীতে ইত-স্তত বিচরণ করিয়া আসিতেছে। তাহাৎ ঈশ্বব পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে “তুমি পৃথিবীতে জোব নামক আমাব সেবকে দেখিয়াছ, সে কেমন আমাব ভক্ত ?” শয়তান তাহাতে হাঁসিয়া উত্তর করিল যে “জোব আপনার অলুপত সেবক না হইবে কেন ? তাহাকে আপনি ধন, জন, সুখ সম্পদ দিয়া গৌরবাসিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাব কোনরূপ ক্রো-ধ কিংবা দুঃখ নাই কাহেই সে আপনার একান্ত বশীভূত হইয়াছে। কিন্তু আপনি একবার তাহার বিত্তবিভাগে হস্তক্ষেপণ করিয়া দেখুন দেখি, সে

কেমন আব আপনার বেশে থাকে।” এই কথা শুনিয়া ঈশ্বর শয়তানকে বললেন যে “আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি কেবল জোবেব শরীরের উপর হস্তক্ষেপণ না করিয়া, আর তোমাব যাহা চোঁড়া হয় করিয়া দেখ, তথাপি সে অবজ্ঞা করিবে না।” শয়তান ‘তথাক্ত’ বলিয়া চলিয়া আসিয়া জোবেব সাত পুত্রের ও তিন কন্যাব প্রাণ ধ্বংস ও শত্রু বাবা তাহাব পক্ষাদি অপহরণ করিয়া লইল এবং নানাপ্রকারে জোবকে বষ্ট দিল। তথাপি জোবেব মতি টলিল না এবং তাহার ঈশ্বর ভক্তি অক্ষুণ্ণ বহিল। সে কেবল এই মাত্র বলিল যে “ঈশ্বর দিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরই লইয়া গিয়াছেন, অতএব ঈশ্বরের নাম ধনা থাকুক।” ইহার পরে পুনরায় এক দিবসে ঈশ্বরের সমক্ষে শয়তান উপস্থিত হইলে ঈশ্বর শয়তানকে বলিলেন যে “তুমি ত জোবকে কষ্ট দিতে ক্রটি কব নাই, তথাপি দেখ আমার প্রতি জোবেব শ্রদ্ধা অবিচলিত বহিয়াছে।” শয়তান তত্ত্বরে বলিল যে মনুষ্যের যাহা কিছু আছে তাহা সকলই সে তাহাব প্রাণ বাঁচাইবাব নিমিত্ত দিবে, অতএব আপনি এই ক্ষণে জোবেব অস্তি মাংসে হস্তক্ষেপণ করিয়া দেখুন সে তাহা হইলে আপনাব মুখের উপরে অতিসম্পাত করিবে।” এই কথা শুনিয়া ঈশ্বর বলিলেন যে, “যাও কেবল জোবেব প্রাণ নষ্ট করিও না, তন্নিমিত্ত তোমাব আর যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিয়া দেখ।” তদনুসারে শয়তান আসিয়া জোবেব শরীরে আপাদ মস্তক বিছোটকে প্রণীড়িত করিয়া তাহাকে অকণা ধমণা দিল। তথাপি জোবেব ভক্তি বিচলিত হইল না। তাহা দেখিয়া ঈশ্বর পুনরায় জোবকে পূর্বাশ্রয় অধিক রূপা করিলেন। অতঃপর তাহাকে তিনি চৌদ্দ হাজার মেঘ, ছয় সহস্র উষ্ট্র, এক সহস্র জোড়া বলদ এবং এক সহস্র গর্দভ এবং ১১ জন পুত্র এবং তিন কন্যা প্রদান করিয়া সুখী করিলেন।

কিন্তু হিজ্রাব সকলে জোবেব ন্যায় ঈশ্বরানুগত ছিল না। অধিকাংশ ব্যক্তির ঈশ্বরের নিয়ম সকলে তাচ্ছিল্য করিয়া হস্ত নির্ম্মিত মূর্ত্তি পূজা এবং মানা প্রকার অহিতাচরণ করিতে লাগিল। ঈশ্বর তাহাতে ক্রোধিত হইয়া হিজ্রদিগের দুর্গতি করিতে আবিস্ত করিলেন। পারস্যস্থানের রাজা তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের বহুলোককে বান্ধিয়া লইয়া আপন রাজ্য মধ্যে তাহাদিগকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিলেন। দাউদ ও সলেমান রাজার পূর্বে

এবং হিজ্রা-দিগের নির্বাসনের সময় ঈশ্বর তাহাদের শাসনের নিমিত্ত কোহুয় ইলাইজা, ইলাইসা, জেরিমিয়া, ইজিকিয়েল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তিকে আদৌ-
কিক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কোহুয় এক যুগ
ঈশ্বরের আজ্ঞামতে অনেককণ পর্য্যন্ত স্বর্গ ও চন্দ্রকে ঠিক এক স্থানে
দণ্ডায়মান করিয়া রাখিয়াছিল, এবং যে পর্য্যন্ত শত্রুরা পরাজিত না হই-
য়াছিল, সে পর্য্যন্ত ঐ দুই গ্রহ বিমানে তাহাদের নিয়মিত গতি পরিচালন
কবিত্তে পাবে নাই। এই ব্যক্তির আজ্ঞায় জর্ডান নামক নদীর জলও
এক স্থানে শুক হইয়াছিল এবং সেই শুক স্থান দিয়া প্রক্ট সৈন্য পরি-
হটলে, পবে নদী পুনরায় স্রোতস্বতী হয়। ইলাইজা নামক আর একজন
ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল, সে শত্রু ভয়ে এক জঙ্গলেব মধ্যে পলায়ন কবিলে পবে,
সেই স্থানে কতকগুলি কাকে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত চৌটে করিয়া খাদ্য দ্রব্য
এবং জল বোপাইয়া তাহাব প্রাণ রক্ষা কবিয়াছিল। কিন্তু এই ব্যক্তি
কিহুগে কাকের মুখেব আশীস্ত দ্রব্য আহাব ও পান কবিত্তাছিল, তাহা
আমি বুঝিতে পারি না; কাবণ বাক অপবিত্র পক্ষীব মধ্যে পবিগণিত এবং
অপবিএ পণ্ড পক্ষীব স্পৃষ্ট দ্রব্য সকল ব্যবহাব কবিত্তে ঈশ্বর স্বয়ং সেনাই
পর্ষতে মুসাকে নিষেধ কবিয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয়, আমাদের মধ্যে
প্রচলিত “আতুবে নিয়মো নাস্তি” বিধি এই অবস্থায় অবলম্বিত হইয়াছিল,
কিহা ইলাইজা পুনরায় লোকালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া বিধি১ত প্রারম্ভিত
কবিত্তা তাহাব এই অনিবার্য্যাপাপ খণ্ডন কবিত্তাছিল। কিন্তু বাইবেলে
তাহাব কোন নিদর্শন নাই, ইহা কেবল আমাব অহুমান। ইলাইসা
নামক আর এক ভবিষ্যদ্বক্তা আমাদের দর্শাসা মুনির ন্যায় অত্যন্ত
নাগাঙ্ক পুরুষ ছিলেন। তাহাকে দেখিয়া এক দিন বেথেল নগরেব ৪০ জন
বালক তাহাকে “নেড়া নেড়া” বলিয়া ববতালী দিয়াছিল, এবং উপহাস
কবিত্তাছিল, সেই জন্য তিনি তাহাদিগকে অভিসম্পাত করেন এবং সেই
অভিসম্পাতের ফলে জঙ্গলের মধ্যে হইতে দুইটা ভল্লুকী আসিয়া
চল্লিশটা শিশুকে ভক্ষণ কবিত্তা ফেলিয়াছিল।

হিজ্রা তাহাদের ঈশ্বরের নিয়ম সকল লঙ্ঘন করার ফলে বহু কষ্ট
পাইলেও তাহাদের জ্ঞানের উদয় হইল না এবং ক্রমে তাহারা অধিক
হইতে অধিকন্তর পাপ এবং ভ্রষ্টের রত হইতে লাগিল। সেই পাপে

অবশেষে তাহাবা তাহাদের দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া পৃথিবীর নানা দিগে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। অন্য জাতীয় লোকে তাহাদের ঈশ্বরের প্রেরিত জুডিয়া দেশ অধিকার করিয়া মুলেমান বাজাব নির্মিত মন্দির ভাঙ্গিয়া তদ্ব্যবস্থিত মূল্যবান দ্রব্য সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল। মুসলমানেরা যেমন হিন্দুদিগের দেব মন্দির সমস্ত পাদদলিত করিয়াছিল, জেরুসালামের এই প্রসিদ্ধ মন্দিরকে ভাঙিয়াও তজ্ঞপ হইয়াছিল; এক্ষণে তাহাব ভয়াবশেষ পর্য্যন্তও নির্ণয় করা বঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান সময়েও হিব্রুদিগের জুডিয়া দেশ অন্য জাতীয় এবং অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের শাসনাধীন হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু হিব্রুদিগের মধ্যে এক ভবিষ্যদবাণী আছে যে হিব্রুদিগের শাস্তি এবং তাহাদের চরমসীমা উপস্থিত হইলে, তিনি একজন মেসাইয়া অর্থাৎ জ্ঞানকর্তা পাঠাইয়া হিব্রুদিগকে প্রেরিত করিয়া, পুনরায় তাহাদের মধ্যে পুণরায় বিবাহ করিবেন এবং অদ্য হইতে ১৮৮৭ বৎসর পূর্বে যীশুখ্রীষ্ট নামক একজন হিব্রু জুডিয়া দেশে উপস্থিত হইয়া প্রচার করেন যে, তিনিই সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু হিব্রু তাহাকে ঈশ্বর প্রেরিত মেসাইয়া বিস্মা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিল না এবং তাহাব বিব্রঙ্কাচরণ করিয়া তাহাকে শূলে দিয়া বধ করাইল। হিব্রু বলে যে ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত মেসাইয়া এখনও পৃথিবীতে আবির্ভাব হয় নাই, কিন্তু তিনি যে এক সময়ে আসিয়া ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সমগ্র রূপে পূর্ণ করিবেন, তাহাব কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সেই নিমিত্ত ইউরোপ খণ্ডে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পবে ইউরোপবাসী খ্রীষ্টিয়ানদিগের হস্তে বহু শতাব্দী ধরিয়া হিব্রু অনেক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরাচরণ ভোগ করিয়াছিল। খ্রীষ্টিয়ানদিগের গৃহেব নিকট হিব্রুরা বাস করিতে পারিত না, নগরে খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাসস্থানের দূরে হিব্রুদিগের বস বাসের নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। খ্রীষ্টিয়ানেরা হিব্রুদিগকে স্পর্শ করিলে পাপ বিবেচনা করিত। হিব্রু দেখিলে খ্রীষ্টিয়ানেরা তাহার গাত্রে নিষ্ঠীবন উদ্দীপণ করিয়া নিক্ষেপ করিত। টাকার প্রয়োজন হইলে বাজারা ধনাঢ্য হিব্রুদিগের নিকট ধন বাহিব করার নিমিত্ত তাহাদিগকে নানা রূপ জালা যন্ত্রণা দিত, এমন কি

হস্ত পদ বন্ধন করিয়া অগ্নিব উপবে কাষাবেন নায় ক্রমে দগ্ধ করিত। এইজন্য হিজ্রা ধনবান হইলেও সর্বদা মলিন ও চিন্ন বস্ত্র পবিধান করিয়া অতি জঘন্য অবস্থায় কাল যাপন করিত। কারণ খ্রীষ্টিয়ানদিগের মনে যদি কিছুমাত্র সন্দেহ হইত, যে অমুক হিজ্রাব ধন আছে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া ধন পাঠিবাব নিমিত্ত স্বল্পণা দেওয়া হইত। যদি কোন হিজ্রা বমণীক রূপে কোন খ্রীষ্টিয়ান পুরুষ আকর্ষিত হইত তাহা হইলে সেই পুরুষের বন্ধু বান্ধবেরা বিবেচনা করিত যে হিজ্রা বমণী কোন রূপে অভিচার কিম্বা জাদু করিয়া খ্রীষ্টিয়ান পুরুষের মন ভুলাইয়াছে অতএব সেই স্ত্রীলোককে তাহাবা জলে ডুবাইয়া নচেৎ অগ্নিতে পোড়াইয়া মারিত। হিজ্রাব প্রকাশ্যরূপে কোনও স্থানে তাহাদের ঈশ্বরের মন্দির স্থাপন কিম্বা তাঁহাব উপাসনা অথবা পক্ষাহ দিনে কোন উৎসব করিতে পারিত না। হিজ্রাদিগের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিতে খ্রীষ্টিয়ানেরা কিছুমাত্র পাপ দিখা ছাড়া বিবেচনা করিত না। বরং খ্রীষ্টিয়ান পাদবিবা এই সকল কার্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিতেন যে, এই জাতিকে নির্ধাতন করিলে ঈশ্বরের সমস্ত কৰা হয়। এক্ষণেও কমিয়া, অস্ত্রিয়া, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি দেশ হিজ্রাদিগের প্রতি খ্রীষ্টিয়ানের শত্রুতা এবং বিদ্বেষ ভাবের হাস হয় নাই। কিন্তু ধন্য হিজ্রাজাতি। কি চমৎকার এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও দাঢ়্যতা সহকারে অদ্য দেড় হাজার বৎসর যাবৎ তাহাবা নিজ দেশ হইতে পবিতাক্ত হইয়া পৃথিবীর দেশ দেশান্তরে ছত্রভঙ্গ হইয়া অকথ্য এবং অসীম ক্লেশ যন্ত্রণা এবং অপমান ভোগ করিয়াও নানা কৌশলে আপনাদের জাতীয় ধর্ম রক্ষা ও জাতীয় আচার ব্যবহার পালন করিয়া আসিবাছে এবং দ্বিভাষে ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত সেই মেসাইবাব আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ইংরাজীতে হিজ্রাদিগের আর এক নাম “জু এবং এই বাক্য ঘণা ব্যঞ্জক হইলেও ইহা যেমন রূপণের তেমন ধন্যমানেরও উপমা। ফলত পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেতেই হিজ্রাজাতীয় লোকেরা বিপুল ধনবান। অন্যান্যদের কলিকাতায় এজবা ও গবাই এবং বোম্বাইয়ে সাস্ত্রন নামক হিজ্রা আফিমের ব্যবসাব বাজা এবং ইউরোপ খণ্ডে রথচাইল্ডের বংশ শত শত কোটি মুদ্রাব অধিকারী। এমন বাজা কিম্বা বাজ্য নাই যাচারা রথচাইল্ডের

নিকট গুলী নহেন। এমনও প্রবাদ আছে যে ইউরোপ ধণ্ডে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রথচাইল্ডের বংশ ইচ্ছা করিলে যুদ্ধের ব্যয় বন্ধ করিয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে পারে।

মুসলমানদিগের প্যাগম্বর মহম্মদও সেই ভবিষ্যদ্বাণী অবলম্বন করিয়া গীত্তখীষ্টের ছয় শতাব্দী পাবে আবাব দেশে আপনাকে মেসাইয়া বলিয়া নূতন এক ধর্ম প্রচাৰ করেন। ফলে খ্রীষ্টিয়ান ও মহম্মদীয় উভয় ধর্মের মূল ভিত্তি হিক্রদিগের এই ধর্ম পুস্তক ও মূসার আইন। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে খৃষ্টান ও মহম্মদীয়দিগের মধ্যে প্রভেদ এই যে খৃষ্টানেবা হিক্রদিগের ধর্ম পুস্তক তালমদ গ্রন্থকে যথার্থ পুৰাতন বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং তাহাতে যাহা লিখিত আছে তাহাই সত্য এবং অথওনীর ইতিহাস স্বরূপে জ্ঞান করেন, কিন্তু মহম্মদ নাকি বলিয়াছেন যে যদিও তালমদের কথা সত্য তথাপি তাঁহার কৃত কোবাণই অন্যান্য পুৰাতন কেতাবের পরিবর্তে গ্রহণীয় এবং তদপেক্ষা অধিক বিশ্বস্ত এবং মনুষ্যের অধিকবর্ণীয়। মুসলমানেবা বলেন, যে ততক্ষণ মহম্মদেব কোবাণ প্রচাৰিত না হইয়াছিল, ততক্ষণ উপরি উক্ত পুস্তক সকল কার্য্য-কাবক ছিল বটে, কিন্তু কোবাণ লিপিবদ্ধ হওয়ার পাবে কোরাণের সমক্ষে মনুষ্যের অন্য কেতাব বিশ্বাস কবাব আবশ্যক নাই। মুসলমানদিগের ধর্ম সম্বন্ধে আমাব এই স্থলে কিছু বলিবাব নাই, যাহা কিছু বলিব তাহা খৃষ্টান সম্বন্ধেই বলিব।

যাহাবা যীশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্বের উপর বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের হিক্রদিগের এই পুৰাতন ধর্ম পুস্তক সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ব্যতীত উপায় নাই, কাবণ পুৰাতন বাইবেলের উপবেষ্ট যীশুখৃষ্টের দেবত্ব নির্ভর কবে। কিন্তু খ্রীষ্টানেরা বলিতে পাবেন যে যীশুখৃষ্ট এক নূতন ধর্ম প্রচাৰ করিয়াছেন। করুন, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই কিন্তু তাহা বলিয়া পুৰাতন বাইবেলে যে সকল বিধি ব্যবস্থা আছে তাহা খ্রীষ্টানেবা অসত্য কিম্বা পাপ জনিত বলিতে পারেন না। এবং ইহাও তাঁহাদিগকে স্বীকাৰ কবিতে হইবে যে হিক্ররা যদি তাহাদের ঈশ্বরের আজ্ঞা সকলে অবজ্ঞা না কবিত এবং ঠিক ঠিক তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী হইয়া কার্য্য করিত, তাহা হইলে যীশুখৃষ্টের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার আবশ্যক হইত না; কারণ ইহাই বাইবেলের মর্ম যে ঈশ্বর তাঁহার স্বেচ্ছের পাত্র হিক্রদিগের সঙ্কল্প এবং পরিব্রাজকের নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় পুত্র

যীশুকে জুড়িয়া দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং পুণাতন বাইবেলের লিখিত ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল যে পবিত্র এবং পুণ্যেব আকর তৎপ্রতি জীর্ণান দিগের কোন সন্দেহ হইতে পাবে না। এখন অপকৃপাতী পাঠক দেখুন দেখি আমাদের পূর্ব পুরুষদিগের বচিত্ত বিধি ব্যবস্থা ও আচাৰ ব্যবহারের সহিত যীশুখৃষ্টেব পূর্ব পুরুষেব বিধি ব্যবস্থা এবং আচাৰ ব্যবহারের কতটুকু প্রভেদ আছে এবং খৃষ্টিয়ানেবা যে আমাদের কার্য্য সকল দেখিয়া তাঁহাদের নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাহাই বা কতদূর ন্যায় সঙ্গত ?

ঈশ্বৰ হিজ্রদিগকে আমাদের ন্যায় অগ্নি দ্বাৰা হোম যজ্ঞ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তবে আমবা ঘৃত দ্বারা আহুতি দিয়া থাকি, হিজ্রবা মাংস দিয়া আহুতি দিত। আমাদের মধ্যেও বাহ কেতুব যজ্ঞে মাংসের আহুতি দেওয়া হয়। আমাদের বালকদিগের আমবা কর্ণবেধ কবি, হিজ্রবা স্তন্যত করে। আমাদের স্ত্রীলোকেবা স্তন্যতুমতী হইলে এবং সন্তান প্রসব করিলে আমবা তাহাদিগকে কয়েক দিবসেব নিমিত্ত অন্তচি এবং অপবিত্র জ্ঞান কবি, হিজ্রদিগেব মধ্যেও স্ত্রীলোকের সেই ব্যবহাৰ আছে। আমাদের দেশে পূজাব নিমিত্ত ব্রাহ্মণবংশীয় লোকেবা নিয়োজিত আছে, হিজ্রদিগের মধ্যেও ঈশ্বৰ এবনেব বংশোদ্ভব বাক্তাদিগকে তাঁহাব পূজায় নিযুক্ত কবিয়া ছিলেন। আমাদের মধ্যে বিধি আছে যে ব্রাহ্মণেরা গুচি ও পবিত্র হইয়া থাকবে, এবনেব সন্তানগণের উপবেও তদ্রূপ আদেশ আছে, বিশেষতঃ এরনেব সন্তানদিগকে ঈশ্বৰ বিধবা কিম্বা অসতী স্ত্রী বিবাহ কবিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ কবিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে যীশু খৃষ্টেব পিতা বিধবা এবং অসতী স্ত্রীলোককে বিবাহ কবা একই প্রকাৰ অপবিত্র কার্য্য বিবেচনা করিতেন। আমাদের খাদ্যাখাদ্যেব বিচারেব ন্যায় হিজ্রদিগের আহারের নিমিত্ত ঈশ্বৰ কতিপয় পশু এবং জীব নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহার্য্য যদিচ্ছা অহার করিতে পাবে না। হিন্দুদিগের পূজাব সময় ধূপ ধূনা পোড়াইবাব ও দীপ জ্বালাইবাব প্রথাব ন্যায় হিজ্রদিগের মধ্যেও ঠিক সেই ব্যবহাৰ আছে। আমাদের মধ্যেও যেরূপ বুখা মাংস ভক্ষণেব নিষেধ আছে, হিজ্রদিগকেও তদ্রূপ ঈশ্বৰ বুখা মাংস খাইতে বারণ করিয়াছেন। আমাদেরও যেমন চতুর্মাস্য্য ব্রত করিবাব নিয়ম আছে নহস' পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়েও ঈশ্বৰ হিজ্রদিগকে ব্রত কবিবাব নিয়ম কবিয়া দিয়াছেন।

মৃতদেহ স্পর্শ করিলে আমাদের ন্যায় হিজ্রাও কয়েকদিবস অশুচি থাকিয়া পরে স্নান ও কোব কর্ম করিয়া শুচি হয়। আমাদের মধ্যে পাণী এবং নির্দোষী নির্দোষের নিমিত্ত অগ্নি এবং অন্যান্য দৈব পবীক্কাব ন্যায় তাহাদের মধ্যে সেইকপ করিতে ঈশ্বর উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে যে পূর্ককালে নহুষ্যেব দীর্ঘাযু ছিল, বাইবেলেও ঠিক তাহাই দৃষ্টি হয়। মানবেব যুদ্ধে আমাদের দেবতাবা আসিয়া অনেক সময় যোগ দান কবিয়াছিলেন, হিজ্রদিগেব পূজিত ঈশ্ববও তাহাদিগকে সহায়তা কবিয়া তাহাদেব শত্রু নিপাত কবিয়াছিলেন। পূবাতন বাইবেল পাঠ ববিলে কেবল হস্ত নির্মিত মূর্ত্তি সকল ঈশ্বব স্বকপে পূজা কবাব শ্রথা ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে হিজ্রদিগেব আচাব ব্যবহার হিন্দুব আচার ব্যবহাবেব সদৃশ বলিয়া দৃষ্ট হইবে। ইহাব মধ্যে হিজ্রদিগেব আবাস্য ঈশ্বর কি হিন্দুব ঈশ্বব সত্য, আমি তদ্বিষয়ে তর্ক কিস্বা মীমা সা এই স্থানে কবিতে ইচ্ছা কবি না। আমি কেবল এই মাত্র বলিতে চাহি যে আমাদের যে সবল আচাব ব্যবহার দেখিয়া এক্ষণে সভ্যতাভিনানী ব্যক্তিবা ঘৃণা ও উপহাস ববেন, তাহা এক সময়ে য়ীশু খৃষ্টেব পিতা ঈশ্ববকত্বক অনুমোদিত ছিল এবং িজ্রা তাহা অতিক্রম কবিয়া অন্য আচাব ব্যবহার অবলম্বন কবাতেই পৃথিবীতে য়ীশু খৃষ্টেব আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু আমরা পৌত্তলিক আমবা জান যে পরমেশ্ববেব নিয়ম ও বিধি সমস্ত অখণ্ডনীয় এবং চিবস্তায়ী, আমাদের বড় লাট কৌন্সিলেব আইনেব ন্যায় পবিবর্ত্তনশীল নহে, তবে কি কাবণে মুসার আইন সকল যাহা ঈশ্ববেব স্বীয় অন্তস্তামতে বিধিবদ্ধ এবং প্রচাবিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাব পুত্র য়ীশু খৃষ্ট পবিবর্ত্তন কবিলেন, তাহা আমাব ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুকিতে পারি না। আমি সাহেবদিগেব কথা ধবি না, কাবণ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম তাহাদেব পৈত্রিক ধর্ম্ম এবং তাহা সমর্থনেব জন্য তাহাবা অনেক কথা কহিতে পাবেন এবং কহিয়াও থাকেন, কিন্তু আমাদের দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগেব উচিত যে আমাদের আচাব ব্যবহাব পবিত্যাগ কিস্বা নিকা করার পূর্কে, সাহেবদিগেব ধর্ম্ম পুস্তক গুলি আদ্যোপান্ত যত্নেব সহিত পাঠ করিয়া দেখেন এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচাবকগণেব বাক্যে মোহিত হইয়া নৃত্য না করেন।

হিন্দু ধর্মের সংস্কার।

প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর।

(আজ প্রায় চাবি বৎসর হইল বাঙ্গালায় নব ধর্মযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রাচীন ও নব্য হিন্দুসম্প্রদায় মিলিয়া নিশিষা এই শুভ কণ্ঠের অনুষ্ঠানে প্ররুত হইয়াছেন। বিষ্ণু নান্দালী হিন্দুজাতির দুর্ভাগ্যক্রমে এই শুভ সংযোগে বিযোগ ঘটিবাব উপক্রম হইয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায়ের দোষে কি নব্য সম্প্রদায়ের বৃষ্টতাব, একপ দলাদলি ঘটিতেছে, তাহা এখনও সাধারণে বুঝিতে পা ব নাই। অথচ এই দলাদলি কোন সম্প্রদায়ের দোষে ঘটিয়াছে, অথবা উভয় দলেবই অল্প বিস্তর দোষ আছে কি না, তাহা না বুঝিলে উভয় দলেবই শুভ অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত হইবে।) আমবা হিন্দুসন্তান, প্রাচীন কি নব্য দলের খাতায় নাম না লিখাইলেও, এ দলাদলিতে আমাদেব অনিষ্ট আছে। তাই বিগত আষাঢ় মাসেব নবজীবনে প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় কর্তৃক হিন্দুধর্মের সংস্কার নামধেয় একটা প্রবন্ধ লিখিয়া, কি প্রাচীন কি নব্য উভয় দলের নেতাগণকেই তুল্যরূপে কয়েকটা কথা বলি।

আমি মনে কবি নাই যে আমাব সেই অকিঞ্চিংকর প্রবন্ধ কোন সম্মুখ পাঠক বা লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিলে। কিন্তু আমার সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বিগত ভাদ্রমাসেব নবজীবনে এবজন বিস্তৃত বিচক্ষণ লেখক আমাকে কয়েকটা উপদেশ দিবাব জন্য হিন্দুধর্মের সংস্কার নামক একটা প্রবন্ধ লিখিয়া আমার অশেষ ধন্যবাদেব পাত্র হইয়াছেন। লেখক, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিবও যে সময় সুলভ ক্ষরণের পক্ষপাতী, ইহাও আমাব পক্ষে পবম সৌভাগ্যেব বিষয় বলিখা মনে কবি। লেখক মহোদয় আমার লিখিত প্রবন্ধেব সংপ্রতিবাদ করিতে গিয়া, পবিশেষে একটু সৌজন্য বক্ষা করিয়া বলিখাছেন, ‘আমি প্রতিবাদ করিতে এটা প্রস্তাবেব অবতারণা কবি নাই।’ আমিও তাঁহাব সংপ্রতিবাদে পবম সহৃষ্ট হইয়া বলিতেছি। লেখক যদি আমাব প্রবন্ধেব অনেক কথাই উল্টা না বুঝিতেছেন, এবং উল্টা বুঝিয়া নবজীবনের পাঠকমাত্রকেই উল্টা বুঝাইবাব চেষ্টা না করিতেন, তবে

আমাকে এই অসার প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে হইত না। প্রাচীন ও নব্যসম্প্রদায় কর্তৃক হিন্দুধর্মের সংস্কার এক্ষণে কি ভাবে চলিতেছে, তাগাতে সাধারণের মতিগতি প্রধানত কোন্ দিকে ঘাটতেছে, আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাই উত্তম দলের নেতাগণকে বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিতাম।

কিন্তু আমি বাংলা বলিয়াছি তাহাই যদি সকলে উল্টা বুঝিল, তবে আমার আর লেখনী ধারণ বৃথা পশুশ্রম মাত্র। লেখক আমার প্রবন্ধের যেমন ভাব বুঝিয়াছেন, প্রাচীন ও নব্যদলের নেতাগণও যদি সেইরূপ বুঝেন, তবে আমার অরণ্যেই ধোঁহন হইয়াছে বলিতে হইবে। এজন্য আমার প্রবন্ধের ভাব লেখক যে উল্টা বুঝিয়াছেন, আমি তাহাই যথাসাধ্য প্রদর্শন করিব। তরঙ্গা করি লেখকও আমার অদ্যকার বক্তব্য বিষয় গুলি বিশেষ বিবেচনা করিয়া বুঝিয়া নবীন ও প্রবীণ সম্প্রদায়ের নেতাগণের সম্মিলনের জন্য, আমারই ন্যায় সকলের দ্বারে দ্বারে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিবেন।

বিভিন্ন লেখক, প্রাচীন ও নব্য হিন্দুসম্প্রদায়ের ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে যেরূপ বুঝিয়াছেন সেইটাই আদৌ উল্টা। তিনি লিখিয়াছেন,—‘নব্যেরা অন্য ধর্মের সহিত যোগ করিয়া হিন্দুধর্মের কলম বাঁধিতে চান; হিন্দু প্রাচীন দল তাহাতে বিরূপ, তাহার ধর্মবাক্যের কেবল পরগাছা কাটিতে চান।’ লেখক কি জানেন না শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রধান উদ্দেশ্য এবং সম্পূর্ণ ইচ্ছা, হিন্দু ধর্ম চিরকাল যেরূপ ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, সেই ভাবেই ইহাকে রক্ষা করা। তবে আজ কাল হিন্দুধর্মের গূঢ় তাৎপর্য সকলে বুঝিতে পারে না; এইজন্য তিনি হাঁচি, চীকটাকি হইতে স্নান, শরন, ভোজন প্রভৃতি হিন্দুর বাবদীর লোকাচারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন, যে, হিন্দুর আচার ব্যবহার বাহা কিছু আজ কাল (প্রাচীন সম্প্রদায়ের মতো) প্রচলিত আছে, তৎ সমস্তই ধর্মমূলক, তাহার কোনটাই পরিত্যজ্য নহে। ‘নব্যহিন্দুসম্প্রদায়ের নেতা বহির্ম বাবুর উপদেশের তাৎপর্য এই যে ‘ধর্মই ধর্ম, আচার ধর্ম নহে’ * * * হিন্দুধর্ম মানি, হিন্দুধর্মের বখামি মানি না * * * হিন্দুধর্মের ভিতরে আজ কাল অনেক ভেল মিশ্রিত হইয়াছে। সেই সকল উপধর্মকে কাটিয়া ছাঁটিয়া

বিষয় যে হিন্দুধর্ম তাহাই সকলের গ্রহণীয়।' পরন্তু বেদব্যাশ্রয়ের হুঁচনাতেই কৃষ্ণ বাবু বলিয়াছেন, "কাটিয়া ছাটিয়া হিন্দুধর্ম সংস্কারের আমরা পক্ষপাতী নহি। হিন্দুধর্ম বৃক্ষ চিরকাল যেমন আছে সেটরূপই রক্ষা করিয়া, তাহার আপন গুলিকে দূর করাকেই আমরা প্রকৃত সংস্কার বলি।" এখন বিজ্ঞ লেখক যখন দেখি, কোন দল স্বধর্ম বৃক্ষের কেবল পরগাছা কাটিতে চান? আমরা দেখিতেছি প্রাচীন ও নবীন উভয় দলই পরগাছা কাটিতে চান। (তবে প্রবীণ দল খৃষ্টিয়ান ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করাই পরগাছা কাটিয়া স্বধর্ম বৃক্ষকে রক্ষা করা বলেন; নব্য সম্প্রদায়ের নেতাগণ খৃষ্টিয়ান কি ব্রাহ্ম দলের ত কবাই নাই, বর্তমান হিন্দুধর্মের ভিতর হইতেও কুসংস্কারগত উপবর্ষ গুলি, বাহ্য হিন্দুধর্ম বলিয়া সাধারণ হিন্দু সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তৎসমস্তকেই বিদ্যায় দিয়া স্বধর্ম বৃক্ষকে পরিচায়ভাবে সাধারণের হৃৎকেন্দ্রে বিদ্যমান রাখিতে চান। লেখক এই মত-বস্তুকে পূর্বপশ্চিমাভিমুখীন বলিয়াছেন। এই মতদ্বয়ের সম্মিলন অসম্ভব বলিয়াছেন।) দুলভ দেখিতে গেলে নবীন ও প্রবীণ দলের ত্রিমুখিত্ব ধর্মসংস্কারের পথ বিপরীত পথ-মুখীন সন্দেহ নাই। কিন্তু চিন্তাশীল, নিরপেক্ষ হিন্দু, বাহারা উভয়দলের নেতাগণকেই তুল্যরূপে ভক্তির চক্ষে দেখেন, তাহারা বুঝিয়াছেন, প্রাচীন ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণের অনান্য বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও, একটা বিষয়ে সম্পূর্ণ মতের ঐক্য আছে। আমরাও বিশ্বাস এবং তরঙ্গা করি, প্রাচীন ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণের একতার সেই সূত্রগাছি বিচ্ছিন্ন না হইলে কালে উভয়দলের নেতাগণের ধর্মমত পার্থক্য বিদূরিত হইয়া, একট পথে পরিচালিত হইবে। সেই মতটী 'চিন্তা ও চিহ্ন'। আমরা বতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে এই বোধব্যব, প্রাচীন সম্প্রদায়ের নেতাগণ সম্রাটের দ্বারা এই চিন্তাচিহ্ন সাজের উপায় বলিতেছেন; নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণ, চিন্তাচিহ্নকেই ধর্ম বাক্যের ভিত্তি বা লোপান বলিয়া, সম্রাটকে তাহার সহকারী করিয়া, ধর্মের সহজ পথে অগ্রসর হওয়ার উপদেশ দিতেছেন। তবে কেহ কেহ 'ধর্মই ধর্ম, আচার ধর্ম নহে' এই কথাটি দেখিয়াই চমকিয়া উঠিয়া থাকেন, অব্যবস্থাপূর্ণ সম্রাটকে কর্মনাশার নিক্ষেপ করিয়া অন্য ধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মের যোগ করিয়া একটা মন বড়া ধর্ম সংস্কার কার্যে প্রতী হই-

রাছেন । নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণের উপদেশের আগাগোড়া না পড়িয়া অনেকই এই উদ্ভট সিদ্ধান্ত করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বীরেশ্বর বাবুর সম্পাদিত পত্রিকা বিশেষে এ কথা স্পষ্ট বর্ণাইলেনও, কেহ সে দিকে তাকায় নাই । সকলেই হট্টগোল করিতেছেন । বাঁহারা বুদ্ধিমান এবং নিরপেক্ষ হিন্দু, তাঁহারা সকলের সকল কথাই কাণ পাতিয়া শুনিতেছেন । হট্টগোলে যোগ দিতেছেন না । বলা বাহুল্য তাঁহারা এই হট্টগোল মধ্যেও প্রোক্ত চিন্তাশক্তি বাক্যের একতা দৃষ্টে সন্মিলনের ছায়া দেখিতেছেন । এই শ্রেণীর হিন্দুগণ বুঝিয়াছেন, উভয় দলেরই উদ্দেশ্য এক, পথও এক ; তবে মাঝে একটা ত্রিপথের সম্মুখে আসিয়া উভয় দলের নেতাগণই দাঁড়াইয়া সোজাপথ নির্ণয়ে ব্যগ্র হইয়াছেন । পূর্বেই বলিয়াছি, প্রবীণ ও নবীন দলের নেতাগণের মতের একতার সেই ক্ষুদ্রটি ছিন্ন না হইলে, কালে অবশ্য সন্মিলন হইবে ? মতানৈক্য কালে মিটিবে না, কে বলিল ? (১) তবে যে সকল স্বৈচ্ছাচারী শিক্ষিত তাঁহাদের মনোমত একটা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুমাঝ গড়িয়া লইতে চান, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র । তাঁহাদের সহিত যে প্রবীণ সম্প্রদায়ের একতা বন্ধন প্রকৃতি বিরুদ্ধ, তাহা আমিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি । বোধ হয় নব্যসম্প্রদায়ের নেতাগণও প্রোক্ত মতাবলম্বীগণের মতকে মনে মনে উপেক্ষাই করেন । তবে কি না 'ঠক বাচ্চিতে গাঁ উজার' বলিয়াই প্রকৃত নব্যহিন্দুসম্প্রদায়ের নেতাগণ ইহাদিগকে কিছু বলেন না । বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর শিক্ষিতগণের ধর্ম মতের ভিত্তি স্থাপনোদ্দেশ্যেই প্রচারে ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা আবিস্কৃত হইয়াছে । এবং নবজীবনের 'ধর্ম জিজ্ঞাসা' ও 'উদ্ভট কথা' শীর্ষক ত্রবন্ধীয় ক্রমশঃ প্রকাশিত

(১) তবে কোন কোন পণ্ডিত যে বলেন, বৈদিক কালে যখন "অগ্নিমিলে পুরোহিতঃ" ইতি প্রথম ঋকের সৃষ্টি হয় তখন ভারতবাসী যেক্রম সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, তেমন সভ্য আর হয় নাই । ক্রমেই ঋষিগণ স্থূল বুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন । ব্যাস, জৈমিনি প্রভৃতি বৃদ্ধদর্শনকার এবং ভগবদ্গীতাকারও সেক্রম হৃদয়বুদ্ধি প্রাপ্ত হন নাই, একালের চৈতন্য, রত্ননাথ শিরোমণি শঙ্করাচার্য্যের ত কথাই নাই । এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের সহিত নব্যদলের যে মিল হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য । ১১

হইতেছে। এই শ্রেণীকে শিক্ষা দানে নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণ যেমন কৃতকার্য হইবেন, প্রাচীন দলের নেতাগণ তেমন সমর্থ হইবেন না। কেননা প্রাচীন দলের নেতাগণের কথা এই শ্রেণীর শিক্ষিতগণের হৃদয়স্পর্শী হইবে না। অপিচ প্রাচীন দলের নেতাগণের উপদেশ যেমন প্রাচীন হিন্দুদল আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন, তেমন নব্যদলের নেতাগণের ধর্ম ব্যাখ্যায় ফল দর্শিবে না। এই জন্যই আমি সকল শ্রেণীর লেখকগণের একত্র সম্মিলনে সম্পাদিত একখানি পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। তদ্বিন্ন নবজীবন বিদ্যমান, বেদব্যাসের আবির্ভাবে আমাদের লাভ ভিন্ন কতি কি?

প্রজ্ঞাপদ লেখক বলিয়াছেন ‘চন্দ্রমোহন বাবু নবজীবনের ভূমিকায় মুগ্ধ হইয়া ভাবিয়াছিলেন ‘এইবার বুঝি নবীনে প্রবীণে প্রীতি হইবে’ ইত্যাদি ‘কত সুখ দেখিয়াছিলেন।’ নবজীবনের পার্থক্যমাত্রই জানেন, আমি নবজীবনের ভূমিকায় মুগ্ধ হইয়া নবীনে প্রবীণে মিলনের আশা করি নাই। নবজীবনের ভূমিকায় (সূচনায়) নবীনে ও প্রবীণে সম্মিলনের কোনই আভাস ছিল না। নবজীবনের অগুষ্ঠান পক্ষে লেখকগণের নাম দেখিয়াই সকলে নবীনে ও প্রবীণে মিলনের পূর্বাভাস বুঝিয়াছিল। আমি আমার প্রবন্ধের ভূমিকাতেই সে কথা পরিকার ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছি। লেখক আমার এই কথা যেমন বুঝিয়াছেন, অনেক কথায় সেইরূপ উল্টা বুঝিয়াছেন। তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

লেখক আগা গোড়া যুক্তি তর্কের দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,— এবং স্পষ্টত বলিয়াছেন, “একটু আকাশ পরিষ্কার হইবার ঘো হইয়াছিল। সম্মিলনের কিরণ অল্প মেঘাবৃত হইলেও দ্রবং বিকীর্ণ হইতেছিল, অমনি কোথা হইতে রমেশ-মেঘে আকাশ ছাইয়া পড়িল; সেই সময়ে সকলের আশা সমূলে উৎপাটিত হইল।” কিন্তু সকলেই জানেন, নবজীবনের প্রথম বৎসর, নবীনে প্রবীণে সম্মিলনের কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই। কেবল পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের একটি প্রতিবাদ মূলক এবং ভিন্ন শব্দগুণ তর্কচূড়ামণি প্রকৃতি প্রাচীন দলের নেতা ও পাণ্ডুরগণের লিখিত কোন প্রবন্ধ প্রথম বৎসরের নবজীবনে প্রকাশিত হয় নাই। আমরা যে মাসেই নবজীবন পাইয়াছি, শুধুনই আগ্রহের সহিত খুলিয়া অগ্রে দেখিয়াছি,

পণ্ডিত নশ্বর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের কোন প্রবন্ধ আছে কি না? কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিত যতুলী এক বৎসরকাল আমাদের পে আশা পূর্ণ করিতে যত্নশীল হন নাই। রমেশ মেধে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, নবজীবনের দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম সংখ্যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে চূড়ামণি মহাশয়ের সেই প্রবন্ধও সেই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। আমরা বুঝিতে পারি নাই, রমেশ বাবুর ঋষিদের দেবগণ শীর্ষক (প্রথম) প্রবন্ধে এমন কি তীব্র তীক্ষ্ণ ছিল যে, সেই খোঁচাতেই কাল নশ্ব সূত্র প্রাচীন পণ্ডিতগণ গর্জন করিয়া উঠিলেন। স্বর্গীয় বাবু রামদাস সেন বহন বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন—‘সোমরস এবং গোমাংসের প্রশংসাপুস্তক মত্রে যে কল্পিত আনন্ড হয় তাহা বলিতে পারি না’ (২)। তখন প্রাচীন পণ্ডিতগণকে ত গর্জন করিতে তনি নাই। না, তখন বঙ্গীয় গগন ঘোর অমানিশার আচ্ছন্ন ছিল; নশ্বরের কিরণে তখন বাতলা আকাশ উজ্জ্বল হয় নাই। বিব হীন নশ্ব সকল, ইতস্তত বিবরে মুখ তুলিয়া ছিল, গর্জন করিবে কি? কালের গতিতে সব হয়। রামদাস বাবু বেদকে গোমাংসের প্রশংসাপুস্তক বলাভেও কেহ গর্জন করেন নাই। রমেশ বাবুর মুখে বেদের প্রশংসা ধরে না, তথাপি তাহার খোঁচার সকল বিষয়ই গর্জন করিয়া উঠিলেন।

আমি এ পর্যন্ত বিজ্ঞ লেখকের প্রবন্ধের যে উত্তর গাহিলাম, তাহাতে কি এবীণ, কিনবীন উত্তর দলের আদরণীয়—নবজীবনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এবীণ দলের মনোমত একখানি পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তা হইয়াছিল বলিয়া কাহারও বোধ হয় না। অথচ আমাদের প্রত্যাখ্যান লেখক, ইহার পরই এক নিখাসে বলিতেছেন,—‘পাঠক! পূর্বোক্ত কুজ্বটিকাই বেদব্যাঙ্গের উৎপত্তির অপর কারণ। সেই অধি বা তাহার কিছু পূর্বোবাধি নব্যের প্রিয়, প্রাচীনের অপ্রিয় প্রবন্ধ নবজীবনে বেশী বেশী বাহির হইতে লাগিল; নব্যদল দলে দলে দ্বিগুণ উৎসাহে নব্য হিন্দুধর্মে (১) দিন দিন আকৃষ্ট হইতে লাগিল; x x x দাদা তাই নবজীবন ও প্রচারের শব্দ কথায় নব্যের অনেক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে প্রাচীন বা তদ্রূপবলবীর মনস্তি হইল না, তাহাদের উপযোগী একখানি সংবাদ-

পত্রের প্রেরণ হইল। নতুবা জীবিত লোকের তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম ও ধর্মের অহুতা। দীর্ঘক প্রবন্ধ কাটিয়া ছাঁটিয়া ছাপা হওয়াতে বেদ-ব্যাসের সৃষ্টি হয় নাই।’ পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমি ‘চূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধ কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রকাশের জন্য বেদব্যাসের উৎপত্তি হইয়াছে’ ঠিক এ কথা বলি নাই। আমার লিখিত পূর্ব প্রবন্ধ আর একবার পাঠ করিলেই সকলে দেখিতে পাইবেন, আমি এই প্রতিযোগী পত্র সৃষ্টির অনেক গুলি কারণ প্রদর্শন করিয়াছি, চূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধ কাটা ছাঁটাই এ দলারলির মুখ্য কারণ নয়। অন্য দশবিধ কারণের মধ্যে একটি কারণ মাত্র। চূড়ামণি মহাশয় বঙ্গবাসীতে যে ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেন, তাহাতেই বুঝা যায়, যে কেবল নবজীবন ও প্রচারের ধর্ম মতের সহিত তাঁহার সহায়ত্ব নাই বলিয়া তিনি নবজীবন ও প্রচারের সংশ্লিষ্টতা গণ্য করেন নাই। প্রোক্ত প্রবন্ধ কাটা ছাঁটার অকারণ অভিযোগ উপস্থিত করাতেই তাঁহার মনের গুমর ফাঁক হইয়াছে। লেখক মহাশয় এখন তাঁহার সাক্ষাৎ গাহিয়া কি করিবেন? বাহা হউক, না হয় স্বীকার করিলাম, চূড়ামণি মহাশয় কেবল মানির ভয়েই নবজীবন-সম্পাদকের উপর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যের অজুরোধে এতটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে, আমি এই কাটা ছাঁটার কথাটা না উঠাইলে, নবজীবন সম্পাদকও তাঁহার সাক্ষাৎ দিবার ফাঁক পাইতেন না। লেখক মহাশয়ও সম্পাদকের সম্পাদকীয় নীতির প্রশংসা করিতেন না। সম্পাদকের দোষেই এ বিচ্ছিন্নতা ঘটয়াছে, এইরূপ একটা হির সিকান্ত সকলেরই মনে থাকিয়া যাইত। আমার এই খোঁচা মারাতে অন্তত এতটুকু বুঝা গেল যে, কেবল নবজীবন সম্পাদকের দোষে এ দলারলি ঘটে নাই। লেখক যে বলিয়াছেন ‘সেই অবধি বা তাহার কিছু পূর্বাধি নব্যের প্রিয়, প্রাচীরের সম্পূর্ণ আশ্রয় প্রবন্ধ নবজীবনে বেশী বেশী বাহির হইতে লাগিল; × × × কিন্তু তাহাতে প্রাচীন বা তত্ত্বাবলম্বীর মনস্তত্ত্ব হইল না, তাহাদের উপযোগী একখানি সংবাদ পত্রের প্রেরণ হইল। এই সমাগমে বেদব্যাসের উৎপত্তি’—একথা কতদূর সত্য তাহারও আলোচনা করা বাউক।

সকলেই জানেন, বাবু বসন্ত চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু নীলকণ্ঠ মজুমদার, বাবু চন্দ্রশেখর বসু, বাবু কালীনাথ মল্লিক, বাবু বীরেশ্বর

পাঁড়ে, বাবু দেবেন্দ্রবিজয় বসু, বাবু কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, বাবু ইন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখক গণের এবং সম্পাদকের লিখিত প্রবন্ধাবলি প্রথম বৎসরের নবজীবনে বেশী বেশী বাহির হইয়াছে। বোধ হয় কেহই বলিতে পারিবেন না, অন্তত সেই সময়ে কেহ বলেন নাই, যে প্রোক্ত লেখকগণের প্রবন্ধ নবা দলেরও কথাই নাই, প্রবীণ দলের অপ্রীতিকর হইয়াছিল। বরং হিন্দু সমাজের মুখ-পত্র বলিয়া যে বঙ্গবাসী স্পর্ধা করেন, তিনি সেই বৎসরের নবজীবনের অনেক প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া হয় জয়কার দিয়াছিলেন। এবং ত্রাস্কন্দল-ঘোষা-হিন্দু আখ্যা দর্শন সম্পাদক বরং নবজীবন ও প্রচার পৌত্তলিকতার দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছে বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তবে লেখক মহাশয় কিসে সিদ্ধান্ত করিলেন, নবজীবনে নবা দলের প্রীতিকর, প্রাচীন দলের অপ্রীতিকর প্রবন্ধ বেশী-বেশী বাহির হইতেছিল বলিয়া প্রাচীন দলের মনস্তাত্ত্বিকর প্রবন্ধ-পূর্ণ একখানি পত্রিকার প্রয়োজন হইয়াছিল? যে প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বেঙ্গবাসীর সৃষ্টি, নবজীবনকে কি তরুণযোগী করা অসম্ভব হইয়াছিল? প্রাচীন পণ্ডিত যগুলী মনে করিলেই ‘ভূয়স্যাব্যবদিশাতে’ বাক্যের সার্থকতা নবজীবনেই করিতে পারিতেন। সে চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছিলেন, বা চেষ্টা করিয়াও নবজীবন সম্পাদক কর্তৃক কোন বাধা পাইয়াছিলেন কি? সকলেই অবগত আছেন, নীলকণ্ঠ বাবুর ‘শাস্ত্র সমর্থন’ প্রবন্ধের (৫৭৩ পৃষ্ঠা) ছোট নোট নবজীবন সম্পাদক বলিয়াছেন, ‘তারা প্রসাদ রত্ন তুলিতে গিয়া যদি সঙ্গে সঙ্গে বিষ তুলিয়া থাকেন. নীলকণ্ঠ তাহা পান করিয়া হজম করিলে কতি কি?’ সকল শ্রেণীর হিন্দুকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশে যে পত্রিকার জন্ম, সকল শ্রেণীর লেখকের লেখা প্রকাশ না করিলে পত্রিকা সম্পাদন যখন অসম্ভব, তখন এরূপ উদারতাই প্রশংসনীয়। এ হেন গুরু গভীর, অষ্টচ বিনয়নত্র উপদেশেও যদি প্রাচীন পণ্ডিতগণের বা তদ্ব্যতাবলম্বীর মনস্তাতি না হয়, তবে আর কিসে হইবে?

লেখক বলেন, “রমেশ বাবুর ঋগ্বেদ শীর্ষক প্রস্তাব যে প্রাচীনের নিতান্ত অপ্রীতিকর তাহা সাধারণে অবগত আছেন। এই সম্বন্ধে নবীন দলের আর প্রবীণের বিদ্যেমানল সমাধিক জ্বলিয়া উঠে।” তবেই বুঝা গেল, প্রবীণ দলের পূর্ক হইতেই নবীন দলের উপর বিদ্বেষ ছিল। রমেশ

বাবুর ঋণেদের দেবগণ-শীর্ষক প্রবন্ধ অছিল। মাত্র। না হয় স্বীকার করি-
লাম, রমেশ মেঘেই প্রাচীন ও নব্যবাদের সম্মিলনের আঁকাশ আচ্ছন্ন
করিল। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলী যদি এক রমেশ মেঘেই দিশা-
হারা, দেশছাড়া হন, তবে আর তাঁহাদের দ্বারা এই পাশ্চাত্য সভ্যতা-
ন্দোলিত বন্ধে হিন্দুধর্মের সংস্কারের আশা কি? বেদ-বিবাদে
সে আশা কি কাহারও পূর্ণ হইয়াছে? আমাদেরত বোধ হয় না। প্রায়
সকল হিন্দুই বলেন, রমেশ মেঘে আকাশ অচ্ছন্ন করিলে, প্রাচীন পণ্ডিত
মণ্ডলী সদযুক্তি পূর্ণ শাস্ত্রের তর্ক-বাত্যায় মেঘ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা
করিলেন না কেন? বেদ-বিবাদে দলাদলি, গলাগলি ঘোট না করিয়া
প্রাচীন গণ্ডিতগণ মিলিয়া, একখানি ঋণেদের বাখ্যা সহ অমুবাদ প্রকাশ
করিলেইত সাগর পারের রমেশ-মেঘ, সাগর পারে উড়িয়া যাইত? “বেদার্থ
বোধ অতি কঠিন কথা” ইহা বলিলেই কি সকলের আকাজ্ঞা পূর্ণ হয়?

বলা গসঙ্গত নয় যে চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মান্দোলনের ফলই নবজীবন।
অথচ তিনি প্রথম বৎসর নবজীবনে একটা প্রবন্ধও লিখেন নাই। তিনি
যে ‘ধর্ম্মবাখ্যা’ পুস্তকাকারে খণ্ড ক্রমে প্রকাশ করিতেছেন, তাহা
অগ্রে নবজীবনে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিলেই ত লোকে তাঁহার ধর্ম্ম মত
সাদরে পঠন, শ্রবণ এবং হৃদয়ঙ্গম করিত? বোধ হয় পুস্তকাকারের ‘ধর্ম্ম
বাখ্যা’ অল্প লোকেই চক্ষে দেখিয়াছে। নবজীবনের সাহায্যে তাহা দেশ-
ময় প্রকাশিত হইত। এবং তাহা হইলে, বাহারা নবজীবনের অমুষ্ঠানপত্র
পাঠে অহলাদে নৃত্য করিয়াছিল, তাহাদের নিকট তিনি কেবল তর্কচূড়ামণি(!)
বলিয়া অভিহিত হইতেন না। হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারকদের উপযুক্ত অধিনেতা
বলিয়াই আপামর সাধারণের ভক্তি উপহার পাইতেন। এমন সুযোগ
এপর্যন্ত কোন পণ্ডিতের ভাগ্যে ঘটে নাই অথচ চূড়ামণি মহাশয় এই
সুযোগ ত্যাগ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের অমুষ্ঠাতা শীর্ষক প্রবন্ধের শেষ
ভাগ (যে অংশের লেখার ভাঙ্গ নবজীবন সম্পাদক করেক পংক্তি উদ্ধার
করিয়া দেখাইয়াছেন) প্রকাশ হইল না বলিয়া, প্রোক্ত প্রবন্ধ কাটাছাঁটার
অভিযোগ দিয়া, নবজীবনের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া, একখানি প্রতিযোগী
পত্রিকা প্রকাশের সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। পাঠক! আমাদের বিজ্ঞ
লেখক বাহাই বলুন, সকলেই কিন্তু জানেন, সেই সুবিধা খুঁজিবার ফল,—

‘বেদব্যাস’। অষ্টচ চূড়ামণি মহাশয়ের যেন নবজীবনে লিখিবার অনিচ্ছা ছিল না, নবজীবন সম্পাদক তাঁহার সহিত একমতাবলম্বী হইয়া পত্রিকা সম্পাদন করিলে, কখনই এরূপ বিচ্ছিন্নতা ঘটিত না।—বঙ্গবাসীতে তিনি যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহাতে আমরা এইরূপই বুঝিয়াছিলাম। এখন বুঝা গেল, আমরা বাহা বুঝিয়াছি তাহা ত ভুলই, আমাদের ভ্রম সংশোধনার্থ বিজ্ঞ লেখক বাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ ভ্রম-মূলক। ভূত্বের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, লেখক একজন বেদব্যালের পৃষ্ঠ পোষক বলিয়াই যেন, আমাদের ভ্রমসংশোধন করিতে গিয়া নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রত্যুত্ত শুকালতাই করিয়াছেন। কিন্তু ওকালতী করিতে গিয়াও নূতন উকিলের ন্যায় নবী ছাড়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন।

প্রদ্যাক্ষর লেখক আর একটি কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন ‘লেখক বেদব্যাসকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখপাত্র স্বীকার করিতে বড় সারাজ।’ আমি অস্বীকার করিয়া বলিতেছি নবজীবনের লেখক, পাঠকগণ আমার পূর্ব প্রবন্ধ একবার আগা গোড়া পড়িয়া দেখিবেন; দেখিবেন,— আমি গোড়া হইতেই বেদব্যাসকে প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখপাত্র বলিয়া আসিয়াছি। তবে ইহাও বদ্বিরাছি যে, “বঙ্গদর্শনের তিরোভাবের পর (কেবল নব্য সম্প্রদায়ের সম্মিলনে) ধর্ম সংস্কার জন্য নবজীবনের আবির্ভাবে বিশেষ কোন ফল হইবে না বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। পরন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণের মুখপাত্র কোন পত্রিকাও সে আশা পূর্ণ করিতে পারিবে না। তবে প্রাচীন ও নব্যসম্প্রদায়ের লেখকাগ্রণীগণের রাসায়নিক সম্মিলনে সে আশা পূর্ণ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।” এই কথা শুনির যথার্থ্য প্রদর্শন জন্যই শেষে বলিয়াছি, “কেবল চন্দ্রশেখর বসু কেন, বাবু রজনী-কান্ত গুপ্ত প্রভৃতি লেখকের প্রবন্ধ বেদব্যাসে প্রকাশ করিতে যখন ভূত্ব বাবুর আপত্তি নাই, তখন অবশ্য তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে বেদব্যাসকে ঠিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখপাত্র করিলে চলিতেছে না। সকল শ্রেণীর হিন্দুকে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া বেদব্যালের যখন উদ্দেশ্য, তখন এইরূপ উদারতা তির গোড়ামিতে সে উদ্দেশ্য সকল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। নবজীবন ও প্রচারের ও বিষয়ে উদারতা প্রাণসমনী।” পাঠক! দেখিলেন,

আমি “বেদবাসকে” ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখপাত্র পত্রিকা বলিতে কিরূপ নারাজ ! তবে বঙ্গবাসীর মতে “বেদবাসই একমাত্র হিন্দুধর্মের আদর্শ পত্রিকা” সেই কথাই আমি ভেমন সার দিই নাই। বঙ্গবাসীর কথায় সার না দেওয়াতেই কি লেখক মহাশয় আমাকে প্রোক্ত অপরাধে অপরাধী নাবাস্ত করিয়াছেন ?

আমি স্বীকার করি, “ব্রাহ্মণ অথচ পণ্ডিত বাতীত ধর্মের মৌলিকতা রক্ষিত হওয়া কঠিন। বাঁহারা পুঙ্খবাহুল্যে কেবল ধর্ম্মান্দোলন করিয়া আসিতেছেন, ধর্ম্ম তাঁহাদের হাড়ে মাসে জড়িত * * *। কিন্তু উদারচেতা পণ্ডিতমাত্রেই বলেন, ‘জাতিতে ব্রাহ্মণ নহে, ব্রাহ্মণ শুণে।’ “ব্রাহ্মণ অথচ পণ্ডিত” বলিয়া লেখককেও সে কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইয়াছে। “গোবরেণ পয়স হয়; ঘৃতও ভেল হয়” বলায় সকলের সকল অপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু লেখক “ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-কল্প-পাশ্চাত্য-শিক্ষিত” কাহাকে বলেন, বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় লেখকের অভিপ্রায় এই যে, যে সকল পাশ্চাত্য-শিক্ষিত হিন্দুসন্তানকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দয়ার চক্ষে দেখেন, তাঁহারা “ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কল্প পাশ্চাত্য-শিক্ষিত”। এ কথা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, বন্ধিমবাবু, চন্দ্রনাথবাবু, চন্দ্রশেখরবাবু প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দয়ার চক্ষে দেখেন না বলিয়া তাঁহারা “ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কল্প পাশ্চাত্য-শিক্ষিত” নহেন; বীরেশ্বরবাবু, ইন্দ্রনাথবাবু, নীলকণ্ঠবাবু প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দয়ার চক্ষে দেখেন বলিয়াই “ইহারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কল্প পাশ্চাত্য-শিক্ষিত।” তাই বেদ-ব্যাসে পশ্চাত্তর লেখকগণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলেও, লেখকের মতে বেদ-ব্যাস খাটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখপাত্র। কেন না ভূয়সা ব্যবদিশ্যতে ! নবজীবনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইতে রামা শ্যামার লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ হইলেও তাহা অহিন্দু মতের পত্রিকা ! অনেকে বলেন, “নবজীবন যদি দুই ফর্ম্ম-অকারে প্রকাশিত হইত এবং হিন্দু, অহিন্দু, পণ্ডিত, অপণ্ডিত, শিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত সকল শ্রেণীর পাঠক পাঠিকার মনোরঞ্জন করা যদি নবজীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য না হইত, তবে বেদব্যাসের ন্যায় নবজীবনও ‘ভূয়সা ব্যবদিশ্যতে’ বাস্তব সার্থকতা রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু সে পক্ষে চলিলে, নবজীবন এতদিন ধুমকেতুর ন্যায় দেখা দিয়া অচিরে অন্তর্ধান

হইতেন। কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর লিখিত প্রবন্ধের আশায় বসিয়া থাকিয়া, পান্চাত্য শিক্ষিতের প্রবন্ধ প্রত্যাখ্যান করিলে, বর্তমান আকারে নবজীবনকে প্রকাশ করিতে সম্পাদককে আরও একযুগ অপেক্ষা করিতে হইত।

আমাদের বিজ্ঞ লেখক শেষে একটি রহস্যের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, “প্রাচীন আর নব্য এই দুইটি মাত্র সম্প্রদায় ঘুরিলে, লেখকও এই দুইএর একটির অন্তর্ভুক্ত হইবেন। নব্য সম্প্রদায়ের দিকে একটু আন্তরিক চানের আবছায়া পরিলক্ষিত হওয়ার, তাঁহাকে নব্য হিন্দুসম্প্রদায় বলিয়া নির্দেশ করিতে ইচ্ছা করি।” আমি বলি আপত্তি নাই। নবজীবন সম্পাদকের “হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা?” শীর্ষক প্রবন্ধ শুনিয়া বা পড়িয়া অনেক নব্য হিন্দু, নব্য হিন্দু সম্প্রদায় হইতে নাম কাটাইলেন; রমেশ-মোহন-বাতায় বিঘূর্ণিত হইয়া অনেক নব্য হিন্দু প্রাচীন পণ্ডিত বিশেষের উত্তরীয় ধরিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দলে গিয়া, নাম লিখাইলেন; আমার ন্যায় নগণ্যকে কেহ ডাকিলও না, কোন কাঁকে যিগিবার সাধ্যও আমার নাই; স্তব্ধাং লেখক যে আমাকে নব্য হিন্দুসম্প্রদায় বলিয়াছেন, তাহাতে আমি স্তম্ভী ভিন্ন চূর্ণিত নহি। বরং তিনি যে আমাকে না নবীন, না প্রবীণ তৃতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বলিতে চাহেন, সে স্পর্ধা আমার নাই। তবে একথা আমি পূর্বেও বলিয়াছি এখনও বলি, কি নব্য, কি প্রাচীন কোন দলেরই আমি গোড়া বা উকীল নহি। যে দলের যে টুকু দোষ বা গুণ দেখিব, তাহা মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিব। কিন্তু আমার কুঁড়িবার বা বলিবার দোষে, যদি প্রাচীন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ, এবং নব্য হিন্দু-সম্প্রদায়ের প্রশংসা প্রকাশ পায়, সেরূপ ভ্রম আমাকে যিনি দেখাইয়া দিবেন, তাঁহাকে আমি প্রকৃত বন্ধু এবং সহপণেষ্ঠা মনে করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। লেখক মহাশয় আমার সেরূপ (প্রকৃত পক্ষে) ভ্রম একটিও দেখাইতে পারেন নাই। অথচ আমার নব্য দলের দিকে একটু আন্তরিক চানের আবছায়া দেখিয়া আমাকে সেই শ্রেণীর উকীল (প্রকারান্তরে) বলিয়া রহস্য করিতে ক্রটি করেন নাই। প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে আমি দলদলির অগ্রণী বলায় যেন লেখকের আঁতে বা লাগিয়াছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, বন্ধে অনেক মহা মহো-

পাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে চূড়ামণি মহাশয়কে আমরা প্রাচীন দলের বে-
নেতা বলি, তাহা কি তাঁহার পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়? নেতৃত্ব করিতে
গিয়া দলাদলির ঘোঁট করিয়াছেন, ইহা তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির চিহ্ন বা
পরিচয় বটে; ধর্ম্ম সংস্কারক দলের উপযুক্ত নেতার চিহ্ন বা লক্ষণ নহে।
যাঁহার উপর লোকের বেশী আশা, তিনি যদি নিরাশার অধিনায়কতার
পরিচয় দেন, তবে কি আমাদের সকলেরই আক্ষেপের কথা নয়? নব্য
দল মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে বরাবর রাজি; এখনও আগ্রহান্বিত;
অন্তরাং তাঁহাদের প্রতি একটু আন্তরিক টানের আবছায়া থাকা না হউক,
উভয় দলের দোষ গুণ বলিতে গেলে, ইহাদের প্রশংসাটা একটু ঘোরাল
হইবে আশ্চর্য্য কি? আমি আমার লিখিত প্রবন্ধে প্রাচীন ও নব্য হিন্দু
সম্প্রদায়ের নেতাগণকে লক্ষ্য করিয়া দুইটি বিশেষ গুরুতর কথা বলিয়াছি।
পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের (“বেদবাসেনা” প্রকাশিত) ‘স্বধর্ম্ম
রক্ষা’ নামধের প্রবন্ধের সার কয়েকটি কথা কোটেশান্ দিয়া তুলিয়া
(৭৬৬, ৭৬৭ পৃষ্ঠা) নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণকে লক্ষ্য করিয়া শেষে
যাহা যাহা বলিয়াছি, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের কথা গুলির সমাপ্তি
কোটেশান্ মুদ্রাকরের ভ্রম বশত মুদ্রিত না হওয়ায়, লেখক বোধ হয়
‘অপিচ’ শব্দের (৭৬৭ পৃষ্ঠার) পূর্বাভিধিত সমস্ত কথা গুলিই
ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের মনে করিয়া ভ্রমে পণ্ডিত হইয়াছেন। এবং
পরিশেষে (অপিচ শব্দের পরে) প্রাচীন-সম্প্রদায়ের নেতাগণকে লক্ষ্য করিয়া
‘রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রিগণের’ গালাগালি নিবারণ করিতে বলিয়াছি ও
লেখক তাহাতেই হয় ত আমার নবাবদের দিকে টানের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত
করিয়াছেন। এবং বুঝিয়াছেন, আমি ঘুসো ঘুসী ঠেকাইতে গিয়া পাশ
কাটিবার সময় এক ঘুসি মারিয়া আসিয়াছি। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাক্য
সমাপ্তি করিয়াই আমি বলিয়াছি,—“বাস্তবিক নব্য-সম্প্রদায়ের এ রোগটী
অনেক দিন হইতে হইয়াছে * * * ” ইত্যাদি। সেই কয়েক পংক্তি পড়িয়াও
যদি কেহ বলেন, আমি নিরপেক্ষভাবে উভয় দলের নেতাগণকে তুল্যরূপে
সভ্য কথা বলি নাই, তবে আমার আর বলিবার কি আছে!

লেখক মহাশয় আমার প্রতি একটি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়া-
ছেন, সরল ভাবে তাহার একটা উত্তর দিয়া সাক্ষ্যই দেওয়া আমার কর্তব্য

হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন “পাঠক! আমি একজন রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রী; সুতরাং আমার আঁতে বা লাগিয়াছে; *** তিনি কীলোকীলি থামাইতে গিয়া এক কীল মারিয়া আসিলেন। বাহিয়া বাহিয়া গরিবকে মারিলেন, তাই কীল কিছু বেশী জোরে বোধ হইয়াছে।” উপসংহার কালে লেখক এই রামা শ্যামা তীর্থযাত্রী, যে শ্রেণীর লোককে বলিয়া বুঝিয়াছেন, যদি সকলেই সেইরূপ বুঝিয়া থাকেন, তবে বাস্তবিকই আমি কীলোকীলি থামাইতে গিয়া এক কীল মারিয়া আসিয়াছি সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যে শ্রেণীর লোককে বাঙ্গালী হিন্দু বলিয়া আসিতেছি, এবং প্রাচীন ও নব্য হিন্দুসম্প্রদায়ের দলাদলিতে যে শ্রেণীর হিন্দুগণের অধিক অনিষ্ট হইবে বলিয়া, আমি আশঙ্কিত ভাবে উভয়দলের নেতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া, মিলিয়া মিশিয়া ধর্মসংস্কার করিতে বিনীতরূপে অজরোধ করিয়াছি, সেই সাধারণ হিন্দুসম্প্রদায়কে কেহ ‘রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রী’ বলিয়া বুঝিবে, এবং আমার কথায় কাহারও আঁতে বা লাগিবে, ইহা আমি কখন মনেও ভাবি নাই। আমার লেখার ভঙ্গি তেমন চইলে, হয়ত নবজীবন সম্পাদক সেই অংশ প্রকাশই করিতেন না। লেখক যে বলিয়াছেন “কালে বাণুও পণ্ডিত হয়” তাহা আমিও জানি। এই বাণু শ্রেণীর হিন্দুকে লক্ষ্য করা দূরে থাকুক, আমি এই শ্রেণীর জন্যই ওকালতী গ্রহণ করিয়াছি। তত্ত্বের শিক্ষিত এবং পণ্ডিতগণের সৌম্য গুণ বিচার করিতে বাওয়া কি আমার শোভা পায়? আমি রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রী বলিয়া বাহাদিগের বাড়িবাড়ি নিবারণের কথা বলিয়াছি, তাহাদের একটা আবু ছায়া মত স্বরূপ বর্ণনাও আমার প্রবন্ধের স্থানে স্থানে আছে। চক্ষুস্থান পাঠক মাত্রেই তাঁরা দেখিয়া চিনিতে পারিবেন—আমার মতে রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রী কাহার। কিন্তু লেখকের ন্যায় অনেক পাঠক, লেখকই—ভয়ত আনার বর্ণিত রামা শ্যামার চিত্র-দর্শনে সক্ষম হন নাই। অধিকন্তু প্রবন্ধ লেখকের লেখার ভঙ্গিতে অনেকেই উল্টা বুঝিয়া মন্ডাহত হইতে পারেন। এজন্য অদ্য আমি রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রীদিগের একটা চিত্র সহ পরিচয় দিব। ভরসা করি কোন পাঠক ‘কবির’ দলের দোষারোপ ন্যায় সেই চিত্র নিজের মনে করিয়া ‘আমার আঁতে বা পড়িয়াছে’ বলিয়া আর গোল ধোঁগ করিবেন না।

আমাদের বিজ্ঞ লেখকই বলিয়াছেন “বড়ই আক্ষেপের বিষয়, ব্রাহ্মধর্ম

শৈশব অতীত করিতে না করিতেই গুরুজনের সহিত পৃথক্ হইলেন। তাই আজ উদার ব্রাহ্মধর্ম আদি, নববিধান ও সাধারণ এই ত্রিধা—বিতর্কিত মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।” আমরাও দেখিয়া আসিতেছি, এই বাঙ্গালায়, কি সামাজিক, কি ধর্মতৈতিক, কি রাজতৈতিক যে কোন নূতন বিষয়ের আন্দোলন বা অস্থিষ্ঠান হইয়াছে, তখনই এক শ্রেণীর লোক তাহার চাঁই হইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছে। “আমি সকলের নেতা, আমার মতে সকলে চল, না চলিলে আমি এ দলে থাকিব না” বলিয়া প্রথমত আব্দার,—আপত্তি; পরিশেষে পৃথক্ একটা দলের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের দেশের যাত্রাওলারা ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণ যাত্রাওলাদিগকেও পরাস্ত করিয়াছেন। এই শিক্ষিতগণের গুণেই “উদার ব্রাহ্মধর্ম ত্রিধা মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।” ইহাদেরই গুণে ভারতবর্ষের অস্থিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাতাগণের তিনটা দল হয়। এই শিক্ষিতগণই বহু-বিবাহ-নিবারণী আন্দোলনার, বিষবা-বিবাহ প্র-র্ত্তন অস্থিষ্ঠানে, বাল্য-বিবাহ-নিবারণী হজুকে, প্রথম ‘চেরা সই’ করেন। আবার অন্য একজন নামজাদা পণ্ডিত, যেই সেই সকল বিষয়ের প্রতিবাদ করিলেন, অমনি “বাবুর দল” তদ্বিষয় বিবেচনা, আলোচনা, অবসারণা না করিয়াই, পূর্ব সিদ্ধান্তে অলাঞ্জলি দিয়া নূতন মতে ‘ডিটো’ লাগিয়া স্বাক্ষর করিলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহারা—চৌকোষ মাহুষ! এই সকল মহাত্মারাই একবার খ্রীষ্টানের বাইবেল পাড়রা—হিন্দুগণকে গালাগালি দেন; ব্রাহ্মধর্মের আলোক পাইয়া দেশভুক্ত হিন্দুকে কুমন্ত্রারাপন্ন মূর্থ বলেন; অলংকৃত সাহেবের মুখে যোগ সাহায্য শুনিয়া মাথায় চুলের খোঁপা, মুখে দাড়ী গোঁফা, হস্তে দীর্ঘ দীর্ঘ নখ রাখিয়াই ‘যোগে ব্যপে’ যোগী হইবার আশায় খিওলকিষ্ট হইয়া বলেন! আবার, হিন্দু-পণ্ডিত বিশেষের ‘ধর্ম-ব্যাখ্যা’ শুনিয়া প্রতি স্রোতে করিয়া বাটা হিন্দু সাক্ষিয়া—(এক সময় যেচ্ছাচারিতার জন্য যে সকল বন্ধুর নিকট ভিরকৃত হইয়াও তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, এখন সেই সকল) উন্নতমনা প্রকৃত বন্ধুগণকে “অহিন্দু, শাস্ত্রজ্ঞান-হীন, স্বাধ-সাহায্য-বোধ-হীন, গুরুপদেশ-বিহীন, ধর্মের বাঁড়” প্রভৃতি ‘নানা বিশেষণে বিশেষিত করেন।” আমি নিরপেক্ষ সকল পাঠককেই জিজ্ঞাসা করি, এই শ্রেণীর লোকের দ্বারা কি এত দিন হিন্দুধর্ম, হিন্দুসমাজ

বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে ? ইহারাই কি হিন্দুসমাজের প্রধান অন্তের মধ্যে গণ্য ? এই শ্রেণীর লোককে ‘রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রী’ বলার কি সাধারণ হিন্দুধর্মাবলম্বীর ‘অঁতে যা লাগে’ ? না বাহিয়া বাহিয়া গরিবকে মারা হয় ? কে আমাদের বিজ্ঞ লেখক তা জানি না। তিনি যদি আমার বর্ণিতরূপ ‘রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রী’ দলের হন, তবে তাঁহার অঁতে যা লাগিলে আমার হুঃখ নাই। ঐ সকল তীর্থযাত্রীগণকে কোণে কোণে কটাক্ষ করা ভিন্ন অন্য কি প্রকারের গুরু-গভীর উপদেশ আছে তাহা আমি জানি না। অনেক দিন হইতে গুরু-গভীর উপদেশের কথাটা শুনিতেছি বটে, আমাদের হুঃখ্য ক্রমে কোন গুরুকেই সেই স্বর্গীয় উপদেশটি দিতে শুনিলাম না।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস স্বধর্ম বুদ্ধির পরগাছা কাটিয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে যাহারা সক্ষম, তাহারা মিলিয়া মিশিয়া ধর্ম সংস্কার করা অপমান কি ধর্মহানি মনে করিবেন না। গোঁড়াগণই বলাবলির বোঁট করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত। সুখের বিষয় এই যে বেদব্যাসে এখন আর বিদ্যেব বিজুজিত অকিকিংকর প্রবন্ধ বাহির হইতেছে না। এবং ‘প্রবীণের ও নবীনের অপ্রীতিকর প্রবন্ধ বেশী বেশী বাহির হওয়া’ অপবাদের পর হইতেই (লেখক স্বীকার করুন বা নাই করুন) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের লিখিত প্রবন্ধে নবজীবনের কলবর উজ্জ্বল করিতেছে। ভরসা করি, কালে প্রচারের ন্যায় বেদব্যাস ও নবজীবনের সহিত সৌভাত্র প্রেমে আবদ্ধ হইয়া, একই উদ্দেশ্যে জীবন তরী ভাসাইয়া, আমাদেরিগকে ধর্মের সহজ উন্নতিকর বিস্তৃত পথে লইয়া যাইবেন। অপিচ সাধারণের সে আশা পূর্ণ করিতে যদি নবজীবন কি প্রচার অসমর্থ হন, তবে আমরা নবজীবন ও প্রচারের দীর্ঘ জীবন কামনা করি না। বেদব্যাস যদি সকল শ্রেণীর হিন্দুর উপদেষ্টা বন্ধু বা গুরুর ন্যায় কৃৎস্নবৃত্ত হিন্দুধর্মের গুঢ় রহস্য সকল সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারেন, তবে বেদব্যাসকেই আমরা বৃহদাকারে দীর্ঘকাল বন্ধী সাহিত্য গগণে বিরাজ করিতে দেখিলে সুখী হইব। যে সহপদেষ্টা সেই আমাদের বন্ধু। আমরা খ্যাতি প্রতিপত্তির ষাতিরে আসল কথা ভুলিব না।

শ্রীচন্দ্রমোহন সেন।

তুমি আর আমি ।

বিপুল সংসারে কে চিনে আমারে ?
তুমিত সবার হৃদয় সরে--
বিকট কমল শোভা অচঞ্চল,
অধর্নিশ নাচ হরষ ভরে ।
ভকতি-সমীর, পিরীতির নীর,
নাড়িয়া বভ্রই তরঙ্গ তোলে,
সৌরভের রাশি মুহু মন্দ হাসি,
হড়াও ততই শ্রোতের কোলে ।
শিশিরের বিন্দু পিরে মুখ-ইন্দু,
কভু না সম্পূর্ণ প্রফুল্ল হয়,
শ্রেম অশ্রুজল পাইলে কমল,
আর কি মুহূর্ত মুদিত রয় ?
ভকতি অনিলে, তুমিত কুটিলে,
সাজালে মানস-সরসী-বর ;
ভক্তি কোথা পাই ভাবিয়া বেড়াই,
কলঙ্কিত মন মোরা যে নয় ।
ভকতি মুকতি, তোমারি শকতি,
তোমারি নিয়ত সেবিকা দাসী ।
কৃপা করি নাথ ! ঘৃচাও বিষাদ !
ঘৃচাও হৃদের কলুব রাশি !
নাহি পার কিবা, সমাগর-দীপা,
অবনী, অমরা, সকলি তব !
চন্দ্র-তার-ভরা কার-কার্য-করা
নৈপুণ্য তোমার প্রকাশে নভঃ ।
কুম্ভা, নলিনী, প্রফুল্ল কামিনী,
ধরার মন্দার গোলাপ দাম,
দিবা, বিভাবরী হৃগন্ধ বিতরি
প্রকাশে নিয়ত তোমার নাম ।

ডকান্ স্কটলাণ্ডের রাজা। রাজ্যে বিদ্রোহ ঘটনাছে। মাক্‌ডন ওয়াল্ড বিদ্রোহীর সর্দার। মাক্‌বেথ ও বান্‌কো—ডকানের ছই জন প্রধান সেনাপতি। ইহারা অসাধারণ বিক্রমে বিদ্রোহ দমন করিলেন, বিদ্রোহীর মুণ্ডপাত করিলেন। সেই সময়ে অন্য দিকে নরওয়ে-রাজ স্কটলাণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন। কডরের সর্দার বিদ্রোহী হইয়া নরওয়েরাজকে দলে বলে সাহায্য করেন। মাক্‌বেথ ও বান্‌কো মাক্‌ডন ওয়াল্ডকে বিনষ্ট করিয়া, নরওয়ের অধিপতি রোএনো এবং কডরের সর্দারকে ভুল সংগ্রামে অতুল বিক্রমে পরাভূত করেন। এই যুদ্ধ ক্ষেত্রের অনতিদূরে প্রান্তর বন-ভূমিতে, এই মহা সমর সমাপ্তির অনতি পূর্বে, মাক্‌বেথ মহানাটকের আরম্ভ। ছরাকাজার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি তিনটা প্রেতিনী প্রথম দৃশ্যের রঙ্গ-চারিণী। তাহারা পরস্পরে বলা বল করিল, যে সূর্য্যাস্তের পূর্বে যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মাক্‌বেথের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। উদার মানসের সূর্য্যী আশা সূর্য্যোদয়ের সহিত হৃদয় আলো করিয়া উঠিতে থাকে; ছরাকাজার চরাশা সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে উদয় হয়; প্রথমে বড় উজ্জল ছটা; কিন্তু ক্রমেই করাল হইতে করালতর ছায়ার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ছরাকাজার রূপা প্রেতিনীগণ কাজেই বলিয়া যাইতেছে, তাহারা সূর্য্যাস্তের সময় মাক্‌বেথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে—তাহারা যাইবার সময় সকলে মিলিয়া নাটকের প্রস্তাবনা-গীতি গান করিয়া গেল;

Fair is foul and foul is fair,

Hover through the fog add filthy air.

সুন্দরকে মন্দ ভাবি, মন্দকে সুন্দর;

বদ হাওয়া কুয়া দিয়া ফিরি নিরন্তর।

ছরাকাজা এমনই প্রেতিনীই বটে। যে সকল ভাল জিনিস আছে, তাহা মন্দ বলিয়া মনে হয়, তাহাতে মন উঠে না, আশা পূরে না, তৃপ্তি হয় না; এক একটা মন্দ জিনিসকে তখন কতই না সুন্দর বলিয়া মনে হয়—সেইটা পাইবার জন্য, হাঁকু পাকু করিতে হয়। পাপের স্বপ্নই এই যে, সুন্দরকে মন্দ ভাবে, মন্দকে সুন্দর। সুতরাং মাক্‌বেথ-রূপ মহাপাপ নাটকের ইহাই মহতী প্রস্তাবনা।

৭ম দৃশ্যে রাজ শিবিরে রাজা ডকান কডরের বিদ্রোহের সংবাদ এবং

মাক্বেথের বিক্রম ও বিজয় বার্তা শ্রবণ করিয়া বিজ্রোহী কডরের সর্দারি কাড়িয়া লইবার এবং মাক্বেথকে সেই পদ প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করিলেন ।

তৃতীয় দৃশ্যে তৃণ-লতা-হীন প্রান্তর ভূমিতে সেই প্রেতিনীগণের লীলা-খেলা । ছুরাকাজ্জার বিহার ভূমি এই রূপই বটে; কেবল ধূ ধূ করে । সমরাবসানে বিজয়ী বান্ধো ও মাক্বেথ সেই প্রান্তর দিয়া শিবিরে আসিতোছেন । স্বর্ষ্য অস্ত যাইতেছেন ; গোধূলি আসিতেছে ।

‘সুন্দরে মন্দ, মন্দে সুন্দর’ সেই যে ডাকিনীরা প্রথম ধূয়া গাইয়াছে, সেই ধূয়া ধরিয়াই তাহার মাক্বেথের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে—মাক্বেথ হয় ত মনে মনে তাহাই ভাবিতোছিলেন—মুখেতে স্পষ্টই বলিলেন—এই নাটকে মাক্বেথের প্রথম কথা—

এমন সুন্দরে মন্দ দিন আর দেখি নাই !

বাস্তবিক, অম্জি অতুল সাহসে মাক্বেথ বিজ্রোহ দমন করিয়া স্তব্ধতাও নিকটক করিয়াছেন—আজি বড় গুভ দিন ; কিন্তু ছুরাকাজ্জা রাক্ষসীরা আজি মাক্বেথের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে—এ চতুর্দিকস্থ সাক্ষ্য কুজ্বা-টিকাজ্বর শৈলমালার ন্যায় তাহার হৃদয়ে অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হইতেছে—আজি বড় ছদ্দিন ; তাহাতেই আমরাও বলি—

এমন সুন্দরে মন্দ দিন—আর দেখি নাই ! এই দিনে এই ক্ষণে সেই তৃণ-লতা-হীন প্রান্তর ভূমিতে, সেই প্রেতিনীরা বিজয়ী বান্ধো ও মাক্বেথের দৃষ্টি পথ বর্জিত হইল ।

একজন বলিল ‘জয় মাক্বেথকি জয়, গ্রামিণের সর্দারকি জয়’ আর একজন বলিল—‘জয় মাক্বেথকি জয়, কডরের সর্দারকি জয়’ । তৃতীয়া বলিল—‘জয় মাক্বেথকি জয়—ভাবি মহারাজকি জয় !’ মাক্বেথ শিহরিয়া উঠিলেন,—এমন সুন্দর কথায় কি যেন একটা বন্দ আছে—এই আশঙ্কায় যেন শিহরিয়া উঠিলেন * । ভাবিতে লাগিলেন । বান্ধো জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোমরা আমার কথা কিছু বলিলে না ?

* and seem to fear

Things that do sound so fair.

একজন বলিল—মাক্বেথের চেয়ে কম অথচ বেশী ;

আর একজন বলিল—অত স্ত্রী নয়, কিন্তু স্ত্রী বেশী ;

তৃতীয়া বলিল—তব বংশ রাজা হবে, নিজের রাজা নয়,

কাজে কাজে মাক্বেথ বাঞ্ছা—উভয়েরই জয় !!

ডাকিনীরা অদৃশ্য হটল—মাক্বেথের হৃদয়ে কু-আশা গাঢ় হইতে লাগিল।

এই সময়ে সেই পথে রাজ সভাসদেবা আসিয়া মাক্বেথকে রাজাদেশ জ্ঞাপন করিল ; বলিল—মহাবাজ আপনাকে কডরের সর্দার-পদ প্রদান করিয়াছেন। মাক্বেথ প্রথমে বিশ্বাসই করেন না ; তাহার পর যখন বুঝিলেন, যে কথাটা সত্য, তখন, ভাবিতে লাগিলেন ‘আমিত পিতৃ-মৃত্যুতে শ্রামিসের সর্দার বটেই কিন্তু আমি যে ইচ্ছাৎ বাজ প্রসাদে কডরের সর্দার হইব, একথা প্রোতনী গুলা জানিবা কিরণে ? হয়ত তারা ভবিষ্যৎ জানিতে পারে ; তবে হয়ত সত্য সত্যই আমি রাজা হইব—তবে কি রাজাকে হত্যা করিতে হইবে নাকি ?—দুব চোক, অত শত ভাবনা কেন ? যদি অদৃষ্ট রাজ্যলাভ থাকে, তাহা হইলে আমি কোন চেষ্টা না করিলেও রাজা হইব।’ দেখুন, পাপ কেমন ধীরে ধীরে প্রবল হইতেছে। অভাবনীয় রাজ-প্রসাদ লাভ করিয়া কোথায় ক্লতজ্ঞাতায় হৃদয় ভরিয়া উঠিবে ? না কোথায় সেই রাজাকে হত্যা করিবার কল্পনা মনে উঠিতেছে। দেখুন, প্রস্তাবনা গীতি মিলিতেছে ‘কিনা ; ছবাকাজ্জা সন্দেহে মন্দ করিয়া তুলে কিনা। কোথায় হৃদয়-দ্রাবিনী ভক্তি সহচরী ক্লতজ্ঞাতা, আব কোথায় নবকের পিশাচী ক্লতজ্ঞাতা—কোথায় হৃদয়ে দেবী উড়লা হইবেন ! না কোথা হইতে রাক্ষসী আসিয়া হৃদয় অপকব কলি তখন মাক্বেথ মহা প্রপীড়িত হইয়া, তাকে নিত্যাড়িত করিবার চেষ্টা করিলেন। ভাবিলেন, ‘দূর হোক, এসব কথা আর ভাবিব না। অদৃষ্ট থাকে হবে—আমার চেষ্টার প্রয়োজন কি ?’ যে বলিতে পারে অদৃষ্টে রাজ্য-ভোগ থাকে—অবশ্য হইবে—সে পরক্ষণে ভাবিতে পারে—পাপ বর্ষ থাকে, অবশ্য হইবে—এই অদৃষ্ট-বাদই পাপের প্রশয়-দাতা।

চতুর্থ দৃশ্যে রাজা ডক্কানের সহিত মাক্বেথের সাক্ষাৎ হইল। মাক্বেথের ক্লতকার্যের বিরূপে প্রশংসা করিবেন, রাজা, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পান না, কিন্তু মাক্বেথের সম্মাননা করিবেন, তাহা ভাবিয়া পান না—

রাজ্যব এমনই আনন্দ । এতই কৃতজ্ঞতা ! রাজা মহানন্দে মাক্বেথকে বলিলেন, 'এই বাড়ি তোমার ভবনেই স্থাপন করিব ।' মাক্বেথ বলিলেন 'তবে আমিই দূত স্বরূপ অগ্রসর হইয়া গৃহিণীকে আপনাব আগমন বার্তা জ্ঞাপন করিতে যাই ।' মাক্বেথের হৃদয়ে কিম্বদন্ত্যানল লাগিয়াছে—রাজ-সম্মানায় মাক্বেথ অস্থির । আপনা আপনি বলিতেছেন—

Stars hide your fires !

Let not light see my black and deep desires :

দেখো না, সম্ভব আলো, তাৎকা নিকব !

কৃপ সম এই মম তামস অন্তর ।

পঞ্চম দৃশ্য—লেডি মাক্বেথের প্রবেশ । ইনি মাক্বেথের প্রবৃত্তি-রূপা গৃহিণী ।

সকল মনুষ্যেবই বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি আছে ; সেই প্রকৃতির উপর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নিবর্তই গ্রীড়া দাবতৈছে, মানব প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভের নিমিত্ত নিয়তই পরস্পর মানামারি করিতেছে—যে যখন প্রবলা হয়, সেই তখন প্রকৃতিকে আপনাব পথে লইয়া যায় । তন্ন বলেন—মাতা প্রকৃতি—বনিতা প্রবৃত্তি—চহিতা নিবৃত্তি । মাতা হইতে জন্ম—জন্ম হইতে আমবা বিশেষ প্রকৃতি লাভ করি, বনিতায় ভোগ—ভোগে প্রবৃত্তি ; চহিতায় সম্প্রদান ও সমপণ শিক্ষা—নাড়ী ভেঁড়ান নিস্বার্থ ভাবে পরকে সমর্পণই নিবৃত্তি শিক্ষা ও নিকাম ধর্ম । বনিতা হইতে বাগ, বনিতা হইতে ভোগ, বনিতা হইতে সংসার । কামে প্রবৃত্তি, ভোগে প্রবৃত্তি ; সংসারে প্রবৃত্তি । বনিতা সকল দিকেই প্রবৃত্তি রূপা । এই প্রবৃত্তি রূপা গৃহিণী চালনায মানব প্রকৃতি কি ভাবে পরিচালিত হয়—মাক্বেথ চবিত্রে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে ।

মাক্বেথের প্রকৃতি সাহস-বতী, তেজস্বিনী, বিক্রম-ধামিনী ও ছুরা-কাজ্জামণী । মাক্বেথ যখন জয়োলসে উল্লসিত, তখনই তাঁহার ছুরাকাজ্জা প্রেতিনীকণে মৃত্তিমতা হইয়া, তাঁহার হৃদয়ে বাজ-পদ লালসায় অক্ষুব্বোপণ করে । এখন দেখ, তাঁহার গৃহিণী-রূপা প্রবৃত্তি মানব অবয়বে নিশাচরী রূপে তাঁহার সেই প্রকৃতিকে কোন পথে লইয়া যায় ! মাক্বেথের বিশাল সতেজ প্রকৃতিতে আকাজ্জা-রূপা অতিক্রম পাপের অক্ষুর ছিল—

অনেক হৃদয়েই থাকে—কিন্তু তেমন সংপ্রতি তাঁহার সঙ্গিনী হইলে, তাঁহাকে সং পথেই লইয়া যাইত; কিন্তু মাক্বেথ-গৃহিণী দুঃসাহসময়ী লালসাব সাক্ষাৎ মূর্তি। এই গৃহিণীর প্রয়োচনায় মাক্বেথ হৃদয়স্থ ক্ষুদ্র পাপাক্রুর স্বরূপ বন্টক তরুতে পবিণত হইতে চলিল।

প্রকৃতিব প্রেতিনী ডাকিনী মূর্তি সকল মাক্বেথকে যেখানে সেখানে দ্রাকাক্ষার পথ প্রদর্শন কবে, প্রকৃতিব বান্ধসী-কপা গৃহিণী অন্তঃপুবে নিয়তই সেই পথে তাড়না করিয়া লইয়া যায়,—কাজেই মাক্বেথ ক্রমেই মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন।

পঞ্চম দৃশ্যে মাক্বেথের, প্রকৃতিরূপা গৃহিণীর আবির্ভাব। ইতিপূর্বে মাক্বেথ গৃহিণীকে পত্র লিখিয়া ছন, যে তাঁহার সহিত তিনটা ডাকিনীর সঙ্গে দেখা হয়, তাহা বা তাঁহাকে বডবেব সর্দাব বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিল, তাহার পর তিনি সংবাদ পান, যে সত্য সত্যই মহাবাজ তাঁহাকে ঐ পদ প্রদান করিয়াছেন। ডাকিনী বা তাঁহাকে ভাবি মহাবাজ বলিয়াও অভিবাদন কবে।—‘এ সকল সুস্বাদ ও সুখাশাব আহ্লাদেব ভাগ তোমায় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না—এই কথা তোমাব অন্তবেব অন্তরে বাধিও এক্ষণে বিদায়।’ দৃশ্যরম্ভে মাক্বেথ গৃহিণী এই পত্র পাঠ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন—‘বাজা ত হবে, তা খুব সহজ উপায়ে হতে পারিবে কি? তোমার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষাব সহচর সকল তোমাতে নাই—

Art not without ambition, but without

The illness should attend it—

যাই হোক, বাড়ীতে আসিলে বুঝিতে পারি, তোমাকে বাগাতে পারি কি না?’

মাক্বেথ-গৃহিণী যখন এইরূপ চিন্তাকুলা, তখন সংবাদ আসিল যে, মহারাজ সেই বাত্রি তাঁহাদেব বাড়ীতে অতিথি হইবেন। তাঁহার দুঃসংবল্ল সিদ্ধি হঠাৎ যে, এমন সুসংযোগ হইল, তাহা লেডি মাক্বেথ প্রথমে বিশ্বাসই কবেন না—শেষে বলিলেন, বড় সুসংবল্ল বটে। মনে মনে ভাবিলেন এমন সুসংযোগ আব হবে না। শুনিতে পাইলেন, দাঁড়কাক গুলা কর্কশ রবে ক-অ অ ক-অ-অ কবিতোছে। বড় আহ্লাদ হইল। তখন তিনি কিরূপে আপনাকে আপনি কঠিন নিষ্ঠুর বঠোর প্রকৃতির করিবেন, সেই

ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন। মাক্বেথ রাজাগমেব সংবাদ দিতে স্বয়ং উপস্থিত। গৃহিণী বলিলেন, ‘তোমার পত্র পাইয়া এখনই ভবিষ্যতের স্মৃতি-ভাগিনী হইয়াছি। মাক্বেথ বলিলেন—‘অদ্য বাত্রি ডঙ্কান এখানে আসিতেছেন।’ গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন ‘এখান থেকে যাবেন কখন?’ মাক্বেথ বলিলেন ‘আগামী কলাই এখান হইতে যাইবার সংকল্প।’ লেডি মাক্বেথ কঠোর কণ্ঠে বলিলেন ‘তাঁহাব এখানে এই নিদ্রার নিশা আব কখন প্রভাত হইবে না।’ মাক্বেথ স্পষ্ট উদ্ভিত বুঝিলেন, কিন্তু এই প্রবৃত্তির প্রতিবোধ করিতে পারিলেন না, বলিলেন ‘পরে এ বিষয়ে কথা হইবে।’ পাপের অঙ্কুরে প্রবৃত্তির সেবনে, পত্র নির্গমন হইল।

ষষ্ঠ দৃশ্যে মাক্বেথ ভবনে ডঙ্কান অতিথি। বাজা বড় আদরে, বড় আচ্ছাদে, বড় গৌরবে, লেডি মাক্বেথের হাত ধরিয়া বলিলেন ‘চলুন, আপনার স্বামীর নিকট আনাদের লইয়া চলুন।’

সপ্তমে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিবাদ।

পাপের পথে অগ্রসর হইয়া, তুমি যখন ছত্রব মহানরকে বশ্প দিও পাবকে পতনোগ্রথ পতঙ্গের মত হেট তুণ্ডে প্রস্থত, তখন নিবৃত্তি কখন নিশ্চিন্ত থাকে না। নিমকেব পুরাণ চাকরের মত, তুমি মান, আব নাই মান, সে তাহাব সকল কথা বলিবেই বলিবে। মাক্বেথ মহাপাপের পূর্বে, পূর্বে কথিত মহামন্ত্র ‘গুভাণ্ডভস্য শীঘ্রং’ জপ করিতে করিতে উপস্থিত; নিবৃত্তি নানা ছাঁদে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল; মাক্বেথ বুঝিলেন দয়া, ধর্ম, কৃতজ্ঞতা, বাজভক্তি, আতিথেয়তা সবগই তাঁহার বিরোধী, কেবল এক ছবাকাজ্জাই তাঁহার হৃদয়ে এই গুরুতব অসং কার্যের একমাত্র উত্তেজনা—কিন্তু ছবাকাজ্জায ত সর্বনাশ হয়।

I have no spur

To prick the sides of my intent, but only

Vaulting ambition which o'erleaps itself

And falls on the other.

এইরূপে মাক্বেথের হৃদয়ে নিবৃত্তি একটু অধিকার করিতেছে, এমন সময়ে দুঃসাহস-সংচরী লালসা-রূপা তাঁহার বাক্সসী গৃহিণী আসিলেন।

শুনিলেন, মাক্বেথ ইতস্তত কবিত্তেছেন, বলিলেন ‘এই, তোমাব আমাকে ভালবাসা ? তুমি নয় পুরুষ ? তবে মনে বাহা হয়, কাজে তাহা করিতে পার না কেন ? যদি পারিবেই না, তবে আমাকে এ কথা ভাঙ্গিলে কেন ? কবিব, বলিয়া এখন পিছাইয়া যাও ? ‘আমার ছেলেকে মাঝি’ এমন কথা যদি কখন বলিতাম, ত দেখিতে—আমার কোলে শুইয়া হাসিয়া হাসিয়া মাই খাটতেছে, সেই সময়ে তাহাব মুখ হইতে মাই খসাইয়া লইয়া আছাড় মাঝিয়া তাহাব মাথাব খি বাহিব কবিয়া ফেলিতাম—যাবা করিব বলিয়া, পরে পাবিব না বলে, তাবা আবার মালুষ !’

এই মানবী-বাক্সী-প্রেতিনী ভাষায় অভাগা মাক্বেথ ছিন্ন ভিন্ন বিচূর্ণ ছইয়া গেলেন। এই স্থলেই পিশাচী প্রবৃত্তিৰ পূর্ণবিকাশ। ভয়ানক বোদ্র, বীভৎস রসেব এমন বিকট উৎকট সন্মাবেশ আব দেখিতে পাওয়া যায় না। লেডি মাক্বেথেব কথা শুলি পড়িতে পড়িতে হৃদয় চমকিয়া উঠে; অভাগা মাক্বেথেব অন্য দুঃখ হয়, পাপিষ্ঠাব উপব বাগ হয়, বাগ কবিত্তে গিয়া ভয় হয়—ভয় করিতে গিয়া ঘৃণা হয়। যে কবি বলিয়াছিলেন, জীবুন্ধি প্রলয়ঙ্করী,—তিনিই বুঝিয়াছিলেন—লেডি মাক্বেথ কিরূপ পদার্থ ? লেডি মাক্বেথ প্রলয়ঙ্করী। এই প্রলয়ঙ্করী পিশাচীৰ প্ররোচনায় মাক্বেথ বাজ হত্যায দৃঢ় সংকল্প হইলেন। পাপতক শিবড গাড়িয়া বসিল; এখন কাটিতে পার, উপড়াইতে আব পার না।

পাপেব দৃঢ়সংকল্পে এই মহাপাপ নাটকেব প্রথম অঙ্ক পবিসমাপ্ত হইল; অদ্য এই পর্য্যন্ত।



নবজীবন ।

৪র্থ ভাগ ।

পৌষ ১২৯৪ ।

৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

পাতঞ্জল যোগসূত্র ।

* ৪ ।

অনুভূত বিষয়াঃ সংশ্রমেণ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

পদক্ষেপঃ—অনুভূত বাক্য অসংখ্য সংস্মৃতিঃ ।

পদার্থঃ—অনুভূতঃ, হৃদয়বদ বা জ্ঞানঃ চেতসা হৃদয়বিদিতশ্চ ; বিষয়ঃ, বৃত্তি স্তদ কটুঃ পদাংশ্চ, অশ্রমেণঃ, আশ্রয়-মনপহবন নিতিয়াবৎ, স্মৃতিঃ, স্মরণঃ, ইন্দ্রিয়াদি-বাক্য জ্ঞাতসা চেতসা হৃদয়বিদিতস্য বা বিষয়স্য বৃত্তে পদার্থস্য বা যো ইদং অশ্রমশ্রমেণঃ সংস্কারদ্বাবেণ বুদ্ধৌ যথাযথমুপাসোহঃ সা স্মৃতিঃ ।

ভাবার্থঃ—বিষয়ানুভবনস্তাৎ হি চিত্তে কোইপি সংস্কারোজায়তে স চ সংস্কারো যদা স্বাভিব্যঞ্জকেন কালাদিনা স্মৃতি বাস্তোভবতি তদা স্বসমানা কাবামেব স্মৃতিঃ জনয়তি, সা স্মৃতিঃ বহুতান্নাধিকঃ নাপান্না ।

তত্র প্রমাণ-বিপর্যয় বিকল্পা জ্ঞানবস্থাঃ । ত এব যদানুভববলাৎ প্রত্যক্ষ্যমানাস্তদা, স্বপ্নঃ । নিদ্রাত্ত্বসংবেদ্যমানবিষয়াঃ । স্মৃতিশ্চ প্রমাণ বিপর্যয়বিকল্পনিদ্রা-নিমিত্তা ।

অনুবাদ—আমরা পূর্বে যাহা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুভব কবি, সংস্কার বশত মস্তকরণে সেই অনুভূত বিষয়েব যে যথাযথ ক্ষুতি হয়, তাহার নাম স্মৃতি ।

অর্থাৎ পূর্বে আমবা যে কোন প্রমাণ (প্রত্যক্ষ, অনুমান বা শব্দ) দ্বারা যে কোন বিষয়ের অনুভব করি না কেন, সেই বিষয়ের একটি সংস্কার হয়; এই সংস্কার বশত অন্তঃকরণে পুনর্বার যে সেই বিষয়ের যথাযথরূপে দৃষ্টি হয়, তাহাব নান স্বৃতি ।

সমালাচনা ।—স্মৃতি বা স্মরণ একটি চিত্তের বৃত্তি বা পরিণাম । আমবা ইচ্ছিয়া বা যে কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ কবি, বা অনুমান দ্বারা যে কোন বিষয় নন্দী পত কবি অথবা আপ্ত লাগেব মুখ হইতে যে কোন বিষয় শ্রবণ কবি, অথবা ণা স যে সকল বিষয় অধ্যয়ন কবি, সেই সকল প্রত্যাক বিষয়ের এক এক ট পৃথক পৃথক সংস্কার অন্তঃকরণে উৎপন্ন হয় । সেই সংস্কার বশত জামাদেব চিত্তে আবার কখন কখন সেই পূর্বের প্রত্যক্ষীকৃত, অনুমিত, শ্রুত বা অন্যত বিষয়ের আকারে পরিণত হয় । চিত্তের এইরূপ পরিণামকে স্মৃতি বলে । স্মৃতি জনা বিষয়ের ইচ্ছিয়-সম্বন্ধির্ষ, ব্যাপ্তি-জ্ঞান বা বস্তুর পরিমাণিকতা ইত্যাদি কোন কাবণের আবশ্যকতা নাই । একমাত্র সংস্কারই কারণ, সেই সংস্কার আবার যেকোন কেন হউক না, প্রকৃত বিষয়ের হউক বা ভ্রান্ত বিষয়ের হউক সেই সংস্কার অনুসাবেই আমাদের স্মৃতি হইবে । স্মৃতির প্রতি এমনত্র সংস্কারই কাবণ । আমবা দশ বৎসর পূর্বে আগাব তাজমহল দেখিয়াছি, কিন্তু দশন অবধি জামাদেব মনে এমনি একটি সংস্কার জন্মিযাণে যে, অমবা যখন মনে বরি, তাজমহলের কাছে যাউতে হয় না, আগায যাউতে হয় না উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেও যাউতে হয় না, বাঙ্গালাদেশ ঘবেব ভিতর দ্বাব কদ্ধ কবিয়া চক্ষু মুদিত কবিয়া জামাদেব অন্তঃকরণক তাজমহল আকারে পরিণত কবিত্তে পাব । অর্থাৎ মনের মধ্যে তাজমহল দর্শন কবিত্তে পবি । ঐকপ তাজমহল দর্শনেব নাম তাজমহল স্মৃতি । ঐকপ পূর্ণাভিমিত বা পূর্ণশ্রুত বস্তুর বেবল একমাত্র সংস্কারেব উদ্দীপন বশত স্মরণ হইয়া থাকে । সংস্কারেব উদ্দীপন নানা কাবণে হয় । জামাদিগেব ইচ্ছা বশত, পূর্ণাভুত বস্তুর সদৃশ বা একেবাবে বিসদৃশ অন্য বস্তুর দর্শনে, বা শ্রবণে, অথবা যে সময় সেই বস্তুর অনুভব হয় সেই সময়ের উপস্থিতিতে, কিবা যে ব্যক্তিব সহিত উহাব অনুভব হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির দর্শনে, অথবা তাহাব নাম শ্রবণে, অথবা তাহার সম্পর্কীয় কোন বস্তু দর্শনে—এইরূপ অসংখ্য কাবণে পূর্ণাভুত বস্তুর সংস্কার উদ্দীপিত হইয়া স্মৃতি

যা স্ববর্ণের উৎপাদন করে। সংস্কার অনুসারে বস্তুর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আর বস্তুর যথার্থতা বা অযথার্থতার বিচার কবিত্তে হয় না। আমরা যদি পূর্ব মুখ গৃহকে পশ্চিম-মুখ বলিয়া দিগিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের পশ্চিম-মুখই স্মরণ হইবে। অবশেষে কাছে প্রমাণ ও অগ্রমাণ দুই সমান। এই নিম্নিত্ত প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প ও মিথ্যা এই চারি বৃত্তির দ্বারা গৃহীত বস্তুরই স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং স্ববর্ণ পূর্বোক্ত চারি বৃত্তির কোনটির অন্তর্গত হইতে পারে না।

ভাষ্যকার বেদব্যাস সৃষ্টির বিষয় এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন—
“কিং প্রত্যয়স্য চিত্তং সর্বত আহাসিতং নিষবদোতি গ্রহোপবক্তঃ প্রত্যয়া
গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকাবনির্ভাসঃ তথা জাতীয়বৎ সংস্কার মাভভে সচ সংস্কারঃ
স্বয়ংকল্পনাস্তদাকাবামেব গ্রাহ্যগ্রহণোভয়ান্বিতঃ সৃষ্টিজ্ঞানমতি। তত্র
গ্রহণাকাবপূর্ণা বুদ্ধিঃ গ্রাহ্যাকাবপূর্ণা স্মৃতিঃ। সা চ দ্বয়া ভাবিত-স্মৃতিয়া
অভাবিত-স্মৃতিয়া চ। স্মৃতি অভাবিত-স্মৃতিয়া জ্ঞানং সময়ে ভাবিত-
স্মৃতিযোতি। সর্বাঃ স্মৃতিয়ঃ প্রমাণ বিপর্যয়-বিকল্প-মিথ্যা স্মৃতি-মুভব্যাং
প্রভবন্তি।”

চিত্ত কহাব স্ববর্ণ করে? কেবল পাত্র অর্থাৎ অনুভব মাত্রের স্ববর্ণ করে? অথবা কেবল অনুভূত বিষয়ের স্ববর্ণ করে? পূর্ব যদি যজ্ঞান হইয়া থাকে তবে স্ববর্ণ কালে কি সেই জ্ঞান মাত্রের স্ববর্ণ হয়, অথবা কেবল ঘটের স্ববর্ণ হয়। এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিষয় ও পাত্র এই উভয়েই স্মরণ হয়। বেন তাহা বুঝাইতেছেন—“আমাদের প্রত্যয় অর্থাৎ অনুভব বা জ্ঞান—গ্রাহ্যোপবক্ত। গ্রাহ্য—জ্ঞানবাবধয় (ঘটাদি), তাহা দ্বারা উপবক্ত, অর্থাৎ আমাদের যে সঙ্গ বস্তুর জ্ঞান হয়, আমাদের জ্ঞান সেই বস্তুর আকারে পরিণত হয় সুতরাং আমাদের অনুভব (প্রত্যয়) গ্রাহ্য ও গ্রহণ, জ্ঞানবিষয় ও জ্ঞান, এই উভয় আধাবেই প্রকাশমান, এক্ষণে দেখ, আমাদের অনুভব যখন অনুভূয়মান বিষয়ের আকারে পরিণত, তখন সেই অনুভূয়মান বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অনুভবের স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন মাই। আরও দেখ, আমাদের প্রথম অনুভব যখন জ্ঞান ও জ্ঞান এই উভয়াকার-সংশ্লিষ্ট, তখন উহা হইতে উৎপন্ন সংস্কারগুলিও জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই উভয়াকার হয়। এই সকল সংস্কার আবার আপনার স্বয়ংক

যা ভাষাধিক কালাদি দ্বাৰা উদ্ভূত হইয়া জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই উভয়ান্বয়িক স্মৃতিবই দৃষ্টাবলি করে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পাবে যে, অমুভব—জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই উভয়ান্বয়িক, স্মৃতিও—জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই উভয়ান্বয়িক, তবে অমুভব ও স্মৃতি এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? ভাষ্যকাব বলিলেছেন, হাঁ ছুইটাই উভয়ান্বয়িক হইলেও ইহাদেব মধ্যে একটি মন্তঃ প্রভেদ আছে, তাহা এই যে, বুদ্ধি বা অমুভব গ্রহণকাব-পূৰ্ণা এব স্মৃতি গ্রাহ্যকাব-পূৰ্ণা। অমুভব বা বুদ্ধিকে গ্রহণ কাব পূৰ্ণা বলা হইয়াছে। গ্রহণকাব-পূৰ্ণা অর্থ জ্ঞান বিশেষ্যক। গ্রহণ শব্দের অর্থ জ্ঞান। অমুভব বা বুদ্ধিতে জ্ঞান বিশেষ্যকাব প্রত্যক্ষমান হয়। সুতরাং অমুভবের উদাহরণ ‘আমি ঘট-বসন্তে জান আছে, বা হইতেছে।’ এখানে দেখ, জ্ঞান বিশেষ্য এব ঘট বিশেষণ। আমার জ্ঞানটা কেমন হইয়াছে? না, ঐটি বিষয়ক। সুতরাং জানি কবিলেন গ্রাহ্যকাব পূৰ্ণা। গ্রাহ্য বলি ত জ্ঞেয় পদার্থ ঘটাদি গাহা, জ্ঞেয় (ঘটাদি) যখন বিশেষ্য রূপে প্রদীপন ন হয়, তখন স্মৃতি হয়। সুতরাং উদাহরণ দেব ‘সেই ঘট, সেই কিনি পূৰ্ণ জ্ঞাত, অর্থাৎ যত পূৰ্ণে দেখিয়া গিয়া সেটি ঘট’ পূৰ্ণ জ্ঞানের বিষয়ীভূত ঘট। এখানে ঘটাবশেষ এব পূৰ্ণ জ্ঞান বা অমুভব তাহা নির্দেশ করিতে পারেন। ‘না, পূৰ্ণ জ্ঞানের বিষয়ীভূত’ এখানে পূৰ্ণজ্ঞান দ্বারা, যতক বিশেষ এব হইয়াছে এই নিমিত্ত ঘট বিশেষ্য।

সেই স্মৃতি অবস্থায় দুই প্রকার। (১) ভাবতঃস্মৃতিয়া, (২) অভাবিত স্মৃতিয়া। ভাবিতস্মৃতিয়াব অর্থ যে স্মৃতি দ্বারা স্মরণ্য অর্থ স্মৃতিত হয়। এতরূপ স্মৃতি সপক্ষ লে উৎপন্ন হয়, কারণ, শাস্ত্র বোনি বোনি স্বপ্ন ভবিষ্যৎ অথবা স্মৃতি বসিরা নির্দেশ কবিয়াছেন ‘স্বপ্নে গহা দৃষ্ট হয় তাহা স্মৃতিয়া, কেবল স্মৃতি বসি হয়।’ অভাবিতস্মৃতিয়ার অর্থ, ভাবতঃস্মৃতিয়া ভিন্ন। ইহা জ্ঞানদেবস্বত্ব স্মৃতি, জাগ্রৎ অবস্থায় বোনি ভাবি অথবা স্মরণ হয় না। প্রমাণাদি সমুদয় স্মৃতি জ্ঞান অমুভূত পদার্থ স্মরণের বিষয় হওয়ায় এই বুদ্ধিকে অপরাধ্য বপবে নির্দেশ করা হইয়াছে।

‘মণপ্রভা’ নামক বৃত্তকার বলেন, অমুভব হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। অতএব অমুভব স্মৃতিবিশিষ্ট। পুত্র যেমন পিতার বিষয় অধিকার করে, সেইরূপ স্মৃতিও অমুভবের বিষয়কে অধিকার করে। অমুভব শব্দের অর্থ

বোধ। বোধ হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয়। সেই সংস্কার হইতে পূৰ্ণাঙ্গভূত বিষয়ের পুনর্জীব যে অনুভব হয়, তাহার নাম স্মৃতি।

যে পাঁচ প্রকার বৃত্তিব নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহাদের সকলেরই স্বরূপ বলা হইল। বোধ ও পাঠকগণও বুঝতে পারিলেন, বৃত্তিগুলি কি। এই সকল বৃত্তিবই নিবন্ধ করা উচিত, কারণ ইহারা সকলেই সূত্র দুঃখ মোহময়। এক্ষণে বলিতে পার, দুঃখ ও মোহময় বৃত্তিগুলিকে কোথায় কথিতে হয় কব, সূত্রময় বৃত্তিগুলিকে বোধ বিবর্তে চাপ কি বলিয়া? ইহাও উত্তরে ভাষাণ্যব বলিয়াছেন 'এতে ক্লেশেষু ব্যাখ্যায়ঃ।' ক্লেশ সূত্রের ব্যাখ্যাব সময় ইহা দেব সবলকেই ক্লেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ স্থলে সূত্রে 'ব্যাখ্যায়ঃ' জনক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যে বিবর্তে যত সূত্র পওয়া যায়, তত সেই বিষয় ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, স্মৃতি অনুসারেই বিষয় ভোগের ইচ্ছা প্রবল হয়। কাজেই সূত্র দুঃখের কারণ হয়। অতএব দুঃখের নাম সূত্রও পবিত্রত্যাগ; আর যাহাতে বন্ধন স্মৃতি অনুভূত না হইতে পারে, এই নিমিত্ত স্থাপন পদক বৃত্তি সকলের একেব বৈ নিবোধ করা উচিত। যখন সূত্রভাবক বৃত্তিই নিবোধক্য বলা যুক্তি সঙ্গত হয়, তখন দুঃখ ও মোহময় বৃত্তিগুলি যে অগ্রে নিবোধক্য সে বিষয় সন্দেহ কি?

অভ্যাসবৈবাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

পদ ছন্দঃ। অভ্যাস বৈবাগ্যাভ্যাং, অভ্যাসে বৈবাগ্যাক্ত তে, তভ্যাম্ তাসাং নিবোধঃ।

অর্থঃ। অভ্যাসেন বৈবাগ্যেণ চ তাসাং চিত্তবৃত্তীনাং ক্লিষ্ট রূপাণাং নিরোধঃ সিধ্যতি।

পদার্থঃ। অভ্যাসো নাম বক্ষ্যমাণশ্চিত্তসৌকার্যপ্রত্যয়ঃ ধাবাপ্রবাহী যত্নবিশেষঃ, বৈবাগ্যাক্ত বাগ্যভাবঃ, বিবরণ্যবাঙ্কমুখতোতি যাবৎ, তাত্ধ্যাং কবণাত্যং তাসাং চিত্তবৃত্তীনাং নিবোধঃ অবশেষনং ব্যাপারনিবৃত্তির্নিবোধঃ।

ভাবার্থঃ। অগ্রে ব্যাখ্যাস্যমানাভ্যাসভ্যাসবৈবাগ্যাভ্যাং তাসাং প্রকাশবৃত্তি-নিয়ম-করণং চিত্তবৃত্তীনাং নিবোধঃ, প্রতিহতনং, বিনিবৃত্তঃ বাহ্যভিনিবেশনাং তাসামন্তর্মুখতয়া স্বকারণে চিত্তএব শক্তিরূপতয়া।

দৃষ্টানং ভগ্নতীতি শেষঃ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তাক্চিৎতবৃত্তয়ো বাহ্যবি-
ষয়েভ্যো বিনিবৃত্ত্যাপারাম্ভিত্ত্বং এব প্রলীনাস্তিষ্ঠন্তীতিভাষ্যঃ। তত্র বিষয়
দোষ দর্শনজেন বৈবাগ্যেণ বিষয় বৈমুখ্য মুৎপাদ্যতে, অভ্যাসেন চ সূখ-
জনকশাস্ত্র প্রবাহ প্রদর্শনদ্বাবেণ দৃঢ়ং স্থৈর্যমুৎপাদ্যতে, ইত্যাভ্যাং ভবতি
চিন্তাবৃত্তিনিবোধঃ।

অনুবাদ। অভ্যাস, চিত্তের একাগ্রতা সাধক দ্বারা প্রবাহী যন্ত্র বিশেষ ;
এবং বৈবাগ্য, বিষয় ভোগ হইতে পবাঙ মুখতা, এই উভয় উপায় দ্বারা
পূর্বোক্ত চিন্তাবৃত্তি সবলের নিবোধ হয়। অর্থাৎ এই উভয় উপায় দ্বারা
জাহাবা অস্বাধ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্তঃকরণে লীন ভাবে অবস্থান
করে।

সমালোচন — অভ্যাস এবং বৈবাগ্য কহাকে বল, তাহা গুরুতর স্বয়ং
পরেই এক একটি সূত্র দ্বারা যথাক্রমে ব্যক্ত করিতেছেন, সুতরাং তাহা
এখানে বলা অনাবশ্যক। চিত্তবৃত্তির নিবোধ কহাকে বলে, তাহাও
আমরা এক প্রকার বলি। আসিয়াছি কেবল তাহা শ্রবণ করাইবার জন্য
এখানে এই বলিলেই হইবে যে বৃত্তিগুলির বাহ্য বিষয়ের সহিত সংস্কৃত
উদ্ভূতন দ্বারা তাহাদিগকে ক্রিয়-শূন্য কবিয়া অন্তঃকরণে প্রলীন ভাবে
অবস্থাপনের নাম নিবোধ। বৃত্তিদিগের উক্ত রূপ ক্রিয়া শূন্য অবস্থা কবি-
বার নিমিত্ত দুইটি মাত্র উপায় আছে। প্রথম, অভ্যাস, দ্বিতীয়, বৈবাগ্য।
অভ্যাস দ্বারা চিত্তের সূক্ষ্ম স্থৈর্য সম্পাদন করা হয়, এবং বৈবাগ্য দ্বারা
বিষয়ভোগেব অভিলাস হইতে চিত্তকে বিনুত করা হয়। অভ্যাস এবং
বৈবাগ্য এই উভয় মিলিত হইয়াই বৃত্তিদিগের নিবোধ সাধন করে। কেবল
অভ্যাস বা কেবল বৈবাগ্য কখনই বৃত্তিদিগের নিবোধ সাধনে সক্ষম হয়
না। এই কথা ভাষ্যকার একটি রূপক দ্বারা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন,
যথা—

“ চিন্তনদী নামোত্তরতো বাহিনী, বহতি কলাগায়, বহতি পাপায় চ।
যাতু কৈবল্য প্রাগ্ভারা বিবেক-বিষয়-নিম্না সা বল্যাণবহা, সংসার প্রাগ-
ভারাবিবেক বিষয়-নিম্না পাপবহা। তত্র বৈবাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলী-
ক্রিয়তে, বিবেক দর্শনাভ্যাসেন বিবেক-স্রোত উদ্ঘাট্যতে ইত্যুভয়াগীন-
চিন্তাবৃত্তিনিবোধঃ।”

চিত্র একটি নদীর স্বরূপ, যেমন নদী সমুদ্রেব জোয়ার ও ভাটা এই দুই রূপ গতি লক্ষিত হয়, কখন সমুদ্রাভিমুখে এবং কখন বা তাহাব বিপরীত দিকে যায়, চিত্র নদীবও সেইরূপ দুইটা বিপরীত প্রবাহ লক্ষিত হয়; কখন উহা মঙ্গলময় মোক্ষ অভিমুখে, আর কখন বা এই পাপসঙ্কল স সাবের দিকে গমন করে। এষ্ট চিত্রনদী যখন মোক্ষাভিমুখে হয়, তখন বিবেক রূপ প্রণালী বা নির্গমমার্গদ্বারা প্রবাহিত হয়; আর যখন সংসারভিমুখী হয়, তখন অবিবেক রূপ প্রণালী দ্বারা বহিষা যায়। যেমন পরিত্রাণি কোন আগন্তুক পশ্চিম দিক দিগে নদীর বেগেব হ্রাস হয়, সেইরূপ বৈবাগ্য উপস্থিত হইলে চিত্রনদীর সংসারগামী স্রোত ক্রমশঃ কম পড়িতে থাকে। আব যেমন এষ্টা নদীর প্রবাহে আর একটা নদীর প্রবাহ আসিয়া পড়িলে, প্রথম প্রবাহকে বলবৎ করে, সেইরূপ অভ্যাস দ্বারা বিবেকগামী চিত্রনদীর স্রোত পূর্ণাঙ্গ প্রবল হয়। অতএব চিত্ররূপের সম্পূর্ণভাবে নিবোধ করিতে হইলে অভ্যাস এবং বৈবাগ্য এই উভয়েবই আবশ্যকতা আছে। উপরি উক্ত রূপেব মর্ম্ম এই যে, আমাদের চিত্তের স্বভাবতঃ সং ও অসং এই উভয়দিকই প্রবৃত্তি আছে, উহাদের মধ্যে বৈবাগ্য দ্বারা অসং প্রবৃত্তি সক্রিয় হইয়া যায়, কিন্তু ঐ অসং প্রবৃত্তির হ্রাসেব সহিত যদি সং প্রবৃত্তির বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে ঐ হ্রাস কোন কার্যেবই হয় না। ততঃ অল্পক্ষণ মাত্র এই অবস্থা থাকিয়া আবার অসং প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হইতে পারে। এই নিমিত্ত যে পরিমাণে অসং প্রবৃত্তির হ্রাস হইবে, সেই ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে সং প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যিক। সং প্রবৃত্তির বৃদ্ধির প্রতি একমাত্র অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুশীলনই কারণ; বৈবাগ্য বশতঃ অসং প্রবৃত্তি এতাবাবে নির্মূল হইলে এবং অভ্যাস দ্বারা সং প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বুদ্ধিলাভ করিলে আমাদের অন্তঃকরণ কেবল সত্ত্বময় হইয়া ছিবে অংশভোগ করিতে ইচ্ছুক হইবে। অতএব ধারণ করে। আমরা পূর্বেই বলিযাছি, নদীর তবঙ্গেব মত বৃত্তি সকল অন্তঃকরণের তরঙ্গ স্বরূপ। নদী স্থির হইলে যেমন তরঙ্গ সকল অদৃশ্য হয়, তেমনি অন্তঃকরণ স্থির হইলে ধারণ করিল বৃত্তি সকলও অদৃশ্য হয়।

মণি-প্রভা নামক বৃত্তিকার বলেন, মনুষ্যের চিত্রনদী স্বভাবতঃ সংসারভিমুখী বৈবাগ্য বলে উহার সেই সংসারভিমুখ স্রোত কম

এবং বিনোক্ত্যাস বশত ঐ শ্রোত আবার সংসারের বিপরীত অর্থাৎ মোক্ষানিমুখে প্রবাহিত হইতে আবদ্ধ হয়। যদি অভ্যাস না থাকিত তাহা হইলে বৈরাগ্য প্রভাবে চিত্তের সংসারান্ধিমুখ প্রবাহের নিরোধ হওয়ায়, হয় ত, চিত্ত কেবল সর্বদা নিদ্রাভিভূত হইয়াই থাকিত। এই নিমিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই উভয়ই চিত্তের নিরোধ সাধনের উপায়।

অভ্যাস কি, বলিতেছেন:—

তত্র স্থিতৌ যত্তৌ অভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

পদচ্ছেদঃ।—তত্র, স্থিতৌ, যত্ন', অভ্যাসঃ।

অর্থঃ।—স্পষ্টম্।

পদার্থঃ—তত্র অভ্যাস বৈরাগ্যযোঃস্থৌ স্থিতৌ (বৃত্তিবহিতস্য চিত্তস্য স্বরূপনিষ্ঠ পবিধাসঃ প্রশান্তবাহিতা, এতৎসকলপরিধি ধাবেনি যাবৎ স্থিতিঃ) তত্রস্থিতৌ (নিমিত্তার্থে সন্তুপ্তী, স্থিতিঃ প্রাপ্তু মিতার্থঃ) যত্নঃ উৎসাহঃ পুনঃ পুনঃ স্থিতিসাধনানুষ্ঠান মিত্যিবৎ, স অভ্যাসঃ, তাদৃশস্য যত্নস্য অভ্যাস ইতি সংজ্ঞা।

ভাবার্থঃ—চিত্তমৌকাগতাং সাধয়তি পুনঃপুনঃ যঃ প্রযত্নঃ ক্রিয়তে স এবাভ্যাসঃ।

অনুবাদ—‘স্থিতি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা সাধনের নিমিত্ত যত্নের যে প্রযত্ন করা হয়, তাহার নাম অভ্যাস।’

সমাধাচনা।—‘ই সূত্রে বিশেষ আলোচনায় বিষয় কিছুই নাই। কেবল স্থিতি ও যত্ন এই দুইটি শব্দের অর্থ ভাল করিয়া জানিতে পারিলেই আর কিছুই আপত্তি থাকে না। এইজন্য ভাব্যক, ঐ দুইটি শব্দের যেকোন অর্থ কবিতাছেন, তাহা নিয়ে প্রদর্শিত হইল।’

‘চিত্তস্যাবৃত্তিবস্যা প্রশান্তবাহিতা স্থিতিঃ, তদং প্রযত্নঃ বীৰ্য্যমুৎসাহঃ তৎসংলিপাদযিষয়া তৎসাধনানুষ্ঠানম্’—

অবৃত্তিক, বৃত্তিশূন্য, অর্থাৎ বাজস তামস বৃত্তি রহিত, চিত্তের যে প্রশান্ত বাহিতা, হর্ষ শোকাদি তৎস্বের অভাব হেতুক দিব বা একাগ্র ভাবে অবস্থান, তাহার নাম স্থিতি। সেই স্থিতি, অর্থাৎ তদৃশ একাগ্রতা, লাভের নিমিত্ত যে প্রযত্ন, উৎসাহ,—অর্থাৎ সে সকল উপায়ে ঐ স্থিতি সম্পাদিত হয়, সেই সকল উপায়ের যে বারবার অনুষ্ঠান তাহার নাম

প্রযত্ন। নির্বিকার চিত্তের স্বাভাবিক নিশ্চল ভাবে থাকার নাম স্থিতি। এবং যে যে উপায়ে চিত্ত ববাবব ঐক্য নিশ্চলভাবে থাকিতে পারে, নিরন্তর সেই সকল উপায় অবলম্বন করাই প্রযত্ন। ঐ প্রযত্নকেই অভ্যাস বলা যায়।

মাণ-প্রভা নামক বুদ্ধিকার বলেন, ‘বজ্রস্তুমোবুত্তিশূনাগ্য চিত্তসৈকাগ্রতা’ স্থিতিঃ, তস্যাং কার্যমায়াং যানি সাধনানি যম নিয়মাদীনি, উদ্বিষয়ঃ প্রযত্নোহুষ্ঠান—মভ্যাস ইত্যর্থঃ।

রাজস এবং তামস বুদ্ধিগুণ্য চিত্তের একাগ্রতাকে স্থিতি বলা হয়। সেই স্থিতি লাভ করিবার নিমিত্ত যে সকল যম নিয়ম আদি উপায় পড়ে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত যে যত্ন, অর্থাৎ বাবল্যব সেই সকল উপায়ের অহুষ্ঠান, তাগকে অভ্যাস বলে।

যদি বল, আমাদেব মনে রাজস তামস বুদ্ধি সকলের সংস্কার সেই অনন্ত-কাল হইতে প্রবলভাব বজ্রযুল হইয়াছে, তাহাবা চিত্তের একাগ্রতা সাধনের সম্পূর্ণ বিবোধী। অতএব সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দী বিদ্যমান থাকিতে অভ্যাস কি প্রকারে একাগ্রতা সাধনে সমর্থ হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ পতঞ্জলি পব সূত্রেব উপন্যাস করিতেছেন।

সতু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যাসংকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ। ১৪।

পদচ্ছেদঃ।—স, তু, দীর্ঘকাল, নৈরন্তর্য্য, সংকার, আসেবিতঃ, দৃঢ়-ভূমিঃ।

পদার্থঃ।—সঃ অভ্যাসঃ তু (চ, হি, বা), দীর্ঘকালঃ বহুকালঃ, নৈরন্তর্য্যঃ, অবিরুদ্ধঃ; সংকারঃ, আদবঃ, আসেবিতঃ, সেবামানঃ, দীর্ঘকালন্ত, নৈরন্তর্য্যং, সংকারন্ত, তৈ বাসেবিতঃ, দৃঢ়ভূমি রন্যোবনতিভবনীয়ঃ।

অর্থঃ।—স তু অভ্যাসঃ দীর্ঘকালনৈবন্তর্য্যাসংকারাসেবিতশ্চেৎ দৃঢ়-ভূমির্ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ।—“ব্রহ্মাংপরঃ প্ররমানঃ শব্দঃ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে” ইতি ন্যায়াং আসেবিতোতিগদেন দীর্ঘকালাদেঃ প্রত্যেকসাহস্রয়ন্তথাহি দীর্ঘকাল-সেবিতঃ, নৈবন্তর্য্যাসেবিতঃ, সংকারাসেবিত ইতি বিভাগঃ। স অভ্যাসঃ বদা দীর্ঘকালাসেবিতোভবেৎ, বহুকালপর্য্যন্তং সেবামানোভবেৎ নৈরন্তর্য্যোপ-অবিরুদ্ধেন সেবামানোভবেৎ, তথা তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ বিদ্যায়া ব্রহ্মহা চ

আসেবিতঃ সম্পাদ্যমানোভাবঃ তদা দৃঢ়ভূমিভবেৎ দাঢ্যায় প্রভবতীত্যর্থঃ, তদা ন কোঃপি স স্বাবস্তমভ্যাসং নিবাবয়িতুং শক্যুয়াদিতি ভাবঃ ।

অনুবাদ —সেই অভ্যাস বহুকাল পর্য্যন্ত অনববত তপস্যাদি সংকার্য্য জ্ঞান ও শ্রদ্ধাপূৰ্ণক অমুষ্ঠিত হইলে অতিশয় দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় । সেই অভ্যাস আর কিছুতেই বিচলিত হয় না ।

সমালে চন । এক আধ দিনেব অভ্যাস বৃত্তান্ত-রব প্রাবল্য-বশত নিবৃত্ত হইতে পাবে, কিন্তু যদ বহুকাল পর্য্যন্ত একাদিক্রমে তপশ্চরণ, ব্রহ্মচর্য্য, বলধন প্রভৃতি সংশ্লেশেব জ্ঞান পূৰ্ণক ভক্তিসহকারে অনুষ্ঠান কৰা হয়, তাহা হইলে অভ্যাস একেবারে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, অবদে'নরূপ প্রতিকূল বৃত্তিতে অভি-ভূত হইয়া স্বাবায়া হইতে নিবৃত্ত হয় না । মণিপ্রভা নামক বৃত্তিবার বলেন, অত্র যে 'তু' শব্দেব সংযোগ কৰা হইয়াছে, উহা পূৰ্ব্বোক্ত আশঙ্কা নিবা-রণার্থ, তদ্বিন্ন ইহাব আব কিছুই অণ নাট ।

অভ্যাসেব পব বৈবৰ্ণ্যেব স্বরূপ নির্দিশ কবিত্তেচেন ।

দৃষ্টান্তশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীক'রসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ । ১৫ ॥

পদচ্ছেদঃ । —দৃষ্ট, আশ্রয়িক, বিষয়, বিতৃষ্ণা, বশীক'ব, সংজ্ঞা, বৈরাগ্যম্ ।

দৃষ্টান্তশ্রবিক-শ্চেতি বিশেষণ সনাস' দৃষ্টান্তশ্রবিকৌ বিষয়ৌ ইতি বস্ম-ধারয়ঃ, তত্র বিতৃষ্ণাঃ বিগত্ৰা তৃষ্ণা যস্য সঃ ওস্য ।

পদার্থঃ । —দৃষ্টে, ইষ্টপোপপভামানে গন্ধমালাদিভোগবস্তুনিচয়ঃ, আনুশ্রবিকঃ অনুশ্রবতে গুরুমুখাদিতানুশ্রবৌ বেদঃ, তত আগতঃ তৈ নিক্ৰ-পিত ইত্যর্থ আনুশ্রবিক—বিষয়ঃ স্বর্গাদিঃ তয়োবি'তৃষ্ণসা তং প্রাপ্ত্যভিলাষ-শূন্যস্য বশীক'বসংজ্ঞা—মনৈত্বে বশ্য্য নাইমেতেষাং বশ্য ইত্যাক'বক-পরা-মর্শঃ, বিরাগস্য ভাবঃ বৈরাগ্যম্ ।

অন্বয়ঃ । —স্পষ্টম্ ।

ভাবার্থঃ । বিষয়ৌ দ্বিবিধঃ, দৃষ্টে, আনুশ্রবিক-দৃষ্ট-বিষয়া নাম স সাবে 'অনুভূয়মান অক্চন্দনবনিতাভয়ঃ আনুশ্রবিকাশ্চ বেদাদিভি নিক্ৰপিতাঃ স্বর্গা-দয়ঃ, তেষাং বিষয়ানাং দোষা-বলোক্য তত্র বীতাহভিলাষং যোগিনঃ বিষয়া মনৈব বশ্য্যঃ নাইং বিষয়ানামিত্যাক'রকং যৎ স্বাধীনং চিত্তং বর্ত্ততে তদেব বৈরাগ্যম্ কথ্যত ইতি শেষঃ । রাগাহত, বমাত্রঃ বৈরাগ্যঃ ন নিরোধ হেতু-

বোণাদি নিমিত্তকাঙ্ক্ষিতো বোণাহিমুদয়াৎ । দোষদর্শন-জনা-রাগাভাবো-
হপি ন নিবোধ হেতুঃ, দোষদর্শনজবৈরাগাদনন্তবমপি বিষয়-সান্নিধান চিত্ত
কোভতঃ সৌভাগ্যাদে বোণাহিনীপ্ততশ্চ । অতোহত্র বৈবাগস্য বৈতৃষ্ণা-
য়াত্র ন লক্ষ্যং কিন্তু যথোক্ত বিতৃষ্ণয়া বশীকাং সংজ্ঞাত ।

অনুবাদ।—দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতমানসাংসারিকভোগ্য-বস্তু, ‘আনু’
শ্রবিক অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র নিকপিত-পারলৌকিক-স্বর্গাদিাবশ্য, এই
উভয়বিধ বিষয়েব দোষ দর্শন করিয়া উহাদিগেব শ্রুতি অভিনাষ-শূন্য ব্যক্তির
স্বচিন্তের বশীকরণ অর্থাৎ স্বাধীনতা উৎপাদনেব নাম বৈরাগ্য ।

সমালোচন।—আমরা এই সংসারে দুই প্রকার লোক দেখিতে পাই ।
একজন কেবল ঐহিক সুখের জন্য লালায়িত, ভাল খাইব, ভাল পাইব, টাকা
জমাইব, বাড়ী বনাইব, নাম কিনিব, যশ পাইব, ইত্যাদি । ইহারা সকলে
যে সকল ভোগেব নিমিত্ত লালায়িত, সেই সকল ভোগেব নাম দৃষ্ট । আর
এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের বেবল দেল দুর্গেৎসব প্রভৃতি কার্য্য
করিব এই বুদ্ধি, তাঁহারা ইহলৌকিক সুখে পবাডমুগ, বেবল পারত্রিক
সুখেব জন্য লালায়িত, স্বর্গভাগ কবিব, নন্দন বনে অঙ্গবা লইয়া ক্রীড়া
করিব, অমৃত খাইব, এই সকল আশায় তাঁহারা মোহিত, যাঁহাই সর্ব্বশ্ব
ব্যয় কবিয়া সাগৰজ্ঞ নবিত বাতিবান্ত । ঐহিক ভোগে বিষয়, পারত্রিক
ভোগে বিষয় । সুতরাং উভয় প্রকার ভোগেজুকেই বিষয়ী বলা যাইতে
পাবে । কিন্তু যে সকল তত্ত্বদর্শী সাধু ব্যক্তি এছ ভয়বিধ বিষয়কে ত্যাগ
সংশ্লিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের উপব বীতবাগ হইয়া মনকে আপন ব বশভূত
কবিত্তে সমর্থ হইয়াছেন, অর্থাৎ আপনাব ইচ্ছায় সেই সকল বিষয়েব আপাত-
মধুব প্রলোভন হইতে অপমৃত্যু কাবতে পারিয়াছেন, তাঁহারা নিরাগী এবং
তাঁহাদের সংকপ চিত্তকে স্ববশে আনাকে বৈরাগ্য বলা হয় ।

মহার্ষি পতঞ্জলি কেবল বিষয় বিতৃষ্ণানে বৈবাগ্য বলিলেন না, ক’বণ
অনেক সময় আমাদের বোণাদি দ্বাবা অনেক বিষয়ে অরুচি জন্মে, কিন্তু সে
অরুচি বৈবাগ্য নহে । বিষয়েব দোষ দেখিয়া অনেক সময়ে বিষয়ে বিতৃষ্ণা
হয় বটে, মৃত স্ত্রীব দাহ কবিত্তে কবিত্তে বোধ হয় এইত সংসার ! আর
ইহাতে মগ্ন হইব না, আব বিবাহ-কবিব না, কিম্ব সে বিতৃষ্ণা অস্তি
অচিরস্থায়ী । দুদিন যাঁহাতে না যাঁহাতে বেবল বিবাহ করা হয়, এমন নহে,

পূৰ্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণবাগে সংসার করিতে পবিত্র হই। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি বলিলেন, বিষয়ের দোষ দেখিয়াই হৌক আর না দেখিয়াই হৌক, বিতৃষ্ণা মাত্রকে বৈবাগ্য বলা যাইতে পাবে না। কাবণ আবার প্রলোভনে পড়িয়া বিষয় তৃষ্ণা প্রবল হইতে পারে। অতএব সেইরূপ বিতৃষ্ণার পর চিত্তকে যে স্ববশে স্থাপন করা, যাবৎ প্রলোভনের অধীন হইতে না দেওয়া, তাহার নাম বৈবাগ্য। বিষয়ের দোষ মণি প্রভা নামক বৃত্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। সেগুলি এই। বিনাশ (বিষয়ের ধ্বংস), পরিতাপ (অগ্রাণু বা ক্ষতি নিবন্ধন মানসিক দুঃখ ইত্যাদি), অতিশয় আধিক্য (একজনের বেশী একজনের কম) ও অসুখ ইত্যাদি।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি চিত্ত বৃত্তিব নিবোধেব নামই যোগ। চিত্ত বৃত্তির নিবোধ কিছু সহজ নয়। অভ্যাস এবং বৈবাগ্য এই দুইটা একত্রিত হইলে তবে চিত্ত বৃত্তিব নিবোধ হয়। আজকাল যোগ যত সুলভ হইয়াছে, বাস্তবিক আসল যোগপদার্থ একটা জনযোগেব মত সুলভ নয়। ইহার অনুষ্ঠান করিতে অনেক সময় এবং অনেক মানসিক বলের আবশ্যক। অভ্যাস এবং বৈবাগ্যের লক্ষণ ভাল করিয়া আলোচনা করিলে বৃত্তিতে পারি-বেন, যোগানুষ্ঠান বড় কঠিন। চিত্তকে এইরূপ করা চাই যে সহস্র সংপ্র প্রলোভনের বস্ত্র দেখিলেও চিত্ত না বিচলিত হয়। বাহাদের দোকানে মিষ্টান্ন দেখিয়া পথ দিয়া যাইতে যাইতে জিহ্বাগ্র লালাকীর্ণ হয়, তাহাদের পক্ষে প্রবল প্রলোভন হইতে চিত্তকে বাচিয়া রাখা একটা বড় কথ্য নয়। তাহাব নিমিত্ত অধিক অন্তঃসারের প্রয়োজন। বৈবাগ্য হইলে ক্রমশ চিত্তের স্থিতিতা জন্মিবে। ঐ স্থিতিতাকে আবাব স্থায়ী করিতে হইবে, তবে নিবোধ হইবে। এগুলি কথায় বলিতে তাদৃশ কঠিন বোধ না হইলেও হইতে পারে, কাজে করা বড় কঠিন।

পরিশেষে ভাষ্যকার বৈবাগ্যের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা সান্ন্যবাদ উদ্ধৃত করিবঃ—

“স্মিরোহ্মপান মৈত্ব্য মিতি চুঠি-বিষয়-বিতৃষ্ণা স্বর্গ বৈদেহ্য-ঐক্য-লব্ধ প্রাপ্তাবান্ত্রিক বিষয়ে বিতৃষ্ণা দিব্যাদিব্য বিষয় সংযোগেহপি চিত্তস্য বিষয় দোষ দর্শনঃ প্রসংখ্যানবলাদনাভোগাখিকা হেয়োপাদেহ শূন্য বশীকারসংজ্ঞা বৈবাগ্যম্।”

ক্ট্রী, অন্ন, পানীয়, ঐশ্বর্য্য, এই সকল দৃষ্ট বিষয়ে তৃষ্ণা-শূন্য—স্বর্গ, বৈদেহ্য (লিঙ্গ শবীর দ্বারা বিষয় ভোগিতা), এবং প্রকৃতি-লয়তা প্রাপ্তি রূপ আত্ম শ্রবিক বেদোক্ত বিষয় হইতে বিতৃষ্ণ ব্যাক্তর দিব্য এবং অদ্বৈত বিষয়ের সান্নিধ্যেও, বিষয়ের দোষ দর্শন করত চিন্তেব যে ভোগে উপেক্ষা বৃদ্ধি তাহার নাম বৈরাগ্য ।

সরস্বতী পূজা ।

১।

এস মা ভারতি রাণি । এস দয়াবতি ।
 এই সে পঞ্চমী তিথি, লইয়া ভকতি প্রীতি,
 পূজিতে এসেছে আজ সন্তান সন্ততি ।
 কত আশা মনে মনে, নিবেদিব ও চরণে,
 তুমি যে প্রসন্ন চির ভাবতেব প্রতি ।
 তোমাৰি মমতা স্নেহে, ভাবতের মৃত ঘেহে,
 এখনো জীবন চির আছে ভগবাত !
 এখনো এখনো প্রাণ, হয় নাই অবসান,
 লইয়া অমৃত-বীণা এস সরস্বতি !
 তুমি যে প্রসন্ন চির ভাবতেব প্রতি !

২।

লইয়া অমৃত-বীণা এস বীণাপাণি ।
 কে বলে গো ছিন্ন-তার, ভাঙ্গা বীণা মা তোমার,
 কে বলে ও নবরাগে আগে না ধমনী ?

তোমাবি বীণাব গানে, তোমাবি বীণার তানে,
 ভাবত আকাশে উঠে শশী দিনমাণি ।
 ভাবতের ঋতু ছয়, ও ললিত বাগময়
 বসন্তে কুসুম হাসে—মেঘে সৌদামিনী ।
 ভারতের লক্ষ লক্ষ, মৃগয় বর্ষাক-বর্ষ
 কাপে ঘোর ভূকম্পনে এখনো জননি !
 কি আছে ও সমাধিতে, বীণায় কঙ্কাব দিতে
 মোহ মূর্ছা ভেঙ্গে চায় উঠিতে অমনি ।
 কি আছে ও ছাই মাখা, কি আছে ও ভস্ম ঢাকা,
 কি আছে সুষ্পৃষ্ট শক্তি শ্মশান-শায়িনী,
 কে জানে মা তুমি বিনা ? বাজাও ভৈরবে বীণা,
 ঢাল সে অমব সুধা মৃত-সঞ্জীবনী ,
 লইয়া অমৃত-বীণা এস বীণাপাণি ।

৩।

এই যে মা মদ্রবালো—সাগরের কুল,
 মিলে মিশে ভাই ভাই,————দেখ নাই, হিংসা নাই
 কবেছি বোধন তব ঘাট গিবি মূলে !
 সিন্ধু বঙ্গ এক-স্রবে, ডাকিয়াছি মা তোমাবে,
 ভঞ্জেনি কি দেবনিদ্রা ? দেখ অঁখি থুলে
 বাসন্তী পঞ্চমৌ উষা, পবিয়া বিনোদ দৃষা
 সাজিয়েছে উপবন মঞ্জবী মুকুলে ।
 কোকিল অকুলে গায়, ভাবত ভাসিয়া যায়
 অলির ললিত তান মাখা ফুলে ফুলে ।
 দিব প্রাণ—দিব মন, পুঞ্জিব মা শ্রীচরণ,
 এসেছি সন্তানগণ পব ভাব ভুলে ।
 ভেগেছে ত্রেতার আশা, সিন্ধু কুলে সে পিপাসা,
 পায় না ছলিতে আব নীলপদ্ম ফুল ।
 যা চাহিবে দিব তাই, লক্ষবিশ কোটি ভাই !—

উলাড়ি ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব দিব পদ-মূলে ।

এসেছি সম্ভাগগণ পব-ভাব ভূলে ।

৪ ।

মা !

তোমাবি বীণাব গানে, তোমাবি রূপায়,
মাস্তাজ পাজ্রাব বজ্র, ভাবতেব ছিন্ন অঙ্গ,
কেমন লাগিছে যোড়া স্নেহ সমতায় ।
আর্য্যাবর্ত দাক্ষিণাত্য, হয়ে গেছে এক-আত্ম
নুইয়া পড়েছে বিক্য মিশে মৃত্তিকায় ।
যেন সবে এক জাতি, এক গোষ্ঠী এক জ্ঞাতি,
অপার ভাবত বংশ সাগবেব প্রায় ।
ভাবতেব নদ নদী, বহিছে পৃথক যদি,
প্রণয়েব পাবাবারে চিনা নাতি যায় ।
ভবজ্ঞে ভবজ্ঞে আছে, এ উহাব পাছে পাছে
উঠিছে পড়িছে যেন ধবে ছ'জনায ।
অপার ভাবত বংশ সাগবেব প্রায় ।

৫ ।

মা !

কে বলে ভারতবর্ষ গেছে সাতল ?
যদিও সবযু গীবে, যদিও সবযু নীরে
ডুবিযাছে অযোধ্যাব বীবেজ্ঞ যুগল ।
যদিও সে বীরধামে, নাহি কেহ বীর নামে,
হইয়াছে যোধ গুনা অযোধ্যা কোশল ।
নিশ্চিহ্ন হয়েছে কেতু, বিচ্ছিন্ন সাগবে সেতু,
গরবে উঠলে আজ জলধির জল ।
তথাপি মা আশা আছে, তোমার দয়ার কাজে,
হাসাইবে নব রবি উদয় অচল ।
অতি ক্ষুত্র পারাবার, বুঝা আফগান তার
আবার পরিবে গজে পাবাণ শৃঙ্গল ।

বাক্ষিলে অকুল সিদ্ধ,
রাখিবে যে কহিগুর, ভুজ্জ কত বল ?
বিনিময়ে “পাঁচ জুতি” লইব কেবল ।

৬ ।

মা !

কে বলে ভাবতবর্ষ জাগিবে না আব ?
কে বলে গো কুক্ষেত্রে, অতীত স্মৃতির নেত্রে,
দেখিয়া বর্ষিবে সদা নয়ন আসাব ।
গেছে বটে এব ভীষ্ম, উজ্জলি নিখিল বিশ্ব
পালিবে না আব কেহ সত্য অস্বীকার ?
মবি মবি হা কি লজ্জা, বীরের সে শব-শয্যা
দেখিয়া হবে কি ভীত চিত্ত সবাকার ?
আর কোন্ ধনঞ্জয়, কবিত্তে দানব জয়,
খলিয়া শমীর সাথে ধনু আপনাব,—
মেদিনী কল্পিত কবি, কোদণ্ড গাণ্ডীব ধবি,
আব কি ভীষণ বলে দিবে না টঙ্কার ?
তোমার দয়ার কাছে, অবশ্যই আশা আছে,
বাজাও মা সঞ্জীবনী বীণা একবার ।
বাজাও ভৈববে বীণা, দেখি দেখি বাঁচে কি না,
অযুত অর্জুন ভীম ববি মাব মার ।
কে বলে ভাবতবর্ষ জাগিবে না আর ?

৭ ।

মা !

কে বলে ভারতবর্ষ জাগিবে না আর ।
যে দেশে পথের ধূলি, বীরের মাথার খুলি
ছড়াইয়া পথে ঘাটে রাজপুতানার,
ধর্মপলি মারাতন, প্রতি গিরি প্রতি বন,
ভুবন ব্যাপিয়া যার বীর অহঙ্কার,

* যে দেশে লিওনিডাস, শিশু কবে উপহাস,
 যে দেশে জহর ব্রত বীর অজ্ঞাব,
 পর্কতে প্রাস্তবে মাঠে, আবারল্লী, হল্দি ঘাটে
 নিশীথে এখনো বাজে বীর চতুর্দ্বার,—
 বাজাইলে বীণা তুমি, এখনো সে মকতুমি
 ঝলসিবে প্রতাপেব শ্রিয় তরবার ।
 এখনো—এখনো আছে অমৃত ছুঁইল বঁচে
 ক্ষত্রিয় পবিত্র বক্তৃতা শ্রোতৃগণে তাহার,
 বাজাও বাজাও বীণা, দেখি দেখি বাচে কি না
 মৃত সঞ্জীবনী তানে জননী আশ্রয় ।
 কে বলে ভাবতবর্ষ জাগিবে না আব ?

৮ ।

মা !

কে বলে ভাবতবর্ষ জাগিবে না আব !
 তোমার বীণাব গানে, তোমার বীণাব তানে,
 নিদ্রিতা সুষুপ্ত শক্তি জাগে পুনর্জীবন ।
 ওই যে প্যাট্রিক ক্যাসে, ফিবিতেছে দেশে দেশে
 কে জানে কি ভবিষ্যত সূচনা তাহার ।
 ত্যাক্সিয়া অতুল ধন, ত্যাক্সি শ্রিয় পবিজন
 জীবনের যত আশা কবি পবিহাব,
 উন্নত ক্ষিপ্তেব মত, সাধে কি মহান ব্রত
 উদাসী সন্ন্যাসী বেশে, ত্যাক্সি নিদ্রাহাব ।
 নহে রাজ্য ধন আশে, পঞ্জাবেব অভিলষি
 পঞ্চ নদ সিংহাসন নাহি চাহে আর ।
 তোমারি বীণাব গানে, এমন বুদ্ধেব প্রাণে
 কি জানি তুড়িত শক্তি হয়েছে সঞ্চাব ।
 কে বলে ভাবতবর্ষ জাগিবে না আব ?

মা !

বাজাও অমৃত বীণা গভীর গর্জনে,
 আবো ঘন ভ্রাতৃভাব, ভাবত করুক লাভ,
 মিশুক একত্রে সবে গাঢ় আলিঙ্গনে।
 আবো হোক আত্মীয়তা, এক সুখ, এক ব্যথা,
 এবত্রে ককক ভোগ একই জীবনে।
 এক চিন্তা এক আশা, মনে মুখে এক ভাষা,
 বাথুক সকলে প্রাণ, এক প্রয়োজনে।
 সংকল্প, সাধনা, পণ, এক আত্মা, এক মন,
 ভাবত ব্যাপিয়া থাক গিবি নদী বনে।
 মগতা বর্ষক মেঘে, উদাম ঝটিকা বেগে,
 ভাতুক শ্রাবত ভাগ্য গগনে শগনে।
 দয়াকর শ্বেত ভূজা, শিশুক মায়ের পূজা
 পতিত ভবতবর্ষ জাগ্র বিসজ্জনে,
 বাথুক সবলে প্রাণ এক প্রয়োজনে।

১০।

বাজাও অমৃত বীণা জননী আমাব।
 সমাজেব হৃদিশায়, যে চঃখ ভাবত পাষ,
 সামান্য ভাষায় তাহা নহে বলিবাব।
 দেখে না, শোনে না বেহ, যুগাষ এ মৃতদেহ
 ববষে জলদ কত আধি জল তাব।
 হায় হেন শোকে তাপে, কেমনে জীবন যাপে,
 নিয়ন্ত এমন যাব গৃহে হাহাকাব ?
 তোমাব বীণাব গানে, কঠিন পাষণ প্রাণে
 কর গো করুণাময়ী চেতনা সঞ্চাব।
 যেন গো সকলে মেলি, শত যত্নে তুলে কেলি
 অসংকোচে সমাজেব পাপ হুর্নিবার,
 না হয় কুণ্ঠিত ভীত হৃদয় কাহার।

১১ ।

বাজাও অমৃত বীণা, বাজাও জননি !
 পবিত্র ভারত ধামে, আব যেন ধর্ম নাথে
 করে না প্রচাব কেহ জাল হিন্দুয়ানি !
 না বাডায় বৈবিভাব, আত্মদ্রোহ মহাপাপ
 যে পাপে এখনো মৃত রয়েছে জননী ।
 যে ধর্মে জননী মবে, মিত্রতা বিনাশ করে,
 চাহিনা শুনিতে আব সে ধর্ম কাহিনী ।
 কব সেই ধর্ম ব্যাখ্যা, দেও সেই ধর্ম শিক্ষা,
 না আছে যাহাতে ভেদ হিন্দু মুসলমানি ।
 ভাবত সুড়িয়া ভাই, ভাই ছাড়া কেহ নাই,
 ম যের সন্তান সবে এই মাত্র জানি ।
 বুঝাও সে প্রেম বেদ, ঘুচে যাক ভেদাভেদ
 ভাবতে জাতীয় ধর্ম ভ্রাতৃ সন্মিলনী,
 হিম গিরি গাবোহিলে, বিদ্যা ঘাট গিরি নীলে,
 কোলাকুলি কোলে ভীলে, — হোক জয়ধ্বনি ।
 ভাবতে জাতীয় ধর্ম — ‘ভ্রাতৃসন্মিলনী ।’

১২ ।

এস মা ভাবতি বাণি ! তোমাৰি কৃপায়, —
 তোমাৰি চরণ স্পর্শে, পতিত ভারতবর্ষে
 কোমল উষাব আলো দূবে দেখা যায় ।
 তোমাৰি মা রাজ্য পদে, ও কনক কোকনাদ
 নবীন জীবন জ্যোতিঃ লাবতে ছড়ায় ।
 যুগে যুগে অবিসত, যে ববি ডুঃখ কষ্ট,
 ভাবতেব ঘোরতম নিশি তমসায়,
 তোমাৰি চরণতলে, উঠে মা সে কুতূহলে
 ভারতে বাসন্তী শুক্ল পঞ্চমী উষায় ।
 জ্ঞানদা মোক্ষদা বাণি, এস দেবী বীণাপানি

অর্পিব অঞ্জলি আজি ও কোমল পায়,
ভারতেব পুণ্য দিন পঞ্চমী উষায় ।

১৩ ।

এস মা ভারতিবাণি এস দয়াবতি !

এই সে পঞ্চমী তিথি, লইয়া ভকতি প্রীতি,

পৃজিতে এসেছে অঞ্জ সন্তান স্তুতি ।

কত আশা মনে মনে, নিবেদিব ও চরণে

ভূমি ত এসমা মাতা ভারতেব প্রতি ।

তোমাণি মমতা স্নেহে, ভাবতের মৃতদেহে

এখনো জীবন চিহ্ন আছে ভগবতি ।

এখনো এখনো প্রাণ, হয় নাই অবসান

দহিয়া অমৃত বাণী এস সবস্তুতি !

ভূমি যে প্রসন্ন চিব ভারতেব প্রতি !

গোবিন্দচন্দ্র দাস ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

মধুসূদন নামটী বড় মধুর ! কিন্তু এমন যে বিপদ-ভঞ্জন মিষ্ট নাম, তাহার পূর্বের কোথা হইতে এক বিদেশী বিধর্মী বিচিকিৎসা মাইকেল শব্দ প্রয়োগ কবিত্তা মেঘনাদ বধ কবিত্তার বচিবত য নাম হিন্দুর নিকট কর্ণ-কটু করা হইয়াছে। এখন প্রায় কেহই সেই সোণার মধুকে মাইকেল বলিয়া না ডাকিলে, চিনিতে পাবে না। একেই ত মেঘনাদ বধ প্রভৃতি কাব্যে পিয়াজ বস্ত্রনের গন্ধ কথ, তাহাতে আবাব গ্রন্থকর্ত্তার যাবনিক নাম দেখিলে, পুস্তকেব মধ্যে হিন্দু দেবতাকে উদ্দেশ্য কবিত্তা যে সকল ভক্তিভাব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা হিন্দু পাঠকের নিকট কপটতা বলিয়া বোধ হয় ; কবির

প্রকৃত মনেব ভাব বলিয়া গৃহীত হয় না। যাহাতে বচিয়তায় বিশ্বাস
কিছা ভক্তি নাই, কেবল বচনার খাতিরে ভাব ব্যাক হয়, সেই বচনা এক
প্রকাব, আর যাহা ভক্তি মূল কবিতা বচিত হয়, তাহার শক্তি এবং মধুরতা
স্বতন্ত্র ভাবেব। বামপ্রসাদেব গীত গুলি যদি মাইকেল কিছা কোন যবন
কর্জুক বচিত হইত, তাহা হইলে শ্রোতাব মনে কিঞ্চপ ভাবেব উদয় হইত,
তাহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পাবে। অধিক হইলেও লোকে তাহা
উত্তম গীত কিছা কবিতা বলিয়া শ্রীকার কবিত, কিন্তু বচিয়তাকে পরম তত্ত্ব
অথবা গীত গুলিকে ভক্তির উচ্ছ্বাস বলিত না। মিল্টন প্রভৃতি খৃষ্টান
কবিবাব বচনার খাতিরে গন্তাবাস্ত যেমন পুৰাতন গ্রীক দেব দেবীদিগেব
অর্জনা এবং আবাবধনা কবিয়াছেন, মাইকেল বর্জুক সবস্বতীব বন্দনাও সেই
রূপ। কবিতা হউক কিছা বক্তৃতা হউক, যাহাতে কবিব কিছা বক্তাব
বিশ্বাসেব এবং ভক্তিব অস্তাব থাকে, তাহাতে বচনার সহস্র ছটা থাকিলেও
তাহা আলুনী বোধ হয়। মধুসূদন যদি হিন্দুধর্ম পবিত্রাণ না করিত, তাহা
হইলে হিন্দুসমাজে মেঘনাদ বধ বাব্য অনেক কপে আদবণীয় হইত,
পুস্তকও অনেকাংশে এখনকাব অপেক্ষা ভাল হইত।

কবিব কবিত্তেব দোষ গুণ নির্মাচন কবাব ক্ষমতা আমাব নাই কিন্তু
মিষ্ট কবিতা আমাব বর্ণে বডট মিষ্ট লাগে। বিদ্যাসাগব মহাশয় প্রভৃতি
অনেক বড় দবেব লোককে মধুসূদনেব কবিতা অতি উচ্চ অঙ্গেব কবিতা
বলিয়া ব্যাখ্যা কপিতে শুনিয়াছি; কিন্তু সত্য কথা বলিতে ভয় হয়,—আমি
ক্ষুদ্রপ্রাণী, আমাব নিকট ঐ কবিতা কেমন কটব মটব বোধ হয়। সাহেবী
মটন চপ্. ও কবি, কটনেট খাইতে হইলে যেমন টেবিল, চেয়াব, কাঁটা
চামচা ও খানসামা খিদমদগাব না হইলে আহাবেব সুবিধা হয় না, সেই
রূপ মাইকেলেব মেঘনাদ বধ পড়িতে হইলে দক্ষিণে এক খানা অভিধান
এবং বামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত লইয়া না বসিলে, বড় সুবিধা হয় না।
কবিকঙ্কণেব চণ্ডী, বাশীদাসেব মহাভাবত ও কুন্তিবাসেব রামায়ণ, ভারত-
চন্দ্রেব অনাদামঙ্গল, ঈশব গুপ্তেব স্বভাব বর্ণন—এ সকল পিঠা পবমান্নেব ন্যায়।
আমাদেব যেমন বসনা তৃপ্তি কবে, মেঘনাদ বধে ভেমন কবে না। যাহা-
দেব ইংবাজী কবিতায় ভাল জ্ঞান আছে, তাহারা দেখিবেন যে মাইকেলেব
কবিতাব ভাব রস ইউরোপীয় কবিতা হইতে অনেক পরিমাণে উচ্চতর।

মাইকেলের কবিতা পাশ্চাত্য কবিতার অনুকরণ অথবা অনুবাদ বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না এবং সেই কারণেই আমি ইত্যাগে বলিয়া আসিয়াছি যে মেঘনাদ বধে পিয়াজ বস্ত্রানব গন্ধ আছে। আর এক বিষয়ে মাইকেলের সহিত আমাদের হিন্দু কবি পণ্ডিত এত যে, মধু বাক্স পড়তি অনার্যাদিগের গুণ গবিয়া ও বীরত্ব বর্ণন কবিতেই সদা আনন্দিত এবং মেঘনাদবধ তাহাতেই পূর্ণ। বাম লক্ষণ পড়তিব প্রকৃত পবিচয় কাব্যে নাই।

এক দিবস একটা দস্তাবেজ নবামত এবার নিমিত্ত আমি বেলা ১১ টার সময় আমার চাকরকে একটা পয়সা দিয়া বাসার নিকট এক পশাবীর দোকানে কিছু শসা কিনতে পাঠাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম, ক্রমে ঘড়িতে ৫টা বাজিয়া গেল কিন্তু তত আমায় পত্যাগমন বলিল না দেখিয়া, আমি স্বয়ং ধীরে ধীরে দোকানের নিচট যাই দেখি, যে দোকান দ্বার এক পিতলের চশমা নাকে দিয়া তাহার দোকানের চৌকিতে উপবিষ্ট হইয়া, নিষ্ঠুরে স্বয়ং কবিয়া অন্নদানদ্বয়ের পুণি পলা “এই ভিক্ষু আবে ছাব, দোষ গুণ দিব কব, আমি মলে ” “কদিয়েছে, এবং আমার চাকর ও আর চাকর ডন খান্দাব তাহার চতুর্দিকে দাড়াইয়া নিষ্ঠুর চিত্তে প্লুত হইয়া শ্রবণ কবিতোছে। এমনই কবিতার মধুসূতা যে বলিক তাহার উপার্জন এবং ক্রোতা তাহাদের স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইয়া কেবল তৃষ্ণাচিত চাতকেব নাথ্য ভাবতচন্দ্রের অমৃত স্তম্ভ পান কবিতো মন। জানি না মাইকেলের মেঘনাদ বধ গ্রন্থ, কবে এইরূপ সর্বলোকক চিত্ত বজ্রন কবিতো পানিবে? আনন্দের বিশ্বাস যে ক্রমে আমাদের দেশে যাই উচ্চ শিক্ষা বিস্তার হইবে অর্থাৎ যখন আমাদের কুলী মজুবেবা ততোকে নন্দাল “ইকুলেব হেড পণ্ডিতের নাথ্য সঙ্কল্প হইবা বনকে বিটপী বিড়ালকে মার্জারী, চেউকে বীচি এবং নাকীকে স্নায়ু বলিতে শিবিলে, তখনই মাইকেলের কবিতার আদব বাড়িবে। কিন্তু আমি বলি, তাহার বচ বিলম্ব আছে, এবং যে পর্যন্ত সেই সুখের কাল উপস্থিত না হইবে, সে পর্যন্ত নিশ্চয়ই মুকুন্দরাম, ভাবতচন্দ্র, কাশীবাম দাস প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি বঙ্গের কবি মঞ্জের শীর্ষস্থান অধিকার কবিয়া থাকিবেন।

মধুসূদন দত্তের আমি এজন সহায়ী ছিলাম। বয়সে মধুসূদন

আমি অপেক্ষা গোটা ছিল কিন্তু এমনই তাহার বিদ্যা বুদ্ধিব জোর, যে আমাদের অনেক পবে হিন্দুকলেজে প্রবেশ কবিয়া, লন্ডে লন্ডে নিম্নশ্রেণী সকল অতিক্রম কবিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই মাধ্যমিক সোপান সমাধায়ী হইয়াছিল। মধুসূদনের বাঙ্গা কবার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল এবং গীত বাদ্যে কম অধিকার ছিল না। খ্রীষ্টান হওয়ার পূর্বেই মধু পারস্যী শিখিয়াছিল এবং খ্রীষ্টান হইয়া বর্ণপুস্তকে অধ্যয়ন করার সময় সংস্কৃত এবং লাতিন গ্রীকও পাঠ কবিয়াছিল। পবে বিলাত যাইয়া ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান ভাষা সংগ্রহ করে, অতএব দেখা যাইতেছে যে মাইকেল কেবল কবি ছিল এমন নহে পৃথিবীর পুরাতন এবং প্রচলিত অনেক ভাষাতেও তাহার অভিজ্ঞতা ছিল। মধুসূদনের আমি সমপাঠী ছিলাম বলিয়াই তাহার সহিত আমার আলাপ পাঁচিয় ছিল এমন নহে, তাহার সহিত আমার আত্মীয়তা হওয়ার আর এক কারণ এই যে আমার মাতুলের সহিত মধুর পিতা বাজনার সর্গ দত্ত মহাশয়ের অত্যন্ত বন্ধুতা ছিল এবং সেইজন্য মাতুলের সহিত আমি বাজনারাধন বাবর খদিব পুত্রের বাসা বাটীতে সর্বদা যাইতাম। বাজনারাধন বাবর আনার মাতুলের সম্পর্কে আমাকে ভাগিনেয় বলিয়া দেখে কবিতেন এবং মধুও সেই কারণে আমাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিত। বিত্তমধুর আত্মপিক বন্ধু ছিল বাজা দিগম্বর মিতের ভ্রাতা ও বাবু গোবিন্দস বসাকের সাহিত। বাজনারাধন বাবু সে কালের সদা দেওয়ানী আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। তাহার বসস্থল যশে হব জেলায় সপদাডী গ্রামে এবং তন্নিকটে তাহার অনেক বিত্ত বিভব ছিল। মধুসূদন বাজনারাধন বাবু একমাত্র সন্তান, অধিকন্তু বিদ্যাতে তাহার প্রথম বুদ্ধি দেখিয়া স্বভাবতই বাজনারাধন বাবু মধুকে অত্যন্ত স্নেহ কবিতেন এবং তাহার আকৃতি পালন করিতে ক্রটি করিতেন না। বাজনারাধন বাবু মধুসূদনের গুণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু এক বিষয়ে তাহার অত্যন্ত ক্ষোভ ছিল। আমি এক দিবস পিতার নিকট পুত্রের গুণ কীর্তন করিতেছিলাম, তাহাতে তিনি আক্ষেপ কাব্য বলিলেন যে “বাপু তুমি যাহা বলিতেছে তাহা সত্য হইতে পারে কিন্তু কোথায় তাহার ধন স্থানে শনি ঠাকুর আছেন, আমার অভাবে মধু যে কি দশা হইবে, তাহা ভাবিয়া আমি অস্থির।”

মধু বড় খোসপোষাকী ছিল এবং সাহেবদিগেব ন্যায় পরিকার পবিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিত। আমাদের সময়ে হিন্দু কলেজ কলিকাতার ধনী বালকে খচিত ছিল কিন্তু পোষাক পবিচ্ছদে মধু এই সকল লক্ষণতি বালকদিগেব কাহাবও নূন ছিল না। বালক কাল হইতেই মধুর সাহেব হওয়ার বাসনা ছিল এবং সেই উদ্দেশে সে চাদর ব্যবহার কবা পবিত্যাগ করিয়া এক ছুট ইঞ্চুলে আসিত এবং তজ্জন্য আমরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গীগণকে “একছুটের দল” বলিয়া অভিহিত করিতাম। সাহেব হওয়ার জন্য তাহার এমনই প্রবল ইচ্ছা ছিল যে ইহার বহুকাল পবে বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সে এই দিবস কথায় কথায় আমাকে বলিল যে “এক্ষণে আমি সাহেবী পোষাক পরি, সাহেবী খানা খাই, ইংরাজী স্ত্রী করিয়াছি, অনর্গল ইংরাজী বলিতে পারি, কেবল ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখিতে পারিলেই, আমার দীর্ঘ কালের মনস্কামনা পূর্ণ হয়, পুত্র সাহেব হইতে পারি।” মধুর প্রায় সকল পবিচিত ব্যক্তিই অবগত আছেন যে বাবু মধুসূদন দত্ত বলিয়া তাহাকে পত্র লিখিলে, সে তাহা গৃহণ ববিত না; গ্রহণ কবা দূবে থাকুক আমি সচক্ষে দেখিয়াছি যে এইকপ এক খানা পত্র পাইয়া মধু পত্র বাহককে গালাগালি দিয়া পত্র খানা তাহার দিকে নিক্ষেপ করিয়া সব হইতে ক্রোধ ভবে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। বাবু শব্দের প্রতি বিবক্তি প্রকাশ কবা বোগটা কেবল মধুর ছিল এমন নহে বিলাত দেবত অধিকাংশ বাঙ্গালীর বিশেষত যাহাঁবা বারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগেবও বিলক্ষণ আছে। (Squire) স্কোয়ার বাক্য গ্রযোগ না করিলে তাঁহাদের সম্মানেব ক্রটি হয়, কিন্তু স্কোয়ার বাক্যের অর্থ ভূত। অতএব দেখা যাইতেছে এই সকল ব্যক্তির নিকট বাঙ্গালীর সম্মান-স্বত্বক বাবু উপাধি অপেক্ষা ইংরাজী ভূত উপাধি সহস্রগুণে আদরণীয়।

ইহা বোধ হয় অনেকে অবগত নছেন যে বিলাত দেবত বাঙ্গালীদিগেব সাহেবী পোষাক অবলম্বন কবাব মূল্যধার মাইকেল মধুসূদন দত্ত। প্রথম বিলাত যাত্রীরা ইংলণ্ডে এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এ দেশে চাপকান চোগা ও দেশী টুপি ব্যবহার কবিতেন কিন্তু মাইকেল বিলাত হইতে কলিকাতায় পৌছিয়া এই সকল ব্যক্তির দূঁ ফিরাইয়া দিলেন। আমার উত্তম স্মরণ আছে যে, মধু

তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিল, যে যে পর্য্যন্ত তাহার সাহেবী পোষাক অবলম্বন না করিবে, সে পর্য্যন্ত মাটিকেলের পরিবার কলিকাতায় পৌঁছিলে তিনি কিম্বা অন্য কোন মেম তাহাদিগকে ষানায় নিমন্ত্রণ করিবেন না, কিম্বা তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ কবিবেন না অর্থাৎ বিলাত ফেরত বাঙ্গালীদিগকে মাইকেলের স্ত্রী মাইকেলের তুল্য সভ্য ব্যক্তি বিবেচনা কবিবেন না। এই কথাতেই তাঁহাদেব ভয় হইল, মতি টলিল এবং ক্রমশ তাঁহাদিগের মধ্যে হেট, কোট, প্রচলিত হইল। মধু বড় আক্ৰেপ ছিল, যে সে বাঙ্গালী হইয়া জন্ম গ্রহণ ববিয়াছিল। আমি তাহার মুখে শুনিয়াছি যে বিলাতে কিম্বা ফ্রান্সে বেহ তাগকে, সে কোন দেশী লোক বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে কখনও Indian অর্থাৎ ভারতবর্ষের লোক বলিয়া পবিচয় দিত না, বণিত যে আমি a Foreigner—একজন পরদেশী।

ধর্ম বিষয়ে মধু যে অধিক টান্ কিম্বা আকিঞ্চন ছিল, তাহা আমরা তাহার সহাধার্য্যরা, কিছুই জানিতাম না এবং আমরা তাহাকে খোস-পোষাকী, ব্যঙ্গ-প্রিয় এবং আমোদ বিলাসী (Jolly fellow) ছোকরা বলিয়া জানিতাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ এক দিবস শুনিতে পাইলাম যে মধু তাহার বাড়ী হইতে বাহিব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কে ধায় গিয়াছে তাহা কেহ জানে না। তখন মধু এবং আমি হিন্দু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় ক্লাসে পড়িতাম। ক্রমে ব্যক্ত হইয়া পড়িল যে মধু খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য পাদ্রীদিগের আশ্রয় লইয়াছে। তাহার পিতা মাতা এই কথা শুনিয়া শোকে আবুল হইয়া পড়িলেন। একে রাজনাবায়ণ বাবু বিত্তশালী মনুষ্য, তাহাতে কলিকাতার অনেক বড় বড় লোকেব সহিত ভাব ছিল, বাজনাবাদ্বয় বাবু প্রুত্বে পাদ্রীবা লইয়া গিয়াছে শুনিয়া তাঁহারা সকলে রাজনারায়ণ বাবুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কবিয়া তাঁহাকে সাহায্য কবিতে অগ্রসর হইলেন। মধু কোন্ স্থানে লুকায়িত আছে তাহা জানিতে পাবিলে সেই স্থান হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক বাহিব কবিয়া লওয়ার নিমিত্ত তাহার পিতা দেশ হইতে লাঠিয়াল ও সড়কীওয়াল আনিয়া প্রস্তুত করিয়া বাখিয়াছেন বলিয়া জনমের উঠিয়াছিল। আমার মাতুল ইহার প্রধান উদ্যোগী এবং কলিকাতার অনেকে তাঁহার প্রতিপোষক ছিলেন। এইরূপ কোলাহল হইতেছে এমন সময়ে ঈর্ষাৎ এক দিবস রেবেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বাসাতে

আমার মাতুলের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই বৈঠকে হিন্দু কলেজের শিক্ষক বাবু রামচন্দ্র মিত্রও ছিলেন। কৃষ্ণমোহন বাবু মাতুলকে বলিলেন যে “আপনাবা অনর্থক মধুব জন্য চেষ্টা করিতেছেন, খ্রীষ্টান হওয়াব নিমিত্ত তাহাব দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে। সে থোকা নয়, দুগ্ধপোষ্য বালক নয়, যে পাদ্রীবা তাহাকে ভুলাইয়া খৃষ্টান কবিবে। ধর্ম্মেব দোষ শুণ নির্কাচন কবিতে তাহাব উপযুক্ত বুদ্ধি ও বয়স হইয়াছে এবং হিন্দু ধর্ম্মের অস্বাভা জানিয়া মধু খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন কবিতে অগ্রসব হইয়াছে। এই দেখুন তাহাব কেমন বুদ্ধি, আপনাবা তাহার প্রতি বল প্রয়োগ কবার আশঙ্কার সেলাট পাদ্রীবা নিকট প্রার্থনা কবিয়া তাহাব অন্তবোধ মতে কেল্লাব মধ্যে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে এবং কেল্লাব কর্ত্তা ব্রিগেডিয়ার পেউনি সাহেব সাদবে মধুকে আপন কুঠিতে স্থান দিবাছেন যে আপনাবা তাহাব অঙ্গ স্পর্শ করিতে না পাবেন।” কৃষ্ণমোহন বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, জীবিত থাকিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলে হইত, যে কেল্লাব ভিতরে আশ্রয় লওয়াব বুদ্ধি কি ১৭,১৮ বৎসরব বয়সেব বালক মধুসূদন দত্তেব মস্তিষ্কেব ঘট হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, না অন্য কোনও স্থিতি মতি ধবেব ঢেঁকী কুস্তীব চক্রীর চক্রান্তে সেই উপায় অবলম্বন কবা হইয়াছিল ?

তদনন্তর কৃষ্ণমোহন বাবু মধুকে মধুব কেল্লাব মধ্যে অবস্থিতি করাব সংবাদ অবগত হইল। আমাব মাতুল ও উক্ত রামচন্দ্র বাবু ও রাজনাবায়ণ বাবুর একজন ভ্রাতুষ্পুত্র মধুব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে কেল্লাব গিয়াছিলেন। আমিও সেই সঙ্গে গিয়াছিলম। মধু কয়েকজন পাদ্রী ও সৈনিক সাহেবের দ্বাৰা বেষ্টিত হইয়া কেল্লাব মধ্যস্থিত গির্জা ঘরে আমাদিগের সঙ্ক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ কবিল। আমাব মাতুল মধুকে তাহাব পিতা মাতার শোকের কথা বর্ণনা করিয়া তাহাকে একবার বাড়ী যাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা কবিতে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু “চোর্য না শুনে ধর্ম্মেব কাহিনী”; মধু সে সকল বাক্যে কর্ণপাত না কবিয়া আমাদিগকে এক সেলাম চুকিয়া গির্জা ঘর হইতে বিদায় কবিয়া দিল, আমবা ও নিরাশ হইয়া কেল্লা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। ইহার কয়েক দিবস পরে ছোটলাট পাদ্রী আর্চ ডিকন ডলটী সাহেব মহা সন্মারোহ করিয়া কলিকাতার মিসনরোব গির্জাতে মধুসূদন দত্তের মস্তকে পবিত্র জর্জন নদীর জল সেচন পূর্ব্বক মাইকেল নামোচ্চারণে তাহাকে অন্ধকার

হইতে আলোকে লইয়া গেলেন। মধুসূদনও আল্লাদে গুলকিত হইয়া সেই উপলক্ষে (On my seeing the light) অর্থাৎ ‘আমি আলোক দেখিলাম’ বলিয়া ইংরাজীতে এক কবিতা রচনা কবিয়া সংবাদ পত্রে প্রকাশ কবে। আমাদের সকলের আশ্চর্য্যবান বাবু রামনাথায় বস্তু তখন হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি মধুব ঐ কবিতার বিক্রপ কবিয়া (On my circumcision) অর্থাৎ ‘আমাব স্নান হইল’ বলিয়া এক পালটা কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহা পাঠ কবিয়া কলেজের ছাত্রেরা অত্যন্ত হর্ষিত হইয়াছিল।

মধু তদনন্তর বিশপ্স্ কলেজে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া মাস্ত্রাজের এক স্কুলেব প্রধান শিক্ষক হইয়া মাস্ত্রাজে গমন কবে এবং সেই স্থানে এক পাত্রী সাহেবেব কন্যাকে বিবাহ ববে কিন্তু কিছু কাল পরে আব একটি বিবির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া স্ত্রীকে পবিত্যাগ করত সেই বিবিকে লইয়া বিলাত চলিয়া যায়। মাস্ত্রাজে মধু Captive Lady নামক এক থানা ইংরাজী কবিতা প্রণয়ন কবে; সেই পুস্তক থানা সাধাবণের নিকট বড় আদর্শীয় হয় নাই। বিলাত যাইয়া মধু ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন ববে এবং তাহার এক কি দুই বৎসর পরে সেই বিবি আসিয়া তাহার সহিত একত্রিত হয়। সাধাবণের নিকট ঐ স্ত্রীলোকটী মধুব স্ত্রী বলিয়া পরিচিত ছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মধুব বিবাহিতা স্ত্রী মাস্ত্রাজে তাহার পিতাব আশ্রমে ছিলেন। মধুব সন্তান গুলি ঐ দ্বিতীয় বিবির গর্ভজাত। তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত নহে।

পৃথিবীতে মধুসূদন মত্তের বত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা সমস্তই তাহার নিজের কর্ম্ম দোষেব ফল। পৈতৃক বিত্ত সমস্ত দিলাওবে ও সাহেবী খরচের অমুঝোখে উড়িয়া গেল। এক সতী লক্ষ্মী পাত্রী বন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে তাহার বিনাপ্রাধিকারে পবিত্যাগ কবিয়া চিব ছাঃখিনী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সাহেব হইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সাহেবেরা তাহাকে এতই ছুণা করিত যে তাহাবা তাহাকে হাইকোর্টেব বার লাইব্রেরিবে মণ্ডে প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত প্রদান করিতে প্রথমে সন্মত হয় নাই। বাবুসাহেব হইলেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি বড় মকদ্দমা পাইলেন না, অবশেষে সর্বস্ব হাবাইয়া, বোংগেব তাড়নার এক

হাসপাতালে যাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন । জন্মদাতা পিতা রাজনারায়ণ দত্ত যে ভয় করিয়াছিলেন, সেই ভয়ই শেষে শুভাইল । কেবল রহিল কি ? না, যে সমাজকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন সেই সমাজের ভাষায় তাঁহার প্রণীত কয়েক খানি গ্রন্থ ।

মধু হিন্দু ধর্ম পবিত্রাণ করিল, হিন্দু অচার ব্যবহার ঘৃণা করিয়া সাহেবী ধর্ম এবং সাহেবী আচার ব্যবহার অবলম্বন করিল, এমন কি বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে তাহার লজ্জা বোধ হইত তথাপি যখন তাহার দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ত বাঙ্গালীবা তাহাকে উপেক্ষা করিল না, তখন অনেক হিন্দু সন্তান তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন বিশেষত বিদ্যালগর মহাশয় মধুকে সাহায্য কবিয়া নিজে বিস্তর ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন । মধুর মৃত্যুর পবেও দয়াশীল এবং দানশীল কয়েক জন হিন্দুসন্তান তাহার পুত্র কন্যাদিগকে অনেক সাহায্য কবিয়াছিলেন এবং এক্ষণেও তাহার পুত্র আলবর্ট দত্তকে বিলাত পাঠাইয়া বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য এবং মাইকেলের সমাধি স্থানে কোন স্মরণ চিত্র স্থাপনা কবার নিমিত্ত হিন্দু সমাজ কৃতজ্ঞকল্প হইয়াছে ।

মধুব প্রসঙ্গে উপসংহাৰে তাহার বিবাহিতা স্ত্রীৰ সদৃশ্বেষ কথা প্রচার না কবিয়া থাকিতে পাবিলাম না । শেষাবস্থায় যখন মধু বোগাক্রান্ত হইয়া সঙ্গতি অভাবে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ কবিতোছিল, তখন সেই পাত্রী কন্যা মধুব পূর্ব কুব্যবহার বিস্মরণ করিয়া উপযাচিকা হইয়া মধুকে লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন যে মধু যদি তাহাকে গ্রহণ কবে, তাহা হইলে তিনি অতি আত্মাদেব সহিত কলিকাতায় আসিয়া স্বামীব সেবা শুক্রবা ও অন্যান্য যথাসাধ্য সাহায্য কবিতো প্রস্তুত আছেন মধু সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই ।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম প্রচার ।

গৌবচ্ছিকায় রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল ; খৃষ্টীয় প্রভাবনা করিব কি প্রস্তাবনার প্রাবল্লেট কোকিল ডাকিয়া উঠিল, বোধ হয় অব্যবহিত পরেই পাশ্চাত্য যুগের অকণ্ঠাস দৃষ্ট হইবে । ভাবি নাই আবার মতটী বিজ্ঞ

সমাজে আলোচিত হইবে; সত্যের সহায়তা যিনি করেন, তৎ প্রস দাং লোকের মনে প্রজ্ঞার উদয় হইয়াছে। ভগতের শুভাকাজী ব্যক্তি মাঝেই অরণ পরিভ্রষ্ট হইবেন যে দ্রবতী খৃষ্টীয় জন মণ্ডলে “উপষ্টভের” প্রতিধ্বনি হইতেছে। (১)

ইংলণ্ডস্থ “রয়াল আসিয়াটিক সোসাইটি” নামক সভাব সভ্য মহাত্মা আর্থর লিলি সম্প্রতি এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বীকার করিয়াছেন বৌদ্ধধর্মই খৃষ্টীয় ধর্ম, বৌদ্ধধর্মোৎসাহী মহারাজা অশোক পাশ্চাত্য প্রদেশে স্থবিব প্রেরণ করেন, উক্ত স্থবিবদিগের ধর্ম প্রচার দ্বারা জ্ঞাতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ধর্মের মূল উক্ত জ্ঞাতিক সমাজ। (২)

ইতিপূর্বে উক্ত মত উপষ্টভে প্রকাশ করা হইয়াছে, খ্রীষ্টীয় যাজব দিগেব বাক্য কতদূর সত্য তাহাব আন্দোলন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ১৯৪৫ সন্থতে প্রাচীন ভাবতের গোবব প্রসঙ্গ এতকাল পরে উদ্‌ঘাপিত হইবাব সূত্রপাত হইল। আর্য্য দেশ কোন কালেই পবভূষণ গলে ধাবণ করেন নাই, বীর্য্যবস্ত এবং অসীম প্রতিভা-সম্পন্ন সন্তানগণকে ক্রোড়ে লইয় চিবকাল অক্ষুন্ন মুখে অভিবাহিত করিয়াছেন; অজি ভায় তেব এই দশা! এ সময় যদি কেহ তাঁহার পূর্বকীর্তি স্মরণ করিয়া তাঁহার যশঃ কীর্তন কবে, তাহাতেও ভাবতেব দুঃখ কথঞ্চিত প্রশমিত হয়। মহাত্মা আর্থর লিলি তাহার পূর্ব সূত্র ধবিয়া ভাবতের অপার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

জ্ঞাতিক ধর্ম কি? কেহই তাহাব অল্পসন্ধান করেন না; তাহা না করাতেই পুণ্ডিতব বিষয়ে ঘোবাঙ্ককার ঘুচিতেছে না। পৃথিবী মহা ভ্রমে নিমজ্জিত রহিয়াছে। ইহা কাহাব দোষ? চক্ষের দোষ না, আলোকের দোষ? খৃষ্টীয় যাজকেরা যাহা বলিবেন, অবনত মস্তকে তাহাবি অল্পসরণ করিতে হইবে, ভগবানের একপ ইচ্ছা কখনই তহে। আপনাদিগের হস্ত পদ তবে কি নিমিত্ত? ভগবান শুদ্ধ দীর সমীব সৃষ্টি করেন নাই, তিনি

(1) (2) Buddhism in Christendom or Jesus the Essene.

Arthur Lillie.

ভূমিসম্পদ ও প্রবল ঋণ্টিকারও সৃষ্টি কবিয়াছেন। তিনি মেঘেরও স্রষ্টা এবং ব্যাঘ্রবৎ আহাব প্রদান করেন। তাঁগব কল্লনাগ্রহত মানবজীবন ! কি আর অধিক বলিব। কোথা হইতে জ্ঞাস্তিক ধর্মের উৎপত্তি এবং বিকাশ আপনারা চিন্তা কবিয়া দেখিলে বঝিতে পারিবেন যে, পাশ্চাত্যেবা তাহা জানিবার কোন চিহ্নই বাধিয়া যান নাই। বিধর্মী কুতীর্থিকদিগের কঠিন হস্তে বিশাল জ্ঞাস্তিক কুলের পতন হইয়াছে। কিন্তু আফ্রিকা, ইউরোপ, এবং আসিয়া মহাভূমিতে সর্বত্র জ্ঞাস্তিক ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এতাদৃশ বৃহৎ গোষ্ঠীব একজনও পাশ্চাত্যে নাই যে তাহাদিগের শত্রুগণের পাশব উৎপীড়নের পবিচয় দেয় ? আজি সংসার জ্ঞাস্তিক শূন্য ও সংসারের জ্ঞাস্তিক নাম বিলুপ্ত হইয়াছে কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বীগণ বলেন, যে, তাঁহাদিগের সমাজ মধ্যে জ্ঞাস্তিক দিগের অনেক আচাব নিয়ম বর্তমান আছে, স্বাক্ষর করেন জ্ঞাস্তিক মত পর্যন্ত খৃষ্টীয় সমাজে পবিগৃহীত হইয়াছে (৩) অথচ জ্ঞাস্তিকদিগের পবিচয় প্রদান বালে তাঁহারা অগ্নান মুখে বলেন জ্ঞাস্তিক তত্ত্ব নিকৃপণ ববা হঃসাধ্য (৪)।

সপ্তকাণ্ড বামায়ণ পাঠ হইল সীতা কে জানা গেল না। আমার বোধ হয়, জ্ঞাস্তিক তত্ত্বই খৃষ্টীয় ধর্মের পুর্বারত্ত ; জ্ঞাস্তিক তত্ত্বানুসন্ধানে খৃষ্টীয় তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে।

আমি পূর্বে বলিয়াছি, মহাত্মা লিলিও আমার মত সমর্থন করত এদর্শন করিয়াছেন, যে জ্ঞাস্তিক মত হইতে খৃষ্টীয় ধর্মোৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা কি মিথ্যা ? জ্ঞাস্তিক সম্প্রদায় ধর্ম প্রয়োজক, শাস্ত ও দার্শনিক ছিলেন, তাহাব আর কোন সন্দেহই নাই। ফাইলো, যোসেফঃ, ইউসিবিয়ঃ, বোসোবাব, সিনি, প্রেদোঁ, ও জেনিংস্ প্রভৃতি বিজ্ঞ লোকেরা জ্ঞাস্তিক তত্ত্বের সম্যক্ বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না, কিন্তু ফাইলোব বৃত্তান্ত হহতে জ্ঞাস্তিকদিগের সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, এতৎসম্বন্ধে প্রিন্স ও প্রশংসা করা যায়। কিন্তু যোসেফঃ যে সকল বিষয় বর্ণনা কবিয়াছেন, তাহা ফাইলোর উক্তির সহিত ঐক্য হয় না। (৫) প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা গিবন্ বলেন

(3) Gibbon II. 284.

(4) Marshden. I. 481.

(5) P. C. Hessena.

জ্ঞাতিক সম্বন্ধে উপকথাব প্রবাহ আছে। (৬) ইবিনিয়ঃ ও ইপিফানিয়াঃ জ্ঞাতিক সম্প্রদায়ের একটি তালিকা দিয়াছেন, তদুপেক্ষে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তাহাব পঞ্চাশেরও অধিক শ্রেণীব অন্তর্গত ছিল। (৭)

পাশ্চাত্য লেখকেরা বলেন প্রাচীন ধর্মযাজকগণ কাথলিক সমাজের বিকল্প মতবাদীদিগকে জ্ঞাতিক নামে অভিহিত কবিয়াছেন। কিন্তু ইহা বড় সন্দেহের কথা। মহাপ্রাজ্ঞ বাস্‌নেজ সাহেব তৎকৃত হিষ্টোরি দে জুইস্ গ্রন্থে, ও টেলর সাহেব কাল মেটেব অভিধান প্রকাশ কালে, সপ্রমাণ কবিয়াছেন যে, জ্ঞাতিকগণ বহু প্রাচীন এবং তাহাবা খ্রীষ্টিয়ান ছিল না। তবে পাশ্চাত্যে জ্ঞাতিকগণ কোথা হইতে আসিয়াছিল? আব তাহাদেব কোন ধর্ম? কোন স্থানে উদ্ভব হয়, ইহাব তদন্ত কেহ কবিয়া থাকেন কি?

ইংরাজী অভ্যাস বশত অনেক নষ্টিক পাঠ করেন, গ্রীক পাঠ গ্রাস্তিক। জ্ঞাতিক সংস্কৃতে বোধনে প্রযোজ্য হয়। আবার গ্রীক গনিস (gnosis) শব্দের অর্থ জ্ঞান, দুইটি এক ধাতু হইতে উৎপন্ন। সুতরাং ইহা সংস্কৃতিরই অপভ্রংশ, ভিন্ন জাতিব উচ্চারণ জনা কিছু বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, তদ্ব্যতীত নষ্টিক না বলিয়া জ্ঞাতিক বলাই সুসঙ্গত বোধ হইতেছে। খ্রীষ্টিয় সমাজের পুর্বারূপ লেখক মার্শডেন গ্রীক গিগনস্কো gignosko শব্দ হইতে জ্ঞাতিক শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। (৮) কিন্তু গ্রীক ভাষায় গিগনস্কো শব্দের অর্থ গর্ভবতী হওয়া। এ অর্থে জ্ঞাতিক শব্দের ব্যুৎপত্তি কবা সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই। মার্শডেন বিজ্ঞলোক, বিজ্ঞ লোকের ভ্রম হয় না; বোধ হয় তিনি বাস্তবতা প্রযুক্ত গ্রীক গিগনস্কো gignosko (বোধনে) শব্দটি পরিহার কবিয়া থাকিবেন। উক্ত শব্দ হইতে কেহ কেহ জ্ঞাতিক শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতে ক্রটি করেন নাই। মিছে বিবাদ করিয়া কেন মরি, জ্ঞাতিক শব্দের দার্শনিক অর্থ আছে, তাহাতে কিরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হয় দেখা যাউক।

গ্রীক ভাষে প্ৰথম পদার্থকে দার্শনিকেবা গনিস gnosis অথবা সোফিয়া sophia বর্ণিতেন। ইহাব অর্থ বুদ্ধি। জ্ঞানিস্ শব্দের সহিত জ্ঞাতিক

. (6) Gibbon. II. 283.

(7) Catalogue of Irenaeus and Epiphaneus.

(8) Marshden History of the Church. I. 479.

শব্দেব যে সম্বন্ধ। সোফিয়া শব্দের সহিত সোফিস শব্দের সেই সম্বন্ধ। গ্রীক দার্শনিকগণ সোফিসাভিধাত ছিলেন। সোফিস এবং জস্তিক, সোফিয়া এবং জিসিস্ পবম্পব অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। বিশেষত জস্তিকদিগের শ্রেয়াব-
তাব বুদ্ধি। (৯) দার্শনিক অর্থ দ্বারা ফিনসফার, সোফিস, সোফিষ্ট্রী এবং
জস্তিক শব্দের শবম্পব অতি নিকট সম্বন্ধ বিজুস্তিত হয়। আদি অমুমান
কবি, ভিন্ন ভিন্ন কাথলিক দাবা ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জস্তিক ধর্মোৎপত্তির নানামত প্রচার আছে। ফাইলোর মতে মিসর-
দেশ হইতে কিন্তু অধিকাংশ লোকে সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন যে, পশ্চাত্যে
বৌদ্ধধর্ম প্রচার জনাই জস্তিক ধর্মের জীবন সঞ্চাব হইয়াছিল। (১০)
আমি দেখাইয়াছি উতালীব সমাজ হইতেই পশ্চাত্যে নানা দার্শনিক মতের
সৃষ্টি হইয়াছে, জস্তিক সমাজ তাহাব মূল, কিম্বা শাখা। (১১) তাহাদের
মতেব সহিত বৌদ্ধ ধর্মের অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ আছে এইজন্যই অমুমান
কবি জস্তিকগণ বৌদ্ধ ছিল, বৌদ্ধদিগের ন্যায় তাহাবা স্রষ্টা স্বীকার করিত
না, এইজন্যই জড়কে নিত্য কাণ বলিত। (১২) জড়ের অপকর্ষ
ও হুঃখদায়ক ধর্ম মানিত। কেবল জড়ের মোহিনী শক্তিই মনুষ্যকে প্রলুন্ড
এবং ভ্রান্ত কবে। ইহাব সেই মোহিনী শক্তি চূর্ণ করিবার উপায় সমাধি।
(১৩) খ্রীষ্টীয়ান দিগের শয়তানের সহিত বৌদ্ধদিগের জড় বা প্রলোভনে কি
প্রভেদ আছে? জস্তিক ও বৌদ্ধদিগের বহু বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য ছিল।
পশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহা অস্বীকার কবিতো পাবেন না। জস্তিক ইয়ন
(Aeon) দিগের উৎপত্তি ও বৌদ্ধদিগের ত্রিবিধ বুদ্ধোৎপত্তিব বৃত্তান্ত একই
পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। অর্থাবিস্কারকদিগের দোষে তাহার রূপান্তর
বলিয়া বোধ হয় মাত্র। তথাপি বিজ্ঞ রিস্ ডেবিড্ প্রকৃত মত স্বীকার
করেন। ইয়ন শব্দটা অর্থাবিস্কারকগণ এক হুঃখের করিয়া তুলিয়াছেন,

(9) Mosheir I. 229.

(10) Mansel's Gnostic Hecretis. P. 35.

(11) Court of the Gentiles. III. 123.

(12) P. C.

(13) Mystus.

যে উহার অর্থ পণ্ডিতেরা বোধগম্য করিতে অসমর্থ। (১৪) রিস্‌ডেবিড্‌স্‌ স্পষ্ট বক্তা, এই জন্যই বৌদ্ধ এবং জৈনিক ইয়নের কঠক সাদৃশ্য স্বীকার করিয়াছেন। (১৫)

দ্বিতীয় বিষয়টী মিল্লোনিয়ম্‌ । ইহা বিজাতীয় শব্দ। ইহার অর্থ সহস্র অক্ষ। এ শব্দ কি অর্থে জৈনিকেরা ব্যবহার করিয়া ছিলেন, তাহার কেহ সন্দেহ বুঝিতে পারেন কি? ইহা এক্ষণে পাশ্চাত্য জাতিব হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাবাই ইহার অর্থ বোধকর। আমরা ত কেহই নই, সুতরাং মিল্লোনিয়ম্‌ শব্দের অর্থ আমরা বুঝি না। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থে যে বস্তু এবং খৃষ্টীয় গ্রন্থে বাইবেলের ‘প্রকাশিত’ নামক পদের বিশেষ অর্থের বহুবিধ পদের যেকোন অর্থ দেখি, তাহাতে উক্ত উভয় বৃত্তান্তের ত সমতুল্য দেখিতে পাই না। খ্রীস্টীয়ানেরা খ্রীষ্টের জন্মের ভবিষ্যাবলী প্রদর্শন করেন, খৃষ্টের সহস্র বৎসর ধর্মবাক্যের প্রমাণ উল্লেখ করেন, (১৬) কিন্তু এটা নূতন কথা বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইল না। খ্রীষ্ট আসিবেন এই ভবিষ্যাবলীর উচ্চতর রব জ্ঞেয়শালনে উপনীত হইবর পূর্বেই ভারত কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। জ্ঞানী বল্লভি এবিষয়ের সাক্ষ্য দিয়াছেন। (১৭) বৌদ্ধ গ্রন্থ জাতকে একপ ভবিষ্যাবলী আছে যে, ভগবান বুদ্ধদেব ভ্রমণে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চ সহস্র বৎসর পরে শাসন স্থাপনা করিবেন, ইহা স্পষ্ট বৌদ্ধ “ভদ্রকল্প” অর্থাবিকারকরণ ইহার কি অর্থ করেন? এ বল্ল ব্যাপার বৌদ্ধ বা জৈনিকদের, খৃষ্টীয়ানদিগের এ শিক্ষা জৈনিক ধর্মোপদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত প্রমাণ দ্বারা খৃষ্টের জন্মের মূল প্রবৃত্তি সপ্রমাণ হইবে।

বৌদ্ধ এবং জৈনিক মতে আত্মার শেষ উন্নতি একই প্রকার। (১৮) জৈনিক সত্ৰাণের একটা শাখা সম্প্রদায় কার্পোক্রেশন নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

(14.) Mohsheim I 89.

(15.) Rhysdavid's Buddhism p. 287.

(16.) Revelation. Ch XX.

(17.) Volney on the Revolutions of Empire. 155.

(18.) Rose Crusians. p. 47.

এই সম্প্রদায়ের সবলি বৌদ্ধদিগের ন্যায়। (১৯) এরূপ সর্ব বিবন্ধে সমরূপতাব কারণ কি, অর্থাবিকাবকেরা বলিতে পারেন কি?

ফাইলো ও প্লিনি লিপি দ্বারা ব্যক্ত হয়, পালেস্টিনের হেসেনি সম্প্রদায় বৌদ্ধ ছিল, তাহাদিগের রীতি নীতি সম্বন্ধে লিপিত হইয়াছে যে, তাহারা সমৃদ্ধিশালী নগর ত্যাগ কবিয়া নির্জন প্রদেশে বাস কবিত, বৌদ্ধ বিহারের ন্যায় তাহাদিগের মঠ ছিল। ঐ মঠ তাহাদের আশ্রম-ছিল। মঠের নিয়ম সকল বৌদ্ধ বিহায়েব ন্যায়; বৌদ্ধ ধর্মের নিষিদ্ধ পাণগ্রহণ, মাদক সেবন, মাংস ভক্ষণ, অসত্য কথন, ও নৈশ ভোজন প্রভৃতি কর্ম্মে তাহারা কদাচ প্রবৃত্ত হইত না। পূণ্য দিবসে অনশনে থাকিত ও আত্মবিক্রম যত্নে ধর্ম্মাশুষ্ঠান করিত; কেহ ধর্ম্ম বিগর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা আপনাদিগের মঠ ও শ্রেণী হইতে তাহাকে বিনিক্ষান্ত কবিয়া দিত (২০) পবোপকার এবং দয়া, শাস্তি এবং প্রেম তাহাদিগের অন্তঃকরণেব ভূষণ ছিল। ধর্ম্ম পালন জন্য অনায়াসেই তাহারা মৃত্যুর বশীভূত হইত। ধর্ম্ম জীবনে প্রবিষ্ট কবাইবাব সমস্ত তাহারা “শীল” গ্রহণ কবাইত। এ রীতি বৌদ্ধদিগের চিব বর্তমান; বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ—হীনযান ও মহাযান; হেসেনিরা তাহাই অবলম্বন করিত, এই হেতু অনেকেই অনুমান কবেন যে ইতালীয় সমাজেব মত হইতেই হেসেনি ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃষ্টরূপে দীক্ষিত না হইলে ভাঙারা কাহাকেও আপনাদিগের শ্রেণী মধ্যে গ্রহণ কবিত না। অহিংসা এবং ভ্রাতৃত্বাব হেসেনিদিগের শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম ছিল (২১), প্লিনি বলেন ডেডসিও পশ্চিম পারে তাহাদের প্রথম অবস্থিতি, তথা হইতে উহারা ক্রমে সিরিয়া, পালেস্টিন ও মিসর দেশে বিহার স্থাপনা কবিয়াছিল। প্লিনি ইহাদের আদি বৃত্তান্ত পবিজ্ঞাত নহেন (২২)। বাইবেল গ্রন্থের নিউটেটেমেন্ট মধ্যে ও হেসেনিদিগের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। কিন্তু যীশুকে যিনি বাপ্টাইজ কবিয়াছিলেন, সেই যোহন এবং যীশু উভয়েই হেসেনি গোত্রীয় (২৩)।

(19) Beeton, 423.

(20) Philo, *Lee Vita Contempt.* 478.

(21) Pliny *Nat Hist.* V 17.

(22) P. C.

(23) Beeton.

হেসেনিদিগেব অপব কয়েকটা শাখা মিশবে-বাস করিত, তাহার। থিরা-পুতিক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পুৰাতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন থিরাপুতিকদিগের আর এক সম্প্রদায় ছিল তাহাবা আঙ্কেতি নামে খ্যাত। আঙ্কেতি গ্রীক শব্দ, ইহাব অর্থ অভ্যাসকাৰী। থিরাপুতিক শব্দের অর্থ চিকিৎসক। হেসেনির অর্থ পুতবুদ্ধি বা শুদ্ধমাত। ভিন্ন ভিন্ন নাম হইলেও ইহাবা একই ধৰ্ম্মাবলম্বী এবং এক-গোত্রজ। প্রাজ্ঞ লেখকগণ বলেন কাথলিক মত ও আঙ্কেতি ভিন্ন নহে, এক ধৰ্ম্মাবলম্বী। অত্যন্ত প্রাচীন খৃষ্টীয় সমাজের বৃত্তান্ত লেখকগণ বলেন যে উক্ত আঙ্কেতিগণ স্পৌদে নামে খ্যাত ছিল। ইহাব সহিত বৌদ্ধ শব্দের সম্পূর্ণই সমকপতা লক্ষিত হয়। কাথলিক মত ও উক্ত সম্প্রদায় ভিন্ন নহে। এ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু পূৰ্বে লোকে তত সভ্য ছিল না, এই নিমিত্ত এ বিষয়ের তৎকালে কোন মীমাংসা হয় নাই; কিন্তু এক্ষণে আঙ্কেতি, কাথলিক মত বা বাজক, থিরাপুতিক ও হেসেনি, বৌদ্ধ ও জ্ঞাত্তকদিগেব গভীর তত্ত্ব নিকূপণ করিবার সময় আগত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় মতাবলম্বীগণ থিরাপুতিকদিগকে খৃষ্টীয়ান বলিয়া বর্ণনা কবিয়া থাকেন, কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর বাসনেজ্ সপ্রমাণ কবিয়াছেন যে তাহার। খৃষ্টীয়ান নহে। (২৪) কিন্তু তিনি বলেন যে কাথলিক বাজকদিগেব উপদেষ্টা উপ-রোক্ত সম্মানীগণ। তাহাদের আচাব ব্যবহাব মত বিশ্বাস—সমস্তই বৌদ্ধ সম্প্রদায় সদৃশ। (২৫) উহাবা পূৰ্ব নাম ত্যাগ কৰত ক্রমেই মত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাসনেজের উপব আমি টীকা করি, এমন যোগ্য লোক আমি নই, তথাপি আত্মমত প্রকাশে সকলেবই স্বাধীনতা আছে। আমি অনুমান করি বোমীয় সম্রাট কনষ্টান্টাইন ঘোর কুতীর্গিক দলের অগ্রণী ছিলেন। তাহাবই উৎপীড়নে কুতীর্গিক দলেব প্রশ্রয় রুদ্ধি ও জ্ঞাত্তক ধর্মের লোপাপত্তি হইয়াছিল। (২৬)।

প্রগাঢ় খৃষ্টীয় তত্ত্ববিদগণ এক তানস্বরে নির্দেশ কবিয়াছেন যে, প্রাচীন

(24) Basnage. Histoire des Jues. Ch. ৪7.

(25) I bid.

(২৬) Ibid.

গাথা ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম পুস্তক অবলম্বনে বোম্বীয় খ্রীষ্টীয়ান ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। বিস্তৃত মণ্ডলীয় মনোভাবের ধর্মোন্মত্ততা নিঃসন্দেহ চিত্রে ইহা বর্ণিত হইতে পারে না। তন্মিবন্ধন টগা ম্পটে বোম্ব হইতেছে যে, কাথলিকগণ বোম্ব-ভাষী ধর্মের অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, এ পর্য্যন্ত ইহার নিরা-বরণ হয় না, ই। (২৭)

এই সন্দেহ অপনোদন জন্য কৈশব বাবোনিয় খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের পুর্বার্ত্ত লিখিয়াছেন। কিন্তু তদ্বারা কাথলিক মণ্ডলীকে চম্ভুস্থান না করিয়া তাহা-দিগকে আবণ্ড অন্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাব গ্রন্থে ভ্রমেব অন্ত হয় না; ধর্ম পুর্বার্ত্তে ভ্রম বড়ই শোচনীয় এবং লজ্জাবহ (২৮)।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মালম্বীদিগের বিশ্বাস প্রেবিত গণের কার্য্য কোন মতেই মিথ্যা হইতে পারে না। অতএব তাহাবা যাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা সত্য। কিন্তু প্রেবিত চবিত লেখকগণ যাহা বলেন তাহা সন্দেহনয়, উপকণায় পূর্ণ এবং অত্যন্ত ভ্রবণ্যহ। (২৯)

খ্রীষ্ট স্বয়ং ধর্ম্ম প্রচার জন্য সমস্ত জন শিষ্য প্রেবণ করেন। কেবল লুক এই কথা বলেন, মোহন, মথি, এবং মার্ক একথা বলেন না; অধিকন্তু পাশ্চাত্য সমালোচকেরাও ইহাব প্রতিবাদ করিয়াছেন। (৩০)

সত্যের অনুরোধ বলিতে হইল এ ব্যাপার বৌদ্ধ সমাজে অপরিজ্ঞাত নহে। কাবণ বিদিত আছে যে ভগবান্ বুদ্ধদেব বর্ষাকালে মুগদাব বনে মাসত্রয় অতিবাহিত করিয়া ষাইট জন শিষ্যকে ধর্ম্ম প্রচারার্থ দিগ্ দিগন্তে প্রেবণ সন্থ আদেশ করিলেন “স্বধর্ম্ম প্রচারার্থ তোমরা একগণে ভিন্ন ভিন্ন অভিমুখে গমন কর, ধর্ম্মের সঞ্চাব কর, নীচ উচ্চ মধ্য সর্ব গৃহেই ধর্ম্মের কথা প্রচার কর, ধর্ম্মের প্রসঙ্গ দিবসের নায় পক্ষ্মানন্দে সকলের মনের গোচর হবে।” (৩১)

(27) Mosheim. IV 208

(28) Ibid. 206

(29) Mosheim Ecclesi. Hist. I.95.

(30) Ibid I 96

(31) Banddha Jataka

বোমে বহুকালাবধি পোপের প্রাজ্ঞার, সেই পোপের আদি বৃত্তান্তই সন্দেহাত্মক। বোমে কে প্রথম বিশপ হইয়াছিলেন, কথলিকগণ তাহা সমপ্রমাণ কহিতে পাবেন না। (৩২)

খ্রীষ্টীয় ধর্মের কোন পূর্বাবৃত্ত লেখকও বোমের আদি বিশপদিগের বৃত্তান্ত নির্ণয় কহিতে পাবেন নাই। (৩৩)

লক্ষ্য হইবে কালিকগণ বুদ্ধ ধর্মকে গ্রাস করিয়াও নিবৃত্ত নহেন। ফগনি পণ্ডিত কালিস ডি, গান্সি, বুদ্ধদেবকে কালমুখ হাতারী জাতিব উপন্যাসোক্ত নারকে বসিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এতদপি কালিকগণ দেববৎ তাঁহাকে পূজা করেন। (৩৪)

পৃথিবী মধ্যে অনেকেই জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবরাজ লভ পূর্বক লোকের পুত্র এবং উপাস্য হইয়াছেন, কিন্তু খৃষ্টীয়ানবাসে সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধদেবকে যখন তখন ক্রাইষ্ট বলিয়া গোলোক ধাঁ ধাঁ দেখেন, ইহাব তাৎপর্য কি? তব ক্রাইষ্ট কি বুদ্ধ? না বুদ্ধ ক্রাইষ্ট? (৩৫)

মাক্বেথ ও হাম্লেট ।

২।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মাক্বেথ ভবনে অন্যতর রাজ সেনাপতি বান্ধো নীম পুত্রেব সহিত কথোপকথন করিতেছেন, গভীর কবাণ নিশীথে নক্ষত্র

(৩২) Mosheim I. 139.

(৩৩) Church History. Mosheim.

(৩৪) Bibliothique Sacree of Lather Richard.

(৩৫) Origin of Pagan Idolatry III 60.

সকল অদৃশ্য হইয়াছে ; বাক্সোব হৃদয়ে কবালচ্ছায়া পড়িয়াছে ; তিনি পুত্রকে আশ্রয়ক্ষার্থ স্বীয় তরবাবি প্রদান করিলেন ; দুঃস্বপ্ন হইতে রক্ষার্থ দেব-তাদের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—এমন সময় মাক্বেথ আসিলেন । রাজা ডক্কান্ আতিথ্যে পবিত্র হইয়া মাক্বেথ-গৃহিণীকে যে ছীবক খণ্ড উপহাৰ দিয়াছেন, বাক্সো তাহা মাক্বেথের হস্তে প্রদান করিলেন । বাক্সো বলিলেন, ‘আমি গত বাত্রি সেই তিনটা প্রেতিনীকে স্বপ্নে দেখিয়া ছিলাম’ ; মাক্বেথ বলিলেন ‘আমি তাহাদেব কথা আর ভাবি না—সময় পাইলে, তাহাদেব ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে তোমায় আশ্বাস পৰামর্শ করিব ।’ বাক্সোর পিতা পুত্রে শয়ন করিতে গেলেন । মাক্বেথ দৃষ্টিভ্রমে মগ্ন হইলেন ; সন্মুখে শূন্য দেখিলেন, তববারি লগ্নমান, তাহার মুট তাঁহার হস্তের দিকেই রহিয়াছে ; ধবিত্তে গেলেন, ছায়া তববারি ধরা যাইবে কেন ? তখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার দৃষ্টিভ্রমই তাঁহার দৃষ্টিপথে তববারি রূপ ধরিয়া তাঁহাকে দুর্কার্য্যে পথ প্রদর্শন করিতেছে . তখন মাক্বেথ আপনাব কবাল হৃদয়ে সেই গভীর মেঘাচ্ছন্ন নিশীথেব কবালচ্ছায়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । অন্য গৃহ হইতে মাক্বেথ গৃহিণী সঙ্কেত ঘণ্টাধ্বনি করিলেন ; অমনি মাক্বেথ ডক্কানেব গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন । প্রথম দৃশ্য শেষ হইল । ছবাকাজ্জাব দাহনে, দুষ্প্রবৃত্তিব বাতাসে, এহেন বীর মাক্বেথ পতঙ্গের মত ভস্মীভূত হইতে চলিল ।

দ্বিতীয় দৃশ্যে এক প্রকোষ্ঠে একাকিনী মাক্বেথ গৃহিণী দণ্ডায়মানা । পিশাচী সুরাপান করিয়াছে ; সুরাব অস্বাভাবিকী উত্তেজনায় আক্লান্দ করিতেছে , পেচকেব বিকট শব্দে, ডক্কানেব কাল নিকট বুঝিয়া প্রেতের মত আনন্দ কাবতেছে । পার্শ্বস্থ গৃহে মাক্বেথের কল্পিত কণ্ঠবব হইল—‘ওখানে কে ও—কি ও’—পিশাচী ভাবিতে লাগিল ‘ভবে হয়ত গ্রহবীৰ্য্য আগিয়াছে, কাজটা তা হ’লে, হলো না—দেখিতেছি, নিদ্রিত ডক্কানকে যদি আমার পিতার মত না দেখাইত, তাহা হইলে আমিই কার্য্য শেষ করিতাম’ । সংকর্ণে অসংকর্ণে—প্রবৃত্তি-রূপাবা লগ্নয়াইতে পাবেন । আপনারা করিতে পাবেন না—লেডি মাক্বেথ পিশাচী বটে । পিশাচ নহে । লগ্নয়াইতেই পারে, স্বহস্তে করিতে পারিবে কেন ? কিন্তু পারিল না বলিয়া, যেন একটু হুঃখিত হইল ; আপনাকে আপনি প্রবোধ দিল, ‘পিতার মত

দেখিলাম, বলিয়াইত পালিলাম না।' এমন সময় রক্তাক্ত-হস্তে মাক্বেথ আসিয়া বলিল 'আমি কার্য্য শেষ করিয়াছি।'

দেখ কি বিষম পাপের কাণ্ড ! ডঙ্কান মাক্বেথের পরম আত্মীয় নিকট কুটুৰ; প্রভু হইয়াও সচিবের ন্যায় ব্যবহার করিতেন; রাজা হইয়া, বন্ধু ন্যায় ভাল বাসিতেন; মাক্বেথকে সম্মানিত করিয়া ডঙ্কান আপনাকে শ্লাঘা বলিয়া মানিতেন। মাক্বেথকে সম্মানিত করিবার জন্য, মাক্বেথ আহ্লাদিত হইবেন মনে কবিয়া, আহ্লাদ করিয়া তাঁহার ভবনে আতিথ্য গ্রহণ কবিয়াছেন; অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্বে মাক্বেথ-গৃহিণীকে বহুমূল্য হীৰক খণ্ড উপহার প্রদান পূর্বক, আনন্দে অকাতবে নিঃশব্দ নিদ্রাব শায়িত হইয়াছেন। সেই আত্মীয়, কুটুৰ রাজা, বন্ধু, পরমোপকারী প্রভু, যখন স্বগৃহে আশ্রিত অতিথি হইয়া নিঃশব্দ নিশ্চেষ্ট ভাবে, আতিথ্য আত্মসমর্পণ পূর্বক গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখন মাক্বেথ তাঁহাকে স্বহস্তে হত্যা কবিল।।। আমরা শ্রীৰামচন্দ্র কর্তৃক গোপনে বালীবধের কথা, সপ্তবথী কর্তৃক বালক অভিমন্ত্যর হত্যাকাণ্ড, যুধিষ্ঠিরেব মিথ্যাবাদে শোকাক্ত দ্রোণাচার্য্যের হত্যাকাহিনী, অশ্বখামা কর্তৃক স্তম্ভ পঞ্চপাণ্ডব শিশুর বধ বিবরণ প্রভৃতি পাপ হত্যাকাণ্ড শুনিয়াছি কিন্তু এমন হত্যাকাণ্ডী মহাপাপী আব দ্বিতীয় দেখি না। প্রথমেই বলিয়াছি মাক্বেথ পাপেব পাপ, মহাপাপ।

মাক্বেথ নাটকের প্রথমঙ্ক, পাপেব উদ্যোগ পর্ব। এই উদ্যোগ পর্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা প্রথম ২ বন্ধে কবিয়াছি। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের আরম্ভেই মহাপাপেব পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি। তাহার পর বাকি বাক্স আনা ভাগে, পাপের পবিণাম প্রদর্শন। মহাপাপেব গুরুভারে বীর মাক্বেথেব হৃদয় দিন দিন কিরূপে নবকে নিমজ্জিত হইতে লাগিল, যে লেডি মাক্বেথ একদিন আপনার পৈশাচিকী কঠোবতাব স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিল, যে প্রতিজ্ঞা বক্ষাথ চুরিত-চুচুক শিশুকে সে বক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া সঙ্কল্বে চূর্ণ কবিত্তে পারে, সেই বাক্সমীর এখন কি ভাবে সুষুপ্তিতেও স্বস্তি নাই, মহাপাপী নম্পতি হৃদয়ে মহাপাপ কিরূপে লীলা খেলা করিতে লাগিল—নাটকের এই শেষ বার আনা ভাগে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে মহাপাপ-ভয়ে পাপীর লাঞ্ছনা বিকট বিচিত্র মূর্ত্তিতে দেখান হইয়াছে।

পাণ্ডের অনাবিধ পরিণাম হ্যাম্লেট নাটকে আছে। হ্যাম্লেট নাটকে পাণ্ডের গভীরান বা ক্রম সঞ্চার দেখান হয় নাই। সাক্ষাৎ পূর্ণাঙ্গ পাপ দিনামাব ভূমি বাজ মূর্তিতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া পৰ, হ্যাম্লেট নাটকেব আরম্ভ। এখানেও সেই দারুণ বিশ্বাস-বাতাৱতা সেই আত্মীয় হন, সেই স্ত্রী ও নিশ্চেষ্টেব বিনাশ, সেই রাজ-হত্যা। এখানে পাপ অতি গুরুতব; বাজা—অগ্রজ সহোদর; অল্পগত অল্পজ বাজোব উপব লোভ পববশ হইয়া, রাজ মহিষীর উপব কামপববশ হইয়া, সেই রাজাকে স্ত্রী-বস্ত্রায় হত্যা কবিয়া রাজ্য কবগত এবা রাজ মহিষীকে শয্যাভাগিনী করিল। রাজহত্যা, অগ্রজ হত্যা, স্ত্রী হত্যা, গুপ্ত হত্যা প্রভৃতি মহাপাপের সহিত স্ত্রী-গমন কপ আব একটি মহাপাপ এখানে মিলিত হইয়াছে। এই পাণ্ডের পাপী ক্রিডিস্ যখন দিনামাব ভূমি সিংহাসনে নিশ্চিন্দে নিঃশঙ্ক ভাবে অধিষ্ঠিত, তখনই হ্যাম্লেট নাটকেব আরম্ভ।

মাক্বেথ নাটকেব বে পর্য্যন্ত আমণ ব্যাখ্যা কবিয়াছি, সেই ভাগেব বাক্তিগত ও তানগত বৈশেষিকত্ব বাদ দিলে, তাহাব পব, অর্থাৎ মাক্বেথ কর্তৃক ডক্কান হত্যার পব, মাক্বেথ, নাটকেব অশকপে হ্যাম্লেট নাটক আবস্ত কবা চলে। হ্যাম্লেট নাটকের প্রথমাক্ষেব প্রধান কথা—হ্যাম্লেটের অপঘাত-মৃত পিতার প্রেতায়া গভাব নিশীৰে বাজ প্রাসাদেব সঙ্গুৰে বিচবণ কবে, প্রহরী দেখিল, হ্যাম্লেটেব বন্ধু হোরেশিওকে বলিল, হোরেশিও স্বচক্ষে দেখিবা হ্যাম্লেটকে বলিলেন। হ্যাম্লেট দোখলেন, প্রেতযোনি প্রতিহিংসা কবিতো হ্যাম্লেটকে উত্তেজনা করিলেন। হ্যাম্লেটেব পিতাব প্রেতায়াব পৰিবৰ্ত্তে ডক্কানেব প্রেতায়া এবা হ্যাম্লেটব পৰিবৰ্ত্তে মাল-কোমকে স্থাপনা কবিনেই—হ্যাম্লেট নাটকেব প্রথমাক্ষটি সম্পূর্ণকপে মাক্বেথ নাটকেব অশ হইয়া উঠে। ইহা ত ইহাক বুঝা যাব, যে ছুই থানি নাটক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পৃথক্ হইলও, তত্ত্বমজ্জায় এক। পাণ্ডের সামান্য ক্ষূলক ধুয়াইয়া ধুয়াইয়া কিকপে ক্রমে ক্রমে ছবাকাক্ষর গুফ স মং কাত্রেব পি.পোষণে, কুপ্রভৃতিব কুবাভাসেব পবিসেবনে, দারুণ দাবা-নলে পবিবদ্ধিত হইয়া, কিকপে আপনাব বাস্তবক্রেত দগ্ধ করিয়া ফেলে, মাক্বেথ নাটকে তাহাই দেখান হইয়াছে; আব সেই পাপিনল আপনায় জগন্মুখি দগ্ধ করিয়াই কান্ত না হইয়া, পার্থক্য বনভূমিতে ছড়াইয়া পড়ে,

কিছুপে সেই সন্মত দৃষ্টি করে, তাহাই হাম্লেট নাটকে দেখান হইয়াছে। তা কি মাক্বেথ নাটকে নাই? আছে। গৌণভাবে আছে। মুখ্য কথা—মাক্বেথ দম্পতির হৃদয়ে পাপের উৎপত্তি, আধিপত্য এবং দৌৰাত্ম্য প্রদর্শন। বাঙ্কোব হত্যার, বালক মাক্‌ডুওয়েব বা তাহার মাতা লেডি মাক্‌ডুওয়েব হত্যার বা যুবক দিওনার্ডের মৃত্যুতে, মূলপাপী মাক্‌বেথেরই ক্রম পরিণাম দেখান হইয়াছে। ইহাই বুঝান হইয়াছে যে এক মহাপাপ পাপকাবীরে আবণ্ড শত পাপে লিপ্ত করে। মুঞ্জ তরু যেমন, আপনাব বীজকোষেই বীজ সকল অন্তর্ভুক্ত ও অঙ্কুর বর্জিত কবিয়া আপনাব হৃদয়েই শত শত ক্ষুদ্র তরু ধারণ করে, একটি জীবন্ত মহাপাপ তেমনই শত শত পাপ'স্থব পবিবর্জিত কবিয়া বিবাজমান হয়, ইহাই মাক্‌বেথ নাটকের কথা। আর যেমন, 'নগর পুড়িলে শেবালয় না এড়ায়' সেইরূপ মহাপাপ নিষ্পাপ হৃদয়ও অধিকার করে। পাপ দুঃখের সূত্র সঞ্চারে সংক্রামক হয়—তাহাই হাম্লেট নাটকের কথা। দেখ এক ক্লডিয়সেব মহাপাপ হাম্লেটে মহাদুঃখের অবতারণা কাবল, সেই মহাদুঃখের সঞ্চাবে হাম্লেট পাপে লিপ্ত হইতে লাগিলেন, হাম্লেট স্বহস্তে নবহত্যা কবিয়া সঙ্গে সঙ্গে নাবী হত্যার পাপের ভাগী হইতেছেন, স্বহস্তে জল বিবিয়া দূত হত্যার দৃষ্টি কবিতোছেন। ক্লডিয়সেব মহাপাপে হাম্লেট মহাদুঃখী, হাম্লেট মহাদুঃখের মহাভাবে, নানা পাপে লিপ্ত; ক্লডিয়সেব মহাপাপ কি কেবল নিকটস্থ নিষ্পাপ হাম্লেটকে পাপে লিপ্ত এবং ভস্মীভূত কবিয়াই ক্ষান্ত? তাহা নহে; মহাদুঃখের সূত্র সঞ্চাবে সেই পাপের প্রসব বৃদ্ধিতে অশীতি-পব বৃদ্ধ অমাত্য পলোনিয়সেব অপঘাত হুত্বা, নগীর পুতলী অফেলিয়াব পাথারে প্রাণ বিসর্জন, সাহসী উৎসাহপূর্ণ লায়র্টিসেব মহাপাপে লিপ্ত হইয়া অকালে কালমুখে প্রবেশ, দুই জন রাজদূতের বিদেশে ঘাটুক হস্তে অকাবণ প্রাণ সমর্পণ, রাজসংসারের অকল্পিত শ্রী-হীনতা এবং বাঙ্কো পবদেশীর অধিকার,—এ সকলই সেই মহাপাপের আত্মসঙ্গিক ফল। মাক্‌বেথ নাটকে সেক্সপীয়র বলেন পাপ পাপীকে পোড়ায়—হাম্লেট নাটকে বলেন, ভাত পোড়ায়ই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ বিস্তার করিয়া, পাপ ছড়ায়, চতুর্পাশ্ব পাপী ও নিষ্পাপকে সমানে দগ্ধ কবিয়া ফেলে। ইহা খানি নাটক একটি নক্সায় এইরূপে দেখান যাইতে পারে,—

মাক্বেথ

পাপের উৎপত্তি, পবিপুষ্টি, আধিপত্য, দুঃখ জনকতা, সংক্রমণ পরিণাম

হামলেট

পাপের পবিণাম প্রদর্শন উভয় নাটকেবই মুখ্য উদ্দেশ্য। মাক্বেথ নাটকে পাপের উৎপত্তি, পবিপুষ্টি, আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে দেখান হইয়াছে, দুঃখজনকতা গোণভাবে আছে; হামলেট নাটকে আধিপত্য, দুঃখ জনকতা সংক্রমণ বিশেষকণে দেখান হইয়াছে—পবিপুষ্টি গোণভাবে আছে। আধিপত্য উভয়েই সমান, পরিণাম একরূপ হইয়াও স্বতন্ত্র। উভয় নাটকেই বিদেশী রাজ্য কতক স্বদেশ আক্রমণের কথা আছে। উভয় নাটকেই নবওয়ে বাজ আক্রমণকারী। মাক্বেথ নাটকে নবওয়ে বাজকে পবাভূত কবিয়াই মাক্বেথের মনে দবাকাজ্জাব উদয় হয়, তাহাতেই পাপের সূত্র-পাত—কিন্তু পবিণামে কুটিলওব সিংহাসনে প্রকৃত উত্তবাধিকারী মাল-কোম্ অধিষ্ঠিত; দেশে শুভকব শাস্তি বিরাজিত। হামলেট নাটকেব আরস্তে নবওয়ে বাজের আক্রমণ সূচনা, পবিণামে সেই নবওয়ে বাজ কর্তৃক দিনামার ভূমিব অধিকার, দিনামারগণের স্বাধীনতাচ্যুতি। কুডিয়সেব পাপ সংক্রামক বলিয়া তাহাব পবিণাম অতি ভয়ঙ্কব। ভাল, কুডিয়সেব পাপই বা সংক্রামক হইল কেন? আব মাক্বেথেবই বা সংক্রামক না হইল কেন?

পূর্বেই ঐ প্রশ্নের উত্তবেব আভাস দেওয়া হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি মাক্বেথ অপেক্ষা কুডিয়স্ গুণকতব পাপে পাপী। কুডিয়স্ লোভেব সহিত কামপরবণ হইবা অতি গুণকতব ঢকান্য ববেন। গুন্নি-গমন অতি গুণকতব পাপ। ইহাব সংক্রামকতা অতি ভয়ঙ্কব; পিতৃ হস্তা অনাধে পিতৃবৈভব অধিকার কবিতেকে, বিবয়ী লোকেব পক্ষে এ দুঃখ মহাদুঃখ সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই পিতৃহস্তা, বৈভবাপহাবী, আবাব মাতাকে স্বীয় শয্যাভাগিনী কবিয়াছে,—এ দুঃখ বিষয়ী অবিসয়ী সকলেরই শিবে শিবে লুণ লঙ্কাব মত নিয়ত জ্বালা দিতে থাকে। মাতা দুঃচাবিনী বলিয়াই ধীর স্থিব গন্তীব প্রকৃতিব হামলেট দুঃচিন্তাব অবসন্ন। পিতৃব্যের দুঃকৃতি ও মাতার দুঃসর্বত্র ভাবিয়া ভাবিয়া হামলেট—পাগল বল, চিন্তা প্রিয় বল, দার্শনিক বল,—কবি বল, পাপী বল, অকর্মণ্য বল, mystic বল, দুঃখের

বল, বিশ্বাস হীন বল, বাহা বল,—তাহাই হইয়াছেন—তিনি সেক্সপীয়রের হাম্লেট হইয়াছেন—দুঃখেব একরূপ জীবন্ত মূর্তিমন্ত অবত ব হইয়াছেন ।

দুষ্টিতাব যে দুঃখী তাহাব উপব পাপ যেন সন্তোষেই স ক্রমণ করে। তাই আজি এ হেন হাম্লেট, নানা পাপে পাপী । মাতাব দুঃখিত্রে হাম্লেটের যোবতব দুষ্টিতাব উৎপত্তি—সেই দুষ্টিতাব দুঃখিত্রে পাপেব সঞ্চরণ ও সংকমণ ; তাহাতেই—বাজ পবিবাব একেবাবে শ্রীভ্রষ্ট ও বাজ্যেব স্বাধীনতা নষ্ট হইল । ডক্কানেব পুত্রদ্বয় ম লকোম্ ও ডনালবেনেবও পিতৃমৃত্যুতে ও বাজ্য নাশে মহাজুঃখ হইয়াছিল কিন্তু মাতাব দুঃখিত্রেব কলঙ্ক-রূপ দুষ্টি-তাব তাঁহাদিগকে জজ্বলিত ক'ব নাই । তাহাবা শাস্ত্রবক্ষার্থ সময়ে বিদেশে গমন কবিলেন, এব' জ্যেষ্ঠ মালকোন বীবেব মত সৈন্যে স্বদেশে ফিবিয়া আসিবা মাক্বেথকে পব জিত্ত কবিয়া পিতৃ সি হাসনে অভিষিক্ত হইলেন । তবৈই দেখা বাইতেছে,—পাপীব পক্ষ মহা পাপেব পবিণ ম সকল সময়েই ভয়ঙ্কর হইলেও সেই পাপেব সহিত যদি জ চবিত্র জ ড়ত থাকে, তাহা হইলে তাহাতে গৃহিণীতে গৃহস্থেব গৃহস্থালি নষ্ট ম হনীতে রাজ্য নষ্ট হয় । আমাদের চলিত পদ্যে বলে,—

রাজ্যেব পাপেব রাজ্য নষ্ট, প্রজা বষ্ট পায়,

গৃহিণীেব পাপেব গৃহস্থ নষ্ট লক্ষ্মী ছেড়ে যায় ।

গৃহিণীেব ব্যভিচার বাস্তবিক এমনই পাপই বটে; হাম্লেট নাটকে রাজ্যেব পাপেব সহিত গৃহিণীেব ব্যভিচার সংযুক্ত হওয়াতে, এক মহাপাপ, তুমুল মহা পাপ হইয়াছে । সেই পাপে—রাজ্যেব রাজ্য নষ্ট, প্রজার মহা বষ্ট, গৃহস্থেব সঞ্চয় নষ্ট এব' দিনামাব ভূমি স্বাধীনতা ভষ্ট হইল । লোভ ত মহাপাপ বটেই, কাম আবার সেই দুই পাপেব মহাপাপ । লোভ নিজেই উচ্ছিন্ন যায়—ক'ম আবার আব একজনকে দড় ইয়া ক্রমে দশজনকে নষ্ট করে । লোভেব পবিণাম ভয়ঙ্কর; কামেব সংক্রামকতা অতি ভয়ঙ্কর ।

মহাপাপেব পবিণাম সর্বত্র একরূপ হই লও মূলেব বিভিন্নতা বশত এসবে ও বিস্তারে সেই পবিণামেব বিভিন্ন মূর্তি হয়, বোধ হয় এই কথাটি বুরাইবার জন্যই সেক্সপীয়র একই রূপ কাহিনী লইয়া দুই খানি পৃথক নাটক লিখিয়াছেন । মাক্বেথ কাহিনীেব ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এই কথা আবও বিশদ হইবে ।

সেক্সপীয়রের নাটক সমস্তই প্রাচীন কাহিনী ও ইতিহাস হইতে গৃহীত; লীষব প্রভৃতি কোন কোন নাটকে আবাব দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন গল্পের একত্র সমাবেশ আছে। মাক্বেথ নাটকও স্কটল্যান্ডের রাজাদিগের প্রাচীন কাহিনী হইতে গৃহীত। ডঙ্কান-মাক্বেথ রক্তান্ত বিভিন্ন পুরাবৃত্তে বিভিন্ন প্রকারে। পাছে, ঠিক কোন খানি হইতে সেক্সপীয়র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না—সম্ভবতঃ তিনি তিন চারিটি বৃত্তান্তই দেখিয়া থাকিবেন। এক খানি পুরাবৃত্তের এক ভাগের সারাংশ আমরা দিতেছি,—

In Wyntown's Cronykil of Scotland an entirely different version is given—Duncan is there the uncle of Macbeth who is Thane of Glamis and Gruoch is Duncan's wife, who after the murder of her husband marries Macbeth * *

It is in Wyntown that we first meet with the weird sisters, who however only manifest themselves to Macbeth and spur his ambition in a dream

Notes Clarendon series

কণাটা হইতেছে এই,—একখানি পুরাবৃত্তে আছে যে, ডঙ্কান মাক্বেথের পিতৃব্য, এবং ডঙ্কানের স্ত্রী, স্বামীর অপঘাত মৃত্যুর পর মাক্বেথকে বিবাহ করে। সেই পুরাবৃত্তেই তিনটা ডাকিনীর কথা আছে; তবে তাহারা স্বপ্নে দেখা দিচ্ছে মাত্র।

এই তিনটা ডাকিনীকেই যখন সেক্সপীয়র নাটকের প্রস্তাষনাকারিণী-রূপে প্রথমেই আনয়ন করিয়াছেন, তখন তিনি যে ঐ পুরাবৃত্ত দেখিয়া ছিলেন, তাহাই সম্ভব। স্মৃত্যু-পিতৃব্য পত্নী ডঙ্কানের স্ত্রীকে যে মাক্বেথ বিবাহ করেন, একথাও তিনি অবশ্য জানিতেন, কিন্তু এই মূল কথা তিনি পবিত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা প্রথম প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি, মাক্বেথের ও হাম্লেটের কাহিনীর একই মূল কথা—রাজ্যলোভে রাজহত্যা। এখন দেখাইতেছি, যে মূল কাহিনীতে আবও ঐক্য ছিল, সেক্সপীয়র তাহা পবিত্যাগ করিয়াছেন। আদি কাহিনী যথেষ্ট মূল কথা—রাজ্য লাভে রাজ্য হত্যা, পরে

কাম মোহে গুর্জিনী-গমন। কিন্তু মাক্বেথ নাটকে সেক্সপীয়র এই শেষ ভাগ পরিচ্যাগ করিয়াছেন। মূলে বিভিন্ন কবিতা তুলিয়াছেন—কাজেই পরিণামে বিভিন্ন হইয়াছে। একটি কথা ভাগাভাগি করিয়া দুই খানি নাটকে বুঝান হইয়াছে।

সেক্সপীয়র যে কেবল এই দুই খানি নাটকেই একটি বিস্তৃত কথা ভাগাভাগি কবিতা লিখিয়াছেন এমন নহে, তাঁহার অন্যান্য নাটকেও এইরূপ আছে—রূপক গুণক মোতের অর্ধেক পরিষ্কৃটন বোমিও জুলিয়েট, অর্ধেক আর্টনি ও ক্রিওপেট্রার, অবিখ্যাস খানিক লায়াবে, খানিক ওথেলোও। একপ ভাগাভাগি ভাব, পরস্পর সাপেক্ষ ভাবত আছেই, এমন কথাও বলা যাইতে পারে, যে সেক্সপীয়রের সমস্ত গম্ভীর নাটক গুলি একত্র একখানি বৃহদ্রুপ, এক এক খানি নাটক একটি পবিচ্ছেদ মাত্র।

কেবল সেক্সপীয়র বলিয়া নয়, প্রায়ই মহাকবিদের পৃথক পৃথক গ্রন্থের মধ্যে একটা গাঁথনী, একরূপ বাঁধনী থাকে। বিকটব হুগো আপনাব নবেল গুলি সম্বন্ধে নিজেই সে কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশের মহাকবিদের পৃথক পৃথক কাহিনীতেও এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের ভক্তিকাহিনী দুইটিতে—ঋষচরিত্রে ও প্রহ্লাদ চবিত্রে—ভক্তিব দুইটি বিভিন্ন পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋষ প্রহ্লাদ—উত্তরবই অচণ্ড ভক্তি—কিন্তু ঋষ বাজপদেব অপেক্ষাও উচ্চপদের জন্য কামনা করে, প্রহ্লাদ বাজপদ, ইন্দ্রতপদ তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রহ্লাদেব ভক্তি নিষ্কাম; ঋষের ভক্তি সম্পূর্ণ স্কাংম। কাজেই ঋষ ও প্রহ্লাদের পরিণাম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভক্তিতে ভগবান্ মিলে—পরিণামে এতটুকু সমানই আছে—কিন্তু ঋষ—ঋষ লোকে, উচ্চপদে। আব প্রহ্লাদ বৈকুণ্ঠে; সেখ নে—উচ্চ নীচে প্রভেদ নাই।

হাম্লেট্ ও মাক্বেথ নাটকেব মূল পরিণাম একই—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কিন্তু মাক্বেথ দম্পতি লোভেব বলে কল্পকাল লোককে মারিল, আব আপনাবা মরিল, কিন্তু ক্লডিয়ন্, লোভী অথচ কামী ক্লডিয়ন্, বাড়ে বংশে সকলকে টানিয়া, হাম্লেট বংশে নির্মূল করিয়া, স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমিকে পর-দেশীর কবল-গ্রস্ত কবিতা নরকে গমন করিল।

এই জগতের এক দিকে পাপে ছুখে বড়ই মাখামাখি, বড়ই ঘেঁষাঘেঁষি;

অথচ কিছু বেয়া বিষিও আছে ; প'প বলে হুংখ, তোর সৰ্ব্বস্বত আমা-
হতেই, ঐ দেখ, মহ'তেজা মাক্বেথ আমাব ভাণ্ডাবের ধনেই তোর গৃহ
পূৰ্ণ কবিতোছে । হুংখ বলে, তা সত্য, আমি গোড়ায় তোমার নিকট ঋণী
বটে কিছু এখানে সেই মূলধন খাটাইয়া দেখ দেখি, হাম্লেট—আজ কি
ধনে ধনী হইয়াছে ; হাম্লেট—চিন্তা জীবন, অকস্মণ্য, কবি-কল্প, দার্শনিক,
বাতুল, বিশ্বাস-হীন, দুঃস্থের ও দুঃখিগণ, হাম্লেট সকলই—কেননা হাম্লেট
হুংখের অবতার—হাম্লেট—মহাদুঃখী ।

শ্যুশানে শিব ।

১।

গভীর আঁধাবময়ী নীরবাবনী,
ভাসিছে কালের স্রোতে স্তম্ভিত অন্তর ;
প্রকৃতির শিবোপবি অগণিত ফণী,
বিজলীৰ ছটা ক'প গর্জে ভয়ঙ্কর ।
সমস্ত গগন ব্যাপ্ত জীযুত মালায়,
আঁধাব নিশীথে আরো আঁধাব খেলায়

২

অদূবে শেখব রাজি দাঁড়ায়ে নিশ্চল,
স্থিৰ যেন উদাসীন মহামূর্ত্ত ধবি,
নাহি গণি আঁধাবের পবাক্রম বল ;
পড়ে পদতলে তার দলিত কেশরী ।
বিবাগ—বিরাগ—যেন অচলের গায় ;
ভূবিত, আসক্তি ছাড়ি, বৈরাগ্য ভূষায় ।

৩

সম্মুখে প্রবাহমানা ভীমা তরঙ্গিণী ;
 ঘনরাজি ভীমাকাশে করি বিলোকন,
 আশ্ফালনে তরঙ্গৈব তথা নিশীথিনী
 কাঁপিছে, হতেছে যেন অতলে মগন ।
 শান্তি নাই, কোথা শান্তি ? এ যে ভীম বেশ,
 মহা প্রলয়েব এই বুঝি বা আবেশ ।

৪

ভীষণ দৃশ্যের মাঝে উহা কি আবার ?
 ঐ যে ভীষণ-তব পাবক জ্বলন,
 লক লক শত জিহ্বা উচ্চ চূড়াকব,
 পুনঃ নদী বক্ষ ভেদি অতলে মগন ;
 অগ্নিময় চারি দিক ভীষণ আকার ;
 নহে বে আলোক ইহা জীবন আঁধার ।

৫

ছুটিছে ভীষণ বেগে ভীম প্রভঞ্জন ;
 উপার্জিবে যেন দর্পে সমস্ত ধবণী,
 একটা জীবন তার তুলাব মতন
 উড়ে যায়—কোথা যায় ছাডায় মেদিনী ।
 আঁধারে প্রলয় ভীম, মহা ভীমবেশ,
 আঁধারে আঁধার মিশি গাঢ় তম শেষ ।

৬

প্রভঞ্জন সহ মিশি পাবক ভীষণ,
 ছড়াইছে চারি দিকে শিখা আপনাব
 ছুঁইছে আকাশ পুন, ভীষণ দর্শন ।
 একস্থানে সমাবেশ আলোক আঁধার ।
 এ অগ্নি আলোক নয় আঁধার কেবল,
 অশ্বান, বাহাতে বন্ধ মানব সকল ।

৭

কিছু কাল আগে যাবে দেখেছি হাসিতে,
 চিত্রায় শযান-সেই, তাকিয়ে জীবন ;
 প্রতি বোম কপে অগ্নি, প্রত্যেক রজ্জাতে,
 পশি পবমাণু তাব করিছে দাহন ।
 পবতে পবতে এবে ক্ষমেষেব ভাব
 পুড়িয়া কবিছে তার শুধু ভয়সাব ।

৮

উঠিছে আকাশে ধুম শবীর নাশিয়া,
 পড় আছে ধবণীতে বিত্তি অসাব ;
 জীবনেব সহ তেজ গিয়াছে চলিয়া
 শূন্যে শূন্যে মিশা মিশি সব শূন্য সার ।
 বোপাশ মানব তুমি দর্প অবতাব ?
 না হয় মনেতে ছিলে, সংসার মাঝাব ।

৯

নহে বে মানব শুধু গেল যে চলিয়া,
 ঐ আবো কত প্রাণী কত সৃষ্টি হায় ।
 শূন্যেতে জন্মিষে, গেল শূন্যেতে মিশিয়া,
 অণু পবমাণু তাব পাবে না কোথায় ।
 সবাব বিনাশ যাব হয় এক কালে,
 ভীষণ অশান বলি জানেবে সকলে ।

১০

একটি স্তম্ভব ফল জন্মিল শাখীতে,
 স্তম্ভর কুসুম এক হাসিল ধরায় ;
 ছড়ায় বনবী কোম যদি বিটপীতে,
 প্রকাশিল প্রেমতার, সোহাগ বাড়ায় ।
 সেই সব অশানে একত্র মিশিয়ে
 পুড়ে গেল নিম্ন প্রিয় ধন তেজাগিয়ে ।

১১

অন্য গঠন হয় তাম্রিশ ফলেব
খান খান হয়ে গেল, পুড়িল আশানে।
কঠিনতা অবদিত যেই কুসুমের,
হাসি যায় সখা, প্রেম কটাক্ষ ফেগণে,
সোহাগে গঠিত সেই বল্লবী স্তম্ভবী,
পুড়িছে আশানে এবে সব পবিত্রি।

১২

আবো যে ভীষণ দৃশ্য এ মহাআশানে,
ডাবিনী যোগিনী অট, হাসে বে উল্লাসে,
শোষিছে শোণিত যত; বিশাল বদনে
বন্ধুধাণ পড়িতেছে উন্নত উবসে।
প্রাক্তনে দেউটী জলে ভীষণ দর্শন।
দেখিলে তা দিকে মুদ্রা আপনি নয়ন।

১৩

হস্ত নাট কাব্য পদ অঙ্কাজ কাহাব,
কবন্ধ বেহ বা, কেহ কর্তৃ আপনার
ভাজিয়ে শোণিত পিয়ে পিপাসা ছর্কাব
শোষি তিরপিছে; দেখ ভীষণ আকাব।
কেহ বা নাচিছে লয়ে বিশাল কৃপাণ,
কেহ তাব কবে নিজে দেয় বলিদান।

১৪

নাহি দয়া নাহি নায়ী এদেব সহিত,
যত প্রাণ, যত জীব সর্বল ধবিয়া,
ফেলে অগ্নি মাঝে তায়, হয়ে উল্লসিত
পাবক ছড়ায় শিখা আকাশ ছুঁইয়া।
কঠিন কঠিন তম বজ্র হইতে
কবে, সবে ফেলে দেয় অগ্নির কুণ্ডেতে।

১৫

কে ওট বসিয়া হেথা যোগরত মন,

মহাযোগী মহাজ্ঞানী অনন্ত শরীর ;
 জ্যোতির্ময় দিব্য কান্তি ; প্রভায় আপন
 দৃষ্টি মাত্র কবে দূব মানস তিমিব ।
 কে ওই শ্মশানে বসি পুণ্য জ্ঞানচ্ছায়া !
 দিব্য জ্ঞান জননিল কাহাবে হেবিয়া ?

১৬

এই কি সে মহাদেব শিব মহেশ্বর,
 মহাযোগী শিব ময় অনাদি কারণ !
 এই বি বিবাগী সেই, জ্ঞানেছি যাহাব
 শ্মশানেই বাস, আব বিভূতি ভূষণ ।
 শ্মশানে মশানে থাকি মহাযোগী বেশে
 মহাযোগ শিক্ষা দেয় ভূষিত মানুষে ।

১৭

শেনি এই মহাযোগী পুণ্য প্রসবণ,
 চলি গেল শ্মশানেব ভীতি চিত হতে ,
 ডাকিনী যোগিনী আব ভীষণ-দর্শন ।
 কিছুমাত্র শঙ্কা মোব নাবে জন্মাইতে ।
 আঁবাবে ভিলাম যেন নিমিষেব আগে
 আলোকিত হলো চিত দিব্য জ্ঞান রাগে ।

১৮

বৈবাগ্য বিভূতি লিপ্ত অনন্ত শরীবে
 প্রেম পুন তাব মাঝে বিজলী খেলায় ;
 বৈবাগ্য প্রেমেব সমাবেশ একাধারে
 কাব নাহি হয় এতে দিব্য জ্ঞানোন্ময় ?
 শিখ বে মানব হেথা অসাব সংসার,
 হের রে শ্মশানে, হবে বৈবাগ্য সঞ্চাব ।

১৯

হেব বে মানব এই মহা যোগী পানে
 কেমন হাসিছে প্রেম বদনে সুন্দর :

শিখ রে করিতে প্রেম আপনাব জনে,
কিন্তু নাহি রবে মজি তাদেব ভিতর ;
সংসারে বাসিবে ভাল, সৃষ্টি বিধাতার,
শিখিবে শ্রমশান হতে বৈবাগ্য আবাব ।

২০

ঐ দেখ,

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগ্নাগুলি পড়িছে আসিয়া,
তঁাহাব চরণতলে ; অনিত্য শরীর
ভস্মীভূত অইখানে ; দূবেতে থাকিয়া
কি সাধ্য পশিতে তাঁব চরণ স্তম্ভিবে ;
পার্থিব ইন্দ্রিয় নদ কবি ব্যবহার
দেখিবে কি তাঁবে ? উহা অসাধ্য চেষ্টাব ।

২১

হেমের আদর্শ পুন এই মহেশ্বর,
শিখাইছে পেন সবে দেখায়ে সংসারে,
“প্রকৃতি পুনরুৎপাদে,” যাহাব অস্ত্র
প্রেমে বশীভূত নয়, নাঁচিবে কি কবে ?
এই প্রেমে এ বৈবাগ্য নাই বে কখন,
—মোহ নিদ্রাযত্ন, কবি অনিত্য লোকন ।

২২

ধর্ম অর্প কান মোক্ষ চতুর্গ ফল—
ইঁহাব চরণ নাভ, বাসনা কবিলে
বৈবাগ্য, প্রেমের চান্দ সাহায্য কেবল ;
শ্রমশান সংসার ভূত আছে এক কালে ।
বিস্ত বে শ্রমশানে পাবে,— ব্যাকুলিত মন ।
তাজিয়ে এ “অহংভাব”— তাঁহাব চরণ ।

২৩

“মৎস্য মাংস মদ্য মূদ্রা মৈথুন” মকার
একাধাবে সমাবেশ এই শ্রমশানেতে,

ঈশাব চরণ তলে ; ধোঁজ একবার
 পাইবে সকল, হবে দিব্যজ্ঞান চিত্তে ।
 ইনিই শিখান ক্রম পঞ্চ অকাষেব
 ইঁহাব করুণা, পথ সমাদি-লাভের ।

২৪

বৃথা চেষ্ঠা মানুষের বৃথা পরিশ্রম
 নিজ বলে পুণ্য শাস্তি লভিবাব তবে ;
 দুঃখ নিমজ্জিত আত্মা কবিয়া গ্রহণ
 ইনিই শিখান পুণ্য লভিবে কি কবে ;
 স সাবের মাঝে সত্য চিব অবস্থিত,
 কিন্তু মান্য তণা ঘোষ, পাবে না তাহার।
 দুঃখল হৃদয় হয়ে ; আসবে শ্রুশানে
 পুণ্য-শাস্তি-প্রদ-পদ লভিবে এখায় ।

২৫

পিতৃদেব !

পেয়েছি তোমার দেখা বহু ভাগ্য কলে ;
 অভয়ে বসিতে দেও তব শ্রীচরণে ;
 এ পাপ হৃদয় দক্ষ সংসার জঞ্জালে
 জানাইবে কটা কথা আশাস্বিত মনে ।
 সম্ভান অধম হলে, নিকটে পিতার
 সমান স্নেহেব ধন, — ভবস। আমাব ।

২৬

অর্দ্ধেক জীবন গেল অতীত হইয়া,
 না শিখিল না জানিল লভিব কেমনে
 দিব্য জ্ঞান, যাব বলে স্বরূপ জানিয়া
 গঠি পবকাল তবে আত্মা সাবধানে ।
 জ্ঞান করিয়া আত্মা বিধানে তোমার
 গঠিত না হলে, সব যতন অসাব ।

২৭

মজিয়াছি সংসারের অলীক মায়ায়,

না জানিয়া আশ্রিত্ত্ব, অনিত্যে আপন
বিশ্বাস স্থাপন কবি, প্রাণ মন কাষ
সঁপিয়ে তাহার কবে, কবেছি গ্রহণ
অসাব অশান্তি বাশি হৃদি দুর্দলতা—
প্রতিক্ষণে কক্ষ চ্যুত ভূমে তারা যথা ।

২৮

অনন্ত জীবন কবি এদেহে ধাবণ,
নবেছি অনন্ত বাব, —গণনা অতীত,
অনন্ত জীবন তাই অনন্ত মরণ,
প্রতিক্ষণে বাঁচি পুন প্রতিক্ষণে মৃত ।
মরিয়াছি ততবাব গেল যতক্ষণ,
যতক্ষণ পুন পাই,— ততই জীবন ।

২৯

জীবাত্মাও সংসাবেব ক্ষুদ্র শক্তি লয়ে,
মবেছে অনন্তবাব ; বাঁচিছে আবার ;
কিন্তু দেব শিখে নাই কেমন করিয়ে
দিব্য জ্ঞান লাভ হবৈ ; কিম্বা আপনাব
কেমনে হইবে যোগ পবমাত্মা সনে—
কেমনে রহিবে স্ত্রেণে তাঁহার চরণে ।

৩০

পিতৃদেব ।

চাহিয়াছি শতবাব কত চেষ্টা করি
পরাক্রিতে বিপুলগণে ; কিন্তু সে যতনে
হয়েছি বিফল ; আয়ো সমুদয় অবি
প্রবল বেগেতে বত মোরে আক্রমণে ,
জানিয়াছি তাই, বিনে করুণা ভোমাব,
সাধ্য নাই মানবেব রিপু নাশিবার ।

৩১

ভূমি যবে দয়া করি দীন-প্রার্থনায়

বল দেও শত্রুগণে কবিতে বিনাশ,
মুহুর্তেকে পাষ নাশ বিপু সমুদায় ;
কিন্তু নিজ বলে নব বিফল প্রয়াস ।
তাই পিতঃ ক্লান্ত হয়ে তোমার চরণে
কবি আত্ম সমর্পণ দয়া বব দীনে ।

৩২

বিস্তৃত শ্মশান ক্ষেত্র— আমার হৃদয়,
কতশত “আমি” গুলি কত কাল ধবে,
মরিয়াছে নরিতেছে, সংখ্যা নাহি হয়,
“মহা শ্মশানেব” সম ভাবিলু ইহারে ।
একটী মহাশ্মশান এক যুগ হলে
তুই যুগে সেই নাম অবশ্যই ফলে ।

৩৩

জানি কিন্তু—কব স্মৃতি সে মহা শ্মশানে
চিবকাল ; তাই আজি বডই উল্লাস—
অনাবো হৃদয়ে স্থিতি তেমনি বিধানে
কবিরে অনন্তকাল, শ্মশান-নিবাস ।
আত্মা মোব নিত্য নিত্য হেবিরে তোমাবে,
পৃথিবীও নিত্য নিত্য ভক্তি উপহাবে ।

৩৪

পিতৃ দেব ।

শিশুও আমার আজি নূতন বিধান,
চালাও তোমাব আজ্ঞা পালিতে সতত,
সংসারে আজ্ঞায় তব ববি অবস্থান
কাটি এ জীবন-কাল না হই মোহিত ;
নূতন জীবন দেও হৃদয়ে আমার,
প্রণামি তোমাব পদে শত শত বাব ।

শ্রীকামিনীকুমার দাস ।

কৃষ্ণনগরের রাজবংশ ।

বাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশাবলি বৃত্তান্ত চাৰিখানি প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় । প্রথম খানি কোন অপ্রকাশিত নামা পণ্ডিতের লেখা, সহজ সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ—ক্ষিতীশ বংশাবলি-চবিতম । তাহা ত আদিশবের সময়ে ভট্ট নাবায়ণের আগমন অবধি কৃষ্ণচন্দ্রের অভিষেক পর্য্যন্ত আছে । দ্বিতীয় খানি বাজাবলোচন কর্তৃক বিবচিত, নামাণ্য। তদ্য কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ বিবরণ, ইহাতে ভবানন্দ মজুমদারের পিতামহ কাশীনাথের বাণ্যানে আগমন অবধি কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা বঘুবান্ধব মুক্তাপন্ন আছে । তৃতী ভাবতচন্দ্রের অগ্ন্যমঙ্গলের লিখিত বিবরণ । চতুর্থ—কৃষ্ণনগরের বাজব টাঁব ভূতপুত্র দেবে নন্দীয়া বাহুচন্দ্রের বায় কর্তৃক সংকলিত কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রপুত্র বংশাধিত্যেব পুন ভট্টনাবায়ণের বাঙ্গালায় আবিপত্য পাপনাবদি বওমন রাজা ক্ষিতীশচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত (১৮৭১) নববীপ রা ব শেষ ইতিহাস , গ্রন্থখানি ১৮৭৫ সালে লিখিত ।

শেষোক্ত গ্রন্থ বঙ্গের শিক্ষিতমণ্ডলিৰ নিকট সুপরিচিত , ভাবতচন্দ্রের অগ্ন্যমঙ্গল দেশ প্রসিদ্ধ ; প্রথম দুইখানি বড় ত্রুপ্পাণ্য । বাঙ্গালা গ্রন্থখানি সমগ্র দেখি নাই , উক্ত অংশ বিশেষ দেখিয়াছি মান । সংস্কৃত ক্ষিতীশ-বংশাবলি চবিতম্ সস্ত্রতি একখানি দেখিতে পাইয়াছি ।*

প্রথম তিনখানি গ্রন্থের বচনাবলি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক ।

সংস্কৃত ক্ষিতীশবংশাবলি চবিতের শেষ কথা--বাজা বঘুবান্ধব নিজেও যাগাদিক্রিয়া করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ রাজ্য পালনপুৰ্ব্বক যোল শ পঞ্চাশ শকে ভাগীবথীতীবে মুক্তপ্রাণ হইয়া পবমগতি লাভ কবিলেন ।

তাহার পর সেই বর্ষে, মুর্শিদাবাদাধিকৃত যবনের অনুমতি অনুসারে অমা-

* সংস্কৃত গ্রন্থখানি বাবিষ্টর ঐযুক্ত ননোনাহন ঘোষের । মহারাজ ঐশচন্দ্রের দোহিত্র আমদেব বজ্র ঐযুক্ত শ্যামাধব বায় আমাদগকে দেখিতে দিয়াছেন । এই গ্রন্থখানি ১৮৫২ সালে বলি'নে ছাপা । আমরা উহা পুনর্বার মুদ্রিত কবি এবং ঐযুক্ত হরীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত মাসিকপত্র বিদ্যোদয়ের অংশ রূপে উহা প্রকাশিত হইবে । বাঙ্গালা গ্রন্থের কেহ সন্ধান বলিয়া দিলে পুনর্মুদ্রন করিতে পারি ।

তোরা কৃষ্ণচন্দ্র নামে তাঁহার বহুগুণ নিধান পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিল ।

বাসালা গ্রন্থখানির শেষ কথা এই ;—

কিঞ্চৎকাল পরে বগুবাম কৃষ্ণচন্দ্রকে রাজ্য দিয়া ঈশ্বর সেবায় নিযুক্ত হইলেন ।

তৃতীয় পুস্তক অন্নদামঙ্গল সম্বন্ধে সকলেই জানেন,—

বেদলয়ে ঋষি বসে ব্রহ্ম নিকপিল।

সেই শকে এই নীত ভাবত বচিলা ॥

অর্থাৎ—১৬৭৪ শকে অন্নদামঙ্গল সাদৃশ্য হয় । তখন কৃষ্ণচন্দ্র চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিতেছেন । অন্নদামঙ্গলেব কল্পনা ইহার দশ বৎসর পূর্বে হয় নাই, তাহার প্রমাণ আছে । ভাবত নিজ প্রণত সূচনার বিবরণ নিজেই গ্রন্থেব দুই স্থানে দিয়াছেন । দুই স্থানে একই কথা । গ্রন্থাবস্তে আছে,—

মহাবদ জঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায় ।

নজবাণা বলে বার লক্ষ টাকা চায় ॥

● * * *

বন্ধ করি রাখিলেক মুবসিদাবাদে ।

কত শত্রু কত মতে লাগিল বিব দে ॥

* * * *

অন্নপূর্ণা ভগবতী মূবতী ধরিয়া ।

স্বপনে কহিলা মাতা শিয়বে বসিয়া ॥

গুন বাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয় ।

এই মূর্তি পূজা কব হুঃখ হবে কয় ॥

গ্রন্থ শেষভাগে আছে,—

শাকে আগ মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে ।

ববগীবি বিভ্রাট্ হইবে এই দেশে ॥

আলিবর্দ্ধি কৃষ্ণচন্দ্রে ধবি লয়ে যাবে ।

নজবানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে ॥

বন্ধ করি রাখিবেক মুবসিদাবাদে ।

যোরে ক্ষতি কবিবেক পড়িয়া প্রমাদে ॥

অগ্নে দেখা দিব অন্নপূর্ণা কণা হবে ।

এহ গীতে পূজার পদ্ধতি দিব কয়ে ॥

এই শেষ ভাগেব কবিতাব প্রথম পংক্তিব অর্থ—১৬৬৪ শক। সেই শকে বর্গীব বিভ্রাট, তাহাব পব কৃষ্ণচন্দ্র বন্দী, তাহাব পব অন্নদামঙ্গলের সূচনা। সূত্রাং বাঘ গুণাবল্যেব কথাতেই বৃথা যত্নোচ্চ, যে অন্নদামঙ্গলেব সূচনা ১৬৬৪ শকাব্দ পূর্ণ হই নাই ।

বাক্সালা গ্রন্থখানিতে যদিও কৃষ্ণচন্দ্রের নাম আছে কিন্তু রঘুবাহুব মৃত্যু বা কৃষ্ণচন্দ্রের অভিষেকের কথা নাই । তাহাতে অন্তরান কব যাহাতে পারে, যে গ্রন্থখানি রঘুবাহুবের জীবদ্দশাতেই লিখিত হয় ।

সংস্কৃত গ্রন্থখানি কৃষ্ণচন্দ্র অভিষেকের পরে লিখিত । কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণচন্দ্রের বিবরণ বিচ্ছিন্ন নাই । গ্রন্থের পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র বাধ হয় কোন বিশেষ ক্রিতি কিছ বর্ণন নাই । রাজ্যের স্বাধীনতা, জ্ঞানবাপীর সোপান, বা অন্নদাব পূজা পঢ়াব প্রাপ্তি, ইত্যাদি তাহার উদ্দেশ্যেব সন্তাবনা ছিল । সম্ভবত ক্ষিত্রীশব শাসনীয় চরিত্রম কৃষ্ণচন্দ্রের অভিষেকের বিচ্ছিন্ন পরেই লিখিত ।

কৃষ্ণচন্দ্র যখন গোদাবরীসঙ্গমস্থানে, তখন অন্নদামঙ্গলের সূচনা । যখন অন্নদামঙ্গল শেষ হইল, তখন কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রাবতীর রাজত্ব করিতেছেন ।

এই মনোভাটনাট্য ইংরেজী অনুবাদ হয়—বাক্সালা গ্রন্থখানি সর্বাংশে লিখিত, তাহার ১৫ সংস্কৃত গ্রন্থ, সাত শ্রেণীে অন্নদামঙ্গল লিখিত হয় ।

অন্যবিধ মনোভাটনাটে গহন মত প্রতীকবন হয় । তিন খানি গ্রন্থেব বিবরণ তুলন করিলে দেখা যায়—বাক্সালা গ্রন্থে অনেক কথা নাই কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থে আছে । প্রধানতঃ পিতামহ কাশীনাথ হইতে বাক্সালা গ্রন্থেব আদ্য । কাশীনাথ হইবার জমীদার বলিয়া কথা মনে । কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থে যে খান হইতেছে সে এই বংশটির প্রতিষ্ঠিত বংশবংশ । ভট্টনারায়ণ বঙ্গ দেশে আসিয়া প্রদেশ বিপত্তি রাজার মত বাস করেন, আদিগণের নিকট গ্রাম ভূমি ক্রয় করেন, শুধু তাহাই নহে, তিনি রাজকুমার, তাহার পিতা ক্ষিত্রীশ কান্যকুব্জ দেশের কোন প্রদেশে রাজা ছিলেন । অব্যব দেখা যায় যে এই ছই খানি গ্রন্থেব একটা কথা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ভাবতচন্দ্র যেন একটু পরিবর্তন করিয়াছেন ।

বাস্তালা গ্রন্থে রঘুবাম রায়েব বন্দী হওয়ার কোন কথাই নাই। আমা-
দেব পূৰ্ণ অহুমান মত বঘুৰামেব জীবদ্দশায় এই গ্রন্থ লিখিত হইলে, ওল্পপ
একটি ওকতৰ কথা কেন লেখা হয় নাই, তাহা বুঝা যায়।

আবার একটি কথা বাস্তালা গ্রন্থে আছে, কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থে নাই। সেটি
ভবানন্দ মজুমদার কর্তৃক বর্ণিত বিদ্যাসুন্দবেব কথা। সংস্কৃত গ্রন্থ পরে রচিত
হইলেও এই ভাগটি কেন পবিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাও বেশ বুঝিতে পাৰা
যায়। বাস্তালা গ্রন্থেৰ ভাব এইকপ, সমস্ত গল্পটি বিশেষৰূপে চোরপঞ্চাশতে
আছে, ভবানন্দ তাহা হঠাতেই মানসিংহবে গুনান। এখন দেখা যাউ-
তেছে, যে ক্ষিভীশবংশাবলি চবিত্বেব গ্রন্থকাব সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত--তিনি
জানিতেন যে চোরপঞ্চাশতে ওকপ কিছুই গল্প নাই--সুতবাং তিনি বুঝিয়া-
ছিলেন. যে গল্পটি কেবল গল্প মাত্র--সম্ভবত তাহাতেই ঐ ভাগ পরিত্যাগ
কৰিয়াছেন।

আব একটি কথায় অন্নদামঙ্গলেৰ সহিত অন্য দুই খানি গ্রন্থেব বিবোধ
আছে।

বাস্তালা গ্রন্থে আছে স্রযং লক্ষ্মীদেবী বডগাছি গ্রামেব হবিহোড়েব
বাটী হইতে ভবানন্দ মজুমদাৰেৰ নাটীতে কাঁপি লইয়া আগমন কবেন।
ইহাও আছে যে ভবানন্দেব লক্ষ্মী-সেবা ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থে আছে, ভবানন্দ
প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী ও গোবিন্দ বিগ্রহদ্বয়েব মহা সমাবোহপূৰ্ণক পিবাছেব
উদ্যোগ কৰিয়াছিলেন, হঠাৎ বৰ্ষা উপস্থিত হওয়াতে সেই বিবাহ দেওয়া
হইল না, কিন্তু সঙ্গৃহীত দ্রব্যজাতে মানসিংহেব সমগ্র সৈন্যসমূহেব বসদ
যোগাইলেন ; তাহাদিগকে ঘোব দুৰ্যোগে বক্ষা কৰিলেন এবাং তাহাতেই মান-
সিংহেৰ প্রিয়পাত্র হইলেন।

ভাবতচক্ৰ কিন্তু এমন কথাব কোন আভাস কোঁথাও দেন না যে
ভবানন্দ কখন লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা কৰিয়াছিলেন, বা লক্ষ্মীসেবা তাঁহাব ছিল।
ভবানন্দেৰ ভবনে যে গোবিন্দ বিগ্রহ ছিল, এবাং অন্নদামঙ্গলে আছে ;—
একস্থানে,—

মানসিংহ গেলা মজুমদাৰেৰ আলয়।

দেখিয়া গোবিন্দ দেবে মহানন্দ ময় ॥

অসরলী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত ।

দিলেন গোবিন্দ দেবে কব আমি কত ॥

অন্যস্থানে ভবানন্দ নিজ বাটীতে যাইয়াই—

প্রথমে গোবিন্দ দেবে প্রণাম কবিল।

জনকের জননী চরণ বন্দিল। ॥

কিন্তু কোথাও ভবানন্দের লক্ষ্মী ঠাকুবানীব কথা ভারতে নাই। ভাব-
তের মতে ভবানন্দের গোবিন্দজী—হয়, বাচিলাব,না হয় উইডোয়র।

ভারতচন্দ্র লক্ষ্মীঠাকুবানীব পবিত্র অন্নদা দেবীকে হবিহোড়ের বাটী
হইতে ভবানন্দের ভবনে আনিয়াছেন, এবং আডম্ববে ভবানন্দকে দিয়া
অন্নদার পূজা ও আয়োজন কবাটয়াছেন। দেবী অন্নদা বা অন্নপূর্ণার মহিমা
প্রচারই অন্নদামঙ্গলের স্পষ্ট লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে
গিয়া ভাবতচন্দ্র প্রকাবাস্তরে ভবানন্দকে অন্তত তাঁহার গোবিন্দদেবকে
লক্ষ্মী-ছাড়া কবিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ইহাতে গ্রন্থে একটু অসঙ্গতি
দোষও হইয়াছে। পূর্বোক্ত গ্রন্থ স্থানাব কথা অবগত ককন—অন্নপূর্ণা বলি-
ছেন—

শুন বাজা কৃষ্ণচন্দ্র না কবিহ ভয় ।

এই মূর্ত্তি পূজা কব দুঃখ হবে ক্ষয় ॥

আমাব মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ ।

কয়ে দিলা পদ্ধতি, গীতেব ইতিহাস ॥

চৈত্র মাসে গুরুপক্ষে অষ্টমী নিশায় ।

কবিহ আমাব পূজা বিধি ব্যবস্থায় ॥

অর্থাৎ অন্নপূর্ণা নিজমূর্ত্তি স্বয়ং প্রকাশ কবিতেন,পূজাব পদ্ধতি গীতেব
ইতিহাস, পূজার সময়,—সমস্তই বলিয়া দিয়া মঙ্গলগীত প্রকাশ কবিতেন
আদেশ কবিতেন। যদি ইহাব বহু পূর্বে ভবানন্দ একপ চৈত্রমাসে অন্নদার
পূজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কবিয়াছিলেন, আব সে সকল কথা যদি রাজসংসারে
পরিজ্ঞাত ছিল, তবে আবাব স্বপ্ন দৃষ্টমূর্ত্তি চৈত্রমাসে, কথিত পদ্ধতিতে, পূজা
কব—এ কথা অন্নপূর্ণা বলেন কেন? আপনাবা বলিতে পাবেন, দেবতার
মায়া আমবা কিরূপে বুঝিব? আমবা বলি, কবিব মায়ায এখানে দেবতার
মায়া হইয়াছে। যখন প্রথম দুইখানি গ্রন্থ লিখিত হয়, তখন কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক

অন্নপূর্ণা পূজা প্রচায়েব কল্পনাই উঠে নাই, স্তববাং গোবিন্দদেবের কমলা বিচ্ছেদ হয় নাই এবং ভবানন্দগুলি মীলাভ করেন। অন্নদামঙ্গলের রচনা কালে ষাণ্মাসিকের অন্নদান মহিমা বর্ণনা নাথায় একটু হেব্যফব কবিয়াছেন।

সে যাহাচাইক এখন অন্নদা ভবতচন্দ্রের সমাধি কবিতেছি না—
পুলোক্ত তিনখানি গ্রন্থে, অন্নদা ১২ বাল নির্ণয় কবিবার চেষ্টা কবিতেছি না। এই বর্ণনায়, অন্নদা দুই ভ্রাতার বা বাইতে পারে, যে গদ্য গ্রন্থখানি প্রথম, পরে সংস্কৃত চরিত্রখানি, সমস্ত শেষে অন্নদামঙ্গল হয়। অন্নদানন্দনের সমাধি কাল কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মের চতুর্দশ শতাব্দী বৎসর। বাঙ্গালা গ্রন্থের নিবন্ধন সমস্ত কৃষ্ণচন্দ্রের কিছু পূর্বে। ২৫, ৩০ বৎসর মতো তিনখানি গ্রন্থ নিশ্চিত হয়।

এই তিনখানি গ্রন্থের কথিত রূপান্তরিত ঐতিহাসিক, এক্ষণে তাহা দেখা যাইতেছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের সভা সদা বাঙালীর ভাবানন্দ শ্রমপণ্য মহিমায় সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা প্রচার করিতে রতী। ভাবানন্দ মহানন্দ যম বতপুত্র পুত্র হইতে, কৃষ্ণচন্দ্রের শত্রু—মহাবংশজিতাশন শাবর্ণীচ বর্ত্তে এ বর্ণা প্রচারিত হইলেও, সে বর্ণা এখন অন্নদা ভাবানন্দ দেন নাই। নানা স্থলে দিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত, অন্নদা ভাবানন্দ হলে দিলেই চলিত। অন্নদা ভাবানন্দক নামের উচ্চারণের বিবরণ কৃষ্ণচন্দ্র পয়স দিয়া ছিলেন, সচ্ছন্দে পুণ্যসময় পরিচয় দিত পারিতেন, তা দেন নাই।

সংস্কৃত গ্রন্থে আছে—অন্নদা প্রভাশদিভাবে পরাজয় কবিয়া একদা মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

ভো মজুমদার! ভবতো বাগ্যতো অগ্নিন্ সংগ্রামে মহান্ সন্তোষো বৃত্তঃ, অবিবল সপ্তাহে ত্রিদিনে চ নন সৈন্যস্য প্রাণবকা ক্রতা, অতঃ তব সমী-
হিতং ক্রুহঃ; যথা ৩২ অশ্বাঃ কহবঃ। ইতি এবং সনাদিষ্টো, মজুমদারো ভট্টনারায়ণদ্যাদিশূরনাথগমন বশাবস্থায় বাজাশাসন, কাশীনাথ বায় পলায়ন, ছবনাথিক কতক ভবনিবন এদিক সর্ব্বং কথ্যানাস, বাগোয়ানাথা প্রভৃতি চতুর্দশ দেবদেবগণের অভিল্যুচ উদঘটনামাস। (১)

(১) উক্ত অংশ অত সহজ সংস্কৃত, সেই জন্য ইহাব অনুবাদ আর দেওয়া গেল না। সন্ধি বহুদেও পদবিচ্ছেদ কবিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই স্থলে ভারতচন্দ্র কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

মজুমদার মানসিংহ কহিয়া কি বল ।
পাতশাব হজ্জ বে আনান সঙ্গে চল ॥
পাতশাব সহিত সাক্ষাত মিল ইব ।
বাস্য দিয়া কবনানি বাজা ববাইব ॥

* * *

অন্নপূর্ণা দেবীবে পৃথি যা মজুমদার ।
মানসিংহ সহিত চলিয়া দবাব ॥

দিল্লীতে ভবানন্দ পৌছিলা,—

পূর্ব-নিহত-স্বায় হস্তিক কাশীনাথ বাবস্যা স্মৃতা মজুমদার ইতি পশ্চিচয়ং
জানন্ তথাবিধ আতিথ্যাদি এবণেন চ পাবম পশ্চিচয়ো জবনেশ্ববো মানসিংহ
আহ, মানসিংহ কাশীনাথ স্মৃতা মজুমদারো মহাশভাবঃ—ইত্যাদি ।

অন্নদামঙ্গলে দেখুন, মানসিংহ ভবানন্দেন কি বলিয়া পশ্চিচয় দিতেছেন ;—

পিদাভিল বাজালায় ঠেবছিন্ন বড দান,
সাত বোজ দাকণ বাদিলে ।

বিস্তব বস্তব মেল, অবশেষ মহা বৈল,

উঃ বাসী সহ দল বলে ॥

ভবানন্দ মজুমদার নাম, পূব ভাসিয়াব
বঙ্গালি বামণ ঐষ্ট জন ।

সপ্তম্ভ গোবাক দিল, সকলেয়ে বাঁচাইল,
নত ইইল ইহাব কাবণ ॥

* * *

বাজা দিব কহিয়াছি, সঙ্গে দবি আনিয়াছি,
গোলাম কবুলে পাব পায় ।

অদেশে বাজাট পাব, দোশ দিয়া ববে যায়,
ফবমান ফবমাহ তায ॥

তাহাব পূব, ভবানন্দ দিল্লীতে বন্দী হওয়াতে তাঁহাব অন্তচবদয় খেদ
কবিত্তেছে,—

হেদে বামুনেব ছেলে, আশু পাছু নাহি চলে,

দিল্লী আইল বাজাই কবিত্তে ।

দুধে ভাতে ভাল ছিল, হেন বুদ্ধি কেটা দিল,

পাতশার দেয়ানে আসিতে ।

মানসিংহ সঙ্গ পেয়ে, রাজা হৈতে এল ধৈর্যে ;

এখন সে মানসিংহ কই ? •

গাজাখোব বজপুত, আফিস্তেতে মজবুত,

ব্রহ্মহত্যা কবিলেক অই ॥

তাহাব পব, ভবানন্দকে দেবীপুত্র জানিয়া পাতশা বিনয় কবিয়া বলি-
তেছেন;—

জাহাঁগীর বহে শুন বামুণ ঠাকুর ।

না জানি কবিতু দোষ, বোঝ কব দূব ॥

ইহাতে দেখা গেল, দ্বিতীশবংশাবলিয যে সকল স্থলে, ভবানন্দের
রাজবংশে উৎপত্তির কথা আছে সে সকল স্থলে ভাবতচন্দ্র সেকপ কোন
আত্মাস ত দেনই নাই ববং ভবানন্দ যে একজন সামান্য ব্রাহ্মণ মাত্র
তাহাই বিশেষ কবিয়া বলিয়াছেন ।

তাহাব পব অন্নদামঙ্গলে ভবানন্দের পিতৃ পবিচয় স্থলে—ভাবতচন্দ্র
বলিতেছেন;—

ধন্য ধন্য পবগণা বাগুয়ান নাম ।

গাঙ্গিনীর পূর্বকলে আন্দুলিয়া গ্রাম ॥

●

*

*

তাহে রাম সমদ্যাব নাম একজন ।

শ্রোত্রিয় কেশবী গাঁই বাটীয় ব্রাহ্মণ ॥

সীতাঠাকুরাণী নামে তাঁহার গৃহিণী ।

ঐ কয় পংক্তি পাঠ কবিলেই বুঝা যায়, যে বাম সমাদ্যারের যে রাজ-
কুমার বলিয়া কোন পবিচয় ছিল, তাহা ভাবতচন্দ্র জানিতেন না বা
মানিতেন না; শাদা সিধা একজন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের পবিচয় দিয়াছেন
মাত্র ।

শেষের উদ্ধৃত সংস্কৃত অংশে দেখুন, তাহাতে মজুমদারকে বারবার কাশীনাথ স্তত বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু মূল পুস্তকে মজুমদার কাশীনাথের পৌত্র, এ গোল স্বয়ং গ্রহণকাবই কবিলেন? না জাহাঙ্গীর শাহ করিলেন? আসল কথা ভবানন্দ মজুমদার হইতে প্রকৃত ঐতিহাস পাওয়া যায়, তাঁহার ফরমানও বাজ সবকাবে আছে—তাহার পশ্চাতে দৃষ্টি করিলেই গোল, —মহাগোল এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই তাৎতল্ল ঐ ভাণে নীরব; কেবল নীরব নহে, এই বংশে ভবানন্দের যে প্রথম বাজালাভ হইল, খোদ ভবানন্দের কথায়, তাহার অনুচরদের কথায়, মানসিংহের কথায়, জাহাঙ্গীরের কথায় এবং নিজ কথায় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন । আমরা বায় শুণাকরের; পছাই নিবাপদ মনে কবি ।

ভবানন্দ মজুমদার মহাবাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের অতিবুদ্ধ পিতামহের পিতা—সপ্তম পুরুষ । ভবানন্দের সময় খৃষ্টাব্দ ১৬০৫ হইতে ১৬২৫ । ভবানন্দের তিন পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপাল; ভবানন্দের পর কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত কে কে রাজা অন্নপূর্ণা ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা গাইতেছে,—

খৃষ্টাব্দ	অন্নদা কখন তবে ভবিষ্যত কই ।
১৬২৫	মোব প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই ॥
	সমাদবে মোব কাঁপি বাধিবেক এই ।
	যাব স্থানে কাঁপি রবে বাজা হবে সেই ॥
	গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধব ।
১৬৩২	বাঘব হইবে নাম বাঘব-সোসব ॥
	দেগাঁয়ে আছিল বাজা দেপাল কুমাব ।
	পবন পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসাব ॥
	আমাব কপটে তাব হয়েছে নিধন ।
	বাঘবেবে দিব আমি তাব বাজাধন ॥
(কৃষ্ণনগর)	গ্রাম দীঘী নগর সে কবিবে পত্তন ।
(দীঘনগর)	দীঘী কাট কবিবেক শঙ্কর স্থাপন ॥
১৬৭৬	তাব পুত্র হইবেক বাজা কদ্রবায় ।
১৬৮৩	বাড়িবেক অধিকার আমার নয়ায় ॥
	গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে ।

- পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে ঘাইবে ॥
 তিন পুত্র কন্দেব হইবে নিকপম ।
 রামচন্দ্র বড় বাম জীবন মধ্যম ॥
- ১৬৯৪ বাম কৃষ্ণ ছোট তাব বড় ব্যবহার ।
 বামচন্দ্র নিধান বাড়াই হবে তাব ॥
 জি নবেক সপ্তসিংহ আদি রাজা বাজি ।
 সোমসাগ পবি নাম হবে সোমসাজী
 এট কাপি তেলন ববিবে অহঙ্কারে ।
 সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে ॥
 নিধন ববিব তাবে সববাবে লয়ে ।
- ১৭০৪ বাচ্য দিব বামজীবনেবে তুষ্টি হবে ॥
 অবি বাবে তাব ঘরে থাকিব মনুন্দে ।
 বাজাট বরিষ বামজীবন আনন্দে ॥
 তিন পুত্র হবে তাব প্রথম ভাগ্যাব ।
 রাজা বাম, ২য় বাম, বদুবাম বাব ॥
 ভূমি দান দয়া দপ রাজধর্ম্ম বদে ।
- ১৭১৫ যুবাব খ্যাত হবে ধন্য নগলে ॥
- ১৭২৮ তাব পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান ।
 বাশাতে কবিবে জ্ঞান বাপীর সোপান ॥
 বিগ্রহ ব্রহ্মণ্য দেবমূর্ত্ত প্রকাশিয়া ।
 নিব স কনিবে শিব নিবাস কবিয়া ॥
 আমাৰ প্রতিমা পূজা প্রকাশ তাহাতে ।
- ১৭৩২ কত বব তাব বশ প্রকাশ ইহাতে ॥

বাস্তবিক মহাবাজেজ্জ কৃষ্ণচন্দ্র নজে যেমন গুণবান্ তেমনই বিলক্ষণ
 গুণ-গ্রাহক রাজা ছিলেন ।

নবজীবন ।

৪র্থ ভাগ ।

মাঘ ১২৯৪ ।

৭ম সংখ্যা ।

ভালবাসাবাসি ।

(বাসন্তী গীতি)

প্রকৃতি গো--প্রকৃতি গো একি বীতি তোর ।

যথা যাই এক চাঁদ,

এক ঢালা, এক বাঁধ,

একই বাসন্তি তানে, বিশ্ব খানি ভোর,

অণু হ'নে হিমাচল,

শিশির, সাগর জল,

একই নিয়মে সব কবিতে প্রয়াণ,

একটু ফুলের কে লে

“রজ-বাজ” হেলে দোলে !

কে বুঝে এ লীলা খেলা—নিগূঢ় সজ্জান ।

কা'র কাছে বল্ বল্,

শিখিলি এ প্রেম ছল,

কা'র গুণে, নভে ভবে, করে দিলি মিল ।

কেন বা তপন করে,

কমলের হাসি বরে,

কোমলে কঠিনে কেন লেগে গেল খিল্ !

চকোর চাঁদের লাগি
 সাবা নিশি থাকে জাগি ।
 কে দিল প্রেমের রাগ পাখীর পরাণে !
 ক্ষুদ্রপ্রাণে ববি কব
 ধবিয়ে, শিশির থর
 হরষে মরিয়া যায় প্রেম-আলাপনে ।
 বুঝি না এ কোন খেলা ?
 কেমন প্রেমের মেলা,
 ছোট বড় এক ছাঁদে বুক বেঁধে যায়,
 চাতক “দে জল” যাচে,
 মেঘেতে বিজলি নাচে,
 বসন্ত আসিরে বলি, পিক্‌ আই গায় ।
 মাধবী মোহাগে হায় ?
 সহকারে নিশে যায়
 পতঙ্গ আপনা ভুলি, অনলেতে ধায়,—
 প্রেমের এ লীলা খেলা, বুঝা বড় দায় !
 নিকর ররিয়ে শেষে,
 তটিনী কোণে মেশে,
 আবার তটিনী ধায় সাগরের পানে,
 সকলি আপনা ভুলি,
 প্রাণে প্রাণে কোলাকুলি,
 বেহুস—বিভোর সবে, পরস্পর টানে ।
 কুল তোর একি ছাঁদ,
 নভে ভবে দিলি বাঁধ,
 কঠিন গাছেবে তুই, দিস্‌ চাক আলা,
 হেবে তোর বম কায়
 পাষণ (ও) গলিষা যায়,
 ভাবে শেষে—“মানে মানে কেন হুই কালা ?”
 পবিত্রাপ হুদে উঠে,
 অমনি সলিল ছুটে,

অভিমানী পাবাণের বুকখানি চিরি ;

ওবে ফুল কিবা ভোর

প্রেমের কোমল ডোর !

বাধিয়াছ এ সংসার, সেই ডোবে ঘিবি ।

যেখানে ফুটিস্ তুই

কিবা মরু—কিবা ভূঁই,

স্বরগেব শশী ভাবা, দেয় সেথা চুম্,

মায়ুষ, আকুল প্রাণে,

হোবে বে হৃদয় টানেন,

বুকে কবি, তুখ ভলি স্তখে যায় ঘুম্ ।

প্রকৃতি গো, জননী গো,

অগতের জুডনী গো—

এই ভবা তোর, লইল তুইবি কোল্,

ফেলো না শিশুবে ভূমে,

তুলে লও চূমে চূমে,

দাও দাসে, জননী গো মৃদ মৃদ দোল !

প্রকৃতি গো তোব ধাবা,

দেখে শু'ন দিশে হাবা !

আদি নাই—অন্ত নাই,—ধীবা স্রোতস্বতী,

মহান্ তুহার তান্,

মহান্ তুটাব গান্,

প্রেমেব পাখাব লীলা স্তন্দরে মত্তী ।

সাধে কি “বিবর্ত—বাদ” ।—

বিজ্ঞানের অবদান ।

অবাক্ জ্ঞানের বণা, প্রকৃতি ছটায় ।

ধন্য ধন্য জননী গো,

কৈলাশেব কামিনী গো !

প্রেম প্রবাহিণী তোর চরণে লুটায় ।

স্বর্গ মন্ডাকিনী-ধাব

সন্ধ্যার-কুম্ব হার,

রক্ত চন্দ্রমা রশ্মি, পুত পরিমল,
 প্রেম বিনে সকলিত গবল—গরল ।
 প্রেমের কুহুম তুলে,
 যেই জন সেট ফুল,
 পূজ নাই একদিন সোনার পুতুল,
 ভালবাসা—ভালবাসা,
 ভাবব ভাসা, আশা—
 বাস্তব নাই যেই জন, সেই রে বাতুল,
 শরীর মাটিব দেহ,
 মিছাব অসাব গের,
 বেথে লাগে ছুটাছুটি পোড়া অতিমান,
 প্রকৃতিব দেখ খেলা,
 মাহুষে মাহুষে মেলা,
 একের লাগিয়ে কাদে, অপব পরাণ ।
 দুটি প্রাণ একাকার,
 নদ নদী একবার,
 দুটি ফুল এক বোটে, দুলিবে হুহুল,
 একই দোহাব তান,
 একই দোহাব পান
 একই বাতাসভরে দুগুনা আকুল ;
 এক ভালবাসা বাসি,
 এক নান্না, এক হাসি,
 একই দোলাব দোল একই বন্ধার,
 মিশে যায় লতা গাছ,
 পাতায় পাতায় নাচ,
 মূলে জড়া জড়ি—নাহি ছাড়া ছাড়ি আব,
 স্বপ্নেব সুখা বাশি,
 মরতে পড়েছে আসি,
 তাই সে কুহুম হাসে, মাতারে কানন ;—
 যাব না উহার কাছে,

স্বাস লাগি গলে পাহে ।
 স্বরগের বালা ওট, নিখুঁত্‌ মানম ;
 না— উহাবে হৃদয়ে ধবে,
 শিখে নিব ভাল করে,
 কেন নিতি ফুটে বনে, ছড়াইয়া হাসি,
 শিখাবে ও ভালবাসা,
 প্রাণে দিবে প্রেম আশা,
 গাইব বাসন্তীগীতি, ভাল বাসা বাসি ॥

পাতঞ্জল যোগসূত্রম্ ।

৫ ।

তৎপরং পুরুষখ্যাতে গুণ-বৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ।

পদচ্ছেদঃ ।—তৎ-পরং, পুরুষখ্যাতেঃ, গুণ-বৈতৃষ্ণ্যম্ ।

পদার্থঃ ।—তৎপরং তন্মাৎ (পূর্বোক্তাৎ বৈবাগ্যাৎ) পরং উৎকৃষ্টং
 অথবা তৎ বৈরাগ্যাৎ, পরং উৎকৃষ্টং, পুরুষখ্যাতেঃ পুরুষঃ, আত্মা, তস্য খ্যাতিঃ
 জ্ঞানং তন্মাৎ আত্মসাক্ষাৎকাবাক্তোঃ, গুণ বৈতৃষ্ণ্যম্ গুণেভ্যঃ, গুণেষু
 গুণানাং বা বৈতৃষ্ণ্যম্ তৃষ্ণাবিবহঃ । গুণাঃ সদ্ধাদয়ঃ ।

অন্বয়ঃ ।—পুরুষখ্যাতে গুণ বৈতৃষ্ণ্যম্ তৎ পরম্, তৎ, পরমিতি বা ।

ভাবার্থঃ ।—বৈবাগ্যং দ্বিবিধং, একং বিষয়-বৈবাগ্যম্ । অন্যচ্চ গুণ
 বৈবাগ্যম্ । তত্র প্রথমং ভাবং পূর্নশ্চিন্ সূত্রে নিরূপিতং অত্রাস্ত্যং গুণ
 বৈবাগ্যং নিরূপ্যতে । পুরুষখ্যাতেঃ আত্মসাক্ষাৎকাবাৎ, বিষয়-দোষদর্শিনঃ
 জনস্য পুরুষদর্শনাভ্যাসাদিতার্থঃ গুণেভ্যঃ কার্য্য-সহিতেভ্যঃ সদ্ধাদিশুণেভ্যঃ
 যৎ বৈতৃষ্ণ্যং নিস্পৃহত্বং, বিরক্ততেতি বাৎ তদপি বৈবাগ্যম্, তচ্চ তৎপরম্

পূৰ্ণস্বাভূত্বম্, অন্য তু তদিত্তি বৈবাণ্যম্ পৰামৃশ্যতে তেষাং মতে পুৰুষ-
খ্যাতে-গুণ বৈতৃষ্ণ্যং তং (বৈবাণ্যম্) তচ্চ পৰমিতাশ্রয়ঃ । পুরুষপদমত্ৰ-
বুদ্ধেব পুাপলক্ষকমিত্তি বিজ্ঞান-ভিক্তুস্তথা হি তন্মতে পুরুষখ্যাতে-বিত্যস্য
আত্মবশাহন্যতব-সাক্ষাৎকাব্যভাষাদিত্যর্থঃ আত্মদ্বয়ং বুদ্ধি পুরুষদ্বয়ং । শুদ্ধং
চিত্তং বুদ্ধি বচিতং যদা যনি লীয়তে তদগুণ বৈতৃষ্ণ্যমৃকষ্টং বৈবাণ্য-মিত্যর্থঃ ।

অনুবাদঃ ।—আত্মসাক্ষাৎকাব্য-নিবন্ধন সত্বাদি গুণ ও তাহাদেব কার্য্য
হইতে চিত্তেব যে বিবক্তি,—তাহা ও বৈবাণ্য, উহা পূৰ্ণবৈবাণ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।

সমালোচন । এই সূত্রে পৰ শব্দেব ব্যবহাৰ হওয়ার আশ্রয় এক প্রকাৰ
জানিতে পাৰিতেছি যে, বৈবাণ্য দুই প্রকাৰ (১) পব, (২) দ্বিতীয় অপব ।
প্রধান এবং অপ্রধান । যদি বল লোকে প্রধানেব বিষয় অগ্রে বলিয়া তাহাব
পব অপ্রধানেব কথা বলিয়া থাকে, এ স্থলে সেই লৌকিক বীতিব পবিহার
করিয়া অগ্রে অপ্রধান এবং পবে প্রধানেব কথা বলিলেন কেন? ইহার
উত্তব এই যে দুই প্রকাৰ বৈবাণ্যেব মধ্যে আবাব পূৰ্ণাপনীভাব আছে ।
একটি অগ্রে না হইলে আব একটি উৎপন্ন হয় না । প্রথমে অপব বৈবাণ্যেব
উৎপত্তি হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে পব বৈবাণ্যেব অধিকাবই হয় না ।
মণিপ্রভা নামক বুদ্ধিকাৰ স্পষ্টই বলিয়াছেন “ পূৰ্ণ বৈবাণ্যং পব বৈবাণ্য-
হেতুঃ । ” পূৰ্ণোক্ত বৈবাণ্য পব বৈবাণ্যেব প্রতি বাবণ । এই নিমিত্তই
প্রথমে অপব বৈবাণ্যেব নির্দেশ কবিয়াছেন । ভাষাকার বলেন, পবে হয়
বলিয়া উহাব নাম পব বৈবাণ্য ।

পুরুষখ্যাতি নিবন্ধন (গুণেব উপদেশ ও শাস্ত্র প্রমাণে আত্মাব স্বরূপ
বিজ্ঞানেব পর) যে ‘ গুণ-বৈতৃষ্ণ্য ’ ইহার অক্ষবাস্ত্ববাদ, গুণে নিস্পৃহা বা
গুণেব উপব বীতবাগ হওয়া, গুণ এবং বৈতৃষ্ণ্য এই দুইটি কথায় ৭মী তৎ
পুরুষ বা ৫মী তৎপুরুষ সমাস কবিয়া ইহা নিস্পন্ন হইয়াছে । গুণ, পূৰ্ণেই
বশা হইয়াছে, প্রধানত তিনটি, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ । এই প্রধান গুণ-
ত্বেব পবস্পৰ ব্যামিশ্রণে আবাব নানাবিধ জ্ঞানাদি পৌকষ গুণ উৎপন্ন
হয় । যখন চিত্ত সেই সকল গুণ হইতে বিবক্ত হয়, তাহাদিগেব উপর আর
স্পৃহা থাকে না, অথবা তাহাদেব অধীন ভাব পরিত্যাগ কবিয়া অবিকৃত
ভাবে অবস্থান কবে, চিত্তেব সেই অবস্থার নাম ‘ গুণ বৈতৃষ্ণ্য ’ । আত্মার
স্বরূপ ঠিক ঠিক জানিতে পারিলে চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনেব মধ্যে
কোন গুণেব দ্বারাই পরিচালিত হয় না, তখন উহা সম্পূর্ণ বিত্ত এবং

নিরীকাত নিরুদ্দেশ প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে ধাবণ হবে। এই সূত্রের ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

“দৃষ্টান্তশ্রবিক বিষয় দোষদর্শী বিবক্তঃ পুরুষ দর্শনাভ্যাসা তুচ্ছবুদ্ধি-প্রবি-
বেকাপ্যায়িত বুদ্ধি গুণেভ্যাব্যাক্তাব্যাক্ত ধর্মবেভ্যোবিরক্ত ইতি তৎস্বয়ং
বৈবাগ্যম্ । তত্র যতন্তবং জ্ঞান প্রসাদ-মাত্রঃ যস্যোদয়ে প্রত্নাদিতথ্যাত্তিবৎ
মন্যতে প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং, ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্লেশাঃ, চিরঃ শ্লিষ্ট-পর্যোভ-
সংক্রমো, যসা—বিচ্ছেদাং জনিতা ম্রিয়তে, মৃদা চ জায়ত ইতি জ্ঞানস্যৈব
পবাকার্থা বৈবাগ্যম্ ।”

দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক এই উভয় বিন বিষয়েব দোষ মনুষ্য দেখিয়া
তাহাতে বিরক্ত হয়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহাব পব আশ্রয় স্বরূপ দর্শন
ও বাবস্থাব আশ্রয়ত্ব অন্তর্শীলন কবত আশ্রয় বিবক্ত (নির্মল) ও অপরিণামী
এইরূপ বিবেক দ্বাবা বুদ্ধি আপ্যায়িত (পবিত্র) হইলে সন্দ্বাদিগুণ ও তাহা-
দের ব্যাক্ত ও অব্যাক্ত (স্থল স্থল) কার্য্য-বলাপেব উপব গতস্পৃহ হয়, অর্থাৎ
কোনরূপ প্রাকৃতিক কার্য্যে আব তাহাব অসক্তি থাকে না। তাহাশ অসক্তি-
শূন্যতার নামই গুণ-বৈতৃষ্ণ। অতএব দুই প্রকার বৈবাগ্য (প্রথম এবং
পব,) তাহাব মধ্যে পব (দ্বিতীয় বা উত্তর কাল জাত) বৈবাগ্য জ্ঞানের
প্রসাদ মাত্র, জ্ঞানেব সম্পূর্ণ ওজ্জ্বলা স্বরূপ। ভাষ্যকার নিম্নেই জ্ঞান-প্রসাদ
শব্দেব জ্ঞানেব পবাকার্থাকপ অর্থ কবিয়াছেন, অর্থাৎ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত জ্ঞান—
তাহাব পর আব কোন বস্তু জানিতে বাকী বহিল বলিয়া একটা স্পৃহা থাকে
না, জ্ঞান ঐ স্থানেই চবম সীমা প্রাপ্ত হয়। যাহাব উদয় হইলে প্রত্নাদিত-
থ্যাত্ত অর্থাৎ আশ্রয় তত্ত্বদর্শী যোগী মনে মনে বিবেচনা কবেন, যাহা পাই-
বার তাহা পাইয়াছি, আব আমাব প্রাপ্তবা কিছুই নাই, যে সকল ক্লেশ দূষ
কবিবার ইচ্ছা ছিল, তাহাবা দূষ হইল, এবং যন্নিবন্ধন জন্ম মরণ ধাবা অবি-
রত প্রবাহিত হইতে ছিল, সেই শ্লিষ্ট পর (স্থল্যাব্যাক্ত) ভব সংক্রম (সংসারে
যাতায়াত) নিবৃত্ত হইল; এই বৈবাগ্য আব কিছুই নহে, জ্ঞানেরই পবা-
কার্থা অর্থাৎ চরম সীমাকট জ্ঞানেবই স্বরূপ।

কেহ আশঙ্কা কবিয়াছিল, এও ত বড় মজাব কথা, মহর্ষি পতঞ্জলি সূত্রে
লিখিলেন “গুণ বৈতৃষ্ণ” গুণেতে তৃষ্ণার অভাব বা নিস্পৃহতা, ভাষ্যকার
তাহার ব্যাখ্যা করিলেন, উহা আব কিছুই নয়, চবম সীমাকট জ্ঞানেরই
স্বরূপ। ইহাদেব পরম্পরেব সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পাবে? বার্ত্তিককার

বিজ্ঞানভিক্স ইহার উত্তর এইরূপ কবিরাজেন “ ইতি চেৎ ন শব্দভেদেহ-
প্যাথাভেদাৎ নহ্যভাবোহস্মত্তেহতিবিক্কাহন্তি, অধিকরণসাবস্থা বিশেষশ্চৈবা-
ভাবত্বাৎ, তথাচ চিত্তসৌব তাদৃশী জ্ঞানবৎসৈব ত্ব্যাবিবহ ইতি অপিচ ভবতু
বৈতৃক্ষ্যমেব বৈরাগ্যং তথ পি জ্ঞান প্রসাদেনৈব বৈতৃক্ষ্যলাভো বিশেষোহ
নুমায়ত ইতি লিঙ্গলিঙ্গিনো বভেদাপচাবাৎ সূত্র ভাষ্যায়ানবিরোধঃ” । ইতি ।

একথা বলিও না, কাবণ তুমি চুই দুই বকম শব্দ দেখিয়া ভয় পাইতেছ
মাত্র, একটু ভলাইয়া বুঝিলেই বেশ জানিতে পাবিবে যে উহাদের একই
তাৎপর্য্য । দেখ আমাদের মতে অভাব নাম একটা অতিবিক্ত পদার্থ নাই,
আমবা বস্তুর অবস্থা বিশেষকেই অভাব বলিয়া নির্দেশ করি, অতএব চিত্তের
উক্তরূপ জ্ঞানাবস্থাকেই আমবা তৃক্ষ্য বিবহ বলিব । যদি অভাব একটা
স্বতন্ত্র পদার্থ হয়, তাহা হইলেও তুমি ইহা অবশ্য স্বীকার কবিবে যে জ্ঞানের
প্রসাদ চিত্তের তাদৃশ বৈতৃক্ষ্য বিশেষের অনুমাপক । তাহা যদি হয়, তবে
প্রাচীন একটা নিয়ম আছে “ অনুমাপক ও অনুমেয় এই উভয় অভিন্নরূপে
ব্যবস্কৃত হইতে পারে, অতএব সেই নিয়মামুসারে গুণ বৈতৃক্ষ্যের অনুমাপক
জ্ঞান প্রসাদের গুণ বৈতৃক্ষ্য অর্থ, এইরূপ আত্মা প্রসাদ যাহা চিত্তের গুণ
বৈতৃক্ষ্যের সহিত সম্বন্ধ, সেইরূপ জ্ঞান প্রসাদ হইলে চিত্তের গুণ বৈতৃক্ষ্য
অবশ্যই উৎপন্ন হয়, কখনই ব্যভিচার ঘটে না ।

পূর্বসূত্রে যে প্রকার বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ বৈরাগ্য
উৎপন্ন হইলেও মনুষ্য যোগী হইতে পারে না । আমবা পূর্বেই বলিয়াছি
যোগ শব্দের অর্থ চিত্তবৃত্তির নিবোধ । নিখিল চিত্ত বৃত্তির প্রশ্রাববোধ
বা কার্য্য নিবৃত্তি । এই চিত্তবৃত্তি অসংখ্য । সমুদ্র যেমন সর্পিদা তবঙ্গ ভঞ্জে
টলটলায়মান, মনুষ্যের চিত্ত, বৃত্তি ভবে ঠিক সেইরূপ । সমুদ্রের চেউ-এরমত
ইহাতে প্রতিফল প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য বৃত্তি নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে,
ধলিতেছে, আবাব আব একদল বৃত্তিকে অবকাশ দিয়া (তাহাদের শব্দ মুক্ত
করিয়া) আপনি আপনিই লীন হইতেছে । এই অসংখ্য বৃত্তির মধ্যে পূর্বে
যে বৈরাগ্যের উক্তি হইয়াছে তাহা দ্বাবা কতিপয় মাত্রের নিরোধ সম্ভাবনা,
কাবণ সে বৈরাগ্য বিষয় বিতৃক্ষ্য, বিষয়ে নিম্পৃহতা বা বীতরাগ হওয়া । বিষয়
শব্দের অর্থ জ্ঞী, অন্ন, পানীয় অথবা এক কথায় বলিতে হইলে, সমুদয় ভোগ্য
জাত এবং ঐশ্বর্য্য — প্রভূতা, সামর্থ্য্য ও সম্পৎ ; তাহা হইলেই হইল, অভিলষ-
ণীয় বস্তুর নাম বিষয় ; যাহা লোকে চায় তাহার নাম বিষয় । আয়াস

চাওয়াব প্রধান উদ্দেশ্য স্মৃতি হইলেও চাওয়াটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্মৃতির উপ-
করণ সামগ্রীই ঘটিয়া থাকে । কারণ স্মৃতি মনের একটা বৃত্তিমাত্র, অন্যের
সদৃশ বাস্তবিত্ত স্মৃতি উৎপন্ন হইতে পারে না, সাধারণ বাহ্যবস্তু সম্বন্ধেই উহা
উৎপন্ন হয়, এত নিম্ন ও স্বাভাবিক বস্তুদিগকেই আশ্রয় চাই । সাধা-
রণত স্মৃতির উৎপাদক বস্তুদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা বাইতে পারে ।
ভাল পাওয়া ভাল পূৰ্ব প্রভৃতি, ভোগ্য বস্তুসকল, স্থিতি ও ঐ সবল ভোগ্য-
বস্তু সম্পাদক প্রভৃতি, সামগ্রী এবং সম্পন্ন । স্মৃতি বা একমাত্র স্মৃতি মুখ্য অভি-
প্রেত হইলেও সাধারণত চাওয়াটা দুই বর্ণের ঘটে, “ভায়া” দেখি, ধনঃ
দেখি, পুত্রঃ ভগবতি দেখি মে ।” ভোগ্য বস্তু ও ভোগ্য সম্পাদক প্রভৃতি
বিষয়ে ঐ দ্বিবিধ চাওয়া বস্তুট—বিষয় । বিরাগগুলি অব্যবস্থিত ইচ্ছা
ত্রিভেদে দ্বিবিধ ; ঐ সবল বিষয়ে বিরাগ জন্মাইলে আমাদের বাস
সেই প্রভৃতি বস্তুগুলি বৃত্তি নিবেদন হইতে পারে বটে, কিন্তু যাবদীয়
বৃত্তি নিবেদন হয় না ।

যদি বল, পুরুষের বৃত্তিমাত্রই স্বার্থসম্বন্ধে মূলক । যদি সেই মূলেব
উচ্ছেদ হয়, তবে শাখা পল্লব ফল ফুল ইত্যাদি সবলেই সেই সঙ্গে শুষ্ক হয়,
তাহাদেব নাশের নিমিত্ত আপাততঃ উপায় বিবর্তিত হয় না । যদি অংগ
বৈরাগ্য দ্বারা সংগ্রহ প্রভৃতি ছেদ সম্ভব হয় তবে পূৰ্ব বৈরাগ্য নিশ্চয়োজন ।

মোটামুট দেখিলে ঐক্য বিবেচনা হয় বটে, কিন্তু হৃদয় বিচলিত করিয়া
দোহনে বিবর্তিত পাবিবে যে কাম ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, অহং, ঘেহ, মদ
মাৎসর্য ইত্যাদি বৃত্তির লোপ হইলেও, মানুষ নাটক মানুষের মত নিশ্চেষ্ট
জড়ভাব প্রাপ্ত হইলেও চিত্ত একেবারে বৃত্তি শূন্য হয় না, কারণ বিষয় বিতৃ-
ষ্ণার সহিত জ্ঞান শক্তির লোপ হয় না । আমরা ইচ্ছা নাট, নিশ্চেষ্ট হইয়া
বসিয়া আছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা চক্ষুর দর্শন শক্তির লোপ হয়
নাই, আমরা সমুখ যাহা আসিতেছে তাহা হইতে পড়িতেছে, আমি তাহা-
দিগকে যে ভাবেই গ্রহণ করি, চক্ষু দ্বারা অবশ্যই তাহাদিগকে সেই ভাবে
গ্রহণ করিতেছি । এইরূপ বিষয় অমৃতের স্বাদ আমরা বিবর্তিত তুল্য হই-
লেও তাহাদের একটি স্বাদ অবশ্যই অনুভব হইবে । এইরূপ কাণে শ্রবণ
করি, আবৃত্তি দ্বারা স্পর্শকর । এক্ষণে দেখ এতগুলি কাজ যখন নির্বাহ
হয় তখন চিত্ত বৃত্তিশূন্য হয় ইহা আর কিরূপে বলা যায় ? এখানে এইটুকু
স্মরণ কথা বুঝিতে পারিলেই সকল বিষয় ধোলাসা হইবে । আমরা পূর্বেই

বলিয়াছি বৃত্তি শব্দ চিত্তের অবস্থাস্তর বা পরিণাম বুঝা যায় ঐ চিত্তের পরিণাম গুণের কোন বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ঘটে, তেমনি চিত্তের উপাদান ভূত সম্বন্ধেও তমঃ এই গুণত্রয়েব তাবতম্য অনুসারেও উৎপন্ন হয়। অতএব আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলিকে ছই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলি বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান্য, আর কতকগুলি গুণ জ্ঞান্য ! পূর্বোক্ত প্রথম বৈবাগ্য দ্বারা বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাত কতকগুলি বৃত্তির লোপ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু গুণোৎপন্ন বৃত্তির লোপ হা না। যতদিন ত্রিগুণাত্মক মোহ বা অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন “আমাব” “আমি” ইত্যাদি বোধ থাকিবে ততদিন ত্রিগুণোৎপন্ন বৃত্তির অবিকার থাকিবে, গুণের উচ্ছেদ না হইলে আর উহাদের লোপ হইবে না। অপিচ—

যতক্ষণ চিত্তের একটি মাত্র বৃত্তি অবস্থান করিবে ততক্ষণ অবধি চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির বলিয়া নির্দেশ করিতে পার না। অতএব যদি সেই অবস্থায় আর কোন বৃত্তির স্বীকার নাই কর, কিন্তু তুমি ইহা অবশ্য স্বীকার করিবে যে লোকের ইচ্ছা গোপের সহিত আত্মজ্ঞানের লোপ হয় না, নিশ্চেষ্ট বা সচেষ্ট, ব্যাপক বা সঙ্কীর্ণ যে ভাবেই থাকি “আমি” এইরূপ একটা বোধ অবশ্যই থাকিবে, তাহা হইলেই চিত্ত সনৃত্তিক হইল। যতক্ষণ অবধি আমি বলিয়া বোধ থাকিবে ততক্ষণ অবধি চিত্ত সনৃত্তিক। আমি এই বোধ মোহ বা অবিদ্যামূলক। সেই মোহ বা অবিদ্যা আবার সহ, বজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। কাহেই চিত্তকে একেবারে বৃত্তি শূন্য করিতে হইলে অবিন্যাস বা মোহের হাত হইতে আপনাকে মোচন করা অবশ্যক, আমার আশ্রয়কে বিস্মরণ করিতে যত্নবান হওয়া বিধেয়। আমাব আশ্রয়ের উপর বাতৃত্ব হইতে চেষ্টা করাই প্রধান কাণ্ড। উহা বিকপে সাধিত হয়, তাহা মণিপ্রভা নামক বৃত্তিতে লিখিত হইয়াছে।

বিষয় দোষ দর্শন নিবন্ধন চিত্তের বশীকার সংজ্ঞা নামক প্রথম বৈবাগ্য উৎপন্ন হয়, তাত্কাব পব শুক্লমুখ এবং শ্যামের বচন হইতে পুরুষের (জীবা-আব) স্বরূপ জ্ঞানিতে পারে; জানিতে পারে আত্মা বিতৃষ্ণ এবং অপবিণামী; তখন বাহ্য বিষয় পরিহার করিয়া সেহ আত্মদর্শনে আশ্রয় জন্মায়, আত্মদর্শন করিবার সময় বর্জ্যমেঘ নামে চিত্তার উদয় হয়, তখন চিত্ত হইতে বজঃ এবং তমোগুণরূপ মল অপগত হয়, খাটী সত্ত্বগুণ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। চিত্ত অতিশয় প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। সেই সম্পূর্ণ নির্মল চিত্তে স্বভাবত বিতৃষ্ণ

চৈতন্য-রূপী পুরুষ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় চিত্ত ও পুরুষ এক হইয়া যায়, আমাব আমি দুই হয়, গুণত্রয়ের বহন উভেদ হয়, চিত্ত বৃত্তি শূন্য হয়।

চিত্তে আয়্যার প্রতিবিম্ব হওয়াতে উহা জ্ঞান বটে, কিন্তু চরমদীয়া প্রাপ্ত জ্ঞান, ঐ জ্ঞানেব জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, কিছুবই পবিচ্ছেদ নাই। উহা আমার আমিত্ব দুই কবিয়া জড়ে ও চৈতন্যে প্রভেদ কাব্যছে। ত্রিগুণ মূলক আমি-ত্বেব মোহিনী শক্তির ছেদ হয় বলিয়া উহাকে গুণ বৈত্যা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। অতএব বৈবাগ্যবগকে যথাক্রমে বিষয় বৈবাগ্য এবং গুণ বৈবাগ্য বলিয়া অভিহিত করা হইতে পারে। যতদিন অবধি আব কিছু না থাক্ আমাব আমি দুইটুকু মাত্র থাকিবে, তত দিন এ চিত্ত সম্পূর্ণ স্থির নয়, চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির করিতে হইলে বিষয় বৈবাগ্যেব মত গুণ বৈবাগ্যেরও আবশ্যক।

বিলাতী জুয়াচুরি ।

ভুক্তভোগীর লেখা হইতে গৃহীত ।

লণ্ডনের বগষ্ট্রীতে আমাদের দোকান। অন্যান্য দোকান অপেক্ষা আমাদের দোকানে অনেক বহুমূল্য ও পছন্দসই হীরা জহরত থাকিত বলিয়া আমাদের দোকানে খুব পসার ও নামডাক ছিল, অনেক বড় বড় ধনী লর্ড আমাদের দোকান হইতে জড়াও গহনাপত্র ক্রয় করিত। এ স্থলে বলা উচিত আমি নিজ দোকানদার নাই, তবে আমি অনেক দিন এ দোকানে কাজ করায় আমার এ কাজে বহুদক্ষতা জন্মিয়াছে বলিয়া ও বহুদিন বিশ্বস্তভাবে কাজ করিতেছি বলিয়া এখানে এক প্রকা. আমি কঠোর মত হইয়া আছি। জহরতের দোকানে প্রায় চুরি জুয়াচুরি হয় বলিয়া আমাদের প্রদর্শনী গৃহে (show room) কিছু বেশা পাহাবাব আটা আটা, থাবিকারের প্রতি সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আমরা বেচা কেনা করিয়া থাকি, আব আমাদের বড়

কর্তার বিশেষ নিয়ম এই যে বিশেষ পৰিচিত না হইলে আমরা কাহাকেও ধাব কোন জিনিস বেচি না, বা কেহ কোন বাক্সের উপর টাকার বসাত দিলে বহুক্ষণ না সে টাকা ছাড়ি বহু ততক্ষণ বিক্রীত দ্রব্য আমবা ক্রেতাকে ছাড়ি দিই না। এক কথায় অন্যান্য দোকানদারদিগের অপেক্ষা আমরা বেশী নত ও হাবা।

সত্য সত্য এই সকল জুয়াচুরি বড় বড় জুড়ী গাড়ি কবিতা একপ জনকাল আগে বোকনে অসিদ্ধা পাবে যে ঠাণ্ডা ইহা দিগের প্রতি কাহাবও সম্বন্ধ হয় না ও সম্বন্ধ কবিত্তে সংসে হয় না। এছাড়া বিলাতে সমস্ত লোককে সকলে অধিক বিশ্বাস করে বণিক অনেকই প্রায় একজন জালোক মনে কবিতা লয়। এই যুবতীর বেগুনা অতি সনাত্ত বংশীয় লোকদিগের ন্যায়, কাহাব সাধা মনে করে যে ইহা বোকনে চুরি কবিত্তে অসিদ্ধাছে। কিন্তু এই সকল সুন্দরী বেগুনীরাহতা যুবতী এই সকল কার্যেব প্রধান অংশীদার, ইহাদের সাহায্যেই চুরাচে বেগু নিজ নিজ অভিপ্রায় সহজে বিনা বাধায় সম্পন্ন করে। জুয়াচুরি বোকান বাইবা এই জালোকদিগের সহিত এতদূর ভাবে কথাবর্তা করে যেন তিনি সম্প্রতি এই যুবতীর পানিগ্রহণ কবিত্তে ছেন, অথবা শীঘ্র তাহাকে বিবাহ কবিত্তে। কখন কখন কেবল জীলে কবিত্তে এ কাসা সম্পন্ন করে থাকে।

এইকপ ক্ষেত্রে ইহারা দোকানে প্রবেশ করিয়া এজিনিস ওজিনিস দেখিয়া কিছু পছন্দ না হইয়া, কিছু ক্রয় না কবিত্তা চলিয়া যায়, কিন্তু তাহাব পরেই প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই দোকান হইতে কেন একটা দামী অলঙ্কার এই মাত্র খোঁজা গবেছে ইহাদের এমন হস্ত সেট কেহ কেহ ইহা অথোকা ও নিপুণ ববদারী, তাহাবা দোকানে যাওয়া চুর না কবিত্তা নিজ গৃহে বসিয়া চুরি করে। ইহারা দোকানে আসিয়া জিনিস পছন্দ কবিত্তা দোকানদারকে কত ছোটল বা অপব কোন বাটব ঠিকানা বলিয়া দেয়, যে তাহার সেই ক্রীত জিনিস দোকানব কোন লোক আকত পাঠাইয়া দিলে তাহাব হস্তে মূল্য দিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। দোকানদার সেই ভকুমমতে নির্দিষ্ট সময়ে দোকানের কোন বর্মচাচী দ্বারা সেই জিনিস পাঠাইয়া দেয়, কিন্তু লোক সে ব্যক্তি বিত্ত হস্তে ও গুরু মুখে প্রত্যবৃত্ত হয়। এই সকল জুয়াচুরি ধরিবার নিমিত্ত সচরাচর দোকানদারেরা স্বাবদাবদিগের প্রতি দুই প্রকারে লক্ষ্য রাখিয়া থাকে।

প্রথম, তাহাদের হাতেব প্রতি, দ্বিতীয়, তাহাদের কথোপকথনের ভাষাব প্রতি । এই সকল চোব জুয়াচোরদিগকে প্রাণ ধরা পড়িয়া ভেলে যাউতে হয় ; সেখানে হাঙে করিয়া শ্রমজীবী কঠিন কাজ করিতে হয় বলিয়া ইহা-দিগেব হস্ততল হার বঠিন বর্কণ হইয়া পড়ে, কোন ভদ্রলোকের একপ হয় ন , ইহা দিগকে ধাববাব এএ এক উপায় । তৃতীয়, ইহাবা যত কেন ভদ্র-লোক সাজুক না, যত কেন ভদ্র ভাষায় কথা বহুক না, ইহাদের ভাষায়, বখাব প্রশ্নালোতে, গলাব স্বরে একপ এনটা বিরূত ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে যে তাহাতেই দোকানদারের ইহাদের উপর সন্দেহ বয়ে, স্বত্বাং তাহাবা সতর্ক হয় । কিন্তু অধিকাংশ চোব একপ গোশলী যে দোকানদারদিগের এই সকল সতর্কতাকে তাহাবা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না । একপে অন্যর নিজেব এথা ব- যাউক ।

একদিন নব-জীবনে আমি দোকানে আপন কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময় আমদের বহু বর্ন্ত এনে আমাব ঝাণ চুপ চুপ বয়েন্ “তুমি প্রদর্শনী ঘাবাগয়ে দুজন খবিদাব আনিয়াছে, তাদের পছন্দসই জিনিস-পত্র দেখাও, বিক্ৰ সাবান ; তাদের চাউনিতে আমার কেমন সন্দেহ বোব হচ্ছে ।” আজ্ঞামাত্র আমি তথায় যাইয়া দেখি একজন ভদ্রলোক একটি সুন্দর যুতীর সহিত জিনিসপত্র দেখিতেছেন । ভদ্রলোবটী দেখিতে বহু বৃশ ও কয়, অব তাহাব গলাব স্ববাকছু খাতিথে তে গোছ । ভদ্রলোকটিব সঙ্গে একটি নিশাস গ্রন্থাস ফেলিবাব যন্ত্র (respirator) রটি-য়াছে ; তাহার অবস্থা দেখি বোধ হইল যেন তাহার হাঁপানিকাশীর বাবাম আছে । সঙ্গের যুবতীটি দাঁষাঙ্গী, মুখেব উপরিভাগ নব বিবাহিতার ঘোনটা দ্বাবা আচ্ছাদিত, তাহাব আতে উজ্জল চক্ষু ও সুন্দর মুখটী দেখিয়া তাহাকে কেন সম্ভ্রান্ত ঘবের কনা বলিয়া বোধ হইল ; এক কথায় ইহাদি-গেব উপর আমার কোন সন্দেহ উপস্থত হইত না । ইহাবা দুইজনে এটা এটা দেখিয়া শেষ একটি হস্তে ও একটি গলাব অলঙ্কার দেখাইতে আমাকে আজ্ঞা কবয়, আমি একে একে অঙ্গ ও বহুলোব নান বিধ উক্ত দুই প্রকার অলঙ্কার দেখাইতে লাগিলাম । ভদ্রলোকটি দুই চাবিটি অলঙ্কার দেখিয়া আমাকে বলিলেন, “বেশী দামী জিনিসেব কোন প্রয়োজন নাই, তন্ন দাম অগত বেশ পরিষ্কার গড়নের জিনিস দেখাও ।” আমি তাহার আজ্ঞা অনুযায়ী পঞ্চাশ হইতে ৫০০০ টাকার জিনিস পর্যন্ত দেখাইতে লাগিলাম । অনেক

দেখাওনার পৰ ভদ্রলোকটি একষোড়া মাঝারি গোচ দায়ের অথচ বেশ পবিত্র কাৰ্য কৰা হাতেৰ গহনা নিয়ে বলিলেন, ‘এই ষোড়াটা আমার বেশ পছন্দ হচ্ছে, এর দাম কত হবে?’ আমি বলিলাম ‘৬০ গিনি।’ সঙ্গী স্ত্রীলোকটি এতক্ষণ চুপ কৰিষাছিল, তিনি এই কথা শুনিয়া একটু নাকতোলা গোছ কৰে বলেন, ‘হাঁ, বালা ছোড়াটা মন্দ নয় বটে, কিন্তু খুব যে ভাল তাও নয়।’ ভদ্রলোকটি জবাব দিলেন, ‘কেন, তুমিত বলচ বেশী দামী দৰকাৰ নাই। আব এতগুলোৰ মধ্যে এই ষোড়াটাই আমার বেশী পছন্দ হচ্ছে।’ স্ত্রীলোকটি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া গলাব গহনার প্রতি দৃষ্টিনিষ্কপ কৰিয়া বলিলেন, ‘বা, কি চমৎকার গড়ন, অতি সুন্দর দেখতে তা।’ আমি খবদাবের মুখে এই প্রশংসা শুনিয়া দোকানদারের দস্তবমত সেটিও তাঁহার হাতে তুলে দিলাম। বলা বাহুল্য, তাঁদের ভদ্রলোকেব ন্যায় ভাব দেখে আমার মনেহটা একপ্রকার দুঃ হয়ে ছিল, এছাড়া আমার মনিব যে সন্তোষ করে আমাকে এদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেটাও আমি একপ্রকার ভুলে গিয়েছিলাম। স্ত্রীলোকটি গলাব গহনাখানি একবার হাতে করে এদিক ওদিক নেড়েচেড়ে আবার প্রশংসা কৰে বলেন, ‘বা, দিব্য জিনিসটি, কি, চমৎকার। বড় সুন্দর কাজ কৰা, পছন্দমই জিনিস বটে।’ সঙ্গী ভদ্রলোকটি সজিনাব—এই ব্যবসায় প্রশংসাপ্রদানি শুনিয়া সহাস্যো জিজ্ঞাসা কৰিলেন, ‘এটাও নেবার ইচ্ছা হয়েচে নাকি?’ রমণী যেন উল্লসিত হয়ে অথচ লজ্জার খাঁতিৰে বলেন, ‘না না, তবে জিনিসটা ভাল তাই দেখছি।’ ভদ্রলোকটি যেন আৰো আপ্যায়িত হয়ে বলেন ‘তাব দোব কি? বেনাবেচাব দস্তবই এই; চক্ষে ভাল ঠেক্ৰপ নিতে হানি কি?’ এই কথার পৰ উত্তরের চাৰি চক্ষু একবার সম্মিলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে কাণে বাণে কি কথাও হইল। তাহার পৰ আমার জিজ্ঞাসা কৰায় আমি বলিলাম ৫০ গিনি। ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্য ভাবে যেন একটু থাকিয়া চোক দুটো বিস্তারিত কৰে আশ্চর্য্য ভাবে বলে উঠলেন, ‘উঃ ওই বস্তি জিনিসেব এত দর।’ বিস্ত জিনিসটি তাঁহার হাতেই নাড়াচাড়া হতে লাগল। আমি একটু বুঝিয়ে স্থজিয়ে বল্লম, ‘জিনিসটা ছোট হলেও ওতে যে মুক্তা কটা রয়েছে, ওরূপ মুক্তা সচরাচৰ পাওয়া যায় না।’ এই কথায় ভদ্রলোকটি একটু নিমরাঞ্জি হয়ে যেন অনিচ্ছা সবেও সেটি নিতে সন্তুষ্ট হলেন। সঙ্গিনী এইরূপ খরিদ কৰায় বড় আত্মনামিত হলেন, এবং আমি ভদ্রলোকটিকে জিনিসটি বুঝিয়ে স্থজিয়ে দিয়ে দিলুম

বলে আমার প্রতি একবার সুরুতজ্জ সহাস্য দৃষ্টিনিষ্কপ ববিলেন। কে একরূপ সুরন্দরী যুবতীর সুরুতজ্জ সহাস্য দৃষ্টিকে অগ্রাণ্য কবিত্তে পাবে? আমিও ঐবনীত ভাবে অভিবাদন কবিয়া তাঁহাব কুরুতজ্জ দৃষ্টিব সম্মান বক্ষা কবিলাম ও আমি মনে মনে তাঁহাব বুদ্ধিব বড় প্রশংসা কবিয়া বলিলাম, যে একরূপ বুদ্ধিমত্তী খবিদদার না হইলে কি আমাদের দোকান চলে? পুরুষ গুলো কেবল শস্তার দিকে যায়। এক্ষণে আমি তাঁদের বুদ্ধিবোশলে এতদূর মোহিত হইয়াছি ও তাঁহাদের প্রতি এতদূর আনাব বিশ্বাস অন্মেছে, যে দোকানের প্রতি আমার আব চক্ষু নাই।

বিলাতেব দস্তব ক্রেত'বা প্রায় সঙ্গে ক'ব'য়া টাকা আনে না, দোকানদার ক্রীত জিনিষ পাঠাইয়া দিয়া বাড়ি হইতে টাকা আদায় ববে। সেই রীতি অনুসারে আমি বলিলাম 'মহাশয়, আপনাদের এমন কোন ঠিকানায় পাঠাতে হবে?' সঙ্গী স্ত্রীলোকটি বালয়া উঠিলেন, 'আমরা সঙ্গে কবেই নিয়ে যাব, তোমাকে আব কষ্ট কর পাঠাতে হ'ব না।' আমি এই প্রত্যুত্তবে অপায়িত হ'য়ে দাম চাইলাম। ভদ্রলোকটি এই কথায় পকেট হইতে এক চেব বই বাতিব কবিয়া একটা ব্যাক্সেব নানে এক শত দশ গিনিব এক র'সদ লিখে দিলেন। চেব খানি হাতে গইয়া এইবাব আমাকে এবটু চক্ষু লজ্জা পারত্যাগ কয়ে বলতে হ'ল, 'মহাশয়, আমাদের দোকানেব বণ্যব নিয়ম আছে যে ব্যাক্স হতে যতক্ষণ না চেবের টাকা আদায় হয়, ততক্ষণ আমরা কোন জিনিষ খন্দেবকে ছেড় দিচ না?' এই সময় আনাব মনিবের সেই সতর্ক বাক্য মনে পড়িল, যদিও একজন ভদ্রলোককে এই প্রকাব কট কথা বলতে আমার একটু লজ্জাবোধ হইল, আমি মনে মনে একটু সঙ্কচিত হলেম, কিন্তু ভদ্রলোকটি আনাব এই প্রকাব সতর্কতা দেখে কিছুমাত্র বিবক্ক বা অনন্তস্ত না হয়ে বং সহাস্য মুখে বলিলেন 'বেশত বেশত, আপনাদের এইরূপ সাবধান হওয়াইত উচিত, বিশেষত আজ কাল যেক্রপ দিন কাল পড়েছে।' তাঁহার এই উদাবতায় আমি আবে লজ্জিত হলেম, এবং তাঁব প্রতি আনাব যে একটু সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছিল, সেটুকুও একেবারে গেল। কিন্তু সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটিব ভাবে একটু বিবক্তির চিহ্ন দেখা গেল। যাহাই হউক, ভদ্রলোকটি আপনাব নাম ও ঠিকানার কার্ড দিলে চলে গেলেন। অতঃপর আমাদের একজন লোককে সেই চেবের টাকার জন্য ব্যাক্স পাঠাইয়া আমি Show room এর যে যে জিনিষ খুলে তাঁদের

দেখিয়ে ছিলাম, সব মিলিয়ে দেখলাম ঠিক আছে, কোন গোল মাল হয় নি। এত সময় তাঁদের চেকের টাকা আদায় হয়ে এল, সুতরাং আর আমাদের সঙ্গেই কোণ কাঁচ বহিল না, বরং আমার অকারণে একজন ভদ্রলোকের প্রতি একপ সন্দেহ করা হয়েছিল, বলে মনে মনে আমি বড় লজ্জিত হলেম; এবং সেই ভদ্রলোকের নির্দিষ্ট ঠিকানায় তাঁর ক্রীত অলঙ্কার দুটি পাঠিয়ে দিলাম।

*

*

*

*

ইহাব পৰ একমাস সময় অতিত হইল। এদিন আমি নিয়মিত সময়ে Show room এ বসে আছি, এমন সময় সেই পূন্যাক্ত যুবতী পুনরায় একা আমাদের দোকানে এসে দেখা দিলেন। এবারও তাঁহার মুখ ঘোমটার অর্ধাচ্ছাদিত বটে, কিন্তু এবার আর সেই নব প্রস্তুতি গোলাপ সূদৃশ সুন্দর মুখশ্রী নাহি, এবার তাঁহার মুখখানি কিছু স্নান, বিমর্ষ, তাতে যেন অস্বস্তি ভাবে কোন মানসিক দুঃখের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথমেই হুচাব কথাই তাঁর স্বামীকে, সেই ভদ্র লোকটির কঠিন পীড়ার কথা উল্লেখ করে, তাঁর দোকানে একা আসবার ও বিমর্ষ ভাবের কারণ বলে সেই পূর্বেই গলাব গয়নাখানি বাব করে বসেন, এখানে ভেৎস যাওয়াতে মেঝেতেব জন্য এবার আমি এসেছি, তাঁর স্বামীকে কঠিন পীড়ার কথা শুনে আমি একটু দুঃখিত হলেম ও নৈতিক সাহসুহুতি প্রকাশ করে তাঁকে অস্থির হবে সেই অলঙ্কার খানি মেঝেতে স্বীকৃত হলেম। এবার এই সহিত কথা বার্তায় ইনি যে বার্তা একজন সম্ভ্রান্ত দবেব স্ত্রীশিক্ষিতা মহিলা সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ বাহল না। তাঁর স্বামীর পীড়ার পর্বত্রে বুঝতে পার্লেম, যে তিনিই আবেগের জন্য এখানে (লওনে) এনে বাস করেছেন। স্ত্রীলোকটি লওনের একজন খুব বড় নামজাদা ডাঙাবেব নাম করে বসেন, তিনিই এখন তাঁর স্বামীর চিকিৎসা করেন, কিন্তু এখানে এসে অবধি রোগ ক্রমাগত বাড়তে বলে তিনি তাঁকে শীঘ্র স্পেনে বায়ু পরিবর্তনের জন্য আদেশ করেছেন। ইহাব পৰ তিনি আমাদের দোকানের দুই চারি খানি সাজান গহনার প্রশংসা কবতে আমি তাঁকে দু এক খানি করে গহনা দেখাতে আরম্ভ কর্লেম, তিনি স্বামীর পীড়ার জন্য দুঃখ কবতে করতে সেগুলি দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে কয়েক খানি ভাল কাজ করা দামী জড়ওয়া গহনা পছন্দ করার আমি তাঁর অসুখতি অপেক্ষায় বলিলাম, যদি

আপনি অল্পমতি কবেন, তাহলে এগুলি সব কাল আপনার স্বামীর নিকট আমাদের লোক মাঝফত পাঠিয়ে দি ; যদি এর মধ্যে তিনি আপনার জন্য কিছু গ্রহণ করেন ।’ জ্বালে কটী আবার এই প্রস্তাবে বিশেষ মৌজনা প্রদর্শন কবে বিনীত ভাবে বল্লেন, ‘আনার স্বামী এসব গহনা পত্র পছন্দ করেন বটে, কিন্তু তিনি এখন যেকপ পীড়িত, তাতে যে এসময় তিনি কিছু নেবেন এমন আমার বিশ্বাস হয় না, তবে আপনি যখন অনুবোধ কছেন, তখন একবার পাঠিয়ে দেথবেন, যদি এর মধ্যে তিনি কিছু গ্রহণ কবেন, বিশেষ তিনি হীবার আ’টি আর ঘড়ির চেন বড পছন্দ করেন ।’ এই সব কথা বার্তাব পব যুবতী আমাকে অভিবাদন কবে প্রস্থান করলেন । বলা বাহুল্য তাঁব স্মৃধুব আলাপে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলাম ।

পব দিন নিষ্কামিত সময়ে নানাবিধ অলঙ্কার লইয়া নির্দিষ্ট আবাসে হোটেলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম—সঙ্গে আমাদের দোবানেব এজন মাত্র দবোয়ান ছিল । যাইবা মাত্রই পথমে আমার সহিত হোটেলের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইল । তাঁহাব চ এক কপায় আমাদের ক্রেতাব পরিচয় পাইলাম । তিনি তাঁহাব বড প্রশংসা কবিয়া বলিলেন যে ইনি yorkshire এব একজন ধনী লোক ও অনেকগুলি বয়লাব ঘনিব অধিস্বামী । পীড়িত হইয়া ইমি এখানকার বাজ টিবিংসক Sir Ealing Dean এব পবায়র্শ গ্রহণের জন্য এসেছেন । ইনি অবে একবার এটজন্য এখানে এসেছিলেন , ইনি অতি ভদ্রলোক, আব ইঁচাব জ্বী বড সতী সাপ্তী, দিন রাত স্বামীব সেবায় নিযুক্ত আছেন । হোটেল্যাধ্যক্ষের মুখে এহ পরিচয় পেয়ে আমি পবম আশ্লাদিত হলেম । পবে আমাদের ক্রেতা যে ঘবে ছিলেন আমি সেই ঘবে প্রবেশ কলেম । ভদ্রলোকটিব স্ত্রী সেই ঘবে বসে ছিলেন, তাঁব স্বামী তাব পাশব পবে শুয়ে ছিলেন, আমার প্রবেশ মাত্র তিনি উঠে আমাকে ভদ্রোচিত অভ্যর্থনা কবে,বস্তুে একখানা চৌকী দেখিয়ে দিলেম, আমি তাহাতে বসলেম, তিনি পার্শ্বের ঘবে তাঁব স্বামীব নিকট আমার আগমন সংবাদ দিতে উঠে গেলেন । এহলে বলা উচিত আমার স্ত্রী দণেশ্যান হোটেলের দ্বাবে আমার প্রতীক্ষায় নীচে অপেক্ষা কবিতো লান্ধিল । মুহূর্ত্ত পবে তিনি প্রত্যাপন্নম কবিয়া আমাকে তাঁহাব স্বামীর নিকট লইয়া গেলেন । যে ঘবটিতে আমাদের ক্রেতা মহাশয় ছিলেন, সেটি একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর গৃহ, দোব জানালাগুলি সব পরদা ঢাকা, ভদ্রলোকটি

এক খানি কোঁচে শুয়ে ধববের কাগজ পড়তেন; এবাব দেখে বোধ হল যেন তিনি পূর্বের অপেক্ষায় কাহিল হয়ে পড়েছেন, চোক মুখ বসে গেছে। আমি গৃহে প্রবেশ মাত্র ক্রেশযুক্ত সহস্য বদনে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কবে, আমার অভিবাদন কল্লেন, পবে শিষ্টাচার সহকাৰে বল্লেন, ‘আপনাকে এই কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি বড ডঃখিত হলেম, আমার বড অসুখ শরীর বলে আমি আপনাদের দোকানে যেতে পারি নে, আমার বড ইচ্ছা ছিল, আমি স্বয়ং গিয়ে পছন্দ-সই দুটা একটা অলঙ্কার কিনে আনব। যাহা হউক, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ কবে এতদূর কষ্ট স্বীকার কবে আমার জন্য এসেছেন, এজন্য আমি আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি, আপনার এই অনুগ্রহে আমি অত্যন্ত অধ্যায়িত হলেম।’ এই প্রথম শিষ্টাচারের পব আমি গহনাব বায় খুলে তাঁহাকে একে একে দেখাবাব উপক্রম কব্‌চি, এমন সময় তিনি পুনবায় বলে উঠলেন, ‘অধিক কিছু আনেন নিত, আমার এখন অসুস্থ শরীর আমি বেশী জিনিষ পত্র পছন্দ কব্‌তে পারব না, তবে সুসিব জন্য অল্প দামেব মত দু এক খানা নেব।’

রোগীব শয্যাব পার্শ্বে ত্রৈশব শিশি, গ্যাস, আব একটা বড গলা উচু পাত্র বয়ছে, বোধ হয়, সেটায় জল বা ঐকপ কোন জিনিস ছিল। আব একখান ফ্লানেলের চাদবে তাব সর্বাঙ্গ আবৃত ছিল।

আমি একে একে দুই এক খান করে অলঙ্কার তাঁব হাতে তুলে দেখাতে লাগলেম; তিনি দেখিতে লাগলেন; কিন্তু তাব মুখেব ভাবে বোধ হতে লাগল, যেন এগুল তাব তত পছন্দ হচ্ছে না, আমি একে একে ভাল ভাল জিনিস বাব কর্তে আবন্ত বল্লেম। তাব পব একঘোড়া হাতের অলঙ্কার নিয়ে তাঁর স্ত্রীব দিকে চেয়ে বল্লেন, ‘দেখদেখি এ ঘোড়াটা তোমাব হাতে কেমন হয়?’ যুবতী লহস্যবদনে ঘোড়াটি নিয়ে হাতে দিখে তাঁব স্বামীর প্রতি আত্মাদপূর্ণ দৃষ্টিতে কটাক্ষপাত কবিলেন। এই সময় ভদ্রলোকটি তাঁর স্ত্রীকে এক গ্যাস সেবি মদ প্রদানেব আদেশ কল্লেন, স্ত্রীলোকটি সেবি এনে দিবা মাত্র ভদ্রলোকটি অমনি আব এক গ্যাস পোর্টের জন্য স্ত্রীকে অনুৰোধ কল্লেন। তাঁহাব স্ত্রী তাঁহাব এই অনুবোধে বাধা দিয়া বলিলেন “সাব ই— তোমাকে অধিক মদ খেতে বাবণ।” স্বামী এই কথা শুনে যেন কাতর হয়ে বল্লেন, ‘আমাব প্রাণ যায়, শীঘ্র দাও, ডাক্তাবেব জ্বালায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাপত হল, এখন আমাকে সুখে মবতে দাও।’ এই কথায় তাঁব স্ত্রীব বক্ষে দুই এক

বিন্দু জলধারা পতিত হইল, তিনি নিঃশব্দে এক গেলাস পোর্ট আনিয়া শ্রমীর সমক্ষে রক্ষা করিলেন । তাহার পর ভদ্রলোকটি নিজে এক গ্লাস পান করিয়া আমাদের এক গেলাস পানে অনুবোধ করিলেন । আমি তাঁহার শিষ্টাচারেব জন্য ধন্যবাদ দিয়া সুদা পানে অস্বীকার করায়, তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন তবে 'পোর্ট খাবেন কি ? অতি চমৎকার পোর্ট ।' আমি তাহাতেও অস্বীকার করায় ভদ্রলোকটি পুনরায় গহনা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন । কিছুক্ষণ পবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কাছে আর কিছু গহনা আছে,' আমি আবো বয়েকখানি দেখাইয়া বলিলাম, "আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি এখনি দোকান হতে আবে নূতন জিনিস এনে দেখাচ্ছি ।" আমার সঙ্গে প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা ছিল । ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন, 'না, না, আমি ওই হতেই একটা পছন্দ করে নিচ্ছি', তাহার পবে একঘোড়া বাল লইয়া তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বলিলাম ৩৫ গিনি । ভদ্রলোকটি চমকিয়া উঠিয়া তাহা বাগিয়া বলিলেন, 'উঃ এত দর ।' তাহার পবে আমার বলিলেন, "আচ্ছা আপনি যখন কষ্ট হবে এনেছেন তখন কিছু না নেওয়া ভাল দেখায় না ।" আমি তাহার এই সৌজন্যে বড় বাধিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, 'আপনারা ভদ্রলোক, অবশ্য কিছু না নিলে আমাদের দোকান চলিবে কেমন হবে, অবশ্য নেবেন বই কি ।' এই সময় ভদ্রলোকটি হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'উঃ গেলুম, গেলুম, বড় ছগন্ধ, লুসি, শীজ খানিকটা ভিনিগার ঘবে ছড়িয়ে দাও ' আমি হঠাৎ তাহার এই প্রকার ভাব দেখে কিছু চমৎকৃত হলেম, বস্তুত, আমি যবে কোন প্রকার দুর্গন্ধ অনুভব করি নাই । লুসি এই কথায় খানিকটা ভিনিগার ঘবে ছড়াইয়া দিল । তাহার পবে ভদ্রলোকটি সহাস্য বদনে পুনরায় অলঙ্কার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন । পুনরায় একছড়া মুক্তাব মালা লইয়া দাম জিজ্ঞাসা করায় আমি ৪০০০ টাকা বলিলাম । ভদ্রলোকটি এই কথায় মালাছড়াটি আমার হাতে প্রত্যাৰ্পণ করিয়া বলিলেন, 'না মশায়, আমরা গবির মানুষ, চার হাজার টাকার মুক্তাব মালা কেনা অমাব মত লোকেব সাধ্য নয় । ডাক্তাবেই আমার সৰ্কনাশ করে ।' এই সময় পুনরায় সেটরূপ চীৎকার করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ভিনিগার ছড়াইয়া দুর্গন্ধ নিবারণ করিতে আদেশ করিলেন । আমি কিছু আশ্চর্য হইলাম, যোধ হইল, এই বুঝি এঁব রোগের খেয়াল ।

কিন্তু এবাব তাহার স্ত্রী আব ঘরে ভিনিগাব না ছড়াইয়া একখান রুমাল লইয়া তাহাত খানিকটা ভিনিগাব লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আবার খানিকটা ঘব ছড়াইতে আদেশ করিয়া আমাকে ঘড়ি ৩ চেন দেখাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি ভাল চেন বাজিতে লাগিলাম, তাহার স্ত্রী আমার নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, ভদ্রলোকটি এই সময় বলিয়া উঠিলেন ‘শীঘ্র, শীঘ্র, গেলুম, গেলুম।’ এই কথা বলিয়াই তিনি নিজে এক শিশি লইয়া ঘবে ছড়াইলেন; আমি ভয়ানক তীব্র গন্ধ অনুভব করিতে লাগিলাম ও কিছু বস্তু হওবার আঁকুর্পাকু করিয়া উঠিলাম, আমার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। আমাকে এই প্রকার করিতে দেখিয়া ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন, ‘মহাশয়, বোধ হয়, আপনার কিছু বস্তু বোধ হচ্ছে’, বলিয়াই সেই ভিজা কমাল দ্বারা আমার নাক মুখ চাপিয়া ধরিয়া আমাকে জোর করিয়া একখান চৌকিতে শোয়াইয়া দিলেন। তাহার পর কি হইল আমার ঠিক স্মরণ হয় না। তবে আমার বোধ হয়, যেন আমি একবার নিতান্ত দুশ্লভাবে তাহার এই কাণ্ডে বাধা দিয়াছিলাম। কিন্তু যেন এক প্রকার অনশ্লভ শক্তি আমার সমস্ত বল হরণ করিয়া লইল। আমি যদিও একবারে অজ্ঞান অচেতন হইয়া পড়িলাম না বটে, কিন্তু এমনি আমার গাত পা দুর্বল বোধ হইতে লাগিল যে আমার নাড়িবাবও শক্তি থাকিল না। আমি জীবিতাবস্থায় যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। যেন ঘুমের ঘোরে ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম, ভদ্রলোকটি আমার হাতছাট ধরিয়া বাধিয়াছে, আর তাহার স্ত্রী আমার সঙ্গে যাচা কিছু ছিল সমস্ত আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতেছে। তাহার পর আমার মুখ চিত্তিয়া আমার মুখে কি যেন জলের মত ঢালিয়া দিল। পবে আমার কানে স্বপ্নবৎ বোধ হইল, যেন ঘবেব দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া গেল। আমি জাগ্রত অবস্থায় এই স্বপ্নবৎ কার্য দেখিতে লাগিলাম। নিদ্রাভঙ্গের পবে উঠিয়া দেখি সেই ঘবে আমি একা। ক্রমে ক্রমে পূর্ব কথা মনে স্মরণ করিয়া জ্ঞানের সঞ্চাব হইতে লাগিল। তখন একে একে আমি গহনাপত্র খুঁজিতে গিয়া দেখি যে সে সকল কিছুই নাই। দ্বারের নিকট গিয়া দেখি দাব বাহির দিক হইতে রুদ্ধ। তখন আমার সম্পূর্ণ চেতনোদ্বেক হইল। তবে কি আমি এককণ স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম, না উহা সত্য ঘটনা। অলঙ্কারেব বাস্তবিকটেই পড়িয়াছিল, খুলিয়া দেখি যে উহা শূন্য।

এখনও আমি মাতালের ন্যায়, অমাব মস্তিষ্ক ভালরূপ প্রকৃত হইয়া নাই ; যদিও আমি অনেকটা নিজ অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি, নিকটে চাকরদেব ডাকিবাব জন্য ঘণ্টা ছিল, তাহা বাজাইলাম ; একজন চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে ইহাদেব কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। চাকর জবাব দিল তাঁহাবা ত অনেকক্ষণ এখান হইতে চলিয়া গেছেন, ‘আপনার আহাব প্রস্তুত, আসুন।’ আমি (আশ্চর্য্য ভাবে) ‘আহাব প্রস্তুত।’ চাকর। ‘আজ্ঞা, হাঁ। মহাশয়, তাঁবা আপনার জন্য আহাব প্রস্তুত রাখিতে বলে গেছেন।’

আব আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। ইহাব পব যাহা হইল পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন, তবে হোটেলারক্ষ অনেকক্ষণ তাঁহাদেব আগমনেব অপেক্ষায় ছিলেন।

শ্রী বাণী প্রসন্ন দত্ত ।

কাব্যের কোকিল ।

একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে ; প্রবাদটি প্রায় সকলেই সময়ে সময়ে ব্যবহার কবে, প্রবাদটি এই :—“ক্লক কেমন? যার মনে যেমন।” পৃথিবীর পদার্থপুঞ্জ সকলে সমান চক্ষে দেখিতে পায় না—সকলে সমান ভাবে ধারণা করিতে পারে না। একজন, সামান্য বালু+বেণু হাতে লইয়া ভাবে তদন্ত ; আর একজন শত শত পাহাড়, পর্বত লঙ্ঘন করিয়া ছ’ শব্দে চলিয়া যাইতেছে, ভ্রক্ষেপও নাই। একজন একটি সাধারণ পত্রের শোভা সৌন্দর্য্যে বিমোহিত ; আব একজন হাটিতে হাটিতে, সেই পত্রটি হস্তচ্যুত করিয়া নখে ছিঁড়িয়া অগ্নান বদনে চলিয়া যাইতে সমর্থ। একজন নদী, মাঠ, ঘাট—সবই সুন্দরতাময় দেখে ; আর একজন

তাজনহলে বাইরাও এটী ওটীর দোষ অল্পসন্ধান তৎপর ! কাহাবও
পৃথিবী—সুখেব পবিবাব, ভাবময়, আবেশময় ; কাহাবও পৃথিবী চিরশুদ্ধ—
মকভূমি ।

জগত্তেব সর্বত্র এই মতবৈধ, সর্বত্র এই বৈষম্যবাদ । এট বৈষম্য প্রার্থ-
নীয় হউক আব নাই হউক, সকল বিষয়েই ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয় ; বর্ণ,
আকাব, গঠন, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক সৌন্দর্য্যের
উপাদান করনা করে, কিন্তু, এসবল ত সবই বাহ্যিক ; প্রকৃত সৌন্দর্য্যেব
সঙ্গে ইহাদেব সম্পর্ক অতি অল্প—আদবে আছে কি না সন্দেহ । সৌন্দর্য্য—
জড়ত্ববিবোধী উদ্বোধন, চখে মুখে এব সত্তা নাই ; এব স্থান হৃদয়ে ।

সময়ে মনযে, সংসাব যেন কুজ্জটিকারত—ঘোব তমসচ্ছন্ন, গাছ
গুলি অন্ধকারে ভূত প্রেত বালয়া ভয় হয়, চাবিদিকে সন্দেহ, অবিস্থান,
ভ্রান্তি । মন যেন কি জানিতে চায়, যোর পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ; জলের
অত্যন্তাভাব । যেদিক দেখা যায় কি যেন দেখি, দেখি—দেখিতে পাই না,
যেন কেমন অভেদ্য, দুর্বোধ । এমন অনেক সমব আসে,—

In which the burthen of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintelligible world,—

যখন এই দুর্বোধ জগতেব দুর্ভাব বহস্য রাশি আমাদেব উপব আসিয়া
চাপিয়া পড়ে । ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই স্থির করা যায় না, হৃদয়েব
অস্তুমূল প্রদেশ ইহাতে কে যেন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কবে —

কোথা হতে আসি, কোথা ভাসি যায় ?

সকাল আবার হয় কি হেথায় ?

বীজে অঙ্কুরিত, বীজে পবিগতি ?

চক্রাবর্ত ভাবে দুবলজ্যা গতি ?

গ্রহের মতন চক্রেতে ভ্রমণ ?

ধূমকেতু মত অথবা গমন,

অনির্দিষ্ট পথে ভ্রমি চির দিন,

ভ্রমি ভ্রমি স্বর্ঘ্যে হইবে বিলীন ?

পৃথিবীর দিকে তাকাইলেও সমস্তই কোলাহল—গগণোল—বিশৃঙ্খলা !
গুণীব আদর নাই, নিগুণ বৈশ গণ্য মান্য ; গগনলম্পর্শী বৃক্ষলাখায় সিংহল

ফুলের স্থান ; আব গোলাপ ? গোলাপ গাছটা আঁতায় পচিতেছে—টপ্ টপানি থাইতেছে । ধার্মিকের সমৃদ্ধি নাই, বত সব ভণ্ড তপস্বী বেশ আসর জম-কাইয়া ধার্মিক নামে পবিত্রিত ; যাব যেখানে সমাবেশ প্রার্থনীয়, সেখানে তাব নামগন্ধও নাই ; যেন বেলেব গাড়ী পূবা দমে চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে—সকলই ওতপ্রোত, অর্দ্ধ সম্পন্ন ;—

যে দিকে চাওয়া যায় সেই দিকেই “অহো বিধাতঃ শিশুতা তবৈব।” বসিয়া উষ্ণ স্থান ফেলিতে হয় । সমস্তই অনিয়ম—সমস্তই কবির chaos !

যাহাতে জগতের এই বিনোদেব ভগ্নন হয়, যাহাতে ইহাব পরিবর্তে অপূর্ণ শান্তি সত্ত্বাব সংস্থাপন কবে,—তাহাই সৌন্দর্য্য, যাহা’ত ধবার সচ্ছন্দ সত্ত্বাবে বিশ্বময়ের বিশ্বরূপ প্রকটিত কবে ; যাহাতে প্রতি পবমাণ্ডতে তাহাব শৃঙ্খলা, অপরিবর্তনীয় নিয়মেব বিকাশ ধ্ব ; যাহা মনে ধরিয়া, ইচ্ছাময়েব ব্রহ্মাণ্ডময় অশ্রমিত তেজ, হৃৎস্থ ফুলেব ন্যায় মনঃস্কুব প্রোচব হয়, তাহাবই নাম সৌন্দর্য্য । প্রেম, মিলন—সৌন্দর্য্যেব কাজ, সামঞ্জস্য—সুন্দর, অসামঞ্জস্য—অসুন্দর । এই জনাই, চন্দ্রবাবু বলেন, যাহা সুন্দর নয়, তাহাকে যাহা অতীব সুন্দর দেখে, এমন মনই সৌন্দর্য্য দেখিতে পাবে, চক্ষু এবিষয়ে অন্ধ । বঙ্কিম বাবু এই স্থানটি বড়ই বর্ণনীয় ; “গোবিন্দলাল উদ্যানে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন প্রকৃতি ককণাময়ী।” প্রকৃতির এই ককণা—সৌন্দর্য্যেব অপব নাম—এই ককণা সত্য সামঞ্জস্য স্থাপনে চেষ্টিত । প্রকৃতি ধীবে ধীবে ছাটিয়া ছাটিয়া সর্ব্বত্র উচু নীচু দ্ব কবিতা সমান কবিতা ; প্রকৃতির সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য ; প্রকৃতি হইতে আব অধিক সুন্দরী কে ? কবি ববি ঠাকুর এ কথা বেশ বুঝাইয়াছেন ।

এখন কাব্যের কোকিলের কথা বলিব । বিদ্যাপতির কৃষ্ণ বিবাহিণী বাখা “পায়স লেই কবে বায়স নিয়ড়ে ফুকাবি,” যেন কাকে আব কোকিল পালন-না কবে—যেন কোকিলের ডিগ্ ভক্ষণ কবিতা দেলে—বিবাহিণীর এক প্রধান শত্রু নিপাত হইবে । বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের অসীম মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন ; কিন্তু, কোকিল, ভ্রমর, চাঁদ, মলয়বায়ু, এ সকল সম্বন্ধে তাহাদের বর্ণনা প্রেমের ব্যাকুলতার সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে গিয়াছে । বৈষ্ণব কবিগণ কেন ? কালিদাসও বলেন ;—

“সমদ মধুকবাণঃ কোকিলানাঞ্চনাদৈঃ ।”

কুসুমিত সহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চরমৈঃ ॥

ইযুভিব্ব সুতীকৈ ম'নস' মানিনীনাং ।

তুদতি কুসুমবাণো মন্থথোক্ষীপনায় ॥”

এইরূপ আদি কবিগণ প্রায় সকলেই কোকিলবধে একরূপ ভয়ানক লাগসা—
এক ভয়ানক গলা শু নানো পিপাসা সংযোগ কবিয়া গিয়াছেন, এ পিপাসা
দেশ, দিক, পাত্র ভেদে যেকোন ই বাবণ ককক, সাধাবশত ধারণা, —ইহা একরাশি
বিষ নিশ্চিত। কিন্তু তাম্র পাত্রেরে দুগ্ধ বাথিলে যে বিষ হয়, তা কি দুগ্ধের
দোষ? দুগ্ধ জগতেব জীবন, কিন্তু বিকাবগ্রস্ত বোগী দুগ্ধ পান কবিলে স্বতই
অধিকতর বিকাবতা প্রাপ্ত হয়! ফল কথা,—

“There is nothing good or bad ;

But thinking makes it so”

ভাল মন্দ কিছই নাই,

মনেব গুলে ভেদ বে ভাই ।

চন্দ্রবাবু বলেন, সবল বালক সমস্ত রাত্রি স্থখেব ঘুম ঘুমাইয়া নিশিগেষে
কোকিল বধে আফ্লাদে মাতিয়া খেলা কবিতো ছোটো। কই? সে তো
কোকিলেব গবলেব জ্বালায় জলিয়া উঠে না ।

বঙ্কিমবাবু কোকিলেব বেশ চিত্রটি আঁকিয়াছেন, তাঁহাব কোকিলেও বিষ
আছে—সে বিষ শোধিত বিষ, সে বিষব জ্বালায় অন্তব দহে বটে, কিন্তু,
সে প্রদাহেব পবিণাম মৃত্যু নয়—শান্তিপূর্ণ স্থিব ভাবও নয়। উহা ব্যাকুলতা;
সে ব্যাকুলতায় মাহুষকে বসাইয়া দেয় না—সামনেব দিকে টানিয়া লইয়া
যায়। অথচ বঙ্কিমবাবুব কোকিল যেন কেমন এক হা হতোহ্মির
ভাব আনিয়া ফেলে। “কি যেন ছিল, কি যেন নাই, যেন তাহাব
অভাবে জীবন অসাব হইয়া পড়িয়াছে।”

তাব পর, ওয়ার্ডসওয়ার্থেব কোকিল। যে সকল অপরিষ্কৃত তত্ত্ব
দার্শনিকগণ সংসার সংসব-বিহীন নিরবচ্ছিন্ন সত্য বলিয়া ধ্যান করেন, সেই
সকল নানা অপবিজ্ঞেয় উপায়ে মানব মনে সমুদিত হইয়া তাহাকে
স্বর্গীয় মত্ততায় মাতাল করিয়া তোলে, ব্যক্তি বিশেষকে মহাশক্তি
স্বমুস্তিধরিবা দেখা দেন, আর নাই দেন, সাধাবশ মানব জাতির
নিকট তিনি অল্প অধিক পবিমাণে স্বতই পরিষ্কৃত। এই স্বর্গীয়
মত্ততা—এই আগহাতিশয়াই প্রকৃত উদ্বোধন। চৈতন্যকে যখন
উর্দ্ধবাহ হইয়া বিগলিত নেত্রে গাইতে দেখি—

“পবন দয়াল আমাব গোসাঞি ।

যখন যা চাই তখন তা পাই ॥”

যখন দেখিতে পাই, যিশুখ্রীষ্ট বিশ্বাস বিস্ফারিত লোচনে বলিতেছেন
“Ask and it shall be given ; knock and it shall be open ;”

যাচিতে থাকিলে মিলিবে ধন, ছুঁয়াবে যা দিলে, খুলিবে কবাট ।

তখন আমরা বুঝিতে পারি প্রার্থনা দ্বারা কত কি কবা যায় । বস্তুত প্রকৃত
প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক জগৎ সমুখ লইয়া আসে । আবার প্রেম—বিশ্বজনীন
প্রেম, সার্বভৌমিক প্রীতি—স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হবে । ওয়ার্ডসোয়ার্থও
এই কথাই বলেন , কিন্তু তিনি এমন এাটু বাড়াইয়া বলেন, তিনি যা
বাত্তাইয়াছেন, তা সকলেবই অনুকরণীয় - শিক্ষণীয় । তিনি দেখাইয়াছেন,
ফুল, ফল, লতা, পাতা, একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণা—ধ্যান করিয়াও
প্রকৃত জ্ঞান লাভ কবা যায় । তিনি বলেন প্রকৃতির প্রকৃত ধ্যান কবিয়া মানুষ
জড় পদার্থেব জীবন দেখিতে পায় । ওয়ার্ডসোয়ার্থ নিজেই এ কথাব বিশিষ্ট
প্রমাণ ; তাঁহার জীবন দেখিলে একথা আমবা বেশ বুঝিতে পারি, তিনি
বলেন ;—

“ I have felt a presence that disturbs me with the joy of
elevated thoughts.

আমি এমন সত্তা উপলব্ধি কবিয়াছি যে, তাহাতে কি এক মহান
ভাবে আমাকে ব্যাকুল কবিয়াছে ।

তিনি বলেন জীবনে এমন সময় আসিয়াছে—

“When the light of sense goes out, but a flash has revealed
the invisible world.”

যখন এই বাহ্যবের আলোকে নিবিয়া যায় কিন্তু অন্তরে বিদ্যুৎ বিকাশে
অদৃষ্ট জগৎ দেখিতে পাওয়া যায় ।

ওয়ার্ডসোয়ার্থের কোকিলে—অন্যান্য লেখার কথা বলিতেছি মা—এই
প্রাকৃতিক ধ্যানের উন্মেষ মাত্র পবিলক্ষিত হয় ;

And listen till I do begat
That golden time again,
O blessed bird ! the earth we pace,
Again appear to be
An unsubstantial, fairy place
That is a fit home for thee.”

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কোকিলে যে ভাবের উন্মেষ, চন্দ্র বাবু কোকিলে সেই ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ; পূর্ণোক্ত স্বর্গীয় ভাবের—চরম সীমা । তাঁহার কোকিলের রবে প্রেম, জ্ঞান, ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ফেলিতেছে । ভাগ-বতী ভক্তি, সাবস্বতী শক্তি একত্র মিলিত, গঙ্গা যমুনার সঙ্গম, সেই দেবারাধ্য প্রয়াগ তীর্থ । প্রয়াগে নাকি মব লোচনের অগোচর, অন্তঃ-সলিলা সবস্বতী প্রবাহিতা আছে, যখন প্রয়াগে গিয়াছিলাম, চক্ষুচক্ষে তা দেখিতে পাই নাহি । চন্দ্রবাবু কোকিলে সেই গঙ্গা, যমুনা, সবস্বতীর একত্র মিলন—“একত্র মিলন—একতাত্ত্বিক, শাবীৰিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশ”—দেখিতে পাইলাম ।

বৈষ্ণব কবিদিগের মণো কেহ কেহ মোহন মূলীৰ কোন্ বন্ধুব শব্দেব কি গুণ তাহা ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, একজন লিখিয়াছেন, শ্রীবাধিকা প্রেমের আবেশে গলিয়া মূলী বদনকে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন,—

কোন্ বন্ধে কোন্ ধনি কহ গুণমণি ।
কোন্ বন্ধে কেকা ববে নাচে ময়ূবিনী ॥
কোন্ বন্ধে বসালে ফোটয়ে পারিজাত ।
কোন্ বন্ধে ফোটয়ে কদম্ব প্রাণনাথ ॥
কোন্ বন্ধে ষড়ঋতু বহে এক কালে ।
কোন্ বন্ধে নিধুবন হব ফুল ফলে ॥

বাধিকা বাঁশবী ববে মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, ঐ ববেই ময়ূবিনী কেকা রবে মৃত্যু; ঐ ববেই বসালে পারিজাত প্রদোষ্ট, ঐ ববেই ষড়ঋতুব একত্র সমাবেশ ।

সিদ্ধার্থ বিলাস ভবনে, ভোগ স্তম্বে পরিবেষ্টিত হইয়া, বেণু বীণাব বঁবে শুনিতে পাইতেন—

সর্বভূত জয়ধর্মী, অনিত্য সংসার ;
সুমহান্ কৃচ্ছ্র ভোগ প্রাণী সবাকার ;
জবা ব্যাধি মৃত্যু ছঃখ—প্রদীপ্ত দহন
দহিছে বজ্রনী দিনে অনাথ ভুবন ।
মৃত্যু বশীভূত সবে হইবে বিলস ;
নদী ক্ষিপ্ত দাক্ষ মত মৃত্যু হরি লয় !

পুন আগমন নাই, পুন সংমিলন
নদী স্রোতে বহমান ফল পত্রগণ।
কামনা নটেব নাট, নিশার স্বপন ;
সলিল বৃদ্ধ মবীচিকা প্রদর্শন !

যে বেণু বীণা অঙ্গনা হস্তে যাউয়া স্থান বিশেষে মাল্লষকে নবকের দিকে
টানিয়া লয়, সেই বেণু বীণাব ববে, নর্তকীর কাঙ্ক্ষাতে সিদ্ধার্থ জন্ম-জরা-
মূর্ত্য তবঙ্গে হৃদয়ে আহত হইলেন ; তিনি শুনিতে পাইলেন, যেন পূর্ব পূর্ব
বোধিসত্ত্বগণ তাঁহাকে অন্তবোধ কবিতেছেন ; -

বিপবীত বাগ বেষে দহে দিভবন ,
কৃপা মেঘ শীতশাস্ত্র কব বরিষণ ,
স্বর্গের অমৃত দ্রাব কব উন্মোচন ,
বোধহ নিময় , কব মুক্তি প্রদর্শন ,
অবিদ্যা মোহ তামাস লিপ্ত ধবাতল ,
নিবন্ধন ধর্ম চক্ষু দাও সুবিমল ।

চন্দ্রাবু কোকিলের বব পূর্বোক্ত কপ তন্ময়তাব সহিত শ্রবণ কবিত্যা-
ছেন । তাঁহার কোকিলের ববে ইহাশব্দ অন্তর্ভুক্তি , শুধু অন্তর্ভুক্তি নয়,
এইরূপ কয়েকটা ভাবের মিশ্রণ ; মিশ্রণে এক অতীত পূর্ব অমিশ্র
পদার্থের সৃষ্টি ! “বসন্ত পৃথিবীর চবম বিকাশ , কোকিল-কণ্ঠে সেই
চবম বিকাশ স্বরূপে পরিণত । কু—উ স্ববে ব্রহ্মাণ্ডের ফোঁট একতী-
ভূত । কু—উ ধ্বনি ফোটেব সঙ্গীতাত্মক প্রতিক্রিয়া । সৌন্দর্য্য
স্বলতা, বীৰতা, দয়া, প্রেম ভক্তি, জ্ঞান, কু উ স্ববে বিবশিত—কোকিল
ববে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গীত ।”

তাব পব, আবাব কোকিলের পঞ্চম ।

এই স্তম্ভের হইতে স্তম্ভবতর, স্তম্ভবতর হইতে স্তম্ভবতম, বৃহৎ হইতে
বৃহত্তর, বৃহত্তর হইতে বৃহত্তম, বৃহত্তম হইতে অনন্ত , উন্নতি, উন্নতি উন্নতি,
আবো উন্নতি ; অনন্ত উন্নতি , এই মন্ত্রেই কোকিলের কু, কু—উ, কু—উ,
কু—উ, কু। এই ধাবাত্মিক অনবচ্ছিন্ন উন্নতিই চন্দ্র বাবু কোকিলের
পঞ্চম ।

অনেক দিন হইল হেমচন্দ্র কোকিলববে প্রকৃতিকে নব চিসলয়ে সাজিতে
দেখিয়া, অচেতন মলয়বাত, অচেতন কুসুম রেণুকে কোকিল কাকদ্বী

শুনিয়া অধীব হইতে দেখিয়া, প্রবাহিণীকে কোকিলেব ভাষে মাতিয়া,
কল কল স্বরে সাগর পাশে ছুটিতে দেখিয়া—জড়কে চেতমের স্তম্ভা
বুঝিয়া সচেতন হইতে দেখিয়া—গাইয়া ছিলেন—

“বহে যদি সে তবঙ্গ কাণেব হৃদয়ে,
গাও হে তবে সে গীত শুনায়ে কব জীবিত
নিঃশ্রেত বঙ্গের যদি শ্রোতেতে ডুবাও ।
বহস্য, বোদন, কিম্বা উৎসাহে ভাসাও ।
কে আছে হে ববি কুলে গভীর হৃদয়,
গাও একবার শুনি জীবন সার্থক গুণি
অমনি মধুব স্ববে গভীর উচ্ছ্বাস
জুড়াবে এ গউড়ের প্রাণেব জ্বালা ।”

“গভীর হৃদয়” চক্ষুবাবু কোকিলেব ‘মধুব স্ববে’ “গভীর উচ্ছ্বাসে” সেই
রহস্য উৎসাহেব গীত গাইয়াছেন, কোকিল ববে শাবীরিক, মানসিক,
আধ্যাত্মিক বিকাশেব একতানাত্মক সঙ্গীত চিত্রিত করিয়াছেন। প্রত্যেক
বঙ্গবাসী একবার এই সঙ্গীত দেখা উচিত। দেখিয়া, শিখিয়া ‘জীবন
সার্থক’ করা কঠব্য।

যম-যাত্রীদের সেতোগণের সভা ।

এখন সকল বকমেই জরীবা হইয়াছে ‘পূর্বে বিলাতে যাইতে হইলে ছয়
মাস লাগিত, এখন একুশ দিনেব বেশী লাগে না,—পূর্বে বাঙ্গালা দেশ হইতে
গয়া কাশী যাইতে হইলে তিন মাস লাগিত, এখন হই দিনেই যাওয়া যায়।
এই অল্পপাতাজুসাবে বঙ্গদেশেব পথও অনেক নিকট হইয়াছে। কিন্তু হৈম
পথ, জলীয় পথ, ত ড়িত পথ প্রভৃতি নূতন নূতন পথ হওয়াতে, “এলো
পথের” যাত্রীর সংখ্যা মন্দীভূত হইয়া আলিতেছে দেখিয়া, সেই পথের সনন্দ

প্রাপ্ত ইজাবদাবগণ কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন ; বিশেষ, কালিঘাটের হালদাবদিগের ন্যায় ইহাদের অংশীদারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে লাভের অংশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে । তাই ইহঁরা ধর্ম্মঘট করিয়া অপরাপর পথগুলি বন্দ করিবার এবং অপ্রাপ্ত-সনন্দ পাণ্ডাগণকে অনর্থক অংশদান করিতে না হয়, তাহার চেষ্টায় আছেন ।

ইতিমধ্যে ইজাবদাবগণ গুপ্ত সভা আহ্বান করেন । সকল সভ্য সভ্য হইলে একজন সভ্য এই প্রস্তাব করিলেন, যে আজ কাল গবর্ণমেন্ট যেকোন ক্ষিপ্ত হস্তে সনন্দ বিতরণ করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয় যে অতি অল্পকাল মধ্যেই যাত্রী অপেক্ষা সনন্দ প্রাপ্ত অংশীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে । আর গবর্ণমেন্ট যেকোন উদার, তাহাতে সনন্দ বিতরণে বাধা জন্মাইবার আশাও দূরীভূত । বরং সেৱণ চেষ্টা করিলে গবর্ণমেন্টের বিবাগভাজন হইবার সম্ভাবনা । অতঃ অংশীদারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইলে “কুতের” ভাগ ক্রমশই হ্রাস হইয়া আসিবে ; অতএব যাহাতে সকল দিক বজায় রাখিয়া পূর্ণ মাত্রায় যমযাত্রী পাওয়া যাইতে পারে, এক্ষণে একটা উপায় উদ্ভাবন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে । এই কথা শুনিয়া সভ্যগণ “সাধু সাধু” উচ্চারণ করিয়া প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন । অতঃপরে আর একজন সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবকারীকে ধন্যবাদ প্রদান করত বলিলেন, বর্তমান বিপদ দূরীকৃত করিবার একটা সুন্দর উপায় আমি উদ্ভাবন করিয়াছি, সভ্যগণের মনোনিবেশ হইলেই কৃতার্থ হইব । উপায়টি এই যে অনেক যাত্রী আমাদেব সাহায্যে একেবারেই যম-কবলে নিপতিত হয় ; তাহাদের কাছে আমরা একবার বই “কুত” পাই না । আমরা আবহমান কাল যম-রাজের সাহায্য করিয়া আসিতেছি, এই ক্ষণে তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যদি ক্ষুধা নিরোধ করেন, কোন লোককে কবলিত না করেন, অতঃ প্রত্যেককে বৎসরে ৪।৫ বাব তলপ করিয়া কাছে নিয়া ছাড়িয়া দেন, তবে আমরা, প্রত্যেক মাসের নিকট প্রতিবারে যাইতে আসিতে দুইবার করিয়া বৎসরে ৮।১০ বাব “কুত” পাইতে পাবি ; আর যাত্রীগণ যমের কবলে-অগ্রহা হইলে, আমাদেব লাভের অল্প অনন্তকালপর্যন্ত এমনই অসংখ্যরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে । অতএব এই গুপ্ত সভা হইতে এই বিষয়ের জন্য যমরাজকে অনুরোধ করা হউক । এই প্রস্তাব শ্রবণান্তে সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আত্মহারা হইলেন এবং সজোরে করতালি দ্বারা গুপ্ত সভা ব্যক্ত করিলেন ।

অনন্তর তৃতীয় ব্যক্তি সভাগণকে গম্ভীর ভাবে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—
 আপনাবা উল্লাসে মত্ত হইয়া অধীর হইবেন না। ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলে
 উপস্থিত কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবাব সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; তিনি দ্বিতীয় প্রস্তাবকারীকে
 ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন প্রস্তাবকারীর সাবগত্বা বক্তৃত্তা তাঁহাব অগাধ
 চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে কিন্তু যমবাজের ক্ষুধা নিবোধ সম্বন্ধে আমাব
 এই ব্যক্তব্য যে আমবা যখন যমবাজের এত উপকার করিয়াছি, তখন তিনি
 যে আমাদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও
 সন্দেহ নাই। কিন্তু, ক্ষুধা, স্বাভাবিক রুচি, ইচ্ছা কবিলেই ইহাকে নিবোধ
 করা যায় না, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিব হিতাহিত জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না; এ অবস্থায়
 যমরাজ আহাব না করিয়া যে সহজে স্তম্ভ থাকিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয়
 না। তবে আমাদিগকে ঔষধেব সাহায্যে এরূপ কবিতে হইবে, যাহাতে
 যমরাজেব ক্ষুধারুচিব উদ্রেক হইতে না পাবে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে
 আজ পর্য্যন্তও এমন কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার সাহায্যে ক্ষুধা-
 রুচিকে নির্মাণ মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

এই কথা শুনিয়া চতুর্থ ব্যক্তি ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—কথাব ভাবে
 বোধ হইতেছে আপনি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বিজ্ঞানেব
 অসাধ্য কি কোন কাজ আছে? আমি এইক্ষণেই তিব্বতীয় কোন মহাত্মাব
 নিকট অনুরোধ পত্র দিতেছি, সেই পত্র নিষা যমরাজ, মহাত্মাব নিকট গিয়া
 যদি কিছু দিন শিক্ষানবিশী কবেন, তবে আপনাবা দেখিতে পাইবেন যে
 ক্ষুধাকে “নির্মাণ” দেওয়া কতদূর সহজ। অবশ্য এ কথা আপনাদিগকে
 বলিয়া দিতেছি, মহাত্মাব উপদেশে যমরাজ স্বীয় জিহ্বাকে কঠোরক্লম্ব রন্ধুর
 মধ্য দিয়া ব্রহ্মতালুতে ঠেকাইতে পারিলে, আব তাঁব ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই
 থাকিবে না। অনন্তর আব একজন সভ্য উঠিয়া বলিলেন, এ বড়
 ভয়ংকর বিষয় যে আপনাবা সকলেই “উপায়ের” চিন্তা কবেন কিন্তু
 “অপায়ের” চিন্তা কবেন না। ব্রহ্মতালুতে জিহ্বা ঠেকাইতে পারিলে
 যে ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ হয়, তাহা যোগ শাস্ত্রেব নিগূঢ় সত্য, সে কথা কেহই
 খণ্ডন করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ অবস্থায় মানুষেব বহিরিক্রিয়
 সকল কার্য্য না করিয়া জড়ভাব ধারণ করে। আমবাতো আর
 যমরাজকে যোগী করিতে বসি নাই। যমবাজের নির্মাণ মুক্তি বা অনন্ত
 শক্তি লাভও আমাদের লক্ষ্য নহে। যমরাজের বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইলে

আর তিনি সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না। সুতরাং বাহ্য-
কেও তিনি তলপ করিবেন না। আর তলপ না করিলেই বা কে ইচ্ছা করিয়া
ধমপুবে যাইবে? এর ফল এই হইবে যে এখন তবু আমরা ভাগের ভাগ
দুই দশজন পাইতেছি, যমপুৰী যোগীস্বামীর আবাস হইলে, তাও যাইবে;
আমাদিগকে অনশনে জীবন হারাইতে হইবে। অতএব জিজ্ঞাসা ব্রহ্মতালুতে
ঠেকাইয়াও যমরাজ ঘাণাতে বহিবিদ্রিষ্টেব পবিচলন দ্বারা লোকের প্রতি
আধিপত্য খাটাইতে পারেন, তাহাব কোন উপায় উদ্ভাবন করা সর্বতোভাবে
বিধেয়, তাহা হইলেই আমাদের সৰ্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে। এই কথাব পর,
গুপ্ত সভা গুপ্ততবকপ ধারণ করিল, বাহাবো মুখে আব কথা ফুটে না, সক-
লেই নির্বাক।

কিষ্কন্ধণ পবে, বিশালদেহ একজন সভ্য গম্ভীর ভাবে গাত্রো-
থান করিয়া, সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিব মুখাবলোকন করত ধীরে ধীরে
বলিতে লাগিলেন, সভ্যগণ আপনাবা বে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন,
তাহা আমি বুঝিতে পারবোতাহ। নতুবা এ অধীনকে আজি আপনাদের
সমক্ষে বাচালতা করিতে হইত না। আমি প্রস্তাব করিতেছি, যে যমরাজকে
প্রত্যহ ষাইট গ্ৰেন কবিয়া কুইনাইন দেওয়া হোক, তাহাব ক্ষুধা অত্যন্ত মন্দা
পাকিবে, অথচ তিনি গাত্র জ্বালায়, যাত্রীগণকে অনবরত তলপ তাগাণা
করিতে থাকিবেন। এই কথায় সবলেই সুপ্রোথিতব ন্যায় চট্কা
ভাঙ্গিয়া উঠিলেন—এবং বলিলেন ইহাই সাধু পরামর্শ, তখন সেই প্রস্তাব
সকলসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল, ও আনন্দে সভা ভঙ্গ হইল।

শুধুই রহস্য।

পরলোক গন্ত ডাক্তার বামদাস সেন ‘ঐতিহাসিক রহস্য,’ ‘রত্নরহস্য’
লেখেন; ইহলোকস্থিত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু ‘বিজ্ঞান-রহস্য’ ‘লোক-রহস্য’
লিখিয়াছেন। ঐহিক পারত্রিক বড় লোকেদের দেখাদেখি আমারও কিঞ্চিৎ

রহস্য লিখিতে সাধ হইয়াছে । কিন্তু গুরুতব অন্তরায় উপস্থিত ; ইতিহাসে—
আমাব হাসি আসে ; বজ্র—আমি চিনিতে পাবি না ; বিজ্ঞানে—অজ্ঞান ;
লোক বুঝিবাব আলোক আমাতে নাই । কাজেই, আমাকে শুধুই রহস্য
লিখিতে হইল, সূতবাং আপনাদিগকেও অগত্যা শুধুই রহস্য গড়িতে হইতেছে ।

সকলকে জিজ্ঞাসা কবিলাম,—বলি হাঁগা, শুধুই বহস্য কি লিখিব ?

সর্বাত্রে একালেব ছাত্র বিস্মিত মু'খ বলিলেন, শুধুই বহস্য এই যে,—

বাগ অর্থ ভালবাসা, ঘৃণা অর্থ দয়া মায়া ।

তখন একালেব শিক্ষক গম্ভীর মুখে বলিলেন তা নয়, শুধুই বহস্য এই যে,—

যে লেখে সে লেখে না,

যে শেখে সে লেখে না ।

একালেব দবিত্র বন্ধে হ'ত দিশা কাতব বশ্ঠে কটিল, শুধুই রহস্য
এই যে,—

ক্ষুধায় যে ক্ষিপ্ত, শাকার তাহাব ঘোটে না ।

ধনী উদবে হাত দিয়া তেমনই কা'ব বশ্ঠে বলিলেন, শুধুই রহস্য
এই যে,—

প্রচুরে যে বিভোব মল্লগ্নি তাহাব ঘোচে না ।

একালেব স'বাদপত্র তীব্র কটাক্ষ কবিয়া বলিল, শুধুই বহস্য এই যে,—

গবীবের তেললুণের উপব বাটা চডানই রাজনীতি,

একালেব বাজপুকষেবা উত্তর ছলে বলিলেন, আব শুধুই বহস্য
এই যে,—

রাজার রাগ বাড়ানই প্রজানীতি ।

একালের সাময়িক পত্র সকল দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, শুধুই রহস্য
এই যে,—

বহুপরে যে মূল্য পাওয়া যায়, বা ত'ও যায় না—তাহার নাম অগ্রিম
মূল্য ;—

একালের গ্রাহকেরা শুনিতে পাইয়া ভাড়াভাড়ি রাগ করিয়া বলিলেন,
শুধুই বহস্য এই যে,—

সময়ে যাহা কখনই বাহির হয় না, তাহার নাম সাময়িক পত্র ।

একালের আবেলোমায়লা আদালতের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল,
শুধুই রহস্য এই যে,—

ইষ্টাপ্পের যে বাবদা তাহাব নাম নাস্তবক্ষা ।

আব পল্লীগ্রামের লোকে পোলিস্কে দেখাইয়া বলিল, শুধুই বহস্য
এই যে,—

ছুগব বাজিতে যে চীৎকার, তাব নাম শান্তি বক্ষা ।

নাইট সাহেব মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, শুধুই বহস্য এই যে,

সব চেয়ে জংখী এই ভাবত ভুভাগে,

সব চেয়ে বেশী বেশী বেতনাদি লাগে ।

গিফিন্ হাত কামড়াইয়া বলিলেন, শুধুই বহস্য এই যে,

তোমরা— যাব শীল, তার নোড়া,

তাবই ভাঙ্গিবে দাঁতেব গোড়া ।

তখন সেকালের দিকে পশ্চাৎ দৃষ্টি বহিলেন ।

সেকালের শত্ৰু গুডো হাসিতে হাসিতে অগ্রসব হইয়া বলিলেন—শুধুই
বহস্য এই যে,—

মনের কথা খুল বলিলেই বাতুল,

চেপে বাথিলেই প্রতুল ।

সেকালের আমলা মহাশয় ক্রকুটি কবিতা বলিলেন, শুধুই বহস্য
এই যে,—

আমলাকে পয়সা দিয়া কাজ কবাতলে—অপবায়,

উকীলকে মোহব দিয়া কথা কহাইলে—সহায় ।

সেকালের শাওড়ীবা কপালে হাত দিয়া বলিলেন, শুধুই বহস্য এই যে,—

ডাকিলে, জামাই খায় না,

যাচিলে, জামাই পায় না ।

সেকালের দিঙ্গী শাওড়ীবা গালে হাত দিয়া বলিলেন, শুধুই বহস্য
এই যে,—

গোড়া দেশের দেখ কাপ,—

যা নইলে, পেট ভবে না, তাবেই বলে, সর্কডি,

যা নইলে ঘব ভবে না, তাবেই বলে পাপ ।

সেকালের বঙ্গদর্শন আমাব চক্ষে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন, শুধুই বহস্য
এই যে,—

বুকেব ভিকার নাম ডেলাফেলানি, বুতীর ভিকা শযাতোলানি,

শুধু পুরোহিতের—প্রণামি, জমীদার নায়েবের—সেলানি,

কিন্তু কেবল দ্বিবেদ্যের ভিক্ষাই লাজ্জনা বহল ।

সেকালের হতোম পেঁচা সহবেব দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন, শুধুই
রহস্য এই যে,—

এখানে খেঁদীপুতেরা—পদ্মলোচন,

আব প মণ্ড ভণ্ড গুলা—ভাগবত চুষণ ।

সেকালের সাধক বামপ্রসাদ গাহিতে গাহিতে বলিলেন, শুধুই রহস্য
এই যে,—

ছুটা গজ ছুটা অশ্ব স্থানে বসে' কাল কাটালো,

আব বডের ঘবে ববে ভব মন্ত্রীটা বিপাকে মলো ।

সেকালের মাতাল ঢলিতে ঢলিতে বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,

বিশবাঁও জলের নীচে ইলিশ ঠাকুবানী, সে হলো গরম,

আব স্থখি খুড়োর লেজের বাঁধা নাটান ফল,—ডাব—সে হলো ঠাণ্ড ।

সে কালের পক্ষী কবি আপশোষ কবিতা বলিলেন, শুধুই রহস্য
এই যে,—

ইংবাজ জাতি হল জাতি, উপার্জনের অংশ চায় ।

সে কালের ভট্টাচার্য্য একটু হাসিয়া একটু কাঁদিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য
এই যে,

দাতায় দান কবে.

হিংসকে হিংসায় মবে ।

তখন সম্মুখ গশাৎ শেষ কবিতা উদ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত কবিলাম । গুনি-
লাম দৈব-ভাবতী বলিতেছেন, ' বাছা একাল সে কালের এত কথা গুনিয়াও
এখনও বুঝিলে না যে শুধুই রহস্য কি,—তবে গুন, সর্ব্ববালের শুধুই রহস্য
এই যে,

যে জানে সে বলে না.

যে বলে, সে জানে না ।

যারে চাই তারে পাই না,

যাবে পাই তারে চাই না ।

আরও রহস্য এই যে,—

লোকে, ডাকায় ভাসে, জলে চসে,
দাঁতে হাসে, ঠোঁটে ভাষে ।

তখন ভাবচীৰ ভাষাব শুধুই বহস্য শুনিবা আমি গলগল্গল্গলে মায়েৰ চ'ণাকলে উদ্দেশে প্ৰণাম বলিলাম, বলিলাম—‘ আমি এইবাব শুধুই বহস্য বুঝিয়াছি ।’ প্ৰশ্ন হইল, ‘নি বুঝিলে ?’ আমি বলিলাম, ‘সৰ পোকা শুধু বহস্য—‘অদ্যকার এই প্ৰবন্ধ ।’ দেবীৰ হাস্যধ্বনি যেন শুনিতে পাইলাম—
বলিলেন, ‘তুমিই বাচা বহস্যবিৎ, ‘সাগু ছাপ ।’

অতবাং আমি ছাপিলাম ।

মাক্বেথ্ ও হাম্লেট ।

৩ ।

আমবা দ্বিতীয় প্ৰবন্ধে মাক্বেথ্কে বক্তাক্ত হস্তে সত্যমান রাখিয়া, হাম্লেট্ মাক্বেথ্ এট ছুই খানি নাটকেব পৰস্পৰ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কৰিয়াছি । আমবা কি ভাবে ঐ দুই খানি নাটকেব সমালোচনে প্ৰবৃত্ত, তাহাব অনেকটা অভাস দিয়াছি । এখন আবাব মাক্বেথ্ নাটকেব ক্ৰমানুসৰণ কৰা যাউক ।

দ্বিতীয় অঙ্কেব দ্বিতীয় দৃশ্যাব আৰম্ভেই মাক্বেথ্ কৰ্ত্তক ডঙ্কান হত্যায় পাপেৰ পূৰ্ণাবয়ব প্ৰাপ্তি ; অগ্নীয় হত্যা, বন্ধু হত্যা, প্ৰভু হত্যা, বাক্স হত্যা, গুপ্ত হত্যা, সুপ্ত হত্যা, অশ্ৰিত হত্যা, অতিথি হত্যা—মাক্বেথ্ এই সকল পাতকেব পাতকী ।

মাক্বেথ্ বক্তাক্ত হস্তে পাপে বৃত্তি-দাত্ৰী কত্ৰীৰ সম্মুখে আসিয়া বলিল, ‘আমি কাৰ্য্য শেষ কৰিয়াছি, তুমি কিছু শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলে কি ?’

মাক্বেথ্ গৃহিণী । আমি কেবল পেচকেব চীৎকার ও পতঙ্গের কিল্লি শুনিয়াছি যাত্ৰ ।

আমরা পুৰি প্ৰবন্ধে বলিয়াছি, পিশাচী স্ত্ৰীৰ পান কৰিয়া পেচকেব বিকট শব্দে আনন্দ কৰিতেছিল । আর কিছুই শুনে নাই ; পেচক

ও পতনের বিকট বব শুনিয়াছে, তাহাতেই আনন্দ করিয়াছে। এখানেও সেই মূল কথা—

‘মনকে স্মরণ।’

রাত্রি কালে কাল পের্চাব চীৎকার কেহই ভাল বাসে না—পাপীয়সীর তাহাতেই আনন্দ।

বাজা ডঙ্কানের শব্দ শুন গৃহে দুই জন বন্ধক শুইয়াছিল। মাক্বেথ গৃহিণী তাহাদিগকে অতিরিক্ত স্রবা সেবন করাইয়া একেবারে অজ্ঞান করিয়াছিলেন। মাক্বেথ বলিতেছেন ‘ডঙ্কানের হত্যার পর, তাহাদের একজন ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাসিয়া উঠিল, আর একজন বলিয়া উঠিল, ‘হত্যাকাণ্ড।’ আমি দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। তাহারা একত্রে ভগবানের স্ববোচ্চারণ করিল, একজন বলিল, ‘ভগবান আমাদের রক্ষা কর,’ আর একজন বলিল, ‘রূপা কর,’ আমি মহা পাপী, ভগবানের রূপের কান্দাল, কিন্তু আমি ত বলিতে পারিলাম না, ভগবান আনন্দের রূপে কব। কণাটা আমার গলায় আটকাইয়া রহিল।’

যে দুঃখে পড়িয়া পাপের মগ্ন হইয়া দুঃখভঞ্জন ভগবানকে ডাকিতে পারে না, তাহার দুঃখের সীমা নাই। পূর্বেই বলিয়াছি—মাক্বেথ মহাপাপী বলিয়া মহা দুঃখী।

মাক্বেথের মহা কষ্ট দেখিয়া গৃহিণী অনেক সাঙ্ঘনা করিলেন। বলিলেন ‘ও সকল কথা মনে করিয়া ভাবিতে নাই—যাও একটু জল দিয়া তোমার হাত দুটি ধুয়ে ফেল গে, ও বীভৎস বনালগুলি অব বেবে কাজ কি?—তরবারি দুই খানি সঙ্গে আনিয়াছ কেন? যাও, ও ডখানা সেই নিদ্রিত বন্ধকদের নিকটেই রাখিয়া তাহাদের বক্তৃতা রাখাইয়া এসো।’ মাক্বেথ বলিলেন ‘আমি আর যাব না। আমি যাগ করিয়াছি—তাহা ভাবিতেই পাবিতেছি না, তা আবার দেখিতে পাবি কেন?’ তখন মাক্বেথ গৃহিণী একটু ঘুণাব হবে, একটু স্পর্ধাব স্বরে বলিলেন—‘তুমি বড় শিশু-সংস্কারের লোক; দাঁও আমাকে অবরোধ ডখানা দাঁও—ঘুমন্ত আর মৃত, তাবা ত চিত্তের পুস্তক; ছবির ভূতে ত, ছোলাবাই ভয় করে—আমি বন্ধকদের বক্তৃতা রাখাইয়া আসিতেছি; এই হত্যাকাণ্ডে তাহাদের দোষী করা চাই।’ এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই বাল নিশীথিনীর নীরবতা নষ্ট করিয়া বহির্ভাবে গুম্ গুম্ করিয়া বুলে আঘাত হইতে লাগিল। সেই আঘাতের পর আঘাত মাক্বেথের বুকে

পড়িতে লাগিল। মাক্বেথ মনে করিতে লাগিল, যেন সমস্ত বহির্জগৎ কেবল ধারাবাহিক আঘাতে পবিত্র হইয়াছে ; আর তাহার সমস্ত অন্তর্জগৎ সজাগ হইয়া তাহার বক্ষে আসিয়াছে ; সেই বহির্জগতে আর সেই অন্তর্জগতে ধারাবাহিক ঘাতপ্রতিঘাত হইতেছে—গুম্ গুম্ গুম্—হুম্ হুম্ হুম্। প্রকৃতি যেন এতক্ষণে দণ্ড প্রণেত্রীভাবে তাহার পাপ হৃদয়ের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিয়াছেন ; সেই মহতী প্রকৃতির সহিত পাপের কুণ্ঠিত কুণ্ঠিত প্রকৃতির প্রথমে ধীবে ধীবে, ক্রমে জোবে জোবে—সন্মিলন হইতেছে গুম্ গুম্ গুম্—হুম্ হুম্ হুম্।

সহ-পাপিনী পাপ-সঙ্গিনী তাঁহার গৃহিণী তখন পাপ লুকাইতে গিয়াছেন ; আশ্রয় একা ফেলিয়া গেলে—আমাব বৃকে আঘাত লাগিতেছে, শুনিতেছ না ? কাহার কাছে লুকাইবে ? বুঝিতেছ না—আমাদের কথা সকলেই জানিতে পারিয়াছে ; ঐ দেখ জগৎশুদ্ধ এক হঠাৎ ঘা মাঝিতেছে—গুম্ গুম্ গুম্—হুম্ হুম্ হুম্।

মাক্বেথ মুখ কুটিয়া ভাবিতেছেন,—

‘কোথা হতে হতেছে আঘাত ?

প্রতি শব্দে কেন মোবে কবে ভষাকুল !

কি বীভৎস হস্ত মোব। চক্ষে বিপে শূল :

বকণেব অশ্রুবাশি পাবিবে কি কভ্

ধুতৈ হস্তেব বক্ত ? না—এই হস্ত মম

সমগ্র সাগর বাবি বজ্রিবে কেবল,

নীল জল হ'বে বক্ত।

মাক্বেথ গৃহিণী ফিবিয়া আসিবার সময় শেষেব কথাগুলি শুনিতে পাইলেন। বলিলেন—‘তোমাব মতন আমাব হাতও বক্তে ভিজিয়াছে—কিন্তু তোমাব মত অমন ভিজি হৃদয় আমাব নহা।’ বাহিরে আবার আঘাত হইতে লাগিল—গুম্ গুম্ গুম্। যে আঘাতে মাক্বেথকে স্তব্ধ আড়ষ্ট কবিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার গৃহিণীকে চঞ্চল করিল। তিনি স্বামীকে বলিলেন,—‘চল আমবা ঘবে যাউ, হাত ধুওগে ; আমাদের বাজ্রিবাস পবিগে ; হঠাৎ উঠিতে হইলে, লোকে যেন কিছু মনে করিতে না পারে—অত ভবনায় আশ্রয়িত হইও না।’ মাক্বেথ বলিলেন ‘যে কার্য্য করিয়াছি তাহাতে আশ্রয়িত হই—আমার পক্ষে পরম মঙ্গল।’ তখনও আঘাত হইতেছে—মাক্বেথ বাইতে

বাইতে বলিলেন, 'বা মাঝিরা আর তোমরা ডক্কানকে ভাগাইতে পারিবে কি ? তাহা পারিবে না !'

দম্পতি নিষ্কান্ত ; দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত ।

এই দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষ ভাগে স্থল কথা—পাপে মাক্বেথের নিঃশ্রুতি ও মাক্বেথ গৃহিণীর পাপ লুকাইবার জন্য অয়োজন, ও সত্যতা, এবং স্বামীকে সাহস ও সাহসনা দান । পাপিষ্ঠা নারী, স্বামীকে পাপের পরামর্শ গ্রহণে বিবর্ত দেখিয়া 'তবে বুঝ আমাকে ভাল বাসে না' মনে করিয়া যেমন ভালবাসার ধূয়া ধবিয়া পুরুষকে পাপের পথে লইয়া যায়,—মাক্বেথ গৃহিণীর মত, চোক মুখ ঘূষাইয়া 'এই তোমার ভালবাসা' বলিয়া পুরুষের মাথায় ঘূষাইয়া দেয়,—সেইরূপ পাপ-পরামর্শ মত কাব্য হইলে, 'তবে ত আমার বড়ই ভালবাসে' মনে করিয়া পাপ ভাবনত পুরুষকে উত্তোলিত করিবার চেষ্টা করে । পুরুষের কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে, পাপের ভাবনা ভাবিতে দেয় না, পুরুষের কাছে পুরুষের গোঁবব করিয়া তাহাকে খাজ বাখিবার চেষ্টা করে ।

মাক্বেথ গৃহিণী পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি প্রদানের সময় বলিয়াছিলেন 'তুমি নয় পুরুষ ? তবে মনে বাহা হয়, কাজে তাহা করিতে পার না কেন ?' তখন মনেই প্রধান । কিন্তু, সাহসনা দিবার সময় বলিতেছেন 'ছি ও সব কথা কি আর মনে করিতে আছে ?' এখন যেন মনে কবটাই মন্দ, মনে কিছু নয় । তখনকার কথা—'তুমি নয় পুরুষ ? তবে এমন কাজ করিতেছ না কেন ?' এখনকার ভাষা 'তুমি পুরুষ, তবে এমন করিতেছ কেন ?' এই রূপে দেখা যায়, যে প্রার্থনা ও সাহসনার উভয়ের ধূয়া পুরুষের হইলেও রাগ বাগিনীতে কোমল ভীতের ভেদ হওয়ায়, সকাল সন্ধ্যার ভেদ হইয়াছে । আমরা স্থল কথাগুলি বলিতেছি মাত্র, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেক্ষণিক্যের জুই এতটা কাব-চুপির কথা না বলিয়াও থাকা যায় না । এই সকল কাবচুপির কাজ, চন্দ্রমা চক্ষে দিয়া আধ ডায়াল, আধ আলোকে, দেখিতে হয়, বুঝিতে হয়, আর আপনাব মনে কাককাবের প্রশংসা করিতে হয় ।

রাজা ডক্কান কেবল মাক্বেথের সম্মানবর্দ্ধনার্থ, তাঁহার গৃহিণীকে আপ্যায়িত করিবার জন্য, মাক্বেথের ভবনে উপযাচক হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । অতি প্রত্যুষেই তাঁহার ওখান হইতে প্রস্থান করিবার কথা ছিল । মাক্বেথ ও লেনক্স নামে দুই জন ওমরাকে অতি প্রত্যুষেই আসিতে

বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারাই বহির্দ্বারে আঘাত করিতেছিলেন। গুড়ুর আন্দোলন প্রমোদের জন্য বেশী রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া ভৃত্যকে ভোরে উঠিতে হইলে, সে মহা বিরক্ত হয়। মাক্বেথের দ্বাবন্ধকও এই গুম্‌গুম্নি শব্দে মহা বিবর্ত্ত ভাবে শয্যা হইতে উঠিয়া ভাবিতে লাগিল, ‘ছাই এমন রাত্রিতেও একটু নিস্তাব নাই, লোক আস্ছেই আস্ছেই—এ যে নবক হয়ে উঠলো—আমি ত দেখিতেছি নবকেব দ্বাবপাল।’ বাস্তবিক মাক্বেথ-ভবন যে নবকেব নবক হইয়াছে, তাহা নিবৃত্ত দ্বাবন্ধক ঘুমের ঘোরে, কপকেব জোবে, না বলিলেও আমরা বুঝিতে পারিয়াছি।

মাকডফ্ ও লেনক্স ভবনে প্রবেশ করিল, একটু পবেই মাক্বেথের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হইল; রাজা এখন উঠিবেন, কখন যাবেন—এই সংল বিবয়ে কথাবার্তা হইতে লাগিল। মাক্বেথ অতি তল্ল কথাব বেবল উত্তর দিতে লাগিলেন। হৃদয়ে গুরুভাব চাপিয় ছে—বেশী কথা বহিতে পারিবেন কেন?

মাকডফ্ রাজার শয়ন গৃহে অগ্রে প্রবেশ করিয়াছিল,—ছিন্নশিরা রাজদেহ দেখিয়া চীৎকারে বাড় ব সকলক জাগবিত্ত হাবল। লেডি মাক্বেথ যেন সেই চীৎকারেই আসিলেন, বাঙ্কো আসিলেন। রাজকুমারবয় মাল্-কোম্ ও ডনাল্‌বেন আসিলেন। মাক্বেথ ও লেনক্স রাজার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিবিয়া আসিলেন—মাক্বেথ বলিলেন, ‘লোক দুটাকে কাটিয়া ফেলিয়া আমি ভাল কবি নাই।’ মাকডফ্ বলিলেন, ‘কাটিলে কেন?’ তখন, আবার দুই জনক হত্যা কবাত্তে মাক্বেথের পাপাশি ইন্ধন পাইয়াছে—মাক্বেথ পাপে অভ্যস্ত হইয়াছে; মাক্বেথ প্রথম হত্যাকাণ্ডের পর আপনার গৃহিণীর সঙ্গুথই পাপের ভাবে মিয়মাণ ছিল, যখন মাকডফ্ ও লেনক্স আসিল, তখন ভাল করিয়া কথা বহিতে পারে নাই, এখন হত্যার পর হত্যা করিয়া যেনমোব সমক্ষে রাজবন্ধক-দ্বয়কে হত্যা করিয়া নবকেব সাহস সক্ষম কাব্য হা। যখন মাকডফ্ দ্বিজ্ঞাসা করিলেন ‘কাটিলে কেন?’ তখন আবেগপূর্ণ ভাষায় প্রকৃত বাগ্মীর মত উত্তর করিলেন;—

Who can be wise amaz'd, temperate and furious,

Loyal and neutral in a moment? No man:

হঠাৎ বিম্বিত হলে, বিবেচনা শক্তি থাকে না, ক্রুদ্ধ হয়ে ঐর্ষ্যা রাগ

যায় না, রাজভক্ত হয়ে উদাসীন থাকিতে পারিলাম না—কেহই পারে না ।

শুনিতে শুনিতে লেডি মাক্বেথ মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । যে লেডি মাক্বেথ স্পর্ধা কাব্যে বলিয়াছিলেন যে তিনি বক্ষত শিশুকে ইচ্ছা করিলে আছাড় মারিয়া চূর্ণ করিতে পাবেন, যে লেডি মাক্বেথ স্বামীকে ধিকার দিয়া মহাপাপে প্রবৃত্ত কবাইয়াছেন, সেই পাষণ্ডী পিশাচী স্বামী কর্তৃক আবার হত্যার কথা শুনিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িল ! জ্ঞাচবিজ্ঞেব বৈচিত্র্য বুঝিলে কি ?

শ্রী প্রকৃতি স্বভাবতই জলেব নায় তরলা । শৈত্যাধিক্যে জল যেমন ওস্তবৎ কঠিন হয়, শ্রীলোকও কখন কখন তবল হৃদয়, সাংসে বাঁধিয়া, পাষণবৎ কবে । কিন্তু একটু আঁচ লাগিলেই বরফ যেমন গলিয়া যায়, শ্রীলোকের সাহসে বাধা বুকও তেমনই অগ্নিতেই গলিয়া যায় ।

রাজা বাজিতে অতিথি হইবেন, এই কথা শুনিয়া অবধি মাক্বেথ গৃহিণী আপনাকে কঠোর প্রকৃতি করিবার জন্য হুঃসাতসে বুক বাঁধিবার জন্য, দানবী শক্তিব আবাধনা কবিতেছিল * । মাক্বেথ ডক্কানকে হত্যা করিবে, কিন্তু জ্বাপান করিয়াছিল, লেডি মাক্বেথ । পৈশাচিকী আবাধনায়, পৈশাচ পানীয় সেবনে তবে গৃহিণী হুঃসাহসিকতাব সহায়তায় বুক বাঁধিয়া ছিল । যাই শুনিল, যে স্বামীকে সে কাপুরুষ বলিয়া কিছু পূর্বে ধিকার দিয়াছিল, সে সচ্ছন্দে দুইজন নির্দোষ বক্ষকে হঠাৎ হত্যা করিয়াছে—এত যে বৃকের বাঁধনি, সমস্ত যেন এক আঘাতে খুলিয়া গেল, এত যে জমাট, সব যেন গলিয়া গেল । আমাকে ধর ধর বলিতে বলিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল ।

*

Come you spirits !

That tend on mortal thoughts, unsex me here,
And fill me from the crown to the toe topfull
Of direst cruelty ; make thick my blood ;
Stop up the access and passage to remorse,
That no compunctious visiting of nature
Shake my fell purpose, nor keep peace between
The effect and it † come to my woman's breasts
And take my milk for gall, you murth'ring ministers,
Whenever in your sightless substances
You wait on nature's mischief !

এই হত্যাকাণ্ড-বিষয়ে বিং কর্তৃব্য স্থির কবিবার জন্য কিছু পরে সংক্ষেপে
একত্র হইবেন, স্থির হইল। বাজকুমারদ্বয়ের মনে কিন্তু মহা সন্দেহ হইয়াছে ;
তাহারা একজন ইংলণ্ডে, ও আর একজন আয়র্লণ্ডে পলায়ন করা স্থির করিয়া
তাহাই কবিলেন। এইখানেই তৃতীয় দৃশ্য শেষ।

চতুর্থ দৃশ্যে বিক্ষুব্ধ, ইহাতে অন্তর্কর্ত্তী ঘটনা সকলের আভাস পাওয়া
যায়। মাক্‌ডফ্ একপ আভাস দিতেছেন, যে বাজকুমারদ্বয় যখন হঠাৎ
কাহাকেও কিছু না বলিয়া পলায়ন ক'রয়াছেন, তখন তাঁহাদের উপর সন্দেহ
হয়; তাহারাটী হয়ত একেদিগকে বশীভূত কবিয়া তাহাদিগকে দিয়া এই
কাজ কবাইয়াছেন।

কুমারদ্বয় বাক্য ছাড়িয়া গিয়াছেন; তাহাদের পবই মাক্‌বেথ উত্তরাধি-
কারী। সূতবাং স্কটল্যাণ্ডের রাজ্য তাহাকেই অর্শিয়াছে, মাক্‌বেথ স্কট-
ল্যাণ্ডের রাজা এবং শীঘ্রই স্কোন নগরে তাহার অভিষেক হইবে বলিয়া
ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। বস নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোক, সেই অভিষেক
দেখিতে যাঠিতেছেন, বাজকুমারদ্বয়ের উপর সন্দেহের কথা, মাক্‌বেথ রাজা
হইবার কথা,—শুনিয়া একজন অশীতিপর বৃদ্ধ বলিল ;—

God's benison go with you, and with these

That would make good of bad, and friends of foes।

ভগবান্ তোমাদিগকে বক্ষা করুন, আর যাহারা মন্দকে ভাল মনে
কবে, শত্রুকে মিত্র মনে কবে, তাহাদিগকেও তিনি বক্ষা করুন।

প্রবীণ বিচক্ষণ বুদ্ধের কথাই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হইল, আর
নাটকের মূল ধূয়া মন্দকে সুন্দর ভাবে—আর একবার আমাদের মনে জাগ-
কর করিয়া দেওয়া হইল।

আমরা প্রথম অঙ্কের শেষে দেখিয়াছি, জ্বলন্ত বক্সি মুখে পতঙ্গ পতনোন্মুখ
হইয়াছে, দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সেই পতঙ্গ দগ্ধ হইতেছে, তাহার পক্ষপত্র
সকল জল্ জল্ করিয়া জ্বলিতেছে, জ্বলন্ত শিখা লইয়া পতঙ্গ ফর্ ফব্
কবিয়া উড়িতেছে—দহ্যমান, উড়্‌ডীয়মান, ফব্‌ফবায়মান, দেদীপ্যমান,
মহাপাপী মাক্‌বেথ—স্কটল্যাণ্ডের মহারাজা।

বৈশেষিক দৰ্শন ।

- (১) বৈশেষিক সূত্র—কণাদ মুনী প্রণীত, ১০ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, প্রত্যেক অধ্যায়ে ২ টি কবিতা আদ্রিব ।
- (২) পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ ।
- (৩) উপস্থাব—শঙ্করমিশ্র প্রণীত ।
- (৪) বিবৃতি জয়নাথায়ণ তত্ব পঞ্চানন প্রণীত ।
- (৫) বৈশেষিক দৰ্শনং মহানোঃপাধ্যায় শ্রী চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কৃত ভাষ্য সমেতং ।

সকলেই জানেন, সংস্কৃতে নাট্য সাধা, পাতঞ্জল, বেদান্ত, নীমাংসা ও বৈশেষিক এই ছয়টি দৰ্শনই প্রাচীন এবং প্রধান, এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ, জৈন, বামাজ্জ প্রভৃতি অনেকগুলি নব্য দৰ্শনও আছে। ইহাব মধ্যে বৈশেষিক দৰ্শন মহর্ষি কণাদ প্রণীত। কণাদের আর একটি নাম উল্লুক। “বিক্রান্ত-সিদ্ধ সন্নিধি মল্লিঙ্গঃ কাশ্যাপোহিবৌৎ” এই বচনে বৈশেষিক দৰ্শন প্রণেতা ‘কাশ্যাপ’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কণাদের অন্য পরিচয় নাট্য, বৈশেষিক দৰ্শনের সময় নিকপণ বলাও অসাধ্য।

এই জগতে অনন্ত পদার্থ, জড়, চেতন, উদ্ভিদ, অনন্তরূপ। এই অনন্ত পদার্থবাণীকে এক একটি কবিতা জ্ঞানিতে হইবে অনন্তবাহিনীও জানা যাইতে পাবে না, মনুষ্য জীবনের অল্প কালের ত কথাই নাই। এদিকে উহাদের জ্ঞান জ্ঞান হইলেও মনুষ্যের পূরুষার্থ লাভ হয় না। এই নিমিত্ত সপ্তজ্ঞ ঋষিগণ সেই অনন্ত পদার্থসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ কবিতা সংক্ষেপে শিক্ষাদিবার নিমিত্ত দশন-শাস্ত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈশেষিক দৰ্শনে সমুদয় পদার্থগুলি এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়। এই ছয়টি নাত্র পদার্থের নাম কবিতা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ বলেন এই ছয়টি ভাবাভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে মাত্র, এতদবিস্তৃত অভাব নামক এক স্বতন্ত্র পদার্থ যে সূত্রকারের অভিপ্রেত, সে বিষয় কোন সংশয় নাই, কাবণ তিনি নিজে অনেক সময় অনেক সূত্রে অভাবশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। অভাব পদার্থ যে বৈশেষিক দৰ্শন সম্বন্ধে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহাব নামো-ল্লেখ না করিবার কাবণ এইরূপ বোধ হয়। সূত্রকার পদার্থ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গ্রন্থ বচনা করেন নাই, মনুষ্যকে মোক্ষপথে পথিক কবিবার নিমিত্তই ইহাব প্রবৃতি এবং সেই জন্যই প্রকৃত গ্রন্থারম্ভ করিলেন—

ধর্ম বিশেষ প্রসূতাং দ্রব্যগুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায়ানাং
পদার্থানাং সাধর্ম্য্য বৈধর্ম্য্যভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিশ্চেষসম্ ॥

ধর্মবলে বা পূর্বজন্মের স্মৃতি বলে, উৎপন্ন যে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, ও সমবায়--এই কয়টি পদার্থের সাধর্ম্য্য (অনুগত ধর্মের) এবং বৈধর্ম্য্য (বিকল্প ধর্মের) যে জ্ঞান, তাহা হইলেই মোক্ষ পথে পথিক হওয়া যায় তাইতে পারে। কোন ধর্ম কোন পদার্থে আছে, কোন পদার্থেই বা নাই, ইহা ঠিক ঠিক জানিতে পারিলেই মোক্ষ হয় ইহাই তাৎপর্য্য।

একপ স্থলে অভাবের উল্লেখ না থাকিবায় সম্ভাবনা। বিশেষ বৈধর্ম্য্য কথাটি যখন অভাবসংশ্লিষ্ট, তখন অভাব পদার্থ যে একেবারে পবিত্র হইয়াছে এ কথাও আমবা বলি না।

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কিরূপে মুক্তিলাভ হয় তাহা বিবৃতি-কার জয়নাবায়ণ তর্ক পঞ্চানন মহাশয় এইরূপে বলিয়াছেন। পুণ্য বিশেষ বলে দ্রব্যাদি পদার্থের সাধর্ম্য্য ও বৈধর্ম্য্য প্রকৃতরূপে জ্ঞান হয়, তাহার পূর্ব আশ্রয়মনন, আশ্রয়মননের পূর্ব নিদিধ্যাসন দ্বারা আশ্রয়সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, আশ্রয়সাক্ষাৎকার লাভ হইলে ক্রমে ক্রমে নিধ্যাভ্যাসাদির নাশ হইয়া মোক্ষ লাভ হয়। বৈশেষিকদিগের মতে মোক্ষ শব্দের অর্থ নিরুত্তি। পদার্থ ধর্মসংগ্রহকার ঐ দ্রব্যাদি পদার্থের সাধর্ম্য্য এবং বৈধর্ম্য্য কথাকে বলে, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, জীবাশ্মা, পবনাস্মা এবং মন এই নয়টি দ্রব্য। রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ক, সংযোগ, বিভাগ, পবন, অপবন, বুদ্ধি, স্বপ্ন, ছেদ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রত্যহ এই সপ্তদশটি গুণকে কণাদ স্পষ্টীকাবয়্য হুত্র দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শুক্ল, দ্রবত্ব, মেহ, সংসার, অদৃষ্ট এবং শব্দ এই সাংখ্যিক গুণ ও তাহার অভিপ্রের, সূত্রানুসারে সর্বগুণ চরিত্রাণী ৩৭।

উৎক্ষেপণ (উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ,) অবক্ষেপণ (নীচে দিকে নিক্ষেপ,) আকৃষ্ণন (জড় করা,) প্রসারণ (বিস্তার করা) এবং গমন (যাওয়া) এই পাঁচ প্রকার কর্ম, (ক্রিয়া)। ভ্রমণ, বেচন, স্পন্দন, উর্দ্ধচলন, তীক্ষ্ণ গমন প্রভৃতি ক্রিয়াসকল গমনেবই অন্তর্গত সূত্রানুসারে পাঁচের অধিক কর্ম (ক্রিয়া) নাই।

সামান্য দুই প্রকার, পব এবং অপব, তাহার মধ্যে দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম এই

তিনেতে বর্তমান সদ্ধানামক সামান্য পর, অর্থাৎ অধিক পদার্থে বর্তমান ।
এবং কেবল দ্রব্যাদি অপব, অর্থাৎ অল্প পদার্থে বর্তমান ।

বিশেষ—এক প্রকার ধর্ম । সমবায় এক প্রকার সম্বন্ধ ।

পদার্থ ধর্মসংগ্রহকার এইরূপে ষট্ পদার্থের ভেদ নির্দেশ করিয়া তাহা-
দের সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্যের নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু একপ ভেদ মাত্র
জানিয়া পদার্থের স্বরূপ জ্ঞান হওয়া যায় না, এই নিমিত্ত আমবা প্রথমে দ্রব্য-
দির লক্ষণ নির্দেশ করিতে বাধ্য হইলাম ।

দ্রব্য ।—মহর্ষি কণাদ দ্রব্যের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন,—

ক্রিয়া গুণবৎ সমবায়ি কারণং দ্রব্যম্ । ১ । ১ । ১৫ ॥

যাহা ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয় এবং সমবায়ি শব্দে তাহাব নাম দ্রব্য ।
সমবায়ি কারণ শব্দে উপাদান বা প্রকৃতি । দ্রব্য কি তাহা আমবা শূন্য-
রূপে জানিতে বা বলিতে পারি না, তবে তাহাব কতকগুলি লক্ষণ নির্দেশ
করিতে পারি মাত্র, সে লক্ষণগুলি এই—ক্রিয়ায়ুক্ততা, গুণযুক্ততা এবং সম-
বায়ি কারিত্ব ।

গুণ । মহর্ষি কণাদ গুণের লক্ষণ বলিতেছেন,—

দ্রব্যশ্রযা গুণবান্ সংযোগবিভাগেষু কারণমনপেক্ষ ইতি গুণ
লক্ষণম্ । ১ । ১ । ১৬ ॥

যাহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অর্থাৎ গুণ শূন্য, যাহা কখন কোন
গুণের আশ্রয় হয় না, এবং যাহা সংযোগ বিভাগ বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া
কাহাবও কারণ হয় না অর্থাৎ যাহা কর্ম নগ, তাহার নাম গুণ ।

কর্ম । মহর্ষি কণাদ কর্মের লক্ষণ বলিতেছেন,—

এক দ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষু নপেক্ষকাবণমিতিকর্ম
লক্ষণম্ । ১ । ১ । ১৭ ॥

যাহা একমাত্র দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, যাহা কোনকপ গুণের আশ্রয়
নয় এবং যাহা সংযোগ বিভাগ বিষয়ে নিরপেক্ষ কাবণ, তাহার নাম কর্ম
বা ক্রিয়া ।

এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলে অনন্ত পদার্থবাশি অনন্তরূপ হইলেও বিশেষ বিবে-
চনা করিয়া দেখিলে তাহাদিগের মধ্যে তিনটীমাত্র মৌলিক ভেদ লক্ষিত
হয় । (১) কতকগুলি, জগৎতর যাবৎ বস্তুর উপাদানস্বরূপ এবং ক্রিয়া ও

গুণের আশ্রয় । (২) ঐ সকল বস্তুর ধর্ম, যেমন রূপ, পরিমাণ ইত্যাদি । (৩) ক্রিয়া গতি, বুদ্ধি, উৎপত্তি, বেগ প্রভৃতি জগতে বা কিছু পদার্থ আছে, সমুদায় এই তিনেরই অন্তর্গত । উহাদের মধ্যে প্রথমটির নাম দ্রব্য, দ্বিতীয়টির নাম গুণ, তৃতীয়টির নাম কর্ম * ।

বিবৃতিকার জয়নাবায়ণ তৎপক্ষানন মহাশয় সামান্য বিশেষ ও সমবায়ের এইরূপ লক্ষণ কবিরাজ্যেছেন ।

“ নিত্যেন্দ্ৰ সত্যনেক সমবেতত্ব* সমানত্ব । ” সামান্য একটি ধর্ম যাহা নিত্য, অবিনাশী, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই তিন কালেই বিদ্যমান এবং একেবারে অনেকে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান কবে । যেমন গোত্র, অশ্বত্ব, মনুষ্যত্ব, প্রভৃতি জাতি । জাতি নিত্য, কোন কালেই উহার ধ্বংস নাই, এবং যুগপৎ অনেকেতে অবস্থান কবে । সমুদয় গৌতমেই গৌত্র আছে, সমুদয় অশ্বতেই অশ্বত্ব পাতে, এইরূপ মনুষ্যত্ব সমুদয় মনুষ্যে বর্তমান ।

বৈশেষিকদিগের মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও তাত্ত্বাদেন অবাস্তব ভেদেই এই জাতি অবস্থান কবে । দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব এবং পৃথিবীত্ব, জলত্ব, রূপত্ব এই সকল জাতি, জাতির আব জাতি নাই, কেন না জাতির জাতি তার জাতি এইরূপে অনবস্থা হয়, ববাববই চলিতে থাকে, কোন ঠাঁই আব নাগাড় মরে না ।

“ জাতিমস্তিগ্নত্বে সত্যেকমাত্র সমবেতত্বং বিশেষত্বম্ । ”

জাতিমস্তিগ্ন হইয়া, অর্থাৎ দ্রব্য গুণ কর্মে না হইয়া, একমাত্র সমবায় সম্বন্ধে যাহা অবস্থিত, তাহার নাম বিশেষ । এই বিশেষ পদার্থেব জ্ঞান্য বৈশেষিক দর্শন । এট বিশেষ ও একটী ধর্ম — একজাতীয় পবমাণকে অন্য জাতীয় পবমাণ হইতে ভেদ কবিরাব নিমিত্তই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে ।

কারিকাবলীতে সমবায়ের স্বরূপ অতি সূক্ষ্মরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । যথা—

ঘটাদীনাং কপালাদৌ ত্রয়োষু গুণকর্মণঃ ।

তেষু জাতেশ্চ সমন্থঃ সমবায়ঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

* তর্কালঙ্কার মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে বাস্তবিক ধরিতে হইলে এই তিনটীই মূল পদার্থ, অবশিষ্ট সামান্যাদি তিনটীকে ইহাদের মধ্যে কোন না কোনটির অন্তর্গত করা বাইতে পারে, অতএব উহা অতিরিক্ত পদার্থ নয় ।

অর্থাৎ অবয়ব অবয়বীতে, (সমুদয়ে ও অংশে) যে সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধে দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া অবস্থান ববে, এবং দ্রব্য গুণ ক্রিয়াতে জাতি যে সম্বন্ধে থাকে,— সেই সম্বন্ধেব নাম সমবায় । এই সমবায় সম্বন্ধ সকল স্থলেই একরূপ ; ইহাব আব ভেদ নাই * ।

দ্রব্যেব বিভাগ পূর্বেই দেখান হইয়াছে ; উহাদের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারটি দ্রব্য নিত্য (অবিনাশী) এবং অনিত্য (বিনাশী) এই দুই প্রকারই হয় । ইহাবা পবমাণুরূপে নিত্য এবং তদ্ভিন্নরূপে অনিত্য । ইহাদেব শেষ সূক্ষ্ম অংশ, যাহা হইতে আর অংশ নির্গত হয় না, তাহার নাম পরমাণু । পবমাণুসকল নিত্য এবং রূপবিশিষ্ট । অগ্নি সংযোগ দ্বারা পার্থিব পরমাণুর রূপান্তরও ঘটিয়া থাকে । অবশিষ্ট পাঁচটি দ্রব্য নিত্য, সর্বদাষ্ট বর্তমান, তাহাদের ধ্বংস নাই । পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটি ভূত বলিয়া অভিহিত হয় ; আর পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনঃ এই পাঁচটি মূর্ত্ত (আকাববিশিষ্ট) বলিয়া প্রসিদ্ধ । অনিত্য পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুকে কাষ্য দ্রব্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে । প্রত্যেক কাষ্য দ্রব্য—শবীর ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার । তাহাব মধ্যে শবীর আকাব দুই প্রকার : কতকগুলি যোনিজ ও কতকগুলি অবোনিজ ।

পৃথিবী—গন্ধেব সমবায়িকাবণ দ্রব্যকে পৃথিবী বলে । গন্ধ পৃথিবীবই গুণ ; তবে জলাদিতে যে গন্ধেব অন্তর্ভব হয়, তাহা বেবল উহাতে পার্থিবংশ মিশ্রণ নিবন্ধন সংক্রান্ত হয় মাত্র । গন্ধ দুই প্রকার সূক্ষ্ম এবং ভূর্গন্ধ । গন্ধ ভিন্ন পৃথিবীতে রূপ, রস, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ক, সংযোগ, বিভাগ, পবত্ব, (দূরত্ব) অপবত্ব (নিকটত্ব) গুরুত্ব, দ্রবত্ব, বেগ এবং স্থিতি এই সকল গুণও থাকে † ।

* পদার্থধর্মসংগ্রহকাব বলেন—“ অমৃত সিদ্ধানা মাধার্যাধাবভূতানাং ষঃ সম্বন্ধ ” অর্থাৎ যে সকল বস্তু অমিশ্রণে সিদ্ধ অগচ পবল্পার আকার আধেয় ভাববিশিষ্ট, তাহাদেব পরস্পাদেব সম্বন্ধেব নাম সমবায় । তুর্কালঙ্কাব মহাশয় বলেন ইহা আর কিছুই নয় পৃথক্কের বিপরীত গুণ মাত্র । বিবেচনা কবিলে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটিই গুণ বিশেষ সূত্বেবাং তিনটিকে পৃথক্ক পদার্থ না বলিয়া গুণশ্রেণীর অন্তর্গত করা যাইতে পাবিত ।

† হত্রকার পৃথিবীর পবীক্ষা স্থলে কেবল রূপ, বস, গন্ধ, ও স্পর্শ এই

কবায়, মধুব, লবণ, কটু, তিক্ত, অম্ল এই ছয়টি রসই পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে অক্লৃষ্ণ, অশীত এই দ্বিবিধ স্পর্শ অবস্থিত। পার্থিব শরীর চারি প্রকার,—জঘায়ুজ্জ, অণ্ডজ, স্নেহজ, উদ্ভিজ্জ। পার্থিব ইন্দ্রিয় ত্রাণ। অপর বিষয়—দ্বাণুক হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত।

জল।—গুরুরূপবিশিষ্ট দ্রব্যের নাম জল—জলের জলত্ব ধর্ম্ম জ্ঞাতি। জলের গুরুরূপই স্বাভাবিক, তবে কারণবশত অনাপ্রকার রূপও ঘটিতে পারে; যেমন যমুনার জলের কাল রূপ। জলের মধুবস স্বাভাবিক বিশেষ কাব্যধীন ইহাতে, অন্যপ্রকার বসও অনুভূত হয়। জলের নিজ স্পর্শ শীতল তবে অগ্নি প্রভৃতি সংযোগে অন্যরূপ স্পর্শও অনুভূত হয়, বটে তাহা কৃত্রিম মাত্র। স্বগতই জলের স্রবহ গুণ। এতদ্বির সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ পবত্ব, অপবত্ব, গুরুত্ব, মেহ এবং বেগ এসকল গুণও জলে অবস্থান করে। জলাব শবীর অযোনিজ বর্ণ লোকে প্রসিদ্ধ; ইন্দ্রিয়;—রসনা, এবং বিষয় ভিন্নকণা হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত।

তেজঃ—উষ্ণ স্পর্শ বিশিষ্ট দ্রব্যের নাম তেজঃ। চক্ষুকিরণ তেজঃ পরার্থ বটে কিন্তু উহাতে জলের সংশ্লেষ হেতু উহাব স্বাভাবিক উষ্ণ স্পর্শ অনুভূত হয় না। এইরূপ নবকত স্বর্ণ প্রভৃতি তৈজস পদার্থে মুক্তিকার

চাবটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। উপজ্বাব রচয়িতা গুরুবর্ষ বলেন পৃথিবীতে নীল, পীতাদি অনেক প্রকার রূপ আছে। বিবৃতিকাব জয়নারায়ণ বলেন নীল, গুরু, পীত, বক্ত, হবিত, কপিশ এবং চিত্র এই সাত প্রকার রূপই পৃথিবীতে থাকে। ভাষ্যকার তকালঙ্কার মহাশয় বলেন কৃষ্ণরূপই স্বাভাবিক। তাহাব কথায় আগন্তুক কারণবশত পৃথিবীর অন্যপ্রকার রূপ হইলেও হইতে পারে এইরূপ বুঝাইতোছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণরূপ যে স্বাভাবিক এই কথা প্রমাণ-সাপেক্ষ, সেই প্রমাণটুকু দর্শিত না হওয়ায় গোলাযোগ্য বোধিত। তকালঙ্কার মহাশয় বলিলেন পৃথিবীর কৃষ্ণরূপই স্বাভাবিক। তাহাব পবই বলিতেছেন গুরুই পৃথিবীর নিজ গুণ, রূপাদি কাব্য গুণক্রমে উৎপন্ন। স্তবং কথটা গুলিলেই মনে যেন একটা ধাঁদা লাগে। ফল তিনি ভাষ্য করিতেছেন বলিয়া সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করা উচিত হয় নাই। এসকল কথা একটু খুলে না লিখিলে, আমাদের মত মূর্খ লোকে বুঝে কিরূপে?

সংমিশ্রণ নিবন্ধন, উহাতে স্পর্শের উৎকৃষ্টতা অনুভূত হয় না। উপবিউক্ত উৎকৃষ্ট স্পর্শ ভিন্ন তেজে রূপ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ক, সংযোগ, পরত্ব, অপবত্ব, দ্রবত্ব এবং বেগ এই সকল গুণও লক্ষিত হয়। তেজের স্বাভাবিক রূপ ভাষ্যব গুরু অর্থাৎ চক্ষুকে শূন্য, তবে অগ্নিতে বা সূর্যাদি তৈজস পদার্থে, পার্থিব রূপের সামগ্রণ থাকায় উহা লক্ষিত হয় না। তেজে যে দ্রবত্বের (চল চলে ভাবে) কথা বলা হইয়াছে, উহা নৈমিত্তিক, এবং সূর্যাদি তৈজস পদার্থ মায়ে বর্তমান হয়। কার্যাকপ তেজও—শব্দ, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় ভেদে তিন প্রকার, তৈজস অযোনিজ শরীর সূর্য্যাকাদিতে প্রসিদ্ধ; তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষুঃ, এবং বিষয়—বহিঃ ও সূর্য্যাদি। অত্যন্ত অগ্নি সংযোগেও সূর্য্যাদির চল চলে ভাব একবারে শুকাইয়া যায় না দেখিয়া উহাদিগকে প্রাচীন পণ্ডিতগণ তৈজস পদার্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

বায়ু—বায়ু এক প্রকার দ্রব্য উহারও স্পর্শ গুণ স্বাভাবিক, কিন্তু সে স্পর্শ অনুক্ষ বা অশীত নয়। উক্ত স্পর্শ ভিন্ন বায়ুতে সংখ্যা, পরিমিতি পৃথক্ক, সংযোগ, বিভাগ, পবত্ব, অপবত্ব এবং বেগ এই আটটি গুণও থাকে। প্রাচীনরা বলেন বায়ুতে উদ্ভূত রূপ না থাকায় উহার চাক্ষু্য প্রত্যক্ষ হয় না বটে কিন্তু উদ্ভূত স্পর্শ থাকায় স্পর্শ প্রত্যক্ষ হয়। এবিষয়ে কণাদমুনি কি বলেন দেখা যাউক—

মহর্ষি কণাদ প্রথমে প্রত্যক্ষের প্রতি কাষণ নির্দেশ করিলেন—

মহতামেকদ্রব্যবভ্রাং রূপাচ্যোপলক্ষিঃ । ৪ । ১ । ৫ ।

এই স্তরের প্রাচীন সম্মত অর্থ—

উপলক্ষি শব্দের অর্থ চাক্ষু্য প্রত্যক্ষ; এই প্রত্যক্ষ মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট বস্তুবই হইয়া থাকে। পরিমাণের মহত্ব না থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না ? যদি বল বায়ু প্রভৃতির ত মহৎ পরিমাণ আছে, তাহা কেন প্রত্যক্ষ হয় না ? উহার উত্তর এই যে, সূত্রে এই জন্যই রূপাং এই কথা বলিয়াছেন; রূপাং শব্দের অর্থ রূপ থাকা চাই। কেবল মহৎ পরিমাণ থাকিলেই যে বস্তু উপলক্ষি হইবে, তাহা নয়, উহাতে রূপ থাকা আবশ্যিক। অতএব বায়ু প্রভৃতির পরিমাণের মহত্ব থাকিলেও, রূপ না থাকায় প্রত্যক্ষ হয় না।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল যে স্পর্শ এবং রূপ—দ্রব্যে একরূপই সম্বন্ধ থাকে, এক্ষণে দেখা যায় যে যখন স্পর্শ আছে, তখন রূপ থাকিবার যোগ্য

সম্বন্ধ ও আছে; একটা নিয়ম আছে যেখানে সম্বন্ধ আছে সেইখানে সম্বন্ধীও আছে; অতএব বায়ুতে রূপ থাকা হেতু বায়ুর উপলব্ধি হওয়া উচিত । ইহার উত্তরে মহর্ষি কণাদ বক্ষ্যমাণ সূত্রের অবতারণা কবিরাজেন ।

সত্যপি জ্বায়ে মহত্তে রূপ সংস্কারা ভাবাদ্বায়ো রনুপ-
লক্ষিঃ ॥ ৪।১।৭।

বায়ু মহৎপরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্য হইলেও উহাতে রূপ সংস্কার না থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না । এই সূত্রের তাৎপর্য কেবল সংস্কার পদেব অর্থের উপর নির্ভর কবিতোছে । শঙ্কর মিশ্র বলেন—“ সংস্কার পদেন রূপ সমবায়ো রূপোক্তবো রূপানভিভবশ্চ বিবক্ষিতঃ । ” সংস্কার শব্দের অর্থ রূপ নিকৃপিত সমবার বা রূপের উৎপত্তি, অথবা অন্য রূপ দ্বারা অনাবরণ । এই কথা বলিয়া তিনি আবার বলিতেছেন যে, যদিও বায়ুতে যে স্পর্শ সমবায় তাহা রূপ সমবায়ের সহিত এক হইলেও উহাতে রূপ নিকৃপিত হয় নাই, কারণ বায়ুতে রূপের অত্যন্তাভাবই দেখা যায়, এইরূপ চক্ষুর দৃষ্টিতে রূপের উদ্ভব নাই এবং মধ্যাহ্নকালীন উৎপাতে অন্য রূপের অনাবরণ নাই বলিয়া উহাদের প্রত্যক্ষ হয় না । তাহলে শঙ্কর মিশ্রের মতে রূপ সংস্কারের অর্থ তিন প্রকার দেখা গেল; উহাদের মধ্যে যে কোন একটির অভাব থাকিলে আর প্রত্যক্ষ হয় না ।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন বলেন “রূপসংস্কারঃ সংস্কৃতং রূপং উদ্ভূতানাভি-
ভূতরূপমিতি যাবৎ । তদভাবাৎ তাদৃশ রূপত্বাবচ্ছিন্নাধিকবণত্বাভাবাৎ । ”
রূপ সংস্কার বলিতে সংস্কৃত রূপ অর্থাৎ কোন প্রত্যক্ষ বোধ্য অথচ, অনভি-
ভূত রূপ; তার অভাব হেতুক অর্থাৎ তাদৃশ রূপের অধিবরণ না হওয়ার
বায়ুর রূপের উপলব্ধি হয় না, যদি বল যেখানে সম্বন্ধ থাকে সম্বন্ধীও সেই
স্থলে থাকে,—এই নিয়মে বায়ুতে রূপ কেন না থাকে? এই প্রশ্ন কবিরাজ
তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলেন যে এ কথা বলিতে পার না; বায়ুতে রূপ নাই
ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ রূপের অভাবই ঐ নিয়মের বিরোধী ।
যেখানে এরূপ কোন সাধক নাই বরঞ্চ কোনরূপ সাধক থাকে, সেইখানেই
—যেখানে সম্বন্ধ সেইখানে সম্বন্ধী—এই নিয়মের প্রযুক্তি জানিবে ।

তর্কালঙ্কার মহাশয় পরসূত্রের সহিত স্বমতের মিল রাখিবাব জন্য ৪।১।৫ *

* জ্বায়ের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল আমরা কণ্ডকগুলি গুণের
প্রত্যক্ষ করিয়া সেই সকলের আগ্রয় জ্বায়ের জ্ঞান লাভ করি;—এই

সুত্রস্থিত রূপ শব্দের অর্থ—রূপ-সংস্কার করিয়াছেন । তাহার পর ৪।১।৬ সুত্রের অর্থ কবিলেন বায়ুতে রূপ আছে বটে কিন্তু সে রূপের সংস্কার না থাকায় তাহাব উপলব্ধি হয় না । তাহার এই সংস্কার কথাটিই মহা গোল বাধাইয়াছে ; কাবণ সংস্কার দ্বিনিসটা যে কি, তাহা তিনি স্বয়ং কিছুই ভাবিয়া দেন নাই ; কাষেই রূপের সংস্কার স্বতঃসিদ্ধ অথবা নিমিত্তাধীন এবং কিরূপ সংস্কার হইলেই বা প্রত্যক্ষ হয়, এই সকল ভাল করিয়া বুঝান নাই ।

বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না ইহা সৰ্ববাদী সম্মত । কিন্তু তাই বলে বায়ুতে যে রূপ নাই ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না ; কাবণ খোলা হাঁড়ীর উত্তাপ, গ্রীষ্মেব উষ্ম, চক্ষুর আলোক,—ইহাদের রূপ আছে, অথচ উহাদের প্রত্যক্ষ হয় না । তবে বায়ুর রূপ নাই শুধু এই কথা মাত্রে যদি বায়ুর রূপ না থাকে, তা হলে আব কথা নাই । যদি বল পুরাণাদিতে আকাশ হইতে বায়ু এবং বায়ু হইতে তেজ এইকপ সৃষ্টি ক্রম কথিত হইয়াছে । ইহাতে দেখা বাইতেছে যে বায়ু উপাদান আকাশ তাহাতে রূপ না থাকায় বায়ুতে রূপ হইবে কোথা হইতে ? ইহাব উত্তবে আমবা বলিষ তেজে যে রূপ আছে ইহা সকলেবই স্বীকার্য্য, কিন্তু তেজেব উপাদান বায়ু বায়ুতে রূপ না থাকিলে তেজে রূপ আসিবে কোথা হইতে ? অতএব যদি উপাদান অনুসাবে বস্তুব গুণ নির্দেশ করিতে হয় তবে বায়ু যে একেবারে রূপ শূন্য এ কথা বলা বাইতে পারে না ।

শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়ভেদে ঐ বায়ু আবার তিন প্রকাব ; বায়বীয় শরীর অধোনিজ পিণ্ডাচাদিব দেহ, ইন্দ্রিয়—সৰ্ব শরীর ব্যাপি ত্বক্, এবং বিষয় প্রাণ অপানাদি হইতে মহা প্রলয়কাবী বড অবশি ।

আকাশ—শব্দের সমবায়ি কাবণ অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে শব্দের আশ্রয়ের নাম আকাশ । যদি বল আকাশনামক একটী স্বতন্ত্র দ্রব্য স্বীকাব করিবার আবশ্যক কি ? বায়ুকেইত সমবায় সম্বন্ধে শব্দের আশ্রয় বলিলে হয়, ইহার উত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন, এ কথা বলিতে পার না ; কারণ বায়ুর

আধুনিক মতেব খণ্ডন কবিতে তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রয়াস করিয়াছেন । তাহার প্রধান যুক্তি এই যে যদি কেবল গুণ মাত্রেব প্রত্যক্ষ হইত, তাহলে আমাদের মল ও মূলের মধ্যে প্রভেদ জ্ঞান হইত না, স্থলে জলের কার্য্য এবং জলে স্থলেব কার্য্য করিতে হইত আমরা প্রবৃত্ত হইতাম ।

বিশেষ গুণ স্পর্শ—বাবদ্রব্য হারী (যতক্ষণ আশ্রয় দ্রব্য বর্তমান হয়, ততক্ষণ অবস্থান করে) ; শব্দ সেরূপ নয়, অল্পক্ষণেই নশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং উহাকে বায়ুবিশেষ গুণ বলিতে পার না ; এই নিমিত্ত শব্দের আশ্রয় বলিয়া আকাশ নামক একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য স্বীকার করিতে হইবে * । আকাশে ছয়টি গুণ থাকে ; শব্দ এবং সংখ্যা দি পাঁচ । আকাশ এক হইলেও কর্ণকূহর প্রভৃতি উপাধিভেদে নানা প্রকার । আকাশের ইন্দ্রিয়—কর্ণ ।

কাল বা সময়—বড়, ছোট ইত্যাদি বৃদ্ধির হেতু, ইহা নিত্য এবং এক অর্থাৎ স্বজাতীয় বহিত । কাল এক হইলেও ঋণ, মুহূর্ত্ত, প্রভব আদি উপাধিভেদে নানা রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই কাল কালিক সম্বন্ধে সমুদয় জগতের আশ্রয়, এবং সমুদয় জন্য বস্তু প্রভি নিমিত্ত কারণ । “কলনাৎ সর্বভূতানাং সকাল পবিকীর্তিতঃ” ইত্যাদি পুংণ বাক্যই কালের সত্তা বিষয়ে প্রমাণ ।

দিক্—দূর এবং নিকট ইত্যাদি ব্যবহারের হেতুই দিক্ ; কালের মত

* আকাশ একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য ইহা স্বীকার ববাইবার নিমিত্ত বিবৃতিকার নিম্নলিখিত অনুমান পবম্পরা দেখাইয়াছেন । (১) শব্দ একটি বিশেষ গুণ (কোন এক বিশেষ দ্রব্যাপ্রিত গুণ) কারণ ইহা চক্ষুব গ্রাহ্য নয় অথচ বহিরিঞ্জিয় গ্রাহ্য, বাহ্য চক্ষুব গ্রাহ্য না হইয়া বহিবিক্রিয়ের গ্রাহ্য হয় তাহা কেই বিশেষ গুণ বলে যেমন স্পর্শ ; তাহার পব (২) শব্দ যখন গুণ, তখন উহা সমবায় সম্বন্ধে কোন দ্রব্যে অবশ্যই বর্তমান হইবে, কারণ গুণ মাজেই দ্রব্য সমবায় সম্বন্ধে থাকিবে । এক্ষণে শব্দ কোন দ্রব্যের বিশেষ গুণ ? ইহা ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ুব বিশেষ গুণ হইতে পারে না ; কারণ ইহা অপাকজ (অগ্নি সংযোগাদি জন্য পবিণাম জাত নয়) অকারণ-গুণ-পূষক (কারণ=উপাদান তাহার গুণেব অনুযায়ী নয়) এবং প্রত্যক্ষ ; ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ুব বিশেষ গুণ ইহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহারা পাকজ উপাদান গুণানুসারী । তাহার পব শব্দ যখন বিশেষ গুণ তখন উহা দিক্, কাল, বা মনের গুণ হইতে পারে না ; কারণ দিক্, কাল ও মনে কোন বিশেষ গুণ থাকে না, এবং ইহা যখন বহিরিঞ্জিয় প্রত্যক্ষ তখন আশ্রয় বিশেষ গুণ হইতে পারে না ; কাজেই শব্দের আশ্রয় একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে । সেই স্বতন্ত্র দ্রব্যের নামই আকাশ ।

দিক্ নিত্য ও এক । দিক্ এক-হটলেও পূর্ব পশ্চিম ইত্যাদি উপাধি ভেদে নানারূপে প্রভীত হয়; বাহ্যর যে দিকে সূর্য্য উদিত হয় সেই তাহার পূর্বদিক, এবং যেদিকে সূর্য্যোব অন্ত হয়, উহা পশ্চিম দিক্ ; পূর্ণাতিমুখ দাঁড়াইলে বাম হাতের দিকের নাম উত্তর এবং দক্ষিণ হাতের দিকের নাম দক্ষিণ । বোধ হয় দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণদিকের নামের মধ্যে সম্প্রদায় এইরূপ কোন কার্য্যাকারণতা থাকিবে । দিকে সংখ্যা আদি পাঁচটি গুণ অবস্থান করে । তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন কাল, দিক্ এবং আকাশ এই তিনটি একই পদার্থ কেবল কার্য্যভেদে ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় । এ একটা নূতন কথা বটে এবটু স্পষ্ট করে বুঝাইলে ভাল হইত ।

আত্মা—আত্মা দুই প্রকার জীবাাত্মা এবং পবনাত্মা ; এই উভয়বিধ আত্মাই চৈতন্যের আশ্রয় । ইহার মধ্যে জীবাাত্মাকে সংসারী বলিয়া অভিহিত কবে । ভেদনাদিব সাধক কুষ্ঠারাদি যেমন কর্তা ভিন্ন কোন কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ জ্ঞানেব সাধক চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও বর্ত্তা ভিন্ন কিরূপে ফল নিষ্পাদনে সক্ষম হইবে ? এই নিমিত্ত দেহের অধিষ্ঠাতা জীবাাত্মা নামক একটি অতিবিক্ত পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । কেহ কেহ বলিয়াছিল দেহাত্মিক আত্মার স্বল্পতা কবির আবশ্যক নাই; এই দেহট চৈতন্যের আশ্রয় এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে নিজ ব্যাপারে প্রবেশ করিয়া থাকে । বৈশেষিকবা বলেন তাহা হইতে পারে না ; যদি দেহই আত্মা হইত, তাহলে বাল্যকালে অল্পভূত বস্তুব বুদ্ধাবস্থায় স্মরণ হইত না ; কারণ বাল্যকালেব দেহ এবং বুদ্ধকালেব দেহ দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, কেননা পরিমাণ ভেদে যে দ্রব্যসকল ভিন্ন হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এক্ষণে দেখ বাল্যকালের দেহ এবং বুদ্ধকালের দেহ যদি ভিন্ন হইল তবে একেব অল্পভূত পদার্থ অপবে কিরূপে স্মরণ করিবে ? রামের অল্পভূত বস্তুব কি গোপাল স্মরণ কবিতে পারে ? যদি বল বাল্যকালের দেহ এবং বুদ্ধকালের দেহ ভিন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে কার্য্যাকারণ সম্বন্ধ আছে ; বাল্যকালের দেহকে বুদ্ধকালের দেহেব কারণ বলা যাইতে পারে, অতএব কারণের অল্পভূত বস্তু কার্য্য স্মরণ করুক না কেন ? ইহাও যুক্তিসিদ্ধ নয়, তাহলে মায়ের অল্পভূত পূর্ব বস্তু পুত্রে স্মরণ করিতে সক্ষম হইত । আরও দেখ শরীরের চৈতন্য হইলে, সদ্যোজাত শিশুর জ্ঞান্যাপানে এবং অর্দ্ধ প্রসূত বানর শিশুর সন্ধিহিত শাখা অবস্থানে প্ররতি হইত না, কারণ তৎকালে ঐ সকল

কার্য যে আপনায় হিতকর একরূপ বৃদ্ধি হওয়াই অসম্ভব ; কিন্তু আমাদের মতে পূর্বজন্মে অমৃতত্ব ইষ্টসাধনতার তখনই স্মরণ হওয়া যতটা বাঞ্ছনীয় কার্যো প্রযুক্ত হয়। যদি বল পূর্বজন্মভূতের স্মরণ হওয়া বর্জ্য সম্ভব হয়, তবে পূর্বজন্মেও আবণ্ড কত বস্তু অমৃতত্ব হয়, তাহাদেব স্মরণ হব না কেন ? ইহার উত্তর এই যে সেরূপ স্মরণ হওয়াব প্রতি কোনরূপ উৎসাহক কাৰণ উপস্থিত হয় না।

পূর্বজন্ম স্বীকার করায় বৈশেষিকদিগের মতে সংসার যে অনাদি তাহা এক প্রকার সিদ্ধ হইল এবং সংসারের অনাদিত্ব সিদ্ধি সত্ত্বে আত্মাও যে অনাদি তাহাও সিদ্ধ হইল এবং সেই অনাদি ভাবের নাশ না হওয়ায় আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল, যদি বল দেহও আত্মা ভিন্ন হউক, মন এবং আত্মা কেন এক হউক না ? মন হইতে স্বতন্ত্র আত্মা মানিবার আবশ্যকতা কি ? ইহার উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন,—মন, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ ; ইহার জ্ঞানাদি স্বীকার কবিলে প্রত্যক্ষই অসম্ভব হইয়া পড়ে ; কারণ প্রত্যক্ষে আত্মার (যাহার প্রত্যক্ষ হয় তাহার) মহত্বই কারণ ; মন সূক্ষ্ম হওয়ায় কোনরূপ প্রত্যক্ষের আশ্রয় হইতে পারে না *। এই সকল কারণে দেহ ও মন

● চক্ষুরাজ্য তর্কালঙ্কার মহাশয়, শবীর ও মনের চৈতন্যতাবের প্রতি নিম্নলিখিত যুক্তি করি দেখাইয়াছেন,—শবীরে চৈতন্য নাই, কারণ শরীরের কারণ পবমাণুতে চৈতন্য থাকার কোন প্রমাণ নাই। আবণ্ড দেখ পৃথিবী বস্তুর গুণ সকল উপাদান কাবণেব গুণ অনুসাবেই উৎপন্ন হয়, কোন কোন শরীরে জ্ঞান থাকিতে দেখা যায়, কোন কোন শরীরে জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাবই দেখা যায় ; অতএব শবীরের চৈতন্য স্বীকার করিতে হইলে একরূপ বৈষম্যের প্রতি একটা বিশেষ হেতুব নির্দেশ কবিতে হইবে। আবণ্ড দেখ শরীরের গুণ রূপাদি প্রতি শরীরেই ভিন্ন প্রকারে দেখা যায়, এবং শরীরের উপলব্ধির সহিতই তাহাদের উপলব্ধি হয় কিন্তু শবীরের সহিত জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না। ইঞ্জিয়দিগের চৈতন্য নিরাকরণের পক্ষে এই যুক্তি জ্ঞানিবা। মনও আত্মার সহিত ভিন্ন হইতে পারে না, কারণ মন আত্মার অংশাদি অমৃতত্বের কারণ মাত্র, বাহ্য কারণ, তাহা কখন কৰ্ত্তা হইতে পারে না। যেমন রূপাদি জ্ঞান সাধনের সহিত বর্তমান এবং চক্ষুরাদি ইঞ্জিয় তাহার সাধন, সেইরূপ অংশাদি অমৃতত্বেরও একটা সাধন আবশ্যক করে ; মনই তাহাদের সাধন।

হইতে ভিন্নরূপ একটি স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই কল্পনীয়। জীবাশ্মা অনেক এবং প্রতি দেহে ভিন্নস্বরূপ; পবমান্বা একই; তিনিও আবার জীব-সকল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ *। উভয় আত্মাই পরম মতঃ পরিমাণবিশিষ্ট অর্থাৎ বাপক; কিন্তু বুদ্ধি আদি ছয় সংখ্যা আদি পাঁচ, ধর্ম এবং অধর্ম ভাবনা নামক সংস্কার—এই চতুর্দশটি গুণ আত্মাতে বর্তমান, ঈশ্বরে কেবল আটটি গুণ অবস্থান করে সংখ্যা দ্বি পাঁচটি, বুদ্ধি, ইচ্ছা, এবং যত্ন। ঈশ্বরান্বিত বুদ্ধি, ইচ্ছা এবং যত্ন নিত্য এবং সর্ব বিষয় বাপী। ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রতি অমুমান এবং আগম উভয়বিধ প্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে। অমুমানের আকার—ক্ষতি অক্ষুব্ধ প্রভৃতি জগৎস্থি যখন বর্ণি, তখন তাহাদের অবশ্য একজন না একজন কর্তা আছেন, কারণ কার্য মাত্রেবই কর্তা থাকে; জগৎ স্থি কার্যের কর্তা একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই হইতে পাবে না। আগম

“দাবাতুমী জনয়ন্ দেব একঃ”।

মনঃ—স্থাদি জ্ঞানের সাধন। মনের অস্তিত্ব বিষয়ে বৈশেষিকেরা এইরূপ অনুমান করেন যে, আমাদের সকল প্রকার জন্য জ্ঞানবই এক একটা করণ আছে; স্থাদি জ্ঞানও জন্য জ্ঞান, অতএব উহারও একটা না একটা করণ অবশ্য অঙ্গীকার্য; সেই করণকেই মন বলে। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগই বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ; কিন্তু মন পবমাণত্বা অতি ক্ষম; এককালে একেব অতিবিস্তৃত ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইতে পাবে না, এই জন্য এককালে একমাত্র ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানই হয়, কখন দুই ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান এককালে হয় না। মনের অবয়ব বা অংশ নাই এবং প্রতি শরীবে এক একটি স্বতন্ত্র মন অবস্থান করে।

* চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার বলেন—উপাধি ভেদেই আত্মার ভেদ লক্ষিত হয়; বস্তুগত্যা আত্মা একই। যদি বল আত্মা যদি একই, তবে ঐ একই আত্মার স্থখ দুঃখাদি ভিন্নরূপ ভোগ সম্বলিত নানাবিধ দেহে অবস্থান কিরূপে সম্ভবপর? ইহার উত্তরে তর্কালঙ্কার মর্শনয় বলেন, ইহা বড় আশ্চর্য্য নয়; কারণ একই প্রদেশে কাল-ভেদে, এবং একই কালে দেশ ভেদে, মানাক্রপ দেহধারণ করা—আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়।

উচ্ছ্বাস ।

অশান্ত অবোধ মন ! বোঝ অন্ধকাবে বসি,
কত কাল র'বি আঁধার নিরুদ্ভব হইয়া ?
বুকেব ভিতবে তোয়, অন্ধকার স্তরীভূত,
ভইতেছে, — একবার দেখ নিরখিয়া ।
পাপেব সংসার সদা, টলমল কবে পাপে,
প্রাণ ভরি পাপ তুই কেন নিস বুকে ?
অ'পনার মর্শ্ব স্তলে, আপনি বিক্সিয়া ছুরী,
সহিষ্ণুর পরিচয় কেন দ্বিস মুখে ?
জদয়েতে বল নাই, ছবলী হয়েছ বড়
শাস্তিহারা এখন(ই) যে হবি তুই মন ।
নিবাশা বুকেতে বসি দেখাইছে ভয় তোবে,
নিবাশাব ভয়ে তোব অশ্রু ববিষণ ।
কেঁদে কেঁদে কথ মন বিকারে বিহ্বল হবে
যে টুকু চেতনা আছে, হবে বিচেতন ।
তাই বলি এই বেলা স্থির ভাবে বসি ও বে
চেতনা মধুব মূর্তি কর রে স্রবণ ।
'নীরদ বিজলীমাখা আধা বাধা আধা শ্যাম
মাধুর্য্য রসের খনি উজ্জল বদনা"
মন তুই কব বিলোকন ।
জদয়েতে শক্তি হ'বে অন্ধকার পলাইবে,
হরি হরি বলি মন ডাক রে উল্লাসে ।
বিপাবিবে স্বর্গজ্যোতিঃ অন্ধকার পূর্ণ মনে ;
পূর্ণ হবে চিত্ত আহা পাবিভাত বাসে ।

কগাই মাধাই আয় হুই ভাই,
করে করে বাধি হরি গাই,

প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে নাচিয়া নাচিয়া,
নামেব গবিয়া গাহিয়া গাহিয়া,
প্রেমেব মহিমা প্রচার কবিয়া,

মাতোয়াবা করি প্রাণ ।

ছুটে আয় হেথা জগাই মাধাট,
কবতালি দিয়া হরি গুণ গাই,
তোদের সরস কণ্ঠ গীতি হয় !
কবিলে শ্রবণ আবার ধবায়,
জগত মাতাতে আসিবে নিমাই,
এই বেলা আয় সবে মিলে গাট—

পাতকী মোচন গান ;

বাঁহাছিয়া খোল, বল হবি বোল,
নিমাই আসিয়া দিবে সবে কোল ;
কে আছিস আয় উচ্চ কণ্ঠে গাই,
হরি গুণ গান দিবা নিশি ভাই !
ছনয়ন দিয়া প্রেমের নিকর,
কব কর কবি ব'বে নিরন্তর,
হৃদয় অঁধাব পলায়ে যাবে,
নব বল মন আপনি পাবে,

মলয় পবন প্রাণেতে ব'বে ॥

ধব ধব ধব তান

গাও তবে মন গান ।

দুঃখেরই আগার,

তাপিত সংসার,

বাবেক ভুলিয়া যা,

মুখে হরি গুণ গা,

মনে হরি গুণ গা,

মনে প্রাণে আছা এক করিয়া

বল তোরা ঐ বা ॥

প্রিয় মন বে আমার।

ক'বি কত কাল পাগে ডুবে আব ?

কিসের সংসার ? কাহার সংসার ?

পাপের সংসার, পাপের আধার।

থাকিস্ আবদ্ধ কেন ?

কেন বে উন্মাদ হেন ?

নিজের মঙ্গল ব'রেব মনটি, এব বব বিলোকন।

আপন বলিয়ে, যাহাব নিকট

কুতদাস হ'ত চাপ,

(তা'বা) কখনই তোরা আপন হ'বে না

চিবদিন তোব নিকটে ব'বে না

তবে ——— তা'দেব কেন বে চাপ ?

চিবদিন যেই আপন আপন,

তাহাব নিকটে বিকাইতে মন

মন রে আমার ধাঁও।

প্রাণ ভবি সেই দয়াময় নাম

মন বে আমার গাঁও।

স্নায়ু ঘূমায়ে মাঝার স্বপন

দেখিয়ে আব কি কল ?

নীদ পবিহরি মন বে আমার

মুখে হবি নাম বল।

প্রাণের আঁধার দুবে পলাইবে,

হৃদয়ের পাপ টুটিয়া যাইবে,

বাধা শ্যাম নাম কব উচ্চারণ

ওবে বে অবোধ মন !

ঐ ছুটি নাম ভক্তি নিকবে,

স্থাপন করিলে হৃদয়ের পবে.

ছুটি মিলি এক হ'বে।

মনে যদি ভক্তি থাকে তবে বে হৃদয় দিয়া

ভক্তিকামিনীর বেশে ছুটিবে এখন,

মনকদম্বের ঠে মূলে বাধা শ্যাম কুতূহলে

ধীরে ধীরে রুবিবে নর্তন।

কখন বা ক্লান্ত হ'য়ে ভক্তি যমুনার জলে

বাধা শ্যাম ছুই জনে দিবে গো সঁতার।

মনের বাসনা গুলি গোপিকার বেশি ধবি,

সদাই হরষে মাতি করিবে বিহার।

রাধামান কাদম্বিনী মনকুঞ্জ বিতানেতে
 বিষাদে বিথাবি আঁহা পড়িবে যখন,
 শ্যামেব সোহাগ পেয়ে মানমেঘ প্রেমে মিশি
 মনোহর ইন্দ্র ধনু করিবে সৃজন।
 মনেব বিজন বনে নির্গাথ মুবলী ধনি
 'মধুমান' বনি আঁহা উঠিবে বাজিয়া,
 ভকতিব সমুদ্রাণে। অননি উজান বাঁহ
 উনিতে বেগুনা গান আসিবে ছুটিয়া।
 তাজি তগেব আঁশা,
 তাজি সিদ্ধ ভাল বাসা,
 প্রবল হবজ গুলি পুকেতে ধরিয়া।
 লালসা বাসনা নীববে থেক না
 দেশবের নাম গাও।
 কিছুরি অঁচাব ববে না ববে না
 দেশবের গুণ গাও।
 মায়ার শিকল ভেঙ্গে চুরে দেনি,
 বাবেক অবোধ মন।
 ত্রিভঙ্গ মবতি ধ্যান কর ভুই
 কবিয়া কণোব পণ,
 দুমায়ে দুমায়ে মাষাব স্বপন
 দেখিয়া কি আঁচ দণ ?
 নীদ পরিহরি মন বে আমান
 সদা হবিমাম বল।

কঙ্কসু।

আমবা নিয়ত যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেই সকল কার্য্যে, আমবা
 ভাল করিতেছি, কি মন্দ করিতেছি তাহাই অনেক সময় বুঝিতে পারি না।
 আমরা অনেকেই সিদ্ধ তত্ত্ব লুপ্ত হইয়াছি, না করিলে চলে না ; কিন্তু সেই
 কাজটাই যে আমাদের ঠিক কাজ হইতেছে, তাহা আমবা সবল সময়ে
 বুঝিতে পারি না, বুঝ'ন ত দূবে আস্তাং। অনেক সময় অনেকেব মনে এমন
 ধারণা হয়, যে আমবা যদি তত্ত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়া থাকি, তাহা হইলে, আমাদের ভাল হয়।
 প্রত্যহ ধ্বংস করি, তাহা হইলে, আমাদের ভাল হয়।

আমাদের নিজের নিত্যকার্য্যের ভাল মন্দ বিচারে যখন এইরূপ খটকা
 হয়, তখন এক ব্যক্তিব বা ব্যক্তিসমূহেব অস্থিতি কোন একটি নূতন কার্য্যে

যে অন্যান্য বান্ধির নানাকূপ খটকা হইবে, তাহাতে আব বিচিত্র কি ?
কঙ্গ্রেসের মত একটি গুৰুত্ব নতন ব্যাপারে, যে শত্রু মিত্র উভয় পক্ষ
হইতেই নানাকূপ খটকা উঠিতেছে—তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই ।

বাজা প্রজা মধ্যে অস্ত্রের সংঘর্ষ অতি ভয়াবহ ব্যাপার হইলেও, পৃথি-
বীর কুত্ৰাপি ওটি নতন জিনিস নহে । ‘বলং বলং বাহুবলং’ ‘কীরভোগ্যা
বহুজ্ঞা’ ‘জোব জাব, মুলুক তাব,’ এ সকল কথা সকল দেশের রাজা প্রজা
সকল সময়েই জানেন । বিস্ত সাফাং সখকে বাহুবলেব, বা অস্ত্রবলেয়
কোন প্রযোজন না বিবিধা বাজা প্রজা মধ্যে দাবি দাওবাব নিয়ত সংঘর্ষণ
—অতি নতন ব্যাপার, বড় বিচিত্র ব্যাপার ।

আজি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ যুরোপীয় রাজনীতি ক্রমে ক্রমে এই ছাঁচে
গঠিত হইতেছে, রাজনীতি বলিয়া এবটা জিনিস সকল দেশেই ছিল
ও আছে, এহ পঞ্চাশ বৎসর মধ্যেও রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি
প্রজানীতি বলিয়া এটা জিনিস খাড়া হইয়া উঠিতেছে ।

যুরোপীয় রাজনীতিকে ক্রমে বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর করিবার প্রধান যত্ন
এই প্রজানীতি, প্রধান মনোবল এই প্রজানীতি । আজি কালি আয়ল্যাণ্ড
সম্বন্ধে ইংলণ্ডের প্রবল রাজনীতি আয়ল্যাণ্ডের প্রজানৈতিক যত্নে, আর
প্রজানৈতিক মসলায়, ক্রমাগত দিগড় হইতেছে, ভবসা কবা যায় আয়ল-
্যাণ্ড সম্বন্ধে ইংলণ্ডের রাজনীতি আচিবাৎ বিস্তৃততর হইবে ।

ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে টংলওর রাজনীতি, বিয়ংপরিমাণে, অজ্ঞতা-মলে, আর
কিয়ংপরিমাণে ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার জঞ্জালে,—বিষম দৃষ্টিত । এই মল জঞ্জাল
দুবীকরণের জন্য, ভাবতবর্ষে প্রজানীতি সংগঠন ও সংস্থাপন কবা একান্ত
আবশ্যক । যুরোপীয় রাজনীতি সংঘর্ষের এমন কার্য্যকর যন্ত্র, এরূপ
কার্য্যকরী মশলা,—আপ নাই ।

লর্ড লীটন হঠাৎ অস্ট্রেলিয়ার আইন দেশ মধ্যে প্রচ-
লিত কবাত, প্রজার মধ্যে সাহায্য যুরোপীয় রাজনীতির বংকিঞ্চিৎ
শিথিলাভিল, তাহা বা বাবল, বাজার পাছে ভাবতীয় প্রজা একেবাবে নগণ্য
নহে । লর্ড রীণ্ডের সময় ইংলণ্ড নিজের পোষকতার আন্দোলনের অবসরে,
আবার বুধদার প্রজা বা বুধিণ, যে টি রাজ্য জাতি, সহজে ভারতবর্ষের
প্রজাবৃন্দকে আপনাদের সঙ্গে সমান স্বত্ব বা অধিকার প্রদান করিবেন, এমন
আশা কবাট হুল, রাজনীতির সাহিত প্রজানীতির বীতমত নিয়ত সংঘর্ষণ
আবশ্যক । সেই জন্য সূচাকক্ষে প্রজানীতির সংগঠন ও সংস্থাপন আবশ্যক ।

লর্ড রীণ্ডের বিদায় বাণে, ভাবতীয় সমগ্র প্রজা ক্রুদ্ধতা ভরে এক
হৃদয়ে অভ্যুত্থান করিল; বীপণের শত্রুপক্ষ অহুদাব ইংবাজদল চমকিয়া
গেল । সমজুদাব লোকে সেই চমকে বুঝিতে পাবিল,—প্রজার বল বৃদ্ধিতে
পাবিল ; যুরোপীয় প্রথায়, ভাবতে প্রজানীতি সংগঠন বরা সম্ভব, ক্রমে
এই ধারণা হইল ।

লর্ড ডফরীণেব আমলে, সেই প্রজানীতি সংগঠনের চেষ্টা হইতেছে । তাহাবট নাম বঙ্গোপসাগর । ইংলণ্ড বঙ্কু ভারতে প্রচলিত এই প্রবলা প্রথা রাজনীতির পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারে এমন একটি প্রজানীতি গঠিত করা বড় সহজ কথা নহে । সেক্ষণ প্রজানীতি সংস্থাপন কবিবাব উপযুক্ত উদ-
করণ সংগ্রহ হইয়াছে কি না, উপযুক্ত প্রকাশ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে কি না,—এ সকল কথাব নীমাংসা করা ক্ষণে অসম্ভব, এই মাত্র বলিতে পারা যায়, যে যুরোপীয় রাজনীতির সংদর্শিকা কথা প্রজানীতি সংগঠনের চেষ্টা এই কঙ্গ্রেসে হইতেছে ।

দ্বীপ স্থিতিভাবে,—নিবেট, দাত সন্ধিগু, শক্ত সমর্থ, বক্তৃতা অস্থিমত-প্রজানীতি ভারতে সংগঠিত করিতে পারিলে, দ্বীবে দ্বীবে ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের রাজনীতির সংশোধন হইবার সম্ভাবনা—তাহাতে আমাদের মঙ্গল আছে । বৃষ্টিতে পানিলে, তাহাতে ট বেজেবও মঙ্গল আছে । পূর্বেই বলিযাছি, বাহুবলের বা অল্প বলের কোন প্রযোগ না কবিয়া রাজা প্রজা মণে দাবি দাওয়াব সংঘর্ষণ দ্বারা ক্রমে প্রজাব সমুদ্র সংস্থাপন এবং অধিকাৰ বর্দ্ধন—প্রজানীতিব কাথা । একপ প্রজানীতি ভারতে এবাব খাড়া হইয়া দাঁড়াইলে, অল্প বলে বিপ্লবেব সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে । ইংলণ্ডেব পক্ষে সেটি বড় অল্প লাভেব কথা নহে ? ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে ভারতে যদি সংগঠিত প্রজানীতি থাকিত, তাহা হইলে, সেই প্রজানীতিব সাহায্যে সিপাহীবা আপনাদের আবেদন উঠে ইতিয়া কোম্পানীব নবট জ্ঞাপন করিতে পারিত, প্রজানীতিতে রাজনীতিতে বীতিমত সংঘর্ষণ চলিত, বন্ধুকে কামাঙ্গে হত সমর ব্যাধিতে হত না ।

কোন দেশে প্রবলা প্রজানীতি থাকিলেই যে সে দেশে রাজা প্রজায় অল্প বিপ্লব হয় না, তা হইতে নাই, এমন কথা আমবা বলিতেছি না, তবে রক্ষাশ্রমব, সতেজ, সবল, প্রজানীতি থাকিলে, রাজনীতি তাহাকে আদবে সঙ্গিনী কবিয়া লন, তাহাতেই অস্তবল পরীক্ষাব অবসর কমিয়া আসে ।

যে দিক্ দিখাই দেখা যাব, ভারতে প্রজানীতিব সঞ্জন করা যে আবশ্যিক, তাহাতে সন্দেহ নাই । বঙ্গোপসাগর সেই কার্যে ত্রী । সুতরাং কঙ্গ্রেস অতি গুরুতব ব্যাপার ।

১ প্রথমেই বলিযাছি, আমাদের নিজেব নিতা কার্যেব 'ভাল' 'মন্দ' সম্বন্ধে নিজেব মনেই অনেক সময় খটকা উঠে, স্মৃতিবা এমন একটা প্রকাণ্ড কাণ্ডে দুই জন, দশ জন, শত জন, বা সহস্র জন খটকা তুলিলে, তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই । বৎস যত খটকা উঠে ততই ভাল, যদি খাটি সোণা মলা মাটিতে মিশিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা যত পোড়াইবে, ততই নিখাদ হইবে, উজ্জল হইবে, বা মাঝে মাঝে বাতিবে,—ফাটিবে না, চটিবে না ।

সাহায্যে, প্রজানীতিব পরিচর্যায় গাপিত জীবন দাদা ভাই নগোবাজি, যুরোপীয় রাজনীতিব মঙ্গল, বিজ্ঞ বিচক্ষণ রাজা বাজেন্দ্রলাল মিত্র

প্রভৃতি ভাবতীয়া ধুবন্ধগণ যোগ দান কবির ছেন, উদাব রাজপুত্র গণেব
প্ৰতিনিধি আনেন হিউন প্রভৃতি যে কল্পসেব বিবালনে নিয়ত ব্যাপৃত,
সেই কল্প নুকে যে বাণ্যকর ছেলে খেলা মান কবে, সেই বাল্য ছেলেখেলা
হইলে, সব লিপেল প্রফিনেব মত উচ্চগদ্য কৰ্মচারীবা, বিলাতের টাই-
মসেব মত বঙ্গমোষ সবাদ পত্র সবদা.—উদাব উপব জুটুটি কবিবে
কেন ?

কিছু কল্পে স বাল্য চাপলা না হইলেও, নানা ব'বণে বয়সেব বিড়ম্বনা
হইতে পাবে, কিংব গবিনাণে হইতেছে ।

প্রজাব যে টি মন্ম কথা, সেইটি শটবা প্রজানীতি গঠন কবা আবশ্যক,
সেইটি লইবাই প্রজানীতি গঠিত হইতে পাবে। অন্য উপায় অসম্ভব।
ভাবতীয়া প্রজাব মন্ম কথা—তাতাদের দাবিদ্র হুংখ। ইংবাজ শাসনে এই
দাবিদ্র হুংখ দিন দিন বাড়িতেছে। দাফিগাতো দানব মতি পবিগ্রহ কবি-
য়াছে, উত্তর পশ্চিম ফার্মট অধিকার কবিয়াছে, অপর উপব ভু বঙ্গে ক্রমে
ক্রমে বিস্তার রক্তি ববিয়াছে। এই সপব্যাপী সম্প্রদায় দাবিদ্র হুংখকে
জান করিয়া স্তব বাবিত পাইলেন, তবে প্রজানীতিব স্তব বাগবে;,
বাজনীতি বতই কেন ব'বণে হউক না, প্রজানীতিব মন্মের কাদনি স্তব,
তাহাকে বাণ পাতিবা শুনিতে হইবে। ক্রমে সেই মন্ম হুংখ বাজনীতিক
দূর ববিত হইবে।

ইংলণ্ডেব প্রজা চাহিবাছিল,—স্বাধীন বাণিজ্যেব অধিকার, আমেরিকা
প্রজা চাহিবাছিল, স্বাধীন জীবনেব অধিকার; আয়র্লণ্ড চাহিতেছে, স্বাধীন
শাসনেব অধিকার, আমবাও এত সকলেব দেখা দেখি, বলিতেছি আমা-
দিগকে তোমাদের সঙ্গে সমান অধিকার দাও। সিবিল বিচারেব অধিকার
নাও, কোন্সিলে বসিবার অধিকার দাও, মুক্ত বাববার অধিকার দাও—কিছু
এ সকল পবেব স্তবে স্তব লাগান মাত্র, নিজেব কাদনীৰ বাগিনী নহে।

নিজেব প্রাণেব কপাব জ্ঞান বাগাইয়া, বাগিনী ধণিতে না, পাবিলে স্তব
লাগিবেই না। কোন্সিলে প্রতিনিধ প্রণালীতে দেশীয় সদস্য গৃহীত হোক,
জেলাব শাসনকর্তা ও বিচারকর্তা পৃথক পৃথক বাক্তি হউন, উচ্চ উচ্চ গদে
দেশেব যোগ্য বাক্তিদেব গ্রহণ কবা হৌব, বর্ণাশ্রম শিক্ষার্থীদের সুবিধা
কবিয়া দেওয়া হৌক—ইত্যাদি প্রার্থনা প্রজানীতি, স্মৃষ্টন ব্যাপবে অবাস্তব
কথা। ইংলণ্ড কর্তৃক ভারতের উপর নিত্য, নৈমিত্তিক, অনিয়মিত,
নিয়ত ধারা বাহিক শোষণ ক্রমে ক্রমে কমান হৌক ইহাই আমা-
দের মূল প্রার্থনা। এই মূল কথা, স্বাধীনতা, সার্বভৌম, মানদহন্য ভাষায়
কাভব যেটি কর্তৃক নিয়ত নিবেদন কবিত হইবে। ইংবাজ বণিকদের
অস্বাভাবিক বাণিজ্য শোষণে এবং ইংবাজ রাজেব স্বার্থপর সবকারি শোষণে
দিন দিন ভাবভেব বিকল দারিদ্র বুদ্ধি হইতেছে, তাহা দেখিব প্রদেশের,
জেলাব পরগণাব, গ্রাম নগবেব তালিকা দিয়া তন্ন তন্ন বরিয়া বুঝাইয়া দিতে

হইবে। হুর্ভিক্ষ কমিশন এই দাবিজের কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন; হুর্ভাব প্রভৃতি বিচক্ষণ উচ্চ কর্মচারীরা, দাদাভাই প্রভৃতি প্রকৃত দেশভক্তগণ সংখ্যা পৰিমাণাদি দেখাইয়া উত্তর প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এই দারুণ দাবিজ প্রত্যাহ প্রত্যক্ষীভূত হইছে। তথাপি বাঙালক নামে বিবাত কঠোর পুঙ্খবহুদয়ে এ কথা এখনও লাগে নাই। দোটি কাতব কঠে নিযত সন্তুষ্টা ভৈববী রাগিণীতে গন্ধাবের তান লাগাইলে তবে সে হৃদয় গলিবে।

কঙ্কসেব গায়বেবা এখনও গলা সাধিতেছেন, বস্ত্র বাধিতেছেন, সুর মিলাইতেছেন, প্রকৃত গাওনার সময় এখনও হয় নাই—সুতরাং সমালোচনা চলে না। অন্য জ্ঞান, বঙ্কসেব প্রবীণ পঙ্কসেব মধ্যে দুই চারি জন প্রজাব প্রাণেব কথা লইয়া স্তব বাধিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা যে হইতেছে না সেট কেবল অন্যের তামান্যাবদের বিদ্যনায। সর্বত্রই তামাসগীর লোকে সৎ দেখিতে ভাল বাসেন, সুর বৃদ্ধিতে পাবেন না। কাজেই আসবব দেবে, অনেক তলেই স্তব লাগে না, গান জমে না। কঙ্কসেও তাহাই হইতেছে। প্রথম প্রথম সর্বত্রই তাহা হয়, কিন্তু গায়কদের প্রাণেব ভিতর স্তব পাঠিলে, আস হৃদবে অধ্যবসায় থাকিলে, শেষে গান জমিতেই হইবে।

বিগত কঙ্কসেব প্রকৃতি প্রবৃত্তি ও প্রদবণ পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং তামাসগীর ‘প্রতিনিধিগণেব আচরণ সম্বন্ধে, কঙ্কসে উপস্থিত আমাদেব একজন বন্ধু আমাদিগকে যে উহা ন পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এবথানি ব কিয়দংশ এই প্রবন্ধেব উপসংহারকণে এইহলে উদ্ধৃত কদিয়ান।

“বলা বাহুল্য কঙ্কসে আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, দেখাইতে যাই নাই। দেখাইব ন শক্ত আমাব নাই—সুতরাং বলা হইয়াই আমাকে ঐ সংকল্প অবলম্বন বিতে হইয়াছিল। এবং দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া কেবল দেখিতেই ছিলাম। সেই অন্য বন্ধাদের বন্ধুতাব উপব যত না কাণ না দিয়াছিলাম, শ্রোতাদের মুখেব ভাব ভঙ্গিৰ উপব তাহার অধিক দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। হিউম সাহেব বন মুখেব দিকে তখন দিন ক্রমাগতই আমাব দৃষ্টি ছিল। এখানে থাকিতে শুনিয়াছিলাম তিনি নাকি একজন দেবতা, সাক্ষাতে বাহা দেখিলাম, তাহাতে তাহার উপব আমাব ভালবাসাব লাগব হয় নাই কিন্তু ভক্তির উদয় হয় নাই। তিনি ভাপতব্দু মন্দেব নাই কিন্তু তিনি নিস্বার্থ ভাবতবন্ধু নহেন। তিনি স্বজাতিব স্বার্থায়েব স্বদেশপ্রেমী ভাবতবন্ধু। ইহাও সমান্য প্রশংসাব কথা নহে। অল্প আইনেব বিজোলিউসন লইয়া গোলযোগ বাধিবাব সময়, হিউম সাহেবের প্রথম চিন্তাবুল ক্রান্তি, পবে ব্যাকুল ভাব, ক্রমে অস্থির এবং অধৈর্য্য ভাব, অবশেষে তাহাব দৌড়াদৌড়ি পর্যন্ত দেখিয়া এবং অল্প আইন উঠাইবাব প্রত্যবে তাহাব নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া এবং আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যে তাহাব ভাবভঙ্গি দেখিয়া, আমাব বিশ্বাস হইয়াছে হিউম সাহেব নিস্বার্থভাবে কেবল ভারতেরই হিত ইচ্ছা করেন না, স্বজাতিব স্বার্থেব দিকেও তাহার বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। সন্ত-

যত ভাবতেন নব অকুরিত জীবনের সঙ্গে আব তাঁহার স্বভাবের স্বার্থের সঙ্গে একটি গ্রন্থি বন্ধন কবিতা দিবার জন্যই তিনি এত যত্ন কবিতেন। আমার নিকট বোধ হইল ‘কঙ্গেসই’ এই গ্রন্থি বন্ধনের চেষ্টা। উজাত ভাবতেন উপর ব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আপনাকে আশাব মনের কথা বলিতে কি, এট আশাব সঙ্গে সঙ্গে আমার এবটু আশঙ্কাও হইতেছে। এট নুতন ধরণের গ্রন্থিতে উভয় জাতির স্বার্থ এক বজ্রতে বদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে বিলাত ভাবতে “হবিচর” আয়া হইয়া উঠিবে? কি কোন গভীর জল সঞ্চায়ী চতুৰ রাজনৈতিকের কোণে আমাদেব নব অদ্বিত জীবনী শক্তিটি ভাবতেন নবম মুক্তিকা হইতে এই গ্রন্থি টানে উৎপাটিত হইয়া উঠিয়া পড়িবে, কিছুই এখন বুঝিতে পারিতেছি না। প্রথমটি হইলেই ভাল এবং ভবনা কবি হইবেও তাহাই। কিন্তু অস্থির কুটম্বেব মনে ভাল অপেক্ষা মন্দের কথাই সন্দেহ জাগিয়া উঠে। কঙ্গেসে সামাজিক দখাব অনোটনার চেষ্টা যে হইবাছে এবং আগামী বংসবেও আবও যে পলিকাৰকণে হইবে, সেটা আব কিছু নাহ, নদীৰ এবাদকেব শ্রোত থাপ কাটিয়া আব এক দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা মাত্র। “তোনবা কথিবাব্য বব আনবা অন্ন ভোজন করি এবং তেমিবা সমাজ লইয়া থাক আপা সমাজেব মল দেশের শাসনকার্য্য নইয়া খেলা করি।” এট মল মন্দের দাফিত অনেক গুলি রাজনৈতিক পণ্ডিত আছেন। এট শ্রেণীর দুই বটি লোক যে কঙ্গেসে এবাব ছিলেন আমার একপ সন্দেহ হইয়াছিল। হিন্দুবিবাহ আইনের কিছু গনিবত্তনের জন্য কঙ্গেস হইতে গবর্ণমেণ্টে দবখাত কা হউক না বেন, এমন কথাও ববওয়া ভাবে ছুই একজনে উপস্থিত ববিত্তে অগ্রসর হইবাড়গেন। কবেকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তিব অন্ত হুগুগাহেই এবাব এ শ্রেণীর বোন কথা কঙ্গেসে উঠে নাই। কিন্তু আগামী বাবে সামাজিক দখা বঙ্গেসে তুলি-বাব জন্য আবাব চেষ্টা হইবে, কঙ্গেসেব পলিচালনাও ৭৩ দিন একপ চেষ্টা নিবাবণ করিবা ব্যাখ্যাত পাৰিবেন, বলা যায় না। কঙ্গেসেব নাযকদেব মধ্যেও কাহাবও বাহাবও এই চেষ্টা আচ্ছ হইয়া আগো অধিক চিত্তাব কাবণ, কঙ্গেসেব একজন নাবক আমাচে পলিকাৰকণেট বলিলেন “আব কিছু না ইউক সমুদ্রে জাভাজে এত গুলি বাঙ্গাণ আশিল, এটিও বম ঘাভ নহে।”

কঙ্গেসেব স্তায়িত সমুদ্রে পূৰ্ব পান দে অ মার আশঙ্কার কথা লিখি-বাড়িলাম, তাহাব কাবণ এবাব পরিকাব কবিতাই বলিতেছি। প্রথমত যিনি কঙ্গেসেব দ্বাৰ্ত্তী স্বকপ সেই মহাত্মাব বে দিকে লক্ষ্য, নদীৰ শ্রোত তাহার অন্তকুলে কি না জানি না। নানা পদার্থে গঠিত সাতশত সভ্যব নৌকাব ঠিক উপযুক্ত মান্নি তিনি কি না, তাহাও বলা যায় না। তাহাব পব—স্ববেঙ্গ বাবু, নবেঙ্গ বাবু, মি: বন্ধ্যোপাধ্যায় এব এই শ্রেণীর কঙ্গেসব আব আব পলিচালকগণেব এখনই যখন এক এক জনেব এক এক দিকে মতি গতি, তাহাব উপব, ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবাৰ পূৰ্বেই ক্ষমতা পরিচালনেব ইচ্ছার

কতকগুলি লোক এখনই যেকপ গোর উন্নত দেখিলাম, তাহাব উপর কংগ্রেসের কার্যপ্রণালী, যেমন প্রকরণ পদ্ধতি দেখিলাম, তাহাতে কঙ্গ্রেস পার্লি-য়ামেন্টে কপে পাবণত হউক না হউক, বিলাতেব পার্লি-য়ামেন্টেব সভাদেব নাদবানিতে কঙ্গ্রেস শীঘ্রই বোপ হব পবিণত হইবে। এবাব এক-জন সাক্সাজি ব্রদলোব ইনবম টেমব বিকোলিউসানব সময় কিছু বলিবাব জনা প্যাটিফবমে উঠিয়াছিলেন। ভ্রদল বণত তিনি খঞ্জ। প্যাটিফবমে উঠিবাব সময় যখন তিনি থোডাইতে থোডাইতে চলিতে লাগিলেন, তখন চারিদিক হইতে অনেক “ডেংগেট” হাততালি দিয়া উঠিলেন। থিয়াটব যাব আভনেতাদেব কোন ক্রটি হইলে, আট আনা টিকিটেব প্যালাবিব দিক হইতে যেনন হাত-তালি এব হো হো শব্দ উঠিতে থাকে বঙ্গ্রেসে সেই-কপ অতি অভদ্রোচিত বৃংসিত দশ্য দেখিয়া আনি যে কি মন্থাস্তিক যাতনা পাইবাছি, তাহা দেখিতে পাব না। দেশেব প্রতিনিধি হইয়া যাতাবা ভাবতেব অদৃষ্টক ফিবাঈবাব জনা একস্থানে সমবেত হইয়াছেন, তাহাদেব একপ বাল চপলতা দেখিয়া আব বাবব কি বলুন? ফল কথা কঙ্গ্রেসে তামাসা দেখিতেই অবিকাশ লোক গিয়াছিলেন। যাহাবা ক্ষমতাবান, তাহাবা আপনাদেব ক্ষমতা দেখাইতে গিয়াছিলেন, কেহ বেহ এই স্তবিধায় নিজেব সংবাদপত্রেব গ্রাহক বান্ধব চেষ্টাতেও ছিলেন। প্রকৃত দেশহিতৈষী এবং ভাল লোকও ছিলেন। কিন্তু প্রায়ই পণাব শন্য মক্কেল ছান অল্পবাক উকীল এবং সংবাদপত্রেব সংস্কৃতি লোক এবং দুই চারি দশজন আগাব মতন শিক্ষাব বঞ্চিত অগচ “আনো প্রাপ্ত” তকণ দয়ঙ্ক জমীদাব সম্ভান এবং কতকগুলি অপবিচার প্রদেশ চিতৈষী এবং হইয়া—বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণকে কথা বলিতে অবকাশ না দিয়া এব তাহাদেব ভাল কথা উড়াইয়া দিয়া, ভাল বেতাল সকণ সময়ে সমান হাততালি দিয়া, কোন ক্রমে বঙ্গ্রেস বাপাব এবাব সমাধান কবিবাচেন। কঙ্গ্রেস দ্বাবা উপবাব পাইতে ইচ্ছা কবিলে এবং ইচ্ছাকে স্থানী কবিত্তে ইচ্ছা ববিলে ন্যায় কতকগুলি লোককে ইচ্ছার নবো প্রবেশ ববা নিতান্তই আবণ্যক। কার্যেয় লোকেব পবিবর্ধে কেবল বক্তৃতা লোক লইয়া কঙ্গ্রেস গড়িতে চেষ্টা কবিলে, সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে।

নবজীবন ।

৪র্থ ভাগ । { কাল্কিন ১২৯৪ । { ৮ম সংখ্যা ।

নৈশেষিক দর্শন ।

১ ।

গুণ । রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপবত্ব, ত্রুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ এবং বেগ এই দশটি কেবল মাত্র পদার্থের অর্থাৎ আকার বিশিষ্টেবই গুণ ; বুদ্ধি আদি ছয়টি গুণ, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা এবং শক্তি—এই দশটি কেবল অনূর্ত পদার্থের অর্থাৎ নিবাক্যবের গুণ ; সংখ্যা আদি পাঁচটি গুণ, মূর্ত এবং অমূর্ত এই উভয়েতেই বিদ্যমান হয় । রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ, বুদ্ধি আদি ছয়টি গুণ, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা এবং শক্তি ইহা বিবেচ্য গুণ অর্থাৎ কোন এক বিশেষ বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; সংখ্যা আদি সাতটি গুণ, নৈমিত্তিক দ্রবত্ব, গুরুত্ব, এবং বেগ ইহা সাধারণ গুণ অর্থাৎ কোন এক নির্দিষ্ট বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে না । সংখ্যা আদি সাতটি গুণ, দ্রবত্ব, স্নেহ, এবং বেগ ইহা দুইটি ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারে, রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শক্তি ইহা কেবল এক একটি বাহ্যিক দ্বারা অনুভূত হয় । সংযোগ, বিভাগ এবং বেগ ইহা ত্রিবিধ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে কণ্ঠ্য গুণ বলে ।

রূপ—একটি গুণ, কেবল দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় । জগদীশ তর্কালঙ্কার বলেন শুক্ল, নীল, রক্ত, পীত, হবিত, কপিশ, চিত্র—এই সাত প্রকার রূপ আছে । বিশ্বনাথ বলেন রূপ অনেক প্রকার । রূপ সচরাচর

বর্ণ বলিয়াই প্রসিদ্ধ । পৃথিবী, জল, তেজঃ এই তিনটি মাত্র দ্রব্যেই রূপ থাকে ; পৃথিবীতে সকল প্রকার রূপই থাকে, জলে গুরু, এবং তেজে ভাস্কর গুরু । রূপ সকল আবার দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, প্রথম উদ্ভূত, দ্বিতীয় অনুদ্ভূত । শাস্ত্রকারেরা উদ্ভূত এবং অনুদ্ভূতের কোন বিশেষ লক্ষণ কবেন নাই, কেবল স্বরূপ মাত্র দেখাইয়াছেন । তাহারা বলেন ভাঙ্গা খোলাব আগুণ, গ্রীষ্মের উষ্ণ এবং চক্ষুঃ অর্থাৎ দৃষ্টির তেজ প্রভৃতির রূপ অনুদ্ভূত, এবং ঘট, পট প্রভৃতির রূপ উদ্ভূত ।

বস—ইহা বসনা অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা অনুভূত হয় । বস—বসায়, মধুব, লবণ, কটু, তিক্ত, এবং অন্ন এই ছয় প্রকার । বস পৃথিবী ও জল এই দুইটি মাত্র দ্রব্যেরই গুণ । জলে এক মাত্র মধুব বস অবস্থান করে, হবিতকী প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণে জিহ্বার দোষ কাটাইয়া জল পান করিলে ইহা ঠিক অনুভূত করা যায় । বসও উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত এই দুই প্রকার, তাহান্ন মণ্ডে অনুদ্ভূত বস অতীন্দ্রিয় ।

গন্ধ—ইহা ভ্রাণেন্দ্রিয় অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা অনুভূত হয় । গন্ধ দুই প্রকার সুবন্ধি এবং অসুবন্ধি ইহা কেবল পৃথিবীরই গুণ । পাষণাদিগের গন্ধ স্কুৎ-কট বলিয়া অতীন্দ্রিয়, অনুভূত হয় না । গন্ধ অনিত্য ।

স্পর্শ—ইহা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় । স্পর্শ তিন প্রকার—শীত, উষ্ণ, এবং অনুষঙ্গ অশীত । ইহা পৃথিবী জল, তেজঃ, এবং বায়ু, এই চারি দ্রব্যেই অবস্থান করে । তন্মধ্যে শীত স্পর্শ জলে, উষ্ণ স্পর্শ তেজে এবং অনুষঙ্গ অশীত-স্পর্শ পৃথিবী এবং বায়ু এই উভয়েই বর্তমান । এই স্পর্শ আবার দুই প্রকার—পাকজ এবং অপাকজ ; তাহাব মধ্যে পৃথিবীতে পাকজ এবং বায়ুতে অপাকজ অর্থাৎ একরূপ বিজাতীয় স্পর্শ অবস্থান করে * । পৃথিবী, জল, তেজঃ এবং বায়ু

● পাক দুই প্রকার পীলুপাক এবং পিঠবপাক । বৈশেষিকেরা পীলুপাক বাদী এবং নৈয়ায়িকেরা পিঠব পাকবাদী । পীলুপাকবাদীদিগের মতে কোন একটা বস্তু, মনে কব মাটির ঘড়া, বা ইট (যাহাব পাক আবশ্যক) প্রস্তুত করিয়া অগ্নি সংযোগ করিলে, আগুনের উত্তাপে ঐ বস্তুটি প্রথমে একেবারে শিথিল হয়, কাজেই উহাব পরমাণু গুলি পৃথক পৃথক হইয়া পক্ষ হয়, সেই ধারাবাহী আগুনের উত্তাপেই আবার ঐ পক্ষ পরমাণু গুলি একে একে সংযুক্ত হইয়া যথাক্রমে দ্ব্যণুকাদিক্রমে পরিণত হওত পুনর্বার যেকণ

পরমাণুতে যে স্পর্শ থাকে তাহা নিত্য ; তন্নিম্ন সমুদয় স্পর্শই অনিত্য । পৃথিবীতে কঠিন এবং কোমল এই উভয়বিধ স্পর্শই অনুভূত হয় ।

সংখ্যা—ইহা গণনা ব্যবহারের প্রতি হেতু । যে নয় প্রকার দ্রব্য উক্ত হইয়াছে, তাহাদেব সকলেই সংখ্যা থাকে । সমুদয় সংখ্যার মধ্যে একত্ব কেবল দুই প্রকার—নিত্য এবং অনিত্য , নিত্য বস্তুগত একত্ব নিত্য এবং অনিত্য বস্তুগত একত্ব অনিত্য । দ্বিত্ব হইতে পদার্থ পর্য্যন্ত সমুদয় সংখ্যা, অপেক্ষা বৃদ্ধি জন্ম । স্তত্রাং অপেক্ষা বৃদ্ধি নাশেব সহিত ইহাদেবও নাশ হয় । অপেক্ষা বৃদ্ধি বলিতে এই এক, এই এক, কথিয়া একেবাবে যে অনেক একত্বেব জ্ঞান । এত অপেক্ষা বৃদ্ধি ক্ষণত্রয় মাত্র অবস্থান করে । *

পরিমাণ—মান ব্যবহারের প্রতি হেতু । ইহাও সমুদয় দ্রব্যে বর্তমান এবং নিত্য অনিত্য দুই প্রকার , নিত্য দ্রব্যাবৃত্তি পরিমাণ নিত্য, অনিত্য

বস্তু ছিল, সেইরূপ আকাবের একটি পক্ষ বস্তু প্রস্তুত হয় । বক্ষিব বেগবশত পবমাণুদিগেব ত্রৈকপ বিশেষ এবং পুনঃ সংযোগ এত শীঘ্র সম্পাদিত হয়, যে আমবা কিছুই অনুভব কবিতে পাবি না । এইরূপ পবমাণুতে পাকেব নাম পীলুণাক । পিঠবপাষবাণীদিগেব মতে পার্থিব বস্তুমাত্রেই সচ্ছিদ্র (Porous) স্তত্রাং কোন পার্থিব পাত্রকে অগ্নিসংস্কৃত বসিলে অগ্নিব স্ফুল্গ স্ফুল্গ অবযব গুলি ঐ সকল ছিদ্রেব মধ্য দিয়া বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উত্থাকে ভিতব বাহিব উভয় দিকেই পক্ষ কবে, অবযবেব আব বিশেষ আবশ্যক কবে না । পাক হইতে বাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে পাবজ বলে । বাহা আপনা হইতে উৎপন্ন, তাহা অপাকজ ; অপাকজবে স্বাভাবিক বলা যায় ।

* তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন “ সংখ্যাঃ খল্পপি উৎপত্তেঃ প্রভৃত্যা বিনাশ মনুবর্তন্তে । ” ইহাব অর্থ সংখ্যাসকল উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত স্থিত হয় । কাব উৎপত্তিব সহিত কাব বিনাশ পর্য্যন্ত স্থিত হব, একথা আমবা ভাল কবে বুঝিতে পারিলাম না । যদি সংখ্যেয় পদার্থেব উৎপত্তি হইতে তাহাব বিনাশ পর্য্যন্ত স্থিত হয়,—এইরূপ তাৎপর্য্য হব, তাহলে আমাদেব একটা ত্রিভাষ্য এই যে সংখ্যেয় পদার্থগুলিত এক এক কথিয়া উৎপন্ন হব স্তত্রাং সংখ্যেয়েব উৎপত্তিব সহিত কেবল একত্ব সংখ্যাবট সম্বন্ধ, অন্য সংখ্যাব নয় । এবং ইহাব পব “ প্রত্যক্ষণস্য দ্বয়োবিভিন্য সন্নিবন্ধীহপ জায়তে । ” এই অস্য পদেব উচ্চেষ্য কি, তাহাও আমবা বুঝিতে পাবিলাম না ।

দ্রব্য বৃত্তি পরিমাণ অনিত্য। পরিমাণ সামান্যত চারি প্রকার—অণু (ক্ষুদ্র) মহৎ (বড়), দীর্ঘ (লম্বা), হৃদয় (খাট)। সংখ্যা জন্য, পরিমাণ জন্য এবং সমূহ জন্য পরিমাণ অনিত্য। আশ্রয়েব নাশই পরিমাণ নাশের কারণ। পরিমাণ সত্ত্বাভীয়া উৎকৃষ্ট পদিনাশের কারণ হইবে। এই জন্য দ্ব্যর্থকের পরিমাণ কাছাকাছি কাছাকাছি নয়। উহা নিজে অতি ক্ষুদ্র, উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর পরিমাণ আর হইতে পারে না।

পৃথকত্ব—যে গুণ থাকিতে অন্তর বস্তু অন্তর বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়, তাহার নাম পৃথকত্ব। এই পৃথকত্বও সমদয় দ্রব্যে অবস্থান ববে। ইহাও পৃথকত্ব নিত্য ও অনিত্য দুই প্রকার। অনিত্য পৃথকত্ব আশ্রয় নাশে বিনষ্ট হয়। এক হইতে পৃথক, অন্য হইতে পৃথক। এষ্টরূপে অনেক প্রকার পৃথকত্ব হইতে পারে। উহাদের মধ্যে দ্বিপৃথকত্বাদি অপেক্ষা বুদ্ধি জন্য এবং অপেক্ষাবুদ্ধির নাশাদীন উহাদের বিনাশ হয়।

সংযোগ। বিভিন্ন বস্তুর মেলনৈব নাম সংযোগ, ইহা সকল দ্রব্যেই থাকে। সংযোগ তিন প্রকার—এক বস্তুজ, উভয় কক্ষজ এবং সংযোগজ। ক্রিয়া জন্য সংযোগ দুই প্রকার প্রথম অভিব্যক্তি, দ্বিতীয় নোদন। যেকোন সংযোগ হইলে শব্দ উৎপত্তি হয় তাহার নাম অভিব্যক্তি। শব্দ না হইলে, নোদন।

বিভাগ—এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর ছাড়া থাকাকে বিভাগ বলে, ইহা সংযোগের ঠিক উল্টা। সংযোগের ন্যায় বিভাগও নয়টি দ্রব্যে অবস্থিত হয় এবং তিন প্রকার। এক প্রকার ক্রিয়া জন্য, উভয় ক্রিয়াজন্য এবং বিভাগ জন্য।

পবত্ব ও অপবত্ব দুই প্রকার—প্রথম দৈশিক, দ্বিতীয় কালিক। দৈশিক পবত্বকে দূবত্ব এবং অপবত্বকে নিকট বলা যায়। কালিক পবত্বকে জ্যোতিষ এবং অপবত্বকে কনিষ্ঠত্ব বলা যায়। এষ্ট উভয় বিধ পবত্ব, অপবত্বই ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু এবং মনতে বর্তমান হয়। বৈশেষিকদিগের মতে দৈশিক পবত্ব বা দূবত্বের প্রতি অধিক সূক্ষ্ম সংযোগ এবং অপবত্ব বা কনিষ্ঠত্বের প্রতি অল্প সূক্ষ্ম সংযোগ কার্যকর এবং কালিক পবত্ব বা জ্যোতিষের প্রতি অধিক সূক্ষ্ম গতি এবং অপবত্ব বা কনিষ্ঠত্বের প্রতি অল্প সূক্ষ্ম গতি কার্যকর।

বুদ্ধি। বৈশেষিকদিগের মতে বুদ্ধি প্রথমত দ্বিবিধ অনুভূতি এবং স্মৃতি। ইহাদের মধ্যে অনুভূতি আবার দুই প্রকার প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। ইন্দ্রিয়

জ্ঞান জ্ঞানেব নাম প্রত্যক্ষ । ইন্দ্রিয় ছয় প্রকার, নাসিকা, শ্রীক্সা, চক্ষু, শ্রুত্, কর্ণ, এবং মন ; এই নিমিত্ত স্নাগজ্ঞ, বাসন বা স্বাদ, চাক্ষু্য, স্পর্শন, শ্রাবণ এবং মানস এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ । তাহাব মধ্যে চাক্ষু্য ও স্পর্শন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কিছু বণা আবশ্যক । চাক্ষু্য প্রত্যক্ষের প্রতি জ্ঞেয় বস্তুতে উদ্ভূত রূপ এবং তাহাব সহিত আলোক সংযোগ হওয়া আবশ্যক । বস্তুব সহিত তাহাব সংখ্যা পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, পবত্, অপবত্, স্নেহ, বেগ, দ্রবত্ব, ক্রিয়া এবং জাতি ইহা দিগেবও চাক্ষু্য প্রত্যক্ষ হয় । ত্রিগিন্দ্রিয়দাবা যে জ্ঞান হয়, তাহাব নাম স্পর্শন প্রত্যক্ষ । বস্তুব জাতিবও স্পর্শন প্রত্যক্ষ হয় । সংখ্যা, পরিমাণ পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, পবত্, অপবত্, স্নেহ, বেগ, দ্রবত্ব এবং ক্রিয়া ইহাদেবও স্পর্শন প্রত্যক্ষ হয় । মনেব দ্বাবা যে জ্ঞান হয় তাহাব নাম মানস প্রত্যক্ষ, সুপ, দুঃপ, ইচ্ছা, দেব, শ্রয়ত্ব এবং বিশেষ গুণযুক্ত আয়ার ও মানস প্রত্যক্ষ হয় । * যে বস্তু যে ইন্দ্রিয় দ্বাবা জ্ঞেয়, সেই বস্তুব অভাবও সেই ইন্দ্রিয় দ্বাবা জ্ঞেয় । সকল প্রকার প্রত্যক্ষের প্রতি জ্ঞেয় বস্তুব পরিমাণেব মহত্ব থাকা আবশ্যক, এই নিমিত্ত পবমাণ, দ্ব্যণুক এবং তাহাদেব গুণেব প্রত্যক্ষ হয় না । জ্ঞেয় বস্তুব সহিত ইন্দ্রিয় সঙ্গিকর্ষই প্রত্যক্ষের নিম্পাদক, বৈশেষিকেরা উহাকে ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করেন । প্রত্যক্ষ আবাব লৌকিক এবং অলৌকিক ভেদে দুই প্রকার । লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় বলা হইল, ঠিক্ পীতিনত ইন্দ্রিয় সঙ্গিকর্ষ না হইয়া যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাব নাম অলৌকিক প্রত্যক্ষ । এই অপৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি তিন প্রকার অলৌকিক সঙ্গিকর্ষ কাবণ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে, সামান্য লক্ষণ, জ্ঞান লক্ষণ এবং যোগজ । সামান্য-লক্ষণ সঙ্গিবর্ষ দ্বাবা জাতিব জ্ঞানে তজ্জাতীয় নিখিল বস্তুব জ্ঞান হয় ; বজ্জু দেখিয়া সর্পজ্ঞান, বা ঝিহুক দেখিয়া ক্ষপাব জ্ঞান, এইরূপ প্রকার জ্ঞান সকল জ্ঞান লক্ষণ সঙ্গিবর্ষ দ্বাবা উৎপন্ন এবং যোগীদিগেব জ্ঞানেব প্রতি যোগজ সঙ্গিকর্ষ কাবণ ।

ব্যাপ্তি জন্য জ্ঞানেব নাম অমুমিতি বা অনুমান, বৈশেষিকেরা অনুমানকে তিন প্রকারে বিভক্ত কবিয়াছেন যথা পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতো

* তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন আত্মাব একেবাবেই প্রত্যক্ষ হয় না । আমি জানিতেছি এইরূপ জ্ঞান—ভ্রমমাত্র ।

দৃষ্ট । কাবণ দেখিয়া কার্য্যেব অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ, যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টিব অনুমান । কার্য্য দেখিয়া কাবণের অনুমানকে শেষবৎ বলে ; যেমন প্রাতঃকালে উঠে থানা ডোবা জুড়ে পবিপূর্ণ দেখিয়া, বাত্রে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুমান । এই দুই প্রকারেব অতিবিক্ত অনুমানকে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলে , এক স্থানে এক প্রকার কার্য্য কাবণ ভাব দেখিয়া তজ্জাতীয় আব এবাট স্থলেও সেইরূপ কার্য্য কাবণ ভাব বল্লনাব নাম সামান্যতো দৃষ্ট । অনুমানের আবতিন প্রকার ভেদ আছে (১) কেবলান্বয়ী (২) কেবল বাতিবেকী এবং (৩) অনন্বয়-বাতিবেকী । সকল স্থলেই আছে বলিয়া বিচার্য্য স্থলেও অবশ্য আছে, একপ অনুমান কেবলান্বয়ী । কেবল মাত্র বিচার্য্য স্থলই থাকিতে পারে অনান্য পাবে না—এইরূপ সাধ্যব অনুমান বাতিবেকী , বিচার্য্যস্থলে, থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পাবে, এই এই কাবণে বিচার্য্য স্থলে আছে , একপ অনুমান অনন্বয়-বাতিবেকী । ‘পর্য্যতো বন্ধিমান’ এইরূপ অনুমান মূলক । সাধাবণত অনুমান পঞ্চ অবয়ব বিশিষ্ট । সেই পঞ্চ অবয়ব—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন ; প্রতিজ্ঞা—পর্য্যতে আগুন আছে, হেতু—ধূমাং, পদ আছে বলিয়া, উদাহরণ—যেখ নে আগুন থাকে সেই থানেই পদ থাকে, নিগমন—এখানে আগুনের সঙ্গিত একত্রপায়ী পদ আছে, উপনয়—অন্তএব এখানে আগুন আছে ।

বৈশেষিকেবা উপমান এবং শব্দ এই উভয়কে অনুমানের অন্তর্গত কবিষাছেন ।

পূর্ব্বানুভব জন্য সংসারাদীন যে জ্ঞান হয়, তাহাব নাম স্মৃতি । জ্ঞান মাত্রেব প্রতি মনের সহিত স্বাকব যোগ হেতু । সমুদয় জ্ঞানই দুই প্রকার—প্রমা যথার্থ জ্ঞান, অপ্রমা মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রম । ভ্রম আবাব দুই প্রকার সংশয় এবং বিপর্য্যয় ।

স্মৃথ—সকলের বাঞ্ছনীয় , দুই প্রকার—ঐহিক এবং পাবত্রিক ।

দুঃখ—বাহা কেহই চাহে না, এবং অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় ।

ইচ্ছা—দুই প্রকার—ফলেচ্ছা এবং উপায়েচ্ছা । ফল বলিতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—স্মৃথ বা দুঃখ নিবৃত্তি , উপায় বলিতে—ঐ ফল লাভেব সাধন ।

দ্বेष—কোন বস্তু হইতে অস্বরাগের নিবৃত্তিব নাম দ্বেষ ।

প্রযত্ন—চেষ্টা, ইহা তিন প্রকার—প্ররতি, নিবৃত্তি এবং জীব, যোনি ।

প্রযুক্তি এবং নিবৃত্তি যে কি, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে। করিতে ইচ্ছা, নিজেব সামর্থ্য লাভবোধ এবং কবিবাব উপকরণ, ইচ্ছা প্রযুক্তিব কারণ, নিবৃত্তিব, কাবণ দ্বেষ বা অল্পশকাব বোধ। আমাদেব স্বাস প্রাসাসেব পত্নকে জীব যোনি বত্ন বলে।

গুরুত্ব—বস্তুব ভাবেব নাম গুরুত্ব। ইহা পৃথিবী, এবং জলে অবস্থান করে ও অতীন্দ্রিয়।

দ্রবত্ব—যে গুণ থাকিলে বস্তু গলে যায় তাহাব নাম দ্রবত্ব। দ্রবত্ব দুই প্রকাব সাংসিদ্ধিক এবং নৈমিত্তিক। যাহা স্বভাবতই বর্তমান তাহাব নাম সাংসিদ্ধিক, যাহা কোন কাবণ বশত উৎপন্ন হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক। জলে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব এবং দ্ব্যাদিতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে। দ্রবত্ব পৃথিবী জল এবং তেজ এই তিনেতে বর্তমান। জলেব পবমাণ্ডতে যে দ্রবত্ব আছে, উহা নিত্য।

স্নেহ—কেবল জলেবই গুণ। জলেব পবমাণ্ডত যে স্নেহ আছে তাহা নিত্য এবং তন্নিম্ন স্থলে অনিত্য। তকালঙ্কাব মহাশয় বলেন এই স্নেহ পদার্থ দ্বাবাই গুঁড়া বস্তু একত্ৰ করিবা বটিকা বা তাল কবা হয়।

সংস্কার তিন প্রকাব বেগ স্থিতিস্থাপক এবং ভাবনা। উহাদেব মধ্যে বেগ—পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ুতে বর্তমান; স্থিতি স্থাপক কেবল পৃথিবীতে এবং সংস্কার কেবল জীবাশ্মায় বর্তমান। যে গুণ থাকিলে আকর্ষণ দ্বাবা বস্তুব বৃদ্ধি হয় এবং আকর্ষণ ছাড়িয়া দিলে পুনর্বার আপনাব স্বাভাবিক আকাব প্রাপ্ত হয় তাহাব নাম স্থিতি স্থাপক সংস্কার, ভাবনা একটি গুণ যাহা থাকিলে স্মৃতিব উৎপত্তি হয়।

ধর্ম—পুণ্য। অধর্ম—পাপ; ইহাবা জীবাশ্মাব গুণ।

শব্দ—শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বাবা বাহ্যর অন্তর্ভব কবা হয়, তাহাব নাম শব্দ। ইহা দুই প্রকাব প্রথম ধ্বনি, দ্বিতীয় বর্ণ। মৃদঙ্গাদিব শব্দেব নাম ধ্বনি, এবং কণ্ঠতালু প্রভৃতি আস্যেব অভ্যন্তর স্থান হইতে উৎপন্ন শব্দেব নাম বর্ণ। শব্দ সকল আমাদেব বর্ণেব ভিতর আসিয়া উৎপন্ন হইলেই উহা আমাদেব প্রত্যক্ষেব বিষয় হয়। বৈশেষিকগণ এই বর্ণেব ভিতর শব্দেব উৎপত্তিব প্রতি দুই প্রকাব রীতিব নির্দেশ কবিয়াছেন, প্রথম বীচি তরঙ্গ নাম, দ্বিতীয় কদম্ব গোলক ন্যায়। যেমন কোন জলাশয়েব মধ্যে ঢিল ফেলিলে, যেখানে ঐ ঢিল পড়ে সেই স্থলে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তাকাব তরঙ্গ উৎপন্ন

হয়, তাহার পর ঐ বৃত্ত ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া তীরে আসিয়া সংলগ্ন হয়। সেইরূপ কোন প্রদেশে অভিঘাত দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হইয়া উহা ঐরূপ বৃত্তাকারে ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া দশদিকে ছড়িয়া পড়ে; আমাদের কাণেব ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ প্রক্রিয়াকে বীচি তবক্ষন্যায় বলে। দ্বিতীয় মতে অভিঘাত মাত্রেই দশ দিকে দশটি শব্দ উৎপন্ন হয় এবং সেই দশটা শব্দ হইতে আব দশ দশটা শব্দ উৎপন্ন এইরূপ ক্রমে শব্দ উৎপন্ন হইতে হইতে ক্রমে কর্ণবিবরে আসিয়া উৎপন্ন হয়। এইরূপ শব্দোৎপত্তি স্খীতিব নাম কদম্বগোলক ন্যায়। বৈশেষিকদিগেব মতে শব্দ অনিত্য; কাবণ আমবা এই শব্দ উৎপন্ন হইল এই শব্দ বিনষ্ট হইল, একরূপ ব্যবহাৰ কৰি।

কৰ্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, এবং সমবায় ইহাদেব বিষয় পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই উহাদেব বিষয় এক প্রকাব মোটামুটি জ্ঞান হইতে পাবে। এক্ষণে সপ্তম পদার্থ অভাবেব বিষয় কিছু বর্ণনা আবশ্যক। কোন বস্তুর না থাকাব নামই অভাব। অভ বচন প্রকাব, প্রাণভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব এবং অন্যান্যভাব। কোন বস্তুর উৎপত্তিব পক্ষে যে সেই বস্তুর না থাবা তাহার নাম প্রাণভাব, ধ্বংস বলিতে নাশ, বস্তু বিনষ্ট হইলে তাহাব যে না থাকা, তাহার নাম ধ্বংসাভাব। অত্যন্তাভাব বলিতে কোন বস্তুব ভূত, ভবিষ্যত এবং বর্তমান এই তিন ক লেই না থাকা। এই তিন প্রকাব অভাব সংসর্গাভাব নামে অহিত হয়। ভেদ ও অন্যান্যভাব—একই পদার্থ।

বৈশেষিকোক্ত পদার্থ গুলি উক্ত হইল। এক্ষণে সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য। সাধর্ম্ম্য বলিতে একরূপ ধর্ম্মেব আগ্রহতা। বৈশেষিকোক্ত ষট্ পদার্থেব সাধর্ম্ম্য এই কয়টি—অস্তিত্ব অতিদেয়ত্ব, বাচ্যত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব। আশ্রিতত্ব নামক একটি ধর্ম্ম নিত্য দ্রব্য ভিন্ন অপব বস্তুতে বর্তমান হয়। দ্রব্য ভিন্ন সমস্ত নিষ্ঠুর এবং ক্রিয়াশূন্য, এই জন্য নিষ্ঠুর এবং নিষ্ক্রিয়ত্ব উহাদেব সাধর্ম্ম্য। যে যাহার সাধর্ম্ম্য, উহা তাহাব বিপবীতেব বিধর্ম্ম্য।

এই সকল পদার্থ বিস্তৃতরূপে বৈশেষিক দর্শনে উক্ত হইয়াছে। আমবা পূর্বেই বলিয়াছি বৈশেষিক সূত্র দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। উহাব মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে সমুদয় পদার্থেব সামান্যরূপে নির্দেশ বনা হইয়াছে; দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্রব্যেব নিরূপণ; তৃতীয়াধ্যায়ে আত্মা ও অন্তঃকবণেব লক্ষণ, চতুর্থাধ্যায়ে শরীর এবং তাহাব উপযোগী বস্তুর নির্দেশ, পঞ্চমাধ্যায়ে কৰ্ম্ম নিরূপণ; ষষ্ঠাধ্যায়ে বাজিক কৰ্ম্মেব আলোচনা; সপ্তমাধ্যায়ে গুণ এবং সমবায়

সহকের প্রতিপাদন, অষ্টমাধ্যায়ে জ্ঞানের উৎপত্তি ও তার নিদানাদি নিরূপণ, নবম অধ্যায়ে বুদ্ধি বিশেষে প্রতিপাদন, দশম অধ্যায়ে আত্মা ও গুণগুলির আলোচনা। জরনাবারণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিয়াছেন যদিও এই শাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে পদার্থসমূহের নির্ণয়ই করা হইয়াছে, তথাপি ঐরূপ নির্ণয় মোক্ষের সাক্ষাৎ কাবণ তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যে সংসাধিত হওয়ায়, এই শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্যে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। এটি নিমিত্তই হুত্রকার প্রথমেই “অথাতো ধর্মং বাধ্যাস্যামঃ” এই হুত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ধর্ম বলিতে এখানে নিবৃত্তিকর ধর্মই বলিতে হইবে। কাবণ বস্তুর সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান হইলে, কোন বস্তু কিরূপ তাহা ঠিকঠিক জানিতে পারিলে, আমাদের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়, জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির সঙ্গিত আমাদের আকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্তি হয়, সেই সময়ে ছুঃখেরও নিবৃত্তি হয় মন সন্তোষ অমুভব করত স্থিতি-ভাব ধারণ করে। বৈশেষিকেরা বলেন ঐরূপ ছুঃখনিবৃত্তির নামই মোক্ষ। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন, তত্ত্বজ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয়, এই মিথ্যাজ্ঞানের নাশই মোক্ষ প্রাপ্তির প্রতি হেতু। কাবণ জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান, ঐ তত্ত্বজ্ঞান হইলে পুরুষ আর সংসারে আবদ্ধ থাকে না, মুক্তিলাভ করে।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষ্যে বৈশেষিকদিগের পূর্ব প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ অনেক কথাই আছে। তাহাব মধ্যে আগবা এদটি প্রধানের মাত্র উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। বৈশেষিকদিগের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। উভয়েবই কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই পদার্থ, যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্রিক উৎপন্ন হয়, সমুদ্রে জল বৃন্দুদ তয়, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে জীবাত্মাসকল উৎপন্ন হইয়া যে পর্য্যন্ত মোক্ষ লাভ না হয়, সেই পর্য্যন্ত জন্ম মৃত্যু ধাবাবাহী সংসারে পতিত হইয়া পৃথক ভাবে অবস্থান করে, মোক্ষ লাভ হইলে যেমন পুষ্প রস সমুদয় মধুরসহিত মিশিয়া যায়, নদীসকল সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়া যায় এবং ঘটাকাশাদি ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশে মিলিয়া যায়, সেইরূপ জীবাত্মাও পরমাত্মায় মিলিত হইয়া একভাবে অবস্থান করে তখন আর ভিন্নভাবে প্রকাশ পায় না। এইরূপ একটা ভাবেই পরম মোক্ষ বলে। অত্যা স্বভাবত নিশ্চয়।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষ্যে এরূপ অনেক নূতন কথা আছে । বিস্তার ভয়ে সেগুলি এখানে সমালোচিত হইল না ।

হিন্দুর নবজীবন ।

সনাতন ধর্মই (সর্বশক্তিমান্ এক ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ) অলৌকিক হিন্দু ধর্ম । দেবতা বা ঋষি প্রোক্ত উপায়ে জীবাত্মাব মোক্ষ বিধান এই অলৌকিক ধর্মের চরমোদ্দেশ্য । এই অলৌকিক ধর্মের অন্তর্গত সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয় ভূষিত চারিবিবর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র । এই চতুর্কর্ণের অলৌকিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক—ধর্মতাব যে সকল গ্রন্থে বিবৃত আছে, সেই সকল গ্রন্থকে হিন্দুশাস্ত্র বলে । এই হিন্দুশাস্ত্রের উপদেষ্টা প্রথা নত ব্রাহ্মণগণ । ব্রাহ্মণ হিন্দুর মন্তক, ক্ষত্রিয় বাহুবল, বৈশ্য উদর এবং শূদ্র পদবয় । কাল সাক্ষী আছেন, এক সময়ে এক্ষণকার এই প্রাচীন হিন্দু, শূদ্র রূপে দৃঢ়াধ্যবসায়, ব্রাহ্মণরূপে মস্তিষ্কের প্রতিভাব, ক্ষত্রিয়রূপ ত্রিলোক-বিজয়ী বাহুবলে, এবং বৈশ্যরূপে অতুল বিভবের উত্তরাধিকারী হইয়া, কত মহাযুগ ধরিয়া এক-ছত্ররূপে সমাগবা ধবাব বরণীয় পতি ছিলেন । এক্ষণে হিন্দুর যোব স্তম্ভাবস্থা । হিন্দুর মস্তিষ্ক শুষ্ক হইয়াছে—বাহতে বল নাই—উদরে অন্ন নাই এবং গমনশক্তি বহিত হইয়াছে । এক্ষণে ব্রাহ্মণ মূর্খ, ক্ষত্রিয় ভীক, বৈশ্য অলস এবং শূদ্র অবাধা হইয়াছে । কে জানে আবার কত দিনে হিন্দুর অভ্যুদয় হইবে ! বর্ণগত বৈচিত্র্যতা আবাব আদৃত হইবে । ব্রাহ্মণ তত্ত্ব কথায়, ক্ষত্রিয় বাজ্যপালনে, বৈশ্য বাণিজ্যে এবং শূদ্র আশ্রমী সেবার মনোনিবেশ করিবে ! হিন্দু, নিবাস হইও না । যে কাণবশে তুমি পৃথিবীর শীর্ষ স্থানে থাকিয়া অধঃপতিত হইয়াছ, সেই কালবশে তুমি এই নীচ

● আমরা বালবাছি তর্কালঙ্কার মহাশয় পৃথিবীর কৃষ্ণরূপের প্রতি কোন প্রমাণ দেন নাই, এটি আমাদের ভ্রম ; তিনি সপ্তম অধ্যায়ে শাকজ রূপপ্রসঙ্গে এ বিষয়ের প্রমাণ দিয়াছেন ।

অবস্থা হইতে কিছুকাল বিশ্রামের পর, আগার সম্মানে আপনাব অতীত
স্থান অধিকার করিবে । বৃষ্টি তোমাব অদৃষ্ট চক্র আবার ফিবিয়া আসিল !

আমাদের মধ্যে একগুণে সাতশ্রেণীর হিন্দু আছে ।

(১) কুলি গজুব, বাকুনী বামন, ভাট, ইত্যাদি নিবন্ধব লোক । এই
শ্রেণীতে সমাজের দশ আনা লোক আছে ।

(২) সুখ গোঁড়া হিন্দু, যারা দুই চারিটা কবিয়া অশুদ্ধ মন্তোচ্চারণ
করিয়া কোন বকমে পিতৃ পিতামহের পাট ও ব্রাহ্মণ হইলে ফলাহারের
কার্য্য বজায় বাধিয়াছে । এই শ্রেণীতে চারি আনা লোক ।

(৩) ইংরাজী নবীস্ কালেজের ফেবতা--যাবা——

“ না হিন্দু না মুসলমান

ধর্ম্ম ধনের ধাব ধারে না ।

নয় মগ, দিবিজী, বিদ্যম ধিদি

ভিত্তব বাতি যায় না জানা ।”

এই শ্রেণীতে এক আনা লোক ।

(৪) অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, সম্বতী, স্বামীর দল, যাঁহাদের সাহায্যে
কতক পবিমাণে সমাজ চলিতেছে ।

এই শ্রেণীতে অর্দ্ধ আনা লোক ।

(৫) তৃতীয় শ্রেণী হইতে সবিসা যাঁহাবা আজিকালি গীতা ভাগবতের
কথা আওড়াইতেছেন ।

এই শ্রেণীতে এক পাই লোক ।

(৬) জানী নাস্তিক যাঁহাবা নিরপেক্ষ ।

এই শ্রেণীতে অর্দ্ধ পাই লোক ।

(৭) জানী আস্তিক যাঁহাবা নিরপেক্ষ হইয়া অদৃশ্য ভাবে নির্জনে
থাকেন ।

এই শ্রেণীতে অর্দ্ধ পাট লোক ।

পূর্বেক সাত শ্রেণীর মধ্যে সপ্তম শ্রেণীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমাজের
কোন সংশ্রব নাই, তজ্জন্য এই শ্রেণীর হিন্দুকে বাদ দিতে পাবা যায় । অব-
শিষ্ট ছয় শ্রেণীর পবম্পর সাহায্যে আধুনিক সমাজ চলিতেছে । কিন্তু এতদপ
চলিলে, আব অধিক দিন আধুনিক হিন্দুসমাজ টিকিয়া থাকিবে না । কারণ
প্রথম তিন ও বর্ত্ত শ্রেণীর হিন্দুব দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম কখনও সমাক্রমে আচরিত

হইবে বলিয়া বোধ হয় না। অবশিষ্ট চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর হিন্দু থাকিল। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর হিন্দু ভাগ ক্রমশই উত্তবোদ্ধব কমিয়া আসিতেছে। যেকপ এক ভাবে কমি তছে, একপ কমিতে থাকিলে, এই শ্রেণী অচিরে লোপ পাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যা বড়াবে। আবার তৃতীয় শ্রেণী ভাঙ্গিয়া ক্রমশ পঞ্চম শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে এবং বৈদেশিক শিক্ষার উত্তবোদ্ধব বিস্তাবে ১ম ও ২য় শ্রেণীর হিন্দু ওয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া ৫ম শ্রেণীর আরও দল পুষ্টি করিবে। এইরূপে ইংল্যাজ রাজ্য আম'দেব দেশে আব একশত বা দুই শত বর্ষ স্থায়ী হইলে, পঞ্চম শ্রেণীতে আট আনা লোক হইবাব বিশেষ সম্ভাবনা।

একপে দেখা যাউক এই পঞ্চম শ্রেণীর হিন্দু বিকপ চবিজ্ঞ। যাহাবা কোন ধর্ম মানিত না—ব হাদেব আচান ব্যবহাব অদ্ভুত বকমেব ছিল—যাহাদেব মন বৈদেশিক শিক্ষাব প্রভাবে বতক পরমাণে স্বাধীন হইয়াছিল—যাহাবা ইংল্যাজ কাতে আপনাদেব হিন্দু বলিবা পবিচয় দিতে লজ্জা বোধ কবিত—যাহাদেব মনো ব্রাহ্মণেবা যজ্ঞসূত্র না ঢাকিয়া লজ্জায় বাহিবে আসিতে পাতিত না—যাহাদেব মনো শূদ্রেবা যজ্ঞসূত্র গলদেশে ধারণ করিবার জন্য উৎস্রুত ছিল—যাহাবা অখাদ্য পাইয়া সর্ব লোকেব নিকট ঐ বিষয়েব আন্দোলন কর) আপনাদেব শ্রাঘা জ্ঞান কবিত—যাহাবা সম বয়সকে হিন্দু শাস্ত্রালোচনা কবিতে দেখিলে বা বামাষণ মহাভাবত পাঠ কবিতে শুনিতে তাহাকে অসভ্য বলিবা উপহাস কবিত—সেই তাহাবা—সেই মানোদ্যায়ী কালেজব ফেব্ তা গোবাব। আজি নব গোরা সাজিয়া হিন্দুধর্মের বাখ্যা কবিতেছেন। যেন স্বপ্ন যোগে দেব'দেশে হিন্দুধর্মের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া তাহাবা সচসা হিন্দুধর্মের নাম লইবা দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আজি হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে এই নব্য শ্রেণীর হিন্দুরা নবজীবন পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছেন। যখন এই একটা নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে তখন 'আশা কবা যায়, কালে এই শ্রেণী অত্যন্ত প্রবল হইয়া আবার সনাতন হিন্দুধর্মের বাহাদুর্য্য সমস্ত জগতে স্থাপন করিবেন। এই শ্রেণীর উদ্ভব শুভ বলিতে হইবে। এই শ্রেণীর উত্তবোদ্ধব বৃদ্ধিব প্রতি দুইট মুখ্য কাণ দেখা যায়।

✓ (১) ইংল্যাজী ভাষা ও ইংল্যাজের সহিত সম্বন্ধে তৃতীয় শ্রেণীর মনে স্বাধীন ভাবের ক্ষুধা।

(২) ঐ স্বাধীন ভাবের ক্ষুদ্রবিশত জাতীয় ভাবের ও ভাবের উন্নতি
কল্পে মনঃসংযোগ।

এক্ষণে আমাদের ভাবী শুভাশুভ ইংবাজের অদৃষ্টেব উপর নির্ভর করে।
ইংবাজ আমাদের দেশে বহুমূল হইয়া থাকিলেই আমাদের আশা ফলবতী
হইবে। অর্থাৎ কোন বলদৃষ্ট স্বাধীন ধার্মিক জাতির সংসর্গে আমাদের
বাস এক্ষণে সর্বতোভাবে প্রয়োজন। এই সংসর্গে জেতার স্বাধীন ভাব
আমাদের মনে ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হইবে। এই জন্যই সাধু সংসর্গের
মাহাত্ম্য আমাদের শাস্ত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। সাধুসংসর্গে সাধু-
ভাব মনে সঞ্চারিত হয় সূতরাং ধার্মিক পবাক্রমশালী জেতার সংসর্গে আমাদের
মনে যে স্বাধীন ভাবের ক্ষুদ্রি পাইবে তাহা বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমতে
বিজিতের মনে স্বাধীন বৃত্তির ক্ষুদ্রি নিমিত্ত জেতার দুইটি গুণ থাকা
আবশ্যক।

(১) পবাক্রমশালী।

(২) ধার্মিকতা।

পবাক্রমশালী না হইলে জেতার আত্ম স্বাধীনতার পক্ষে বাধা পড়িবে।
জেতা ধার্মিক না হইলে বিজিতের মনে স্বাধীন ভাব জন্মাইবার পক্ষে বাধা
পড়িবে। ধার্মিক জেতা, বিজিতকে ক্রমশ আত্মশাসন যোগ্য করিয়া বিজিতের
মনে উত্তরোত্তর স্বাধীন ভাবের ক্ষুদ্রি করিয়া দিতে বাধা। ইংবাজ পবাক্রম-
শালী ও ধার্মিক সূতরাং ইংবাজের সংসর্গে আমাদের মনে স্বাধীন ভাব
জন্মাইবার পক্ষে কোন বাধা দেখিতে পাই না। ইংবাজের অপেক্ষা অপর
কোন জাতি ধার্মিক আছেন কি না, আমরা সম্যক জানি না। তবুতে
পাই অপর দুই একটি জাতি ইংবাজের অপেক্ষা ধার্মিক আছেন কিন্তু আমা-
দের দেশ তাঁহাদের অধিকৃত হইলে তাঁহাদের স্বভাবে যে ব্যতিক্রম হইবে
না, তাহা কে বলিতে পারে। বিশেষ ইংবাজের রাজত্ব আমাদের এক প্রকার
বেশ সহিয়া গিয়াছে। এই জন্য আমাদের ইংবাজের অধীনে থাকিয়া সন্তুষ্ট
থাকিতে হইবে। পূর্বেক্ল ২টি ব্যক্তি জেতার আব একটি গুণ থাকা
আবশ্যক, কিন্তু এটি তত মুখ্য নয়।

(৩) সাধারণ তত্ত্বস্বাবলম্বিতা।

জেতার এই গুণ থাকিলে বিজিতের পক্ষে এই সুখ হয়, যে বিজিত জাতি
কখন যথেষ্টাচারী রাজার ক্রীড়ার সামগ্রী হইতে পারে না। ইংবাজের মধ্যে

বহিঃ সম্পূর্ণরূপে সাধারণ স্বত্ব প্রচলিত নাই কিন্তু অনেকাংশে ইংরাজরাজ্য সাধারণ তত্ত্বের উপর গঠিত বলিতে পারা যায় । ইংরাজ রাজ্যে যথেষ্টাচারী একজন রাজ্যের থেয়ালের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে না । সুতরাং এক্ষণে ইংরাজ যাহাতে আমাদের দেশে বন্ধনুল থাকিতে পারেন তদ্বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত । এইরূপ সংসর্গ না করিলে কোন প্রাচীন জাতির আর স্বাধীন হওয়ার উপায় নাই । সুতরাং আমাদের দেশে ইংরাজ যত অধিক দিন থাকিবেন, তত অধিক পবিমাণে আমাদের মনে স্বাধীন ভাবের উপায় হইবে এবং তত অধিক সংখ্যক হিন্দু তৃতীয় শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইবে । যত পঞ্চম শ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, ততই স্বদেশীয় ভাষার ও ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ধর্ম্মালোচনা বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতীয় ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চবিত্র পুনর্গঠিত হইবে এবং বল ও সাহস প্রফুটিত হইবে । যেমন একদিকে হিন্দুর স্বাধীনতা ও ধর্ম্মবৃত্তির আধিক্য হইবে, তদ্রূপ অন্য দিকে ইংরাজের মানসিক বল ক্ষয় হইয়া ইংরাজজাতির অবনতির সূত্রপাত হইবে । এইরূপ একেব উন্নতি ও অন্যেব অবনতি বিজ্ঞানসম্মত ও প্রত্যক্ষীকৃত সত্য ।

এক্ষণে, তৃতীয় শ্রেণীর মনে স্বাধীন ভাবের উপচয় হইলে কি প্রকারে পঞ্চম শ্রেণীর উদ্ভব হয় তাহাই বলি । স্বাধীন ভাবে মনে স্বাভাবিক ভাব স্বত উদয় হয় । স্বাধীন ভাবের ফল জাত্যাভিমান । মন জাত্যাভিমান প্রণোদিত হইলে এইরূপ তর্কবিতর্ক করে । “অপবে আপনার ধর্ম্ম পালন কবে, আমরা কেন আমাদের ধর্ম্ম পালন কবি না ? আমরা কেন পরের ধর্ম্মের অনুসরণ কবি ? আমাদের হিন্দুধর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্ম—আমরা হিন্দু । আমাদের শাস্ত্র আছে, এক আধ্‌থানি নয়—অনন্ত শাস্ত্র । আমাদের বেদ আছে—আমাদের পুৰাণ আছে—আমাদের দর্শন আছে,—আমাদের বাসন্য আছে—মহাভারত আছে—ভাগবত আছে—আমাদের গীতা আছে,—আমাদের কি নাই ? কেন ভাই আমরা আর পবধর্ম্মের দোহাই দিয়া বেড়াই ? আমরা সাক্ষাৎ ধর্ম্মেব পুত্র হইয়া বিধর্ম্মীর ধর্ম্মেব আশ্রয় লই । আমাদের দিক । এস ভাই আমরা মিলিয়া আমাদের বর্মান্তরমস্থান করিয়া চিচিত্র ধর্ম্ম রত্নেব উদ্ধার কবি ” । এইরূপ আন্দোলনে ক্রমে মনে অপূর্ণ, অগাধ, অনন্ত ধর্ম্মভাবের উদয় হয় । এই ধর্ম্মোদয়েব ফল জাতীয় ভাবাব উদ্ধার এবং সাময়িক পদেব ও ধর্ম্ম গ্রন্থের বহুল প্রচার । এইরূপে ধর্ম্মবৃত্তির সঙ্গে জাতীয় ভাষার

উন্নতি হইলে নূতন নূতন দৃশ্য ও ভাব আসিয়া মন অধিকার কবে। ধর্ম ভাবের পরবর্তী বীৰ্য্য বাজক বৃত্তির ক্ষুদ্র্তি হয়, ক্ষত্রিয় ধর্মের বিকাশ হয়। এক্ষণে পঞ্চম শ্রেণী হিন্দুর ধর্মবৃত্তির ক্ষুব্ধের সঙ্গে জাতীয় ভাব ও ভাবের উন্নতি আবর্ত্ত হইয়াছে। এইরূপে ধর্ম্মান্দোলনের সঙ্গে সন্যাসকপে জাতীয় ভাবের উন্নতি হইলে, কালে এই শ্রেণীর মনে, ধর্ম্ম সহায় থাকিবা—একতা, সাঙ্গ ও বলের সঞ্চার কবিয়া দিবে। তখন এই শ্রেণীর হিন্দুবা পৌরাণিক বিখ্যাত বীরগণের কথা স্মরণ কবিয়া বীরভাবে উত্তেজিত হইয়া মহাবীরের ন্যায় জয়রাম ঈশ্বরাম ধনিতে পৃথীকপ লঙ্কাদ্বীপের আমূল প্রকম্পিত কবিয়া ধর্ম্মানন্দে পৃথিবীর পাপবাশী সমূলে ভস্মীভূত কবিয়া পুনর্ধাব পবিত্র হিন্দুজাতির বিজয় নিশান হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরাগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক মঙ্গলময় হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বষ্টিবাচন কবিবেন।

আয় আয় আয় সেই দিন আয়
হিন্দু বাজ্য যবে শোভিবে ধবায়।
পাপে তাপে তপ্ত যবে ক্ষিত্তিল
প্রেম শান্তি জলে হবে স্নানীত ॥

জনৈক হিন্দু।

কে কাহার প্রাণাধিক ?

নিমন্ত্রণ নিশীথে নিভৃত নিবাসে,
সুদীন শয্যায় শায়িতা সতী,
প্রাণ যায় যায়, সম্মুখ শমন,
না ম্যানে অবোধ অবোধ পতি।

নয়ন আসারে বুক ভাসি যায়,
জগৎ সংসার অধার ময়,
কেহ নাহি আব শরণাগতের,
সুদীন ব্রাহ্মণ সর্ব্বান্ত হয়।

“থাক থাক থাক বুশলে থাক হে !
 জনমে জনমে শাসী যে আমি ;
 বলি উঠি বৈসে, নমস্কার বলিছে,
 “ঠাকুর গোসাই পদে প্রণামি ।”

“মুছে ফেল জল যাই দেখে যাই
 তব চাঁদ মুখ দুল জ্যোৎস্নায়,
 হায় মবে যাই মবণ অধিক,
 বল প্রাণাধিক কে কাব হায় ।”
 শমন শাসনে যত না কাতবা,
 পাতিব দশাব অধিক তাব,
 ততোধিক মতী সন্দেশ দোদানে,—
 থামিল কণ্ঠেব স্বর্ণ কঙ্কণ ।

সুবধ ব্রহ্মাণ্ড নিহৃত বুটরে,
 নিসাড়ে স্বামীব বদন চাঁট,
 চবিত্তে চপলা চমকিয়া যেন
 কহিলা কাণ্ডেবে “বেহে তাই !”
 “দেখছে বাবেক নয়নে আমার,
 দেখা দেখি কবি দুই জনায়,
 প্রাণ গেলে তব ববে প্রাণাধিক,
 নয়নেব মণি নয়ন তাবায় ।”

এত বলি তবে অঞ্চলে আপন
 মুছায় নাথেব নবন নীব,
 নয়নে নয়নে বৈঠল দুজনে,
 প্রকৃতি বাহিল দীব সমীব ।

এক দৃষ্টে জুঁহে জুঁহেতে তন্ময়,
 আত্মসাৎ একি চমতকাব
 আপন স্বরূপ হবি হবি বোল,
 নিবথে বদনে জুঁহে জুঁহাব ।

দেখিতে দেখিতে উত্তরে বিভোর,
এ দিকে যামিনী প্রভাতা হয়,
“কৈ প্রাণাধিক লুকাও প্রতিমা।”
ছবি-কামিনী শেষ সময়।

সোণার প্রতিমা লুটায় পড়িল,
চাখেব প্রতিমা গেল না তার,
প্রাণাধিক ছবি প্রাণেব প্রতিমা,
নয়নেব পটে রহিগ হয় !

কাতর ব্রাহ্মণ ছাড়িল নিশ্বাস,
বলে “প্রাণাধিকে জ্বিনিলে পণ।”
হৃদয়ে দামিনী—হাসেন কামিনী,
পদ ধূলি চাহি সীমন্তে লন।

অকণ উদয়ে ব্রাহ্মণ তনয়,
প্রবোধ প্রশান্তে ম্ৰতি ধবি,
অনুবাগে নাম গুনাইল কাণে,
প্রাণ প্রতিমায় পবণ ভরি।

বিধিমতে তার করিল সংকাব,
পবমা পবিত্রা জাহ্নবী কূলে,
আপনি সেখানে সাধিলা সমাধি,
দ্রুত নাটক সংসার ভুলে।

সে সমাধি ভূমে তমাগ তলায়,
আলোকে আঁধাবে দেখে পথিক,
ছায়ার কারায় সারঙ্গ বাজায়,
“দেখ দেখ কার কে প্রাণাধিক ?”

শারীরিক বৃত্তি ।

গুরু । শারীরিক বৃত্তি সকলের স্বকৃতি ও পবিত্রতায় যে সূক্ষ্ম আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

শিষ্য । তাহাব কারণ বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম কেহ বলেন না।

গুরু । কোন কোন ইউরোপীয় অনুশীলনবাদী বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম বা ধর্মস্থানীয় কোন একটা জিনিস বিবেচনা কবেন, কিন্তু তাহাবা এমন কথা বলেন না, যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন তাহাব পক্ষে প্রয়োজনীয়।†

শিষ্য । আপনি কেন বলেন ?

গুরু । যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম হয়, তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য ধর্ম। কিন্তু সে কথা না হয়, ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর স্বাক্ষকে ধর্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কব, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। যদি যাগযজ্ঞ রত্নাভ্যাস ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম বল ; যদি দয়া, দক্ষিণ্য, গর্বো-পকারকে ধর্ম বল ; যদি কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম বল ; না হয় খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ধর্মকে ধর্ম বল, সকল ধর্মের জন্যই শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। ইহা কোন ধর্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল ধর্মের বিঘ্ননাশের জন্য ইহাব বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাটা কখনও কোন ধর্মবেত্তা স্পষ্ট কবিয়া বলেন নাট, কিন্তু এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ কবিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

শিষ্য । ধর্মের বিঘ্ন বা ক্লিপ, এবং শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে তাহাব বিনাশ, ইহা বুঝাইয়া দিন।

* অনুশীলন তত্ত্ব সম্পূর্ণ হইয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রাঙ্কন জন্য প্রস্তুত আছে। ইহাব যে সকল অংশ নবজীবনে প্রকাশিত হয় নাই, শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধীয় এই অধ্যায় তাহার একাংশ। গ্রন্থের মধ্য হইতে উদ্ধৃত কবিয়া নবজীবনে ইহা দেওয়া গেল বলিয়া প্রথমটা একটু অসংলগ্ন বোধ হইতে পারে।

† Herbert Spencer বলেন ।

শুক । প্রথম ধব, রোগ । রোগ ধর্মের বিঘ্ন । যে গোড়া হিন্দু রোগে পড়িয়া আছে, সে বাগযজ্ঞ, ব্রহ্ম নিয়ম তীর্থদর্শন, কিছুই কবিত্তে পারে না । যে গোড়া হিন্দু নয়, কিন্তু পবোপকার প্রভৃতি সদমুষ্ঠানকে ধর্ম বলিয়া মানে, বোগ তাহাবও ধর্মের বিঘ্ন । বোগে যে নিজে অপটু, সে কাহার কি কার্য্য কবিবে ? যাহার বিবেচনায় ধর্মের জন্য এ সকল কিছুই প্রয়োজন নাই, কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম, বোগ তাহাবও ধর্মের বিঘ্ন । কেন না রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না ; অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না ; কেন না চিত্তকে শারীরিক যন্ত্রণায় অভিভূত কারয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে । রোগ বর্জ্য কর্মের বিঘ্ন, যোগীব যোগের বিঘ্ন, ভক্তের ভক্তিব সাধনের বিঘ্ন । রোগ ধর্মের পরম বিঘ্ন ।

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না, যে শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের অভাবেই প্রধানতঃ রোগের কারণ ।

শিষ্য । মনে ককন, হিম লাগানতে পীড়া হয় । তাহাও কি অনুশীলনের অভাব ?

শুক । যুগিস্ক্রিয়ের স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের ব্যাঘাত । শারীরতত্ত্ব বিদ্যাতে তোমাব কিছুমাত্র অধিকার থাকিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে ।

শিষ্য । তবে দেখিতেছি যে জ্ঞানার্জ্জুনী বৃত্তিব সমুচিত অনুশীলন না হইলে শারীরিক বৃত্তিব অনুশীলন হয় না ।

শুক । না, তা হয় না । সমস্ত বৃত্তিগুলিব যথাযথ অনুশীলন পবম্পরের অনুশীলনের সাপেক্ষ । কেবল শারীরিক বৃত্তিব অনুশীলন জ্ঞানার্জ্জুনী বৃত্তিব সাপেক্ষ, এমত নহে । কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিও তৎসাপেক্ষ । কোন কার্য্য কি উপায়ে কবা উচিত, কোন বৃত্তিব কিসে অনুশীলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে । জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না । কিন্তু সে কথা এখন থাক ।

শিষ্য । এখন থাকিলে চলিবে না । যদি বৃত্তিগুলিব অনুশীলন পরস্পর সাপেক্ষ, তবে কোনগুলির অনুশীলন আগে আবস্ত কবিব ?

শুক । সকল গুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এককালেই আরম্ভ করিতে হইবে ; অর্থাৎ শৈশবে ।

শিষ্য । আশ্চর্য্য কথা ! শৈশবে আমি জানি না, যে কি প্রকারে কোন

বৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে । তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব ?

শুভ । এই জন্য শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যিক । শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না । সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য । কেবল শৈশবে কেন, চিবকালই আমাদের পবের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন । এই জন্য হিন্দুধর্মে শুরুব এত মান । আব,—শুরু নাই, শুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না । ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনেব কথায় এ কথা বলিয়াছি । এখন বাহা বলিতেছিলাম, তাহা বলি ।

(২) বৃত্তি সকলের এইরূপ পৰস্পর সাপেক্ষতা হইতে শাবীবিবিকী বৃত্তি অনুশীলনেব দ্বিতীয় প্রয়োজন, অথবা ধর্ম্মেব দ্বিতীয় বিষয়েব কথা পাওয়া যায় । যদি অন্যান্য বৃত্তিগুলি শারীরিক বৃত্তির সম্পর্ক হইল, তবে জ্ঞানার্জনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক অনুশীলনেব জন্য শাবীবিবিকী বৃত্তি সকলের সম্যক অনুশীলন চাই । বাস্তবিক, ইহা প্রসিদ্ধ যে শাবীবিবিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকিলে মানসিক শক্তি সবল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, অথবা অসম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ প্রাপ্ত হয় । শাবীবিবিক স্বাস্থ্যেব জন্য মানসিক স্বাস্থ্যেব প্রয়োজন, মানসিক স্বাস্থ্যেব জন্য শাবীবিবিক স্বাস্থ্যেব প্রয়োজন, ইউবোপীয় বিজ্ঞানবিন্দু পণ্ডিতেরা শরীর ও মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন । আমাদের দেশে এক্ষণে যে কালেজি শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত তাহার প্রধান নিম্নাবাদ এই যে ইংগতে শিক্ষার্থীদেরগেব শাবীবিবিক ক্ষুণ্ণিত প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শাবীবিবিক নহে, অকালে মানসিক অধঃপতনও উপস্থিত হয় । ধর্ম্ম মানসিক শক্তির উল্লব নির্ভব কবে, কাজে কাজেই ধর্ম্মেরও অধোগতি ঘটে ।

(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ত্ব, বা তৃতীয় বিঘ্ন আবও গুরুতব । বাহাব শাবীবিবিক বৃত্তি সকলের সমুচ্চিৎ খলুশীমন হয় নাই, সে আশ্রয়ক্ষায় অক্ষম । যে আশ্রয়ক্ষায় অক্ষম, তাহার নির্দিষ্টে ধর্ম্মাচরণ কোথায় ? সকলেরই শত্রু আছে । দস্তা আছে । ইহাবা সর্বদা ধর্ম্মাচরণের বিঘ্ন করে । ভক্তির অনেক সময়ে যে বলে শত্রুদমন করিতে না পাবে, সে বলাভাব হেতুই আশ্রয়ক্ষার্থ অধর্ম্ম অবলম্বন কবে । আশ্রয়ক্ষা এমন অলঙ্ঘনীয় যে পবম ধার্ম্মিক ও এমন অবস্থায় অধর্ম্ম অবলম্বন পবিহায়া কবিতে পাবে না । মহাত্মারতকার, “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” ইতি উপন্যায়ে ইহাব উত্তম উদাহরণ কল্পনা করিয়াছেন ।

বলে জ্রোণাচার্য্যকে পবিত্রকবিত্তে অক্ষম হইয়া যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পরম ধার্মিকও মিথ্যা প্রবঞ্চনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শিষ্য। প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলে খাটিতে পারে, কিন্তু এখনকার সভা সমাজে বাজ্রাই সকলের বক্ষা কবেন। এখন কি আত্ম-রক্ষায় সকলের সক্ষম হওয়া তাদৃশ প্রয়োজনীয়?

গুরু। বাজ্রা সকলকে বক্ষা কবিবেন, এইটা আইন বটে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। রাজা সকলকে বক্ষা কবিয়া উঠিতে পারে না। পাবিলে এত খুন, জখম, চুবি ডাকাতি, দাঙ্গা, মারামারি প্রত্যহ ঘটত না। পুলিশের বিজ্ঞাপন সকল পড়িলে জানিতে পারিব, যে যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আশ্রয় হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনাব শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাও তোমার বুঝা কর্তব্য। যখন তোমাকে শ্রীতিবৃত্তির অংশীদারের অবশিষ্ট কথা বলিব, তখন বুঝিবে যেমন আত্মরক্ষা আমাদের অনুর্ত্তেব ধর্ম্ম, আপনাব স্ত্রী পুত্র পরিবার স্বজন কুটুম্ব প্রতিবানী প্রভৃতির বক্ষাও তাদৃশ আমাদের অনুর্ত্তেব ধর্ম্ম। যে ইহা করে না, সে পরম অধার্ম্মিক। অতএব যাহার, তদুপযোগী বল বা শাস্ত্রী বিক শিক্ষা হয় নাই, সেও অধার্ম্মিক।

(৪) আত্মরক্ষা, বা স্বজনরক্ষা এই কথা ইহাতে ধর্ম্মেব চতুর্থ বিঘ্নের কথা উঠিতেছে। এই তদ্ব্যতীত গুরুতব; ধর্ম্মেব অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই ধর্ম্মেব জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত, প্রাণ কি, সর্ব্বস্বথ পবিত্যাগ করিবাছেন। আমি স্বদেশরক্ষার কথা বলিতেছি।

যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম্ম। সমাজ এক এক ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সর্ব্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ কবে, এক এক সমাজ বা দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ কবে। মনুষ্য যতক্ষণ না বাজ্রার শাসনে বা ধর্ম্মেব শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া থাইতে পাবিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশাসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পাবে, সে তার কাড়িয়া থায়। তেমনি, বিবিধ সমাজের উপর কেহ একজন বাজ্রা না থাকাতে, যে সমাজ বলবান, সে দুর্ব্বল সমাজের কাড়িয়া থায়। অসত্য সমাজেব কথা বলিতেছি না, সত্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি। আজ ফ্রান্স জার্মানির কাড়িয়া থাইতেছে,

কাল জর্মানি ফ্রান্সের কাড়িয়া থাইতেছে; আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়িয়া থায়, কাল রুস তুর্কের কাড়িয়া থায়। আজ Rhenish Frontier, কাল পোলণ্ড, পবন্ত বুলগেরিয়া, আজ গিশব, কাল টক্কুন—এই সকল লইয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুবেল মত হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি কবিয়া থাকেন। যেমন গাটের কুকুবেল যে যাব পায় সে তার কাড়িয়া থায়, কি সভ্য কি অসভ্যজাতি তেমনি পবেল পাইলেই কাড়িয়া থায়। হুর্ল সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ কবিবার চেষ্টা করিয়াই আছে। অতএব আপনাদের দেশবন্ধা ভিন্ন আত্মবন্ধা নাই। আত্মবন্ধা ও স্বজনবন্ধা যদি ধর্ম হয়, তবে দেশবন্ধাও ধর্ম। বৎ আবণ্ড শুকতব ধর্ম, বেন না এম্মলে আপন ও পাব, উভয়ের বন্ধাব কথা।

সামাজিক কতকগুলি অবস্থা পশ্চিম উৎপত্তি এবং কতকগুলি অনুপযোগী। কতকগুলি অবস্থা সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পরিবৃদ্ধির অনুকূল। আবার কোন কোন সামাজিক অবস্থা কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন ও পরিবৃদ্ধির প্রতিকূল। অধিকাংশ সময়ে এই প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুত্র হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেস্ট্যান্টদিগকে রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ, ওরোজ্জের হিন্দুধর্মের বিষয় আর একটি। সনাজের যে অবস্থা ধর্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি। লিবার্ট শব্দের অর্থবাদ। ইহা এমন তাৎপর্য্য নহে যে রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার मित्र। ইহা অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ধর্মোন্নতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব আত্মবন্ধা, স্বজনবন্ধা, এবং স্বদেশবন্ধাব জন্য যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন তাহা সকলেবই কর্তব্য।

শিষ্য। অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই ?

গুরু। তাহা অর্থ এমন নহে যে সকলকে যুদ্ধ বাবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু সকলের প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকেই যুদ্ধব্যবসায়ী হইতে হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয়, যে বৃহৎ রাজ্য সে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী সকলে সকলকেই এই জন্য যুদ্ধ করিতে হইত।

বৃহৎ রাজ্যে বা সমাজে, যুদ্ধ, শ্রেণীবিশেষের কাজ বলিয়া নির্দিষ্ট থাকে । প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যমিক ভারতবর্ষের রাজপুতেরা ইহা উদাহরণ । কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্তৃক বিজিত হইলে, দেশের আর বক্ষা থাকে না । ভারতবর্ষের রাজপুতেরা পবাত্ত হইবামাত্র, ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল । কিন্তু রাজপুত ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য জাতি সকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সে হুর্দশা হইত না । ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অস্ত্রধারণ করিয়া সমবেত ইউরোপকে পবাত্ত করিয়াছিল । যদি তাহা না করিত, তবে ফ্রান্সের বড় হুর্দশা হইত ।

শিষ্য : কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বারা এই ধর্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে ?

গুরু : কেবল বলে নহে । চুযাডেব সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয় । এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পবিপুষ্টিব জন্য ব্যায়াম চাই । এদেশে, ডন, কুস্তী, মুগুর, প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল । ইংরেজি সভ্যতা শিথিলে গিয়া আমবা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না । আমাদের বর্তমান বুদ্ধিবিপর্যয়ের ইহা একটি উদাহরণ ।

বিতীৰ্ণতঃ এবং প্রধানতঃ অস্ত্রশিক্ষা । সকলেই সর্ববিধ অস্ত্র প্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত ।

শিষ্য : কিন্তু এখনকার আইন অনুসারে আমাদের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ ।

গুরু : সেটা একটা আইনের ভুল । আমবা মহাবাহী বাজতন্তু প্রজা, আমবা অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহাব বাণ্য বক্ষা করিব ইহাই বাঞ্ছনীয় । আইনের ভুল পশ্চাৎ সংশোধিত হইতে পারে ।

তাবপর তৃতীয়তঃ অস্ত্রশিক্ষা ভিন্ন আর কতকগুলি শারীরিক শিক্ষা শারীরিক ধর্ম সম্পূর্ণতা জন্য প্রয়োজনীয় । যথা অশ্বাবোহণ । ইউরোপে যে অশ্বাবোহণ কবিত্তে পারে না এবং বাহার অস্ত্রশিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহাস্যাম্পদ । বিলাতী জীলোকদিগেও এ সকল শক্তি হইয়া থাকে । আমাদের কি হুর্দশা !

অস্বাভোহণ যেমন শারীরিক ধর্মশিক্ষা, পদব্রজে দূরগমন এবং সস্তরণও তাদৃশ। যোদ্ধাব পক্ষে ইহা নহিলেই নয়, কিন্তু কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়, এমন বিবেচনা কবিও না। যে সঁতার না জানে সে জল হইতে আপনাব বক্ষার ও পবেব রক্ষাব অপটু। যুদ্ধে কেবল জল হইতে আত্মরক্ষা ও পবেব বক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় এমন নহে, আক্রমণ, নিক্ষেপ, ও পলায়ন জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। পদব্রজে দূরগমন আবও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা বাহুল্য। মনুষ্য যাজেব পক্ষেই ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। অতএব যে শারীরিক বৃত্তিব অনুশীলন করিবে, কেবল তাহার শরীর পুষ্ট ও বলশালী হইলেই হইবে না। সে ব্যায়ামে সুপটু—

গুরু। এই ব্যায়াম মধ্যে মনযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বল-
কারক। আত্মরক্ষাব ও পবেপকারেব বিশেষ অস্ত্রবল।*

শিষ্য। অতএব, চাই শরীরপুষ্টি, ব্যায়াম, মনযুদ্ধ, অস্ত্রশিক্ষা, অস্বা-
ভোহণ, সস্তরণ, পদব্রজে দূরগমন—

গুরু। আবও চাই সহিষ্ণুতা। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি সকলই সহ্য কবিতে পাবা চাই। ইহা ভিন্ন যুদ্ধার্থী আবও চাই। প্রয়োজন হইলে মাটি কাটিতে পারিবে—ঘব বাধিতে পারিবে—মোট বহিতে পারিবে। অনেক সময়ে যুদ্ধার্থীকে দশ বাবদিনেব খাদ্য আপনাব পিঠে বহিয়া লইয়া যাউতে হইয়াছে। স্থল কথা, যে কর্ম্যকাব আপনাব কর্ম্য জানে সে যেমন অস্ত্রধানি তীক্ষ্ণধার ও শাণিত কবিয়া, সবল দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র কবিতে হইবে—যেন তদ্বারা সর্ব কর্ম সিদ্ধ হয়।

শিষ্য। কি উপায়ে ইহা হইতে পাবে?

গুরু। ইহাব উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহাব, (৪) ইন্দ্রিয়সংযম। চাবিটিই অনুশীলন।

শিষ্য। ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন শুনি-

* লেখক প্রণীত মেবী চৌধুরাণী নামক গ্রন্থে প্রহ্লদকুমারীকে অনুশীল-
নের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে। এজন্য সে স্ত্রীলোক হইলেও
তাহাকে মনযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে।

জ্ঞাতি। কিন্তু আহাব সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। বাচস্পতি মহাশয়
কাঁচকলা ভাতে ভাত খান। ততটুকু মাত্র আহাব বরাই কি ধর্ম্মানুমত ?
তাহাব বেশী আহাব কি অধর্ম্ম ?

শুক। শবীর বক্ষা ও পুষ্টিৰ জন্য যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবু তাহাৰ অধিক কাৰ্যমূলকতা অসম্ভৱ। শবীৰ বক্ষা ও পুষ্টিৰ জন্য বিকল্প আহাৰ প্ৰয়োজনীয়, তাহা বাদ্যনবিং পদ্ধতিত বাৰিষনে, বায়ু-প্ৰদূষণে বাজ নহে। বোৰ কৰি তাহাৰো বলিবন যেকৈচকলা ভাতত ভাত শৰীৰ হয়। ও পুষ্টিৰ জন্য যথেষ্ট নহে। বেচ বা বলিতে পাবেন, বাচস্পতিৰ ন্যায়, যে ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, তাহাপ শাস্ত উশাই যথেষ্ট। সে তৰ্কে আমাদেৰ প্ৰয়োজন নাই—বৈজ্ঞানিকৰ বৰ্ম্ম দৈহিক ককক। আহাৰ নষ্টকৈ যাহা প্ৰকৃত ধন্যোপদেশ—যাহা স্বৰ্গ প্ৰিয়কৰ নুনিগত—পীতা হইতে তাহাই হোনাৰে শুনিয়া আনি নিবস্ত হইব।

आयुःसद्वर्णनार्थं, सुखप्रति वदन्नाः ।

नम्राः स्त्रियाः शिवास्तदा । आहवाः नाद्विकप्रियाः ॥ ४५१ ॥

যে স্নাতক প্রাণবৃত্তিকাবক, উৎসাহবৃত্তিকাবক, বলবৃত্তিকাবক, স্নাত্য
বৃত্তিকাবক, স্থপ বা চিত্তপ্রসাদ বৃত্তিকাবক এবং কটিবৃত্তিকাবক, যাহা বসযুক্ত,
মিশ্র, যাহা সাধারণ মেহে থাকিষা বাস (অর্থাৎ Nutritious) এবং যাহা
দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই সাদৃশ্যকা প্রিয়।

শিষ্য । উহাতে মদা, মাংস, মংসা বিহিত না নিষিদ্ধ হইল ?

শুক। তাহা বেঞ্জানিনের বিচায্য। শবীতত্ববিদ্ বা চিকিৎসককে
জিজ্ঞাসা করিও, যে ইহা আয়ু. সম্ব বলাযোগ্য স্থপপ্রীতিবন্ধন, ইত্যাদি স্তম-
যুক্ত কি না।

শিষ্য । হিন্দু শাস্ত্রকাব্যেণা ত এ সকল নির্দিষ্ট কবিগ্নাছেন ।

শুক । আমাদের বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎসকের আসনে অব-
তরণ করা ধর্মোপদেশকের বা ব্যাখ্যাতার উচিত নহে । তবে হিন্দুশাস্ত্র-
কারেরা মদ্য, মাংস, মংসা নিষেধ করিয়া যে মন্দ বর্ণিত হেঁ, এমন বলিতেও
পারি না । বরং অজুশীলন হইবে যে তাঁহাদের বিধি সংলগ্ন মূল ছিল, তাহা
বুঝা যায় । মদ্য যে অনিষ্টকারী, অজুশীলনের হানিকর, এবং বাহ্যেই
তুমি ধর্ম বল, তাহাবই বিরুদ্ধ, একথা বোধ করি তোমাকে কষ্ট পাইয়া

বুকাইতে হইবে না । মদ্য নিষেধ কবিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ভালই করিয়াছেন ।

শিষ্য । কোন অবস্থাতেই কি মদ্য ব্যবহার্য্য নহে ?

শুক । যে পীড়িত ব্যক্তির পীড়া মদ্য ভিন্ন উপশমিত হয় না, তাহাব পক্ষে ব্যবহার্য্য হইতে পারে । শীতপ্রধানদেশে, বা অন্যদেশে শৈতাহিক্য নিবারণ জন্য ব্যবহার্য্য হইলে সঙ্গত পাবে । অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদকালে ব্যবহার্য্য হইলে সঙ্গত পাবে । কিন্তু এ বিশিষ্ট চিকিৎসকের নিকট হইতে লইবে—ধর্মোপদেশের নিষট্ণ নহে । কিন্তু একটি এমন অবস্থা আছে, যে সে সময়ে বৈদ্যানিক বা চিকিৎসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও বিধির অপেক্ষা না কবিয়া পনিমিত মদ্য সেবন করিতে পাবে ।

শিষ্য । এমন কি অবস্থা আছে ?

শুক । যুদ্ধ । যুদ্ধকালে মদ্য সেবন বরা ধর্ম্মানুমত বটে । তাহাব কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির বিশেষ ক্ষুদ্রিতে যুদ্ধে জয় ঘটে, পরিমিত মদ্য সেবনে সে সকলের বিশেষ ক্ষুদ্রি জন্মে । এ কথা হিন্দুধর্ম্মের অননুমোদিত নহে । নতাবদিতে আছে যে ভয়দ্রুণ বধের দিন, অর্জুন একাকী বৃষ্ণ ভেদ কবিয়া শত্রু সেনা মধ্যে প্রবেশ করিলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত দিন তাহাব কোন সংবাদ না পাইয়া ব্যাক হইয়াছিলেন । সাত্যকি ভিন্ন আব কেহই এমন বীর ছিল না, সে কতভেদ কবিয়া তাহাব অনুসন্ধানে যায় । এ দৃকব কার্য্যে যাইতে যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে অনুমতি কবিলেন । তদন্তবে সাত্যকি উত্তম মদ্য চাহিলেন । যুধিষ্ঠির তাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মদ্য দিলেন । মার্কণ্ডেয় পুবাণে পড়া যায়, যে স্বয়ং কালিকা অশ্ব বধকালে সুবাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে চিন্‌হটের যুদ্ধে ইংবেজসেনা হিন্দু মুসলমান কর্তৃক পবাত্ত হয় । স্বয়ং Sir Henry Lawrence সে যুদ্ধে ইংবেজ সেনার নায়ক ছিলেন, তথাপি ইংবেজের পবাজব খটিয়াছিল । ইংবেজ ইতিহাস লেখক সব জন কে ইহাব একটি কারণ এই নির্দেশ কবেন যে ইংবেজসেনা সে দিন মদ্য পায় নাই । অসম্ভব নহে ।

যাই হোক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মন্ত এই যে (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পাবে, (২) পীড়াদিতে স্ত্রচিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্য কোন সময় সেবন করা অবিধেয় ।

নিষা । মংস্য মাংস সম্বন্ধে আপনাব কি মত ?

শুক । মংস্য মাংস শরীরের অনিষ্টকারী এমন বিবেচনা কবিবার কোন কারণ নাই । বরং উপকারী হইতে পারে । কিন্তু সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে । ধর্মবৈস্তাব বক্তব্য এই যে মংস মাংস, প্রীতিবৃদ্ধির অঙ্গশীলনের বিরৎ পরিমাণে বিবোধী । সর্পভূতে প্রীতি হিন্দুধর্মের সাবতত্ত্ব । অঙ্গশীলন তত্ত্বেও তাই । অঙ্গশীলন হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত—ভিন্ন নহে । এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্রকারেণা মংস্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ ববিষাচেন । কিন্তু ইহাও ভিত্তব আর একটা কণা আছে । মংস্য মাংস বর্জিত ববিলে শাবীন্দ্রিক বৃত্তি সকে-
লেব সম্ভিত ক্ষুত্রি বোধ হয় কি না ? একণা বিজ্ঞানবিদব বিচার্য্য । কিন্তু যদি বিজ্ঞান শাস্ত্র বনে যে, সম্ভিত ক্ষুত্রি বোধ হয় বটে তাহা হইলে প্রীতি-
বৃত্তিব সম্ভিত সম্ভাবনা ঘটল, সামঞ্জস্য দিনক্ট হইল । এমত অবস্থায় মংস্য মাংস ব্যবহার্য্য । কণাটা বিজ্ঞানের উপব ভিত্তব কবে । ধর্মোপাদেষ্টাব বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ কবা উচিত নহে, পূর্বে ববিষাচি ।

শাবীন্দ্রিক বৃত্তিব অঙ্গশীলনের প্রযোজনীয় মণ্যে, (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং (৩) আহাৰেব বণা ববিষ্যাম এক্ষণে (৪) ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক । শাবীন্দ্রিক বৃত্তিব সদঙ্গশীলন অন্য ইন্দ্রিয় সংযম যে নিত্য প্রযোজনীয় বোধ কবি বুঝাইতে হইবে না । ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত শাবীন্দ্রিক বৃত্তি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না, শিক্ষা নিফল হয়, আহাৰ বণা হয়, তাহাব পরিপাকও হয় না । আব ইন্দ্রিয়েব সংযমই যে ইন্দ্রিয়েব উপযুক্ত অঙ্গশীলন, ইহাও তেমাকে বুঝাইয়াছি । এক্ষণে তোমাকে স্মরণ কবিত্তে বলি যে ইন্দ্রিয় সংযম মানসিক বৃত্তিব অঙ্গশীলনের অধীন ; মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা বটে না । অতএব তেমন ইতিপূর্বে দেখি-
যাছ, যে মানসিক বৃত্তিব উচিত অঙ্গশীলন শাবীন্দ্রিক বৃত্তিব অঙ্গশীলনের উপব নির্ভব কবে, তেমনি এখন দেখিতেছ যে শাবীন্দ্রিক বৃত্তিব উচিত অঙ্গ-
শীলন আবাব মানসিক বৃত্তিব উপব নির্ভব কবে । শাবীন্দ্রিক ও মানসিক বৃত্তি
গুলিব এইকণ সম্বন্ধবিশিষ্ট, একেব অঙ্গশীলনের অভাবে অন্যেব অঙ্গশীল-
নের অভাব বটে । অতএব যে সকল ধর্মোপাদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির
অঙ্গশীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহাদের কথিত ধর্ম অসম্পূর্ণ । যে
শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, স্তবং ধর্ম
বিরুদ্ধ । কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ্য হয় না । এবং কতকগুলি

বহি পড়িলে পণ্ডিত হয় না । পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এই কথাটা বড় অনিষ্টকারী হইয়া উঠিয়াছে ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

‘স্নেহ পণ্ডিতের কথা ।’

কলিকাতার ও ক্রোশ উত্তর পাড়া পশ্চিম পাড় উত্তরপাড়া । উত্তরপাড়া একটি প্রসিদ্ধ স্থান, বঙ্গের পশ্চিম জমিদার শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাসস্থান । উত্তরপাড়ার বিহকদী সতীর কথা সকলেই শুনিয়াছেন এবং উক্ত সভার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বোধাই আঁবেব যে শুপাশুণ বিচার হয়, তাহা বোধ হয় সেই বর্ণনও ভাগ্যে গাবিবেন না । উত্তর পাড়ায় একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, একটি উত্তম বাজার আছে, মিউনিসিপ্যালিটি আছে । আর আছে—একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় । সমস্তর উপকরণের মধ্যে নাই কেবল আদালত । কিন্তু না থাকিয়াও উত্তরপাড়ায় বেকপ নামের নোবন্দনা থাকিলে যে কি হইত, বলের কাব সাধ্য ?

মধ্যে একদিন উত্তরপাড়ায় গিয়াছিলাম । তুই একজন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম । আর তথাকার পুস্তকালয়টি দর্শন করিয়াছিলাম । পুস্তকালয়ে ভগ্নানি প্রদেহীয় অনেক পুস্তক পুস্তিকা ও কাগজপত্র আছে । দেখিতে দেখিতেই একখানি অপূর্ণ পুস্তিকা পাইলাম । পুস্তিকাখানি নিতান্ত সুত্র নব—প্রায় দেহগত পৃষ্ঠা—নান, সুবাবিন্দুগ্রহ । উহাতে তিনটি প্রবন্ধ দেখিলাম—একটি বর্ণীয় হাঙ্গামার কথা, একটি বিষ্ণুপুত্রের মদননোহনের কথা, একটি স্নেহ পণ্ডিতের কথা । শেষের কথাটি সংক্ষেপে বলিতেছি ।

সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ কোলকর সাহেব জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে বড় ভাল বাসিতেন। একদা তিনি তর্কপঞ্চাননের ত্রিবেণীর বাটীতে গিয়াছিলেন। জগন্নাথ তাঁহাকে দেশীয় রীতিতে আদব অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার জন্য একখানি কাষ্ঠাসন বা পীড়া প্রদান করিলেন। সাহেব কোন বকম অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া, তত্পরি উপবেশন করিলেন। তখন তর্কপঞ্চানন এক ছিলিম তামাক সাজিয়া থাইতে আবস্ত করিলেন এবং এক টুকরা জলন্ত অঙ্গার সাহেবেবের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—“সাহেব চুট খাও, কিন্তু দেখিও যেন ধোঁয়া আমার গায় লাগে না।” সাহেব চুট ধরাইয়া থাইতে আবস্ত করিলেন।

ধূম পান করিতে করিতে দুই জনে নানা কথা বলিতে লাগিলেন—দায় ভাগাদিব কথাই বেশি। কোলকর তখন দায়ভাগ অমুবাদ বলিতেছিলেন। সেই জন্যই বোধ হয় জগন্নাথের বাটীতে গিয়া দায়ভাগের কথাটাই বেশী কহিতেছিলেন।*

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এইরূপ কথাবার্তার পর তর্কপঞ্চানন সাহেবকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন। জলযোগের সামগ্রীর মধ্যে ফলের ভাগই বেশী—কুটি, তবমুজ, পেঁপে, আম, কাঁটাল, বস্তা এবং বড় একবাটি হুন্ড। সাহেব হুন্ড বেশী খাইলেন না, বস্তা যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা খাইয়া আবার গোটাকতক চাহিয়া লইয়া গাইলেন। বস্তার কথায় তর্কপঞ্চানন দুই একটা পবিহাস করিলেন, সাহেব শুনিয়া খুব হাসিলেন।

জলযোগের পর আবার কথাবার্তা চলিতে লাগিল, সাহেব সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। কিন্তু সংস্কৃতে ইতিহাস নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। তর্কপঞ্চানন যেন গিস্মিত ও চমকিত হইয়া বলিলেন—“সে কি সাহেব, ইতিহাস নাই কি?”

সাহেব। কই, ইতিহাস কি আছে?

তর্ক। কেন, বামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি কি? ও গুলি কি ইতিহাস নয়!

স। ওগুলি ইতিহাস নয়। বামায়ণ মহাভারত কাব্য, পুরাণগুলি উপন্যাস।

* এ কথাটা পুস্তিকায় নাই, আমাদের অমুমান মাত্র।

তর্ক। হ'লই বা কাব্য, হ'লই বা উপন্যাস—কাব্য বা উপন্যাস হইলে কি ইতিহাস হইতে পাবে না ?

স। কেমন কবিতা ইতিহাস হইতে পারে ? ইতিহাসে কেবল প্রকৃত ঘটনার কথা থাকে । পুবাণাদিতে তাহা নাই ।

তর্ক। ধবিলাম, নাই—ধবিলাম, পুবাণাদিতে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ নাই । কিন্তু পুবাণাদি সে জন্য ইতিহাস বলিয়া আখ্যাত হইতে পারিবে না কেন ? পুবাণাদিতে যে সকল রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থনীতি প্রভৃতির বিবরণ আছে তাহা যদি প্রকৃত ঘটনা দেখিয়া লিখিত হইয়া থাকে তবে পুবাণাদি ইতিহাস বলিয়া গণ্য না হইবে কেন ? গৃহস্থশ্রমে থাকিয়া কি প্রকাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে কিরূপ শ্রমোৎসাহ হয়, জাতিতে জাতিতে কি প্রকার সম্বন্ধ হইলে কি প্রকার ফলাফল হয়, বাজা কি প্রকাবে রাজকাৰ্য্য করিলে কি প্রকার ফলাফল হয়, ইত্যাদি মানবজীবন ঘটিত ও সমাজ সম্বন্ধীয় বহুবিধ তথ্য—প্রকৃত মানবজীবন, প্রকৃত মানবসমাজ ও প্রকৃত রাজকাৰ্য্য দেখিয়া নির্ণয় করা যায় । নির্ণয় কবিতা যদি কল্পিত ঘটনাদি অবলম্বন করিয়াও তাহা বিবৃত করা হয়, তাহা হইলে, সে বিবরণ মানবের ইতিহাস বলিয়া গণ্য না হইবে কেন ? এষ্ট যে হিতোপদেশ গ্রন্থে এত নীতি কথা আছে । পশু পক্ষী গল্পের চলে সে সকল কথা লিখিত আছে বলিয়া হিতোপদেশ খানিকে নীতি গ্রন্থ না বলিয়া উপন্যাস বলিতে হইবে কি ? ভগবান বেদব্যাসও তেমনি বহুকাল ধরিয়া বহুলোকের জীবন, বহুবিধ মনুষ্য সমাজ ও না না বাজ্যের রাজকাৰ্য্য দেখিয়া মানবজীবন, সমাজ ও রাজকাৰ্য্য সম্বন্ধীয় নানা তথ্য অবগত হইয়া, পুবাণে সেই সবশেষ ব্যাখ্যা কবিতা গিয়াছেন । ধবিলান, বলিত ঘটনাদি অবলম্বন কবিতাই তাহা ব্যাখ্যা কবিতাছেন । কিন্তু ভজ্ঞন্য পুবাণগুলি ইতিহাস না হইয়া উপন্যাস বা উপকথা হইবে কেন ? এখন আব একটি কথা জিজ্ঞাসা করি । তুমি যে বলিলে, পুবাণাদিতে প্রকৃত ঘটনার কথা নাই । তুমি কেমন কবিতা জানিলে, নাই ?

বামবাবণের যুদ্ধের কথা, কুরুক্ষেত্রের কথা, হাবিশচন্দ্রের কথা,—এসব যে উপকথা বা অলৌক কথা, কেমন কবিতা জানিলে ?

স। আচ্ছা, এই বামবাবণের যুদ্ধের কথাটা ধব । বাম বামন ভল্লকের সাহায্যে বাবণ বধ কবিতাছিলেন, ইহা কি প্রকৃত কথা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় ?

তর্ক । কেন, সাহেব, কলিকাতায় তোনাদেব জাহাজেব যে সব গোরা দেখিছাছি, তাহাদিগকে বানব বলিলে কি বড় একটা মিথ্যা কথা বলা হয় ?

সা । (হাসিয়া) না, তা হয় না, সত্য । বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতিতে তাহাবা বানববৎই বটে ।

তর্ক । কিন্তু তাহাদেব সাহায্যেইত তোনবা জাহাজে চড়িয়া মহাসাগর পাব হইয়া আসিতেছ । তবে আর বানবেব সাহায্যে একটা বাজাকে পবাজর কবা এমন কি অসম্ভব বা অসঙ্গত কথা ?

সা । সে যাহা হউক, কিন্তু পুবাণাদিতে ত প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হয় নাই, তবে—

তর্ক । আবাব ঐ কথা ? কেমন কবিতা জানিলে প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হয় নাই—প্রমাণ কই ?

সা । আচ্ছা, ও কথাটা ছাড়িয়া দিন । পুবাণাদি যে ইতিহাসের লক্ষণাক্রান্ত নয়, তাহাত অস্বীকার কবিতে পাবেন না ।

তর্ক । কেন ইতিহাসের লক্ষণ কি ?

সা । ইতিহাসের প্রধান লক্ষণ এই যে উহাতে অলৌকিক বা কাল্পনিক কথা থাকে না, কেবল প্রকৃত ঘটনার কথা থাকে ।

তর্ক । এইত ও কথা ছাড়িয়াদিলে, আবাব তুলিতেছ কেন ?

সা । তুলিতেছি তাহাব কাবণ এই যে, ইতিহাসের লক্ষণ নির্দেশ কবিতে হইলে, অগ্রে ঐ লক্ষণটি নির্দেশ কবিতে হয় ।

তর্ক । কিন্তু বুলিলে ত, যে, ও লক্ষণ পুবাণাদিতে নাই এমন নয় ।

সা । তা বটে, কিন্তু একটা কথা আছে । প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হইলেই যে ইতিহাস হয়, তা নয় । ইতিহাসের বর্ণনার একটি লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণের অভাবেও ইতিহাসের অভাব হয় ।

তর্ক । সে লক্ষণটি কি ?

সা । সকল জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ।

তর্ক । সে কেমন ?

সা । একটি উদারণ দিয়া না বুঝাইলে সহজে বুঝিতে পারিবেন না ।

তর্ক । উদাহরণ দিয়াই বুঝাও ।

সা । এই রামায়ণের কথাই ধরুন । বারায়ণ—রামা বামচন্দ্রের কথা । কোন লোকের কথা কহিতে হইলে সর্কাগ্রে তাহার জন্ম স্থানের পরিচয়

দিতে হয় । কিন্তু রামের জন্মস্থান অযোধ্যা সম্বন্ধে বামায়ণে বিশেষ কিছুই লিখিত নাই । উহা যে দেশে অবস্থিত তাহাব চৌহদ্দি লিখিত নাই, যে জেলায় অবস্থিত তাহাব নাম কি চৌহদ্দি কিছুই লিখিত নাই, উহাব ল্যাটিটুড্, লঞ্জিটুড্ লিখিত নাই, রামের জন্মের পূর্ন উহা কখন শ্রোন নামে খ্যাত ছিল ইত্যাদি অসংখ্য কথার কোন কথাই লিখিত নাই । তবে কেমন করিয়া বলি যে রামায়ণ ইতিহাসের লক্ষণাক্রান্ত ।

তর্ক । আচ্ছা, আগে একটু বল, লাগ্গত ভাল ।

স। বামায়ণে বান্ধেব জন্মেরও কোন বর্ণনা নাই বলিলেই হয় । রামায়ণ যদি ইতিহাস হইত, তাহা হইলে উহাতে বান্ধেব জন্মের এই বকম একটা বিবরণ থাকিত—অনুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ দিবসে বেলা ৮ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ১৯ সেকেন্ডের সময় বান্ধেব জন্ম হয় । কোন কোন ইতিহাসে বলে, ১৯ সেকেন্ডের সময় নয়, ১ ১/২ সেকেন্ডের সময় । কিন্তু অপব সমস্ত কাঙ্গ ফেলিয়া, এমন কি আত্মব নিদ্রা পর্যাস্ত এক বকম ভাগ কবিয়া বাজবাটাব খাস সেবেস্তায় ক্রমাগত সাড়ে চারি বৎসর অনুসন্ধান করিয়া আনবা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে বান্ধেব জন্ম ১৯ ১/২ সেকেন্ডের সময় হয় নাই, ঠিক ১৯ সেকেন্ডের সময় হইয়াছিল । তাহাব বলেন ১৯ ১/২ সেকেন্ডের সময় বান্ধেব জন্ম হইয়াছিল, তাহাবা ভয়ানক ভ্রম করিয়াছেন এবং ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছেন । তাহারা আব এটি বিষম ভুল করিয়াছেন । তাহাবা বলেন যে, যে স্মৃতিকাগাবে বান্ধেব জন্ম হয়, তাহা ৭ হাত দীর্ঘ, ৪ হাত প্রস্থ ৩ ৫ হাত উচ্চ । আমবা কিছু এবিষয়ের সত্য-সত্য নিকূপণ কবা আত্মীয় প্রযোজনীয় জানিয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি । যে ঘরামি স্মৃতিকাগাব নির্মাণ করিয়াছিল বাজবাটাব হিসাব সেবেস্তায় তাহাব নাম ধাম জানিয়া লইয়া আমরা প্রথমে অযোধ্যাব ঘরামি পরীতে ভ্রাতার অনুসন্ধান করি । দশ পনের দিন অনুসন্ধানের পর অবগত হইলাম যে সে ঘরামি অযোধ্যাবাসী নয়, সে রামের জন্মের কিছু দিন পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া ঐ স্মৃতিকাগার নির্মাণ করিয়া দিয়া আবার স্বদেশে চলিয়া গিয়াছে । একপ গুরুতর বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমরা দুই তিন মাসের পথ অতিক্রম করিয়া বঙ্গে উপনীত হইলাম । এবং অনেক অনুসন্ধানের পর ঘরামি ঐখানে উপস্থিত হইলাম । ঘরামিকে স্মৃতিকাগারের দৈর্ঘ্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম । সে

বলিতে পারিল না, বলিল—আমার মনে নাই। তখন ভাবিলাম, এত পবিত্র ৩০ অনুসন্ধান বুঝাইতেছে। সেটা কিন্তু ভাল নয়। এ রকম অনুসন্ধান বুঝাইলে কাহাবো ঐতিহাসিক অনুসন্ধান নিযুক্ত হইতে প্রবৃত্তি হইবে না। তাহা হইলে ইতিহাসের সমূহ ক্ষতি হইবে। অতএব স্মৃতিকাগারেব পূর্ব বর্ণনা ভ্রান্ত বলিয়া নির্দেশ করিতেই হইতেছে। ভ্রান্ত যে নয়, তাহাই বা কেমন কবিতা বলা যাবে।

অযোধ্যাব পাটবাণীর স্মৃতিকাগার দৈর্ঘ্য ৭ হাত, প্রস্থ ৪ হাত ও উচ্চ ৫ হাত বই নয়, এমন কি হইতে পারে ৭ সে স্মৃতিকাগার নিশ্চয়ই দৈর্ঘ্য ২৭ হাত, প্রস্থ ৪০ হাত এবং উচ্চ ৫০০ হাত।

বাম ভূমিষ্ঠ হইলে পর কোশল্যাব প্রথমা পটিকাংশ বাবী খাম দ্ববায় উপস্থিত হইয়া রাজা দশবৎসে শুভ সংগ্রহ আশ্রয় করিল। তখন বেলা ১০ ঘট্টা ১১ মিনিট ২২ সেকেন্ড।

তখন পাস দ্ববায় পদান মনো, শোভাশ্রম, ৭ জন মতাসদ, ৬ জন চোপদার, ৪ জন খানসামা, ২ জন লক্ষ্য, ২ জন লক্ষ্য নোবক, ৪ জন পত্র বাহক এবং ১২ জন প্রহরী উপস্থিত ছিল। সম্রাট পটিকা মনে রাজা পুত্র দর্শনার্থ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন। সিংহাসন সন্নিবিষ্ট দেড় কোটী আড়াই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যের মণি সুতা খচিত এবং ওৎসবে ১ নন ৩৫ সেব ৩ পোয়া ২৮০ ছটাক। সিংহাসন হটতে নামিয়া তিনি ঔষধাশ্রম, সভাসল্লয়, ২ জন খানসামা ও ৪ জন প্রহরীকে তাহার সঙ্গ আশ্রিতে অনুমতি দিলেন এবং আপন কণ্ঠহার খুলিয়া বাবীকে তাহা পারিতোষিক প্রদান করিলেন। সে কণ্ঠহারের মূল্য ৭৫ লক্ষ ১২ হাজার ৫১ ৭৬ স্বর্ণ মুদ্রা। রাজা দশবৎস তখন আফ্রাদে এতই বিহ্বল যে বাঁ পায়েব জুতা ডান পায়ে এবং ডান পায়েব জুতা বাঁ পায়ে দিয়াই অস্ত্রপুবে প্রবেশ করিলেন। এই অত্যাবশ্যক কথাটি অল্প কোন ইতিহাসে লিখিত হয় নাই। এবং সেই জন্ত সে সকল ইতিহাস এক কালে অসার, অপদার্থ ও গোববহীন হইয়া পড়িয়াছে। অমরা ক্রমাগত পঁচিশ বৎসব অনুসন্ধান কবিতা এই মহামূল্য কথাটি অবগত হইয়া ইতিহাসের ঐতিহাসিকত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছি।

রাজা স্মৃতিকাগারেব দ্বাবে উপস্থিত হইয়া মাত্র পুর্বাধিনিবীবা শব্দ ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন প্রথমা ধাত্রী নবজাত শিশুকে ক্রেড়ে লইয়া রাতার সম্মুখে আনয়ন করিল। প্রথমা ধাত্রীর নাম যোশি, তাহার বয়স

৬৩ বৎসর ৭ মাস ১২½ দিন। সে গৌরবর্ণা ও কৃশাকী। তাহার বাম হস্তে ৬ টি অঙ্গুলি এবং দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখটি খুব বড়। রাজার সম্মুখে আনিবামাত্র শিশু একবার হাঁচিয়া ফেলিল। সকলে ‘দীর্ঘায়ু, দীর্ঘায়ু’ বলিয়া উঠিলেন এবং রাজার অমুমতি পাইয়া কোষাধ্যক্ষ শিশুকে যৌতুক ও ধাত্রীদিগকে পারিবারিক প্রদান করিলেন। তদনন্তর রাজা বহির্বাটীতে গমন করবেন বলিয়া যে বলেন। কিন্তু তখনও তিনি আহ্বানে এত আত্মহারা যে বেশজ্ঞান নহল দিয়া না আসিয়া ঠেকেরাব মহল দিয়া আসিতে লাগিলেন। আসিতে আসিতে সন্নিবেশন কৈকেয়ীর কক্ষে নিকট উপস্থিত হইলেন তখন হঠাৎ একজন পরিচারিক কৈকেয়ীর চৈতন্যহীন হইতে এক কুলা ছাই গর্তের কাছের দরজা দিয়া ঢাক দিয়া ঢাক পড়িল। ‘আঁখু গিয়া, ঘাঁখু গিয়া’ বলিয়া রাজা বদিতা পড়িলেন। পতনবিধা তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল; বৈবর্তনীয় পক্ষে ইতিহাস লেখবেবা বলিয়া থাকেন যে সেই অবিবাহিতা অন্ধ হন। কিন্তু আমবা জানি, তা নয়—তাঁহা বা যৌব মিথ্যাকথা করিয়াছেন। এবিষয়ে আমবা বিশেষভাবে বিস্তর অল্প সন্ধান করিয়াছি। অহুসঙ্কানের ফল এই ইতিহাসের কথা স্থানে প্রকাশ করিব। তাহার পর—

তর্ক। আবার বলিতে হইবে না। এই বকম করিয়া লিখিলেই ইতিহাস হয়?

সা। হাঁ।

তর্ক। বার্মাকি যদি এই বকম করিয়া বায়ামণ লিখিতেন, তাহা হইলে বায়ামণ ইতিহাস আখ্যা পাঠিত?

সা। পাঠিত বই কি।

তর্ক। আচ্ছা, একম ইতিহাস তোমাদের দত্ত আছে?

সা। সহস্র সহস্র—সংখ্যা হয় না।

তর্ক। তোমাদের মধ্যে ঐ সকল গ্রন্থের আদর কেমন?

সা। খুব আদর—এমন কি, আমাদের মধ্যে যে যত ইতিহাস পাঠ করে সে তত পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়।

তর্ক। তোমাদের টোলও কি ঐ বকম ইতিহাস বেশি পাঠিত হয়?

সা। আমাদের টোল নাই, ইন্সুল, কালেক্স ও ইউনিবর্সিটি আছে। তথায় বালক দিগকে রাশিবাশি ইতিহাস পড়িতে হয়, নহিলে তাহাদিগের শিক্ষা নিতান্তই অসুখীন হয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

তর্ক। সাহেব, তোমাদের ইতিহাস আর তোমাদের শিক্ষা লইয়া তোমরা থাক, আমাদের উপকথাই ভাল । এখন এস অন্ত কথা কই ।

শিশু মহারাজ ।

ঝিমি ঝিমি নিশীথিনী, সাধে গলা বিবাদিনী,
 লক্ষ ঝিলী তাহে সঙ্গেতে ঝঙ্কাবে,
 লক্ষ্য নাই কার পাছে, বক্ষ পাতি পড়ি আছে,
 গভীরা, গম্ভীরা, বিভোবা আঁধাবে ।
 কোলেতে কালিন্দী বন্যা, কুলে কুলে বহে বন্যা,—
 অন্ধ জননী ব নন্দিনী আঁধাব,
 কেবল উজ্জল ছটা,— কুন্তল সৌমন্ত ঘটা,
 হীবক কোবক তাবক আঁকাব ।
 গহন অটবী ঘন, বিশাল বিটপীপণ,—
 প্রবলা বরুণী ভাবতে অচ্ছন্ন;
 অন্ধকাঃ স্তূপ মত রনিয়াছে ইতস্ততঃ,
 শাখা কাণ্ড পত্র সমানে পচ্ছন্ন ।
 বিরাট বিটপী বট ঢেকেছে কালিন্দী তট,
 সোঁটা সোঁটা জট! বিলম্বিত জলে,
 যেন সেই বটতল, তামস আশ্রয়স্থল;
 —ভয়ে ভয়ে ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা জলে ।
 অমোঘ পশ্চিমে মেঘ, অমোঘ বায়ুর বেগ,
 ঘেঘিতে দেখিতে ছায়ািল গগন ।

কোথা সে নক্ষত্রকুঞ্জ, কুন্তলে হীরবপুঞ্জ ?
 ঘোর অন্ধকারে বিশ্ব নিমগন ।
 না—না—খদ্যোতিকা আছে, কোপে কাপে গাছে গাছে,
 সাজায়ে বেখেছে সুন্দর সজ্জাব ;
 বাতাসে উডানে লয়, তথাপি জড়ায়েরয়,
 স্তূপের পিবীতি মবিতে জুয়ায় ।
 শৌণ্ড শৌণ্ড সসীরণ হেলাইল মহাবন,
 আতস ফুয়াবা খদ্যোত ছুটিল ;
 কালিন্দীর কাল জলে, মজিতে মজিতে জ্বলে,
 তবঙ্গ ভঞ্জেতে পবাণ তেজিল ।
 মরিল খদ্যোত পুঞ্জ, নিবিল তাবকাকুঞ্জ,
 গগন মেদিনী সব একাবাব ;
 জুড়িয়া জগত কায়া— ছায়া—ছায়া—মহাছায়া—
 সব অন্ধকাব—মহা অন্ধকাব !

আসে বৃষ্টি তড় তড়, চলে বজ্র গড় গড়,
 দামিনী দাঁপিছে বোম জল স্থল,
 বটতলে দৃশ্যমান— বালচ্ছবি লব্ধমান,
 উর্জ কবপুটে, বিভাব বিহ্বল ।
 ভয়েতে বিহ্বল নহে, অটল দাঁড়ান্নে বহে,
 বায়ু বারি বজ্র জক্ষেপ কবে না,
 মাতৃ অঙ্কে শিশু বেন, স্তম্ভফুল ভাব হেন,
 নড়ে না, চলে না, টলে না, সবে না ।
 সায়ন্তুব মনুবংশে উত্তান পাদেব অংশে,
 জ্বব নামে শিশু, সুনীতি নন্দন,
 পঞ্চম বর্ষেব বেল। তেয়াগিয়া ধূলা খেলা,
 কঠোর কঠিন তপস্যা মগন ।
 কি কোমল কম কাস্তি ভক্তি ভরা পূর্ণ শাস্তি !
 উজ্জলে মধুরে যোহন শোভন !

এক মনে, এক ধ্যানে, রুদ্ধশ্বাসে, শুদ্ধ প্রাণে,
ভাবে মাত্র পদ্য-পলাশ-লোচন ।

বাড়িল বায়ু বড়, বহিল তুমুল ঝড়,
মডমড শব্দে শাখা ভাঙ্গি পড়ে,
বর্ষিছে মুখল পাবে, ইবস্মদ হৃৎকাবে,
ঘর্ঘব ঘর্ঘব কড়কড় কড়ে ।
পড়ে বজ্র শিশু পাশে,— মধুব অববে হালে;
ধীবে ধীরে শিশু মেলিল নয়ন,
দেখিল জ্যোতির স্তম্ভ— স্বর্গে মর্ত্যে অবলম্ব,
বলে, ‘এলে পদ্য-পলাশ লোচন !’
ঋষ যাব দিতে কোল, থামিল দাক্ষণ বোল,
নিমেষ দেহিতে নিভিল জলন;
হেবে শিশু চাবি ধাব, অন্ধকাব ! অন্ধকাব !
বলে, ‘গেলে পদ্য-পলাশ শোচন !’
পুন ঋষ পবক্ষণে, একান্ত প্রশান্ত মনে,
ভক্তি-ভব-ভাবে, ভাবে নাবাষণে;
সুনীতি বলেছে যাহা, শুদ্ধ মাত্র ভাবে তাহা,
সেই এক পদ্য-পলাশ-লোচনে ।

হইতেছে বড় বৃষ্টি, নড়িছে ব্রহ্মাব স্রষ্টি,
না নড়ে, না টলে, ঋষ ঋষচিত;
চৌদিকে অঁধাব ঘোর, অন্তরে উজ্জল ভোর,
অঙ্গে মূহু কান্তি হয় বিভাসিত ।
ঘন ঘোব ভুকম্পনে, বজ্রপাতে কণে কণে,
গিবি গুহা ছাড়ি সিংহ বাহিবিল,
অলিছে লোচন ছটা, ভিজিছে কেশর জটা,
লেলিহান জিহবা জলিতে লাগিল ।
গর্জ্জ বজ্র মহা ঘোষে; সিংহ সিংহ নাদে রোষে,
উক ফুক হয়ে চারি দিকে চার,

বিস্ময় মনেতে মানি, বলিতে বলিতে বাণী,
 ধীরে ধীরে ধ্রুব মুদিল নয়ন ;
 পড়ে বজ্র, বাড়ে বৃষ্টি, কল্পে ভূমি, নড়ে সৃষ্টি,
 —ভাবে সেই পদ্ম-পলাশ-লোচন ।

কালিন্দীব কাল জলে, কালেব বল্লোল বলে,
 ঘম ঘব জীব যার খব টানে,
 অজগর ফণধব, যায় স্রোতে তর তর,
 আছাড়ি, কাছাড়ি, তবঙ্গ তুফানে ।
 লাগিল বটেব জটে, উলটি পড়িল তটে,
 সূদীর্ঘ আয়ত বিষম ভয়াল ।
 হইল জীবনে আশ, ছাড়ে সর্প দীর্ঘ শ্বাস,
 ব্যাদানে বদন বিস্তৃত ববাল ।
 জ্বলে চক্ষু ধীকি ধীকি, নাড়ে জিহ্বা লীকি লীকি,
 বিস্তারয়ে কণা দ্বিগুণ চৌগুণ ।
 বাঁকায়ে তুলিল শিব, কাঁপাইল বীবি ধীর,
 জলে শিরোমণি শীতল আগুণ ।
 মণি আভা বটতলে, অতি মূহ মূহ জ্বলে,
 সিংহোপবে শিশু ভুজঙ্গ হেবিল,
 মূর্তি স্নকুমারতম. ননীৰ পুন্দরীকম,
 বসনা নিকলি চাটিতে লাগিল ।
 চেতনা পাইয়া তবে, সর্পেবে হেবিল যবে,
 ভাবে এই পদ্ম-পলাশ-লোচন ।
 দেহ অতি সুবিচিত্র, ষেত কুম্ভ কত চিত্র,
 মাথায় মানিক অতীব শোভন ।
 ধরিল ভুজঙ্গ গলে, বক্ষে নিঙ্গ কুতূহলে,
 করিল চুষন স্বিজিহ্ব বদন,
 বলে 'দেখি অপরূপ তোমার কতেক রূপ !
 বহুরূপী পদ্ম-পলাশ-লোচন ।'

ঘুটিল নর্পের নর্প, পাশেতে দাঁড়াল নর্প,
 ধরিল চক্রক শিশুর মস্তকে ।
 ছাড়ে বৃষ্টি বজ্রপাত ; বিশ্ব শান্ত সুপ্রভাত ;
 পূর্বব গগনে অরুণা ঝলকে । .
 পাখীতে প্রভাতী গায়, বহিছে বল্লব বায়,
 সুধীব সুশান্ত যমুনার জল,
 সুমিষ্ট ধবনী পবে তরুণ অরুণ কবে,—
 সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য পূরিত সবল ।

সপ্তঋষি যাব স্নানে, উপনীত সেই স্থানে,
 দেখে সিংহাসনে শিশু মহাবাজ,
 বিস্তারিয়া ফণপত্র মাথায ধরেছে ছত্র
 মহা অজাগব ভীম নাগ বাজ ।
 ঋষে তবে ঋষিগণ, “এই সেই মধুবন,
 এই সেই ধ্রুব, সুনীতি বালক,
 আমাদের উপদেশে আসি এই বন দেশে
 বিশ্বাসে আশ্বাসে হয়েছে সাধক ।”
 বুঝিল, ভক্তিব বলে ধ্রুব শিশু ধবাতলে
 শ্রেষ্ঠ বাজপদ লভিয়াছে আজ,
 সিংহ পৃষ্ঠে শিশু আছে, নর্প ছত্র ধবিয়াছে,

প্রকৃতির রাজা শিশু মহারাজ ।

উপরে বিটপী বটে— চন্দ্রাতপ শোভা বটে,
 যমুনা বহিছে—অভিষেক জল,
 প্রাচীন অরুণ ভাতি— হৈম দীপে জলে বাতি,
 সামগান গায় বিজ্ঞ অবিবল ।
 তবে সেই সপ্ত ঋষি ঘেরি ঘেরি চউদিশি,
 ধ্রুবমহারাজে করে প্রদক্ষিণ,—
 নবীচি, অদ্বিরা, আব অত্রি, ক্রতু, এই চার
 পুলস্ত, পুলহ, বশিষ্ঠ এ তিন ।

ককে খেত কামাধনি, বকে খেত গোমাধনি,
খেত কেশ নাম, খেত অক্ষ ধারী,
ভালে ভালে এক কালে, কদ্র ভালে, ব্রহ্ম ভালে,
নাচে, বায়, কেরে—সারি সাবি সাবি।

“অন্ন ব্রহ্ম সনাতন ! শিশুব সর্বস্ব ধন !
ভক্তেব ভক্তিতে ভাবনা-ভঞ্জন !
বালক সাধক বরে বক্ষিলে অপন কবে,
ধন্য তুমি পদ্ম-পলাশ-লোচন !”

মৈথিল যাত্রা ।

মিথিলার বাইজীর আড্ডা বহু দিন হইতেই আছে; সম্প্রতি বাবুজী এখানে এসে থিয়েটার খুলেছেন। মৃদঙ্গ করতালের স্থানে তবলা বেহালা অভিষেক করিয়া আড়-ধেমটার আখড়াই দিতেছেন। সারঙ্গে সা রে গা মা সাধনা পূর্বমতই চলিয়াছে; উপবোক্ত বাঙ্গালী বাবু বিলাতি সুর বিবিজানের বামানুবে মিশিয়া বাঙ্গালাব ন্যায় এই ঝেড়ুয়াব দেশ মিথিলাতে ঢালওয়া নাট্য রসেব অতি স্নন্দর ও সভ্য বন্দোবস্ত কবিয়া দিতেছে। সংগীত শাস্ত্রের সেবা কিবা প্রাক হইতেছে, আমি ঠিক বলিতে পারি না, শাস্ত্রে অঙ্গনেই অধিকার নাই। তবে এটা খুব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ত্রিহতে বিদ্যাপতির আমলের সে বাদ্যভাণ্ড এখন চুরমার প্রায়। সে কালের লেই ধানশী, ধ্রুপদ, ধামালের অন্তর্ভুক্ত উপস্থিত—বাইজী ও বাবুজীর মুহু মধুর কণ্ঠ সঞ্চালনে। ধামাল ধানশীর অসহা বাহাই হটক, আর নিজে কিন্তু বাইজী বা বাবুজী কাহারই প্রতি বৈমুখ নহি। শাস্ত্রে দখল না থাকিলেও তাঁহাদের উভয়কেই আমি,—বোল আনা রকম না হটক,—এক আন আন আকাজগু স্বত্তোগ করিতে সমর্থ। বাইজীর,—বিধাতা তাঁহার

ব্যবসা বজায় রাখুন,—মজল্ (নোকতাদার ও বে-মোকত্তা) আমার বিলক্ষণ প্রিয়। পরন্তু বাবুদেব “নাট্য—সমাজ” রত্নাভিনয়ও আমার অরাম-দায়ক। রূপে রসে রাগে উপবোধ উভয়ের কেহই কম নছেন। লংক্ষেপত এ অধীন উভয়েরই নিকট কৃতজ্ঞ, উভয়েরই বাধ্য।

তবে জনৈক স্বদেশীয় সমজদাব আমাদের আধুনিক যাত্রা সমালোচনা প্রসঙ্গে কেমন একটা কথা লিখে ফেলেছেন,—সেটা আমার সময়ে সময়ে হঠাৎ মনে এসে যায় কিন্তু কথাটা কিছু কর্কশ। কথাটা এট ভাবের বে যেদিন থেকে আমাদের দেশে তবলা বাঁওয়া দেখা দিয়াছে, সেই দিন থেকে নাকি সুব-সঙ্গত-সঙ্গীতের সপিণ্ডীকরণ আরম্ভ হইয়াছে। সে সপিণ্ডীকরণ সাক্ষ্য দিয়া সঙ্গমাণ বা সমর্থন কবিত্তে আমি উদ্যত নহি; পরন্তু উহার সত্যতাব বিচার—বিবেচনা—বিশ্লেষ কবিত্তেও আমি স্বভাবত ও শিক্ষা বশত অক্ষম। কেবল এই প্রবাসে ঐ শিও পবিচ্ছেদ যজ্ঞ প্রত্যক্ষ কবিষাছি তাহারই কিছু ‘পরিভাষা’ কবিলেও কবিত্তে পাবি। কিন্তু আমার এই ‘প্রস্তবে’ বিষয় ‘মৈথিল যাত্রা’। অতএব অন্য বিষয়ে অধিক ছন্দ বন্ধ, আব অনায়াস।

গত জ্ঞানুয়ারি মাসে,—কথাটা একটু গোড়া ঘেঁসে বলাই ভাল,—একটা বিষয় কার্য উপলক্ষে, কিছু “রং তামাসা” দিবাব প্রয়োজন আমাদের হয়। রং তামাসা, সাধাবণেই জনা; অতএব সাধাবণ রুচিব অনুবর্তী হইয়াই আমরা তাহার বন্দোবস্ত কবি, কয়েক দিন ধরিয়া খুব নাচ-রঙ দিবা রাত্রি ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত (?) হয়। বাই নাচ, নট নাচ—কয়েক বকমের “নাচরং” ভিন্ন ভিন্ন তথ্যের ছিল। অবশ্য কেবলই নাচ নয়, গানও ছিল এবং গানই অধিক। কিন্তু ‘নাচ’ কথাটাই এ অঞ্চলের লোক সাধারণত ব্যবহার করে, তা যে ধবণের নৃত্য গীতই হউক না। সেই জন্য এখানে আমাদের এখন যে ‘থিয়েটর’ বা ‘নাট্য সমাজ’ হইয়াছে তাহাকে এখানকার লোকেরা বলে “বাজালীর নাচ”। বিপদ আর কি!

কয়েক দিন ভিন্ন ভিন্ন নাচ বডেব পর আমার নিজেই ইচ্ছা ক্রমে এবং জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ সহকারীর পরামর্শে আমরা, একদল অমিশ্রিত আসল মৈথিল ‘নাচ’ আনাহিলাম। ইহাকেই আমি বলিতেছি ‘মৈথিল যাত্রা’। মৈথিল যাত্রায় মুদঙ্গ মন্দিরা করতাল দেখিলাম; সারঙ্গের মত এক রকম বেহালাও দেখা গেল। বাদ্য যন্ত্র সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। যাত্রার অধিকারী

আছে, হোকরা আছে, সখী আছে, সংও আছে । অথবা ইহার সকলই সং । ইহাদের হাব ভাব পোষাক 'পেঙ্গয়াজ' দেখিয়া আমি নিজে পুৰাতন শ্রেণীর লোক হইয়াও প্রথমত হাসি বাখিতে পাবি নাই; অতএব নব্য সভ্য বান্দুদের তু কণাই নাই । অধিকারীর মাথার মুকুট, পরিধানে গুরুয়ের পোষাক; ধূতি মেবজাতি, কখনও বা টিসে পায় জামা । সখীবা আমাদের বাঙ্গালা যাত্রার সখীদেরই মত,—নাচে, গায় 'পাঁওচারি' কবে । নৃত্যের প্রত্যেক উপসংহারে বাহুব বক্র বিস্তার,—তদ্বাবা ভাল রক্ষা,—একটু নৃতন ভঙ্গি,—সেটুকু আর লিখে কিরূপ জানাইব? এষ্ট যাত্রাকে মৈথিলবা খুব বিগুজ ভাষায় অভিহিত কবে;—বলে "নাটক অভিনয় ।" কথাটা ইহাদের মধ্যে, আমাদের মত, ইংবেজী আমলের আমদানি নহে । উষাহবণ, পারিজাত হরণ, ক্রুফের জন্ম ইত্যাদি অনেক বকমেব নাটক অভিনয় এখানকাব যাত্রা-ওয়ারীবা কবে । তা ছাড়া বিদ্যাপতির পদ গায়, গীত গোবিন্দের গাথা গায় । অধিকারী সংস্কৃত ভাড়া কাটে, শ্লোক পড়ে, কবিতা ব্যাখ্যা কবে, বক্তৃতা দেয় 'ঘটকালি করে ।' যাত্রাব গানেব ও বখার ভাষা চমৎকার বিগুজ, অবিকাংশ সংস্কৃত, পবস্ত্র মৈথিল ভাষাব মিষ্টত্বেব ত কথাই নাই । যে সব নাটক সচবাচব ইহার অভিনয় কবে, তাহাব অধিকাংশই আধুনিক এবং বেশ পণ্ডিতদিগেবই বচিত । মৈথিল ভাষাব উয়া হবণ, নাটক সে দিন ছাপা হইয়াছে দেখিলাম । এখানি, "শ্রীহর্যনাথ শর্ম্মণা মৈথিলেন প্রণীতম্ ।" এই নাটকেব এক আধটা গান অধিকাংশ মতে আপনার পাঠক দিগকে উপহার দিলেও আমি দিতে পাবি ।

নাটক অভিনয়ের "তোড বোড়" সাজ সবঙ্গম—এই যাত্রাওয়ারী দিনেব কিছু কিছু নী আছে, এমন নয়; কিন্তু সে সব নেহান্ত জঘন্য ও অগ্রচূর । প্রকৃষ্ট ও প্রচুর ওয়াও অসম্ভব । আহাঃ সমেত মবলগে সাত টাকা ভোব রাতি 'নাটক অভিনয়' দেওয়াব থোকা থাচ । ইহাতে আর কত প্রত্যাশা কবিতে পাবেন মহাশয়! এখনকাব সব মৈথিল রান্না-রাইচুনা সুইডেন সুইজরলাণ্ডেব সংগীতেব উন্নতি সাধনার্থ ভূবি অর্থ ব্যয় করেন এবং ব্যয় করিতে প্রস্তুত শুনিতে পাই । তা তাঁহাদের স্বদেশীয় সঙ্গীতের জন্য সিকি পরসং যদি কখনও ব্যয় কবিতেন, তা হলে বোধকরি এই যাত্রার অন্য রকম বৃত্তান্ত আমাকে লিখিতে হইত । কিন্তু 'উন্নতিতে' আসল ভিনিষ যেমনভর আজকাল বিগড়ে বাইতে দেখা যাইতেছে, তাহাতে 'উন্নতির'

নাম লইতেও যেন কেমন একটা ভয় হয়। আধুনিক উন্নতি প্রবেশ করিলে এই মৈথিলি যাত্রার হয় ত ভিন্নমুষ্টি দেখিতে হইবে এবং সে মুষ্টিতে আর ইহার ষাটি স্বজাতীয়তাকু দেখা যাইবে না ।

আমরা যে যাত্রা আনাহিঁষাছিলাম তাহা নাকি এখানকার খুব একটা প্রেষ্ঠ দল । রাজা মহাবাজা শক্তি শ্রেষ্ঠীয়েব মজলিসেই নাকি ইহার ‘গাওনা’ হয়; যথা তথা হয় না । এই যাত্রাব নাম শুনিতেই আমাদের ফাঁদী নবিস লালা আমলাবা যেন কিকিৎ বিবক্ত হইলেন । তাঁহাদের মতে,—মতটা যদিও ভাদৃশ সপ্রকাশ হইবার অবসর ছিল না, উপবোক্ত সঙ্গীত ‘অসভ্য গোঁয়ারের গান’ । তাঁহাদের ভাবটা এমনিতব যে যা কিছু সভ্য ও সুচিকিৎস তাহা কেবল বাইজীর গজলে । বস্তুত মুন্সী মণাশয়বা মুসলমানী দ্রব্য ভিন্ন অন্যত্র সভ্য “তামিজি” “চিজ্” খুব কমই দেখেন । মুন্সীবা আমাদের “ময়াকেল” আসিলেন ষটে, কিন্তু এ ‘ময়াকেল’ তাঁদের মনের মত হইল না । আমক কারাবাব’ খাতিরে অল্পক্ষণ বসিয়া আমাদের মন বক্ষা কবিরী একে একে আস্তে আস্তে পিটান দিলেন । এখন যত বিপদ আমাব আব সেট মৈথিলি ত্রাঙ্গগণিব । গান আমাদিগকে শুনিতেই হইবে ; নহিলে আর শুনে কে ? রাত্রি কাল কনকনে শীত, তবুও নিস্তার নাই । চেয়াবেব চারি দিকে আগুন জ্বলিয়া কপিত কলেবরে যাত্রা শুনিতে লাগিলাম । কয়েক দিন যিবি ও বাবুয়াদের “কীণ ক’ষ্ঠর চুটকি কবত্বে, তবলা সারঙ্গের মূহু কন কনে, কর্ণপটহ কিছু ‘মহালস-ময়’ হয়ে উঠেছিল,—আজ তাহার পূর্ণ ‘সংস্কার’ উপস্থিত । ‘ত্রিহত’ (২) গীতেব তাব সুরে ভীক্কাচ্চ বন্ধাবে কর্ণ-বিবর বুঝি বা বিদীর্ণ হয় । সপ্তমের উপবেও যদি কোনও উচ্চতব ‘স্বব গ্রাম’ থাকে তা হলে তাহা এই এখানে,—‘ত্রিহত’ গীত ধরিবাব সময় । বস্তুত এমন তর ‘চড়া সুরে’ গান ধরিভে অন্যত্র অসুভব কবিরীচি বলিয়া স্মরণ হয় না । যাহা হউক আজ ‘মজলিসেব’ ভাব অন্য বকম । পূর্বে কয়েক দিন ররিয়া বাইনাচ হইতে বঙ্গর নাচ খুবই হটয়াছিল, কিন্তু গান এক দিনও ‘জমে’ নাই কিন্তু আজ বিলকশ ‘জমাট’ । মৃদঙ্গের গভীর নাদে ও ‘ত্রিহতের’ আকাশ-ভেদী

* ছোট ছোট ছোকরা বট ।

(২) বিদ্যাপতির পদাবলী ও তদনুরূপ গীতকে ‘ত্রিহত’ বলে । বলার কারণ এই সকল গান খাস ত্রিহতের কীর্তি বলিয়া নয় কি ?

খানে 'পাশ জমিয়াছে', শীত ভাঙ্গিয়াছে, লোক জুটিয়াছে; আর চাই কি ? এখন আমি কেবল এই বলিতে চাই যে নৈখিল যাত্রা অদ্যাপি ইহার আনন্দিম ভাব রক্ষা করিয়া বহায় আছে এবং আমাদের যাত্রার প্রাথমিক অবস্থার ইতিবৃত্ত খুঁজিতে হইলে নমুনা স্বরূপ দৃষ্টিপাত করিতে হয়, এই নৈখিল যাত্রার প্রতি। শুভলা বামা ও ক্ষীণ কণ্ঠের ও চুটকি স্রবের বিস্তর গুণ গ্রাম, মনোহরণ-শক্তি থাকিতে পারে এবং আছেও বটে—কিন্তু উহারা যে আমাদের যাত্রাকে জঘাট ভাব ধ্বংস করিয়াছে, বা এতি রাত্রেরই করিতেছে,—ইহা এক প্রকম নিশ্চিত।

মাক্বেথ ও হ্যাম্লেট ।

৪ ।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, পাপের সামান্য ক্ষুদ্র দুঃখইয়া দুঃখইয়া ক্রিষ্টপে ক্রমে ক্রমে জ্বাকাঙ্ক্ষার শুষ্ক সমিৎ কাঠের পরিপোষণে কুপ্রভতির কুব্যক্তাসেব পরিসেবনে, দারুণ নাবানলে পবিত্রীকৃত হইয়া আপনার বাস্তব-কেত্র দগ্ধ করিয়া ফেলে, মাক্বেথ নাটকে তাহাই দেখান হইয়াছে। মজ-তক বেশন আপনার বীজ-কোষেই বীজ সতল অঙ্কুরিত, আর অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত করিয়া আপনার হৃদয়েই শতশত ক্ষুদ্র তরু ধারণ করে, একটি জীৱন্ত মহাপাপ, তেজস্বী শত শত পাপাঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিরাজমান হয়, ইহাই মাক্বেথ নাটকের কথা।

প্রথম অঙ্কে অভি নামান্য অঙ্কুর হইতে পাপতরুর পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন; অঙ্কের শেষ ভাগে পাপতরু জট গড়িয়া বলিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কে পাপতরু বিজৃত শাখা প্রশাখায় নব নব পুষ্প পক্ষা বিরাজমান;

তৃতীয় চতুর্থে সেই বিষতকর ফল পাকিতেছে, বৃক্ষের উপরই শত শত জঙ্ঘর হইতেছে, শত শত পাপ বৃক্ষ, মহা বৃক্ষে পরিবর্জিত হইতেছে। এখন সেই কথাই বলিতে চলিলাম।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, রাজতবনের এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে বান্ধো আপনা আপনি ভাবিতেছেন। এই নাটকে কি ভাবে বান্ধো মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন; তাহা এই স্থলে একবার স্মরণ করা কর্তব্য।

মাক্বেথ বৈরূপ ডঙ্কানব সেনাপতি ছিলেন, বান্ধোও সেইরূপ সেনাপতি ছিলেন; নাটকের আবশ্যেই দেখা গিয়াছে, উভয়েই অতুল সাহসে তুমুল সমরে জয়লাভ করিয়াছিলেন। মাক্বেথ ও বান্ধোর সহিত প্রথমে একত্র আমাদের সাক্ষাৎ—তখন নব বিজয়ের উৎসাহে উভয়ে রাজ-শিবিরে আসিতেছিলেন—পশি মধ্যে প্রাস্তব ভূমিতে প্রেতিনীগণকে দেখিতে পান। বান্ধোই প্রথমে দেখিতে পান; কিন্তু প্রেতিনীগণ প্রথমে মাক্বেথকেই অভিবাদন করে। মাক্বেথ সিহরিয়া উঠিলেন, বান্ধো প্রেতিনীগণকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন। মাক্বেথ শিহরিয়া উঠিলেন, কেননা প্রেতিনীরা তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়াছে; বান্ধো ভৎসনা করিলে যে তাঁহারা দুই জনেই আসিতেছেন, তাহা একজনকে অভিবাদন করিল, আর একজনকে কিছু বলিল না কেন? বান্ধো আপনিই বলিলেন, যে তিনি প্রেতিনীদের অনুগ্রহেব আকাজ্ঞা বা নিগ্রহের আশঙ্কা করেন না, মাক্বেথ কিন্তু একেবারে অভিভূত হইলেন, এই চবিত্ত বৈচিত্র্য আমাদের বিশেষ লক্ষণীয়।

প্রেতিনীরা তিবোহিত হইলে, বান্ধো মাক্বেথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্য সত্যই আমরা প্রেতিনী দেখিলাম, না, পাগল। গের্ডো থেয়ে আমাদের বুদ্ধি ওজ্জ্বল পাইয়াছে?" মাক্বেথ উত্তর করিলেন "তোমার সত্যনিরা রাজ্য হইবে।" কি কথার কি উত্তর! বান্ধো ভাবিতেছেন,—যাহা দেখিলাম তাহা সত্য কিনা—মাক্বেথ ভাবিতেছেন, তাহারা বাহা বলিল তাহা কলিবে কি না। হরাকাজ্জার বিষ-বীজ মাক্বেথ হৃদয়ে আপনার প্রকৃত-সঙ্গত রস পাইয়াছে, বান্ধোর হৃদয়ে পায় নাই।

* Speak then to me, who neither beg nor fear

Your favours nor your hate.

প্রথম অঙ্কে চতুর্থ দৃশ্য দেখান হইয়াছে রাজা ডক্কান মাক্বেথ ও বাক্কো উভয়কেই সমান ভাল বাসিতেন, সমান আদর করিতেন। ষষ্ঠ দৃশ্য দেখান হইয়াছে, বাক্কো মাক্বেথ ভবনে প্রবেশ করিয়া মহা আত্মাধিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সপুত্রক বাক্কোর বিবরণ আমরা পূর্বেই (৩৫৮ পৃষ্ঠায়) দিয়াছি। বাক্কো হুঃস্থপ হইতে রক্ষার্থ দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করেন; দুর্কার্যে হুঃস্থতি তাহাব নাই। স্বপ্নে যে ডাকিনীদিগকে দেখিয়াছেন সে কথা মুক্তকণ্ঠে মাক্বেথকে বলিলেন; মাক্বেথ জ্ঞাত্রেতে স্বপ্নে তাহাদের কথা ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু তাহা বলিতে পারিলেন না। বাক্কো ও মাক্বেথ সমান ভেজবী থাকিলেও পাপের অনুর উদগমে মাক্বেথ হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে যখন মাক্‌ডফ্ ডক্কান হত্যার কথা বলিলেন, তখন বাক্কো একবার মাত্র বলিলেন— ‘মাক্‌ডফ্ বল, যে তোমার কথা মিথ্যা?’ তাহাব পব আর কোন কথা কহিলেন না—কেবল যখন লেডি মাক্বেথ মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান, তখন বলিলেন “ধর, ধর, গৃহিণীকে দেখ।”

ঐ কহস্থলে মাত্র বাক্কোর সহিত আমাদের পূর্ব সাক্ষাৎ, তাহার পর এই তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বাঞ্ছ ভবনেব এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে বাক্কো আপনা আপনি ভাবিতেছেন;—

এখন সকলি হালা; রাজত্ব, সর্দারি
—যা কিছু বশিয়াছিল, প্রেতিনী মাগীরা
সকলি হইয়াছে—কিন্তু বিবম দুর্কার্যে;
তবু তাবা বলেছিলো তব বংশে রাজ্য
নাহি রবে; মমবংশে কিন্তু হবে স্বামী।
প্রেতিনীবা বলে’ থাকে যদি সত্য কথা—
খাটিয়াছে ঠিক ঠাক তোমার বেণায়—
আমার বেলায় যদি সেই মত ফসে,
তাহা হলে আমিও ত আশা কর্তে পারি।”

সম অবস্থার দুই জন লোকের মধ্যে চরিত্র বৈষম্য প্রদর্শন জন্যই মাক্বেথের পাশাপাশি বাক্কোর স্থিতি। দৈবী বাণী হোক, পৈশাচী বাণী হোক, এক জনের সম্বন্ধ কলিয়াছে; আমার বংশে রাজ্য হবে, এমন একটা কথা সেই

দৈবী বাণীতে অনিবার্হি, এমন স্থলে কে বল, আশা না করিয়া থাকিতে পাবে ? সুতবাং বাক্যের মনে আশার ছায়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু সে কেবল আশা মাত্র ; তাহাতে ছবাকাজ্জার স্পর্শ নাই ; আবার মাক্বেথের রাজ্য লাভে বাক্যের হৃদয়ে ঈর্ষার উদয় হয় নাই । ঈর্ষা থাকিলে এই সময়ে আমরা তাহা দেখিতে পাইলাম ।

বাক্সো ভাবিতেছেন,—এমন সময়ে রাজা ও বাণী কপে দলে বসে মাক্বেথ দম্পতি প্রবেশ করিলেন । মাক্বেথ বাক্সোকে সেই ব্যক্তির দরবার-ডোজে প্রধান ভোক্তাক্রমে নিমন্ত্রণ করিলেন । বাক্সো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, কথায় কথায় মাক্বেথ জামিয়া লইলেন যে বাক্সো তাঁহার পুত্রের সহিত সন্ধার পূর্বে অস্বারোহণে বেড়াইতে যাইবেন, এবং ব্যক্তি দুই চারি দণ্ড না হইলে ফিবিবেন না । মাক্বেথ সকলকে বিদায় দিয়া, একাকী ভাবিতে লাগিলেন ;—ভাবনার প্রথম কথা—

To be thus is nothing ;

But to be safely thus

একপ ভাবেতে থাকা—কিছুই ত নয়,

হতে নিষ্কণ্টক যদি পাবা নাহি যায় ।

এই কথাটুকু সহিত হামলেটের প্রসিদ্ধ স্বগতোক্তির তুলনা করিলে এই দুই নাটকের নায়কদ্বয়ের চরিত্র বৈচিত্র্য অনেকটা বুঝিতে পাবা যায় ।

মহাদুঃখী হামলেট চিন্তায় জর্জবিত, সন্দেহে বিষম আন্দোলিত, হামলেটের প্রধান ভাবনা—থাকিব কি না থাকিব ?

To be or not to be, that is the question

মহাপাপী মাক্বেথের কেবল আকাজ্জা—আকাজ্জা—রাজ্য হইয়াও এ আকাজ্জার শেষ নাই । তাহার প্রধান কথা—

থাকিতে যদি হয় ত নিষ্কণ্টক থাকিতে হইবে ।

কণ্টক কে ? বাক্সো । মাক্বেথ অনেকক্ষণ ধরিয়া কেবল বাক্সোর ভাবনাই ভাবিলেন, শেষে বলিলেন—

করিলার এত মহাপাপ কেবল কি

বাক্সোর বংশের বুক ভরাইতে আরি ?

তা হবে না । অদৃষ্ট রে এসো রে সমুদ্রে ।

অন্য যুদ্ধে স্বামরা, দেখিব রে তোরে ।

এই মাক্বেথ প্রথম প্রকাশিত পড়িয়া বলিয়াছিলেন, “অদৃষ্টে থাকে হবে, আমাব চেষ্টাব প্রয়োজন কি?” (৩১৬ পৃষ্ঠা) আজ সেই মাক্বেথ, দেখ অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম কবিত্তে প্রস্তুত ; এ সকলই পাণের লীলাখেলা । অদৃষ্ট বাদ পাণে প্রবৃত্তি দেয়—পাপীকে পাপ হইতে নিবৃত্ত কবিত্তে পাবে না ।

মাক্বেথ ইহাব পূর্বদিন, দুইজন গুপ্ত ঘাঠাব সহিত বান্ধোব বিকঙ্কে বডবস্ত্র কবিয়াছিলেন ; সেই লোক দুটাকে পূর্বের মাক্বেথ নামাকরণ যন্ত্রণা দিয়াছিলেন ; ঐ দিন বুঝাইয়া দেন যে বান্ধো হইতেই ত হাবা বস্ত্র পাটয়া ছিল ; তিনি (মাক্বেথ) সেই সবল যন্ত্রণাদানের প্রকারে লিপ্ত ছিলেন না । আজি আবাব মাক্বেথ সেই কথা সংক্ষেপে তাহাদিগকে বশিলেন, বান্ধোব বিকঙ্কে তাহাদিগকে উত্তেজিত কবিয়া গিলেন । শেষে বা বলেন, “বান্ধো তোমাদেরও শত্রু, আমাবও শত্রু, তাহাকে গোপনে খ্যান ন্যাকান্তবিত্ত কবিত্তে চাই । এই দিনই কথা চাই, আব সঙ্গে সঙ্গে তাহাব গুহ্ম দুঃখসংকেও বদম্বরে পাঠাইতে হইবে । কখন কোথাব, কিরণে কবিত্তে হইবে, আমি শীঘ্রই বলিয়া দিব ।” বাতৃকেবা, পিতা পুত্রকে হত্যা কবিত্তে স্বীকার কবিল, মাক্বেথ তাহাদিগকে বিনাম দিয়া ভবিত্তে লগিলেন ; —

এ কথাত হগো , বান্ধো তোমাব কপালে

যদি স্বর্গ থাকে—হবে অন্য বাত্রি কালে ॥

সমালোচনার প্রথমেই বলিখাতি, মাক্বেথের ছবাকাক্ষা বলে—বাহা কবিত্তে হইবে, তাহাতে শুভাশুভস্য শীঘ্র (৩১৩ পৃষ্ঠা) । এই স্থলের সহিত হামলেট নাটকের ঐক স্থলের তুলনা কবিত্তে হইবে । হামলেট আপনাব পিতৃহস্তা পিতৃবাকে হত্যা কবিবাব জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলেন, গিয়া দেখেন, পিতৃবা উপাসনা কবিত্তেছেন । ভাবিলেন, ইহাকে এখন হত্যা কবিলে, ইহার সদগতি হইবে,—না, একাজ এখন করা হইবে না । ইহাতেই বলিবাছিলাম চিন্তাপীড়িত হামলেট নিরন্তরই ভাবেন—শুভাশুভস্য কালহরণ ।

(৩১৩ পৃষ্ঠা) মাক্বেথের কথা—

স্বর্গে যায় থাক—কিন্তু অন্য বাত্রি কালে ।

আবাব আর একটি মাহপানের সংক্ষেপে এই প্রথম দৃশ্যের পরিসমাপ্তি হইল ।

আর্য্যজাতির কর্মকাণ্ড ।

(১৮০ পৃষ্ঠার পরে)

১৬। মনুষ্য মৃত্যুর পরে প্রথমত প্রেত লোকে গমন করে, প্রেত ক্রিয়া (দাহ অবধি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত) যথা বিধি অনুষ্ঠিত হইলে মনুষ্য পিতৃপদ বাচ্য হয়। এবং তৎপশ্চাৎ স্নান কন্মানুসারে কেহ স্বর্গে (২০) ও কেহ বা নরকে (২১) গমন করে। (২২) অ. হা স্বর্গ নবক ভোগাবসানে, জীব, পুণ্য পাপ কর্মের অনুবন্ধ বশত পুনর্বার পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্য বা তিথ্যাক্ষ্যে যিনি প্রবৃতিতে (২৩) জন্ম গ্রহণ করে। (২৪)

মনুষ্য জন্মদান করিলেও, পুণ্য পাপকলে স্নখী বা হুঃখী এবং স্নহ বা বোগী হইয়া থাকে।

জীব যাবৎ না মুক্ত হয়, এই রূপ স্বর্ষ কর্মের ফলভোগ, পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ ও বোনি ভ্রমণ করিতে থাকে।

১৭। মায়াচ্ছন্ন জীবাত্মার সহজেই মদগতি ও মুক্তিলাভ সম্ভাবিত নহে। কিন্তু কোন না কোন সময়ে জ্ঞান যাহা যেন শেষ লক্ষ্য প্রাপ্তি হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যেকণ উত্তাল তরঙ্গায়িত নদীগর্ভে ক্ষেপণী সঞ্চালন পূর্বক বায়ু ও প্রবাহ বেগে কখন হটিকা, কখন বা অগ্রসব হইয়া ক্রমে ক্রমে

(২০) স্বর্গশব্দে বাহারও মতে ক্ষিন্ন ভিন্ন স্নখ ভোগের স্থান—যথা পিতৃ-লোক (চন্দ্রলোক), দেবলোক (ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণাদি লোক) ইত্যাদি। কেহ কেহ বিশেষ স্নখ ভোগকেই স্বর্গ বলেন।

(২১) তামিস্র, অন্ধ তামিস্র, মহারৌবব, বৌবব, কুণ্ডীপাক প্রভৃতি হুঃখ ভোগের স্থান গুলিকে নবক কহে।

(২২) ‘ ভভো হসৌ নবকে যাতি স্বর্গে বা শ্বেন কর্ম্মনা ।’

ওদ্ধিতম্ ।

(২৩) পত্ৰ, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, জল, লতা ইত্যাদি।

(২৪) তেভ্যং ভুক্তা স্বর্গ লোকঃ বিশালঃ, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকঃ বিশস্তি ।

ভগবদ্গীতা ।

অথ নরকান্নকৃত হুঃখানাং তিথ্যাক্ষ্য মূর্তীর্ণানাং মাহুষ্যো লক্ষণানি ভবন্তি ।

ওদ্ধিতম্ ।

ভীষে উত্তীর্ণ হওয়া যায়,—যেকপ উচ্চ প্রাসাদে বা উত্তম পৰ্ব্বত শিখরে আরোহণ কালে, অত্যন্ত অগাবধানতা হইলেই পতিত ও ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেই ক্রমে উখিত হওয়া যায়, এবং যেক্রপ বণিক স্বকীয় ব্যবসায় প্রসঙ্গে চেষ্টাবান হইয়া কখন লাভ ও কখন বা হানি স্বীকার করত অবশেষে সফল মনোরথ হয়—তদ্রূপ লোকে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উত্তমোত্তম ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়া যোক লাভ কবে।

১৮ । কর্ম্মকাণ্ডেব চবম উ দশু চিত্তশুদ্ধি । যিনি কেবল সাত্ত্বিক কর্ম্মেবই অনুষ্ঠান কবেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি শীঘ্র হয় । যিনি অধিকাংশ সাত্ত্বিক, অগ্নাংশ রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম কবেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি অপেক্ষাকৃত বিলম্বে এবং যিনি অধিকাংশ রাজসিক তামসিক ও অগ্নাংশ সাত্ত্বিক কর্ম্মেব অনুষ্ঠান কবেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি আদৌ বিলম্ব হইয়া থাকে । ফলত যে যেক্রপ কর্ম্মই ককক না কেন, কর্ম্ম করিতে কবিতে ক্রমশ তাহার সাত্ত্বিক বদ নিকাম কর্ম্মে রুচি হইয়া তদনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মে । চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে, জ্ঞানবোগে (২৫) অধিকাব হইয়া চবমে মুক্তি (২৬) লাভ হইয়া থাকে । মহাপাপিষ্ঠ হইলেও, জীব বহু কোটি যুগান্তবে একদিন, না একদিন অবশ্যই মুক্ত হইবে । হিন্দু ধর্ম্মের এই একটি বিশেষ উদারতা ও মহত্ব ।

এই প্রকারে এক কালে সমুদয় জীব মুক্ত হইলে, তাহাকে আত্মান্তিক প্রলয় (২৭) বলে ।

(২৫) জ্ঞানযোগ—তত্ত্বজ্ঞান । শঙ্কবাচার্য্যেব মতে অবিভীষ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞান । নৈয়ায়িক মত জীবাত্মাকে তদিতর দেহাদি সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন রূপে জানা । সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে পুরুষেব ভেদ জ্ঞান ।

(২৬) মুক্তি দুই প্রকার—জীবমুক্তি ও পরম মুক্তি । যে দেহাবচ্ছেদে আত্মার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া অজ্ঞান নষ্ট হয়, যাবৎ সেই দেহ থাকে, তাবৎ ‘ জীবমুক্তি ’ এবং ঐ দেহপাতের পরেই ‘ পরম মুক্তি ’ বা ‘ বিদেহ কৈবল্য ’ অথবা ‘ নির্বাণ ’ ।

(২৭) প্রলয়—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্মান্তিক এই কয়েক প্রকার । প্রাত্যহিক নাশ হওয়াকে নিত্য প্রলয় কহে । ব্রহ্মার প্রত্যেক দিনাবসানে যে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয় ।—এক এক ব্রহ্মার

১৯। দেবতা মনুষ্য এবং পিতৃলোকোদ্দেশে যে সকল বর্ষ্য করিতে হয়, তাহা ক্রমাধারে দেবকৃত্য, মনুষ্য কৃত্য, এবং পিতৃকৃত্য বলিয়া কথিত। সাধারণত দেবকৃত্যের কাল পূর্ষাহ্ন (ত্রিধা বিভক্ত দিনের প্রথম ভাগ), মনুষ্যকৃত্যের কাল মধ্যাহ্ন (ত্রিধা বিভক্ত দ্বিতীয় ভাগ), ও পিতৃকৃত্যের কাল অপরাহ্ন (ত্রিধা বিভক্ত দিনের তৃতীয় ভাগ)।

দেবকৃত্য—পূজা, জপ, স্তুতিপাঠ, হোম, যজ্ঞ, দান, স্নান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, কার্ত্তিক মাসেব আকাশ প্রদীপ, দীপাবিতায় দীপ দান, দ্বাদশ যাত্রা, উপনয়নাদি সংস্কার ইত্যাদি।

মনুষ্য কৃত্য—মনুষ্য যজ্ঞ, ভাত্ত্বিতীয়ায় ভাত্ত্বপূজা, কার্ত্তিকের শুরু প্রতিপদে বলিনাজ পূজা, অশোকাস্তমীতে অশোক কলিবা পান, সাংঘ প্রাতর্ভোজন, বায়োপসর্পণ, কুষাদি বৃত্তি ইত্যাদি।

পিতৃকৃত্য—শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পিতৃশ্রাদ্ধ, উক্তাদান, বুযোৎসর্গ, দাহ, পূরক পিণ্ডদান, গঙ্গায় অস্তি প্রক্ষেপ—ইত্যাদি।

২০। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে কৰ্ম্ম তিন প্রকার। যদিও বেদান্ত মতে নিত্য, নৈমিত্ত্য, কাম্য, প্রায়শ্চিত্ত ও নিষিদ্ধ এই পঞ্চবিধ কৰ্ম্ম উক্ত আছে (২৮), কিন্তু সচবাচর কৰ্ম্মের প্রথমোক্ত ত্রিবিধ বিভাগই প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।

২১। নিত্য কৰ্ম্ম দুই প্রকার। ১—বাহ্য প্রত্যহ করিতে হয়। ২—বাহ্য অকরণে প্রত্যবায় (পাপ) জন্মে।

১ম শ্রেণীর নিত্য কৰ্ম্ম—প্রাতঃকৃত্য, মুত্র পুনীষোৎসর্গ, শৌচ, আচমন, দস্তধাবন, প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যোপাসন, দেবপূজা, ব্রহ্ম যজ্ঞ, বৈশ্বদেব, বলিকৰ্ম্ম, নিত্যশ্রাদ্ধ, অতিথি সেবা, দান, ভিক্ষাদান, ভোজন,

পরমায়ু শেষ হইলে, সমুদয় পদার্থ প্রকৃতিতে অর্থাৎ আদিকারণে লীন হইয়া যায়, তাহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় বহে। অপব ব্রহ্মা জন্মিয়া ঐ সকলের পুনঃ সৃষ্টি করেন।—আত্মাত্মিক প্রলয় সৰ্ব জীবের মুক্তি।

(২৮) তদ্র পঞ্চবিধং। নিত্য নৈমিত্ত্য কাম্য প্রায়শ্চিত্ত নিষিদ্ধ ভেদাৎ। তত্র আত্মানি চত্বারি ধৰ্ম্মাণি। অন্ত্যং অধৰ্ম্মাণি।

ইতি বেদান্ত মতঃ।

ভোজানোত্তর আচমন, সায়াং প্রাতর্হোম, ঐতিহাস পূবাণ শ্রবণ, — লোকযাত্রা ইত্যাদি ।

২১ শ্রেণীর নিত্য কর্ম—অন্নরহঃ স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা, নিত্য পূজা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, দান, ভিক্ষা দান, সায়াং প্রাতর্হোম, শৌচ, আচমন, হোচনোত্তর আচমন ; ষষ্ঠী অষ্টমী অমাবস্যা ও চতুর্দশী তিথিতে স্নান, সংক্রান্তি স্নান, গ্রহণ স্নান, পুত্র জন্ম নিমিত্তক স্নান, আষাঢ়ী, বার্তিকী ও মাঘী পূর্ণিমা বান ; একাদশী ব্রত, অশ্বাষ্টমী ব্রত, বামনবমী ব্রত, শিববাতি ব্রত ; হুর্গোৎসব, দীপাবলি পূজা, জয়ন্তী পূজা, কামদেব পূজা, বাসন্তী পূজা, আবণী কর্ম, আগ্রহায়ণী কর্ম, গৃহাদিতে বাস্তুযাগ, প্রাতি মাসেব কৃষ্ণ পক্ষেব শ্রাদ্ধ, অশ্বযুক্ত কৃষ্ণপক্ষ শ্রাদ্ধ, মঘা ত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ, কন্যার্ক শ্রাদ্ধ, নবান্নশ্রাদ্ধ, নবোদক শ্রাদ্ধ, বরশ্রাদ্ধ, পূপাষ্টকা, শাকাষ্টকা ও মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ, অম্বষ্টকা শ্রাদ্ধ, গৃহ প্রবেশ নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, পুত্র জন্ম নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, সংস্কার কর্ম্মাঙ্ক শ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গাদি কর্ম্মাঙ্ক শ্রাদ্ধ, গ্রহণ শ্রাদ্ধ, প্রত্যাদিক শ্রাদ্ধ, আবণী ও মাঘী পূর্ণিমা শ্রাদ্ধ, সংক্রান্তি শ্রাদ্ধ, জন্ম নক্ষত্র নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, তীর্থ প্রাপ্তি শ্রাদ্ধ, পাত্র প্রাপ্তি শ্রাদ্ধ, প্রেত শ্রাদ্ধ, ভীষ্মতর্পণ, দশ সংস্কার, ভাতৃপূজা ইত্যাদি ।

২২ । নৈমিত্তিক কর্ম্ম (২১) দুই প্রকার । ১—যে কর্ম্মে দিন, মাস বা বৎসর বিশেষেব নিয়ম নাই, বাহা আগন্তুক নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই করিতে হয় এবং বাহা অবশ্য কর্তব্য । ২—বাহা কোন নিমিত্ত জন্য করিতে হয় ।

১ম শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্ম্ম—পুত্র জন্ম নিমিত্তক স্নান, দান ও শ্রাদ্ধ ; সপিণ্ড মরণাদি নিমিত্তক স্নান, প্রাবলিভ, তীর্থ ও পাত্র প্রাপ্তি শ্রাদ্ধ, গৃহ প্রবেশ শ্রাদ্ধ, তীর্থযাত্রা শ্রাদ্ধ, কর্ম্মাঙ্ক শ্রাদ্ধ, অস্পৃশ্য স্পর্শন জন্য স্নান ইত্যাদি ।

২য় শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্ম্ম—প্রথম শ্রেণীর নিত্য কর্ম্ম ও প্রথম শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্ম্ম ভিন্ন, সমুদয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নিত্য কর্ম্ম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমুদয় কাম্য কর্ম্ম ।

(২১) নৈমিত্তিক কর্ম্ম হয় নিত্য, না হয় কাম্য হইবে । নিত্য এবং কাম্যকে বিনির্মুক্ত নৈমিত্তিক কর্ম্ম পাওয়া যায় না ।

২৩। কাম্য কৰ্ম—যাহা কলকজনক বা বাহা কলকামাধিকারীৰ কৰ্তব্য । কাম্য ও দুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত হইতে পাবে । ১—যাহা শুদ্ধ ফলার্থ বিহিত ও যাহা কোন নিমিত্তাহুসাৰে বিহিত নহে । ২— যাহা ফলার্থ অথচ নিমিত্তাহুসাৰে বিহিত ।

১ম শ্ৰেণীৰ কাম্য কৰ্ম—গঙ্গাদি তীৰ্থ স্নান, তীৰ্থতৰ্পণ, কাশী প্ৰভৃতি তীৰ্থ দৰ্শন, শিখাদি দেব পূজা, কাম্য বান ও হোম, তুলসী, বলপত্ৰ ও পুষ্পাদি প্ৰদান, অনিমিত্ত বিহিত সকল প্ৰকাৰ দান, গৃহাদিতে বাস্তব্যাগ, ঔপচাৰিক ও গোষ্ঠী শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ।

২য় শ্ৰেণীৰ কাম্য কৰ্ম—বৈশাখ, কাৰ্ত্তিক ও মাঘ মাসেৰ শ্ৰাভঃস্নান, মাকরী স্নান, মৌনী স্নান, ভূত চতুৰ্দশী স্নান, নাবায়ণী স্নান, অক্ষয় তৃতীয়ায় স্নান, মহা জৈষ্ঠীৰ গঙ্গাস্নান, মাঘ মা'সৰ গঙ্গাস্নান, জ্যৈষ্ঠমাসে ব্যতীপাত পুষ্যা নক্ষত্ৰ ও বৈধতি নক্ষত্ৰেৰ গঙ্গাস্নান, দশহৰা স্নান, সংক্ৰান্তি স্নান, যুগাদ্যা ও মন্বন্তৰা স্নান, ও দান, অষ্টমী স্নান, বাকুণী স্নান, চৈত্ৰ মাসে লৌহিত্য স্নান, বুধাষ্টমীতে শ্ৰোতোজলে স্নান, আমাবস্যাতে নদী স্নান, পোৰ্ণমাসীৰ স্নান ; আমাবস্যা, দশহৰা ও বৈশাখ পোৰ্ণমাসীৰ তৰ্পণ, ভূতচতুৰ্দশী ও রটন্তী চতুৰ্দশীৰ যমতৰ্পণ, অক্ষয় তৃতীয়াৰ বিষ্ণু পূজা, নাগ পঞ্চমী ও কৰ্কট সিংহ সংক্ৰান্তিতে মনসা পূজা, হুগোৎসব, কোজাগৰ রূতা, জগদ্ধাত্ৰী পূজা, গোষ্ঠাষ্টমীতে গোপূজা, পৌষ সংক্ৰান্তিতে বাস্ত পূজা, ববদা চতুৰ্থীতে গোবীপূজা, শ্ৰীপঞ্চমী পূজা, বাসন্তী পূজা, রটন্তী পূজা, ফলহাবী পূজা ; অবণ্যবন্তী ব্ৰত, আমাবস্যা ব্ৰত, ধৰ্ম্মবট ব্ৰত, ললিতাসপ্তমী ব্ৰত, হুগাষ্টমী ব্ৰত, হুগানবমী ব্ৰত, দধিসংক্ৰান্তি ব্ৰত, কাৰ্ত্তিকেষ ব্ৰত, সৰ্বজয়া ব্ৰত, ববদাচতুৰ্থী ব্ৰত, শ্ৰীপঞ্চমী ব্ৰত, অশ্বিনাশ্বিনা ব্ৰত, কোকিল ব্ৰত সাবিত্ৰী ব্ৰত ; বারোপবাস, তিথুপবাস, নক্ষত্ৰোপবাস, মহাষ্টমীৰ উপবাস, জ্যৈষ্ঠমীৰ উপবাস, রামনবমীৰ উপবাস, শিববাতিৰ উপবাস, একাদশীৰ উপবাস, শ্ৰাবণদ্বাদশীৰ উপবাস, অঘোৰ চতুৰ্দশীৰ উপবাস, সংক্ৰান্ত্যপবাস ; বার শ্রাদ্ধ, তিথি শ্রাদ্ধ, নক্ষত্ৰ শ্রাদ্ধ, যুগাদ্যা শ্রাদ্ধ, সংক্ৰান্তি শ্রাদ্ধ, গ্রহণ শ্রাদ্ধ, গৰাশ্রাদ্ধ, পুৰ শ্রাদ্ধ, দেব শ্রাদ্ধ, ঋষি শ্রাদ্ধ, মহুজ শ্রাদ্ধ, মৃত ব্যক্তিৰ প্ৰধান লংকাৰ না হইয়া থামিলে তাহার প্ৰেতশ্রাদ্ধ ; পূৰ্ত্তকাৰ্য্য, কাৰ্ত্তিক্যাদিতে বুধোৎসৰ্গ, দেবব্ৰত বুধোৎসৰ্গ ; সংক্ৰান্তি, যুগাদয়, অক্ষয় ও পৰ্বাদি নিমিত্তক দান ইত্যাদি ।

২৪। মিশ্রলক্ষণাক্রান্ত কর্ম সকলকে, পুনশ্চ নিত্যনৈমিত্তিক, নৈমিত্তিক কাম্য, এবং নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ।

নিত্যনৈমিত্তিক—দ্বিতীয় শ্রেণীর কাম্য কর্ম ভিন্ন সমুদয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্ম ।

নৈমিত্তিক কাম্য—সমুদয় দ্বিতীয় শ্রেণীর কাম্যকর্ম ।

নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য—দ্বিতীয় শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্মের মধ্যে যে যে কর্ম, কাম্য শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়াছে ।



ভারতে ইন্দ্রাজ ।

মহাভারতের কাব্যংশ পবিত্র্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক ভাগ গ্রহণ করিলে এবং বাজনীতিজ্ঞতাব আদর্শ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ চবিত্ত্র সমালোচনা করিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতেব নৈসর্গিক অবস্থারূপে সমগ্র সমাগর ভারতবর্ষ একাধিপতির শাসন শৃঙ্খলে আবদ্ধ না থাকিলে, ভারতে সর্বদাপ্রাণী শান্তি, উন্নতি এবং মঙ্গল কদাপি বিবাজ্য কবিত্তে পাবে না । ভারত, যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত, খণ্ডাধিপতিগণ যখন রাজ্যবিস্তারের জন্য পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত, সমবানল যখন সর্বদাই প্রজ্বলিত, তিন্ন তিন্ন প্রদেশবাসীগণ যখন কেবল মাত্র বিদ্রোহবশীভূত, ফলত যখন ভারত একতা, শান্তি ও কুশলের নিবতিশয় অভাব হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার মোচন অর্থাৎ ভারতে শান্তি সংস্থাপন করণার্থ স্বীয় অলৌকিক বাজনীতিজ্ঞতা শক্তি প্রভাবে সমগ্র ভারতেব রাজবর্গকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন । সেই যুদ্ধের পরিণাম-ফলে ভারত একেশ্বর পাণ্ডবের কর-কবলিত হইয়া উন্নতির শেষ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, এবং সুখ, সৌভাগ্য ও শান্তি বহুকালের জন্য ভারতে সংস্থাপিত হইয়াছিল ।

দ্বাপবেব শেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটনের অনতিপূর্বে ভারতের যেরূপ শোচনীয় দূর্বস্থা ঘটিয়াছিল, ইংরাজের ভারত গ্রহণ কালেও ভারতের ঠিক সেই দুর্দশা।

ভাবতব যে বিপদে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশাল বাজনীতিজ্ঞতাব, অনন্ত কাল ব্যাপি দূর্বদর্শিতাব এবং অলৌকিক ক্ষমতাব নির্বিশেষ প্রত্যক্ষ পবিচয় জগতেব ষাবতীয় লোক-চক্ষে চিবদিনের জন্য সমপূর্ণ বিবিধা ভাবতকে রক্ষা কবিয়াছিলেন, ইংরাজ ঠিক সেইকপে দ্বিতীয়বার ভাবতের ভাব মোচন কার্য্য সম্পন্ন কবিয়াছেন । ইতিহাস প্রকাশ এদিত্তেছে যে, ইংরাজ আগমনের অনতি-পূর্বকালে ভারতবার্ষ্য আবাব ঋণ-ব্যয়ে বিভ্রাস, ক্ষুদ্রাধিপতিগণের মধ্যে রাজ্যবিত্তাবদ অভিনাষ একান্ত বদব'ন, সমদানল প্রজ্জলিত, অকারণ মনুষ্য-ধ্বংস, লোকমধ্যে অনৈক্য, শাস্ত্রিব অভাব, এবং উন্নতি নির্মূলপ্রায় হইয়াছিল । এবাব ভাবতের ভাবমোচন ইংরাজ সংসাধন কবিলেন । ইংরাজ আবাব সমাগব ভাবতে একাধিপত্য সংস্থাপন কবিয়া শাস্তি, উন্নতি ও মঙ্গলের বীজ বোপণ কবিলেন । ভাবত-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ বাজ-নীতি বিশাবদেরমহঃ চবিত্র অবলম্বনে ভারতকে একাধিপতির কব-কমলে সমপূর্ণ কবিয়া, ভাবতের যে পরম মঙ্গল সাধন কবিয়াছিলেন, ভাগ্যফলে দেশকালপাত্র বিবেচনায় দ্বিতীয় বার ভাবতাদৃষ্টে অবিকল সেই মঙ্গলের নিয়ন্তা—ইংরাজ ।

রাজকুল-তিলক মহাবাজ বণজিৎ সিংহের ভবিষ্যৎ বাকা সফল হইয়াছে ; ভাবতবর্ষের মানচিত্রের সমস্তই লাল হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষমতাহীন নির্জীব ব্রহ্মবাজ্য অন্য বং মাধিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়াছিল, আজ লালেলাল হইয়া উঠিয়াছে ; ক্ষুদ্র সিকিমের জন্য লাল বং প্রস্তুত হইতেছে । সমস্ত রাজবর্গের অভিষেকে মহাবাদী ইংলণ্ডেশ্বরী ভাবত-সিংহাসনে বাজবাজেশ্বরী রূপে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন । রাজপ্রতিনিধিদিবির রাজহুয যজ্ঞে সম্রাট-প্রতিনিধি বলিয়া স্বাভা ও লোক সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছেন । অতএব কে না বলিবে যে ইংরাজই এখন ভাবতের একাধিপতি ? একাধিপতির ভাবত এখন শাস্ত্রিময়, এক কথা বলিলে অত্যাঙ্কি হয় না । হিমালয়ের চরণ প্রান্ত হইতে সমুদ্র তরঙ্গ বিঘাতিত কুমাবিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, এবং পূর্বে চীনের সীমা হইতে অনন্ত পশ্চিমে পেশোয়ারের সীমা পর্য্যন্ত সর্বহং সাম্রাজ্যে একটা আভ্যন্তরীণ বিভাদের কোন সূত্রপাত নাই এবং কোন বিপৎপাতের সম্ভবনা নাই । সাগরবন্দে

ভারতবর্ষের দীপ দ্বীপে বিবিধভাবে ভাসিতেছে । স্বতন্ত্রাংশ শান্তি অবিচলিত ভাবে সমাপন ভারতে বিরাজিত ইহা কে না বলিবে ? উত্তরে তিমালয় বিবীট মূর্তি ধারণ করিয়া ভারতের উত্তর দ্বার রক্ষা করিতেছেন, অবশিষ্ট তিন সীমায় সীমানা মহাসাগর স্বেচ্ছা পূর্বক গ্রহণ করিয়া নিযুক্ত হইয়াছেন ; এতদূর চতুঃসীমা বিশিষ্ট স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নিবাসন দেশ অনেক । বহিঃশত্রুর দ্বারা এ অভেদ্য দ্বীপ ভেদ হওয়া অসম্ভব এবং অসম্ভব । সত্য বটে ভারতের উত্তর পশ্চিমের আশ্রয়ীভাব বহিঃভাগে হিমালয়ের পর্বতমালা স্পৃহিত একখানি কাল মেঘ দেখা দিগ্ভ্রম, সেই মেঘ ক্রমে ক্রমে মূর্তি ধারণ করিয়া মূলধানে বৃষ্টিপাতে ভারতকে জলপাননে ভাসমান করিবে, একপ আশঙ্কা ভারতবাসীর স্রবণে একদিন উদিত হইয়াছিল, — কিন্তু ইংরাজ ঐতিহ্যিত শাস্ত্রময়, ভারতের আশ্রয়ীভাব প্রবল বায়ু সবেগে সঞ্চালনে অত্যন্ত কাল মধ্যে সে মেঘখণ্ড ছিন্নভিন্ন হইয়া বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে । তবে এই মাজ বজ্রিতে পাবা দায় যে, কখনো সপ্তমূর্তি ধারণ করিয়া ভারতের নিঃস্রাব হীরাটের সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতবাসীর একটি প্রকৃত পবন উপকার সাধন করিয়াছেন, অর্থাৎ ভারতবাসীকে রাজতন্ত্রের পরিচয় প্রদানের একটি সুযোগ অবসর প্রদান করিয়াছেন । ঐশ্বরিক নিয়ম প্রভাবে সর্বনাশের একশেষেও স্বদেশের নিগূঢ় বীজ নিহিত থাকে । একচ্ছত্র সম্রাটাদীন হওয়া ব্যতীত ভারতের চরম সুখ অন্য কিছুতেই নাই, চিত্তশীল ভারতবাসী ভূবোধদর্শন দ্বারা সমস্ত প্রকারে স্বদেশের কবিয়াছেন, একাধিপতির অধীনতা ব্যতীত ভারতীয় লোকশাস্ত্র একতা কদাপি সম্পাদিত হইতে পারে না—এ কথাও তাঁহার। বেশ বুঝিয়াছেন, এবং একতন্ত্র ভিন্ন দেশে শান্তি সংগ্রাসিত হয় না, ও শান্তি না থাকিলে উন্নতি লাভ হয় না, কার্যকাণ্ড হুস্তে ইহাও তাঁহার। বিলম্বিত বুঝিয়াছেন । সেই জন্যই আগ্রিত বাজবগ সম্রাটের বিপদে স্বদেশের এবং আপনাদের বিপদে বুঝিয়া ধন ও প্রাণ দিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন ; এবং অন্যান্য যাবতীয় লোক-কি ধনী, কি দরিদ্র, কি গণ্ডিত, কি মুখ, সকলেই একবাক্যে স্বদেশের অসুস্থকে বাজার স্বপক্ষে তববাবি ধারণ করিতে এবং যথাসমর্থ প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়াছেন । দুর্বল বঙ্গবাসী বলেন্দিয়াব সাজিয়া বঙ্গের ভাববহু কবিত্তে স্বেচ্ছাপূর্বক আবেদন করিয়াছেন ; বঙ্গরক্ষীকুল, যাহারা এ জগতে অলঙ্কারকেই সর্বশক্তিমান ভগবান ভাবিয়া থাকেন, রাজার এই অকৃত পূর্ব ব্যক্তভারের বৎকিঞ্চিৎ আহুতুল্যের জন্য অমান

বন্দনে শ্রীঅঙ্গকে নিবলস্বাব করিতে উদ্যত হইয়াছেন । সম্পূর্ণ সাত শত বর্ষ ভারতবাসীগণ একাদিক্রমে রক্তপাত ও সর্বনাশের নিদারুণ বহুগা সহ করিয়া ইদানীং ইংরাজাধীনে নিববচ্ছিন্ন শান্তির পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া কি বলিয়া আজ বাজ পদে এ ভক্তি কুসুমাজ্জলি অর্পণ না করিবেন, ভারতের হিন্দুগণ কোন কালেই অকৃতজ্ঞ নহে ।

হইতে পারে আশ্রিত রাজা মহাবাজ বর্গের মধ্যে কেহ কোন কারণে মর্ষ-পীড়িত, কাহাবও হৃদয়ানন্য অবস্থা শাসনে প্রজ্বলিত, কেহ বা সম্রাট আবেপিত ব্যয়ভাবে জর্জরিত, কেহ বা বংশমর্যাদার আসনের বিচাবে অপমানিত, এবং কেহ বা আশ্রিত অধিক সংখ্যক তোপের জন্য লালায়িত । হইতে পারে শিক্ষিত বাবুগণ আরও অধিক চাকরি চাহেন, জাতিভেদে একই পদের বেতনের তাবতম্যে জজবাবুর হৃদয় হয় ত দগ্ধ হইতেছে ; হইতে পারে চা-কবের দোষাঞ্জে জীহীনব হৃদয়ে আগুণ জ্বলিতেছে, ঐটিগ আইনেব কুতর্কে হয় ত কেহ সর্বস্বান্ত এবং হয় ত কেহ প্রভুব পীড়নে উপবাসী । কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের এ সকল দুঃখ কাহিনীর আন্দোলন কি জাতীয় বাজবিস্তোহিতাব চিহ্ন, না, রাজার অন্তগ্রহ পূর্ণ প্রভা-বাৎসল্য জনিত স্বভূভোগেব ইচ্ছা মাত্র ? যে রাজা স্বেচ্ছা পুন্দক বিচাবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রজাকে আপনার বিকল্পে অভিযোগেব স্বত্ব দিয়াছেন, সে রাজা কি লোকেব দুঃখ বা অভাবেব আন্দোলনে রাজতন্ত্রের ক্রটি বিবেচনা করিতে পারেন ? প্রতাপশালী ইংরাজরাজের সাম্রাজ্য এত বিশাল যে, ইহাতে স্বেচ্ছাদেবেব অন্তগমনের অবকাশাভাব । সেই সাম্রাজ্যেব ভাবত একটা প্রশস্ত খণ্ড । সেই ভারতের বিংশ কোটি লোকেব নিয়ন্তা কতিপয় বিদেশীয় রাজ কর্মচারী । অতএব লোকেব দুঃখ অভাব যে কতক পৰিমাণে থাকিবে এটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে ; তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই দুঃখের কাহিনী এত অল্প । ভারত একজাতীয় লোকবাসির নিবাস ভূমি নহে, ন্যূনাধিক এক শত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভাবে বাস করিতেছে ; তাহাদের ধর্ম, আচার ব্যবহার, বীতিনীতি সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, এবং সকল জাতিই সমস্ত বিষয়েই রাজার সহিত নির্বিশেষে বিভিন্ন । জাতি, ভাষা ও ধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্নতার একশ্রেণীর মূহ্যকূল অন্য হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় ; এতাদৃশ শতাধিক বিভিন্ন জাতি ভিন্ন জাতীয় রাজার সহিত যে

সম্যক প্রকার সহায়ত্ব প্রকাশ করিতেছে, ইহাই অতীব আশ্চর্যের বিষয় । কোন দেশেব কোন রাজনীতি বিশাবদ মহান ব্যক্তি মুক্ত কর্ণে না স্বীকার করিবেন যে, এতাদৃশ ভাবতকে ইংরাজ আয়ত্ত করিয়া রাজনীতিজ্ঞতার এবং বিশাল বুদ্ধিমত্তার সর্বিণেষ পরিচয় জগতে প্রদান করি-
তেছেন । ইংরাজ, ইদানীন্তন সমস্ত সভ্য জাতির অহুমোদিত ব্যবস্থাকরণে বিজ্ঞতার সমস্ত জাতীয় স্বত্ব সংরক্ষণ কবিয়া, দেশ প্রচলিত বাবতীর ধর্ম্মে সম্পূর্ণ স্বধীনতা প্রদান কবিয়া, এবং অবশেষে স্বত্বদানের চরমসীমা স্বরূপ “আজ্ঞাশাসন” ভার সমর্পণ কবিয়া, অভূতপূর্ব মাজলিক প্রধায় যে, রাজ্যশাসন কবিতেন, উদ্ভাব্য রাজনীতিজ্ঞতার অভাবনীয় এবং অশ্রুতপূর্ব পবিচয় দানে জগতকে চমকিত কবিয়াছেন । ভারতের এই শাস্তিময়ী মোহিনী মূর্ত্তি ইংরাজের বিশাল বাজনীতি-বিনির্ম্মিত । এ রাজ্য প্রতি যদি ভাবতীয়-গণ বাজভক্তি প্রদর্শন না কবিবে, তবে কোন বাজ্য প্রতি করিবে ?

তবে ভারত কবভারাক্রান্ত এ কথা অবশ্য বালব । সে গুরুভাবে ভারতের বিশ'ত কোটি লোকের মস্তক সমভাবে ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে ; আর সহ্য হয় না । এইটি যথার্থ ভাবতের জাতীয় দুঃখ কাহিনী । করবুদ্ধির অন্যতম ফল অসন্তোষ বুদ্ধি । ভারতের প্রজা কেবল কর-জালায় রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট । সভ্য বটে প্রজার প্রদত্ত করে বাজ্যে প্রতিনিয়ত প্রজারই স্বার্থ সচ্ছন্দতার উপায় সৃষ্টি হইতেছে, প্রজাব দ্বাবে দ্বাবে অনবরত অবাচিত ঐশ্বর্য্য রাশি বিতরিত হইতেছে, কিন্তু ভারতের নিবর প্রজা-কূল সে সুখৈশ্ব-
র্য্যেব রসাস্বাদনে সম্যক্ সন্তোষ লাভে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে । সভ্য বটে হিন্দু ও মুসলমানাধিকাবে ভারতের আভ্যন্তরীণ স্বর্থসচ্ছন্দতাব এত সচ্ছন্দতা ছিল না, কিন্তু ভারত কবজালেও এত রুজবিত ছিল না । কার্য্যকা-
র্য্যেব স্ত্রে তুণনা কবিলে এ কথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কবিত হইবে যে, এ রূপ ধনে এ সুখের সামগ্র্য্য কদাপি হয় না । কর-পীড়িত ভারত সুখের প্রলোভনে ভীত হইয়াছে, স্বর্ণদগ্ধ ভারত স্বর্ণে ঐশ্বর্য্য লাভে শক্তি হইয়াছে, নয়নাশ্রপাতে অশ্রুতপানে ভারত একান্ত কাতর হইয়াছে ।

ব্যয়-সংকুলনার্থই আয়েব সংস্থান । বহুল ব্যয়ে বহুল ধনাগমের আবশ্যক । প্রবাদ এই যে, পৃথিবীর যাবতীয় দেশোপেক্ষা ইংরাজের বাজ্যকার্য্য পরিচালনার ব্যয় অধিক । ভারতের ইংরাজ কর্ম্মচারীর বেতন অশ্রুতপূর্ব উচ্চ । বিশ'তি সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতনের কর্ম্মচারীর পদ ধরায়ত্তলের কোন

দেশে কোন কালে কখনই সৃষ্ট হয় নাই। পুরাকালে ইংলণ্ডে প্রবাদ ছিল যে, ভাবতের বৃক্ষরাজিতে সুবর্ণের মোহর ফলে। সেই সংস্কারপূর্ণ কল্পনা-বিশিষ্ট আয়-ব্যয়-নীতিজ্ঞদিগের দ্বাবাই ভাবতের ব্যয়-ব্যবস্থা নির্দোষ হইয়াছে, এবং এ পর্যন্ত তাহাই অবিচলিত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইংবাজের কমিশেরিয়টের কেবানি গোমস্তা, পবলিক ওয়ার্কের ঠিকাদার প্রভৃতির। এত শীঘ্র অশ্রুতপূর্ব ধনবান হইয়া উঠেন যে, পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশে তরুণ হব না। ব্যয় সম্বন্ধে এই যথেষ্টাচারিতা এবং বিশৃঙ্খলতার জন্যই ভাবতের শিল্প কবভাব প্রতিনিয়তই সমর্পিত হইতেছে। বিস্তৃত ভাবত আব তুণগাছটীও বহন কবিতে পারে না। অতএব ইহাই স্থির বৃত্তিতে হইবে যে, ভাবতে আয়ের পথ একেবারে বন্ধ হইয়াছে, এখন ব্যয়-সঙ্কোচ ব্যতীত ভাবতের আর উপায় নাই। তদন্যথায় ভাবত ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

আর একটা অতীত শোচনীয় অবস্থা ভাবতের ভাগ্যদোষে সম্প্রতি ন-ঘটিত হইয়াছে। ইংবাজ যে শোচনীয় অবস্থায় ভাবতকে, এবাদিপতিব পবিত্র প্রশস্ত কবতল বিস্তার বর্ণনা বন্ধা কবিয়াছেন, আজ কি কারণে বলিতে পাবা যায় না সেই ইংবাজ ইচ্ছা কবিয়া ভাবতকে সেই শোচনীয় অবস্থায় আবার নিষ্ক্ষেপ কবিতে যত্নবান হইয়াছেন। ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। সত্য বটে, ভাবতের অভ্যন্তরীণ বর্তমান অবস্থা সনাক্ত প্রকাষে ইংবাজের ভারত গ্রহণ কাসেব ন্যায় নহে, তথাপি তৎকালে ভাবতে যেকপ শান্তিব অভাব হইয়াছিল, আজ অন্য কারণে সেই বিনয় শান্তিব অভাব হইতেছে। শান্তিব অভাবই রাজ্যের অসম্বলের চিহ্ন, সেই চিহ্ন আজ আমাদের অদৃষ্টদোষে ভাবতের ললটদেশে অগ্নিবং জলিতেছে। যুদ্ধবিগ্রহে সে শান্তিব অভাব হয় নাই, বাজভক্তি অন্যাচরণে সে শান্তিব অভাব হয় নাই, শাসন-বিশৃঙ্খলাব সে শান্তিব অভাব হয় নাই, কিন্তু অন্য অভাবনীয়, অতীত নিষ্ঠুর কারণে, সেই পবিত্র মঙ্গলিক শান্তিব নিবতিশয় অভাব হইতেছে। এবং ব্রহ্মণ্য মৌনাসায় ইহা সন্তোষজনক রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ইংবাজের স্বাধীন ইচ্ছাই, সেই শান্তি বিশ্বংসী কীড়িতস্তেব তিক্তি স্বরূপ।

প্রথম, " ইলবর্ট বিল। " ইলবর্ট বিল সর্বাঙ্গে যেকপ শান্তুলিপিতে ব্যবস্থাপক সভায় সমর্পিত হইয়াছিল, সম্পূর্ণরূপে সেই আকারে বিধিবদ্ধ হইলে, ভারত এই মাত্রব্যক্ত লাভ কবিত বে, চারিজন মাত্র ভারতীয়

কিন্তু ইংল্যান্ড অগণতান্ত্রিক প্রতি বিচার বিধান কবিতেন। কিন্তু ইংল্যান্ড অগণতান্ত্রিক প্রতি কি রূপে, কোথায়, এবং কাহার দ্বারা বিচার বিতরিত হয় তাঁহা ভাবতের বিংশ কোটি লোকের মধ্যে কজন জানিতে ইচ্ছা করেন ? যে কেহই বিচার করিল, তাহাতে এই বিংশ কোটি লোকের কজনের কি আসে যায় ? এই সাংবাদিক বিস্তৃত ভাবত বাজ্যের বিংশকোটি লোকের মধ্যে চাৰিজন মাত্র ব্যক্তি এক একটা ক্ষুদ্র নিম্নত অজানিত সামান্য স্থানের বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের জীবনকালের মধ্যে ইংলণ্ডের এক একটি পথ পরিষ্কারকের প্রতি দণ্ডবিধান করিলে, ভাবতের কি মহান্ স্বত্ব সংস্থাপিত হইত এবং কি অলৌকিক গৌরব গগনস্পর্শ কবিত, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু সে বিল সে ভাবে বিধিবদ্ধ হয় নাই। অথচ ঐ বিল সম্বন্ধে আন্দোলনের ফলশ্রুতি ভাবতের শান্তি নাশের একটা কাণ্ড স্বরূপ। আমরা বুদ্ধ হইয়াছি, আমাদের কেশ কেতবর্ণ হইয়াছে, আমরা এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিবর্তিত্য সাবধানের সহিত একাদি ক্রমে সূচীক্স নয়নে দেখিয়া আসিতেছি যে, দেশীয় কৃত্তবিদ্যা জনগণ পঠকণা অতিক্রম পূর্বক সংস্কার পদনিক্রম কবিয়া ঢাকবি, বাবসায় অথবা যে কোন সূত্রে ছোক, সমস্ত জীবন কাল এইমাত্র ব্রহ্ম অবলম্বন কবিয়া আসিয়াছেন, যে ইংল্যান্ডের সহিত ভাবতীয় জনগণের 'সৌন্দর্য্য সংস্থাপিত হইল। কারণ তাঁহারা ছুরোদর্শন দ্বারা নিঃসন্ধিচ্ছাবে বুঝিয়াছিলেন যে এই দুই জাতির সৌন্দর্য্য, সঙ্গাভুক্তি এবং সন্মিলনেই ভাবতের যাবতীয় মঙ্গলের এবং উন্নতির বীজ নিহিত আছে। সম্পূর্ণ শতবৎসর কালব্যাপী যত্ন ও পরিশ্রমেব পর, সংকল্প সাধনের প্রকৃত সন্ধিসময়ে, এই সর্জনশীল আইনের প্রস্তাবের উত্থাপন এবং সেই মহৎ জাতীয় ব্রতের ধবংস হইল। সন্মিলন সম্বন্ধে আবার দুই জাতি শতবর্ষ পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হইল এখন এই দুই জাতি মধ্যে শত্রুর নিবর্তিত্য অভাব হইয়াছে।

দ্বিতীয়, “আয়-শাসন প্রণালী” নির্বাচন প্রণালীই আয়-শাসন প্রণালীর অস্থি স্বরূপ। ছাপাব কগজওয়ালারা যতই চাক পিটুন, রাজকীয় কর্মচারীরা যতই রং দিয়া বিপোর্ট লিখুন, নির্বাচন প্রণালী নিগূঢ় অভ্যন্তরে ব্যবস্থাপকদের যে সূচিকণ চাতুর্য্যের দৃঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তদ্বারা মঙ্গললৈ যোগ্য ব্যক্তির মনোনীত হওয়া অসম্ভব। এ দিকে নির্বাচন প্রণালী কল্যাণে ভারতের সর্বত্রই পূর্বতনকালের বিস্তৃত প্রায়

সামাজিক অনিষ্টবান্ধির শীর্ষস্থান স্থিত “দল্লারলি” প্রথাটাই পুনরাবির্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবার এই নির্বাচন প্রথার আঘাতে কোন না কোন প্রকারে আঘাতিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। পদপ্রার্থীগণের যোগ্যতা সমালোচনা সূত্রে অতি-নিকট-কূটঘণ্ণেব মধ্যে মনোবিবাদ ঘটয়াছে, সহোদর সহোদরে অনৈক্য হইয়াছে, এবং স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বিবাহ বিসম্বাদ হইয়াছে। নিমন্ত্ৰণ বন্ধ ও ‘বামুণ’ নাপিত বাবণ প্রভৃতি অসভ্য কালের দলাদলির ভীষণ অনুচর সকল অব্যব তীত্র তেজে দেখা দিয়াছে। শত বৎসর পূর্বে আমাদের পল্লি গ্রাম সমূহ যে অবস্থা ছিল, আজ আবার সেই অবস্থা। এ সম্বন্ধে আবাব আমরা শতবৎসর পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হইলাম। আমাদের ঘরে ঘরে আবাব শান্তির অভাব হইল।

তৃতীয়, “টেনান্টিস বিল।” ভাবতবর্ষ বাঙ্গভক্তির আদর্শ স্থল। ভারতীয় জনগণ রাজ্যপ্রজাব সম্বন্ধে যে রূপ পবিত্র ভাবে বুদ্ধিতে পাবেন, অন্য কোন দেশের লোকে সে রূপ বুদ্ধিতে পাবেন না। ভারতে, বাঙ্গা প্রজায় যে নৈক ভালবাসা, যে ভক্তিবাৎসল্য, যে নৈবটাবাবহার, এবং যে সমবেদিত্ব, পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশে বাঙ্গা প্রজাব মণে তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতে, প্রজা রাজাকে দেবতা স্বরূপ দেখেন, বাঙ্গাও প্রজাকে পুত্রবৎ নিবি-ক্ষণ কবেন, রাজ্য প্রতি প্রজার অভিক্তি হিন্দুশাস্ত্রে মহাপাপ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে; প্রজা পীড়নে রাজার নরকগমন অনিবার্য। একটী দীর্ঘায়তন বিস্তৃত রাজ্যের অসংখ্য প্রজাব বাঙ্গাও যে বস্তু, একটী সামান্য ভূমিখণ্ডের অধিপতি তাঁহাব জনৈক মাত্র প্রজাব নয়নেও সেই বস্তু। বড়ই হোন্ আব ছোটই হোন্, প্রজাব নয়নে ভূমাবিকাবী একই পদার্থ। ইংবাজ রাজনীতিজ্ঞেবা রাজ্যপ্রজাব সম্বন্ধে সে স্বর্গীয় পবিত্র ভাব দেখিতে ভাল বাসেন না। এটী তাঁহাদের চক্ষে শূন্য। সেই জন্যই কথিত আইনেব অবতারণা। এতদ্বারা ভারতের বাঙ্গা প্রজার অবিচলিত সম্বন্ধ বিঘাতিত হইয়াছে। বাঙ্গা প্রজার মণে শান্তির অভাব হইয়াছে।

চতুর্থ, আতি-বিবেষ-উত্তেজনা। ভারত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীদিগের নিবাস ভূমি। ইতিহাস ব্যক্ত করে যে, ধর্ম্ম অন্তত ভাষা এক না হইলে একজাতিত্ব, জাতীয়জীবন, এবং জাতীয়-একতা কখনই গঠিত হয় না। ইংরাজের অনুকূলতায় ইংরাজি শিখিয়া একভাষী হইয়া ভারতে একজাতিত্ব সম্পাদিত হইতেছিল। ইংরাজশিক্ষিত কৃতবিদ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষী

ব্যক্তিগণের শীর্ষস্থানস্থিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে একতা সংস্থাপনে তাঁহারাই অভি-
নেতা। ইংবাজেব কৃপায় মহতী জাতীয় একতাব পরিপোষণ হওয়াতে
যখন অভীষ প্রার্থিত মঙ্গলিক সময়ের আবির্ভাব হইল, ভগবান বলিতে
পাঁবেন কেন, সেই ইংবাজ আবাব তাহা যুগান্তবে নিক্ষেপ কবিত্তে ক্লতসংকল্প।
প্রধান প্রধান ইংরাজ বাঙ্গলকর্মচারীগণ খজাহস্তে একান্ত মনে সেই সন্ধি
সময়কে সজোবে ছিন্নভিন্ন করিতে লালায়িত। সর্বোচ্চ বাঙ্গলকর্মচারী স্পষ্টা-
ক্বে মুসলমানকে হিন্দু সহিত ঐক্য সংস্থাপন কবিত্তে নিষেধ কবিত্তেছেন,
হিন্দু প্রতি হিংসা ঘেষ ও জাতীয় বৈবীতার অনিষ্টকব বিষের বীজ মুসল-
মান-দ্বয়ে সযত্নে রোপণ কবিত্তেছেন। আবার অভিপ্রেত কার্য্য
সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানার্থ মুসলমানকে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চপদ প্রদান
কবত, অথবা দয়ার হস্তে তাঁহার গাত্রসেবা কবিত্তেছেন। ওদিকে সর্বসিপল
গ্রেকিং মহারাষ্ট্রকে বাঙ্গালিব প্রতি ঘৃণা কবিত্তে শিখাইতেছেন। প্রদেশীয়
কর্তৃপক্ষগণ কর্তার অভিপ্রায় বুঝিয়া স্ব স্ব প্রদেশে বাঙ্গালিব প্রবেশনিষেধের
অজ্ঞা পর্য্যন্ত প্রচার কবিত্তেছেন। অতএব একতা, একজাতিত্ব এবং
জাতীয় জীবনেব অভ্যুদয় সময়েই তাহার ধ্বংস নিস্পাদক কার্য্য সম্পাদিত
হইল। এখন ভারতের প্রত্যেক জাতিব মধ্যে শাস্তিব অভাব।

ভারতের শান্তিসংগাবক উপর্যুক্ত প্রস্তাব চতুষ্টয় মঙ্গলোদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত
হইয়া, ভারতবর্ষে ব্রবদৃষ্টদোষে অনিবার্য্য কাবণ সূত্রে অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষময়
ফল প্রদান কবিল, অথবা প্রথম হইতেই কোন সূচতুব বাঙ্গলীতিজ্ঞের ছরতি
সন্ধিব পরিণাম-নির্দিষ্ট ফলই প্রসব করিল,—তাহা সর্বজ্ঞ ভগবানই বলিতে
পারেন। যাহাই হোক এখন ভারতে ইংরাজ ও ভাবভীষণগণে ঐক্য
নাই, এক জাতিব সহিত অন্য জাতিব ঐক্য নাই, এক দেশের লোকের
সহিত অন্য দেশেব লোকের ঐক্য নাই, বাঙ্গায় প্রজায় ঐক্য নাই, নগরের
লোকবাশিল্ল মধ্যে ঐক্য নাই, সুদূর, অন্তরঙ্গ, আত্ম কুটুম্বেব মধ্যে ঐক্য
নাই, এমন কি, এক পরিবাবেব লোকদিগের মধ্যে পরস্পরে ঐক্য নাই।
অতএব ভারতে আভ্যন্তরীণ কুশলের নিবতিশয় অভাব। সুতরাং শাস্তিব
অভাব। এখন ভারতের শোচনীয় দুরবস্থা।

প্রশ্ন,—এ শোচনীয় অবস্থার নিয়ন্তা কে ?

উত্তর,—বিশারদ রাজনীতিবিশারদ লর্ড রীপন এবং লর্ড ডকরিণ !!

নবজীবন ।

৪র্থ ভাগ । } চৈত্র, ১২৯৪ । } ৯ম সংখ্যা ।

পাতঞ্জল যোগসূত্র ।

৬ ।

যদি বল অভ্যাস এবং বৈবাগ্য এই দ্বিবিধ উপায় দ্বারা চিত্তবৃত্তি সকলকে অবরুদ্ধ করাব নাম, যদি সমাধি হয়, তবে উহা আবাব সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত নামে দুই প্রকার হইল কেন ? এইরূপ প্রশ্ন করা যি সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত এই দুই প্রকার ভেদ হইবাব কারণ নির্দেশ কবিতেছেন ।

বিতর্ক বিচাবানন্দাস্মিতানুগমাং সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥১৭॥

পদক্ষেদঃ—বিতর্ক-বিচাব-আনন্দ-অস্মিতা-অনুগমাং, সম্প্রজ্ঞাতঃ ।

পদার্থঃ—স্থূল—সাক্ষাৎকাবো বিতর্কঃ, তন্মাত্রা—সাক্ষাৎকাবঃ বিচাবঃ, ইন্দ্রিয়াণাং সাত্বিকরূপসাক্ষাৎকাব আনন্দঃ, আত্মনাবুদ্ধে বেকান্তিকা সংবিৎ (অভেদজ্ঞানং) অস্মিতা, অনুগমঃ যোগঃ সম্বন্ধো বা, পঞ্চম্যা হেতুর্থঃ, সম্প্রজ্ঞাত শব্দস্ত তু সম্যক্ সংশয় বিপর্যয় দহিতছেন প্রজ্ঞায়তে প্রকর্ষণে জ্ঞায়তে ভাবান্ত স্বরূপং যেন স সম্প্রজ্ঞাত ইতিব্যুৎপত্ত্যা সর্বাঙ্গসমাধিকপেহর্থঃ । কেচিৎস্থূলসাক্ষাৎকাববতী প্রজ্ঞা বিতর্কঃ, স্থূলসাক্ষাৎকাববতী প্রজ্ঞা বিচাবঃ আনন্দ আত্মাদ ইত্যাহঃ ।

অর্থঃ—বিতর্কশ্চ, বিচাবশ্চ আনন্দশ্চ অস্মিতাচ তাসামনুগমাং সম্বন্ধা-
ন্ধেতোঃ (স সমাধিঃ) সম্প্রজ্ঞাতঃ কথ্যত ইতিশেষঃ ।

ভাবার্থঃ—সমাধি-সীম দ্বিবিধঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ অসম্প্রজ্ঞাতশ্চেত্যানুগমঃ । তত্র
সম্প্রজ্ঞাতো নাম সমাধিশ্চতুর্বিধঃ (১) বিতর্কানুগতঃ-সবিতর্কঃ (২) বিচাবানুগতঃ

বিষয়ক জ্ঞানকে প্রবল কবিতা চিত্ত হইতে অপর বৃত্তি গুলিকে অপসারিত কবিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম বিষয়ের চিন্তা দ্বারা ঐ জ্ঞানকে আবার সূক্ষ্ম কবিতাে থাকে । এক্ষণে দেখ, প্রথম যোগী মনস্ত্ব কবিতাব নিমিত্ত যে কোন স্থূল ভূতকে আশ্রয় কবিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে প্রবল কবিতা মন হইতে অগ্র বৃত্তি অপসারিত কবিবে । কিন্তু সেই স্থূল ভূত নিছক একটা পাহাড় পর্বত না হইয়া যদি পবন পবিত্র সর্বময় কোন বস্তু হয়, তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ আরও প্রশস্ত হয় । মনে কব, শিব মূর্তির ধ্যান হইল ‘বজ্রত গিবিনিভং’ যেন একটি কপাব পর্বত । পর্বতের মত স্থূল পদার্থ আর কি আছে ? তাতে কপাব পর্বত । উপাসকের মন, শিক্ষিত অশিক্ষিত যেকপ কেন হোক না, অুমাত্র আশাস বাতীতই সহজে কপাব পর্বতের ধারণা কবিতাে সক্ষম হয় । এইকপ একমাত্র ভৌতিক স্থূল পদার্থের জ্ঞানের সর্বময় সম্পাদনের নাম বিতর্ক । তর্ক শব্দের অর্থ অমুসন্ধান ।

ভৌতিক স্থূল পদার্থ মানেই নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, সূতবাং যে কোন ভৌতিক স্থূল পদার্থের পূর্ণজ্ঞান কবিতাে হইলে সেই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও অমুসন্ধান কবিতাে হয়, কেবল কপাব পর্বতের মত একটা প্রকাণ্ড শ্বেত-পিণ্ডের জ্ঞানে সম্পূর্ণ শিবমূর্তির জ্ঞান হয় না, তাহাব সহিত পর্বতের পাঁচটি চূড়াব মত পাঁচটি মুখ, এক একটি মুখে তিনটি কবিয়া চক্ষু, এবং কপালে এক কলা কবে চন্দ্র, পবিত্রানে ব্যাঘ্রচর্শ ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও অমুসন্ধান রাপিতাে হয় ।

এক্ষণে বিবেচনা কবে দেখ, ঐ কপ জ্ঞান মোটেব উপব এক বিষয়ক হইলেও, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগত বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের সংস্রব থাকায়, অনেক বৃত্তিতে সমাকীর্ণ, সূতবাং উহাব প্রাবল্যে অগ্রবিধ বৃত্তিব নিবোধ হইলেও ইহাব নিজান্তর্গত বৃত্তিব বাহুলা হেতু চিত্তের স্বৈর্য্য সম্পাদন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, কাষেই যোগীব স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্ম আশ্রয় কবিতাে হয় । দীর্ঘকাল এক বিষয়েরও সাক্ষাৎকাষে নিবত থাকায় মনের বৃত্তুদ্ভাবনী শক্তি অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়, মন যে কোন এক বিষয়ে নিযুক্ত কবিতাব নিমিত্ত অনেকটা আঘত হয়, কাষেই একবাবে সূক্ষ্মব সাক্ষাৎকার আর তাহাব পক্ষে আশাসসাধ্য নহে । এক্ষণে বলিতাে পাব ভৌতিক পদার্থের মধ্যে স্থূল বা সূক্ষ্ম সকলইত সাবযব, তাষে সূক্ষ্মব জ্ঞানকে প্রবল কবাব বিশেষ ফলনাভ কি হইল ? ইহাব উত্তবে আমবা বলিব, মন তখন ভৌতিক পদার্থ একেবাবে পবিত্রাগ কবিয়া স্থূল ভূতের

কাৰণেব সাক্ষাৎকাৰে প্রবৃত্ত হয়। ক্রিতি, জল, তেজ, মকং, বোম এই পাঁচটি মহাভূতের উপাদান শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস, গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র। তন্মাত্র সকল অতি সূক্ষ্ম এবং নিববয়ব। স্থূল ভূত পবিত্যাগ কবিয়া পূৰ্ণোক্ত পাঁচ প্রকাৰ তন্মাত্রের মধ্যে যে কোন একটি আশ্রয় কবিয়া মন তাহাব সাক্ষাৎ লাভ কবে, তদ্বাংকাৰে পবিশত হয়। এইরূপ জ্ঞানেব অনুশীলনেব নাম বিচাব সূতবাং যখন আমাদেব মন কোন এক তন্মাত্রের আঁকাব প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই আনন্দ হইয়া থাকে, পঞ্চ স্থূল ভূতকে সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হয়, মনেব সেই অবস্থাকে সবিচাব সমাধি বলে। বিচাব শব্দেব অর্থ বিশেষ চিন্তন। এক একটি তন্মাত্র সূক্ষ্ম এবং নিববয়ব হইলেও উহা এক একটি বিশেষ দ্রব্য পবস্পব কাহাবও সহিত কাহাব ঐক্য নাই। সূতবাং তন্মাত্রের সাক্ষাৎকাৰেব নাম বিচাব। একূপ জ্ঞানেব সময় অত্র বৃত্তিৰ নিগোধ হইলেও চিত্তে কতক স্থূলি বৃত্তি থাকে। কেননা “তখন আমি জানিতেছি” এইরূপ জ্ঞান থাকে। কাযেই তখনও আত্মাব তন্মাত্র এবং তাহাব জ্ঞান এই ক’ বিষয়েব বৃত্তি থাকে, অতএব তখনও চিত্তেব সম্পূর্ণ স্থিৰতা সম্পাদনেব অনেক বাকী। সেই জন্য যোগী উহাতেও উদ্দেশ্য ত্রিবিধ বিবদ দেখিয়া গ্রাস্ত বস্তু একেবাবে পবিত্যাগ কবিয়া জ্ঞানেব সাধন ইন্দ্রিয়দিগেব অণুতমব পূৰ্ণোক্ত ব্রীতিতে সাক্ষাৎকাৰ কবে। এই ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎকাৰেব নাম আনন্দ। কাৰণ ইন্দ্রিয় সকল সত্ত্বগুণ প্রধান তাহাদেব হইতে উৎপন্ন এবং স্বয়ং প্রকাশশীল, সূতবাং মন যখন ইন্দ্রিয়াকাৰে পবিশত হয়, তখন উহাও সত্ত্ব প্রধান হয়, কাযেই ঐ ইন্দ্রিয় বিষয়ক জ্ঞান কেবল আনন্দময়। ঐ ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুশীলন রূপ সমাধিকে সানন্দ সমাধি বলা যায়। বিজ্ঞান যদ্বদন মন যখন স্থূল বা সূক্ষ্ম বস্তু পবিত্যাগ কবিয়া তাহাব অণুভব তত আনন্দ মানেব পূৰ্ণোক্ত ব্রীতিতে সাক্ষাৎকাৰে প্রবৃত্ত হয়, সেই সাক্ষাৎকাৰকে আনন্দ বা আনন্দ বলে। ঐ রূপ আনন্দেব অনুশীলন রূপ যোগেব সানন্দ যোগ বা সমাধি বলে। সে অবস্থায় অপববৃত্তিৰ কথাত দুয়ে থাকুক না, স্থূল পদার্থ না সূক্ষ্ম পদার্থ কিছুবই জ্ঞান হয় না, কেবল “আমি সুখী” এই একমাত্র জ্ঞান থাকে।

এক্ষণে বিবেচনা ক’ “আমি সুখী” ইহা একটি জ্ঞান হইলেও ইহাব অন্তর্গত তিনটি বৃত্তি থাকে, প্রথম স্মৃতিবিবৰক বৃত্তি, যে বৃত্তিদ্বারা আপ্যাব অস্তিত্ব, ভৌত্ব প্রভৃতিব অনুভব হইতেছে দ্বিতীয় স্বখ বিষয়ক, তৃতীয় তাহাব

জ্ঞান বিষয়ক। সূতবাং এ অবস্থায়ও মনের সম্পূর্ণ স্থিতি সম্পাদন হইতে পারে না, কাষেই যোগীৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ নিমিত্ত উপায়ান্তৰ অবলম্বন কৰিতে হয়।

তখন যোগী আৰু সব পৰিত্যাগ কৰিয়া আত্মাৰ সহিত মনেৰে ঐক্য সম্পাদন কৰিয়া আত্মাৰ সাক্ষাৎকাৰ আবিস্কৃত কৰে। তখন মনে আৰু কোনকপ বৃত্তিই বহিল না, সকল বৃত্তিৰ নিবৃত্তি হ'ল, কেবল আমি এই জ্ঞান বহিল। আত্মাৰ সহিত মনেৰে ঐক্য জ্ঞানেৰ নাম অস্মিতা, অস্মি শব্দেৰ অৰ্থ অহং, 'অস্মিতা' শব্দেৰ অৰ্থ অহংএৰ ভাব অৰ্থাৎ কেবল আমিই সব, আমি ভিন্ন আৰু কিছুই নাই, এইকপ মনোবৃত্তিৰ নাম অস্মিতা। এই অস্মিতাৰ অনুশীলনৰূপ যোগকে সাম্প্রিত সমাধি বলা হয়।

এক্ষণে বিচাৰ কৰিয়া দেখ এই সাম্প্রিত অবস্থাই সম্প্রজ্ঞাতৰ চৰম অবস্থা। এ অবস্থাদ চিত্তেৰ সকল বৃত্তিৰই নিবোধ হইনাছে। তখন আৰু বৃত্তিগণ তবঙ্গমালাৰ মত একটাব পৰ একটা, তাৰ পৰ আৰু একটা, এইকপ অবিভাৰিত ভাবে উৎপন্ন হইয়া চিত্তকে আৰু ব্যতিব্যস্ত কৰে না, চিত্ত তখন থমথমে ভাব ধারণ কৰিয়াছে, কেবল একটা মাত্ৰ বৃত্তি আছে। 'আমি' এইবৃত্তি টুকু আছে বলিগাই ইহাৰ নাম সম্প্রজ্ঞাত। এই বৃত্তিৰ টুকুৰ লোপ হ'লেই যোগেৰ দ্বিতীয় (অসংপ্রজ্ঞাত) অবস্থা হইবে, এ অসংপ্রজ্ঞাতই যোগেৰ চৰম অবস্থা। পৰমাত্মে ইহাৰ বিষয় সবিস্তৰ বলা বাইবে।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি একেবাৰে নিৰোধিত হয় না বলিয়া উহাকে সৰ্বজ্ঞ সমাধিও বলা হয়। আমবা এ পৰ্যন্ত যাহা বৰ্ণনাম, তাহাতে ইহাও বুঝা গেল যে কেবল জ্ঞানময় বৃত্তিৰ অবস্থান হৈছে ইহাকে সম্প্রজ্ঞাত বলা হয়। প্ৰথমে স্থূল ভূতৰ জ্ঞান, তাৰপৰি সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্ৰেৰ জ্ঞান, অনন্তৰ ইন্দ্ৰিয় জ্ঞান, তাৰপৰি পৰ আত্মাৰ জ্ঞান। এন্তলে ইহাও বলা আবশ্যক যে প্ৰাণীৰ প্ৰভৃতি স্থূল ভূত এবং শব্দ আদি পঞ্চ তন্মা এইয়া সমাদা জ্ঞেয়,। সংস্কৃত ভাষাৰ জ্ঞেয় এবং গ্ৰাহ্য এই দুই শব্দেৰ একই অৰ্থ। এই নিমিত্ত সৰ্বতৰ্ক এবং সৰ্বচাৰ এই উভয়বিধ সমাধিকে গ্ৰাহ্য সমাধি বলা হয়। বাৰণ গ্ৰাহ্য বস্তুকে আলম্বন কৰিয়া এই উভয়বিধ সমাধিৰ অনুশীলন কৰা হয়। ইন্দ্ৰিয়গণ জ্ঞানেৰ সাধন, সংস্কৃত ভাষাৰ সাধন এবং গ্ৰাহ্য এই দুইটি একাৰ্থক শব্দ। এই নিমিত্ত সানন্দ সমাধিকে গ্ৰহণ সমাধি বুলে, কাৰণ জ্ঞানেৰ সাধন কোন এক ইন্দ্ৰিয়কে আশ্ৰয় কৰিয়া উহাৰ অনুশীলন কৰা হয়। আত্মা বা চৈতন্য-ময় প্ৰব, একমাত্র জ্ঞাতা, জ্ঞাতা আৰু গৃহীতা একই কথা। এই ত্ৰয় সাম্প্রিত

সমাধিকে গৃহীত বা গ্রাহক সমাপত্তি বলা হয়। এই অনন্ত জগন্মণ্ডলের যাবতীয় পদার্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) জ্ঞেয়, (২) জ্ঞানের সাধন, (৩) জ্ঞাতা, যাহাব জ্ঞান হয়। এই তিন প্রকার বস্তুর মধ্যে যোগ শিক্ষায় প্রবৃত্ত যোগী, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে প্রথমে জ্ঞেয় বস্তুকে আশ্রয় কবিরাই যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, জ্ঞেয় বস্তু আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার, কাষেই তাদৃশ নবীন যোগীব চিত্ত প্রথমে স্থূল, তাহার পর সূক্ষ্মকে আশ্রয় কবে। জ্ঞেয় বস্তুর পর জ্ঞানের সাধন, তাহার পর জ্ঞাতাকে আশ্রয় কবাই স্বানন্দিত নিয়ম। এই নিমিত্তই মোক্ষবস্তুকায় পবিত্রাছেন স্থূলে নিমির্জিহ্ম চিত্ত এত কষ্টে পুনর্নবদ্য। চিত্তবে যখন আপনাব ইচ্ছানু-সারে অগণ্য বস্তু পবিত্রাচন ব এইম কৌন এক স্থূল বস্তুর আকাৰে পবিত্রত কপিণে পদ্যত যাতনে তখন স্থূল তাগ কবিনা ক্রমে ক্রমে ঐ চিত্তকে সূক্ষ্মে ব দিকে পইয়া যাইবে। যেমন পৃথিবী আদি দূতগণ স্থূল এবং পঞ্চ তন্মাত্র সূক্ষ্ম, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ স্থূল এবং অস্মিতা বা অহঙ্কার সূক্ষ্ম, কাবণ সত্ত্বপ্রধান অহঙ্কারই ইন্দ্রিয়গণের উপাদান। ভোজবৃত্তিকাব বলেন, সবিতর্ক, সবিচাব, এই দুই প্রকার সমাধি আবার যথাক্রমে নির্বিতর্ক এবং নির্বিচাব এই দুই প্রকার অবস্থা পাইতে পারে। সবিতর্ক সমাধি যখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুসন্ধান শূন্য হয়, তখন উহাকে নির্বিতর্ক বলে। এইরূপ সবিচাব সমাধি কেবল সূক্ষ্ম-ধর্মীমাত্রকে আশ্রয় কবিয়া প্রবিষ্ট হয়, তৎসংশ্লিষ্ট দেশকাল কিছুই বিচাব না কবে, তখন তাহাকে নির্বিচাব সমাধি বলা যায়।

শিকার।

(সোনাখাধী—মল্লিকবাড়ী পাছাড—বসন্ত কাল)

গ্রামল বাসান্নি বন্দ * কানন নিকবে,
চালিছে দয়ায় দ্রব হৃদয় তাহাব,
লতায়ে গ্রামল লতা গ্রাম তকববে,
দেখিতেছে গভীবতা কত করুণাব।
অকুট ভাবায় যেন কোটা ফুল বাশি
হৃদয়েন কৃতজ্ঞতা বুঝেছে প্রকাশি।

* দুই উচ্চ টিলার মধ্যস্থ সমতল নিম্ন ভূমিকে বন্দ বা বাইদ বলে।

২

ঘড়ই ককণাবতী অই শ্রোতস্বতী,
জননীৰ মত স্নেহ সকলেৰ সন্মান,
তুণ হতে উচ্চ তরু সকলেৰ প্ৰতি
জীৱন কপিণী কপে সদা বহুমান।
এত স্নেহ এত দয়া আছে আব কাৰ ?
ঠিক যেন দয়াময়ী—জননী আমাব !

৩

বিছাইয়া আছে বন্দে শ্ৰাম তৃণদল,
লীলা নিকুঞ্জেৰ মত, ঝোপ ঝাপ শত শত
খেলাইছে ছোট ছোট সবুজ অচল !
নিববেৰ ডই কুল, শ্ৰামল হিজল মূল
বিলাসিনী হৰিণীৰ কেলিলীলা স্থল !
গভীৰ গুজাব * বন, নল তারা অগণন,
যে দিকে ফিৰাই আখি কানন শ্ৰামল,
নবতরু নবলতা নব ফুলদল।

৪

ষসন্তেৰ শ্ৰাম ৰাজ্য ৰাজত্ব তোমাৰ,
আপনি প্ৰকৃতি বাণী, পৰাইছে ঘৰে আনি
যেখানে যা মাজে ভাল বস্ত্ৰ অলঙ্কাৰ !
মজ্জিত গজাড † বন, উচ্চ টেক ‡ সিংহাসন,
লতাব ললিত কুঞ্জে শয়ন তোমাৰ !
কোকিল কোমল গানে, শ্ৰামা স্থললিত তানে,
শ্ৰবণে সঙ্গীত সুধা ঢালে অনিবার !
অনন্ত কানন বাজা বাজত্ব তোমাৰ !

* গুজা = বেত বৰ্ণেৰ বস্ত্ৰ গোলাপ।

† গজাড = গজাবি।

‡ টেক = টিলা।

৫

প্রতিযোগী শূন্য বাঙ্গা অনন্ত কানন,
 তোমাব একাধিপত্য, অসীম শক্তি সামর্থ্য
 কে আছে দ্বিতীয় তেন কবিরে হেলন ?
 তোমাব বনের লতা, তোমাব বনের পাঁতা
 ঝাঁপাতে আপনি ভয়ে কাপে সমীপণ !
 পড়িতেছে দোড়াইয়া, এ গাছে ও গাছে থিয়া,
 কেমনে গলা'য়ে যাবে ফাফব পবন !
 দিনে দিবাকর ভাতি, শবতে চাঁদনী বাতি
 সশব্দে প্রভাত সন্ধ্যা কবে আগমন,
 বাব মাস সাত বাব ঋতু ছয় জন ।

৬

অসীম বীৰত্ব বীণা বিক্রম ছন্দাব,
 কোটি বজ্র পবান্ধব, গভীর গর্জন তব
 কাননের মাটি ফাটে দাপটে তোমাব !
 ভীষণ নথব চয়, বহু দম্ভ সমুদয়
 যুদ্ধেব প্রধান অস্ত্র বাঁধা হাতিয়াব !
 অমিত সাহস বল, পদিশূণ্য বক্ষস্থল
 লোলজিহ্বা মহামূর্তি বন্ধ পিপাসাব !
 মাত যবে বণ বজ্রে, কে আঁটে তোমাব সঙ্গে
 ভয়ঙ্কর দিক্‌দাহী অগ্নি অবতাব !
 রাজাধিবাজেন্দ্র তুমি, তোমাবি এ বনভূমি,
 অনন্ত কানন বাজ্য বাজহ তোমাব,
 অসীম বীৰত্ব তব বিক্রম হুঁস্কার !

৭

এস দেখি আগি ক্ষুদ্র মানব সন্তান,
 এস হে শার্দূল বাজ, হু'জনে যুঝিব আজ,
 যুঝিব তোমাবে তুমি স্তম্ভ বলবান !
 এস বজ্র নথ নিষে, বীৰ বেশে ছল্লাবিষে,
 পাল হে বীবেব স্বর্ঘ্য বীবেজ্ঞ প্রধান !

নতুবা চোবের মত, হও হে কুশল গত
শলাইষে বাথ তুচ্ছ স্থণিত পবাণ,
চাহি যুদ্ধ আমি ক্ষুদ্র মানব সন্তান।

৮

তোমার শাস্তিব বাজ্য কানন শ্রামল,
আমি হে বিদ্রোহী তব, চাহি তাব অধিকার
বাথ দেখি নিজ বাজ্য থাকে যদি বল,
ববাহ ভল্লুক চয়, তব সেনা সমুদয়
বধেছি সঙ্গীনধাবী মহিষ সকল।
নাহি অবশিষ্ট আব, এই দেখ এই বাব,
মুহূর্ত্তে কানন বাজ্য কবির দখল।
ধবিযাছি বুদ্ধ অস্ত্র দেখ বাইফল।

৯

এই যে ছুটিল গোলা অগ্নি উগাবিয়া,
ছুটিল নক্ষত্র বেগে, বিজলী জ্বলিল মেঘে,—
লও দেখি কত শক্তি বক্ষ বিস্তারিয়া !
দেখি কণ্ঠে কত বল, কাঁপাইয়া বনস্থল
গোলাব গর্জ্জন ঢাক বজ্রে গরজিয়া।
ছুটিল অলস্ত গোলা আকাশ ভাসিয়া।

১০

“ভেবেছ কি ওহে ক্ষুদ্র মানব সন্তান,
এই গোলা অগ্নিময়, দেখিছ! পাইব ভয়,
এতই স্থণিত কি হে পশুর পবাণ ?
ও গোলা ত তুচ্ছ অতি, যদি ক্ষেপে স্থরপতি
একত্রে অব্যুত বজ্র তথাপি—সম্মান—
তথাপি জাতীয় মান, প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান
দিব না সে বজ্রমুখে না দিবে পবাণ !
ভেবেছ কি ওহে ক্ষুদ্র মানব সন্তান?”

১১

“ কি বলিব ঐবাবত পশুব অধম,
 হইয়ে তোমার দাস, যদি না কবিত নাশ
 স্বজাতীয় স্বাধীনতা বীৰ্য্য পবাক্রম ।
 না আনিত পিঠে কবি, চাৰ্জামা হাওদা ধরি
 পাবিতে কি প্রবেশিতে কানন দুৰ্গম ?
 আনিয়াছে গৃহে শত্রু পশুব অধম ।”

১২

“ আনিয়াছে গৃহে শত্রু নরুনা কি আব,
 সাম্রাজ্য নিবিড বন, আজ তাব সিংহাসন
 চাহিতে মানব, প্রাণে,—কি সাগা গোমাব ?
 শশক শঙ্কায় তুমি, ঘেসিতে না বনহুমি,
 থাকুক অজ্ঞেয় বীৰ্য্য বীবন্ত আমাব ।
 কাণ নানী বিভীষা, বধিল বাক্ষসপণ
 সেইকপ ঐবাবত পশুকুলাপাব ।
 আনিয়াছে গৃহে শত্রু, কি বলিব আব ?

১৩

“ যাক্ পশুপিঠের কথা বলিয়ে কি ফল,
 অলস্ত ইহাব স্মৃতি তীব্র হলাহল ।
 ও দাস হয়েছে বশি, ভাবিও না বনস্থলী
 একেবারে বীরশূনা বীবন্ত শ্রামল ।
 এই পাতিলাম বুক, সবিব না একটুকু
 দেখ এই বজ্র বক্ষে ধবি কত বল,
 ছাড় তব ব্রহ্ম অঙ্গ ছাড় বাইফল ।

১৪

স্বাধীন সঙ্গবে আব, যুগ্ম নব অহঙ্কার
 সহেনা হে, তুমি ক্ষুদ্র নর হীন বল !
 এ বজ্র নথবাঘাতে, এই ভীম বজ্র দাঁতে
 বিদারি তোমাব পর্ব্ব স্কীত বক্ষ স্থল,
 আকর্ষ কবিব পান শোণিত তরল ।”

১৫

এই ছাডিলাম গোলা বন্ধা নাই আর,—
গবজিল রাইফল “সেণ্ট্রাল ফায়াব” ।—
এ কি হে মুহূর্তে হাষ, দেখি অচেতন প্রায়,
পতিত বিদীর্ঘ বন্ধ যুগের আকার,
বীবেজ শার্দূল বাজ, এত বে অঘরে আজ
বনেই পতিত বনবীর অহঙ্কার ?
হা জদা কি অজ্ঞান, এই ছায়া বলিদান,
এই আত্মবধ চির দেখি পুনর্দায়,
দমাহিত স্থিতি নোণ জাপালে আবাব ।

শ্রী:গোবিন্দ চন্দ্র দাস ।

লর্ড কানিংগের ধীরতা ।

(১৮৫৭ অব্দে কলিকাতার ঘটনা ।)

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের বাকদানী কলিকাতার বড় গোলযোগ উদ্ভূত হইয়াছিল । এই থান স্থায়ী ধর্মাবলম্বী বহুসংখ্যক নবনাবী, বাসক ও নালিকা একত্র জড় হইয়াছিল । ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া নিকষেগে ও নিদাপদে বাস করিয়া আনিষ্ঠাচর্য, একত্র ইহাদের জীবন ও সম্পত্তি বক্ষাব নিমিত্ত কোন চেষ্টা ছিল না । দীর্ঘকাল স্বথ শান্তিতে অতিবাহিত করিতে ও দীর্ঘকাল আপনাদের নিবীহভাবের পরিচয় দেওয়াতে ইহাদের চিত্তবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল । কলিকাতার অপরাধ অধিবাসিগণও সশস্ত্র ও সাহস-সম্পন্ন ছিল না । তাহারা নিশ্চিন্ত মনে উদ্যোগের সংগ্রহে ভংগন থাকিত, নিকষেগ গোজীযদ্ধ বহিন' বাস করিত এবং নিদাপদে আপনাদের অবলম্বিত কার্য সম্পন্ন করিয়া তুলিত । ইহাদের আত্মবক্ষায় কোন অবলম্বন ছিল না । উক্ত ইংবেদেবা ইহাদের উপর অনেক সময়ে

অত্যাচার কবিতেন। যোঁবনমূলভ তেজস্বিতায, অদূৰদৰ্শিতামূলক
 আত্মস্ববিতায ও অমাত্মবোচিত আত্মপ্ৰাধান্তমত্ততায় ইহাবা কলিকাতাব
 সাধাবণ অধিবাসীদিগকে নিপীড়িত কবিয়া আপনাদেব নিকৃষ্টতব স্মৃথে
 আপনাবাই পবিতৃপ্ত থাকিতেন। বে-সবকাবী ঠংবাজ সম্প্রদায় ক্ৰয়বিক্ৰয়ে
 আপনাদেব ক্ষতিলাভ গণনাতে নিযুক্ত থাকিতেন। এই কাৰ্য্য-প্ৰসঙ্গে
 স্থানীয অধিবাসীদিগেব সহিত তাঁহাদেব যতটুকু মিশিবাব প্ৰয়োজন হইত,
 তাঁহাবা কেবল ততটুকু মিশিতেন। স্মৃতবাং সাধাবণ অধিবাসীদিগেব সহিত
 তাঁহাদেব তাদৃশ সমবেদনা ছিল না। তাহাদেব বীতি, নীতি, আচাব,
 ব্যবহাব ও মানসিক ভাব প্ৰকৃতিতে তাঁহাবা সম্পূৰ্ণ অনভিচ্ছ ছিলেন।
 তাঁহাবা বাজধানীয সুবম্য প্ৰসাদ পবিত্যাগ কবিয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা
 কবিতেন না। জনসাধাবণেব মনোগত ভাব বুঝিষা অপবেব মানসিক
 প্ৰকৃতি পবিজ্ঞানেব সীমায়ুদ্ধি কবিতোও চেষ্টা কবিতেন না, এবং আপনাদেব
 অবলম্বিত বাণিজ্যব্যবসায়েব ক্ষতি কবিয়া দূবতব প্ৰদেশেব কোন বুহং
 ব্যাপাবেব পৰ্যালোচনাতে ও ব্যাপৃত হইতেন না। স্মৃতবাং তাঁহাবা মহা-
 রাষ্ট্ৰখাতেব সন্ধীৰ্ণ সীমাতে আবদ্ধ থাকিবা আপনাদেব ব্যবসায়েব শ্ৰীযুদ্ধি
 সাধনে তৎপৰ থাকিতেন। তাঁহাবা এইসময়ে মহাবাষ্ট্ৰখাতবাসী বলিয়া
 অভিহিত হইতেন। বেলওয়ে ইওয়াতে ইংবেজেবা সময়ে সময়ে কলিকাতায
 বাহিৰে যাইতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদেব বহুদৰ্শিতা অধিকতব
 প্ৰদাবিত হইত না। তাঁহাবা অধিকাংশ সময়েই বাণিজ্যপ্ৰধান মহানগবে
 বাস কবিয়া বাণিজ্যলক্ষ্মীয প্ৰসাদে আপনাদেব সৌভাগ্যযুদ্ধিব স্বপ্ন
 দেখিতেন। সমগ্ৰ পৃথিবীয সম্পদে চীনদেশেব মানচিত্ৰকাবকদিগেব যেকপ
 ধাবণা ছিল, সমগ্ৰ ভাবতেব সম্বন্ধে তাঁহাদিগেব ধাবণা উহাপেক্ষা বড বেশী
 ছিল না। চীনেব মানচিত্ৰকাবক যেমন চীন সাম্ৰাজ্যকে সমগ্ৰ পৃথিবী বলিয়া
 মনে কবিতেন, উল্লিখিত ইংবেজ সম্প্রদায়ও তেমনি ভারতেব সূদৃশ প্ৰসাদ-
 ময়ী বাজধানীকে সমগ্ৰ ভাবতেব প্ৰতিকপ বলিয়া বিবেচনা কবিতেন।

উত্তৰপশ্চিমপ্ৰদেশে সিপাহীদিগেব অভ্যুত্থানেব ভয়ঙ্কৰ সংবাদ এই
 শ্ৰেণীয লোকে যে সম্ভন্ত হইবে, তাহা কিছু বিচিত্ৰ নহে। যাহা মিবাটে
 ঘটয়াছে, দিল্লীতে যাহাব বিকাশ দেখা গিয়াছে, বাঙ্গালাতেও যে, তাহাই
 ঘটবে, এই শ্ৰেণীয লোকে কেবল ইহা ভাবিয়াই সৰ্বদা শঙ্কিত থাকিত;
 এবং শঙ্কিতহৃদয়ে আপনাদেব ধনপ্ৰাণ বক্ষাব জল্প শবৰ্ণমেটেব নিকট

চাহিয়া থাকিত। প্রাণের দায়ে তাহাদের একরূপ উদ্ভাস্ত হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে। তাহারা দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগে বাস কবিতা আসিতে ছিল; নিরুদ্বেগে ও নিবাপদে আপনাদের বৈষয়িক কার্যে অতিনিবিষ্ট থাকিত; এবং আপনাদিগকে নিবাপদ ভাবিয়াই পবাজিত পবাদীন জাতিকে অবজ্ঞাব চক্ষে চাহিয়া দেখিত। এই দীর্ঘকালে তাহারা কোনরূপ আশঙ্কা বা উদ্বেগের আবর্তে পড়িয়া ঘুবিয়া বেড়াইয়া নাই, এবং যে জাতির প্রতি তাহারা এই দীর্ঘকাল অবজ্ঞাব ভাব দেখাইয়া আসিতেছিল, সেই জাতি হইতে যে তাহাদের সমূহ বিপদ ঘটিবে, ইহা তাহারা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু এখন ঘাতের প্রতিঘাত আগন্তু হইল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সংবাদ অতিবজ্রিত হইয়া ভয়ঙ্কর ভাবে তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা এই সংবাদে স্তম্ভ হইয়া চাবিদিকে আপনাদিগকে বিপদে পৰিবেষ্টিত বলিয়া মনে কবিতো লাগিল। মহানগবীর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়ে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। ফিবিঙ্গি ও পন্তুগীজেবাই ইহাতে অধিকতর ভীত হইয়া উঠিল, ইংবেজেবোও ভয়ের হস্ত হইতে একবাবে নিকৃতি পাইলেন না। অনেক আপনাদের নিবাপদ কবিবাব জগু জাহাজে যাইয়া বাস কবিতো লাগিলেন। কেহ কেহ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কবিতেন, কেহ কেহ বা অন্ধকাবময় গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া আপনাদিগকে সর্বপ্রকার বিপদবিপত্তি হইতে বিমুক্ত বলিয়া মনে কবিতো লাগিলেন। কেহ কেহ নগর পবিত্যাগ কবিতা নিকটবর্তী পবিত্রে অবস্থিতি কবিতো লাগিলেন। কেহ কেহ ইংলও যাইবাব জগু জাহাজ ভাড়া কবিলেন, কেহ কেহ বা বন্দক ও পিস্তল কিনিয়া সর্বদা সসজ্জ ও সশস্ত্র হইয়া বহিলেন * ।

* যুবোদীর ও ফিবিঙ্গিদিগের এইরূপ অবস্থা মে মাসে ঘটিয়াছিল। জুন মাসে ইহারা অধিকতর স্তম্ভ হইল। যাহা হউক, মে মাসে ইহাদের যেকোন আশঙ্কা হইল, তৎসম্বন্ধে একখানি সংবাদ পত্রে একরূপ লিখিত হইয়াছিল :— “অনেকে আপনাদের গাড়ীতে পিস্তল লইয়া যাইতেন, এবং আপনাদের বোহাদিগকে ঐ পিস্তল শীঘ্র শীঘ্র ভবিতে ও ছুড়িতে শিখাইতেন। ভাগীরথীতে যে সকল জাহাজ ছিল, তাহা ব্যতী কালে যুবোদীঘরণে পরিপূরিত হইয়া উঠিত। শত্রু পক্ষ ব্যতীতে আক্রমণ কবিতো ভাবিয়া, যুবোদীঘরণ ঐ সকল জাহাজে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ কবিতেন। তাহারা সকল স্থানেই ও সকল সময়েই আপনাদিগকে বিপদ মনে কবিতেন। যখন সহসা কোন বিপদ ঘটে, তখন মনের একরূপ ভাব হওয়া অস্বাভাবিক নহে।”

এই সময়ে মহামতি লর্ড কানিংগের স্বাভাবিক দীর্ঘতাব কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কোনরূপ ভ্রুশিষ্টতা বা কোনরূপ গভীর আশঙ্কা তাঁহাকে পবিত্র কর্তব্যপথ হইতে অণুমাত্রও বিচলিত কবিত্তে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রশস্ত মুখমণ্ডলে এ সময়েও প্রশান্ত্যাব বিরাজিত ছিল। প্রশস্ত ললাট-ফসক এ সময়েও উদ্বেগের আবিলতা হইতে বিমুক্ত ছিল। কলিকাতার ক্রীষ্টধর্মাব-লম্বিগণ ভারতের সর্বপ্রধান রাজপুরুষের এ সঙ্কটকালেও দীর্ঘ ও প্রশান্ত ভাব দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন এবং অসন্তোষের সহিত তাঁহাকে স্বপ্রণীত স্বধর্মের লোকদিগের বক্ষায় উদাসীন ও উপস্থিত সময়ে গুরুতব রাজকীয় কার্যের অযোগ্য বলিয়া মনে কবিত্তে লাগিলেন।

কলিকাতার যুবোপীয় প্রবাসী ও ফিনিসিগণ যে অবস্থানে ভীত হইয়া-ছিল, তাহা বলা যায় না। তাহাদের ভয়েব আনন্দও লি বাবণ ছিল। যে সকল সিপাহী পূর্বে কোম্পানীর প্রধান সহায় হইয়া অতঃপর ও বহিঃপর হইতে এই বিপুল সাম্রাজ্য বক্ষা কবিত্তেছিল, তাহাদাই এখন সহসা কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুথিত হইয়া ইংলেজের শোণিতে আপনাদের উদ্ধার প্রতিহিংসার পরিচরণে অগ্রসব হইয়াছিল। কলিকাতার নিকটবর্তী বাবণ পুরে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থান কবিত্তেছিল। ইথাবা এক বাহিন্তে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া যুবোপীয়দিগের পবাক্রম পর্য্যদন্ত কবিত্তে পারিত। কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ, বাবাগয়ের অপরাধদিগের বিমুক্তীকরণ, ইহাদের অসাধ্য কার্যমধ্যে পৰিগণিত ছিল না। মিবাটে, দিল্লীতে যাচা দটি মাহিন, কলিকাতাতেও তাহা ঘটবার সম্ভাবনা ছিল। স্তবৎ কলিকাতার যুবোপীয়গণ সন্তুষ্ট হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মহাবিল্লেরব পূ। দুর্গ ভাবিত্তে লাগিল, এবং আপনাদের গুণপ্তসর্বস্ব হইবে মনে করিয়া ধনপ্রাণ বক্ষার জন্ত কাতব-স্তাবে গবর্ণমেন্টের দিকে চাহিয়া রহিল।

লর্ড কানিং বিশেষ না ভাবিয়া সহসা কোন কার্যে হস্তক্ষেপ কবিত্তেন না। তিনি অটল পর্ত্তেব ছায় অটল ভাবে থাকিয়া এবং দীর্ঘতাব সহিত সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা কবিত্তা গুরুতব কার্যে হস্তক্ষেপ কবিত্তেন। যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব রাজধানীতে প্রবাসী যুবোপীয়দিগের মধ্যে আশঙ্কার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, আতঙ্ক উদ্বেগেব তবঙ্গে যুবোপীয় ও ফিনিসিগণ যখন সমভাবে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আন্দোলিত হইতেছিল, তখনও লর্ড কানিংগের দীর্ঘতাব কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। দিনের পব দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল,

লর্ড ক্যানিং প্রতিদিন ধীরভাবে বিপদাপন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এবং ধীরতার সহিত উপস্থিত বিপদ নিরাকৃত করিতে যত্ন, উদ্যম, ও চেষ্টার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। ইংবেজ সম্প্রদায় এই সময় ভাবিয়াছিলেন যে, গবর্ণরজেনেবেল বিপদের পূর্ণ মূর্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছেন না। যে হেতু তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাজধানীর অদৃষ্টে কি ঘটবে, ভাবিয়া এখনও বিচলিত হন নাই। কলিকাতা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইলে যুবোপাধিদেগের দশা কি ঘটবে, তাহা তিনি ভাবিতেছেন না; এবং যুবোপাধিদেগের আশঙ্কা যে, কিরূপ বলবতী হইয়াছে, তাহাদেব হৃদয় যে, কতদূর অধীৰ হইয়া উঠিয়াছে, সৰ্ব্ব-বিধ্বংস-ভাবনাব কবালছায়া যে তাহাদিগকে কিরূপ আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এ সময়ে গবর্ণর জেনেবেলের ম্যমণ্ডল যদিও প্রশান্তভাবে শোভিত ছিল, তথাপি উপস্থিত বিপদের পূর্ভাব বুঝিতে তাহাদের কিছুমাত্র ঔদাসীণ্য জন্মে নাই।*

দূরতরপ্রদেশে যাহারা বিপদাপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি উদ্ধারই বিপ্লবের সংঘাতে ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের প্রতি গভীর সমবেদনা দেখাইতে তিনি কিছুতেই বিমুখ হন নাই। এই সকল বিপদাক্রান্ত জনপদ বক্ষা করিতে তিনি হৃদয়েব সহিত চেষ্টা করিতে ছিলেন। যাহারা অপেক্ষাকৃত নিবাপদস্থানে থাকিয়া বিপ্লবের সংবাদ অতিবিক্রিত করিয়া আপনাদিগকে আপনাবাই দিনষ্টপ্রায় মনে করিতে ছিল, গবর্ণরজেনেবেল তাহাদিগের প্রতিও সমবেদনা দেখাইতে কাতর হন নাই। তিনি তাহাদের গভীর আশঙ্কার কারণ বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কর্তব্যসম্পাদন বিষয়ে তাহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। বিপদাক্রান্ত জনপদবক্ষা কবাই

* লর্ড ক্যানিং এই সময় যে সকল চিঠি পত্র লিখিয়া ছিলেন, তৎসমুদয়ে ইহার ভূবিভূতি প্রমাণ পাওযায়। তিনি বিশপ্ উইল্‌সনকে এসময়ে যে পত্র লিখেন, তাহার তাব এই—“আকাশ ঘোবতর কৃষ্ণবর্ণ ইহা উঠিয়াছে, তথাপি উহা পরিকৃত হইবার চিহ্ন সম্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে। গবর্ণমেন্ট ধীরতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত কার্য্য অবত্ত করিষাছেন। যথোচিত পূর্নসাবধানতা ও শক্তিব সহিত কার্য্য করিতে স্বনয় ঔদাসীণ্য দেখান হইবে না। আত্মা, লক্ষ্য, ও বাগ্যগনৌতেই বিপদ অধিকতর অবল হইয়াছে। এই সকল স্থানে প্রভুতলক্ষি-গম্পার ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ বহিয়াছেন। আমার বিলক্ষণ আশা আছে যে, আমবা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইব।

অগ্রে তাঁহাব প্রধান কর্তব্য হইয়া উঠিয়া ছিল। তিনি এই কর্তব্য সম্পাদনে বিশেষ মনোযোগী হইয়া ছিলেন। অগ্রে কলিকাতা রক্ষা করার সুবন্দোবস্ত না কৰাতে তাঁহাব বিশেষী হইয়া ছিলেন, তাঁহাব তদীয় হৃদয়গত মহান ভাব বুঝিতে পাবেন নাই। গবর্ণর জেনেৰল যে স্থানে অবস্থিতি কবিতে ছিলেন, সে স্থান অপেক্ষায় অন্যান্য স্থানে ভয়ঙ্কৰ বিপ্লবেৰ কবান ছায়া পূৰ্ণ মাত্ৰায় বিস্তৃত হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেৰল ঐ সকল স্থানেৰ রক্ষা বিধান তৎপৰ হইয়াছিলেন। কলিকাতাৰ ইংবেজ সম্প্রদায় ইহা না বুঝিয়া গবর্ণর জেনেৰলেৰ নিন্দা কবিতে লাগিলেন এবং তাঁহাব প্ৰতি অবজ্ঞাব ভাব দেখাইয়া আপনাদিগকে নিঃসহায় ও নিবলম্ব ভাবিতে লাগিলেন। যে হেতু, গবর্ণর জেনেৰল তাঁহাদেৰ ন্যায় সমগ্ৰ ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্য মহাবাহুধাতেৰ অন্তৰ্ভুক্ত বলিয়া মনে কবেন নাই।

যে মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে কলিকাতাৰ ইউৰোপীয়দিগেৰ আশঙ্কা অধিকতৰ বলবতী হইয়া উঠিল। ইউৰোপীয়গণ সখেৰ সৈনিকদল ভুক্ত হইবাব জন্ত চেষ্টা কবিতে লাগিল। কলিকাতাৰ বাণিজ্যসমিতি প্ৰভৃতি প্ৰধান প্ৰধান সভা হইতে এ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনেৰলেৰ নিকটে আবেদন হইতে লাগিল। কবাসী, আমেৰিকাবাসী প্ৰভৃতি অগ্ৰাছ বৈদেশিক জাতিও এ বিষয়ে ইংবেজদিগেৰ সহিত সমবেদনা দেখাইতে লাগিল। আবেদনকাৰীবা সকলেই সৈনিকদিগেৰ গ্ৰায যথানিয়মে সজ্জিত ও শিক্ষিত হইবাব ইচ্ছা প্ৰকাশ কবিল। কিন্তু গবর্ণর জেনেৰল এ সময়ে ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্যেৰ ৰাজধানী বন্ধাব জন্ত সখেৰ সৈনিকদল সংগঠিত কবিবাব বিশেষ প্ৰয়োজন দেখিলেন না। তিনি আবেদনকাৰীদিগেৰ প্ৰাৰ্থনায় এই উত্তৰ দিলেন যে, তাঁহাবা বিশেষ কনষ্টেবলৰূপে নিযুক্ত হইতে পাবেন। গবর্ণর জেনেৰলেৰ উত্তবে ইংবেজ সম্প্রদায় অধিকতৰ বিবৰ্ত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাবা অপবিসীম বিবাগ ও ক্ষোভেৰ সহিত মনে কবিতে লাগিলেন যে গবর্ণর জেনেৰল তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট কবিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই তাহাদেৰ কাতৰ প্ৰাৰ্থনায় উপেক্ষা দেখাইয়াছেন।

গবর্ণর জেনেৰল যে, আবেদনকাৰীদিগেৰ প্ৰতি তাচ্ছল্য দেখাইয়া তাহাদেৰ আবেদন অগ্ৰাছ কবিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। এই সময়ে বাহিৰে সাধাৰণেৰ সমক্ষে আপনাদেৰ গভীৰ আশঙ্কাৰ চিহ্ন প্ৰকাশ কৰা তাঁহাব অভিপ্ৰেত ছিল না। একপ কবিলে হয়ত সাধাবণেৰ হৃদয় অধিকতৰ

উত্তেজিত হইয়া উঠিত। ইংবেজদিগকে সকল বিষয়ে আট বাট বাধিতে দেখিয়া সাধারণে হয়ত আপনাদের জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কায় অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠিত। লর্ড কানিং সম্প্রদায় বা শ্রেণীবিশেষের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তিনি সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়েব ও সকল জাতিবই শাসন, পালন ও রক্ষার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, নিজ কলিকাতা ও সহর-তলীতে সকলেই যাবপব নাই ভীত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল স্থানে বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করিয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়েব নিবাস ভূমিতে এক শ্রেণীকে শাস্ত ও নিরঙ্কণ করিবার জন্ত যাত্রা কবা যাইবে, চরত তাহাতে অত্র শ্রেণী অধিকতর ভীতি-গ্রস্ত হইয়া উঠিবে। যাত্রাতে সবলেই শাস্ত হয়, সকলেই সর্জবাপী আশঙ্কায় আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, উপস্থিত সমস্যা তাহাই করা উচিত। এ সময়ে ভাবতবর্ষীয়গণ ভয়ে যাবপবনাই অস্তিত্ব হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা আপনাদের জাতিনাশ হইবে বলিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভয়ঙ্করী বিভীষিকা বিচলিত হইতেছিল, এবং আপনাদের জীবন বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিকম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। নানাবিধ বিশ্বয়কর বাজাবগুজব সকল বিভ্রান্তরূপে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। লর্ড কানিং প্রকাশ্য ঘোষণা পত্র দ্বারা, যাত্রাতে এই সকল কাহিনীর অমূলকত্ব সপ্রমাণ করেন, অজ্ঞাত ইংবেজ সম্প্রদায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। লর্ড কানিং ২০এ মে লিখেন, “বাজাব গুজব উঠিয়াছে যে, আমি হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-নাশের জন্য, যে সকল পুষ্টিবিব্রাতে হিন্দুগণ মান কবে, তৎসমুদয়ে গোমাংস ফেলিয়া দিতে আদেশ দিয়াছি। জনসাধারণকে অপবিত্র খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য মহাত্মার জন্য দিনে সমস্ত মুদীর দোকানই বন্ধ করা হইবে। যে সকল লোকেব এ সময়ে ধীরভাবে বুঝিয়া চলা উচিত, তাহাবাও আগ্রহের সাহিত বলিতেছেন যে, ঐ সকল গুজবের প্রত্যেকটি যেমন বাজাবে প্রচলিত হইবে, অমনি প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা তাহা অলীক বলিয়া বিজ্ঞাপিত কবা কতব্য। এরূপ কবা হইতেছে না বলিয়া ঐ সকল লোক পিস্তল লইয়া সজ্জিত হইতেছেন। এইরূপ জনববেব অলীকত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য, আমাব বিবেচনায় যোগ্যক্রিয়মত বোধ হইয়াছে, আমি তাহাই অবলম্বন করিয়াছি। বীরতা ও দৃঢ়তা সহিত চলিলে আমি আশা কবি,

সাধাৰণেৰে হৃদয় শাস্ত হইবে।” মহামতি লৰ্ড কানিঙ্ এইৰূপ ধীৰভাৱে ঐ সকল বিষয় আলোচনা কৰিয়া কৰ্ত্তব্য কাৰ্য্যেৰে অমুঠান কৰিতে ছিলেন এবং সম্ভাৱ্য বিশেষেৰে কটুক্তি ও উত্তেজনাৰ মধ্যো দৃঢ়তা হইতে অগুমাঞ বিচলিত না হইবা শাস্ত-ভাবে শাস্তিৰ বাজা অব্যাহত ৰাখিতে চেষ্টা পাইতে ছিলেন।

ভয়ঙ্কৰ বিপ্লবেৰ সময়ে মহামতি লৰ্ড কানিঙ্ যেকুপ উদাবতা ও সমদৃষ্টি দেখাইবা ছিলেন, এখন প্ৰগাচ শাস্তিৰ সময়ে সেইকুপ উদাবতা ও সমদৰ্শিতা বৰ্দ্ধিত হইলৈ, শাসিত জনপদেৰে দে, ক তদুৰ মঙ্গল হইতে পাবে, তাহা বলিৰ শেষ কৰা যায় না।

গুরুশিষ্যেৰে সম্বন্ধ ।

আমবা মানুষ বলিয়া অনেক সময়ে অহঙ্কাৰ কৰিয়া থাকি। প্ৰকৃত মানুষ হইতে পাবিলে অহঙ্কাৰেৰে কথাও আছে। কিন্তু প্ৰকৃত মানুষ কাহাকে বলিব ? আহাব, নিদা, ভয়, ভোগ, লালসাদি কতকগুলি সাধাৰণ প্ৰৱৃত্তি আছে, ঐ সকল বৃত্তি মানুষেৰেও যেমন, পশুৰেও তেমন। স্মৃতবাং ঐ সকল বৃত্তিৰ দ্বাৰা পশু হইতে মানুষ পৃথক্ কৰিতে পাবা যায় না। সেই জগুই হিতোপদেশকাৰ বলিয়াছেন—

“আহাব নিদা ভয় প্ৰভৃতি পশুৰেও যেমন মানুষেৰেও তেমন।

সামান্য়মেতং পশুভিনবাং।

জ্ঞানং নবাংমধিকং বিশেষঃ

জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমাণাঃ।”

অৰ্থাৎ “আহাব, নিদা, ভয় প্ৰভৃতি পশুৰেও যেমন মানুষেৰেও তেমন। মানুষেৰে কেবল জ্ঞানটৌ মাত্ৰ বেৰী। আহাব জ্ঞান নাই সে পশু।” আহাব, নিদা প্ৰভৃতি সাধাৰণ কতকগুলি বৃত্তিৰ সতিত যখন জ্ঞান মিলিত হয় তখনই মানুষেৰে মানুষত্ব, যতদিন জ্ঞান মিলিত না হয়, ততদিন তাহাৰ পশুত্ব দূৰ হয় না, মণুষ্যত্ব জন্ম না।

তবেই দেখা গেল, আমরা জন্মিয়াই মানুষ হই না। জন্মকালে আমাদের মানুষের মত চোক, মুখ, নাক, কাণ, সবই হ'ব বটে, কিন্তু তথাপি আমরা মানুষ নই। এই জন্ম আমাদের প্রাণী জন্ম, মানুষ জন্ম তখনও হ'ব নাই, আমাদের মনুষ্যত্ব তখনও জন্মে নাই। পিতা আমাদের জন্মদাতা, তাঁহারই রূপায় আমরা এ জগতে আসিবাছি, তিনি আমাদের গুরু, তিনি আমাদের পূজনীয়, আবাবনীয়। কিন্তু আমাদের উৎকৃষ্টত্ব জন্ম, এখনও বাকী। সেই উৎকৃষ্টত্ব জন্মদাতা, বা জ্ঞানদাতাও আমাদের পিতা। সেই জ্ঞানদাতা পিতা, আমাদের শিক্ষক, গুরু, আচার্য্য। মনু বলেন :—

“আচার্য্যো ব্রাহ্মণোমূর্তিঃ পিতা মূর্তিঃ প্রজাপতেঃ।”

আচার্য্য বা শিক্ষক পরমাশ্রয় মূর্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্তি। প্রজাপতি সৃষ্টিকর্তা, পিতা জন্মদাতা, সেই জন্তু পিতাকে প্রজাপতির মূর্তি বলা হইয়াছে। আচার্য্য জ্ঞানদাতা, সেই জন্তু তাঁহাকে জ্ঞানময় ব্রহ্মের মূর্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

মনু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা, জ্ঞানদাতা পিতাকে একটু উচ্চ স্থান দিয়াছেন। বোধ হয়, তাহা অতি যুক্তিসঙ্গত। পিতা আমার জন্মদাতা, এজন্ত আমি তাঁহার কাছে ধন্য। কিন্তু আমি অজ্ঞানতমদাচ্ছন্ন মহা জবাযুতে আজিও পড়িয়া আছি। কিছুই দেখিতে পাই না, জগতের কিছুই জানি:ত পাবি না, বুদ্ধিতে পাবি না। আমি কি তা জানি না, পশুতে আমাতে প্রভেদ কি, সে জ্ঞান আমার নাই। যে গুরু জ্ঞানাজ্ঞান শলাকার দ্বারা আমার মত অজ্ঞান তিমিরাক্ষ প্রাণীর চক্ষুকন্মীলিত করেন, তিনি যে উৎকৃষ্টতর জন্মদাতা তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার প্রসাদেই আমরা মনুষ্য জীবন লাভ করিয়াছি। সাধারণ প্রাণী জীবন অপেক্ষা মনুষ্য জীবন যেমন শ্রেষ্ঠ, উৎপাদক পিতা অপেক্ষা জ্ঞানদাতা পিতা তেমন শ্রেষ্ঠ।

মনু বলিতেছেন :—

“উৎপাদক ব্রহ্মদাতাগোবীর্য্যান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।”

অর্থাৎ জনক ও শিক্ষক দুইই পিতা, যেহেতু উভয়ই জন্মদাতা। তাঁহাদের মধ্যে উৎপাদক পিতা অপেক্ষা ব্রহ্মদাতা পিতাই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মদাতা অর্থে বেদের উপদেষ্টা বা প্রকৃত জ্ঞানদাতা।

বয়োজ্যেষ্ঠতা অপেক্ষা জ্ঞানজ্যেষ্ঠতায় আদ্য চিবকালই বৈশী। শিষ্য

অপেক্ষা গুরুব বয়স কম হইলেও তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান করিতে হইবে । এই বিষয়ে মনুতে এই সুন্দর গল্পটি আছে ।

অগ্নিবাব পুত্র শিশুকবি তাঁহাব অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃবা ও পিতৃবা পুত্রদিগকে পড়াইতেন, এবং “হে পুত্রক” বলিয়া ডাকিতেন । এইরূপ সম্বোধনে তাঁহাবা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদেব নিকট “পুত্রক” শব্দ যুক্ত কিনা জিজ্ঞাসা করেন । দেবতাবা মিলিত হইয়া বলিলেন, “শিশু তোমাদিগকে ঠিকই বলিয়াছে । যে ব্যক্তি অজ্ঞ সেই বালক, যিনি উপদেষ্টা, তিনিই পিতা, পণ্ডিতবা এইরূপ বলেন ।” মন্তকেব কেশ পর হইলেই যে বৃদ্ধ হয়, এমন নহে, যুবা হইয়াও যদি বিদ্বান হয়েন, তবে তাঁহাকে দেবতাবা বৃদ্ধ বলেন । গুরু বয়সে কমই হউন আব বর্ণা হউন, তিনি শিষ্যের মাথ, তিনি শিষ্যের পিতা, উৎপাদক পিতা অপেক্ষাও সম্মানের পাত্র ।

আজকাল গুরু শিষ্য বলিলে আমরা দুই বকমেব গুরু ও দুই বকমেব শিষ্য বুঝি । প্রথম, শিক্ষক ও ছাত্র, দ্বিতীয়ত দীক্ষাগুরু ও দীক্ষিত শিষ্য । আমি এ পর্যন্ত শিক্ষক ও ছাত্র অর্থেই গুরু শিষ্য কথা দুইটির ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, পরেও করিব । শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পরের সম্পর্ক ও কর্তব্যাকর্তব্যের বিষয় লইয়াই এই প্রবন্ধ ।

শিক্ষাগুরু আবার পূর্বে কাযাভেদে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইতেন । যিনি উপনয়ন দিয়া সাক্ষ বেদ অধ্যয়ন করাইতেন তিনি আচার্য্য নামে কথিত হইতেন এবং যিনি অর্ণজাভেব জন্ত বেদের এক দেশ বা বেদাদি পড়াইতেন তাঁহাকে উপাধ্যায় বলা হইত । এখন গুরু বালিলে সাধাবণত জ্ঞানদাতা মাত্রকেই বুঝায়, সেই জন্ত উপাধ্যায় ও আচার্য্য দুই অর্থেই গুরু শব্দের ব্যবহার করিলাম ।

যদ্বদ দেখা গেল, তাহাতে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধটা কি কতক বুঝা গেল ? গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ কেবলমাত্র পার্থিব নয়, লৌকিক নয়, সামাজিক নয়, তাহাতে লৌকিকতা প্রভৃতি সমস্ত ত আছেই, আবও কিছু বেশী আছে,— সেটুকু আধ্যাত্মিকতা । এই সম্বন্ধ ক্ষণভঙ্গুর নয়, ইহা সত্য, অজব, অমব, অবিনশ্বব, অনন্তকাল স্থায়ী । ভৌতিক দেহেব সহিত এই সম্বন্ধেব ধ্বংস নাই । তাহাবান মন্ত বলিয়াছেন :—

“আচার্য্যন্ত যাং জাতিং বিধিবৎ বেদপারগঃ ।

উৎপাদনতি দানিত্রা সা সত্য, সাক্ষবামবা ॥”

বেদজ্ঞ আচার্য্য গায়ত্রী উপদেশ দ্বারা যে জন্ম উৎপাদন করেন তাহা ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ বলিয়া সত্য, অজব, অমর । যাহার প্রসাদে আমরা ব্রহ্ম পর্যাঙ্ক পাইতে পাবি, তাহার সহিত সম্বন্ধকে কোন মতেই ক্লিক বলা যাইতে পাবে না ।

গুরুর কর্তব্য সম্বন্ধে মনু যাহা বলেন তাহাব মৰ্ম্মাঙ্গবাদ এই—ধার্মিক অধ্যাপক শিষ্যদিগের উপর কোনরূপ গুরুত্ব হিংসা না করিয়া শিক্ষা দান করিবেন । মধুর ও মৃদু বাক্যে শিষ্যের প্রীতি উৎপাদন করিবেন । ইত্যাদি

শিষ্যের কর্তব্য অনেক । মনুের শ্লোক তুলিবাব আবশ্যক নাই । মনু দ্বৈরূপ শিষ্যের কথা বলিয়াছেন, সেইরূপ শিষ্য ভাবতে আর কোন কালে হইবে কি না সন্দেহ । শিষ্যের মধ্যে যে সকল গুণ থাকা নিতান্তই প্রয়োজন তাহাব কয়েকটা এই,—

শিষ্য জিতেন্দ্রিয় হইবে, বাগদ্বেষাঢ়িব বশীভূত হইবে না, গুরুর প্রতি কখনও অভক্তি, অনাদর, অনাস্থা দেখাইবে না । মিথ্যাচরণ সকল সময়েই গহিত কার্য্য, ছাত্রাবস্থাব আবও বর্জ্য গহিত । হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি যাহাতে উন্নতি প্রাপ্ত হয়, তাহাব চেষ্টা বলা শিষ্যের নিতান্তই প্রয়োজন । দেশ ভূয়াদিব শোভা সম্পাদনে বিশেষ যত্ন করিবে না, বিলাসিতাব প্রশ্রয় দেওয়া ছাত্রের বর্জন্য নহে । ইত্যাদি—

ছাত্রের সহানুভাবী ছাত্রের প্রতি ভাইয়ের মত ব্যবহার করা উচিত । একজনের দুঃখে অপরে দুঃখ অনুভব করিবে, এবং সুখে সুখ অনুভব করিবে ।

শিষ্য যে স্থানে গুরুর নিন্দা বা পন্থাবাদ শুনিবে, হয় সেস্থান হইতে অপর স্থানে চলিয়া যাইবে, অথবা কাণ ঢাকিয়া রাখিবে । মনু বলেন—

“গুরুোবত্রি পবীবাদ, নিন্দাবাপি প্রবর্ততে

বর্ণো তত্র পিধাতবো গন্তব্যঃ বা ততোঃস্থতঃ ।

পূৰ্ব্বকালে আমাদের দেশে গুরুশিষ্যের নিকূপ সম্বন্ধ ছিল, কিংবদন্তি আচরণ ছিল তাহার ছায়ামাত্র আমি দেখাইলাম । পূৰ্ব্ব প্রাক্কণই প্রধানত গুরু ছিলেন । তাহাবা বেদ অধ্যাপন করাইতেন । স্মৃতবাং এখন আমরা অনেক পবিবর্তন দেখিতে পাই । গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ এখন কিংবদন্তি হইয়া দাড়াইয়াছে দেশা মাউক ।

ভাবতবর্ষের অপব কোন প্রদেশের কথা আমি জানি না । বাক্সালাতে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক স্থাপন করিবার পূৰ্ব্ব একটা কথা বলা আবশ্যক যে

বাক্সালাষ গুরু শিষ্য এক বাক্স নহে। এখন বাক্সালাষ হিন্দুদেব মধ্যে দুই বাক্স শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত। স্মৃতরাং দুই বাক্স গুরু শিষ্য দেখিতে পাই। দুই শিক্ষাপ্রণালীতে যখন অনেক প্রভেদ, তখন গুরুশিষ্যের সম্পর্ক দুই বাক্স হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। টোলে ও ইংবাজি স্কুলে সম্পূর্ণ পৃথক নিয়মে অধ্যাপনা হয়। টোল পূর্বনিয়মেব অনুসরণ কবিয়া চলিতে চান, পূর্ব নিয়ম রক্ষা কবিতে চান। কিন্তু স্কুলে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ অন্তরূপ। সেখানে কোন বিশেষ নিয়মেব অনুবর্তী হইয়া কেহ চলে না। ছাত্রগণ তাহাদেব সাধারণ জ্ঞানে গুরুকে যতদূর ভক্তি প্রদা কবা উচিত মনে কবে, তাই কবে। টোলের ছাত্রগণ গুরুবাক্য লঙ্ঘন মহাপাপ মনে কবে, স্কুলেব ছাত্র অনেক সময়ে কিছুই মনে করে না।

যদিও পূর্বনিয়ম বন্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প, তথাপি টোলে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক মর্যাদা বাধিয়াছে। টোলে অধ্যাপক আজিও ছাত্রের “পিতা” অধ্যাপকের ভ্রাতা “খুড়ো” সহাধ্যায়ী ছাত্র “দাদা” বা “ভায়া”। টোলেব পূর্ব গৌরবের সহিত আধুনিক চরবস্থা তুলনা করিলে যদিও টোলেব অনেক অননতি হইয়াছে দেখা যায়, তথাপি ইহার গোবব একবাবে বিলুপ্ত হয় নাট, ইহা বেশ বলিতে পারা যায়। টোলেব অধ্যাপকগণ এখনও পূর্ববৎ নিম্পৃহ, অথবা সামান্য অথৈই সম্ভট। যতদিন অধ্যাপকগণ এইরূপ নিম্পৃহ থাকিবেন, যতদিন বিলাসিতাব মোহন মগ্নেব চলনে না ভুলিবেন, যতদিন নিজের কঠব্যজ্ঞান, স্বাভাবিক তেজ, শাস্ত্রানুশীলনে আসক্তি, স্বকীয় ধর্মে অবিচল অনুপ্রাণ হইতে অনুমাত্র বিচলিত না হইবেন, যতদিন শাস্ত্রচিন্তায় জলাঞ্জলি না দিয়া, নিজের বংশপরম্পরাগত সম্মানের দিকে লক্ষ্য বাধিয়া চাটুকায়-বৃত্তিতে দাক্ষিত না হইয়া, নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা কবিবেন, যত দিন “উপাধি ব্যাধি” গ্রস্ত হইয়া যুগিত পদানুসরণ না কবিবেন, ততদিন আমরা টোলের যমুর শিক্ষা, পবিত্র শিক্ষা, স্বর্গীয় শিক্ষাব জ্যোতি দেখিতে পাইব, সহাব্যায়ী মধ্যে সহোদব প্রীতি দেখিয়া রুদয়ে স্বর্গীয় স্মৃৎ অনুভব করিতে পারিব, গুরুর প্রতি ছাত্রের অকৃত্রিম ভক্তি দেখিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে পারিব।

এইস্থানে আমি টোলেব শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধেব বিষয়ে কোন কথা বলিতে হইলে, টোলেব কি নিয়মানুসারে পড়া হয়, কি নিয়মে থাকা হয়, অধ্যাপক ছাত্র সহিত কিক্রমে ব্যবহার

করেন, তাহা বলা আবশ্যক । অনেক দিন হইল “সাধারণীতে” প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার মর্ম্ম এই,—

ছাত্র ভাবে উঠিয়া “আবৃত্তি” আরম্ভ করেন । টোলের ছাত্রগণ আবৃত্তিকে পাঠের একটা অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন । তাঁহারা বলেন—“আবৃত্তি: সর্ক্সশাস্ত্রাণঃ বোধাদপি গবীরসী” । অর্থাৎ আবৃত্তি—অর্থ বুঝা অপেক্ষা ও ভাল । আবৃত্তি শেষ হইলে তাঁহারা অধ্যাপকের কাছে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন । গুরু আসনে উপবেশন করিলেন, ছাত্রগণ সম্মুখে বসিলেন । ছাত্রের হৃদয়ে ভক্তির স্রোত বহিতে লাগিল, গুরুভক্তিতে হৃদয় মগ্ন হইল, ছাত্র গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া পাঠাবস্তু করিলেন, পাঠশেষ হইলে গুরুকে আবার নমস্কার করিয়া স্থানান্তরে বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন । এইরূপে অধ্যয়ন অধ্যাপন চলিতে লাগিল । গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি অচল, প্রগাঢ়, শিষ্যের প্রতি গুরুর স্নেহ অচল, অটল, প্রগাঢ় ।

বৈকালবেলা নূতন পড়া হয় না । সকালবেলা যাহা পড়া হয়, তাহাব আলোচনা । এইরূপ আলোচনাকে টোলের ছাত্রগণ “পাঠ চাওয়া” বলেন । এই সময়ে ছাত্রে ছাত্রে অলৌকিক ভ্রাতৃত্বাবে পরিচয় । ছাত্রের প্রতি ছাত্রের স্বর্গীয় স্রীতিব দৃষ্টান্ত । অধ্যাপক অধিক পাঠের ছাত্রকে পাঠ চাওয়ান, তাব পব যাহাব অপেক্ষা যে কম পড়ে, সে তাহার কাছে পাঠ চায় । অধিক পাঠের ছাত্রকে অল্প পাঠের ছাত্র অগ্রজের মত ভক্তি করেন, তিনিও তাঁহাকে কনিষ্ঠের মত স্নেহ করেন । এই সকল নিয়মেব গভীবতা নাষ্ট, বৃদ্ধিতে পারি যা অনেক টোলের সমস্ত প্রথারই দোষ দিয়া থাকেন । কিন্তু তা'। নিতান্তই ভ্রু:খের বিষয় । বাস্তবিক টোল নিন্দার বস্তু নয় । পূর্বে হিন্দু-দেব গুরু শিষ্যের কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহা টোলে গেলেই কতক পরিমাণে বৃদ্ধিতে পাবা যায় ।

স্কুলে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত কম । পূর্বে সংস্কৃত কলেজে টোলের নিয়ম চলিত । এখন সংস্কৃত কলেজ হইতেও সে নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে । এখন অপর স্কুলেও গুরু শিষ্যের যে সম্পর্ক, সংস্কৃত কলেজেও তাই ।

ইংবাজি স্কুলে গুরুশিষ্যের সম্পর্কটা বড়ই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে । বালকগণ যতদিন নিম্নশ্রেণীতে পড়ে, ততদিন তাহাদের কোমল, সরল, নির্মল, হৃদয়ে গুরুভক্তির একটু বেথা দেখা যায় । কোমল জিনিষে বেথা বেশী দিন থাকে না, শিশুর কোমল হৃদয়ের ভক্তি বেথাও জল বেথাবৎ বিলুপ্ত

হইয়া যায়। শিশুকালে যে গুরুভক্তির চিহ্ন দেখিতে পাই, উহা গুরুভক্তি কিম্বা ভয়ের কণাস্তব মাত্র, বুঝিতে পারি না। স্কুলেব ছাত্রগণে গুরুভক্তির অভাবই পদে পদে লক্ষিত হয়।

বাহ্যে প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস নাই, তাঁহাব কথা হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন? সন্দেহ, দ্বৈধভাব, অবিশ্বাস শিক্ষাব বিশেষ অন্তায়। আমাদের ছাত্রগণেব অধ্যাপকেব উপর কথায় কথায় সন্দেহ। তাহাবা “গুবোর্কচঃ সত্যমসত্য সত্যং” গুরুব কথাই ঠিক, অপব মিথ্যা, এই মহাবাক্যেব অহুসবণ কবে না। গুরুব প্রতি শিষ্যেব ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস নাই, স্তবনাং গুরুদক্ষিণাব ঘটটা একটু বেশী হইয়া দাড়াইয়াছে। অধ্যাপক পাঠেব জন্ত কোনকপ তিব্ধাব কবিলেন, ছাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাস্তায় গুরুদক্ষিণাব বন্দোবস্ত কাঁবয়া গেল। পূর্বে গুরুদক্ষিণাব বন্দোবস্ত ছিল “উপহারে” এখন “প্রহাবে।” ছাত্রদেব অবগুই দোষ নাই, “প্র” উপসর্গটা যুটাই সর্বনাশ কয়িয়াছে। এমন স্থূল আজকাল বড়ই বিবল, যেখানে এমন গুরুভক্ত ছাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়েব বিদ্যালয়ে একবাব গুরুভক্তিব একটা ঘটনা ঘটয়াছিল। সমযটা আমাব ঠিক মনে নাই, বোধ হয়, ১৮৮২ সাল। এক শ্রেণীব ছাত্রগণ, দেওখালেব গায়ে গুরুব অশ্রাব্য স্তুতি লিখিয়া গুরুভক্তিব পবাকঠা দেখান। তাহাব জন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্লাসেব সমস্ত বালক তাড়াইয়া দেন। গুরুব অপমানেব জন্ত এবটা ক্লাসেব সমস্ত বালক তাড়াইতে হইল, ইহাপেক্ষা হিন্দুব আৰ কি অধঃপতন হইবে?

গুরুশিষ্যেব সম্বন্ধ-শিথিলতাৰ এইখানেই শেষ হয় নাই। গুরুনিন্দা গুরুপ্রহাব, গুরুতিব্ধাব কবিয়াই আধুনিক গুরুভক্তগণ খুসী নহ, যেখানে সেখানে, যখন তখন, তাহাবা গুরুদানব-পবাক্ষয় কাহিনী, অটুহাণ্ড হাসিয়া, ঈহং গস্তীরত, ঈহং তবলতাৰ সহিত বলিয়া বারাদ্বী দেখাইয়া থাকে। বলিয়া থাকে—“কত মাঠেব পণ্ডিত ঠিক কবে দিযেছি।” এইরূপ গুরুদক্ষিণাব বন্দোবস্ত কলিকাতায়ই বেশী। পল্লীগ্ৰামেব বিদ্যালয়ে যদিও গুরুভক্তিব বেশী একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি এতটা অধঃপতনেব চিহ্ন দেখা যায় না।

তাৰ পব সহাধ্যায়ীৰ প্রতি ব্যবহার। তাহাতেও স্কুলেব ছাত্রেব প্রশংসা কবিতে পারি না। সহাধ্যায়ীৰ সহিত সদ্ভাব জ্ঞান ত দেবেব কথা, তই তিন

বৎসব একত্র পাঠ করিয়া ছাত্রেরা পরস্পর নাম পর্য্যন্ত জানেন না। মানুষ একেবারে আপনাকে লইয়া থাকিতে পারে না, তাই ছুই এক জনের সহিত আলাপ থাকে। ইহাতে সহাধ্যায়ীর প্রতি উচিত ব্যবহার করা হইল বলিয়া, বোধ হয়, কেহই স্পর্ধা করিবেন না।

আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, স্কুলে যত ছাত্র পড়ে সকলেই গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর কবে। এখনও স্কুলে অনেক গুরুভক্ত ছাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুভক্তির জন্ত, মাতৃভক্তির জন্ত, বা স্বধর্মবক্ষার জন্ত আবার প্রশংসা কি ? উহা ত কঠব্য কার্য। আমরা ক্রমে এতদূর শোচনীয় দশায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি যে, আমাদের গুরুভক্তি, মাতৃভক্তি, স্বধর্মে বিশ্বাসও একটা প্রশংসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়েক দিন পরে ছেলেকে ছেলে বলটাও হস্ত প্রশংসার কথা হইয়া দাঁড়াইবে।

এরূপ হইল কেন ? গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ কেন এতদূর শিথিল হইল ? তাহার কাণ্ড অনেকগুলি। আদ্য বোধহয়, এই কম্বলী কাণ্ডই—প্রধান।

প্রথম। গুরুব সম্বন্ধ শিষ্যের ঘনিষ্ঠতার অভাব। পূর্বে গুরুব বাড়ীতে শিষ্য বাস করিত, স্নাতকাদি দেখিয়া শুনিয়া গুরুব আচাৰ, ব্যবহার, রীতিনীতি শিষ্যের অভ্যাস হইত। সর্গদা দর্শনে, সর্গদা সম্ভাষণে তাহাদের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইত। স্কুলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় শিক্ষক বদল হয়, দিনে এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা শিক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইহাতে অবশ্যই ঘনিষ্ঠতার আশা করা যায় না। স্নাতকাদি পূর্বে মত গুরু শিষ্য সম্বন্ধ স্কুলে হইতে পারে, এ আশা ছাড়াই মাত্র।

দ্বিতীয়। পূর্বে গুরু একজন থাকিতেন, এখন তাহার স্থানে অনেক। একের প্রতি কঠিন্য পালন করিতে যতটা সুবিধা, দশের প্রতি অবশ্যই ততটা নহে। প্রতি বৎসব শিষ্যের নূতন নূতন শ্রেণীতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুরু সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, ছাত্রেরও বর্ধিত্য বাড়ে। গুরু এক বকমেব হইলে তাহাকে সম্বলিত করা সহজ। কিন্তু এখন একটা ছাত্রের নথী গুরু। নথী আবার নববঙ্গের। একজনের হিন্দুধর্মে অজ্ঞানতা, একজন খ্রীষ্টধর্মের পক্ষপাতী, আর একজন হয়ত কোন একটা উপধর্মের উপাসক। হিন্দু শিক্ষক বলেন গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ “পিতাপুত্রের সম্বন্ধ।” অপর একজন বলেন গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ, “ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার সম্বন্ধ।” খ্রীষ্টান অধ্যাপক হয়ত আর এক বাক্য বলিবেন। এখন ছাত্র কি শিখিবে ? কাহাকে খুঁজিবে ?

কবিবে ? সুতরাং শিষ্যের ঘাড়ে ওরুকে অসম্ভব করাব শোধ একটু পড়িবেই পড়িবে।

তৃতীয়। গুরুর কর্তব্যের শিথিলতা। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর অবশ্য-জ্ঞাবী ফলই গুরুর কর্তব্যের ক্রটি। তাহার প্রধান কারণ আর্থিক সম্বন্ধ। গুরু পড়ান, পূর্বের মত ধর্ম উপার্জনের জন্ত নয়,—কেবল অর্থের জন্ত। কর্তব্য পালনে ধর্ম হয়, কি শিষ্যের পাঠের ব্যাঘাত হইলে অধর্ম হয়, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। দিনটী গেলেনই দুইটা টাকা পাইবে, দুই টাকায় বোজ দুই ঘণ্টা কবিয়া খাটিবে, ঘণ্টাটী বাড়িলেই বাড়ী চলিবা যাইবে—এই তাঁহাদের হিসাব। ছাত্রের মঙ্গলের জন্ত দুই ঘণ্টা সময় অধিক বায় কবিত্তে তাঁহাদের হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব এমন কোন মহাত্মা থাকিতে পাবেন, যিনি অর্থের লালসা না কবিয়া ছাত্রের উন্নতির জন্ত অতিরিক্ত পবিত্র্য করেন। তাহাব বার্য্যকে সকলেই প্রণাম্য কবিবেন, আমিও কবি। কিন্তু সাধারণত কি দেখিতে পাই ? দেখিতে পাই, আদিক সম্বন্ধের জন্ত ও শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্বন্ধের শিথিলতা ঘটিয়াছে।

চতুর্থ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষেও গুরুশিষ্যের সম্বন্ধটা শিথিল হইতেছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে আমাদের দেশে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ জ্ঞানগত। জ্ঞান তাহাব মূল ভিত্তি। জ্ঞান যে শিক্ষাব উদ্দেশ্য নয়, সে শিক্ষার জ্ঞানগত সম্বন্ধ থাকতে পাবে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত জ্ঞান দান কবিত্তে ইচ্ছা করেন না। তাহাদের জ্ঞান পরীক্ষা গত, পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হইল সেই জ্ঞানী, যে উত্তীর্ণ হইল না সে অজ্ঞান। সুতরাং যাহাতে ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পাবে, তাহাই শিক্ষকগণ শিখাইতে বাস্তব থাকেন। ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, মহাজ্ঞানী হইল, ঐ পানেই গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ঘুচিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানের কথায় আমার একটা বৈবাগীর জামাব কথা মনে পড়িল। বাউলদের মধ্যে মাঝে মাঝে এক বকম জামা দেখা যায়, সেই সকল জামা উনপঞ্চাশ বা বৈবাগীর বকমের ছিটের দ্বারা প্রস্তুত। সকল বকমের ছিটখও সূচী স্বত্রেব মাহাত্ম্য জামাক্রমে পবিত্র হয়। যখন আমবা ঐ জামাব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবি, তখন তাহাব বাহ্যিক চাকচিক্যে মোহিত হই, শিল্পীকে বাহবা দিই। কতকদিনের পব, সূত্রেব জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রযুক্ত কক্ষচ্যুত নক্ষত্রেব মত ছিটখও সকল স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে। তাহাব প্রকৃত মূল্য বাহিব হইলা পড়ে। আমাদের বিশ্ব-

বিদ্যালয়ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূবিদ্যা, বসাবসন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যার টুকরা দিয়া একটা জামা প্রস্তুত কবিয়া ছাত্রেব গায়ে দিয়া দেন, তুই ত্বিন পবে যখন তাহাদেব মেধা সূত্র ছিল হয়, তখন সেই জামাব কিছুই থাকে না। জ্ঞানই যখন জন্মিল না, তখন জ্ঞানগত সম্বন্ধ থাকিবে, কেমন কবিয়া ?

পঞ্চম। পূর্বে ছাত্রগণ ইচ্ছামত শিক্ষক বাছিয়া লইতে পারিত। এখন ইচ্ছামত স্কুল বাছিয়া লইতে পারে। স্কুলে তাহাব অদৃষ্টে কিকণ শিক্ষক লাভ হইবে, তাহা সে জানিতে পারে না। হয়ত স্কুলে প্রবেশ কবিয়াই দেখিল শিক্ষক তাহাব মনেব মত নয়। অগত্যা তাহাকে স্কুল ছাড়িতে হইল। এইরূপ স্কুল পরিবর্তনও গুরুশিষ্যেব সম্পক শিথিলতাৰ কারণ।

ষষ্ঠ। স্কুলে সকল শিক্ষক সমান নয়। তুই একজন শিক্ষক, কবিবাব বাজরুজ বায় মহাশয়ব “প্রজ্ঞাদ চবিত্রেব” ষণ্ডামকেব মতও আছেন, প্রজ্ঞাদ শিস্য ত আব সব স্থানে যোটে না, স্তববাং নানা বকম অত্যায কাৰ্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, গুরু দক্ষিণাব গুরুতব ঘটাব কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

গুরুশিষ্যেব সম্বন্ধ শিথিলতাৰ যে বশটি কাবণ দেখাইলাম, ইহাব অনেক গুলি টোলে নাই, স্তববাং টোলে গুরুশিষ্যেব সম্বন্ধ এতদূব শোচনীয় হয় নাই। অনেক দিন পূর্বে স্কুলেও গুরুশিষ্যেব সম্বন্ধ বর্তমান সময় অপেক্ষা অনেক পবিত্র ছিল। মহাত্মা ডেবিড্ হেয়াব, প্যাবিচবণ সবকাব, প্রসন্নকুমাৰ সৰ্কাধিকাবী প্রভৃতি অব্যাপকগণ আজিও ছাত্রেব হৃদয়ে হৃদয়ে বিবাজ করিতেছেন। তাহাদেব মেহ, মমতা, ছাত্রবৎসলতা, সৰ্বজন বিদিত। যদি ছাত্রকে আপনাব মত দেখিতে না জানি, আপনাব মত ভাবিতে না পারি, তবে সেই বা আমাকে গুরু বলিয়া স্বাকাব কবিবে কেন ?

গুরুশিষ্যেব সম্পক নানা কাবণে শিথিল হইয়াছে দেখাইলাম। উহাব কাবণ ছাত্রেব দোষ, শিক্ষা প্রণালীৰ দোষ, শিক্ষকেব দোষ, প্রভৃতি সকল প্রকার দোষো সন্নিষ্ট। এই দিবয়ে কতকটা সংস্কাব আবশ্যক। পূর্বে যেকণ গুরুশিষ্য ভাব ছিল আবাব তাহা কব, যে নিয়ম আজিকার দিনে ভাল বলিয়া বিশ্বাস না হয়, বৈজ্ঞানিক বাখ্যা দ্বাবা তাহা ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন কবিয়া দেও, এরূপ কথা আমি বলিতে চাহি না। বৈজ্ঞানিক বাখ্যাকে আমি বড ভয় কবি। আমি বলি, গুরুশিষ্যেব সম্বন্ধটা নেহাড ক্রম বিক্রমেব সম্বন্ধ বলিয়া বালকগণ বাহ্যতে মনে না কবে, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। আমরা হিন্দু এই কথাটা আমাদেব মনে বাখ্য

উচিত। আমবা যদি সৰ্ব্বান্তঃকরণে শিক্ষকের সম্মান কবিতো না জানি তবে কেবল যে তাঁহাদের মৰ্যাদাব হানি করিলাম এমন নহে, নিজেরও সম্মান হানি কবিলাম। হিন্দু কোন কালে অকৃতজ্ঞ নহেন। যাহাব নিকট হইতে জ্ঞান রত্ন লাভ কবি, তিনি শত দোষেব আকব হইলেও আমার কাছে তিনি পুত্র, আমাব ভক্তির পাত্র। নানা কাবণে আমাদেব জ্ঞানেব পূর্ণতা হইতেছে না বলিয়া, গুরুব প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান অকৃতজ্ঞেব ধৰ্ম্ম। শিক্ষা কালে গুরু আমাদিগকে এমন অনেক কথা বলেন যাহাব একটী কথা পালনে সমর্থ হইলেও আমবা অনন্ত কাদ সূখে কাটাষ্টতে পারি। বেদে আছে—

“একঃ শব্দঃ তু প্রযুক্তঃ সমাক্ জাতঃ

স্বর্গে লোকে চ কামবৃক ভবতি।”

একটা শব্দ যদি উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করা যায়, এম তাহাব অর্থগ্রহ করা যাব, তবে স্বর্গ, মতে বাঁচ ফল লাভ করা যায়। কৃষ্ণ পুৰাণ বলেন :—

“আত্মনঃ সৰ্ব্বং যত্নেন প্রাপত্যাপণেণ বা পুনঃ

পূজনীয়া বিশেষণ পঠ্যতে ভা তমিচ্ছতা।”

অর্থাৎ মঙ্গলোচ্চারণ প্রাপণপণে গুরুদেব পূজা কবেন। অদ্বিসংহিতা বলেন,—

“এক মপাফলং বস্ত গুরুশিষ্যো নিবদয়েৎ।

গুণিণ্য নাপ্তি তদন্তরং বদন্তা সোচ্চনী তবৎ ॥”

অর্থাৎ একটা অক্ষরও যে গুরু শিক্ষা দিয়াছেন, শিষ্য জগতেব কোন বস্তু প্রদান কবিলে তাহাব ধন হইতে মুক্ত হইতে পাবে না। এইরূপ হিন্দুব রুতজ্ঞতা। সেই হিন্দু কুলে জন্ম গ্রহণ কবিয়া অকৃতজ্ঞতাব কালী মুখে মাথিয়া গুরব অমৰ্যাদাকপ মহা পদে যাহাতে পতিত হইতে না হয়, তাহাব জ্ঞতা চেষ্টা কবা কি ছাত্র নামেবই উচিত নয়? কত বাব দোষণাম্যা অজ্ঞানেব সহিত সমুখ সমবে উপস্থিত হইবাছেন, অজ্ঞান তাণেব সহিত যুক্তও কবিয়াছেন, কিন্তু মৰ্যাদা রক্ষা কবিতো কখন ভুলেন নাই, গুরুব অঙ্গে শর বিদ্ধ করিবার পূর্বে, তাহাব পদ বন্দনা কবিতেন। গুরুশিষ্যেব সম্বন্ধেব বিষয় যতই ভাবা যায়, ততই তাহাব মাধুর্য্য মোহিত হইতে হয়, ভাবে বিভোব হইতে হয়, গুণেব মহিমা চমৎকৃত হইতে হয়। গুরুকে গুরব মত দেখিলে, ছাত্রের রূপেও অসীম আনন্দেব উদয় হইয়া থাকে। দাতা দান কবিয়া যতদূর আনন্দ উপভোগ কবেন, ভিক্ষক দান পাইয়াও ততদূর আনন্দ পায় কি না

সঙ্গেই। তাই বলি, ছাত্রগণ! তোমরা গুরুকে বতদূর সম্ভব সম্মান করিবে, তাহাতে তোমাদের সম্মান বাড়িবে। মনে রাখিও

“অন্নং বা বহু বা যন্তু ঐতস্তোপকরোতি যঃ।

তমপীত গুরুং বিদ্যাং প্রতোপক্রিয়য়া তন্না ॥”

অর্থঃ যে শিক্ষক ছাত্রকে অন্নই হউক বা অধিকই হউক, শাস্ত্র অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে গুরু বলিয়া জানিতে হইবে।

আব মনে রাখিও,—অধ্যাপক হোমাদেব অশ্রায় ব্যবহার সংশোধনের জন্তই হোমাদেব উপর শাসন করিয়া থাকেন,—তোমরা ত অধ্যাপকের পর নও। অধ্যাপকছাত্রদের শাসন করেন, পরের ছেলে বলিয়া শাসন করেন না। নিজের কোন অঙ্গ বেগ হইলে যেরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়, সেইরূপ হোমাদেব দোষ সংশোধনের জন্ত শাসন করেন। যে ছাত্রের মুখে বিষাদেব চিহ্ন দেখিলে প্রাণ আকুল হয়, সন্তোষেব চিহ্ন দেখিলে হৃদয়ে স্বর্গীয় স্বথ অনুভব করি, তাহাও সহিত কি ক্ষাণ্যবী সম্বন্ধ? যাহার দর্শনে নয়ন পবিত্র হয়, যাহার কথা শুনিতে কাণ জুড়ায়, যাহার উন্নতি শুনিতে হৃদয়ে আনন্দ ধবে না, যাহাদের সন্নি কথ্যাপকথনে মেহময়ী জননীর কথা পশ্যন্তু বিস্মৃত হইয়া যাই, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ কি ক্ষণভঙ্গ?

ধরনী ও রমণী ।

রঙ্গে ধরণীব প্রধানত দুই মূর্তি, বাসন্তী মূর্তি ও প্রাবৃট্ মূর্তি। বঙ্গরমণীবও প্রধানত দুই মূর্তি—সেইরূপ বাসন্তী মূর্তি ও প্রাবৃট্ মূর্তি।

শীতের অবসানে হিমের তেজ কমিয়া আসে দিগ্‌মণ্ডল কমণ পরিষ্কার হইতে আৰম্ভ হয়, গ্রহ নক্ষত্র চক্রে সূর্য্যেব কিরণ পরিষ্কৃত হয়, চারিদিকে তাহাদের বিমল ও কোমল জ্যোতিঃ বিভাসিত হয়। শীতে তরু লতা পত্র-মুগ্ধ শূণ্য হিঁস, অনেক গাছ একেবারে ডাটা সার হইয়া পীন হীন বেশে জীব

বোগীর মৃত আত্ম পঙ্কর লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বসন্তাগমে যেন তাহারা কোন মোহিনী শক্তিবলে পুনরুজ্জীবিত হইল, আবার যেন মৃত শরীবে বস্তু সজীব হইল, নূতন নূতন নানা বস্ত্রের পাতা দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে সাদা সাদা, লাল লাল ফুলের কুঁড়ীগুলি উঁকি মাঝিতে লাগিল। যে উত্তরীয় বায়ু স্পর্শে শরীর জড়সড় হইত, আজ আর সে উত্তরীয় বায়ু বহিতেছে না, এক্ষণে মৃদু মন্দ মধুর মলয় মাক্তেব কাল পড়িয়াছে। তবে মাঝে মাঝে অনেক দিনেব পুরাতন সস্তাব ভুলিতে যেন না পারিয়াই, উত্তরীয় বায়ু সময়ে সময়ে এক একবার দেখা দিয়া যান। কিন্তু অসময়ে আসিলে এনি হয়, দেখিবামাত্র ধরণী আপনাব বদনমণ্ডল কুজ্বাটিকা অবগুঠনে আবৃত কবেন। এইরূপ দিন কতক চলিয়া গেলে উত্তরীয় বায়ু আব বড় দেখা দিতে সাহস কবেন না। এক্ষণ দক্ষিণবায়ু ক্রমাগত বহিতে থাকে। গায়ে লাগিলে শরীর শীতল হয়, ঐশি ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু যখন সাংকালে কাল বৈশাখী বেগে, কখন ঘোর ঘূর্ণী বায়ুরূপে, কখন ভীম ঝঞ্ঝাবাতরূপে আসিয়া সমুপস্থিত হয়, তখন বড়ই ভয়ানক ; আবার কখন বৃষ্টিপাত, কখন কবকাবাত—সেইটাই আবও ভয়ানক।

বসন্তকাল ফুলের রাজত্ব সময়, নানাবিধ ফুল, গাছাদিকে প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধে চারিদিক আকুল করিয়া তুলে। যেমন শোভায় তেমনি গন্ধে, কন্দর মন আনন্দে ভরপুর করিয়া তোলে। বাগানে, মাঠে, জঙ্গলে, বনে, যেখানে ডাকাতিবে সেইখানেই ফুল। চারিদিকে ফুল ছড়াইয়া প্রকৃতিদেবী যেন ফুল ক্রীড়াষ বিস্তার। অনেক গাছ আজও পাতা দেখা দেয় নাও কেবল ফুলে আচ্ছন্ন, কোনটী কেবল সাদা, কোনটী কেবল লাল। গোম আম্র মুকুল, বনে শাল পিয়ালের মুকুল ফুটিয়া চারিদিক গন্ধে পূর্ণ কর। বসন্তে ধবলী ফুলময়ী—ধবলী শোভাময়ী—ধবলী গন্ধময়ী। কেবল এই টুকু বালিদাই ক্ষান্ত হইলে বসন্ত বর্ণনা ফুয়ার না। বসন্তেব অপব অঙ্গ কোকিল, পার্ণায়া, দাহিয়াল, ভ্রমর প্রভৃতির স্রমধুর শব্দ। যখন নববাগ্ভাব নবকিশলয়মধ্য হইতে কোকিল পবদায় পবদায় আওয়াজ চড়াইতে থাকে, পার্ণায়া, দাহিয়াল প্রভৃতি প্রহ্লাষে ক্রমোন্নতি সহকারে ডাকেব উপব ডাক ছাড়িতে থাকে, ভ্রমর আম বা শালব মুকুলের ভিতর দলবদ্ধ হইয়া গুণ্ গুণ্ ববে স্রব ধবিতে থাকে, তখন মন বিড়োর করিয়া তোলে। আপনা আপনি বিস্মৃত হইতে হয়। অমনি যেন কোঁচ হয় ধবলী এক নূতন সাজ নূতন সাদৃশ্যে মোহিনী

মুদ্রিত আশাদিগকে আশ্বিনিত করিতে আসিয়াছেন। স্তব্ধতা বসন্তের ধবণী ফুলময়ী—ধবণী শোভাময়ী—ধবণী গন্ধময়ী—ধবণী মধুব শব্দময়ী।

আর বর্ষায় ধরণীর আব এক বেশ। এখনও সেই দক্ষিণাবায়ু ক্রমাগত বহিতে থাকে, তবে বসন্তের মত সময়ে সময়ে উত্তরের বায়ু আর দেখা দেয় না, মাঝে মাঝে পূর্ব হইতে বায়ু বহিতে থাকে তাহাতে শরীরে জড়তা আনিয়া দেয়, মনের ক্ষুধা হানি করে, কিন্তু বসন্তের উত্তরের বায়ুর মত হাতে ধবণী কৃষ্ণটি পাচ্ছা হব না। বসন্তের ঘূর্ণিবায়ু, বসন্তের কাল বৈশাখা, বসন্তের বজ্রাবাত, বসন্তের করকাপাত এখন এ সকল কিছুই নাই। এখন অন্য সময়ে অজ্ঞানধারে বারি বর্ষণ হয় আর কখন কখন আকাশ মণ্ডল বোষপববশ হইয়া বিদ্যুৎ বজ্রাবাত দেখাইয়া আশাদিগকে ভয়ে জড়সড় করেন। বসন্তে ধবণী ফুলময়ী, বর্ষায় ধবণী ফলময়ী। কিন্তু তা বলিয়া বর্ষায় ফুল ফুট না, বলিলেও চলিবে না। যে কালে জলে কমল কুমুদ কল্লাব, স্থলে কদম্ব, কেতকী, শেফালিকা, সে কালে ধরণী ফুল-সোভাগ্য হীনা এ কথা বলিতে পাবা যায় না। তবে এখন ফুলে সে রসের চটক নাই, সে গন্ধের উন্নতকাবী তেজ নাই। বর্ষায় ধরণীর বেশভূষাব আব একটু প্রভেদ,—বসন্তে ধরণী নানা বস্ত্রে সজ্জিত, বর্ষায় ধরণী আগা গোড়া ভবপুৰ সবুজে ঢাকা, মাঝে সাদা সাদা বড বড ফুল। যেন মা নিজের আনন্দ নিজে ব্যথিতে না পাবিয়া পল খল ববে হাসিয়া বিহ্বল। এই টুকু বড়ই শোভাময়। বর্ষায় নদী খাল বিল সমস্তই জলে ভরপুর। কূলে কূলে জল। এখন অল্প জল লইয়া কুল কুল কবিতে কবিতে নদী প্রবাহিত নহে, এখন জল প্রাচুর্যে গম্ভীরভাবে একই মনে একই গতিতে সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছেন। এখন আন নদীর জোয়ার ভাটা নাই, কেবলই এক টানা ভাটা অভীষ্টাভিমুখে অনন্তমনা অনন্তপন্থা হইয়া চলিয়াছে। তার পর বর্ষায় আর একটা কথা আছে—শব্দ। বর্ষায় শব্দ মধুব কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু হৃদয় মন বিচোর করিয়া তোলে। যিনি কখন নিশীথ সময়ে নদী বকে থাকিয়া নদীর তীর্থ বেণের ভিতর হইতে একটা অতি মহান গম্ভীর শব্দ অনুভব করিয়াছেন, যিনি কখন বস্ত্রের কড় কড়ানি, বুড়ির তড় তড়ানি বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দের একত্র সংস্থানে হৃদয়ে আনন্দ লাভ করিয়াছেন, যিনি কখন শব্দ ক্ষেত্রে খাল বিল হইতে অনন্ত কীট পতঙ্গের অজ্ঞান একতান লম্বয়ুক্ত ববেব সহিত সহস্র জলচর বিহঙ্গের কলববে বিমোচিত ঝটিকাছেন,

তিনিই বৃষ্টিতে পাবিবেন, বর্ষায় ধবলীও যে শরৎ, তাহা মূর্খ না হইলেও মহান্
বাটে কিনা, হৃদয় মন বিভোর করিতে পারে কি না। সংক্ষেপে বলিতে
হইলে বসন্তে ধবলী মাধুর্য্যময়ী, বর্ষায় গাভীর্ঘ্যময়ী ।

যুবতীও ছই মৃতি, নবমুকুলিতা বাসন্তী তরুণী মৃতি, ও ক্ষীণ-ভব-পয়োধরা
গণেশ জননী মৃতি । প্রথম মোহিনী মৃতিটীতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল লাভণ্যময়
প্রদুটিত । অঙ্গের আভার দিগ্‌মণ্ডল বিভাসিত, নবনের জ্যোতিতে চাবিদিক
চমকিত, কণ্ঠের স্রমিষ্ট স্বর বেগু বীণা বিনিমিত । সেই পৃষ্ঠ পবিপূবিত
ঘোব কৃষ্ণ কেশবাশি, সেই নয়ন—চকলতা পবিপূর্বা, সেই ললাট—চিহ্নাচিহ্ন
বিবহিত । সেই ক্ষীণ অথচ উচ্চস্বব, সেই অঙ্গ জ্যোতি, সেই অশন বসনে
ভাবভঞ্জে, কথাবার্ত্তার বিলাসেব আবেশ, আহুবক্তিব লক্ষণ । আবার
বসন্তের আকাশের মত সময়ে সময়ে অভিমান জনিত ঘোব—সুবিমল বদন
সুধাকবকে ঘোর ঘনাক্ষর করে । শীত ঋতুব উপশমে যখন হিমের চিহ্নমাত্র
আর না থাকে, তখন সুনীল, সুবিস্তৃত নভোমণ্ডলে সেই পৃষ্ঠ পবিপূবিত,
সুন্দর বিলম্বিত কেশবাজি প্রত্যক্ষ করি । গ্রহ নক্ষত্রের জ্যোতি হিমের অব-
সানে পবিফুটিত, চন্দ্র সর্বা কিবণ শীতবাতায়ে আবাব তেজোময়, চাবিদিকেই
প্রকৃতি নিজের কোমল আভা দেখাইয়া—তরুণীর অঙ্গ জ্যোতি মনে পডান ।
এই জ্যোতি, এই তেজ,—নিদাঘের জগৎ দাহনকারী প্রথর সূর্য্যকিবণ নহে,
ইহাতে বোমলতা মৃতিদত্তী, এই জ্যোতিতে চক্ষু জুড়ায়, হৃদয়ে শান্তি হয় ।
আবার বসন্তে চাবিদিকে নূতন নূতন পত্র পুষ্প বিকলিত, সঙ্গে দিগ্‌মণ্ডল
আমোদিত । এই প্রদুটিত পুষ্প বাজি মাঘে তরুণীর স্রমিষ্ট হাসি দেখিতে
পাই । কোকিল পাণিপা প্রভৃতি যখন জীলের উপর পবদায় পবদায়
আন্তর্য্যজ চড়ায়, তখন তাহাদেব সেই হৃদয় বস্তন মধুর স্বব শুনিয়া আর
একটি হৃদয় আনন্দ কারিণী স্রমিষ্ট ধ্বনি মনে পড়ে । বসন্তাগমে যখন
সময়ে সময়ে মেঘগণ অসিয়া সেই সুন্দর জ্যোতির্ময় দৃশ্য সমাক্ষর কবে,
তখন মনে হয় সেই হৃদয় আনন্দকারী মনোহর বদন রোষের আবেশে
সমাক্ষর । বসন্তেও যাহা দেখিতে পাই তরুণী মৃতিতেও তাহাই দেখি,—
সেই বন বন দীর্ঘশ্বাস, মধ্যে মধ্যে ছই চারি খোঁটা বৃষ্টিপাত, আবাব কখন
কখন বা করকাণাত ।

তার পর আর একটি মৃতি । এই মৃতিটিকে আশ্বা গণেশ জননী মৃতি
বলিলাম । এখনও যোবন আছে, কিন্তু যোবনের আব সেই বিলাস বিভ্রম

নাই। অন্ধ জ্যোতি আছে, কিন্তু এখন সে জ্যোতি প্রশান্ত ও শীতল। নয়নের সে চপলতা নাই বরং তৎপরিবর্তে গাঙ্গীর্যের লক্ষণ অমুভূত হয়। এখন সেই স্তম্ভের ললাটে একটু একটু চিন্তার চিহ্নের পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও কথাবার্তা ভাব ভঙ্গিতে আত্মবক্তির বিলক্ষণ আবেশ আছে; কিন্তু প্রথম যৌবনের সেই আত্মবক্তি, আর এই বর্তমানাবস্থার আত্মবক্তির ভিতর একটু বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। প্রথম বয়সের আত্মবক্তি স্বার্থহেবিণী, স্বার্থ-ময়ী, আর পরিণত যৌবনার আত্মবক্তিতে স্বার্থের লেশ মাত্র নাই। ইহা ছাড়া এই মূর্তিতে আর একটি বিন্দু আছে—সেটি তেজ। “তেজ” বলিতে সচরাচর বাহা বুঝি, এ তেজ সে তেজ নহে,—এ তেজ অন্ধের জ্যোতি নহে, রূপের মোহিনীশক্তি নহে, অপাঙ্গ দৃষ্টির অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নহে। এ তেজ অস্তরূপ, কি তাহা পরে বলিব। তাহার পর সেই পূর্বের ক্ষীণ অথচ উচ্চস্বৰ যাহাতে এত মোহিনীশক্তি ছিল, তাহা এক্ষণে গম্ভীর অথচ মধুর স্বরে পরিণত, এখন আর সে কোকিল পাণিয়ার স্বর্যাব নাই, এখন কণ্ঠের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, আওয়াজ ভাবাট হইয়াছে—শুনিতে বেশ গম্ভীর, অথচ পূর্ণোপেক্ষা স্তম্ভব। প্রকৃতি প্রতি বর্ষায় আমাকে এই শৈবোক্ত অতীব মোহিনী মূর্তিটা দেখাইয়া যান। নব যৌবনা ছাড়িয়া পরিণত যৌবনার রূপের মাধুর্য, অনেকের ভাল লাগিবে না। কিন্তু আমি এই শৈবোক্ত মূর্তিটাতে, এই গণেশ জননী মূর্তিতে যতদূর মোহিত হই, নব যৌবনা তরুণী মূর্তিতে আমাকে এতদূর বিমোহিত করতে পারে না। সেইজন্তই বর্ষায় আমার মন বেশী আকৃষ্ট। বসন্তের কথা চারিদিকে শুনি বটে, বসন্তের শোভা সম্পদ চারিদিকে দেখি বটে, বসন্ত বর্ষা সকল কবির রচনায় পড়ি বটে, কিন্তু বসন্তে কেমন একটা ফাকা ফাকা লাগে, বর্ষায় বেন সৌন্দর্য্য পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়—সে ফাকা ফাকা ভাব থাকে না—বসন্তই গম্ভীর—স্তম্ভ—মধুর।

বসন্তের বায়ু মুহমন্স মধুর মলমল মারুত বটে, কিন্তু তাহা হ্রাস বুদ্ধি আছে, তাহাতে শূণ্য বায়ু আছে, তাহাতে কালবৈশাখা আছে, স্বর্য্যবাস আছে। বসন্তের বায়ুর মত তরুণী বালবাসা টলমল করে, কখন কমে, কখন বাড়ি, কখন সে ভালবাসায় কালবৈশাখী আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু বর্ষায় একটানা গম্ভীর মত পরিণত যৌবনার প্রেম চিরদিন একই মুখে, একই গতিতে প্রবল বেগে চলিয়াছে। চিরদিন ভগ্নপূর্ব, তাহাতে হ্রাস বুদ্ধি নাই,

কোয়ার ভাঁটা নাই। মাঝে মাঝে তুফান আছে বটে, কিন্তু তখনও তবঙ্গ সমুদ্রাভিমুখী।

তার পর বসন্তের নৈসর্গিক শোভার কথা—চারিদিকেই নব বিকশিত কুসুমকিশলয়—শোভা ধবে না। এখানে সাদা সাদা ছোট ছোট ফুলগুলি ফুটিয়া বাবুতে গন্ধসঞ্চার কবিতেছে, ওখানে নবমুগ্ধবিত বনপাদপ ধূপছায়ায় নামাবলি গায়ে মহাঘোষীর মত গঙ্গাভীরবে দণ্ডায়মান, চারিদিকেই মধুর শব্দ, মনোহর শোভা। কোথাও সাদা সাদা ফুল, কোথাও লাল লাল পাতা। ইহাতে রমণীর সেই প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়ায়, সেই বেশভূষার চটক আর সেই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণ পবিতর্জনশীল সৌন্দর্য্য। তাব পর বর্ষার দিকে দেখুন। ফুল পাতার সে চটক নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্যেবও কিছুমাত্র ঞ্টি নাই। তরুণী বাসন্তী গোলাপী প্রভৃতি নানা রঙ্গে ছোপান কাপড় পবিয়া মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ কবেন, কিন্তু প্রায়ট রূপিনী ধবণীকে আগা গোড়া সমান ভাবে ভরপুর সবুজে স্তম্ভজিত দেখিলে আরও বিমোহিত হইতে হয়। বসন্তে ছোট ছোট মল্লিকা যুঁয়েব গায় ঈষৎ হান্তেব চিহ্ন মাত্র যে অঙ্গে বিবাক্ত কবিত, বর্ষার সে বদন প্রকৃত কমল কুমুদেব বিকশিত হায়ে পবিণত। এখন আর সে চাপিয়া চাপিয়া ভয়ে ভয়ে বা ভাব বিভাবে মুচকি হাসি নাই, এখন বর্ষাব সরল প্রাণে মনের আনন্দ প্রাণ ভবিয়া প্রকাশ কবিত সমর্থ।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, যখন প্রারম্ভে তরুণীৰ আত্মবক্তি স্বার্থাশ্বেষী, স্বার্থময়ী। তিনি আপনাব স্তম্ভেব জগ্ন যাহাকে স্তম্ভী কবিত হয করেন, কিন্তু বয়স একটু পবিণত হইলে সে স্বার্থ ভাবটুকু কাটিয়া যায়, তখন আত্মবক্তি এক পাত্রে আবদ্ধ থাকে না, ছড়াইয়া পড়ে, ক্রমশ পবিতাববর্গ, দাসদাসী, প্রতিবেশী, স্বদেশীতে, তাবপর পিতৃলোক, দেবলোকে সে আত্মবক্তি ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। আত্মবক্তি, প্রেম, ভক্তিব ভাসবাসাব এইরূপ বিকাশ সর্বত্রই হইয়া থাকে।

আর একটা কথা আছে। তরুণী সাবা দিন আপনাব অঙ্গ সৌষ্ঠব সাধনে তৎপর। প্রাতঃকাল হইতে শয়ন কাল পর্য্যন্ত কিসে তাঁহাব শাবীরিক শোভা বৃদ্ধি পায়, তিনি সেই চেষ্টাতেই নিমগ্ন। কখন সাবান বা সব বেশম, কখন বা ফুলেল কি গোলাপী তেল মাখিতোছেন, কখন পমেটম লাগেব গুণ ব্যবহাব করিতোছেন, কখন মাথা বাঁধিতোছেন, টিপ কাটাতোছেন, অঙ্গের ধূলটি

ঝাড়িতেছেন, গাছমার্জ্জনী সঙ্গে সঙ্গে আছে । বস্ত্রাঞ্চল কোথায় বাধিলে, কিরূপ বেশ ভূষা কবিলে, কতদূর শোভা হয়, সাবা দিন সেই ভাবনাতেই যান্ত । এই এক ভাব । তাব পৰ কিছুদিন গত হইলে, যৌবনের একটু পরি-
ণতি হইলে, দুই একটা সন্তান জন্মিলে, আব একভাব । এখন আব সে অঙ্গ সৌষ্ঠবে যত্ন নাই, কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্য কমে না । এখন যেন অসাবধানতা-
তেই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কবে । মাথাব চুল কথু কথু হইয়া উড়িতেছে, মাথা বাধিবার
বন্ধ নাই, কেহ জোব বা যত্ন কবিতা বাধিয়া দিল, তা হইলে হইল, নচেৎ চুল আর
বাধা হয় না । স্নান না কবিলে নয়, তাই স্নান কবা । দেহে যত্ন নাই, পোষাকের
চটক নাই, কিছুতেই যেন আব মনোযোগ নাই । এখন নিজেব ভাবনা
আর আপনাকে ভাবিতে হয় না, এখন তাহাব ভাবনা অনেক ভাবেন,
বাড়ীব বৃদ্ধতম কৰ্ত্তা মহাশয় হইতে পরিচাৰিকা দাসী পৰ্য্যন্ত সকলেই তাহার
ভাবনা ভাবেন, তিনি এখন সংসাব পবিত্র কাৰিণী, সাক্ষাৎ সাবিত্রী, বৰ্ষার
ধরিদ্রী : বৰ্ষায় বৃষ্টি হইয়াছে বা অনাবৃষ্টি ঘটিবাছে, ভূস্বামী ও কৃষক সকলেই
ক্ষেত্রেব ভাবনা ভাবিতেছেন, জল অধিক দাঁড়াইলে শস্ত নষ্ট হইবে, আইল
কাটিয়া জল বাহিব করিয়া দিবাৰ ব্যবস্থা হইতেছে । কোথাও অনাবৃষ্টি নিবন্ধন
ফসল শুকাইয়া যাইবাব ভয়ে জল সেচনেব বন্দোবস্ত হইতেছে । সকলেই
ক্ষেত্রেব ভাবনা ভাবিতেছেন, কোথায় ঘাস হইয়াছে নিচাইতে হইবে, কোথায়
কিরূপ কবিতা ক্ষেত্রেব উন্নতি হইবে,—সকলেই সেই ভাবনাব ব্যস্ত । ওদিকে
কৰ্ত্তা মহাশয় প্রাতে উঠিয়া গৃহিণীকে বলিতেছেন, “কাল রাত্ৰিতে খোকা দুই
বার কাশিয়াছিল, বোঁদাকে জল বাঁটিতে দিও না, বাসী বা পান্তাতাত যেন
না খান,” ওদিকে পরিচাৰিকা আসিয়া বলিতেছে “বৌদিদি খোকাব আবার
অসুখ কবিলে, তুমি কাপড় ছাড়িয়া দেও, কাচিয়া দি ।” যাহাতে তাহাব সময়ে
স্নান আহাৰ হয়, শবীৰ সুস্থ থাকে, সকলেই সেই ভাবনায় ব্যস্ত । সকলেই
এই গণেশ জননীৰ সেবায় নিবত । তাহাকে আব আপনাব ভাবনা নিজে
ভাবিতে হইবে কেন ? তাহাবও এখন নিজেব সুখাশ্বেষণ নাই । তিনি
পূৰ্বে যখন তরুণী রমণী ছিলেন, তখন মানবী, এখন গণেশ জননী, সংসার
পবিত্রকাৰিণী দেবী হইয়াছেন । বসন্তেব ফুলে মুকুলে কিসলয়ে দেবার্চনা
হয়, কিন্তু বৰ্ষার “শস্ত শ্রামলা” ধবনী স্বয়ং লক্ষ্মীকপিণী, পবমাবাধ্যা দেবতা ।
বসন্ত ও বৰ্ষায়, নব মুকুলিতা বাসন্তী তরুণীতে ও ক্ষীৰ-ভব-পয়োধৰা গণেশ
জননীতে এই ভেদ । একজন পবেব পূজাব উপাদান, অপব স্বয়ং অৰ্চনীয়া ।

তার পর শেষ কথা, পূর্বে যে কথা বলিতে ছিলাম—তেজ। তরুণীও যদি কিছু তেজ থাকে, সে কেবল এক জনের উপব; গণেশ জননীও তেজ সকলের উপব সমান। বর্ষাও ধবিত্রী দর্পভাবে বলিতে পাবেন—“এখন আমি বসন্তের ছায় বাহ্যিক শোভাশালিনী নহি, কেবল শোভা দেখাই না, গন্ধ ছড়াই না। এখন আমি জীব লোকের জীবনরূপিনী। এই বক্ষে অসংখ্য শস্ত ক্ষেত্র ধারণ করিতেছি, ইহা সমস্ত জীব লোকের জীবনের উপাদান। আমি আছি বলিয়াই তোমাদের সকলের উপাধ হইতেছে।” গণেশ জননী বক্ষে শিশু পুত্র ধারণ করিয়া তেমনি দর্পভাবে বলিতে পাবেন, “আমি এখন বড় কুচ্ছ তাক্ষিল্যের সামগ্রী নহি, এই দেখ আমার সোণাব টাঁদ সাত বাজার ঘন, তোমাদের ঐহিক পারিত্রিক মঙ্গলের কারণ। এই বিগুহ তেজশালিনী দর্পময়ী, অথচ বিনবাবনতমুখী দেবী, শোভাও বল, আভাও বল, সকলদিকেই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত, গাভীরো গোববিণী।

পাঠক,—তোমার বয়স কত? তুমি বসন্তের মাধুর্য্যই বুঝিয়াছে, বর্ষাও গাভীরো এখনও মজ নাই কি?

সখী সংবাদ ।

শুনিতাম যথা তথা—

অতি সে পবিত্র কথা—

বস ধামে অতি পুৰাতন,

পিবীতি পিযুষে ভবা,

অতীব সে মনোহরা,

পুৰাতনে নিহুই নূতন।

কে ক’বে হে পুনরাব

শুনাইবে সে গাথায়,

স্নান-প্রেম লালসা লাক্ষিত;

সখা পিন্ধু প্রমথিয়া

পিন্ধু মাত্র উঠাইয়া,

কে বাঁচাবে পবাণ মুচ্ছিত?

গিয়া সেই দ্বাবকাষ,
ভেটিখা সে শ্রামবাস,
কে কবে হে সে সখী সখাদে .
পাষণ গলিত হবে,
ময়ূরী নাচিবে ববে,
শক্তি পাবে মহাশক্তি পাবে ।

“ হে যোণী উদ্যাগী বব ।
দুর্যোগে যক্ষণা হব,
অহুদিন করুণা ভিখারী ” ।
প্রেমগুরা গুণবব ।
হে মশামহিম বব,
শক্তিবব নিকুঞ্জবিহারী ।

ধন্যক্ষরে কুরুক্ষেত্র,
ভূমি হে বিশ্বব নেত্র,
অনিষ্টাম ধন্য অবতাব ।
হে রাখাল হে ভূপাল,
অনাদি অনন্তকাল,
হে নবীন প্রবীণ বাবাব ।

হে শ্রীমান, হে ধীমান,
মহিমায় হে মহান,
হে মহাপুরুষ সমতার ।
তা কৃষ্ণ ককণাসিদ্ধ,
দীনবাক্য এক বিম্ব
দ্রোহ নাথ দ্রুতি বারিকাষা ।”

বাণি সখী বোড কবে,
যেন অভিমানতব,
সমীপে ভবে যেন নবাক্ষর,

মুহু কাঁপি ধর থব
সে বিনোদ কলেবর,
বলে “এবে কি হবে হে হবি দয়ায় ।

বে দেখিছ দশা তার,
হয়েছে পঞ্জব সার,
শুকাইয়া স্বর্গলতা কালিমা বরণ,
বহু দিন বহি যায়,
ভেট না হইল তায়,
ভুলে আছ ভুলিয়াছ মদনমোহন ।

তাকাইয়া আশাপথে
জীয়ে আছে কোন মতে,
হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ ! বলি কবিত্তে বোদন ,
তোমাব কি মনে নাই,
সে প্রকৃতি সেই ঠাই,--
অনুদিন অন্তরে বক্ষ নাবাযণ ।

গোঁয়াব গোপের দলে
নিবস্তব ফেলি ছলে,
কত প্রলোভনে সতী ভুলাইতে চাষ,
মবম মবমে মবি,
তুয়া মুখ চাহি হরি
কঙাগ হ প্রাণ মাত্র আছে বাধিকায় ।

আছে বটে অবিকল,
তুঁ হারি যমুনা জল,
সে কেলি কদম্বতল অতল প্রেমের,
আছে ধীর সমীপণ,
মধুবন নিধুবন
কিস্ত নাই কান্তি সেই কবিত্ত হেমের ।

বহু দিন বহি যায়,
ভেট না হইল তার,

বয়নাব কিনাবার শুল্ল বলাবন !

মকুভুমি লীলাভূমি,

হে শ্রাম ভল না তুমি ।

দয়া কবি বাধিকার দাও দরশন ।

হবে কি সে দিন আর,

ঘুচাইবে অন্ধকাব,

তুঁহাৰি সে বলাবনে ছবস্ত হুঁদিন ?

অমিয়া বচন শুনি

পীরিতি পাইয়া পুনি,

লভিবে তুঁহারি রাধা জীবন নবীন ।

বলাবন বসগুহ ,

জ্ঞান মনে ক্ষীণ কল্প,

বলাবনবাসী সবে বিচ্ছেদে বিধুব ,

সবে স্ততি গীতি গায়,

কবে কৃষ্ণ করুণায়,

পরাইবে শ্রীরাধায় কম কহিছুর ।

তবে বাজাজ্জেশ্বরী

ভুলোক আদোক করি,

বিরাজিবে বিনোদিনী নিকুঞ্জ বিহারে ,

ঘুচে যাবে যমভয়,

সখীরা গাহিবে জ্বব,

জয়দেব বিদ্যাপতি মধুর ঝঙ্কারে ।

সে সঞ্জীতে দেবতায়

শুনিবে হে শ্রামরায় '

রাক্ষাপাশ কণু ঝু নুপরের রোগ ,

ময়ূরী নাতিবে রবে,

বয়না উজান ববে,

অন্তবে বাহিরে হবে হরি হরি বোস ।

শ্রেয়াংসি বজ্রবিদ্বানি ।

দামিনী । সংস্কৃত পড়িবে বলিয়াছিলে, কৈ পড়িতেছ কি ?

যামিনী । না ভাই পড়া হইল না । বর্ণ ও বানান শিখিয়াছিলাম ।

দামিনী । তবে বই পড়িলে না কেন ?

যামিনী । একখানি প্রথম ভাগ ঋতুপাঠ বই কিনিয়া আনিয়াছিলে, তা কিস্তি পড়া হইল না ।

দামিনী । কেন ?

যামিনী । পড়িলাম—“কশ্মিংশিং বনে”—তাব পশ দেখি—বড় ঠাকুরের কথা—আব কেমন কবে পড়ি বল ?

বিনয় বচন ।

বৃন্দাবন বাবু বড়ই বিষম উদ্ধত স্বভাবের লোক । নবীন তাঁহার মোমা-হেব, একদিন কথায় কথায় বলিল “বৃন্দাবন বাবু কাজে বড দক্ষ ও যোগ্য ।” বিনয় কথটা শুনিয়া একটু মুচকি হাসিল । নবীন বলিল, “হাসিলে যে ?” বিনয় বলিল, “বৃন্দাবন বাবু কাযে বড দক্ষ ও যোগ্য, তা বলতে পারি না—তবে কাজে দক্ষযজ্ঞ করেন বটে ।”

কুঞ্জ-বিহাবী ।

মাষ্টার কুঞ্জলাল বাবু পঞ্চাশ বছর বয়সে ছগলি কলেজ হলে এল, এ দিতে-ছেন । না দিলে, বি এ দিতে দেয় না, বি এ না দিলে, পদোন্নতি হয় না । একটাব অবকাশ সময়ে কুঞ্জ বাবু মানাব ঘবে তামাক খাইতে গিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের পাডাব আর একজন পবীকারী বিহাবী বাবুও উপস্থিত । কুঞ্জ বাবুকে দেখিয়া বিহারী কুণ্ঠিত হইলেন । কুঞ্জ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন “হে বিহাবী আমাকে আর সমীহ কেন ভাই ? এখন আমরাত এক স্থ্যোই ধান শুকাই ।” বিহারী মন্তক নত করিয়া দালগ “আজ্ঞে ই। তা এক স্থ্যো ধান শুকাই বটে, তবে আমরা সকালে, আপনি বৈকালে ।”

কৃষ্ণ-ভক্তি ।

বোগী । ডাক্তার কৃষ্ণ বাবু এখনও আসিতেছেন না ?

বন্ধু । সেদিন কামাবপাডাব যে বোগীটাকে তত ডাকডাকি করিয়াও জ্ঞাব পান নাই, আজি তাহাকেই ঔষধ খাওয়াইতে বিব্রত হইয়াছেন ।

বোগী । তবে এবার সে কৃষ্ণকে জ্ঞাব দিবে ।

আসাম—শিলং ।

শিলং আসামের বাজধানী । স্বয়ং চীফ কমিশনর বাহাদুর এখানে সমলে বাস কৰিয়া থাকেন । ইহা অতি দূৰ খাসিয়া পৰ্ব্বতের উপর অবস্থিত । কলিকাতা হইতে নানা যানে, নানা উপকৰণে, এখানে আসিতে হয় । পূৰ্বে এখানে পৌছিতে তিন সপ্তাহ, সময়ে সময়ে বা ততোধিক কাল লাগিত, আজ কাল ইবাজ-বাজের প্রসাদে, চারি দিনেই আসা যায়, তবে কিছুদধিক ব্যয়-সাধ্য,—বায়ের লাঘব কবিত্তে গেলে ৮ দিন লাগে । কলিকাতা হইতে ধুবড়ি প্যাস্ত পূৰ্ববঙ্গ বেলপথের কর্তৃপক্ষগণের বন্দোবস্তে আসা যায়, ইহাব মধ্যে নানা স্থানে গাড়ি ও ঈমাব বদলাইতে হয় । ধুবড়ি হইতে গোহাটী কলিকাতাহু ম্যাকনীল কোম্পানীৰ ঈমাবে আসিতে হয়, এই ঈমাব ডিক্রগড পর্যন্ত গিয়া থাকে । গোহাটীতে হিন্দুব পবিত্র তীর্থ কামাখ্যাদেবীৰ মন্দির অধিষ্ঠিত—সহব হইতে ইহার ব্যবধান প্রায় তিন মাইল । আসাম-প্রবাসী বঙ্গবাসীমাত্রেবই এই পবিত্র তীর্থ দৰ্শন কৰা উচিত । গোহাটী ব্রহ্মপুত্র নদের উপকূলে অবস্থিত ; কলিকাতা হইতে আগমন কালে আসামের প্রথম সীমা যাত্রাপূৰ্ব হইতেই এই কল-কল-নাৰ্দী অনন্তকাল প্রবহমান মহানদের অবিচলিত তবঙ্গ-শোভা দেখিতে পাওয়া যায় । পৰশ্ববামের অভিসম্পাতে ইহাব জল হিন্দুব দৃষ্টিতে পবিত্র নহে, কেবল বৎসরের মধ্যে এক দিন—বাসন্তী মহাষষ্ঠীৰ দিন—ইহাতে স্নান প্রসিদ্ধ । গোহাটী হইতে শিলং ১৩ মাইল, এইটুকুই পার্শ্ব পথ । এ পথে পৰ্ব্বতবিহাবী অশ্বশন টোকায আসাই সুবিধা, এতদ্ভাবা ৮।১০ ঘণ্টাব মধ্যে এই সুদীৰ্ঘ পথ আসা যায় । ইহাই সৰ্ব্বাপেক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ—এক জন মাত্র আবোহীৰ ভাতা ৩০ টাকা, মালপত্রেব জন্ত পৃথক্ মাণ্ডল দিতে হয় । প্লাটস্ ষ্টোর্স্ এণ্ড এজেন্সী কোম্পানী লিমিটেড্—নামক কলিকাতাহু ব্যবসায়ী সম্পদায় পূৰ্বে ইহাব ঠিকাদাব ছিলেন ; সম্প্রতি (জনাই নিবাসী) অত্রতা প্রধান ব্যবসায়ী গোলাম হাফিদাব ও তাঁহার পুত্রাণ ইহাব অধ্যক্ষ হইয়াছেন । সাহেবদিগেব সম্বন্ধ কিছু স্বেচ্ছাচাৰিতাব প্রাবল্য ছিল, অতুনা এই বঙ্গবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতায় এই যাত্রাবাতেব পথ সুবিধাজনক হইয়াছে, ইহাবা স্বয়ং কাৰ্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সৰ্ব্বদা তত্ত্বাবধাবণ কৰিয়া থাকেন এবং আবোহীবর্গেব সুখসচ্ছন্দতা বিধানে সাধ্যমত যত্নেব ক্রটি কবেন না । অধিকন্তু

৩০. ঢাকা ভাড়া দেওয়া অনেকৰ অবস্থাতীত বোধে ইংহাল অপেক্ষাকৃত অল্প আৰু বিশিষ্ট লোকদিগেৰে জুখ ১৫৭ টাকা ভাড়া স্থিৰ কৰিষা অনেকৰ কুতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে। এ পথে আসামৰ অজ্ঞতম উপাধ গো-বান, পৰি-বাবাদি লইয়া আসামৰ পক্ষে ইহা ভিন্ন গতাস্থ্য নাই, এতদ্দ্বাৰা আসিতে অনান চাৰি দিন লাগে। বলা বাহুল্য, ইহা অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধা—৪।৫ টাকা ব্যয়েই আলা যায়।

আসামেৰ মধ্য শিলং সৰ্ব্বাপেক্ষা সুন্দৰ স্থান। পৰ্ব্বতৰ উপবিভাগে অবস্থিত বলিয়া ইহাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্য সহজেই চিত্ৰবিনোদনকাৰী, চতুৰ্দ্ধিকেই অত্ৰভেদী শৈলমালা সদায়ে মন্তকোত্তোলন কৰিয়া বিবাজমান—মধ্যে মধ্যে ময়ূৰেৰ কেঁকা, বনজ বিহংগেৰ কাৰলি, নিৰ্ববেৰ কুল-কুল-ধ্বনি—বড়ই শ্ৰুতিসুখাবহ। এখানকাৰ জগবাপুও আসামেৰ অজ্ঞাত স্থান অপেক্ষা স্বাস্থ্যকৰ ও প্ৰীতিকৰ, অত্ৰ সকল স্থানেই নানাকৰণ পীড়া দেখা যায়—এখানকাৰ লোক একৰূপ বোণশূভ্ৰ বস্ত্ৰেও অত্যাৰ্জ্জি হয় না। এখান পৰ্ব্বত-সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক শৈত্য ১৮ দিন বিবাজমান, শীতৰ সময় নবাগত লোকেৰ পক্ষে কষ্টকৰ বোধ হওঁতে পাবে, কিন্তু সিমলা বা দাৰ্জিলিংৰ মত শীতৰ মাত্ৰা অথৰ নহে। বৰ্ষাৰ ভাৰও এখানে অধিক, চিনাপুঞ্জি ভাৰতৰ মধ্য সৰ্ব্বাপেক্ষা বৰ্ষাপ্ৰধান স্থান। ইহাৰ নিকটে অৰ্ধস্থিত বলিয়াই—এখান হইতে চিনাপুঞ্জি ৩৩ মাইল—বোধ হয়, এখানে এত বৰ্ষাৰ প্ৰকোপ, বৰ্ষাৰ সম-য়েও অত্ৰতা অধিবাসীৰগেৰে বিবিদম্বিক ব্ৰেশ হয়, তবে এক সুবিধা, এখানে কৰ্দমেৰ যন্ত্ৰণা নাই, বৃষ্টিপাতা বন্ধ হওঁবাৰ অব্যাহত পবেই পথ পূৰ্ববৎ শুষ্ক, বৰং অধিকতৰ সংস্কৃত ও পৰিমাঞ্জিত। বৈশাখে এখানে বসন্ত, নিম্নবঙ্গে মাঘেৰ শেষে ও ফাল্গুনেৰ প্ৰথমে বেকৰ নাতি শীত, নাতি উষ্ণ ভাব, যেমন একটু প্ৰাণ-ভুলানি, মন-মজানি ফুৰ যুবে বায়ু, প্ৰকৃতিৰ যেমন একটু মনোহন দৃশ্য, এখানে বৈশাখ সেইৰূপ। শিলংএৰ অতিদূৰে দুই মাইলেৰ মধ্য একটা জলপ্ৰপাত আছে, ইহা বিডন ফল্ নামে প্ৰসিদ্ধ। অত্যাচ্চ পৰ্ব্বতৰ উপবিভাগ হইতে ভূৰাৰ-ধবল বাপুঞ্জি অবিৰাম গতিতে নিৰ্ঝৰিত—প্ৰকৃতিৰ এই মনোজ্ঞ ভাব দৃশ্যকেৰে কড়ই চিত্তাকৰ্ষক, বড়ই নয়নানন্দবৰ্দ্ধক। শিলংএৰ সৰ্ব্বোচ্চ গিৰিশৃঙ্গও স্বভাবেৰ অজ্ঞতম মহৎ নিদৰ্শন, শুনা যায়, ইহাৰ উপবি-ভাগ হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰকে একটা সুদৃশ্যেৰে স্ৰায দেখা যায়।

এখানে হদানী সত্যতাব ও বিলাসিতাব উপকৰণ সমস্তই আছে।

লাটের বাজভবন (চীফ কমিসনরের বেসিডেন্সি) বিলাসী বিলাস-কানন ; ক্রীড়োন্মত্তের ক্রীড়োদ্যান, উপাসকের প্রার্থনা-স্থান—কিছুরই অভাব নাই । ইংবাজ-উপভোগ্য সকলই আছে ; ডাকঘর, তারঘর ত থাকিবেই, হোটেল, চিহ্ন-শালা, গিৰ্জা, গোরস্থান—বালক বালিকা বিদ্যালয়, মিসনস্কুল প্রভৃতি পাঠেব বন্দোবস্তও আছে । বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও এখানে এ সমস্ত বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় । অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে এখানে ইংবাজী পড়িবার বিড়িং ক্লাব, বাঙ্গালাৰ সাহিত্য সভা, বঙ্গ-বালিকা-বিদ্যালয়, উপাসকের ব্রহ্মমন্দির, আমোদপ্রিয়ের নাট্যশালা, প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহা নিবর্তিশয প্রশংসার কথা । সকলই আছে, কিন্তু একটা প্রধান জিনিস নাই—পরম্পর ঐক্য বা মনের প্রীতি এখানে সম্পূর্ণ বিবল, প্রবাসীন মধ্যে কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান, আইটু, আসাম ও ঢাকাঞ্চল নিবাসী লোকই অধিক, ইহাদিগের পরম্পরের মধ্যে একতাব সম্পূর্ণ অভাব, এমন কি, একস্থানীয় লোকের মধ্যেও অনেক স্থলে মনোমালিন্য লক্ষিত হয় । বাঙ্গালীৰ একলঙ্গে প্রায় সকলস্থান কলুষিত, একতাব অভাবে বঙ্গভূমি অন্ধকণ লাক্ষিত, বিধ্বস্ত ও বিদগ্ধিত হইতেছে—ইহা দেখিয়াও বঙ্গবাসী একতা শিথিলে চেষ্টা কবিলেন না, ইহা সামান্য পৰিতাপেব কাৰণ নহে । বাঙ্গালীৰ একলঙ্ক কতদিনে ঘুচিবে অন্ত্যায়ী ভগবানই জানেন । ঐক্য সভ্যতাহুমোদি ত নানারূপ সমাজেব প্রতিষ্ঠা না কবিশা, অত্ৰতা প্রবাসীগণ যদি পবিত্র একতাব স্কন্দন সমাজ প্রতিষ্ঠিত কবিতেন, তাহা হইলে সমাজেব গৌরব বক্ষণ হইত, দেশেব উন্নতিৰ পথ পবিস্কৃত হইত, অন্তবে শান্তিৰ সুবিয়ল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইত ।

এখানকার আদিম অধিবাসী খাসিয়া জাতি । পূর্বে ইহঁদা নিত্যন্ত অসভ্য ছিলেন । অধুনা খৃষ্ট-ধৰ্ম-প্রচাবক শ্রদ্ধাস্পদ বেববেও জাম্মাণ জোঙ্গ মহোদয়েব শিক্ষকতা ওণে এবং ইংবাজ ও বঙ্গবাসীৰ সংঘর্ষে সভ্যতাৰ স্কন্দন মূৰ্ত্তি ইহঁদিগেব মধ্যে ধীবে ধীবে প্রবেশ কবিতোছে । অতাল্প কালেব মধ্যে ইহঁদা যে পবিসাণে সভ্য ও শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে কালে ইহঁদা সভ্যতাৰ ও সংশ্লক্ষাৰ শীৰ্ষস্থানে উঠিবেন, এরূপ সহজেই আশা কবা যাইতে পারে । বলিতে কি, উপবোক্ত জোঙ্গ সাহেবই ইহঁদাৰ অগ্রতম নিযন্তা । তাঁহাৰ নিকট শিক্ষিত খাসিয়া মাত্ৰই কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ, এমন কি অনেকে তাঁহাকে পিতা ও গুরুৰ হাণ ভক্তি কবেন, বস্তত তিনি সেইরূপ ভক্তিব পাৰ ।

আদিম খাসিয়াবর্গের ধর্ম্মভূতি নিতান্ত কম ছিল; ইহঁরা উপদেবতাব উপাসক ছিলেন, এখনও অসভ্য ও অশিক্ষিত খাসিয়া সমাজে ঐকপ প্রেতোপাসকদিগের সংখ্যাই অধিক। অধুনা অনেকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন, কাহারও ব্রাহ্মধর্ম্মে কথঞ্চিৎ অলুবাগ, আবার কেহ বা হিন্দু-ধর্ম্মের দিকেও অগ্লে অগ্লে অগ্রসর। এই শেষোক্তের মধ্যে মাজুবব জীবন বায় মহাশয় প্রধান। প্রত্যুত ইনি খাসিয়া সমাজের অগ্রণী; বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন—সকল বিষয়েই ইনি শ্রেষ্ঠ, ইনি এখানকার অতিবিক্ত সহকারী কমিসনর। কোন খাসিয়াই এ পর্য্যন্ত একপ উচ্চ আসন লাভ কবিতো পাবেন নাই। বাল্মীকী ও হিন্দু সমাজের সত্চিত ইহঁাব সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

সম্প্রতি অত্রত্য অবৈতনিক নাট্যসমাজ কর্তৃক বাবু গিবিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত বাবণ-বধ নাটক অভিনীত হইয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক লোকের দ্বাবা সকল অংশের সূচাক অভিনয় হওয়া পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভাবনাসত্ত্বেও এ অভিনয় প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে একপ অভিনয় দ্বাবা প্রবাস-যন্ত্রণা দূরীভূত হয়, অতএব ইহাব অনুষ্ঠাতাগণ ধন্যবাদেব পার। অভিনয়ে কয়েকটা ক্রুটা লক্ষিত হইয়াছিল, ভবনা করি, নাট্য-সমাজের কর্তৃপক্ষগণ তদ্বিষয়ে দৃষ্টি বাধিবা ভবিষ্যৎ উন্নতিব চেষ্টা কবিবেন। বাবণ-জননী নিকষাব বেশ বড়ই অক্লটিকব ও অস্বাভাবিক বোধ হইয়াছিল—ঊহাব ধীবা, স্থিবা, স্থবিবা মূর্ত্তিব পবিবর্ত্তে, বাবণ হেন পুত্রেব সম্মুখে, ক্লষ্ককেশা যুবতীবেশা মূর্ত্তি দর্শনে আমবা বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। বঙ্গ-মঞ্চে শ্রীযামচন্দ্রেব চর্গোংসব বাবণ-বধ নাটকেব সর্কোংক্লষ্ট দৃশ্য, সঙ্গে সঙ্গে গন্ধর্ককণ্ঠ-নিঃসৃত টোড়ী-ভৈববী-মিশ্রিত হব-হৃদি-নিবাসিনী বণরঙ্গিনীর স্তোত্র-সংগীত বড়ই হৃদয়াকর্ষী;—অত্রত্য বঙ্গভূম আমবা এ ছুইএবই সম্পূর্ণ অসম্ভাব দেখিবাছিলাম। সীতাব অগ্নি-পরীক্ষাব দৃশ্যও তাদৃশ হৃদয়-ভেদী হয় নাই। ঐকতান বাদ্যে অনৈকতানতাই অধিক লক্ষিত হইয়াছিল। তাহাও এত ভয়ঙ্কর যে শ্রোতাব কর্ণে সহজে প্রবিষ্ট হয় নাই। বাস, সীতা ও বাবণেব অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল;—সুগ্রীব-মিতা “বহুবাস্তে লঘুক্ৰিয়া” দেখাইবাছিলেন, বোধ হয়, এ কার্যো তিনি এই প্রথম ব্রতী। অত্যাচ্ছ অংশ মন্দ হয় নাই।

অত্রত্য টাক কমিসনার ফিটজ্ পেট্রিক বাগ্গছব অতি সুযোগ্য এবং স্ননীতি পরায়ণ। ঊহাব সেক্রেটারী লায়েল বাগ্গছবও তাদৃশ দক্ষ এবং ততোধিক গণ্ডিত। এই মণি কাঞ্চন সংযোগে প্রত্যেক কাষো নিবপেক্ষ বিচার ও শাসন

প্রণালী দেখিয়া আমবা বড়ই সুখী । ইহাদিগেব দৃষ্টিতে ষ্বেত-কৃষ্ণেব পার্থক্য নাই । ঈশবেব নিকট প্রার্থনা, ইহাঁবা এখানে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া আসামে শান্তি ও সুমঙ্গল বিধান করুন ।

এখানে ব্রাহ্ম-সমাজেব উন্নতিব মাত্রা কিছু অধিক । অন্ধকার হইতে অনেকেই জ্যোতিতে পৌছিয়াছেন । ইহাদিগেব মধ্যে শ্রীহট্টবাসীর সংখ্যাই অধিক । ইচ্ছা হইলেই, ববিবাব সাক্ষ্যলোকে সমাজ-মন্দিরে ভ্রাতা-ভগিনী-গণেব যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন সার্থক কৰা যাইতে পাবে । মাননীয়া শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা সেন ভগিনীদলেব অগ্রণী, মোহাচ্ছন্ন অত্যাশ্র ভগিনীবর্গেব উন্নতিব বাসনা থাকিলে ঐ ভগিনীশ্রেষ্ঠাব নিকট শিক্ষা লাভ কৰাই বিবি । শীঘ্রই এখানে পণ্ডিত প্রবব শশধৰ তৰ্কচূড়ামণি মহাশয়েব আসিবাব কথা আছে । জানি না, তিনি এই ভ্রাতা-ভগিনীগণেব জ্যোতি ভেদ কৰিবা উদ্ভিতে পারিবেন কি না ।

রাজশক্তি ও সংবাদপত্র ।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র আধুনিক সাহিত্যেব একটি প্রধান অঙ্গ, কিন্তু কেবল সাহিত্য ভিন্ন সংবাদপত্রাদিৰ সহিত আবও অনেকগুলি গুরুতব বিষয়েব সংশ্রব আছে, তন্মধ্যে রাজশক্তিৰ সংশ্রব ও সংঘর্ষণ অতি গুরুতব ব্যাপাব । সংবাদপত্র দ্বাবা রাজা ও প্রজাব মনেব ভাব জানিতে পাৰা যায় । সংবাদপত্র দ্বাবা রাজা—প্রজাব অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য কৰিতে বাধ্য হন । প্রজা রাজাজ্ঞা সমস্ত জানিতে পাবে । এহুলে বলা উচিত, সংবাদপত্র জিনিসটা বিপাতী ও আধুনিক এবং পাশ্চাত্য সভ্যতাব একটা সৰ্ব্বপ্রধান অঙ্গ, এই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রাদি না থাকিলে ইউৰোপখণ্ড এত অল্পদিন মধ্যে এতদূৰ উন্নত হইতে পারিত কি না বলা যায় না । ইউৰোপ যখন একটু একটু সভ্যতাব দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল সেই সময় হইতে তথায় সংবাদপত্রেৰ প্রথম সৃষ্টি, তাহার পৰ সেই সভ্যতাব যত উন্নতি হইতে লাগিল তথায় সংবাদপত্রেৰও তত আদৰ বাড়িতে লাগিল । এহুলে অনেকে আপত্তি করিতে পাবেন, যদি সংবাদপত্র সভ্যতাব প্রধান অঙ্গ হয়, তাহা হইলে আমাদেব দেশ ত এক সময় সভ্যতাব চৰম সীমায় উঠিয়াছিল তবে এদেশে সংবাদপত্র ছিল

না কেন? ইহাব উত্তবে নানা কাণৰ দৰ্শাইতে পাশ যাব। প্রথমত এদেশেব সভ্যতা ও উন্নতিব সহিত ইউৰোপেব সভ্যতা ও উন্নতিব মূলে অনৈক্য বহিষাছে। অশুৰ্জ্জগতেব আলোচনাৰ আমাদেব উন্নতি হইয়াছিল, আব বহিৰ্জ্জগতেব আলোচনাৰ ইউৰোপ আজি সভ্যতাৰ দিকে উন্নত হই-তেছে। তাহার পৰ, ভাবত চিবকাল বাজভক্ত, চিবকাল বাজশক্তিৰ অধীন। ভারতেব রাজ্যব একটা স্বতন্ত্ৰ স্বার্থ ছিল না, প্রজাকে সন্তুষ্ট বাখা, প্রজাপালন হিন্দুবাজ্যৰ প্রধান স্বার্থ, বাজা পিতা, প্রজা পুত্র। পিতা চিবকাল পুত্ৰেব স্বার্থেব দিকে দৃষ্টি বাখিয়া কাজ কৰিতেছেন, পুত্ৰকে আপন স্বার্থ বক্ষাব জন্য স্বতন্ত্ৰ ভাবিতে হইতেছে না, যেখানে একপ পবিত্ৰ সম্পৰ্ক, পবিত্ৰ ভাব, সেখানে স্বতন্ত্ৰ একটা প্রজাশক্তি থাকিলও কাৰ্য্যে তাহা প্রয়োগ কৰিবাব কখন আব-শ্যক হব নাই, প্রজাকে আপন স্বার্থ বক্ষাব জন্ত, আপনাদিগেব স্বার্থেব প্রতি রাজ্যব দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবাব জন্ত, কখন কাগজ কলমে যুদ্ধ কৰিতে হয় নাই, রাজ্য নিজেই প্রজাব স্বার্থ ভাবিয়া কাজ কৰিতেন। একপ অবস্থায় আমাদেব দেশে সংবাদপত্ৰেব প্রচলন হইবে কিৰূপে? কিন্তু ইউৰোপেব সভ্যতা ও তথাকাব বাজনীতি স্বতন্ত্ৰ। প্রথমত ইউৰোপেব সভ্যতা বহি-ৰ্জ্জগৎকে লইয়া, স্বতন্ত্ৰাং তথায় ইহাব উন্নতিব জন্ত সংবাদপত্ৰেব বিশেষ প্রয়ো-জন। তাহার পৰ, তথাকাব বাজনীতিতে বাজ্যব স্বার্থ স্বতন্ত্ৰ, প্রজাব স্বার্থ স্বতন্ত্ৰ। তথায় বাজ্যব প্রজ্যাব আনুতিক মিল নাই। আবাব বাজ্য আপনাকে সৰ্কে সৰ্বা জানিয়া প্রজাশক্তি নষ্ট কৰিয়া প্রজাকে আপন বশে রাখিবাব জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা কৰিতেছেন। ওদিকে প্রজা রাজাকে প্রকৃতি-পুঞ্জেব প্রতিনিধি বা ভূতাব অধিক ভাবিতে চায় না, বাজশক্তিকে যতটা সত্ত্ব প্রজাশক্তিৰ অধীন কৰিতে চায়, এই কাৰণে তথায় সৰ্বদা বাজ্য প্রজ্যাব বিবাদ ঘটতেছে, সংবাদপত্ৰ যন্ত্ৰস্বৰূপ হইয়া প্রজাসাধাবণকে তাহাদেব স্বার্থ বুঝাইয়া দিতেছে, আবাব দৃতস্বৰূপ হইয়া প্রজাশক্তিৰ বল ও আকাজ্ঞা রাজ-শক্তিৰ নিকট নিৰ্ভৰে জানাইতেছে, আবশ্যক হটাল যুদ্ধেব ভেদীববও শুনা-ইতে ভীত হইতেছে না। এক কথায় প্রজাশক্তিৰ উন্নতিৰ জন্ত, প্রজাব স্বার্থ বক্ষাব নিমিত্ত ইউৰোপ ণ্ডে সংবাদপত্ৰেব প্রয়োজন। আমাদেব দেশেও যখন বাজ্য প্রজ্যাব আব সে পূৰ্ব্ৰভাব বজ্যাব নাই, যখন বাজ্যৰ একটা স্বতন্ত্ৰ স্বার্থ ও প্রজাব একটা স্বতন্ত্ৰ স্বার্থ দাড়াইয়াছে, তখন আমাদেব দেশেও আজ-কাল সংবাদপত্ৰেব বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ইউৰোপেব সংবাদপত্ৰেব সহিত

আমাদের দেশের সংবাদপত্রের অনেক উদ্দেশ্যগত পার্থক্য আছে। তথাকাব সংবাদপত্র প্রজাশক্তির যন্ত্রস্বরূপ হইয়া বাজশক্তির সহিত সর্বদা ঘর্ষে প্রযুক্ত হইতেছে বলিয়া বাজা এই শক্তি বিনষ্ট কবিরূপ জন্ম বিধিমতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, কঠোর আইন কবিরূপ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা থাকেন। আব আমবা একে বাজভক্ত, তাহাতে নিবীহ, সুতবাং আমাদের দেশে এখনও ততদূর কোন চেষ্টা হয় নাই। কেবল লড লিটন একবার এই প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র। ইউরোপগণ্ডের অগ্রাগ্রা দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডে বাজশক্তি অপেক্ষা প্রজাশক্তি অনেক গুণ অধিক, এজগ্ৰ তথাব অগ্রাগ্রা দেশ অপেক্ষা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও অধিক। এখানে বাজশক্তি প্রজাশক্তির অধীন বলিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচ কবিরূপ বড একটা সুরিধা হয় নাই। ইংলণ্ড ভিন্ন অপবাপব দেশে প্রজাশক্তি অপেক্ষা বাজশক্তির বল অধিক বলিয়া তথাব সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও এতাদৃশ নহে। ইংলণ্ডের অধীনে ভাবতের আব যত দুঃখ থাকুক না কেন, এই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে ইউরোপের অনেক বড বড সাম্রাজ্য অপেক্ষা আমাদের অনেকটা সুরিধা আছে। লর্ড লিটনের সমব বখন দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিবৃপ্ত হয়, তখন সেই স্বাধীনতা-বন্ধাবস্থাতেও আমাদের দেশীয় সংবাদপত্রের যতটুকু স্বাধীনতা ছিল, ইংলণ্ড ব্যতীত ইউরোপের আব কোন দেশে স্বাধীন অবস্থাতেও ততদূর স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের প্রজাশক্তির অধীনে আমবা তাকায় আমাদের এইটুকু লাভ, আবশ্যক হইলে আমবা বাজাব দোব বাজাব চক্ষে আঙ্গুল দিবা দেখাইতে পারি, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি।

অনেকদিন হইল, প্রভাকব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই নবজীবনে দেশীয় সংবাদপত্রের এক ইতিহাস প্রদান কবিরূপ-ছিলেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছিলেন, এদেশে অল্পদিন মধ্যে সংবাদপত্রের অবস্থা কতদূর উন্নত হইয়াছে। আব আজ এই প্রবন্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতাব আদর্শভূমি, পাশ্চাত্য সভ্যদেশের অগ্রাগ্রা কবাসিভূমিতে বাজতন্ত্রকালে তথাকাব সংবাদপত্রের কিরূপ অবস্থা ছিল, বাজশক্তি প্রজাশক্তিকে দমন কবিরূপ নিমিত্ত কিরূপ কঠোর ব্যবস্থা কবিতেন ও সংবাদপত্রের চালকদিগকে কিরূপ কঠোর নিষমেব অধীন হইয়া কাজ কবিতে হইত, তাহাই দেখান যাইতেছে। বাজশক্তির অধীনে অবস্থানকালে প্রজাশক্তির মুখপাত্রস্বরূপ কবাসি সংবাদপত্র সকলকে কঠিন বাজনিষমেব অধীন হইয়া চলিতে হইত, কিন্তু কবাসীজাতি

যেকপ এককালে সকল কার্যেই বাহবা লইয়াছিল, বাজশক্তির অধীন এই শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থাতেও তাহাদের সংবাদপত্রসমূহ সেইকপ আপন বিক্রমে কর্তব্য পালন করিয়া, সম্পাদকের ও সংবাদপত্রের গোবব বক্ষা করিয়াছিল। আমবা নিম্নে তাহাব একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

১৬৩১ অব্দের ১লা এপ্রেল ফ্রান্সভূমিতে “গেজেট” নামক প্রথম পত্রেব সৃষ্টি হয়। এই পত্র “গেজেটাব” নামেব অন্তর্করণ কবিশা বাহিব হয়। ক্ষুদ্র আট পৃষ্ঠা পরিমিত আকাবে ফ্রান্সেব বাজচিকিৎসক বেণাল্ডট্ এই পত্র সপ্তাহে একবার কবিশা বাহিব করিতেন, প্রথমত ইহাতে কোন প্রকার সংবদ ছাপা হইত ন’। মার্শমান সাহেবেব বাঙ্গাল’ দিগ্‌দশনেব মত গল্প ও পুস্তকেব সমালোচনায় এই কাগজ পূর্ণ কবা হইত। ইহাই ইউরোপপথেব বর্তমান সভ্যতাৰ আদর্শভূমি ফ্রান্সেব প্রথম সংবাদপত্র। সম্ভবত বোম ব্যতীত ইউরোপপথেব এই প্রথম সংবাদপত্র। গেজেটেব অবস্থা এই প্রকাৰ হইলেও এই নূতন জিনিস তথাকাব লোকেব চক্ষেও একরূপ ভীতিপ্রদ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই ইহাকে অন্নবিস্তব ভয় কবিত। পাছে এই পত্র প্রকাশে কেহ কোন বাধা দেয়, এই কাবণে প্রতি সংখ্যাব গেজেটে এই কথাগুলি থাকিত,—

“আমি বৈদেশিক বাজান্তবাদিগকে অনুৰোধ কবি, তাহাবা যেন আমাব সংবাদপত্রেব বিকরাচরণ কবিশা অনর্থক সময় নষ্ট কবেন না। আমাব এই গেজেট সেকপ জিনিস নহে যে, তাহাবা ইহাকে বন্ধ কবিতে পাবেন। স্রোত-সলিল যেকপ বাধা পাইলে ক্ষীত হইবা উঠে, আমাব এ কাগজও সেইরূপ বাধা পাইলে পবাক্রমশালী হইবা উঠিবে।”

ইহাব পব ক্রমে দেখাদেখি ফ্রান্সে ২।৪ থানি কবিশা কাগজ বাহিব হইতে লাগিল, কিন্তু বিশেষ উন্নতি কিছুই লক্ষিত হয় নাই।

১৭৮৯ সালেব বিপ্লব ফ্রান্সেব সংবাদপত্রেব উন্নতিব পক্ষে একটী প্রধান ঘটনা। এই বিপ্লবে প্রায় দেড় শত নূতন সংবাদপত্র জন্ম গ্রহণ কবে ও ইহাব মধ্যে অনেকগুলি সবিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে। এই সকল পত্রে বাজনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ বাহিব হইতে থাকে ও ফ্রান্সেব সেই সময়কাব অনেক প্রধান প্রধান বিখ্যাত লোক এই সকল পত্রে লেখক শ্রেণীভুক্ত হন। সভ্য প্রধান দেশে সংবাদপত্রেব উন্নতিব এই প্রথম অবস্থা, ফ্রান্স ব্যতীত ইউরোপেব অপবাপর দেশেও তিক এই সময় সংবাদপত্রেব বৈশিষ্ট্য, কেবল ইংলেণ্ডে একটু উন্নতি লক্ষিত

হইতছিল, তথায় এই সময় “টাইম্‌স্” পত্র জন্মগ্রহণ কবে। ইহাব অন্তর্নিহিত পবে ফ্রান্সে দৈনিক পত্রের বিশেষ প্রাচুর্য লক্ষিত হয়, এবং সেই সময় হইতেই সংবাদপত্রের প্রতি রাজার দৃষ্টি পড়ে ও তাহার ফল স্বরূপ রাজাজ্ঞা দ্বারা অধিকাংশ সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ কবিতা দেওয়া হয়, কেবল যে সকল পত্রের ভাষা বিশেষ তীব্র ছিল না, বা কেবল শিল্প সাহিত্যাদি লইয়া নাড়াচাড়া করিত, রাজনীতির সংস্পর্শে বড় একটা ঘাইত না, সেইগুলিই রাজাজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি পায়।

নেপোলিয়নের সময় ফ্রান্সের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলক্ষণ সংকোচ কবা হইয়াছিল। নেপোলিয়ন অপবাপব কার্যে যত উদার হইউন না কেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এখনকার ভাষা তখন যে সে শোক ইচ্ছা কবিলেই সংবাদপত্র বাহিব কবিতা পাবিত না। সে সময় কেহ কোন পত্র প্রচার কবিতা ইচ্ছা কবিলে, প্রথমে রাজার নিকট অনুমতি গ্রহণ কবিতা হইত, ফ্রান্সে অধিবাসী লোক ভিন্ন অপব কোন দেশীয় লোক তথায় কোন পত্র প্রচারে অনুমতি পাইত না। সংবাদপত্রের সম্পাদককে রাজসমীপে কতকগুলি বিশেষ নিয়মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত। সর্বদা রাজপক্ষ সমর্থন কবিতা, গবর্নমেন্টের বিপক্ষে কখন কোন কথা বলিব না, এই সকল বলিয়া শপথ গ্রহণ করিলে তবে সে সময়কার গবর্নমেন্ট সম্পাদককে কাগজ বাহিব কবিতা আজ্ঞা দিতেন। নেপোলিয়ন বড় যুদ্ধোত্তর ছিলেন বলিয়া এই শপথের মধ্যে যুদ্ধ বিভাগের কথা বিশেষ কবিতা উল্লিখিত হইত। এই সকল কারণে নেপোলিয়নের সময় ফ্রান্সের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের মূল ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল পত্র বোর্কোঁ-বংশের কিছু গুণগান কবিতা, সে সকল পত্রকে সম্রাট বিষচক্ষে দেখিতেন। আবার যে সকল পত্র নেপোলিয়নের বিপক্ষ ছিল না, অথচ সপক্ষেও কিছু বলিত না, তাহা-দিগকেও তিনি পছন্দ কবিতেন না, শত্রু জ্ঞান কবিতেন। নেপোলিয়ন স্পষ্টাক্ষেপে তাঁহার সময়ে সংবাদপত্র সকলকে তাঁহার রাজনীতির পক্ষ সমর্থন কবিতা আজ্ঞা কবিতেন। নেপোলিয়নের সময় সংবাদপত্রের অবস্থা ত এই, যুদ্ধোত্তরের অবস্থা ইহা পেকা শোচনীয় ছিল। নেপোলিয়নের পব বোর্কোঁ-বংশীয়ের আবার যখন সিংহাসন অধিকার কবিলেন, তখন সংবাদপত্র সমূহকে নেপোলিয়নের ভাষা ততদূর কঠোর শাসনাধীনে না রাখিলেও তাঁহারা কোন প্রকার অনুগ্রহভাব দেখাইতেন না। তবে বোর্কোঁ-বংশীয় সম্রাট অষ্টাদশ ই

বৃপতিৰ সময় ফ্রান্সৰ সংবাদপত্ৰেৰ দ্বিতীয়বাৰ উন্নতি লক্ষিত হয়। এই সময় সম্ৰাট স্বয়ং ফ্রান্সেৰ অনেকগুলি প্রধান প্রধান সংবাদপত্ৰে প্ৰবন্ধ লিখিয়া সংবাদপত্ৰেৰ প্ৰকাশকদিগকে উৎসাহিত করেন, এই সময় সম্ৰাটেৰ উৎসাহে বাক্ত্যেৰ অনেক বড় বড় পণ্ডিত ও বাক্তকৰ্মচাৰী পুনৰায় সংবাদপত্ৰেৰ উন্নতি কৰে লেগনী ধাৰণ কৰেন ও ইহাদিগেৰ যত্নে ফ্রান্সে সংবাদপত্ৰেৰ যুগান্তৰ উপস্থিত হয়।

আমাদেৰ এখানে যেমন পাৰ্চী, ইংলিসমান, সিবিলা মিলিটাৰী গেজেট প্ৰভৃতি কতকগুলি গবৰ্ণমেণ্টেৰ তবফল কাগজ আছে, ফ্রান্সে নেপোলিয়নেৰ পতনেৰ অব্যবহিত পৰে ও বোৰ্কেয়াবংশেৰ বাক্ত্য গ্ৰহণেৰ প্ৰথমাবস্থা, এই প্ৰকাৰ ছয়খানি প্ৰধান কাগজ ও প্ৰজা পক্ষেৰ ছয়খানি প্ৰধান কাগজেৰ গ্ৰাহক সংখ্যা তুলনায় সকলে বুঝিতে পাবিৰেন, বাজে কোন পক্ষেৰ বল অধিক।

গবৰ্ণমেণ্টেৰ পক্ষ	গ্ৰাহকসংখ্যা	প্ৰজাৰ পক্ষ	গ্ৰাহকসংখ্যা
লি জগাল দে পানী।	৪১৭৫	লি কনষ্টিটিউশনাল।	১১২৫০
লি ইউনিয়ন।	২৭৪৯	লি জগাল দে দিগেট।	১৩০০০
লি গ্যাঞ্জেট।	২৩০০	লি কোটিদিয়েন্।	১০৮০০
লি মানটব।	২২১০	লি কুপিয়ব ফ্রাঙ্কে।	২৯৭৫
লি দ্ৰুপিয়ান ব্লাঙ্ক।	১৯০০	লি জগাল দে কমিউন্।	২৩১০
লি পাইলোটি।	৯০০	লি পাব্লিক।	৯২৫

মোট—১৪,২৭৪

মোট—৪১,৩৩০

এই হিসাবে দেখা যাইতেছে প্ৰজাশক্তি অপেক্ষা রাজশক্তি কত হীন বল। বাক্ততন্ত্ৰ দেশে রাজ্যেৰ প্ৰতি প্ৰজাৰ কত কম টান। এই সংবাদপত্ৰেৰ হিসাবে দেখা যাইতেছে রাজশক্তি অপেক্ষা প্ৰজাশক্তি তিন গুণ অধিক, প্ৰকৃত হিসাবে আবণ্ড কত গুণ অধিক, তাহা বলা যায় না। আমবা এই তুলনায় প্ৰথম বৎসবেৰ হিসাব মাত্ৰ দেখাইলাম, প্ৰতি বৎসবেৰ হিসাব তুলিয়া দেখাইলে পাঠকগণ দেখিতে পাইতেন, বাক্ততন্ত্ৰ ফ্রান্সে প্ৰজাশক্তি প্ৰতি বৎসব কিকপ আশ্চৰ্য্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নেপোলিয়ন যে সংবাদপত্ৰেৰ স্বাধীনতা লোপ কৰিয়া প্ৰজাশক্তিৰ গলা টিপিয়া মাৰিতে গিয়াছিলেন, নেপোলিয়নেৰ পতনেৰ অন্তদিন পৰেই সেই প্ৰজাশক্তি পুনৰায় আপন বল লাভেৰ চেষ্টা কৰায়, ছয় খানিৰ স্থানে পাঁচ শত সংবাদপত্ৰ প্ৰজা পক্ষে জন্মগ্ৰহণ কৰিল।

ইহাব মধ্যে প্রধান আঠাব খানিব গ্রাহক ছই হাজ্জাব হইতে ত্রিশ হাজ্জাব পর্য্যন্ত। লুই ফিলিপি প্রজা পক্ষের সংবাদপত্রের আকর্ষক এতাদৃশ বৃত্তিতে ভীত হইনাছিলেন, কিন্তু নেপোলিয়নের জায় তাঁহার সাহস ও বল না থাকায় তিনি কোনরূপে এই শক্তিকে দমন করিতে পাবেন নাই। লুই ফিলিপির ভয়েষ একটা বিশেষ কারণ এই যে, এই সময় ফ্রান্সের সকল সংবাদপত্রের মূল্য হ্রাস হইয়া পড়ায় এতদিন যাহা কেবল সঙ্গতিপন্ন ও ভদ্রলোকের পাঠ্য ছিল, এক্ষণে তাহা সর্ব সাধাবণের পাঠ্য হওয়ায় ছোট বড় ইতব ভদ্র সকল শ্রেণীস্থ লোকেই বাজকার্য্যের সমালোচন আবিস্ত কবায়, বাজার স্বার্থে ব্যাঘাত পড়িল। কিন্তু এই সময় মূল্য হ্রাস হইয়া সংবাদপত্রের প্রচাব বৃদ্ধি হইলেও এক বিষয়ে ফ্রান্সের সংবাদপত্রের অবস্থা বড় শোচনীয় ভাব দাবণ কবে। এই সময় সংবাদপত্রের প্রচাবকগণ দেশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা আপনাদিগের স্বার্থের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিয়া কাগজ চালাইতে লাগিলেন। আব সম্পাদকগণ আপনাদিগের গ্রাহকগণের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিয়া সেই অমুযাবী কাগজ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই সুযোগে সংবাদপত্রের লেখকদিগের বিলক্ষণ আর্থিক উন্নতি হয়। অনেক প্রধান পত্রের লেখক এই সময় বৎসবে বড়ি হাজ্জাব হইতে ত্রিশ হাজ্জাব ফ্রাঙ্ক পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন। এই সময় হইতে সংবাদপত্রে পবনিন্দা, হিংসা, ঘেয ও গালাগালি কিছু বাড়বাড়িই হয় এবং আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদপত্রে সেই ভাব সংক্রামিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহা ভিন্ন এই সময় হইতে ফ্রান্সে সংবাদপত্রে জীজ্ঞাতিব বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়, সুতবাং অশ্লীলতাও যে আবিস্ত হয়, তাহা আব বলিবাব প্রয়োজন নাই। এক কথায় এই সময় হইতে সংবাদপত্রের রুচিব পরিবর্তন হয়। ইতাব পূর্বে সংবাদপত্রে এই সকলের বড় আলোচনা হইত না, তখন কেবলমাত্র বাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা সাহিত্য প্রভৃতিব আলোচনায় পত্র পৃষ্ঠা পূর্ণ কবা হইত। জীজ্ঞাতিব বিষয় আলোচনাব সুর হওয়ায়, জীজ্ঞাতিব ভগ্ন কথেক খানি পত্রেও এই সময় প্রথম সৃষ্টি হয়।

১৮৫২ অব্দে ফ্রান্সে নেপোলিয়নবংশ আবাব প্রাধান্তলাভ কবাব সঙ্গে সঙ্গে, ফ্রান্সে সংবাদপত্র আবাব শোচনীয় অবস্থার পতিত হয়। নেপোলিয়ন বংশধর নেপোলিয়ন অপেক্ষা শত গুণ কঠোর স্বভাবে ফ্রান্সের সংবাদপত্র সমূহকে আবদ্ধ করেন। লুই নেপোলিয়নের আদেশক্রমে সংবাদ বা

সাময়িক যে কোন পত্র হউক না কেন, এবং তাহা যে কোন বিষয়েবই আলোচনা করুক না কেন, বাজাৰ্জা ব্যতীত কেহই তাহা প্রকাশ কবিত্তে পারিত না। তাহাব পৰ এই সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম হইল, ফ্রান্সের অধিবাসী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি তাহার রাজ্যমধ্যে কোন প্রকারেব পত্রিকা প্রচারে অধিকারী হইবে না। এই সকল পত্রের অধিকারী ও সম্পাদকেব সাবালক হওয়া চাই, শুদ্ধ ইহাই নহে, আবার মিউনিসিপাল অধিকার থাকা চাই। সম্পাদক ও পত্রাদিকারীৰ পবিত্বের সহিত বাজার অমুমতি পুনরীকর গ্রহণ আবশ্যক। এই সময় যদি কোন ব্যক্তি কোন ভিন্ন দেশীয় পত্রের গ্রাহক হইত বা ভিন্ন দেশীয় পত্র ফ্রান্সে আনিয়া বিক্রয় করিত, তাহা হইলে তাহাকে ও এই সকল নিয়মাবলীনে চলিতে হইত। এই সকল বাজাৰ্জাব কেহ ব্যতিক্রম কবিলে, তাহাব হয় অর্থদণ্ড, না হয় কাবাবদণ্ড ভোগ করিতে হইত। তাহাব পৰ কেহ কোন পত্র প্রচার কবিত্ত ইচ্ছা কবিলে, প্রচাৰামুমতি লাভেব সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাৰ অধিকারীকে জামিন স্বরূপ পনব হাজাব হইতে পক্ষাংশ হাজাব ফ্রান্স পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টে জমা বাণিতে হইত। কোন পত্র লুই নেপোলিয়নেব গবর্ণমেণ্টেব বিকল্পে কোন কথা বলিলে, এই টাকা গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। যদি কেহ বাজাৰ্জা প্রাপ্তিব পূর্বে বা জামিনেব সমস্ত টাকা জমা দিবাৰ পূর্বে পত্রিকাৰ প্রচাৰাবস্ত কবিত, তাহা হইলে তাহাব শুকতর অর্থদণ্ড ব্যতীত দীর্ঘ কাবাবদণ্ড হইত। মুদ্রাকবকে পর্য্যন্ত ইহাতে টান পড়িত। ইহাব উপব ষ্টাম্প খবচা, বিদেশী সংবাদপত্রাদি ফ্রান্সে আনিলে তাহাব আমদানী মাণ্ডল, কোন প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টেব বিবক্তিকব বোধ হইলে শুকতর অর্থদণ্ড ও কাবাবাস উভয়বিধ লাভ, বাজসভাব কোন কার্য্য বিনামুমতিতে প্রকাশ কবিলে বা গবর্ণমেণ্ট যে কাগজকে যে কার্য্যেব জন্য সাবধান কবিয়া দিযাচেন, পুনরায় সেই কার্য্য কবিলে,—কাগজ তৎক্ষণাৎ বন্ধ কবিয়া দেওয়া হইত। বাজকীয় বিজ্ঞাপনাদি গবর্ণমেণ্টেব ইচ্ছামত বিনা মূল্যে সম্পাদককে প্রকাশ কাবতে হইত। যদি কোন পত্রের প্রকাশক বা সম্পাদক গবর্ণমেণ্টেব এই সকল আদেশ অগ্রাহ্য কবিয়া চলিতে চেষ্টা কবিতেন, তাহা হইলে লুই নেপোলিয়ন তাহাকে ইচ্ছামত শাস্তি দিবাৰ ক্ষমতা স্বহস্তে ধারণ করিতেন। এই সময় কেহ কোন সচিত্র পত্রিকা বাহিব কবিত্তে ইচ্ছা কবিলে বা কোন প্রবন্ধ চিত্রযুক্ত বাহিব কবিত্তে ইচ্ছা করিলে তাহাব স্বতর অমুমতি গ্রহণ করিতে হইত। এইরূপ বত বাব ও বতগুলি চিত্র পত্রিকাৰ প্রকাশের

আবশ্যক হইত, তত বাব পৃথক পৃথক অনুমতি গ্রহণ কবিতে হইত । পুস্তক ও বক্তৃতাাদি সম্বন্ধেও লুই নেপোলিয়ন অনেক কঠিন নিয়ম কবিস্বাছিলেন কিন্তু এ পৰ্য্যন্ত সে সকল উল্লেখ নিম্নয়োজন বিবেচনায় আব তাহা বলা হইল না ।

লুই নেপোলিয়ন এই প্রকাব কঠোব শাসনে তাঁহাব প্রথম বংশবেই এক শত কুড়ি খানি সংবাদপত্ৰেব বা প্রায় এক তৃতীয়াংশ পত্রিকার অকালমৃত্যু হয়, কিন্তু তথাপি ফবাসী প্রজাব বল, এত কঠোব শাসনেও দমিয়া যায় নাই । এই বংশব ফ্রান্সে চৌদ্দখানি দৈনিক পত্ৰ গবৰ্ণমেণ্টকে ৩১৩, ৫৮২ ফ্রাঙ্ক দণ্ড দিয়াও ১৬১,৩৫০ কাপি কবিস্বা প্রত্যহ ফ্রান্সবাসীকে উপহার দিয়াছিল ।

লুই নেপোলিয়নেব পব হইতে ফ্রান্সে সাধারণত ঐ শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে । যদিও ফ্রান্সে এক্ষণে সংবাদপত্ৰাদিব আব সে শোচনীয় অবস্থা নাই, তথাপি স্বাধীনতায় এক্ষণেও ইতা ইংলণ্ড অপেক্ষা হীন । ফ্রান্স ব্যতীত, জৰ্ম্মণি, রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশে দেখা যায়, প্রজাশক্তি অপেক্ষা রাজশক্তি বলবান, সেইখানেবই সংবাদ ও সাময়িক পত্ৰাদিব পূৰ্ণ স্বাধীনতা নাই । সংবাদপত্ৰেব স্বাধীনতায় ইউৰোপখণ্ডেব মধ্যে ইংলণ্ড সকল জাতিকে অতিক্রম কবিস্বাছে । আব আমবাও আজ ইংলণ্ডেব প্রসাদে সেই স্বাধীনতাব কিয়দংশ ভোগ কবিতেছি । এস্থলে পাঠকগণকে বুঝাইয়া বলা উচিত, পূৰ্ণ রাজশক্তিসম্পন্ন দেশে সংবাদপত্ৰাদিব কিরূপ অবস্থা তাহা দেখাইবার জন্তই কেবল ফ্রান্সেব কথাব অবতারণ কবা হইয়াছে, এবং সেই পূৰ্ণশক্তিবিশিষ্ট রাজা নিজ স্বার্থবক্ষাব নিমিত্ত প্রজাশক্তি বিনষ্ট কবিস্বাৰ অভি-প্রায়ে, প্রজার যন্ত্ৰ ও দূত স্বরূপ সংবাদপত্ৰেব স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কবিস্বাও প্রজাব মনেব আগুন চাপা দিতে পাবিলেন না, তিনি প্রজাব মুখবন্দেব নানা চেষ্টা কবিলেও ফ্রান্সেব পন্থেব আনা প্রজা লুই নেপোলিয়নেব বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, ও তাহাব ফলস্বরূপ ফ্রান্সভূমিতে আজ একবাবে রাজশক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে ; ফ্রান্স সম্পূৰ্ণরূপে প্রজাশক্তিব অধীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে । আমাদেব দেশেব শাসন কৰ্ত্তৃপক্ষেব মধ্যে অনেকে এই লুই নেপোলিয়নেব দলেব লোক আছেন, ইঁহাবা প্রজাব মনোভাব মনে আবদ্ধ বাধিবাব জন্ত প্রজাব মুখ বন্ধ কবিস্বাব জন্ত, প্রজাশক্তি নষ্ট কবিস্বাব জন্তগবৰ্ণমেণ্টকে দেশীয় সংবাদপত্ৰেব শক্তি ও ক্ষমতা সংকোচ কবিতে পরামৰ্শ দিয়া থাকেন ; তাঁহাদেব ভাবা ও দেখা উচিত যে, কেবল সংবাদপত্ৰেব মুখ বন্ধ কবিলেই প্রজাব মুখ বন্ধ কবা যায় না, তাহাদেব মনে পাষণ চাপা দেওয়া যায় না, লুই নেপোলিয়ন এক্ষণে প্রজাশক্তি নষ্ট

কবিতা চেষ্টা করার সেই শক্তি যেমন শতগুণ বলে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, আজ ইংবাজ-গবর্ণমেন্ট যদি প্রজাব অপ্ৰিয় হইয়া প্রজাব স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদের বলক্ষয় কবিতা ভাবতবাসীকে নিজ কবতলস্থ বাধিতে যান, তাহা হইলে ইংবাজগবর্ণমেন্টকেও এক দিন নেপোলিয়নের ছায় হতাশ ও ভয়মনো-রথ হইতে হইবে ।

পৰিশেষে আমাদের দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে বলি, ফ্রান্সের সংবাদপত্রের ইতিহাসে তাঁহাদের শিখিবাব অনেক আছে । পায়েনিসের বা ইংলিশম্যান প্রেস্ আক্টেব ভয় দেখাইগেই, আমবা ভয় পাইব কেন ?

নাটক ।

সৃষ্টিকাল ।

যে সে সত্যসমাজে লোক মনে কবিলেই, বখন তখন নাটক সৃষ্টি করিতে পাবে না । এ কথা—ঠিক কথা ।

নাটক বল, নবেল বল, কাব্য বল, দর্শন বল, জগতে জড় অজড় সকল পদার্থেবই বিকাশ, বিশেষ নিয়ম অনুসারে হইয়া থাকে । সকল পদার্থেবই আগম নিগমেব—নিয়ম ও ক্রম আছে । সাহিত্যেবও সকল অবয়বের বিকাশেব ক্রম নিয়ম আছে । সেই সকল ক্রম নিয়ম যে কি, তাহা বুঝা বড় কঠিন, তবে মোটামুটি এতটুকু বুঝিতে পাবা যায় যে, কোন দেশে পাণ্ডিত্য ও বস-গ্রাহিতা যুগপৎ বৃদ্ধি পাইলেই যে সেই দেশে সাহিত্যের সৰ্ব্ব অবয়বের স্তম্ভব বিকাশ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই । বড় বড় জাতির বড় বড় কথা ছাড়াইয়া দিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালি জাতিব ক্ষুদ্র বঙ্গ সাহিত্যেই দেখুন—পণ্ডিত ও বসজ্ঞ অনেকেই আছেন, কিন্তু বাম বম্বব মত আগমনী বা বিবাহ, কাঁহক ঠাকুরেব মত সখীসংবাদ কেহ লিখিতে পারেন কি ? না, তা পারেন না । যখন তখন, যে সে জিনিস, মনে করিলেই হয় না ।

প্রাচীন গ্রীসেব একটি বিশেষ সময়ে, এবং আধুনিক ইংলণ্ড, স্পেন, ফরাসি দেশেব বিশেষ বিশেষ সময়ে, বড় বড় নাটককাব জন্মিয়াছিলেন, এইট

দেখাইয়া, একাইলস, সেকস্পিয়র, হগো প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়া, যুরোপীয় সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, যখন সভা দেশে, যুদ্ধবিক্রমেব, বাহু-বল-বিপ্লবেব, জড় জগতেব সহিত মানবেব কাৰ্য্যশক্তি—বিশেষ আবল্য হয়, তখনই নাটক সৃষ্টি হইয়া থাকে ।

তাঁহাদেব কথা এই যে, দেশে জীবন্ত ভাবে ঘাত প্রতিঘাত থাকিলে, সাহিত্যে ঘাত প্রতিঘাত-জীবনময়-নাটকেব সৃষ্টি হইবে । দেশে ঘাত-প্রতিঘাত না থাকিলে, সাহিত্যে ঘাত প্রতিঘাত হইবে কেন ?

আমরা কান্না সাহিত্যেব সমালোচনাৰ অনেকেই যুরোপীয় সমালোচকগণেব মন্ত্ৰ শিষ্য, কাজেই আমরা ঐ মতেব অনুসরণ কৰিয়া, বাঙ্গালিকে নাটক লিখিতে নিষেধ কৰি, লিখিলে অবজ্ঞা কৰি, বিজ্ঞতা দেখাই, উপহাস কৰি, ঘণা দেখাই ।

কিন্তু সংসাবেব ঘাত প্রতিঘাত মধ্যে আমরা যে নিয়ম স্থিৰ কৰিতেছি, বা যুরোপীয়েরা স্থিৰ কৰিয়া দিয়াছেন বলিয়া, যাহা আমরা অবনত মস্তকে গ্রহণ কৰিতেছি, সেই নিয়মটি একটু বিচাৰ বিতৰ্ক কৰিয়া আমাদের এখনকাৰ দিন দেখা আবশ্যক ।

এই কলিকাতায় এক দিকে, যেমন একজন প্রবান ধনীসন্তান, লক্ষপতি বলিলে যাহাব অবমাননা হয়—এহেন লোক নিভৃতকক্ষে পঞ্চপাৰিপাশ্বিকে পবিত্ৰ হইয় তোষামোদ সেবনেব মায়া কাটাইয়া, অথবা তদপেক্ষা আরও নিভৃতকক্ষে মুহুৰি মহাফেজ লইয়া কড়া ক্রান্তিব হিসাবেব মমতা ভুলিয়া, বিপুল অথদানে, ভূরি সময় দানে, নাটকেব বস্ত্ৰোৎসাহে অগ্রসৰ,—অল্প দিকে, তেমনিই কবি প্ৰদিক্ৰ দাৰিদ্রেব সহচর কবিবব—বামায়ণ মহাভাবতেব অপূৰ্ণ অনুবাদ স্তখেব মায়া কাটাইয়া, ছোট ছোট থোস গল্পেব ছাঁতনি বাঁধুনি গাঁথুনিব মমতা ভুলিয়া, সৰ্বস্বান্ত হইয়া, ঋণদাবে জড়িত হইয়া, সেইরূপে বঙ্গ নাটকেব বস্ত্ৰোৎসাহে বঙ্গভূমিতে অবতীৰ্ণ । আব বৎসব দেখা গেল, নববিধানীবা বাঁশেব বেড়াৰ গোবব-মাটীৰ প্রলেপ দিয়া বঙ্গ নাটকেব সেবা কৰিতেছেন, আৰাব এ বৎসব দেখা যাইতেছে, ঠাৱ কোম্পানি সূৰ্য্যহং, সূৰ্য্যমা, মৰ্ম্মৰ-প্রথিত হৰ্ষা নিৰ্ম্মাণ কৰিয়া নাটকসেবাব উদ্যোগে আছেন । এমন উৎসাহেৰ দিনে, নাটকেব সৃষ্টিস্থিতিব বিলাতী নিয়মটি আমাদের বিচাৰ কৰিয়া দেখা আবশ্যক ।

নাটকেব জীবন—ঘাত প্রতিঘাত বটে । কিন্তু অত অল্প কথায় বলিলে কিছুই বুঝা যায় না । আমরা অনেক স্থলে ঐ কথাটি অনেক প্রকারে

বুঝাইবাব চেষ্টা কবিষাছি, যদিও এখনও অনেক কথা বলিবাব আছে—
তথাপি অদ্য ও কথাব আব নাডাচাডা করিব না। কিন্তু নাটকের জীবন
ঘাত প্রতিঘাত বলিয়াই—কোন সভ্য সমাজে ঘাত প্রতিঘাত থাকিলেই যে
সেই সমাজে নাটক সৃষ্ট হইবে—তাহা বোধ হয় না।

মুসলমান সভ্য জাতি। মুসলমান ইউরোপের সাক্ষাৎ শিক্ষা গুরু।
মুসলমান হিন্দুর নিকট, যুনানীব নিকট, স্বয়ং শিক্ষা করিয়াছে, সেই সকল
জ্ঞান বিজ্ঞান অতি সমৃদ্ধপণে আবাব আপনার শিষ্য যুবোপায়গণকে শিক্ষা
দিয়াছে। মুসলমানের ধর্ম শাস্ত্র কোবাণ একরূপ সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ।
পারসী ভাষার গীতি কাব্য হিন্দু গ্রীকের সমতুল্য। যুদ্ধ বিক্রমে, দিগ্বিজয়ে,
আস দণ্ডের ঘাত প্রতিঘাতে, পাঁচ শত বৎসর যাবৎ মুসলমান জগতে অতুল্য
ছিল বলিলেও হয়।—এত ঘাত প্রতিঘাতেও ত মুসলমানের সাহিত্যে—আবাবী
পারসী, তুবকীতে ঘাত-প্রতিঘাত-ময় নাটক এক থানিও নাই। তবেই
বোধ হইতেছে, কোন সভ্য সমাজে ঘাত প্রতিঘাত থাকিলে, তাহাদের
সাহিত্যেও ঘাত প্রতিঘাতের ছায়া পড়িবে, এই নিয়ম সকল স্থলে খাটে না।
এখন কথা হইতে পারে, কোন সভ্য সমাজে ঘাত প্রতিঘাত থাকিলেই যে
সেই সমাজের সাহিত্যে ঘাত প্রতিঘাত থাকিবে—এ কথা ঠিক নহে বটে
কিন্তু সমাজে ঘাত প্রতিঘাত না থাকিলে, যে ঘাত-প্রতিঘাত-ময় নাটক হইবে
না,—তাহা ঠিক। এ কথারও বিচার কন্য আবশ্যক।

কোন একটি সমাজের মধ্যে অল্প শত্বেব ঝঞ্জননি, অল্প গ্রন্থিব কনকনানি
না থাকিলেই, যে সে সমাজে, কিছুমাত্র ঘাত প্রতিঘাত নাই, এমন কথা বলা
যাইতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে নিজীব প্রায় এই বঙ্গ সমাজে, কতটুকু
মানসিক ঘাত প্রতিঘাত আজ কালি চলিতেছে—তাহা আপনারা
ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? বর্ষীয়ান পিতা, কিসে পুত্র ঠাট বাট বজায় রাখিয়া
পূর্বপুরুষদের কীর্তি কলাপ নষ্ট না করিয়া সুপরিচিত, চব-প্রচলিত পণে
চলিতে থাকিবে—নিয়ত সেই ভাবনায় বিভ্রত, আব তাঁহাব সেই যবীয়ান
পুত্র, কিসে সমাজ ভাঙিবে, গৃহস্থালি নষ্ট করিবে, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন
করিবে,—সেই ভাবনায় ভোব। ইহাতে আমাদের সমাজ মধ্যে নিবর্তিত কি
ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে না? অশিক্ষিত ভাবিতেছে উদ্ব-নীতি, শিক্ষিত
ভাবিতেছেন উদ্ব-নীতি। গৃহিণী ভাবিতেছে অতিথি অভ্যাগত,—ক্রিয়া,
কলাপ—ছেলে পিলে—আবক আচ্ছাদন। বহুমাতা ভাবিতেছেন—বহু

বন্ধুনী—কোট কেদারা—ডাকের পত্র, প্রিয়জনের ছত্র—সোসাইটীর মহাশয়ান, আব চিডিয়াথানার জীবন্ত তীর্থ। ছুইটি বিভিন্ন-মুখী শ্রোতাব ঘাত প্রতিঘাত বঙ্গ সমাজে আজি অনেক কাল লীলা খেলা করিতেছে—সমাজে, সংসারে, এমন কি স্ত্রীপুরুষ মধ্যে—ঘাত প্রতিঘাত নিয়তই চলিয়াছে। বাঙ্গালীর বতই চক্ষু ফুটিতেছে এই ঘাত প্রতিঘাত ততই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। বাহ্যে ঘাত প্রতিঘাত নাই বলিয়া অন্তরেও যে নাই, এ কথা বলিতে পাবা যায় না। তবে যে সমাজ অন্তর্বাহ্যে সমানে নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল,—জড়, অসাড়—উদাস, উদাসীন,—সে সমাজে অবশ্য নাটক সৃষ্ট হইবে না; শুধু নাটক কেন—তাহাতে দর্শন বিজ্ঞান, ব্যবসায় বাণিজ্য—অবশ্য মনুষ্য ধর্মের কিছুই থাকিবে না।

তেমন জড় সমাজ, বঙ্গ সমাজ নহে। অনেক দিন হইতে বাঙ্গালি কাদিতে শিখিয়াছে! অন্তর আলোড়িত হইয়া টগবগ কবিতা না ফুটিলে, কিছু বাষ্প উঠে না। বাঙ্গালি বহুকাল বাষ্পবাবি ফেলিতেছে—অনেকদিন হইতে তাহার অন্তর আলোড়িত হইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর হইল, পাশ্চাত্য সভ্যতার আকর্ষক আঘাতে বঙ্গসমাজ সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল, অভিভূত হইয়াছিল—ময়মুগ্ধবৎ পরিচালকের অঙ্গুলি ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছিল, অ'ল্প অল্পে তাহার সংজ্ঞা হইতেছে। সেই বিষম আঘাতেব অল্প অল্প প্রতিঘাত আবন্ত হইয়াছে। এমন আন্তরিক ঘাত-প্রতিঘাতে কি নাটকের কিছুই উপযোগিতা নাই? তোমরা এমন কবিতা মাথা নাড়িলে চলিবে কেন? আমি তোমাদের কথাত বিশ্বাস করিব না। আমি স্বয়ং একখানা জীবন্ত নাটক, আমার হৃদয়ে ছুইটি প্রবল প্রতীপ শ্রোতাব নিবস্তর ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছে—তোমরা আমাকে চিত্রিত কারলেই নাটক হইবে—তবে এ সময় নাটকেব উপযোগী নয়, এমন কথা কেমন কবিতা বলিব? ‘আমি জীবন্ত নাটক’ এই কথা বলিয়া আমি আত্মগরিমা করিতেছি না—আমি অর্থ, আমবা—আমি, তুমি, তিনি—সমগ্র শিক্ষিত সমাজ। আমবা শিবায় শিবায় পূর্বপুরুষদেব নিতান্ত নিকামতা বহন করত, শিক্ষাগুণে পশ্চিমপুরুষদেব একান্ত সন্মানিতা পাইয়াছি। পাইয়া হইয়াছি—নিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতেব. গ্রন্থ—এক একখানি জীবন্ত নাটক। এরূপ আভ্যন্তরিক সংঘর্ষণ জগতে আর কখন হয় নাই। এমন অপূর্ব সংঘর্ষণেব ফল যে সাহিত্যে প্রতিফলিত হইবে না।—সে বিশ্বাস আমাদের হয় না। সংসাবধর্ম সাধনার জগুই বল, আর কাব্য সাহিত্যের ক্ষুব্ধ জগুই বল,—আত্মচিন্তাভ্রমসন্ধান ও সেই চিন্তেব চিত্রণই আমাদের অবশ্য কর্তব্য কার্য্য!

যে সে সময়ে নাটক হয় না বটে, কিন্তু এসময়ে, যে বঙ্গসমাজ প্রকৃত নাটক একেবারেই হইতে পারে না—এমন কথা ইতিহাসের দোশাই দিয়া, জীব কবিতা বলিয়া, আমরা নাটককারগণকে নিকৎসাহ কবিত্তে পারি না। প্রকৃত পছন্দ চেষ্টা করিলে, এসময়ে নাটক সৃষ্ট হইলেও হইতে পারে।

নাটকের উপযোগী গল্প।

প্রকৃত পছন্দ অনুসরণ করিতে হইবে, অনেক বিষয় শিথিতে হইবে। নাটকের উপযোগী গল্প নির্বাচন কবাও শিথিতে হয়। না শিথিলে অতি সামান্য কর্মও হয় না—এ সকল ত অতি গুরুতর কাজ।

যে সে গল্প লইয়া, অল্প দৃশ্য বিচ্ছিন্ন কবিতা—কথোপকথনের ভঙ্গিতে পুথী লিখিলে, নাটক হয় না। গল্পের মধ্যে ঘট-প্রতিঘাতের উপকরণ থাকাত চাই, গল্পটিতে পূর্ণত্বও থাকা চাই। বাহ্য মত কেবল মুণ্ডটা, বা কেতুন মত মাথাকাটা ধড়টা, লইলে হইবে না। একটি গাছের যেমন মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র পুষ্পফল থাকে—একটি নাটকোপযোগী গল্পেরও সেইরূপ পূর্ণ-বিকাশ থাকা চাই। পাণ্ডবনির্বাসন, মহাভারত যুদ্ধ রূপ মহানাটকের একটি মহামূল্য, সেইটি মাএ লইয়া কখন নাটক হইতে পারে না—তবে যাহার মত নাটকে পালাগাথুনী থাকিলে, প্রথম দিনের পালায় গাওয়া যাইতে পারে।

নাটকের গল্প নির্বাচনার্থে আরও অনেক কথা জানা চাই। সকল কথাই যে আমরা জানি তাহা নহে। তবে মোটামুটি যাহা বুঝিতেছি, তাহা বলিতে ক্ষতি কি? কিন্তু একপ করিয়া বলিবার অগ্রে সোধ হয় দুই একটি নাটকোপযোগী গল্পের নমুনা দিলে ভাল হয়।

প্রথমে বিকটব ছগো বিবচিত একখানি প্রসিদ্ধ নাটকের গল্পটি শুধুন—
তব ত শুনিলেই আপনা আপনি বুঝা যাইবে, যে এই গল্পে কিরূপ নাটকজ আছে।

কবাসি বাজ প্রথম ক্রান্তিসেব ত্রিভূলে নামে এক জন বিদূষক ছিল। ত্রিভূলে দেখিতে অতি কদাকাব, একে কর্কশ, খেঁচুনে, তাহাব উপর পিঠে একটা কুঁজ। ত্রিভূলেকে দেখিলেই সকলে হাসিত, ত্রিভূলেও হাসাইত, কিন্তু হাতে হাড়ে সে জগৎসংসারের উপর চটা ছিল। বাজা বাজা বলিয়া ত্রিভূলে তাহাব উপর চটা, বড় মাছুষবা বড় মাছুষ বলিয়া, ত্রিভূলে তাহাদের উপর চটা, অশ সংসারের লোকের ফাহাব ও পিঠে কুঁজ নাই বলিয়া, ত্রিভূলে সকল

লোকের উপরই চটা। রাজার উপর ত্রিবুলের অসীম প্রভু, সে জগৎ-সংসারের উপর বাগ্ন কবিতা রাজাকে ক্রমেই পাপের পথে লইয়া বাইতে লাগিল। রাজাকে ক্রমে পাবণ্ড, পণ্ড, পিণাচ কবিতা তুলিল। ত্রিবুলে রাজাকে ভাল-মন্দ কিছুই জানিতে দেয় না, তাঁহাকে অত্যাচারে উত্তেজিত করে, পাপে প্রণয় দেয়। বড় বড় সম্ভ্রান্ত পণ্ডিতের মধ্যে কোন কলবধূকে কলকিনী কবিতা হইবে, কাহার ভগিনীকে অভাগিনী কবিতা হইবে, কাহার ছদ্ম-তাকে ধর্ম্মচ্যুতা কবিতা হইবে, সে রাজাকে তাহাবই শিক্ষা দেয়, রাজার স্বৈচ্ছাচারের সুযোগ নিয়ত জুটাইয়া দেয়।

এক দিন মহা মহোৎসব হইতেছে, ত্রিবুলে রাজাকে পবামর্শ দিতেছে যে, এই সুযোগে তিনি মূসে দে কদেব বনিতাকে লইয়া সচ্ছন্দে স্বৈচ্ছাবিধানে স্থানান্তরে যাইতে পাবেন, এমন সময় সম্ভ্রান্ত বুদ্ধ সেন্টে ব্যালীং হঠাৎ রাজার সম্মুখে আসিয়া তাহার কল্যাব ধর্ম্মনাশের জন্য রাজাকে ভৎসনা কবিতা লাগিলেন। পাণ্ডিত্য ত্রিবুলে, এই মন্ত্যাহত পিতাকে আপনাব স্বভাবমত বিদ্রূপ কবিতা লাগিল। বুদ্ধ গজিয়া উঠিলেন, উদ্ধত হস্তে অভিসম্পাত কবিলেন—‘আমাব মত দণ্ড যেন তোব হয়।’

ত্রিবুলের একটি পবমাস্তলবা কথা ছিল। সেই তাহার সংসারের একমাত্র বন্ধন। মানুষ যতই কেন পাণ্ডিত্য পিণাচ হউক না, যতই কেন কঠোর নিষ্ঠা হউক না, তাহার হৃদয়ের এক কোণে একটু মনুষ্যত্ব পড়িয়া থাকিবেই। ভাল-বাসাকে মনুষ্যত্ব বলে। যে যত জগতের উপর চটা, তাহার ভালবাসাটুকু ততই খাটি। জগতের উপর ত্রিবুল, যেমন চটা, আপন কথা ব্রাহ্মকে যেমনই ভাল বাসিয়া, ত্রিবুলে আপনাব হৃদয়ের তুল দাড়ি ঠিক বাখিয়া-ছিল। ব্রাহ্মকে মনগবাস্তে, বনান্তবে, একটি নির্জন নিষ্ঠিত নিকেতনে বাসিয়া, ত্রিবুলে তাহাকে অতি সম্ভূর্ণপে মানুষ কবিতাছিল। লোকের পাপচক্ষু সমক্ষে তাহাকে আসিতে দো নাই, অর্ধশেষ, সবলতায়, সৌন্দর্য্যে—ব্রাহ্মকে স্বচ্ছ সর্গোররের খেত পদ্মের মত কবিতাছে; সেই খেত শতদল এখন প্রফুল্লোন্মুখ হইয়াছে। যে সকল পাপের পক্ষ লইয়া ত্রিবুলে সারদা মাথামাখি কবে—ত্রিবুলের বড় ভয় আছে, কিসে ব্রাহ্মকে সেই পাপ-পক্ষ হইতে বৃদ্ধা কবিলে।

কিন্তু অর্ধশেষ উপর ধর্ম্মের অভিসম্পাতের লীলাখেলা বড়ই ভয়ঙ্কর। ত্রিবুলে মূসেদে কদেব বনিতাকে রাজার নিকট লইয়া যাইবাব বড়ব্যৱ কবিতা, নিজে

চক্রে পড়িয়া, আপনাব কত্থাকেই বাজভোগে অৰ্পণ কবিল। তাহাব পব
প্ৰতিহিংসাপরায়ণ হইয়া রাজার উপর বাগ ভুলিতে গিয়া স্বহস্তে আপন
কত্থাকে বধ কবিল। কোলে লইয়া, মুখ দেখিয়া, চিনিতে পাবিয়া বুঝিল যে,
সেণ্টবালীৰ অভিসম্পাত হাতে হাতে কলিয়াছে। ত্ৰিবুলে বাজাকে পাপে শিক্ষিত
করিয়াছিল, কত্থাকে পবিত্ৰতায় দীক্ষিত কবিয়াছিল; প্রকৃতিব এমনই প্ৰতি-
বিধান যে, সেই অধৰ্ম্ম-দীক্ষিত বাজা হইতেই সেই ধৰ্ম্ম-দীক্ষিত কত্থাব ধৰ্ম্ম নষ্ট
হইল। যে পাণিষ্ঠ এক দিন মৰ্ম্মাহত পিতাব কাতব কণ্ঠস্বৰ শুনিয়া উপহাস
করিয়াছিল, দেখে সেই আজি ততোধিক মৰ্ম্মাহত হইয়া, স্বহস্তে সংসাববন্ধনেব
এক মাত্র সূত্ৰ ছিন্ন কবিয়া, মৃত কত্থা ক্ৰোড়ে কবিয়া বসিয়া আছে; ত্ৰিবুলে ত
কাঁদিতে পাবিল না!

গল্পেব নাটকস্থ বুঝিলে কি?

মাক্বেথ ও হামলেট ।

৫।

আমবা বলিযাছি, বাক্সো হতাব সংকল্পে তৃতীয় অঙ্কেব প্ৰথম দৃশ্বেৰ
শমাস্তি। দৃশ্বেব শেষ কথা মাক্বেথ মুখে পাপসংকল্পেৰ স্বগত উক্তি।

এ কথা ত হলো, বাক্সো তোমাব কপালে,
যদি স্বৰ্গ থাকে—হবে, অদ্য রাত্ৰিকালে।

দ্বিতীয় দৃশ্বে—মাক্বেথ গৃহিণী স্বামীব সহিত সাক্ষাৎ কবিবাব জন্ত
ভূতাকে বলিয়া পাঠাইলেন। পবে আপনা আপনি ভাবিতে লাগিলেন।

আপনা আপনি ভাবিতে আয়রা লেডি মাক্বেথকে আবও অনেক বার
দেখিযাছি। প্ৰথমে মাক্বেথ-লিখিত পত্ৰ পাঠেৰ পর তাঁহাব ভাবনা। তখন
চুবাকাজ্ঞা তাঁহাব মনে ফুটিতেছে। তাহাব পব দূত আসিয়া যখন বলিল,
ডক্কান্ অধিষ্ঠি হইবেন, তখন দুঃসাহসে বুক বাঁবিবাব জন্ত তাঁহাব পৈশাচী
প্ৰকৃতিৰ উচ্চ রবে আবোধনা। * তাহাব পর ডক্কান্ হতাব অবাবহিত পূৰ্বেই
পিশাচীৰ সুবাপান করিয়া, কাগ পেচকেৰ কাগ রব শুনিতে শুনিতে অধৰ্ম্মেব
আজ্ঞাদেব ভাবনা। এই দুই স্থলে মাক্বেথ গৃহিণীৰ পৈশাচিকী মূৰ্ত্তি।

* ৪২৪ পৃষ্ঠায় মাক্বেথগৃহিণীৰ কথাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাৱ অস্থবাদ হয় না।

এখনও সেই লেডি মাক্বেথ আপনা আপনি ভাবিতেছেন, কিন্তু এখন আর সে ভয়ঙ্করী, বীভৎসা মূর্তি নহে ।

গ্রাম লক্ষণ সীতা বঙ্কল পবিয়া বনে গেলেন ; কোণলে হাহাকাব ধ্বনি ; দশবথ প্রাণত্যাগ কবিলেন, কিন্তু কৈ ভরত ত সিংহাসনে বসিল না ?—কৈকেয়ী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে পারে । ছিন্ন নাসা-কর্ণের প্রতিশোধে সীতাহরণ । কিন্তু সীতাহরণের পরিণামে ব্রহ্ম-বান্ধব-বংশ ধ্বংশ হইল—স্বর্ণনখা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে পারে । কিন্তু মাক্বেথগৃহিণী সিদ্ধকামা হইয়া, স্বামীকে স্কটল্যান্ডের রাজবাজেশ্বর কবিয়া, আপনি রাজবাজেশ্বরী হইয়া, অমন হেটমুণ্ড, মলিন মুখে, দীর্ঘশ্বাস তুলিতেছে, অথচ ফেলিতে পাবিতেছে না কেন ?

অইত, অইত পাপেব মজা । অইত পাপ-পুণ্য-বিধাতাব কাবদানি । পাপেব ভোগেও কষ্ট, বিধোগেও কষ্ট । অভিলষণীয় বস্তু একেবারে বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন হইলে, বৎ একরূপ নিবৃত্তি আছে—পাপেব সম্বোধে কিন্তু কখনই সমৃদ্ধি নাই । তাহাতেই কৈকেয়ী ও স্বর্ণনখা নিবাশাব শ্বাস ফেলিতেছে—মাক্বেথ গৃহিণী তাহা পাবিল না—শ্বাস টানিতেছে, নিশ্বাস বন্ধ কবিতেছে, শব্দ বন্ধ কবিতেছে, হেটমুণ্ড স্বামীব আসিবাব পথেব দিকে চাহিয়া আছে, আব দমে দমে বলিতেছে,—

‘পেলেম না কিছু, গেলত সর্বস্ব’ কেন, কেন, বাণী, স্কটল্যান্ডের রাজবাজেশ্বরী । স্বামীব স্বামিনি । কেন কেন ? তোমাব সর্বস্ব গেল কিসে ? তুমি সংকল্প-সিদ্ধিব জন্ম মাতা হইয়া ক্রোড়স্থ স্তন্যপায়ী শিশুকে পাথরে আছাড় মট্বিতে পাপ—এখন তোমার সংকল্প সুসিদ্ধ হইয়াছে—তুমি, সর্বস্ব গেল বলিতেছ কেন ? কোথায় সর্বস্ব তাহা বুঝিতে পাবিতেছ কি ? মামুষেব সর্বস্ব দাস-দাসীতে নাই, প্রভু প্রতাপে নাই, মান-সম্মানে নাই, বাজ্য-ঐশ্বর্যে নাই, প্রাসাদ-পর্য্যবে নাই—সর্বস্ব থাকে,—মনের কোণের ভিতব, প্রাণের প্রাণের ভিতব । ভিতবের সেই নিজস্বই মামুষেব সর্বস্ব । ঐ সিংহাসন, ঐ সিংহদ্বার, ঐ বাজ্য, ঐ সংসার, ঐ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—বাহিবে—সর্বস্ব নাই, কিছুই নাই । চন্দ্রিত, চন্দ্রবর্তি, চরাকাজ্জ্বার বশে আজি ভিতবেব সর্বস্ব হাবাইয়া তাহাতেই তোমাকে বলিতে হইতেছে—

‘পেলেম না কিছু—গেলত সর্বস্ব ।’

ভিতব ছাড়া বাহিবে কোথাত কিছু নাই । তা পাবে আব কি ? সর্বস্ব যে গিয়াছে, তাহাই ঠিক ।

পুণ্যাত্মা পবোপকারেব প্রয়াসী । উপকারেব সংকল্পসিদ্ধি হওয়া সর্বদা ঘটে না । কিন্তু তাহাব চেষ্টাতেই সর্বস্ব লাভ হয় । পাপেব সংকল্প সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইলেও, সুখ নাই, তৃপ্তি নাই—কেবল মনে হয়, হলো কি ? পেলেম কি ?

লেডি মাক্বেথ ঐরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় মাক্বেথ আসিলেন, লেডি মাক্বেথ অমনই সেই অনন্ত নিরাশ চাপা দিয়া মাক্বেথকে সান্ত্বনাদান কবিতে লাগিলেন ।

লেডি মাক্বেথ ছরাকাজ্জাব বশে যতই কেন পাপিষ্ঠা হউন না, তাহাব স্বামী তাহাব নিকট প্রণয়-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাবই উত্তেজনায় মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন সুতরাং লেডি মাক্বেথ স্বামীর জন্ত বড়ই উদ্বিগ্না আছেন । পাছে ভাবিয়া ভাবিয়া মাক্বেথ পংগল হন, সে ভাবনাও আছে । আপনার সর্বস্ব-ধ্বংসকর হৃদয়দাবানল ধীবে ধীবে চাপা দিয়া স্বামীকে বুকাইতে লাগিলেন । বলিলেন, ‘বাহাব কোন উপায় নাই তাহাব বিষয় ভাবিয়া আর কি হইবে ।’

পার্পেব কি সান্ত্বনা আছে ? মাক্বেথ কোন সান্ত্বনাই বুঝিলেন না । পরিশেষে বলিলেন, ‘গৃহিণী আমাব হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতেছে, তুমি ত দেখিতেছ—বান্ধো ও ফ্লীয়ান্স এখনও জীবিত রহিয়াছে ।’ ক্রমে বলিতে লাগিলেন—‘তুমি জানিও রাত্রিচর বাড়ভুগুলা আপনাদেব নিভৃত নিবাস হইতে বহির্গত হইবাব পূর্বে, কিল্লির ঝিমঝিমনিতে নৈশ সমীরণ পুণ্ডিত হইবার পূর্বে, আজি একটি ভয়ঙ্কর কার্য্য হইবে ।’ গৃহিণী সোৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কি কার্য্য ?’ মাক্বেথ বলিলেন, ‘এখন তোমার শুনিয়া কাজ নাই—কাজ সমাপ্ত হইলে তখন প্রশংসা করিও ।’ তাহাব পব মাক্বেথ কালবাহির বোধন করিতে লাগিলেন—আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—‘দেবসেব রমণীয় বস্ত্র সকল অবসন্ন হইতেছে—কালবাহির কবাগ সহচর সকল বিচরণ কবিতোছ । সেই ধূয়া গানের কথা—মাক্বেথ মন্ডকে হুন্ডর দেখিতেছেন, তার মধ্যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছেন ।

তৃতীয় অঙ্কেব তৃতীয় দৃশ্বে তিন জন ষাতুকে সপ্তভুজক বান্ধোকে আক্রমণ করিল—ফ্লীয়ান্স পলায়ন করিল, বান্ধো নিহত হইলেন ।

চতুর্থ দৃশ্বে রাজভবনে বাজ ভোজ । সকলে উপবেশন করিলে ভোজ প্রকোষ্ঠেব বহির্দেখে একজন ষাতুক দেখা দিল । মাক্বেথ আপন আসন হইতে উঠিয়া দ্বারেব নিকটে গেলেন, সে বান্ধোর নিবন বাঁধা মাক্বেথকে

জ্ঞাপন করিল। মাক্বেথ মহা ছুই হইলেন, তাহার পর যখন সে আবার স্ট্রীয়াপের পলায়ন বৃত্তান্ত বলিল, তখন মাক্বেথের হর্ষে বিষাদ হইল। কার্ণিবায়া আসিয়া আপন আসন পরিগ্রহ করিবেন, দেখেন সেই আসনে বাতুক-ঘাত-লগ্নিত বক্তারূপ বাক্কো মূর্তি উপবিষ্ট। মাক্বেথ চকিত, স্তম্ভিতনেত্র হইয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—

‘বল তোমরা কে এ কাজ করিলে ?

আমি কবেছি বলো না—আমাব দিকে তোমার বক্তারূপ কেশ কম্পিত করিও না।’

মাক্বেথ যে ডক্কানকে হত্যা করিয়াছেন, এমন কথাটা কাণা ঘূষা অনেকেই কবিতৈছিল, অনেকেই মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। আঙ্গিকার এই কাণ্ডে সকলেই বুঝিল, যে মাক্বেথ ডক্কানকে হত্যা করিয়াছে—সেই জন্মই তাহার খেয়াল দেখিতেছে।

একেই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। একবাবকার পাপের খেয়ালে, তাহার পূর্বে পাপের কথায় লোকে বিশ্বাস করিল।

বাক্কোব এই প্রেতমূর্তি কেবল মাক্বেথ চক্ষেই দৃশ্যমান। বিশেষ পুণ্যাত্মাগণ এবং অতি বড় পাপাত্মাবা অলৌকিক ভাবে চক্ষুস্থান হন। একের পক্ষে অলৌকিক দৃশ্য সকল, পুণ্যের পরিণাম এবং স্তূথের আবহ। অন্ত্রের পক্ষে সেইরূপ ঐ সকল দৃশ্য পাপের পরিণাম এবং যাতনাব বিভীষিকা। এই সকল অলৌকিক দৃশ্য তোমরা খেয়াল বলিতে চাও, কল্পনা বলিতে চাও বল, কিন্তু কিছু নয়, বলিও না, স্পষ্টত বিশেষ পুণ্য বা পাপে যাহার উৎপত্তি এবং পুনরুৎপাদ বা দণ্ডদানের জন্ত যে সকলের বিধান—সে গুলি কিছুই নয় কেমন করিয়া বলিব ? পাপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দণ্ডবিধান আছে। বাক্কোব ঐ প্রেতমূর্তি সেই দণ্ডবিধানের অঙ্গীভূত—উহা যে কিছুই নয়, তাহা কেমন করিয়া বলিব ?

অল্পকণ পবেই বাক্কোব প্রেতমূর্তি অদৃশ্য হইল। মাক্বেথ নিমন্ত্রিত বাক্কি-বর্গকে বলিলেন, ‘আমাব একরূপ বোগ আছে, তাহাতে প্রলাপ বকিয়া থাকি, তাওটা কিছু নয়, তা যাই হোক, এখনও বাক্কো আসেন নাই, তিনি আসিলে বড়ই ভাল হয়।’—বলিতে বলিতে বাক্কোব মূর্তি আবার মাক্বেথ চক্ষে পবিদৃশ্যমান হইল। মাক্বেথ দণ্ডায়মান আছেন আপনার আসনের উপর প্রেতমূর্তি বলিয়া আছে, দেখিতে পাইতেছেন ; অন্ত্রে দেখিতেছে শূন্য আসন। তখন সেই

আসনের দিকে বিক্ষাণিত দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিতা—অন্তে বুঝিতে পারিতেছে না
কিন্তু বাস্তবিক প্রেতমূর্ত্তির প্রতি তীব্রদৃষ্টিপাত কবিতা বলিতে লাগিলেন,—

‘দূব হ বে দৃষ্টি হতে, যাবে মাটির ভিতবে ;
অস্থিতে মজ্জাত নাই, তোব শোণিত শীতল,
চক্ষু জলিতেছে বটে, কিন্তু চিন্তাশক্তি নাই ।
মানুষে যে কৰ্ম্ম পাবে—সাহসে আমি তা পাবি ;
আয় তুই, উক যক্ষ ক্রম ঋক্ষকপ ধবি,
খজাধারী চন্মী কিন্না, জিঘাংসিত ব্যাক্রকপে,—
অই মূর্ত্তি তাজি আয় অস্ত্র কোন মূর্ত্তি ধবি,
কাঁপিব না আমি, কিন্না আবাব জীবন্ত হয়ে,
ভীষণ জঙ্গলে আয় সংগ্রামি উভয়ে দ্বন্দে,
যদি কাঁপি কভু তাহে বলিস্ তখন তুই,
বালিকা আমাকে—দূব হ বে বিভীষিকা ছায়া
অলীক অনৃত দৃশ্য, যা বে দৃষ্টিপথ হ’তে ।

বাব বার দূব দূব বলাতে প্রেতমূর্ত্তি অপসাবিত হইল । মাক্বেথ স্বীকার
কবিলেন,—তিনি সকল মূর্ত্তি দেখিত পাবেন, কেবল বাক্যের মূর্ত্তি দেখিতে
পাবেন না, আবাব দোকান কবিতা, জীবন্ত মূর্ত্তির সহিত দ্বন্দ্বাক্রম কবিতে পাবেন
কিন্তু প্রেত মূর্ত্তি তাঁহাব নিকট বডই বিভীষিকাময়ী । মাক্বেথ স্বীকার
কবিয়াছেন, প্রেতমূর্ত্তি তাহাতেই অপসাবিত হইল ; আর থাকিবাব প্রযোজন
কি ? বিধাতার দণ্ডবিধান দেখিবে এইকপই হই’তছে, পায়ের কেজী আব
দেখিতে পাই না, কিন্তু কৈ চলিতেও পাবি না, জগদ্বল পাঁথব ত আব নাই—
কিন্তু কথা কহিতে পাবি না কেন ? প্রেতমূর্ত্তি অপসাবিত হইলে, মাক্বেথ
ঐরূপ কথাই বলিতে লাগিলেন । শেষে বলিলেন, আমি আবাব সেই তিনটা
প্রেতিনীৰ সহিত সাক্ষাৎ করিব, ‘আমি শোণিতবাহিনী শ্রোতস্বতীতে এত
অগ্রসব হইয়াছি যে এখন ফিবিয়া যাইতেও যে কষ্ট, পাবে যাইতেও সেই কষ্ট ।
আমি যখন ডুবিয়াছি, তখন দেখিবে, পাতাল কত দূব, পাপে এখনও আমি
অপবিপক আছি, এইবাব পবিপক হইব । এই ভীষণ প্রতিক্রান্তেই মাক্বেথের
ভীষণ পতন । প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ স্থলেই তৃতীয় অঙ্কে শেষ বটে, তবে আব
দুইটি উপদৃশ্য আছে ।

নবজীবন ।

৪র্থ ভাগ ।

বৈশাখ, ১২৯৫ ।

১০ম সংখ্যা ।

পাতঞ্জল যোগসূত্র ।

৭ ।

এক্ষণে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্বরূপ নির্দেশ কবিত্তেছেন ।

বিবামপ্রত্যয়াভ্যাস পূৰ্ণ সংস্কারশেষোহন্তঃ ॥ ১৮

পদচ্ছেদঃ ।—বিবাম-প্রত্যয় অভ্যাস পূৰ্ণঃ সংস্কার শেষঃ অন্যঃ ।

পদার্থঃ ।—বিবামো বৃত্তীনামভাব স্তস্ত প্রত্যয়ঃ কাবণং তস্য অভ্যাসঃ তদন্তঃ-
জ্ঞান পোনঃ পুন্যং তদেব পূৰ্ণঃ যন্ত স কশ্চন সংস্কারঃ শিষ্যতে । স্মিগ্নিতি অথবা
সংস্কারাণাং শেষোন্মিগ্নি সংস্কার শেষঃ অন্তঃ পূৰ্ণোক্তিসম্প্রজ্ঞাত বিলক্ষণঃ ।

অনুবাদ—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে ভিন্নরূপ সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত বলে ।
ইহা সকল প্রকার বৃত্তির উন্মূলক পবনৈবাগ্যাব বাবদ্যাব অনুষ্ঠান হইতে উৎ-
পন্ন হয় এবং সংস্কারাবা জন্মেব বীজরূপ যে জ্ঞান এবং কৰ্ম্ম, সেই জ্ঞান এবং
কৰ্ম্মের সম্পর্ক বহিত অথবা সংসারের বীজরূপ সংসার সকলের উন্মূলক ।

সমালোচনা । অসম্প্রজ্ঞাত শব্দে যে অবস্থায় কিছু জ্ঞান যাব না অর্থাৎ
যখন জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভাব কিছুই থাকে না, চিত্ত আপনাব বিগুহ সত্ত্বস্বরূপ ধারণ
কবিয়া নির্বৃত্ত নিরুদ্ভব প্রদীপেব ত্রায় সম্পূর্ণ স্থিতিবাব ধারণ কবে; চিত্তেব এই
রূপ অবস্থাব নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । হুত্রকার কৌশলক্রমে ঐ অসম্প্রজ্ঞাতের
উপাদ এবং স্বরূপ নির্দেশ কবিত্তেছেন । এইস্থলে তিনটি বিশেষণপদ আছে ।
(১) বিবাম প্রত্যয়াভ্যাস পূৰ্ণ, (২) সংস্কারশেষ, এবং (৩) অন্তঃ ; উহার মধ্যে
'অন্তঃ' এই পদের দ্বাবা অসম্প্রজ্ঞাতের নির্দেশ কবা হইয়াছে; 'অন্তঃ' কি না
পূৰ্ণোক্তিসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । 'বিবাম

প্রত্যয়াভ্যাসপূৰ্ণ' এই বিশেষণ দ্বারা তাহাব উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে ।
 বিবাম বলিতে সমুদয় বৃত্তিব অভাব ; প্রত্যয় বলিতে কাবণ ; সমুদয় বৃত্তিব
 অভাবেব কাবণ একমাত্র পববৈবাগ্য , ঐ পববৈবাগ্যেব পুনঃ পুনঃ অনুশীলন
 যাহাব পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বিবাম প্রত্যয়াভ্যাস পূৰ্ণ । 'সংস্কারশেষ'
 ইহাদ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিব স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে । সংস্কার-
 শেষ এই পদেব দুই প্রকার অর্থ করা হয় । কেহ কেহ বলেন, জন্মমবণ
 প্রবাহরূপ সংসারবেব বীজ স্বরূপ যে সকল সংস্কার তাহাব শেষ অর্থাৎ
 অবসান যে অবস্থায় হয়, তাহাব নাম সংস্কারশেষ । কেহ কেহ সংস্কারশেষেব
 অর্থ করিয়াছেন বুদ্ধ অহঙ্কাবাদিব অশান্তভাবে অবস্থান । তাহাবা বলেন,
 ঐ অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয় ঠে, কিন্তু অহঙ্কাবাদি তখনও প্রবল সত্ত্ব-
 দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, কাবণ যোগ ভাস্কর পব আবার
 তাহাদেব কার্য লক্ষিত হয় । ভাস্কর এই সূত্রেব এইরূপ তাৎপর্য নির্দেশ
 করিয়াছেন—“সালক্ষনোহ্যভ্যাসস্তংসাদনায় ন কল্পতে—ইতি বিবামপ্রত্যয়ো
 নির্কল্লক আলম্বনীক্রিয়তে সচাৰ্শশৃণুঃ—তদভ্যাসপূৰ্ণকং হি চিত্তং নিবাস্তন
 যতাব প্রাপ্তমিব ভবতিইত্যোষনিকর্ষাজ সমাধিবসম্প্রজ্ঞাতঃ ।” স্থূল হইতে আত্ম-
 স্বরূপ অবধি যে কোন ধোযবস্তকে আশ্রয় করিয়া যে চিত্তেব একাগ্রতা সম্পা-
 দন করা হয়, সেই সাধন একাগ্রতাব অভ্যাস অসম্প্রজ্ঞাতেব সাফাৎ সাধক
 হইতে পারে না, কাবণ কোনরূপ আলম্বন যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ উহা
 সম্প্রজ্ঞাত হইবে । এই জনা আত্মসাফাৎকাবেও পরাঙ্মুখকাবী সম্পূর্ণ বৃত্তি-
 শৃণু পববৈবাগ্যকে আশ্রয় করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রবৃত্ত হয় ইহা নির্কল্লক
 অর্থাৎ ইহা কোনরূপ স্থূল বা সূক্ষ্ম ধোযবস্তকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয় না ,
 অতএব ইহা অর্থশৃণু , এই অবস্থায় চিত্ত যেন মূর্তেব মত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে,
 এইরূপ নিকর্ষাজ সমাধিব নাম অসম্প্রজ্ঞাত । ভোজবৃত্তিকাব সংস্কারশেষেব
 এইরূপ তাৎপর্য দেখাইয়াছেন—“আমবা চিত্তেব চাব প্রকাব পবিণাম
 দেখিতে পাই—(১) ব্যাখান—যোগভিন্নাবস্থা, (২) সমাধিপ্রাবল্লভ, (৩) একা-
 গ্রতা এবং (৪) নিবোধ । যখন চিত্ত ক্ষিপ্ত চঞ্চল অথবা অতিশয় বিমূঢ় আনন্দেব
 অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহাব ব্যাখান অবস্থা , যখন সত্ত্বগুণেব উদ্যেকে চিত্তেব
 একটু স্থিতি সাধিত হয়, তখন উহা সমাধিব প্রাবল্লভ (আদিম) অবস্থা প্রাপ্ত হয় ;
 তাহার পব কোন এক ধোয বস্ত অবলম্বন করিয়া চিত্তেব স্থিতি হইয়া থাকাব
 নাম একাগ্রতা এবং চিত্তেব সম্পূর্ণ বৃত্তিশৃণু অবস্থাব নাম নিবোধ । চিত্তেব

এই সকল পরিণামই সংস্কার। উদ্ভাদের মধ্যে ব্যাখ্যান জন্ত সংস্কার সমাধি প্রারম্ভ জন্য সংস্কারদ্বারা বিনষ্ট হয়, সমাধি প্রারম্ভ জন্য একাগ্রতা জন্য সংস্কারদ্বারা বিনষ্ট হয়; এইরূপ নিবোধ জন্ত সংস্কার দ্বারা একাগ্রতা জন্ত সংস্কার-বেদ নাশ হয় এবং পবে নিবোধ জন্য সংস্কার স্বয়ং বিনষ্ট হয়।

যেমন সূর্য মিশ্রিত সীসক আপনাকে এবং সূর্যের মলকে একেবারে দহন করে, সেইরূপ নিবোধ জন্ত সংস্কার সংস্কার এবং আপনাকে অস্তিত্বিত করে। এই নিমিত্ত অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিকে নিব্বীজ সমাধি বলে। মণিপ্রভা নামক বৃত্তিকার বলেন যে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি সংপ্রজ্ঞাত সমাধি জন্ত সংস্কারকেও অস্তিত্বিত কবিয়া থাকে। ইহা নিব্বীজ সমাধি, কেননা ইহাতে কোন ধোয় বস্তু থাকে না এবং ইহাতে কৰ্ম্মের বীজের অভাব থাকে অর্থাৎ এ সময় এমন কোন প্রকার সংস্কার থাকে না যাহা ইহাতে পবে কোন নূতন শুভাশুভ কৰ্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে। বাচস্পতি মিশ্র বলেন ‘বীজ’ শব্দে ক্লেশ কল্যাণ, উদ্বাহা বিদ্যমান না থাকায় উহাকে নিব্বীজ বলা যায়। ভাষ্যকার বলেন অনসংপ্রজ্ঞাত সমাধি দুই প্রকার (১) উপায় প্রত্যয় এবং (২) ভব প্রত্যয়; ইহাদের মধ্যে উপায়-প্রত্যয় সমাধি যোগীদিগেই হয়। প্রকৃত মুক্ত ব্যক্তিই উপায় প্রত্যয় সমাধির অধিকারী। ভব প্রত্যয় সমাধির অধিকারী দেবগণ এবং প্রকৃত লীন ব্যক্তিগণ। কিন্তু সূত্রকার প্রথমে উপায় প্রত্যয়েই উল্লেখ কবিয়াছেন। ইহাতে বিজ্ঞানভিক্স বলেন উপায় প্রত্যয়ের বিষয় অনেক বক্তব্য এবং ভব প্রত্যয়ের বিষয় অল্প বক্তব্য, এই জন্ত সূচীকটাহু ছায়ে * ভব প্রত্যয়ের কথা আগে বলা হইয়াছে নতুবা প্রথমে উপায় প্রত্যয় বলিয়া পবে ভব প্রত্যয় বলা উচিত ছিল।

ভব প্রত্যয়ো বিদেহ প্রকৃতি লয়ানাম্ ॥ ১৯

পদচ্ছেদঃ। ভব প্রত্যয়ঃ বিদেহ প্রকৃতি লয়ানাম্।

পদার্থঃ। ভবন্তি জায়ন্তে জন্তুবোঃশ্মিত্তি ভবো বিদ্যা সংসারো বা প্রত্যয়ঃ কারণং যন্ত (নিবোধ সমাধিঃ, সং তাদৃশঃ নিবোধসমাধিঃ, বিদেহা দেবো যেষাং চেতসি স্ব কাংগে লীনে পবম পবিতোষো ভবতি ন পবম্যুত্

* যদি কোন কৰ্ম্মকারকে প্রথমে এক ব্যক্তি একখানি কড়া গডিতে বলে, তাহার পর কেহ হুচ গডিতে বলে, তাহলে কৰ্ম্মকার অগ্রে হুচ গডিয়া পরে কড়ায় হাত দেয়।

দিদৃক্ষা বর্ততে তে প্রকৃতি লয়াঃ বিদেহাশ্চ প্রকৃতিলয়াশ্চ তে তেষাং বিদেহ-
প্রকৃতি লয়ানাম্ ।

অর্থঃ । বিদেহ প্রকৃতি লয়ানাং ভব প্রত্যযো নিবোধ সমাধিৰ্ভবতী তি
শেষঃ ।

অনুবাদ । যাহাবা বিদেহ অর্থাৎ ষাট্‌কৌষিক দেহ বহিত অতএব দেব
ভাবাপন্ন এবং যাহাবা প্রকৃতিতে লীন, তাহাদেব অসংপ্রজ্ঞাত সশাধিব প্রতি
অবিদ্যা বা সংসারই কাবণ ।

সমালোচনা । ইহা সকলেই জানেন যে জ্ঞান, শিক্ষা এবং স্বভাব অনু-
সাবে মনুষ্য সকল নানা প্রকার এবং এক এক মনুষ্যের কচিও এক এক প্রকার
স্বভাবঃ যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তিদিগের মধ্যে যে ফলএব তাবতম্য হইবে, তদ্বিষয়
বিচিন্তি কি ? যদিও চিত্ত বৃত্তিব সম্পূর্ণ নিবোধ জ্ঞাত স্থিতিবিন্দু ভোগ কবাই
সমুদয় যোগাভ্যাসকারীদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু শিক্ষা জ্ঞান, এবং কচি
অনুসাবে তাদৃশ নিবোধের উপায় এক এক মনুষ্যের চক্ষে এক এক রূপ ।
আবাব উপায় ভেদে মঙ্গলএব তাবতম্য হয় ইহা অগম্যই স্বীকার্য্য ।

ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে আত্ম স্বরূপ দর্শন কবিয়া একাগ্রতাব অভ্যাস
বশে চিত্তকে বৃত্তি শূন্য কবাব নামই নিবোধ । এই আত্মস্বরূপ লোকের
শিক্ষাদি অনুসাবে বিভিন্ন, কেহ বা স্বল্প পঞ্চভৌতিক দেহকেই আত্মা বলিয়া
জানে, কেহ বা ইন্দ্রিয়দিককে আত্মা বলিয়া জানে, কেহ বা অবিদ্যা বা
প্রকৃতিকে আত্মা বলিয়া জানে । আমরা পূর্বে বলিয়াছি চিত্তের একাগ্রতা
সাধনের নিমিত্ত স্থল ভূত হইতে পরমাত্মা অবধি ক্রমে ক্রমে আলম্বন কাবতে
হয় । উহাদেব মন্যে আত্মাই চবম আলম্বনীয়, কিন্তু যাহাদেব ইন্দ্রিয়তে আত্ম-
জ্ঞান আছে, তাহারা ইন্দ্রিয়কে আলম্বন কবিয়া আত্মাকে 'আলম্বন কবিয়াছি
এইরূপ ভ্রমে তাহাতেই সন্তুষ্ট হয় এবং ঐ থান হইতে নিবোধ লাভ কবিতে
থাকে । ঐ সকল যোগীগণ তাদৃশ নিবোধ অবস্থায় শবীর বিনষ্ট হইলে,
ইন্দ্রিয়গতে বিলীন হইয়া ষাট্‌কৌষিক দেহ শূন্য হয়, এইরূপ দেহ শূন্য হয় বলিয়া
তাহাদি কে বিদেহ বলে । ঐরূপ দেহ শূন্য জীবগণই দেব বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

৯ - - - - - ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০

ইহাদিগেব নিবোধ সমাধিব প্রতি অবিন্দ্য অর্থাৎ বাহ্য প্রকৃত আত্মা নহ তাহাকে আত্মা বলিয়া জ্ঞানই—কারণ । কেহ কেহ বলেন ঐক্য দেব ভাব প্রাপ্তি বা প্রকৃতিতে লীন হওয়াই তাহাদেব নিবোধ সমাধিব প্রতি কাবণ, কেননা তাহাদেব ঐক্য অবস্থাই সমাধিব অবস্থা ।

ভাব্যকাব বলেন একুপ নিবোধ প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ নহে, কাবণ বর্ষাকালের অপগম হইলে মণ্ডুক যেমন মৃত্তিকাকাবে পরিণত হইয়া থাকে এবং পুনর্বার নতুন মেঘ হইতে জলসেক প্রাপ্ত হইয়া আবার মণ্ডুকাকৃতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদেহ বা প্রকৃতি লয় যোগীগণ কিছুকাল ঐ বিদেহ এবং প্রকৃতি লয় অবস্থায় থাকিয়া পুনর্বার আবার সংসাবে অবতীর্ণ হয় । বায়ু পুরাণে বলা হইয়াছে—

দশমমন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তান্দ্রিয় চিত্তকাঃ ।

ভৌতিকশচ শতং পুং সহস্রং স্মাতিমানিকাঃ ॥

বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতদ্রব্যঃ ।

পুং শত সহস্রং তৃষ্ঠন্ত্যাবাক্ত চিত্তকাঃ ॥

নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্য কাল সংখ্যা ন বিদ্যতে ।

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়কে আলস্রন করিয়া নিবোধ সমাধি প্রাপ্ত হয়, তাহাদেব ঐ সমাধি দশ মন্তর অবধি থাকিয়া ভঙ্গ প্রাপ্ত হয়, ভূত চিন্তাকাবীরা পূর্ণ এক শত মন্তর অবধি নিবোধ অবস্থায় অবস্থান কবে, এবং অহঙ্কার চিত্তকেরা সহস্র মন্তর অবধি নিবোধ অবস্থায় অবস্থিত হয়, বুদ্ধির চিন্তাকাবীরা দশ সহস্র বৎসর নিবোধ অবস্থায় অবস্থান কবে, আদ্য প্রকৃতি চিত্তকেরা শত সহস্র বৎসর, কিন্তু যে ব্যক্তি নির্গুণ পুরুষকে অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা বশ নিবোধ প্রাপ্ত হয়, তাহাব সে সমাধি অনন্তকালেও ভঙ্গ প্রাপ্ত হয় না । অতএব যে সকল যোগী প্রকৃত মুক্তি লাভ কবিতে উৎসুক, তাহাবা সেই নির্গুণ পুরুষকে অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা অভ্যাস দ্বারা নিবোধ প্রাপ্ত হয়, তাহাদেব নিবোধ প্রাপ্তির উপায় পবে বলা হইতেছে ।

শ্রদ্ধাবীৰ্য্য স্মৃতি সমাধি প্রজ্ঞাপূৰ্ণক ইতরেষাম্ ॥ ২০ ॥

পদচ্ছেদ.—শ্রদ্ধা-বীৰ্য্য স্মৃতি-প্রজ্ঞা-পূৰ্ণক ইতরেষাম্ ।

পদার্থ—শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্রসাদঃ, বীৰ্য্যং উৎসাহঃ, স্মৃতিঃ ধ্যানং, সমাধিঃ একাগ্রতা, প্রজ্ঞা প্রজ্ঞাতব্য বিবেকঃ; এতে শ্রাদদেবঃ পূৰ্ণ উপায়ো যন্ত যঃ শ্রদ্ধাদিপূৰ্ণকঃ ইতরেষাম্ মুমুক্শুণাং যোগিনাম্ ।

অন্থগঃ । ইতদেষাং সমাধিঃ শ্রদ্ধাবীর্যাস্মৃতি সমাধি প্রজ্ঞাপূৰ্ব্বকোভব-
তীতি অন্থগঃ ।

অন্থবাদ । ইতব অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিদেহ এবং প্রকৃতি নয় ভিন্ন য়নুক্ক
যোগীদিগেব অসম্প্রজ্ঞাত যোগ—শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা এই কয়
উপায় দ্বাৰা সাধিত হয় ।

সমালোচনা । পূর্বসূত্রে যে দুই প্রকার যোগের কথা বলা হইল, ঐ দুই
যোগ মুক্তির উপায় নয়, কাৰণ তাহাব মূলভিত্তি ভ্রমেব উপব স্থাপিত স্মৃতবাং
ঐ ভ্রম আজ হউক, কাল হউক, বা ণত সহস্র যুগ পবে হউক, এক সময় অব-
শ্যই নাশ প্রাপ্ত হইবে, ভিত্তিকপ ভ্রম অপগত হইলে যোগও ভঙ্গ হইবে ।
যোগভঙ্গ হইলে ব্যাখান অবস্থা, আবাব বৃত্তির প্রাহুভাৱ, আবাব সংসাবে
প্রত্যাবর্তন । তবে এ স্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যাহাব ঐক্য যোগ ভ্রষ্ট হইয়া
সংসাবে প্রত্যাবর্তন কবে, তাহাবা অগ্ৰাণ্য সংসারী অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়া
আসে এবং অল্প আঘাসেই আবাব তাহাবা প্রকৃত মোক্ষপথেব পথিক হইতে
পাবে । ফল প্রকৃত মোক্ষলাভটী জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সফল
হইবাব উপায় এই সূত্রে বিবৃত হইয়াছে ।

এই সূত্রটীৱ তাৎপৰ্য্য বুঝিতে হইলে শ্রদ্ধা, বীর্য প্রভৃতি শব্দ কয়েকটীৱ
অর্থ হৃদয়ঙ্গম কৰিতে হয় । ‘শ্রদ্ধা’ শব্দেব অর্থ বেদব্যাস বলিয়াছেন, চিত্তেব
সম্যক্ প্রসন্নতা, বাচস্পতি মিশ্র, ইহা ৭ ব্যাখ্যাস্থলে বলেন, “অভিকচিমতী
ইচ্ছা” নামই শ্রদ্ধা, অতিকচি বলিতে ওজ্জ্বল অর্থাৎ সৰ্বগুণেব সম্যক্
প্রাবল্য জন্ত দীপ্ত, তাদৃশ দীপ্তিমতা ইচ্ছা অর্থাৎ সৰ্বপ্রবান অভিনাশেব নামই
শ্রদ্ধা ।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, শ্রদ্ধা শব্দেব অর্থ—প্রীতি । আমাব যোগলাভ হউক,
এই অভিলাষ । ভোজবাজ বলেন, যোগ বিষয়ে চিত্তেব অত্যাশক্তিৱ নামই
শ্রদ্ধা, ইংবাজী অভিক্ত ব্যক্তিদিগকে এক কথায় বুঝাইতে হইলে শ্রদ্ধা শব্দেব
অর্থ ফেণ্ বলিলেই যথেষ্ট হয় । এই শ্রদ্ধা শাস্ত্রাধ্যয়ন, পার্থিবতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ
জন্ত অন্তমান এবং গুরুব উপদেশ হইতে উৎপন্ন হয় । এই শ্রদ্ধা কল্যাণকরী
এবং শ্রদ্ধাকারীকে মাতাব মত সৰ্ব বিপদ হইতে বক্ষা কবে, একবাব যোগেব
উপব শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় আসক্তি হইলে, যোগই আমাব সৰ্বপ্রকাৰে শ্রেয়ঙ্কব
অতএব যেমন কবে হউক, যোগসাধন কবিব এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সহস্র
বাধাবিঘ্নও আব যোগীকে যোগসাধন হইতে বিচলিত কৰিতে পাবে না । কাৰণ

শ্রদ্ধা হইতেই বীৰ্য্য উৎপন্ন হয়। বীৰ্য্য শব্দের অর্থ উৎসাহ অর্থাৎ অতীন্দ্রিত বিষয় লাভের নিমিত্ত প্রবৃত্তি। কোন বিষয়ে শ্রদ্ধা হইলে তাহাব সাধনের নিমিত্ত মনেব যে উৎকট বা হৃদ্যম্য ঔৎসুক্য হয়, তাহাব নামই বীৰ্য্য, বীৰ্য্য শব্দের প্রচলিত অর্থ—শক্তি; স্তব্ধাং শ্রদ্ধা হইলে শ্রেয় বস্তুর সাধন নিমিত্ত আমাদের হৃদয়ে শক্তি বিশেষের সঞ্চার হয়, একপ ব্যাখ্যাও নিতান্ত অসঙ্গত নয়। মনে উক্তরূপ বীৰ্য্য উৎপন্ন হইলে যোগীদিগের স্মৃতি উৎপন্ন হয়; বাচস্পতি মিশ্র এবং বিজ্ঞানভিক্ষু উভয়েই স্মৃতিশব্দের অর্থ—স্মরণ অর্থাৎ চিন্তা কবিয়াছেন; “ভোজবাজ প্রহ্লাদ বলেন, স্মৃতি শব্দেই অর্থ—স্মরণ অর্থাৎ পূর্বানুভূতের চিন্তা; আমবা বলি বাচস্পতি ও বিজ্ঞান-ভিক্ষু-প্রদর্শিত অর্থই ভাল, কেন না কোন এক বিষয়ের সাধন জন্ত আমাদের চিত্ত প্রোৎসাহিত হইলে আমাদের তদ্বিষয় চিন্তা হওয়াই স্বাভাবিক, স্মরণও এক প্রকার চিন্তা বটে, কিন্তু উহা পূর্বানুভব-সাপেক্ষ, চিন্তায় পূর্বানুভব অপেক্ষা কবে না। স্মৃতির পূর্ব চিত্ত অনাকুল অর্থাৎ স্থিৎ হইয়া সমাধিতে নিযুক্ত হয়, সমাধি শব্দের অর্থচিন্তেব একাগ্রতা, অর্থাৎ অন্ত সকল বস্তুকে পবিত্যাগ কবিয়া কেবল একমাত্র ধোয়বস্তুতে সর্ব-প্রকারে চিত্ত সমর্পণ কবাকে সমাধি বলে, এই সমাধি হইতে প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিবেক কি না, ধোয়বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হয়। এই বিবেকের দাবস্বাব অনুশীলন দাবা পবে উহাতেও বিবক্ত হইয়া যোগী নিবালম্ব ধ্যান কালেতে প্রবৃত্ত হয়, এই নিবালম্ব ধ্যানের নাম অসপ্রজ্ঞাত সমাধি।

পাঠক বোধ হয় এই সূত্রেব ব্যাখ্যায়ও জানিতে পারিলেন, যোগী হওয়া কিছু সহ্য নয়, ইচ্ছা কবিলেই চক্ষু মূদ্রিত কবিয়া যোগী হওয়া যাব না। যোগ ভেদে দেখাইবাব জন্ত নয়; মনুষ্যের চরম এবং সমুন্নত উদ্দেশ্য মুক্তিলাভই ইহাব ফল। যে যোগ নানাবিধ আশ্চর্য্য প্রদর্শন কবাইবাব জন্ত অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রকৃত যোগ নয়, এক প্রকার জিমনাষ্টিকেব কস্মলত মাত্র; তাহাব সাধনের নিমিত্ত শ্রদ্ধাদি কিছু আবশ্যিকতা নাহ বটে, কিন্তু বাহা প্রকৃত যোগ, যাহা মোক্ষলাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাব সাধনের নিমিত্ত শ্রদ্ধাদি ভিন্ন আব উপায়ান্তর নাই।

কেহ আশঙ্কা কবিয়াছিল, “তুমি যে যোগাভ্যাসের উপায় বলিলে ইহাও সকলের পক্ষে সমান, শ্রদ্ধা প্রভৃতিও সকলেরই সমান অতএব যোগসিদ্ধিও সকলের এক নিয়মে হওয়া উচিত, কিন্তু কার্যোতে আমবা তাহা দেখিতে পাই না, আমবা দেখি কেহ যাবজ্জীবন যোগের অনুশীলন কবিল, অথচ সিদ্ধিলাভ

হইল না, কাহাবও অনেক বিলম্বে সিদ্ধি হইল, কাহাবও বা “অপেক্ষাকৃত অল্প বিলম্বে সিদ্ধি হইল, আব কাহাবও অতি শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হইল । এইরূপ বৈষম্যের কারণ কি ?” ইহাব উত্তরে মহর্ষি বেদব্যাস যোগাভ্যাসে প্রযুক্ত যোগীদিগের নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবিন্যাস কবিরাজেন । যথা—

তে খলু নব যোগিনো মূঢ়মধ্যাধিমাত্রোপায়া ভবন্তি । তদ্ যথা—মূঢ়-পাযো, মধ্যোপাযো, অধিমাত্রো পায় ইতি । তত্র মূঢ়পাযোহপি ত্রিবিধ — মূঢ়সংবেগো মধ্যসংবেগস্তীত্র সংবেগ ইতি । তথা মধ্যোপায, স্তথাধিমাত্রোপায ইতি ।

সিদ্ধি বিষয়ে এইরূপ বৈলক্ষণ্য হইবার কারণ এই যে প্রতি মনুষ্যের সংস্কার এবং অদৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন, ইহা সৰ্ব্বলোকে স্বীকার্য কবিতা হইতে পারে । সেই অদৃষ্ট এবং সংস্কার প্রভাবে মনুষ্যের যাবৎ কার্যাই ভিন্নরূপ হইয়া থাকে । এক বিদ্যালয়ে, এক সময়ে, এক গুরুব নিকট, এক শ্রেণীতে, একইরূপ এক শত বালক এক বীতি শিক্ষা পাইতেছে, কিন্তু ফল কি হইতেছে ? কেহ বা গুরুব মুখ হইতে নির্গত হইতে না হইতে অর্থ সকল রূদযন্ত্রম কবিতোছে, কেহ বা নিজে উচ্চ আব একাধি দেখিয়াই উচ্চা মধ্যে প্রবেশ কবিতোছে আব কেহ বা গৃহে আসিয়া তদৃশ ক্ষমতাপন্ন অপব এক জন গুরু কড়ক ঐ পাঠই ঘণ্টাধ্বনয় নিযত উদ্ভাবিত কবিতা ও তাহাব ভিতবে প্রবেশ কবিতো না পাবিয়া অধীতকে অনধীতা সমান কবিতোছে । ইহাত প্রাত্যহিক দৃশ্য । যে কারণে অধ্যয়নে এইরূপ বৈষম্য প্রাপ্ত হ , সেই কারণেই বে অধিকাংশ ভেদে শ্রদ্ধাদি উপায়ের বৈষম্য ঘটিবে, “দ্বন্দ্ব কোন সন্দেহই নাই । সেই শ্রদ্ধাদি বৈষম্য হেতুই তোমাব আশঙ্কিত হ ও বৈষম্য ঘটয়া থাকে । শ্রদ্ধাদি উপায়ের বৈষম্য নিবন্ধন আমবা যোগীদিগকে প্রথমত, তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কবিতো পাৰি (১) মূঢ় উপায, (২) মধ্য উপায, (৩) অধিমাত্র উপায । উপায বলিতে পূৰ্ব্বোক্ত শ্রদ্ধা, স্মৃতি প্রভৃতি ; মূঢ় শব্দের অর্থ ম্যাদমেদে (অল্প) ; ঐ শ্রদ্ধাদি যাহাব মূঢ় [অল্প বা ম্যাদমেদে] সেইরূপ যোগীকে মূঢ়পায বলে, ঐ শ্রদ্ধাদি যাহাব মধ্যম বাশির তাহাকে মধ্যোপায বলে, এবং ঐ শ্রদ্ধাদি যাহাব অধিমাত্র অর্থাৎ প্রচুব পরিমাণে উপপন্ন হয়, তাহাকে অধিমাত্রোপায বলে । উপরি উক্ত তিন প্রকাব যোগীৰ মধ্যে প্রত্যেকেই, মূঢ় সংবেগ, মধ্য সংবেগ এবং তাত্র সংবেগ এই তিন প্রকাব । সংবেগ শব্দের অর্থ বাচস্পতি মিশ্রের মতে বৈরাগ্য, তিনি বলেন অদৃষ্ট এবং সংস্কারবশে বৈরা

গোরও মূহুৰ্ভ, মধ্যম এবং তীব্রত্ব হইয়া থাকে । বিজ্ঞান ভিক্স বলেন সংবেগ শব্দের অর্থ সম্যক বেগ অর্থাৎ উপায়ের অনুষ্ঠান বিষয়ে শীঘ্রতা । আমাদের বোধ হয় পূর্বোক্ত অর্থ অপেক্ষা এই অর্থটি এখানে বিশেষ সঙ্গত । কাৰণ বৈবাগ্য শ্রদ্ধাদি উপায়েৰ কাৰ্য্য ; উপায়েৰ মূহুৰ্ভাদিব সঙ্গেই বৈবাগ্যেৰ মূহুৰ্ভাদি আপনা হইতেই হইবে, বিশেষত সংবেগ শব্দে বৈবাগ্য—কোন অভিধান সম্মত অর্থ নয় । উপায়েৰ অনুষ্ঠান বিষয়ে শীঘ্রতা কাহাবও বা অল্প পৰিমাণে কাহাবও বা মধ্য পৰিমাণে এবং কাহাবও বা অধিক পৰিমাণে হইলেও অনুষ্ঠান এবং সংক্ৰান্ত বশে কাহাব উপায় মূহু অর্থাৎ অল্প পৰিমাণে হয়, কাহাব মধ্য পৰিমাণে এবং কাহাবও বা অধিক পৰিমাণে হয় । এই জন্ত মোটেব উপর যোগীদিগেব নযটি ভেদ কল্পিত হইয়াছে । পুণ্ড্রানুপুণ্ড্র কবে ধবিলে অনেক ভেদ হইতে পাবে ।

তাহাদেব একেবাবেই সিদ্ধি হয় না, অথবা তাহাদেব বিলম্বে সিদ্ধি হয়, তাহাদেব বিষয় বলা, না বলা সমান, কাৰণ তাহাতে লোকেব প্রযুক্তি আকৃষ্ট হইবে না, উদ্দেশ্য সিদ্ধিব শীঘ্রতাব দিকেই সকলে উৎসুক । এই নিমিত্ত সূত্রে যে সকল যোগীব শীঘ্র ফললাভ হয়, তাহাদেব বিষয়ই বলিতেছেন,—

অধিমাত্রোপায়ানাং তীব্রসংযোগানাং মাসম্নঃ ॥ ২১ ॥

পদচ্ছেদঃ—অধিমাত্র-উপায়ানাং তীব্র-সংযোগানাং, আসম্নঃ ।

পদার্থঃ—অধিমাত্রঃ অতিশয়ঃ অধিকপৰিমাণ ইতি যাবৎ, উপায়ঃ শ্রদ্ধাদয়ঃ অধিমাত্র উপায়েষাং তে তেষাং, তীব্রঃ অতিশয়ঃ, সংবেগঃ বৈবাগ্যং উপায়ানুষ্ঠানে শীঘ্রতা বা, তীব্রঃ সংবেগো যেষাং তে তেষাং আসম্নঃ সন্নিহিত অনায়াসগম্য ইতি যাবৎ ।

অর্থঃ । অধিমাত্রোপায়ানাং তীব্রসংবেগাং যোগিনাং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বাসম্ন ইতিশেষঃ ।

অনুবাদ । অধিমাত্রোপায় যোগীদিগেব মধ্যে আবার তাহাদেব সংবেগ-বৈবাগ্য বা উপায়ানুষ্ঠান তীব্র (অতিশয় প্রবল), তাহাদেবই শীঘ্র অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হয় ।

সমালোচন । এ সূত্রে আমবা অধিক কিছু বক্তব্য দেখিতেছি না, কারণ সূত্রেব অনুবাদ হইতেই সূত্রেব মন্ত্যর্ধ পাঠকদিগেব সম্যক প্রকাৰে হৃদয়ঙ্গম হইতে পাবে ।

সুন্দরী স্ত্রী ।

সুন্দরী আ জগতেব সাব পদার্থ । লাবণ্যময়ী ললনা যে কি অমূল্য বস্তু তাহা বোধ হয় সৃষ্টিব প্ৰাবল্য কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে স্থিতিরূপে হয় নাই । বমণীব সৌন্দর্য্য যে কি অপূৰ্ণ পদার্থে গঠিত, ললিত লাবণ্য যে কি সুব্রহ্মার কামলতার পরিণামে গঠিত, সৰ্ব্বত্র সুন্দরীর অকবিভ্যাসেব মধুরতা নির্ণয় ব্রহ্মাণ্ডেব যেহি পবনাত্ম সমষ্টিতে নিম্পন্ন, এবং বিধুমুখের মধুর হাসি বিধাতার কি অপবিসীম নিঃস্রাব কোশল, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ, বসন্ত বেহেই বলিতে পারেন না । সুন্দরী বমণী মুক্তি যে কি তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই সৰ্ব্বাপ্ন সুন্দরকপে নির্দেশ করিতে সক্ষম হইবেন নাই, এবং ফিকপ বিচাবেই বা তাহাব সন্তোষজনক ভ্রমশূন্য মীমাংসা লাভ হইবে, সে উপায়ও কেহই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই । কবি-কয়না-প্রস্তুত, জগতেব আদর্শীয় প্রেম-প্রতিমা, সৌন্দর্য্যেব বহুবর্নি স্বরূপ শ্রীমতী বান্ধিকা যে লক্ষ্মাণেব বমণী-সৌন্দর্য্যেব বহু সিংহাসনেব বাজরাজেশ্বরী, তাহা কে স্থিৰ কবিতা বলিবে ? জনব হিত্তি আদর্শ সভা বাল্মীকি-নির্মিতা নিরুপমা চতুর্দশ বয়সী সীতা দেবী, স্বাস্থ্য সভাব মুচনন্দ পবন সঞ্চালিত মৃত্তিমতী বান্ধী, যখন সান্নিধ্যেব বদমালা সমপণ করিলেন, তখন তিনিই চিবদিনেব জগৎ যে সন্তোষজন-সম্মত সৰ্ব্বাপ্ন সুন্দরী বলিয়া বিঘোষিতা হইয়া রহিলেন, এ কথা কে স্থিৰ কবিতা বলিবে ? মহাভারতেব দ্রোপদী, শেক্ষপিয়াবেব ক্লিও-পেট্রা, ভারতচন্দ্রব বিদ্যাবতী, বঙ্কিম বাবর কপালকুণ্ডলা—ইহাবা যে সৰ্ব্বাপ্ন সুন্দরী ছিলেন, এবং সে সৌন্দর্য্য যে বিচাবে সৰ্ব্ববাদিসম্মত, এ কথা কে স্থিৰ কবিতা বলিবে ?

বমণী-সৌন্দর্য্যেব নিবপেক্ষ বিচারক কি মানব-চক্ষু ? মনুষ্য—কি পুরুষ কি স্ত্রী—সকলেবই চক্ষু একই পদার্থে গঠিত, ইহা দেহতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকেবা ভ্রমোভূত প্রকাশ কবিতা গিয়াছেন । পূৰ্ব্বকথিত কয়টি ললনাকে কেহই চক্ষে দেখে নাই, কবির বর্ণনায় তাহাদেব অতুল রূপরাশি এবং নিরুপম সৌন্দর্য্যেব সম্পূর্ণতা লোকে অন্তঃকবণের অভ্যন্তরে অনুমান করিতে পাবে এই মাত্র । দৈবযোগে সেই কবি-বর্ণিত রূপলাবণ্যময়ী ললনাগণ যদি মর্ত্যমহী হইল পৃথিবী অবস্থে এই বঙ্গদেশে লোকেব দ্বাবে দ্বাবে অমুখে

আপনাদেব পরিচয় প্রদান করিয়া কবিব কপালানী নানা কি অসীক এই বিচাবের প্রার্থিনী হইলেন, তাহা হইলে সে বিচাব নিশ্চয় হইতে পাবে কি ?

প্রত্যুত্তর, সন্দেহেব স্থল । প্রথমত আমাদেব কপলগর্ভিতা বঙ্গমহিলাগণ, আপন আপন অঙ্গসৌষ্ঠব ও কপলাবগ্যেব সহিত তুলনা করিয়া, কেহই সেই কবি প্রহত স্বর্গীয় লাবণ্যবতীগণকে আপনা হইতে উচ্চাসন প্রদান কবিত্তে প্রাণান্তেও স্বীকার কবিবেন না । আমাদেব টাক মন্তক-মণী মন্তকেব চক্রাকার তরুণচন্দ্র সম টাকেব শোভাব এতাদৃশ পক্ষপাতিনী যে, তিনি নিশ্চয়ই সহস্র মুখে দ্রোপদীর সীমন্ত-শোভিত আশুলক-লম্বিত নিবিড় কুম্ভ কেশবাবশিষ বিজাতীয় নিন্দা কবিয়া আনন্দ উপভোগ কবিবেন । স্বরূপ-পক্ষপাতিনী বঙ্গ-কোটবাঁক, কুবঙ্গনয়না ক্রিওপেটাব আকর্ষণবিত পটলচেবা নীল গভীর উজ্জ্বলতম নয়নেব তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাতেব নিন্দা নিশ্চয়ই কবিবেন । আমাদেব দম্ভতা সোভাগাবতী, যিনি বিবনে দপণে আপনাব হস্তমুখেব নিবতিশয় শোভা সন্দর্শন চিবদিনই এতাদৃশ বিমোহিত হইয়া বহিয়াছেন এবং তাহাব মৃগ্য এত বুকিয়াছেন যে, সে অনৃতময় হস্ত দান কদাচিত অজ্ঞেব পুংস্প সাধন কবিয়া থাকেন, তিনি ভাবত-বর্ণিত একমাত্র-বাজ ছহিতা বিদ্যাব ঈশ্বাদিকশিত সুবঞ্জিত অপবোদ্ধ-মধ্যস্থিত কুল-বিনিমিত দম্পতিব নিন্দা নিশ্চয়ই করিবেন, এবং সেই মধুব হস্ত উদ্ভাসিত কণিক বক্তাবাবিশিষ্ট স্থল-কমল-সদৃশ নিটোল কপোলে নিশ্চয়ই সজোবে চপেটাঘাত কবিবেন । এই কপে কাপাস বস্ত্র সম স্থগাঙ্গী,—কন্দর্পেব যষ্টি সদৃশ ছিপ্‌ছিপে কীটাক্রান্ত, গাত শাক্ত-বিনীনা কিবা দম্ভভবে পদ শঙ্ককাণ্ডিনী—দ্রুতগামিনী মদমন্দ মধুব গমনেব, এবং উচ্চভাষিনী,—কোকিল কলকণ্ঠবিনিমিত সুমধুর সঙ্গীতময় সুস্ববেব নিন্দা প্রাণ ভরিয়া করিবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই । অতএব এতদ্বিধা প্রতিলক্ষণ হইতেছে যে, রমণীব চক্ষু বমণী রূপেব বিচাবক নহ ।

দ্বিতীয় বাবে, পুরুষেব চক্ষুকে সেই বিচাবকেব স্তম্ভাভিধিক্ত কবিয়া দেখা যাক, সে পবিত্র চক্ষু বমণীসৌন্দর্যেব মথামথ বিচাব কবিত্তে পাবে কি না । দেখা যাইতেছে যে, দেশভেদে রমণীসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে পুরুষেব চক্ষেব বিচাব বিভিন্ন প্রকাব । বঙ্গীয় যুবক, শাবদীয় অথগুমণ্ডল গোলাকৃত পূর্ণশশী সদৃশ রমণী মুখমণ্ডলেব পক্ষপাতী, নারীতে নবীন নীবদ মাশাবং আশুলক-লাসত ঘন কেশবাগব অভিলাবী, সেই কেশ আবাব বিচিত্র বেণী বন্ধনে উজ্জ্বল সুবর্ণ বিমণ্ডিত কবিয়া নীলাস্তোদ ক্রোড়ে বিজ্ঞান ক্রীড়া দেখতে

ভাল বাসেন, তুঙ্গে অলঙ্কৃত গুলিয়া বমণীৰ সৰ্ব্বাঙ্গে চালিতে একান্ত লালাবিত
এবং কজল পূবিত ঈষদ্-ভাসিত চকল নয়নেৰ কন্দৰ্প-দৰ্পহাৰী বাণ সন্ধান
অভিভূত হন। কিন্তু বঙ্গীষ যুবকেব সৰ্ব্বাঙ্গ-সুন্দৰীৰ এত সাধেব সৌন্দৰ্য্য
ইমূৰোপীষ যুবকেব নয়নে নিতান্ত অগ্ৰীতিকব। লম্বাকৃত মুখ, বাজহংস সদৃশ
উচ্চগ্ৰীবা, তুষাব ধবল বৰ্ণ, আগুঠলম্বিত মাত্ৰ তাত্ৰবৰ্ণ আলুলামিত কুঞ্চিত
কেশ, অণুমাত্ৰ লজ্জাবিহীন স্থিৰ কটমটে নয়ন, বৰ্ণবিহীন অধৰোষ্ঠ, শীর্ণ দেহ,
দীৰ্ঘাকৃতি, চকলগামিনীকে তাহাবা সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দৰী বলিয়া থাকেন। চীন,
আবাকান এবং মণিপুৰীযগণ বমণীৰ মুখমণ্ডলে তুলি দিয়া আকা কৃষ্ণ ভ্ৰু যুগল
দেখিলে মুচ্ছিত হযেন, খাদা নাকেব সৌন্দৰ্য্য তাহাবাই বুঝিয়াছেন, বমণীৰ
মুখে তাহাবা উন্নত কিছুই দেখিতে ভাল বাসেন না, কোন বমণীৰ
নাক, চোক, ঠোট, কান, মুখে মিণাইয়া থাকিলেই ইহঁাবা তাহাকে
সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দৰী বলিয়া সেই শীৰ পূজা কবেন। এদিকে আফ্ৰিকাৰ বমণীৰ
বং দতই ঘন কৃষ্ণবৰ্ণ হইবে ততই তিনি পুৰুষেৰ চক্ষে সুন্দৰী বলিয়া প্ৰতিপন্ন
হইবেন, অদৰ্শ বতই স্থল হইবে, ততই তিনি সুন্দৰী বলিয়া পূজিত
হইবেন, দেহ যতই কোমলতা শূন্য এবং বলিষ্ঠ হইবে, গাব চৰ্ম্ম যতই কৰ্শ
হইবে, তাহাব সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰাংশা দেশময় ততই বিঘোষিত হইতে থাকিবে।
এইকপে কোন জাতি বমণীৰ কটিদেশ অনাঘাসে ভাজিতে ইচ্ছা কবেন, কোন
জাতি স্থল শ্ৰেণীৰ এলাস্ত পক্ষপাতী। কেহ কামিনীতে তীব্ৰতেজ দেখিতে ভাল
বাসেন, কেহ বা দীৰ পাশ্চ মুদ্ৰিৰ অলুবাগী। কোন জাতি বিজলি সদৃশ
চকলাব অভিলাষী, কেহ বমণীকে স্থিৰা ধীবা দেখিতে ইচ্ছা কবেন! অতএব
পুৰুষেৰ জাতীয় চক্ষুক ও প্ৰকৃত প্ৰস্তাবে বমণী-সৌন্দৰ্য্যেৰ ভ্ৰম প্ৰমাদ পৰিশূন্য
বিচাবক বলিতে পাবলাম না।

পৰীক্ষাৰ সীমা সংকীৰ্ণ কবিয়া হিন্দু বামাকলেব সুন্দৰী নিৰ্ব্বাচনেৰ ভাব
বঙ্গীষ যুবকেব চক্ষে সমৰ্পণ কৰিলাম। বল দেখি যুবক, সুন্দৰী কে? সীতা
সুন্দৰী কি লক্ষ্মী সুন্দৰী? সাবিত্ৰী কি দময়ন্তী? বাধিকা কি সত্যভামা?
বিদ্যা না কুন্দনলিনী? ছোটকৌ সুন্দৰী না দত্তদেব দামিনী সুন্দৰী? কে
সুন্দৰী? যুবক, সদা-প্ৰফুটিত শিশিৰ-সিক্ত বালঃসূৰ্য্য-বশ্মি-ধৌত মনটাক
সুন্দৰ, কি স্থলকমল-লাঞ্ছিত দীৰ্ঘায়তন, প্ৰকৃত গোলাপী বৰ্ণেৰ চবম উপমা
স্বৰূপ পল্লবিনো সুন্দৰ? যুবক, মলিকা ও মালতীৰ, যোজনগন্ধা ও চামিলীৰ
সৌৰভেৰ কি তাবতম্বা কবিতো পৰ? যদি সে ক্ষমতা থাকে তবেই

ভূমি বামাকুলে তুলনায় সুনন্দী নিকীচন করিতে সক্ষম হইবে, নচেৎ পারিবে না। তবে বললেখি কি গাহাস একমাত্র স্বচক্ষু সহাযে এ অসীম বমণী-রূপ-সাগর নিবৃত্তি নিবর্তিণ্য মন্থন করিয়া সুনন্দী ললনা নিকীচন করিতে বদ্ধ-পারিবে হইয়াছ? তুলনায় সুনন্দী নিকীচন প্রণা তোমাব পক্ষে অতীব জটিল, সে কেবল কপ সাগরে হাবুডু খাওয়া মাত্র।

অথবা তোমাবই পাবত্র রচি, যে সর্বজন-সম্মত তাহাই বা কি প্রকারে বলিব? বমণী যে নিদ্বিষ্ট কপ মাধুরী তোমাব তৃপ্ত সাধনে সক্ষম, হয় ত তাহাই আবার তোমাব অভেদাত্ম্য পবন বজ্র অগ্রীতিকর। যে ললনা সৌন্দ-র্যেব শেষ সীমা প্রদশনে প্রতানবত তোমাব নয়নানন্দ উৎপাদন করিতেছে, যাহাব অতুল রূপবাণী সন্দর্শন-সন্তোষে তোমাব চিব-তৃষাভূব নয়ন ক্ষণমাত্র বাঞ্ছিত হইলে তুমি আশ্রব হইয়া উঠিতেছ, তোমাবই বন্ধু হয় ত তাহাব পাত বাবেক কটাক নিশ্লেপ কাবতেও ক্রক্ষেপ কবেন না। যে সোভাগ্যবতাকে তুমি নিদোষ সুনন্দী বলিয়া সর্বজন সমক্ষে ঘোষণা করিতেছ, হয় ত তোমাবই পবন বন্ধু তাহাকেই কুংসত এবং কদর্য বলিয়া নিন্দা পরিতোচন,—অথচ তোমাব বন্ধু সহিত অগ্র কোন বিষয়েই তোমার মতভেদ নাই। অতএব এহ দুভাণা বঙ্গদগে ছই জন বঙ্গ যুবক একমতে এহ সাগর এম বঙ্গললনা কুল হইতে একটা মাত্র সুনন্দী স্ত্রী বাচ্ছিয়া দিতে অক্ষম,—অথচ সকল যুবকেব চক্ষু একই উপাদানে গঠিত।

যুবক! এক মাত্র তোমাবই চক্ষুকে এ বিচাব কার্যে বরণ কবিতো সাহস হয় না। কেন না তোমাব চক্ষু তোমাবই বিশ্বাসেব পাত্র নহে। তোমাবই চক্ষু তোমাকেই প্রতানয়ত প্রতাবিত কবিতেছে। আজ যাহাতে তোমাব চক্ষু জগতেব অদ্বিতীয় এক মাত্র পবমা সুনন্দী বলিয়া অকপট হৃদয়ে অসন্দ্বিগ্ধচিত্তে লোক সমক্ষে জ্ঞাপন কবিতেছে, কাল আবার সেই তোমাবই চক্ষু তাহাকে সে উচ্চাসন হইতে সজোরে ভূমিতে নিপতিত কবিয়া তাহাতে অগ্র এক মুক্তি স্থাপন কবিয়া তাহাবই পূজা কবিতেছে। একাদিক্রমে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনববত অনগ্রমনে যে অঙ্গনাব অতুল রূপবাণী প্রতিনিযত নিদীক্ষণ কবিয়া তন্ন তন্ন বিচারিবে সূদৃঢ়কণে অটল এবং অভ্রান্তভাবে নিদোষ এবং নিখুঁত সুনন্দী বলিয়া স্থিৱীকৃত করিয়া বাধিয়াছে, ইঠাৎ অগ্র এক স্ত্রী মুক্তি ক্ষণমাত্র বিজলিব ত্রায় তোমার নয়ন পথে পতিত হইয়া তোমাব সে সমস্ত দৃঢ় সংসারকে এককালে ভগ্নী হুত

কবিষা দিতেছে। আবার দেখিতেছি সেই দ্বিতীয় মূর্তির কর্ণধেব জায় সম্মুখে বাখিষা প্রতিনিষত তোমাব সেই একমাত্র বিচার-সম্বল চক্ষুকে নিয়ুক্ত কবিষা যেমন এইবার অন্ত্রান্ত বিচাবে সৌন্দর্য্যে চরমদীপা নিষ্কাষণ কবিষা স্পষ্টায় ক্ষীত হইতেছে, অমনি এক তৃতীয় মূর্তির আবির্ভাব হইতেছে। অতএব সেই একমাত্র অবিখ্যাসী চিব-প্রভাবক চক্ষের সম্ভাবতায় বমণী জগতে সুন্দরী নিষ্কাচনৈব এতাদৃশ অবাবস্থিত মীমাংসা কি প্রকারে অন্ত্রান্ত বলিষা স্বীকার কবির?

যুবক! এই বহুস্তভেদে বহুবান্ হও। প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষের চক্ষুই। স্ত্রী-সৌন্দর্য্যের বিচাবক, কিন্তু প্রণয়-নিষোধিত চক্ষু ভিন্ন অস্ত্র চক্ষের সে কার্য্য সাধন করা উচিত। প্রণয়ী চক্ষুই স্ত্রী-সৌন্দর্য্যের সার মন্ত্রগ্রাহী। প্রণয়ী নয়নই প্রিয়তমা সর্দঙ্গ-সুন্দরী। যে যাহাকে ভাল বাসে, সেই তাহার সুন্দরী, সেই তাহার স্বর্গীয় লাবণ্যময়ী, সেই তাহার সার বহু। জগতের যাবতীয় লোকের চক্ষে সে বমণী কদাকার এবং কদর্যা প্রতিপন্ন হোক, প্রণয়ী চক্ষে সেই একমাত্র পরমাসুন্দরী, একমাত্র নয়নানন্দ প্রদায়িনী এবং পাণ্ডিত্য স্বরূপ সেই একমাত্র অমৃতময় আকর স্তম্ভ। প্রণয়ী যে চক্ষে আপন প্রিয়তমাকে সন্দর্শন করেন, জগতের যাবতীয় অস্ত্র লোক সে পাবিত্র চক্ষু-বিহীন। ভালবাসার চক্ষু বতঃসংপদ। সে পবিত্র পদার্থ প্রাণীর সৌভাগ্য-সঞ্চিত, অশ্রুত উদ্ভব। প্রাণীর সে স্তম্ভ স্বর্গীয়, দেব হৃদয় উৎপন্ন এবং পবিত্র সঙ্গীতময়। ভালবাসনের অদৃষ্টই সেই স্তম্ভ বিবিনিদ্রিষ্ট।

বক্ষ্য যুবক, অকপট চিত্তে বল দেখি, যাহাকে তুমি ভাল বাসিয়াছ, যাহাকে তুমি ভালবাসার পবিত্র চক্ষে অবলোকন করিয়াছ, সেই তোমার সর্দঙ্গসুন্দরী কি না? তোমার হৃদয়াকর্ষণে সেই পূর্ণশরী কি না? ভাষিয়া দেও দেখি, সেই মঙ্গলময় পবিত্র মূর্তির বিমল জ্যোতিষ প্রভাবে তুমি সমস্ত জগত জোৎস্নাময় দেখিতেছ কি না? তাহাকে ভাল বাস বলিষাই তুমি পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীকে ভালবাস কি না? সেই বিশ্বমুখের সুমধুর ভাস্কর তোমার সমস্ত মঙ্গলের কারণ কি না? কে তোমাকে জগতের ত্রিহকব কার্য্য প্রবৃত্ত করায়? অসাধ্য সাধনে কে তোমার হৃদয়ে বলের সঞ্চার করে? কাব উৎসাহে তুমি বিশ্বমুখ হইয়া নৈরাশ্রের হৃদয় শেলকে পুনঃ পুনঃ হৃদয় হইতে উৎপাটন করিতে সক্ষম হও? হৃদ্যাঙ্গা বঙ্গদেশে, এই অধীনতার চিব-নিবাস মাতৃভূমিতে, কুক্কুরের বৃদ্ধ দাসের আবেদন হইয়া উদয়াস্ত গাধার

খাটুনি খাটুয়া, উৎসাহেব পদাভ্যন্ত শিবোত্ত্বরণ কবিতা, মুষ্টিমাত্র তুলা ভক্ষণ
তুমি কাব জন্ম জীবন ধারণ কর ? যুবক, এখন একবার তোমার জন্ম-
মন্দিরেব সেই অবিষ্টাঙ্গী দেবীর সহিত বহিজগতেব সমস্ত রূপবিশিষ্ট তুলনা
কবিতা বল দেখি, তোমারই প্রিয়তমা সর্বাঙ্গসুন্দরী কি না ? মানসাক্ষে কবি-
কল্পিত সুন্দরী ললনাগণকে মুষ্টিমতী কবিতা অনিমেষ লোচন অনন্তমনে
নিরীক্ষণ কর, জগতেব জীবিত যাবতীয় যে বিদগ্ধগণকে দিব্য চক্ষে প্রতিনিয়ত
অনলোকন কর, কবিতা বল দেখি, তোমারই প্রণয়-প্রতিমা এ জগতে একমাত্র
‘সুন্দরী’ কি না ?

ভানবাস’ পাণ্ডিৰ পদার্থ নহে, স্বর্গেব কমলা বহু । নিঃস্বার্থ ভাল-
বাসা যাহাব জন্মে সন্ধানিত হইয়াছে, জগতে তিনিই সৌভাগ্যবান ।
সর্বাঙ্গী শিবই একবার নিঃস্বার্থ ভাল বাসিয়াছিলেন । বঙ্গীয় যুব-
কেব অদৃষ্ট প্রসাদাৎ ভাবতেব অপূৰ্ণ কোশলময় ধর্মবিবাহে সেই
ভানবাসা নিহত বাহিয়াছে । হিন্দু সংস্রাবশ্রমে ধর্মের অভাবনীত
কাবণ স্বত্রে সেই অমৃতময় ভানবাসাব বীজ বঙ্গীয় যুবকেব বক্ষ-
স্থলে নিহিত বাহিয়াছে । সেই জন্মই বঙ্গীয় যুবক সহধর্মিনীকে নিবতিষ্য
ভাল বাসেন । সেই জন্মই বাঙ্গালি নরনে স্ত্রীই সুন্দরী । অতএব যুবক,
কেহ স্মরাইলে নিভয়ে বলিও—‘আমার স্ত্রীই সুন্দরী ।’

তৈমুর সংহিতা ।

তৈমুরেব নাম ইতিহাসজ্ঞ পাঠকেব অবিদিত নাই । পাঠানবাজ মহম্মদ
তগলকেব বাজত্বকালে তৈমুর ভাবতবর্ষ আক্রমণ করেন । সে আক্রমণ-
কাহিনী ভাবতেব ইতিহাসে শোণিতাক্রমে বর্ণিত বাহিয়াছে । ইতিহাসে
যেখানে পাই যে, এই আক্রমণ সময়ে তৈমুর, দয়া, ধর্ম বা শ্রাঘবতাব পরি-
চয় দেন নাই । তিনি পাবস্ত, তাভাব, সাইবিরিয়া লুণ্ঠনপূর্বক কাবুল দিয়া
ভাবতবর্ষে উপস্থিত হন । তাহাব পৌত্র পীব মহম্মদ মুলতান আক্রমণ করেন ।
শতরূপ তটে এই দুই দল সৈন্ত একত্র হইয়া পথবর্তী দেশসমূহ লুণ্ঠন কবিত

করিতে দিল্লীর নিকাটে উপস্থিত হয়। দিল্লীধ্বংস গুজবাটে শলাঘন করেন। দিল্লী অধিকৃত, বিলুপ্তিত ও দন্ধ হয়। অধিবাসীগণ তরবারের মুখে সমর্পিত হইতে থাকে। যে মোগলের শাসনমহিমায় “দিল্লীধ্বংস বা জগদীধ্বংস বা” ধ্বনি সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, বহুপূর্বে সেই মোগলগণই তৈমুরের অধীনে সজ্জিত হইয়া ভাবতবর্ষের এইকপ ছন্দশা ঘটায়, কিন্তু তৈমুর নিজ বাজ্যের স্বশাসন ও বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নে উদাসীন থাকেন নাই। তৎ-প্রণীত সংহিতা সংগৃহীত ও ইংবেজীতে অনুবাদিত হইয়াছে। এই সংহিতায় তৈমুরের সদাশয়তা, শাসনশৃঙ্খলা ও দয়া দাক্ষিণ্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসপাঠে এক সময়ে বাহাকে মুক্তিমান কালান্তক যমের ভ্রাতা বোধ হয়, ঐ সংহিতাপাঠে তাহাকেই আবাব শাস্ত, দাস্ত ও মধুরপ্রকৃতি বলিয়া প্রভাত হইতে থাকে। তাহার সংহিতা তদীয় কবালসংস্কার মূর্তির পরিবর্তে অনুপম সৌম্যপ্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে। আমরা এই সংহিতায় তৈমুরের প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পাই। আমরা ক্রমশঃ তৈমুর সংহিতার পরিচয় দিব। শেষে এই সংহিতা অবশেষে কবিগাই তৈমুরের চবিত্র সমালোচনা করা যাইবে।

তৈমুর সৈন্যদিগের সম্বন্ধে এইকপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদীয় ব্যবস্থার বঙ্গানুবাদ এইকপ —

“আমি নিয়ম করিয়াছি যে, প্রত্যেক যোদ্ধা স্বজীবিকাবের কোন অনিষ্ট করা হইবে না। যে সৈনিকপুরুষ যোদ্ধা হইয়াছে তাহার কশ বা পোতন হইতে তাহাকে বিচ্যুত করা হইবে না। যে সকল সৈনিক যোগ্যতানুসারে সম্মান ও পারিতোষিক পাইয়া থাকে, তাহাদের কার্যের কোনকপ বিকল-চরণ করা হইবে না। যদি কোন যোদ্ধা আপনাব পারিতোষিক হইতে গোপনে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহা অবিচার বলিয়া গণ্য হইবে।”

“যে সকল সামন্ত, মন্ত্রী, যোদ্ধা আপনাদের কার্যকারণের দ্বারা আমার সাম্রাজ্য সম্পত্তির উপর স্বত্ব হাপন করিয়াছেন, তাহাদের পরাক্রম বিপক্ষদল পরাজিত হইয়াছে,—বাজ্য অবিকৃত হইয়াছে, তাহাদের যুদ্ধে আপনাদের সাহসের পরিচয় দিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের স্বজীবিকাবের প্রতি বিশেষ-রূপে দৃষ্টি রাখা যাইবে, এবং তাহাদের কার্যের সমুচিত মূল্য প্রদান করা যাইবে।

‘যুদ্ধ যোদ্ধাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত হইবে। তাহারা যে

পৰামৰ্শ দেন তাহা মনোযোগেব সহিত শুনা যাইবে। যেহেতু তাহারা আপ-
নাদের বহুদৰ্শিতাবলে ঐক্লপ পৰামৰ্শ দিয়া থাকেন। তাহারা আমার সাত্ৰা-
জ্যেব ভূষণস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাহাদের যত্নের পব তদীয় সন্তা-
নেবা তাহাদের কার্য ও ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

“যে সকল বিপক্ষসৈন্য সমবে বন্দী হয়, তাহাদিগকে বধ করা হইবে না।
যদি তাহারা আমাব অধীনে কার্য কবিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে
যথোপযুক্ত কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে, নাচং তাহাদিগকে বন্দিত্ব হইতে বিমুক্ত
করা যাইবে। এইরূপে আমি এক সময়ে চারি হাজার তুর্ককে বিমুক্ত
করিয়াছি।

‘আমি আদেশ দিয়াছি যে, যে সকল সৈন্য আপনাদের কর্তব্য যথাবীতি
সম্পাদন কবিয়াছে, তাহারা আমাব শত্রুপক্ষের পার্শ্বে থাকিয়া আপনাদের
সাহস দেখাইয়াছে, তাহারা যদি ইচ্ছা কবিয়া, অথবা প্রয়োজন বুঝিয়া
আমাব আশ্রয় প্রার্থনা কবে, তাহা হইলে তাহাদের উপব বিশ্বাস স্থাপন
করিয়া তাহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান ও আদব প্রদর্শিত হইবে। কাবণ,
তাংরা তাহাদের পূর্ প্রভু কার্য যথাবীতি সম্পাদন কবিয়াছিল, এবং সেই
প্রভু প্রতি যথোচিত বিশ্বস্ততা দেখাইয়াছিল।

“আমি এইরূপে শেব বহবাম নামক এক জন সৈনিকপুরুষকে পুৰস্কৃত
কবিয়াছি। এই সৈনিকপুরুষ আমীব হোসেনেব সহিত আমাব বিপক্ষে যুদ্ধ
কবিয়া অসাধাবণ সাহসে সকলকে বিস্মিত কবিয়াছিল। যখন তিনি প্রয়ো-
জন বশত পলাইয়া আমাব আশ্রয় প্রার্থনা কবেন, তখন আমি যথোচিত
সম্মানেব সহিত তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছি।

“মোংজোলী-বুবা নামক এক জন বীরপুরুষ বাল্খেন যুদ্ধে সৈন্যগণেব সহিত
আমাব বিরুদ্ধে অগ্রসব হযেন। যুদ্ধ আবন্ত হইবাব পূর্বে আমি তাহার
নিকটে আমাব পক্ষ অবলম্বনেব প্রস্তাব কবি; কিন্তু তিনি তগলক তৈমূব
খাঁব সম্বন্ধে তাহাব কর্তব্য বিস্মৃত হন নাই। তাঁহাব আদেশে তদীয় সৈন্যদল
যুদ্ধাথ প্রস্তুত হয়। তিনি যথোচিত সাহস ও বীরতার সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে
পবাজিত হন।

“কিন্তু উক্ত সৈনিকপ্রধান যখন অবশেষে ইচ্ছাপূর্বক আমার ক্ষমতার
নিকট অবনতমস্তক হন, তখন আমি তাঁহাকে একটা উচ্চ কর্মে নিযুক্ত করি,
এবং আমার বিশেষ অঙ্গুগৃহীত কর্মচারীদিগেব শ্রেণীভুক্ত কবি। আমি সকল

সময় তাঁহাব সংকাষ্য, সন্নাচারেব প্রশংসা করিয়াছি । আমি তাঁহার প্রতি একপ অমুগ্রহ দেখাইয়াছি যে, যদি তাঁহার হৃদয়ে কোনরূপ বিবেচ্য ভাব থাকে, তাহা হইলে উহা ঐরূপ অমুগ্রহ প্রদর্শনে সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ।

ক্রমশঃ—

যামিনী ।

১ম অধ্যায় ।

যামিনীব পিতা কলিকাতায় চাকরী কবিতেন । যামিনী একমাত্র কন্যা স্তব্ধ অতি আদবে লালিতা পালিতা হইত । তাহাব মাতাব নাম দেব দাসী তিনি চলিত বকম লেখা পড়া জানিতেন—স্তব্ধাং যামিনীকে লেখা পড়া শিখাইতে তাঁহাব বেশ যত্ন ছিল ।

যামিনীব পিতা হিন্দু কি ব্রাহ্ম ছিলেন তাহা কেহ জানিত না, তবে দেশেব যাবতীয সং কার্য্যে তাহাব বিলক্ষণ সহানুভূতি ছিল । তিনি যদিও সমাজে যাইতেন না এবং দেশে তাঁহাব বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবাদি পূজা হইত না—তথাপি ব্রাহ্ম সমাজে দান কবিতেন, এবং অনাথা হিন্দু বিধবাকে তীর্থাদি দর্শন কবিবাব জন্ত যথাসাধ্য সাহায্য কবিতেন ।

স্ত্রী কন্যাকে জামা পাত্ৰকা ব্যবহাব কবিতে দিতেন এবং বিশেষ বন্ধ লোকেব সহিত আলাপ আপ্যায়িত কবিতেও দিতেন । খবচ পত্ৰ চাল চলন সকলই তাঁহাব আধুনিক উচু দবেব ভদ্রলোকেব স্থায় ছিল স্তব্ধাং—বাহা উপাৰ্জন কবিতেন, প্রায় সকলই বায় হইত । যামিনী পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হইতেই স্কুলে যাইয়া বীতিমত লেখা পড়া শিখিত ।

“এই সময়ে বামরুক্ষ নামে একটী দশ বৎসর বয়সের পিতৃ মাতৃ হীন বালক তাঁহাদের বাসায় থাকিয়া লেখা পড়া করিত । দেব দাসী তাহাকে পুত্রের স্থায় ভাল বাসিতেন, যামিনীও তাহাকে বড় ভাল বাসিত ।

২য় অধ্যায় ।

যামিনী ও রামকৃষ্ণ উভয়েই বড় হইল। এখন যামিনীর বয়স ১৪ বৎসব। আর রামকৃষ্ণ ১৮ বৎসবেব হইয়াছে। উভয়ের প্রতি উভয়েরই ভাল বাসা,—ভাল বাসাব প্রায় শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে।

এখন ছই জন একত্র হইলে উভয়েই শঙ্কিত হইয়া ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ কবে। অথচ ভয় বা শঙ্কাজনক কোন কাজই তাহাবা কবিতেনা।

যামিনী বড় চতুৰা—এক দিন সে শয়ন কবিয়া আছে, সেই ঘরে দৈবাৎ অগ্র কার্যে রামকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সে যামিনীকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। যামিনী তাহাকে হাসিয়া বলিল “তুমি কি আমাকে দেখিয়া এখন ডবাও ?” রাম বলিল—“চুপ কব”—কেহ ভনিবে।”

যামিনী ধীবে ধীবে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে রামকৃষ্ণের হাত ধরিয়া বলিল—
“তুমি আজ অধু অধু এত ভয় কবিতেনে কেন—আমায় বলিতে হইবে ?”

রামকৃষ্ণ বলিল—“বোধ হয় আর একটু বড় হইলে তুমিও আমায় দেখিয়া ডবাইবে।”

যামিনী “বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি—তা ডব ভয় কি—তবে হঠাৎ নির্জনে তোমাকে দেখিলে আমার একটু একটু গা কাঁপে—ইচ্ছা হয়”—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

রামকৃষ্ণ বলিল—“কি ইচ্ছা হয়, যামিনী।”

যামিনী বলিল—“তোমাব ঐ কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি বেশ করিয়া পবিষ্কাব কবিয়া দি।”

রামকৃষ্ণ সাহস পাইয়া বলিল “আমারও ইচ্ছা হয়—তোমার ঐ সীঁথায় খানিক সীঁছর পরাইয়া দিই।”

এই সময়ে কাহার পদ শব্দ হইল, উভয়ে ভয়ে ও নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইল।

৩য় অধ্যায় ।

দেব-দাসী—সকল কথোপকথনই শুনিয়াছিলেন—আকারে প্রকারেও বুঝিয়া ছিলেন—যামিনী রামকৃষ্ণকে ভাল বাসে, আর এখন তাহার বিবাহেবও বয়স হইয়াছে—তাই সকল কথা স্বামীব নিকট খুলিয়া বলিয়া অনুমোদন করিলেন—“রামের সঙ্গে যামিনীর বিবাহ দাও ?”

তাহাব স্বামী হাসিয়া বলিলেন “কি বিবেচনায় এ কথা বলিতেছ ?”

“কেন দোষ কি ?”

“অনেক দোষ ?”

“কি দোষ ?”

“আমবা ব্রাহ্মণ, বাম শূদ্র ।”

“তা দোষ কি ? না হয় দেশে যাব না ।”

“দেশে না গিয়া চলিতে পাবে, সমাজ ছাড়িতে পাবি না ।”

“অন্ত সমাজ ত আছে ?”

“যদি একটা সমাজ ছাড়িয়া আব একটা ধবিত্তে হইল, তবে যেটা আছে সেই ত ভাল ?”

“তবে ত বামের সঙ্গে বিবাহ হইবে না ?”

“না হোক—সমাজে অনেক ভাল ছেলে আছে ?”

“বামকে যে যামিনী ভাল বাসে ?”

“ওটি ভাল বাসা নহে-পিপাসা ?”

“পিপাসা কিরূপ ?”

“বয়স হইয়াছে—এ সেই বয়সেব ভাল বাসা, এখন তাডাটাডি সুপায় বিবাহ দিলেই আবাব তাহাকেই ভাল বাসিবে ।”

“ভূমিহীন বলিয়া ছিলে হিন্দুসমাজ ভাল নহে ।”

“হঁ, কোন কোন অংশে ভাল নহে, কিন্তু তুলনায়—অগ্রান্ত সমাজ থেকে ভাল ।”

“আমি ত দেখিতেছি ইহাতে দোষই অনেক, স্ত্রী স্বাধীনতা নাই । কথায় কথায় জাতি যায় । অসবর্ণে বিবাহ নাই । বিধবা বিবাহ নাই ।”

“কিন্তু সেগুলি ভাল কি মন্দ তা ভূমি জান না—স্ত্রী স্বাধীনতায় সমাজ উৎশৃঙ্খল হয়, কলিকাতায় ও ইউরোপাদিব দৈনিক পুলিশ কোর্টের তত্ত্ব রাখিলে বৃষ্টিতে পাবিতে । জাতি সম্বন্ধে হিন্দুরা অহুদার, তবে উদ্দেশ্য ভাল পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যবক্ষা হিন্দু ধর্ম্মের বলিয়াই এসকল বিষয়ে এতটা আঁটা আঁটা । অসবর্ণ বিবাহে জাতীয় প্রকৃতি আকৃতি, জাতীয় প্রতিভা, জাতীয় মহত্ত্ব ধ্বংস পায় । বিধবা বিবাহেও সেইরূপ পতি ভক্তি, স্নেহ ও পবিত্রতা ধ্বংস পায় এবং বিবাহ একটা ইঞ্জিব সেবনের ব্যবসা হইয়া দাঁড়ায় । বাবাকনায় আব বহুবায় পরিণীতা রমণীতে কিছুই প্রভেদ থাকে না ।—

দেব-দাসী হাসিয়া বলিলেন—“তর্কালঙ্কার মহাশয় আমি হারি মানিলাম, এখন যেখানেই হোক শীঘ্র বিবাহটা দেওয়া চাই ?”

তাহাব স্বামী বলিলেন—“এবার পূজার সময় বাড়ী বাইরাই বিবাহ দেওয়া যাইবে।”

“বামরুক্ষ কি কবি ?”

“একটা চাকবীর স্তম্ভধা কবিযাছি, তাই কবিবে।”

“কত পাইবে ?”

“৩০ টাকা।”

* * * * *

কয় দিন পরে বামরুক্ষ চাকবীরে নিযুক্ত হইল—এবং স্থানান্তরে থাকিবার স্থান নির্দেশ করিল।

৪র্থ অধ্যায়।

বামরুক্ষ আজি চাপি বৎসর যাবৎ চাকবীর কবিতোছেন,—এ অনুরোধের চাকবীর তাই টিকিয়া বহিষ'ছেন। সদাগর আপিসেব বড় বাবু'র বিশেষ অনুরোধ, সেই অনুরোধেই বামরুক্ষের সাহস এবং কর্তব্য কাজে তাচ্ছিল্য।

বামরুক্ষ বাবু সর্বদাই অগ্র মনস্ক। আপিসেব কাজ তাড়াতাড়ি একরূপ নিঃশেষ করিয়া—কাগজ ও পেনশীল লইয়া আপনাব লেখা লেখেন—লোকে দেখিয়া বিস্মিত হয় আৰ মনে মনে ভাবে, হয় এমন চিন্তাশীল—এমন—পণ্ডিত এমন কবি, সে কেন কেবাণীগিবি কবিয়া জীবন ক্ষয় কবিবে !

বামরুক্ষ অনেকের মুখে অনেক সময় এ কথা শুনিতে পান—কেহ সব-লাভঃকরণে তাঁহাব কবিতাব প্রশংসা কবে—কেহ ঠাট্টা কবিয়া বলে—কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন—যথার্থই তিনি একজন প্রধান শ্রেণীর কবি,—কেরাণীগিবি রূপ সামান্য ব্যবসা তাঁহাব স্পর্শে সম্মানিত হইতেছে।

তাঁহাব মনে মনে সাহস হইয়াছে, তাঁহার কবিতা বঙ্গভাষার রত্ন স্বরূপ হইবে, এক দিন তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে কালিদাস বলিয়া গণ্য হইবেন—বাঙ্গালী আদর করিয়া তাঁহার কবিতা বহি কিনিয়া পড়িবে—তাঁহার মৃত্যু হইলে দেশের লোকে তাঁহার প্রস্তর মূর্তি গঠন করিবে স্মরণ্য তিনি কেন সামান্য কেরাণীব কাজে তাঁহাব অমূল্য সময় ক্ষেপণ করিবেন ?

বড় বাবু কাজে বিলম্ব তাড়াতাড় দেখিয়া মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণকে তিরস্কাব করেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলেন—“মহাশয় বেতন ৩ ত্রিশ—কত খাটা যায়।” আর বড় বাবু যদি বলেন—“এ ভাবে কাজ চলিলে এ ত্রিশও যে রাখা দায় হইবে”—তখন তিনি মুখ গভীর কবিতা বলেন “২৪ ঘণ্টা খাটিয়া একটা কবিতা লিখিলে ১০ টাকাত তার দাম হইবে?”—বড় বাবু স্থগার ভাবে হাসিয়া চলিয়া যান।

রামকৃষ্ণ আপিসেব কাজ “যেন তেন প্রকারেণ” নির্বাহ কবিতা—একদিন কবিতা লিখিতে বসিয়াছেন, এমন সময় ডাক হরকণা একখানি পত্র আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি কবিতার পদ পূরণ কবিতা চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলেন। চিঠিব বিবরণ এই—

প্রিয় রামকৃষ্ণ বাবু!

পিতার মৃত্যুর পবনকে আমার ক^{ইবে} বাখিয়া^{নাম}। কিন্তু আমিও এখন বিধবা। মাও আমি উভয়েই বড় কষ্টে আছি, ইচ্ছা^{নাম} যে, তোমাকে একবার দেখি—আর তুমিও একবার স্বচক্ষে দেখিয়া যাও, আমবা কি দুর্দশায় পতিত হইয়াছি। তিন মাস হইল, আমবা তোমাব কোন পত্র পাই নাই সুতরাং শীঘ্র পত্রোত্তর দিয়া নিশ্চিন্ত করিবে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী

শ্রীযামিনী দেবী।

“বড় বড় কবিতা এবং দার্শনিকেরা অতি মহৎ, তাঁহাদের প্রাণ অতি উচ্চ তাঁহাবা অতি উদার—তাঁহাবা পর হুঃখে অতি কাতব”—রামকৃষ্ণের এই কয়টা কথা শুনা ছিল, অথবা তিনিও সেই শ্রৌীব একজন উদার লোক হইবেন—কেন না ঐ চিঠিখানি পাইয়া তখনই হই খানী চিঠি লিখিলেন ও মনি অর্ডর কবিতা ৫০ টাকা পাঠাইলেন।

১ম পত্র।

যামিনী!

হার! তোমার পত্র পাইয়া প্রাণ অস্থির হইল—আর তোমাদেব বিপদের কথা পড়িয়া এক প্রকার মুচ্ছিত হইয়াই পড়িয়াছিলাম—যাহা হউক সকলই বিধিব বিধান—চিন্তা করিও না, আমি জীবিত থাকিতে কষ্ট পাইবে না। মা ও তুমি যত শীঘ্র পার এইখানে চলিয়া আসিবে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

রাম।

২৪ পৃষ্ঠা

“মাতঃ, পত্রে অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না, আমার সময় অমূল্য, অল্প । দেশে থাকিয়া কষ্ট পাইবেন না । আমি আপনাব জ্ঞাত বাড়ী ভাড়া কবিলাম, যামিনীকে লইয়া আনিবেন---খবচ ৫০ টাকা পাঠাইলাম । কবে বওনা হইবেন, অগ্রে জানাইবেন ।

সেবক শ্রীবামকৃষ্ণ দাসজ্ঞ ।

৫ম অধ্যায় ।

দেব দাসী পত্র ৭ টাকা পাইয়া যামিনীকে বলিলেন—“তোমার পিতা আমাদের ভরণপোষণ জ্ঞাত কিছুই বাখিয়া যান নাই । তোমাকেও এমন ঘবে বিবাহ দিয়াছিলেন যে, এখন অল্পাভাবে ভিক্ষা কবিতে হইবে—এই কয় মাসে অনাহারে মৃতকল্প হইয়াছ, কলিকাতা যাই, বামকৃষ্ণ আমাদের মায়া মমতা ত্যাগ কবিতে পারিবেন না ; বিশেষ সেখানে তোমার পিতার অনেক বন্ধু আছেন, আমরা বোধ হয় অনাহারে মরিব না ।”

যামিনী বুদ্ধিমতী হইলেও, বিপদে এবং অল্পকষ্টে মাতার পরামর্শ ভাল কি মন্দ বুঝিতে পারিলেন না । বলিলেন, “মা, তুমি যদি যাও, তবে আমি আব কাব কাছে থাকিব—উচিত হউক, অসুচিত হউক, আমিও যাইব ।”

দেব দাসী বলিলে—“যাওয়াই স্থিৰ । দেখ আমবা দুঃখিনী, আমাদের এ সংসারে কেহ নাই—বাসকৃষ্ণেবও কেহ নাই, তাহাকে সন্তানের মত পালন কবিয়াছি । আহা ! যদি তোমার পিতা আমাব কথা শুনিতেন, তাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতেন, তবে আর এ দুঃখ হইবে কেন ?”

মায়ের কথা শুনিয়া যামিনীর চক্ষে জলধাবা বহিল—তিনি বলিলেন—“মা দুঃখে ও দারিদ্রেই লোকের জাতি যায়, ধর্ম যায়, ধর্মের জ্ঞাত এ জগতে কটা লোক জাতি ও সমাজ ও স্বদেশ ছাড়িতে পারে—বাবা যখন ছিলেন, তখন দুঃখ-দারিদ্র ছিল না, তাই তিনি তোমার কথা শুনেন নাই—তিনি ভালই কবিয়াছিলেন, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ ।”

দেব দাসী বলিলেন, “তা ঠিক । আমিও দুঃখ আর সহিতে না পারিয়াই কলিকাতা যাওয়া স্থিৰ কবিয়াছি ।”

যামিনীর মাতা যাওয়ার দিন স্থির কবিতা কলিকাতায় পত্র লিখিয়া ছিলেন, এবং যথা সময়ে কলিকাতা বওনা হইলেন ।

যামিনী কিছুই প্রতিবাদ কবিলেন না, নীচবে মায়ের সঙ্গে কলিকাতা চলিলেন ।

৩ষ্ঠ অধ্যায় ।

প্রাতঃকাল বেলওষে ষ্টেশনে এখনও গাড়ি আসে নাই । আশ্রয় স্বজনকে গ্রহণ কবিরাজ জন্ত ক্রমে ছুটি একটা লোক ষ্টেশনঘরে কেবল আসিতে আবন্ত কবিতাছে । পুলিশমান এক আধ জন অসতর্কভাবে এখানে ওখানে দাঁড়াইয়া বহিয়াছে ।

ঠিক এই সময়ে ২২২৩ বৎসরের একটা যুবা পুরুষ ভাল কাপড় জামা ও পাটকা পরিয়া প্লাটফর্মের এক কোণে দাঁড়াইয়া সম্পূর্ণ অগ্রমনস্ক ভাবে পেন-শিল দিয়া কাগজে কি লিখিতেছে । এত অগ্রমনস্ক যে, চারবেক এক পাশ দ্বন্দ্ব হইতে লুটাইয়া ভূমিতলে পড়িয়াছে । যুবা পুরুষের কেশকলাপ অসতর্কভাবে সুবিজ্ঞান, নাসিকাগ্রভাগে স্বর্ণমণ্ডিত চন্দ্রমা ।

এ দিকে ষ্টেশনে মহোৎসব উপস্থিত, লোকের কোলাহল, পুলিশমান ও কুলিগণের হাঁকা হাঁকি, ডাকা ডাকি বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে । বেল আপ-সেব কোন কোন বাবু টেবি কাটিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ঘীবে ঘীরে পাদচরণ কবিতাছেন । দেখিতে দেখিতে গাড়ি আসিয়া থামিল । আরোহিণী অবতরণ কবিতা ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল ।

এখন ভিড় কমিয়াছে, বড় বেশী লোক নাই, কেবল দুইটা স্ত্রীলোক গাড়ি হইতে নামিয়া যাইতেছেন, প্লাটফর্মের ইতস্তত কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন । আমাদেব সেই চিত্তাময় যুবা পুরুষ কিন্তু এখনও ধ্যানস্থ ।

এই দুইটা স্ত্রীলোক অবশেষে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিল—“স্বামি বাবা !” রামকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—“ওঃ গাড়ি আসিয়াছে, আপনাবা আসিয়াছেন, বেশ বেশ, আমাব অপরাধ লইবেন না—আমাব একটা সুন্দর ভাব মনে উদয় হওয়াতে লিখিতেছিলাম তাই এত অগ্রমনস্ক, কবিতার একপ হইয়া থাকে, আমাব দোষ কি বলুন ? যাহোক চলুন ?”

রামকৃষ্ণ গাড়ি করিয়া আগন্তুক ক্রীলোক হটকে লইয়া চলিলেন; বলা বাহুল্য ই'হারাই দেবদাসী এবং বামিনী।

রামকৃষ্ণ একটা জুতা হাড়ী তড়া করিয়া থাকিতেন, ক্রীলোকদ্বয়কেও তথায় লইয়া বাওয়া হইল।

কলিকাতায় পৌছিয়া দেবদাসী এবং বামিনী একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন, কেবল রামকৃষ্ণের অন্তমনস্ক ভাব দেখিয়া মাঝে মাঝে ভীত হইতে লাগিলেন।

এক মাস পরে এক দিন শুনিয়া হতাশ হইলেন, রামকৃষ্ণ কর্ণচূত হইয়াছেন। সেই দিন হইতে তিন দিনের মধ্যে আর তিনি বাসাও আসিলেন না। দেখিয়া শুনিয়া বামিনী বলিলেন, “মা এখন উপায়?”—দেবদাসী কি উত্তর দিবেন? লজ্জা হইয়া বসিয়া বহিলেন।

৭ম অধ্যায়।

রামকৃষ্ণের কাজে তাজল্য ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে অল্প-আল্প বিখ্যাসে তিনি দিশাহারা হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব, তাহার অসাধারণ প্রতিভা—জগৎ সম্মান করিবে; তিনি শাস্ত্র অর্থের দাস হইয়া আর আপিসের টুলে বসিয়া সময় নষ্ট করিবেন কেন?

করাশী উপস্থানকাব ব্যালজাক্ প্রথমোক্তমেন্টক লিখিয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাব সে চেষ্টা বার্থ হইল; তাঁহার বন্ধুরা বলিলেন, নাটক লিখিবার ক্ষমতা তাঁহাব নাই, আর নাট্যশালার অধ্যক্ষেরাও তাহাই বলিল—ব্যালজাক্ বুঝিলেন, তিনি সে পথ ছাড়িয়া উপস্থান লিখিতে বসিলেন, এই বারে দেশময় “ব্যালজাক্” বলিয়া হলহুল পড়িয়া গেল।

রামকৃষ্ণ আশা করিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়াও এক দিন কবিরাজ্যে হলহুল পড়িয়া থাকিবে। তিনি এক দিন রত্নখচিত * বেজ চমকাইয়া বামিনীকে বিব্রিত করিতে পারিবেন। তাই তাঁহার এত সাহস ও কাজে এত তাজল্য হইয়াছিল।

আপিসের কাজ বাদ এক দিন হুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “মাঝ ভূমি কাজে মনোযোগী না হইলে তোমাকে পরচূত করিতে বাধ্য হইব।” রামকৃষ্ণ

* ব্যালজাক্‌র বইতে হীরা ছুদি ছিল।

তাহার হাসিগা কহিলেন, “ইহা অপেক্ষা মনোঃ কবিবাব আমাৰ
শুকতৰ বিষয় আছে।” বড বাবু কহিলেন, “তবে আমাৰ চাকৰি ছাড়িয়া
দেওগাই উচিত।”

বামৰুক্ষ আৰু ইতন্তত না কৰিয়া বলিলেন, “আপনাৰ চাকৰি আমি
আজ হইতে ছাড়িয়া দিলাম।”

বড বাবু বলিলেন, “কবিতা লিখিয়া ভাত হুঁত ৭” বামৰুক্ষ তাকলা
ও স্থগাৰ ভাবে হাসিয়া বলিলেন, “তা দেখা যাইবে

বড বাবু আৰু একটু আশ্ৰমাদ কবিবাব জন্ত বা নন, “বাম তুমি যে
সকল কবিতা লিখিয়া ডেকে বাধিয়া যাও, তাহা আমি পঢ়ি দেখিয়াছি—তুমি
কখন কবি হইতে পাবিবে না।”

বামৰুক্ষ অভিমানে ক্ষীত হটলেন, তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধিত নিয়া বলিলেন
“মহাশয়, কবিত্ত কবিবাব শক্তি কেবাণীদেব থাকিলে, আপন স্বৰ্গ হইত।”

বড বাবু হাসিতে হাসিতে প্ৰশ্নান কৰিলেন। আৰু বামৰুক্ষ অপৰ
কেবাণীদেব নিকট আফালন ও আশ্ৰগোব কবিত্ত লাগিলেন।

বেলা পাঁচ ঘটিকাৰ সময় বামৰুক্ষ এস্তকাপত্ৰ লিখিয়া দিয়া কাগজ
হইতে নিজ্জান্ত হইলেন। আৰু তিন দিবসেৰ মধ্যে তথায় কিস্বা বাডীতে
ফিৰিলেন না। তিনি প্ৰথমত হস্তলিপিগুলি লইয়া সহসেৰ সংবাদপত্ৰ ও
সাহিত্যবন্দ্যাদি পূৰ্ণ মাসিক ও পাঞ্চিক পত্ৰ প্ৰভৃতিৰ সম্পাদকদেব নিকট
গমন কৰিলেন। কিন্তু তাঁহাবা তাঁহাব বচনা গ্ৰহণ কৰিলেন না। কিন্তু ইহাতেও
বামৰুক্ষ চুঃখিত হইবাব লোক নহে—তিনি ঘৃণা কৰিয়া তাহাদিগকে বলিয়া
আসিলেন—“যত দিন সুযোগ্য লোক দাবা দেশেৰ কাগজগুলি সম্পাদিত না
হইতেছে—তত দিন উহা সাহেবদেব কমেড্ ও বণিক্ৰেব দোকান হইতে উচ্চ
স্থান পাইবে না।”

এইবাব সংবাদপত্ৰে তাঁহাৰ ঘৃণা হইল—কেননা তাঁহাব লেখা গৃহীত হইল
না। তিনি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলেন—ই সকল কাগজেব কঠিন সমালোচন কৰি
সম্পাদকদিগকে জনসমাজে অপদস্থ কৰিবেন—কিন্তু তাহাতেও কৃতকাৰ্য্য
হইতে পারিলেন না—তাঁহাৰ সমালোচন কোন কাগজেই মুদ্রিত হইল না।
তখন তাঁহাব দেশেৰ সকল কাগজেৰ উপব বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্ৰোধ হইল—
ভাবিলেন, স্বঃ নূতন কাগজ বাহিব কৰিয়া সকলকে বিস্মিত ও চমকিত
কৰিবেন।

এই নূতন কর্ণনায় নূতন ক্ষুণ্ণিলাভ কবিষা তিন দিবস পবে বামকৃষ্ণ আসিয়া বাসায় উপস্থিত হইলেন ।

যামিনী ও তাঁহার মাতা দুঃখ প্রকাশ কবিয়া কর্মচাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাদিগকে হাসিয়া বলিলেন—“এখন বামকৃষ্ণকেও দুই তিনটা ত্রিশ টাকা বেতনেব চাকর বাধিতে হইবে ।”

জনিষা দেবদাসী হর্ষযুক্ত ও যামিনী অধিকতর দুঃখিত হইলেন ।

৮ম অধ্যায় ।

যামিনী বামকৃষ্ণের গতিক বড় ভাল নহে মনে কবিষা বুঝাইলেন—চাকরী ছাড়া ভাল হয় নাই । থববেব কাগজে পয়সা হইবেনা, আবে হাতেব কড়ি থবচ হইবে,—কিন্তু বামকৃষ্ণ তাহাতে হাস্য কবিয়া বলিলেন—“যামিনী, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি কষ্টে পাইবে না, আমাদ্বাৰা তোমাব সকল অন্তিলাষই পূর্ণ হইবে ।”

যামিনী বলিলেন—“সে সব কথা থাক, তোমাব হাতে ওগুলি কি ?”

বামকৃষ্ণ বলিলেন—“দশ হাজাব টাকাব নোট ।” যামিনী, হাসিতে হাসিতে সেগুলি তাঁহাব হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন এবং খুলিয়া দেখিয়া বলিলেন—“এই তোমাব নোট নাকি ?” “তা বৈ কি—অমিত্রাকব ছন্দে চমৎকাব ভূইখানা নাটক লিখিয়াছি—থিয়েটেবে অভিনয় কবিত্তে দিলে বিস্তর পয়সা পাইব—তোমাকে অভিনয় দেখাটতে লইয়া যাইব—দেখিবে ?” বলিয়া বামকৃষ্ণ কাগজগুলি চাহিলেন, যামিনী উহা তাঁহাব হাতে দিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন । বামকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন ।

বামকৃষ্ণ চলিয়া গেলে দেবদাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন—“বাম কি আজ আবাব আসবে ?”—“তা কিছুই বলে যায় নাই” বলিয়া যামিনী চুপ কবিলেন ।

দেবদাসী বলিলেন—“বাম বিবাহ কবিলেই সংসারী হইবে—সব সুবিধা হইবে । যামিনী তুমি মত দাও ।”

যামিনী—“বাবাব যত্নাশোক এখনও ভুলিতে পারি নাই” এই বলিয়া নিজের ঘবে বাইয়া দবঙ্গ এক কবিয়া দিলেন, কাজে প্রবৃত্ত হইলেন ।

পাঠক, মনে করিয়াছেন—যামিনী রামকৃষ্ণের গলগ্রহ হইয়াছেন—কমত তাহা নহে। তাঁহার উপার্জন রামকৃষ্ণের উপার্জন হইতে। এখন অনেক বেশী। তিনি ভাল শিল্পকার্য্য জানেন,—তিনি সারা দিন রাত্ পলিশ্রম করিয়া এক মাসের মধ্যে, হুঙ্গুল মলমলে লাল ও নীল হুঙ্গে নানারকম কাজ করিয়া চারিখানি সাড়ি প্রস্তুত করিয়া ৩২ টাকার বিক্রয় করিয়াছেন। এবারে আরো কাপড় হুতা—রেশম ও উল কিনিয়া নানা প্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

দ্রব্য জন্ম বা বিক্রয় জন্ম যামিনীকে কোথাও বাইতে হয় না। যামিনীব গৃহ-পশ্চাতে একটা অবস্থাপন্ন ভদ্রপরিবার বাস করেন। সে বাড়ীতে অনেকগুলি মেয়ে ও অনেকগুলি বউ—তাহাদের সঙ্গে যামিনীর অল্পদিন মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব জন্মিয়াছে—তাঁহারাই তাঁহাব কাপড় কিনিয়াছে ও আরো প্রস্তুত জন্ম করমাইস দিয়াছে। যামিনীব যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক হয়, বলিলে বাড়ীর লোক দিয়া, তাহাও তাহারাই কিনিয়া দেয়। ইহা ছাড়া তাহাদের পরিচিতা, অল্প বাড়ীর মেয়েরাও ঐরূপ সাদৃশ্য ফবমাইস দিয়াছে ও ক্রমে আরও দিবে। সুতরাং তাঁহাকে এই জন্ম যথেষ্ট পলিশ্রম করিতে হয়।

ইহা ছাড়া যামিনীর আবে কাজ আছে, যামিনী স্বয়ং উত্তম মেঠাই, নানা-বিধ পুষ্কার ও ছানার সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে—তাহাও পাড়ার মেয়েরা কিনিয়া খায়। তাঁহাব পরিচিতা ভদ্রমহিলারা মেঠাই সন্দেশ প্রভৃতি আর বাজার হইতে আনান না। দেবদাসী এ সম্বন্ধে যামিনীর অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন।

কলিকাতার মেয়েরা অপেক্ষাকৃত অকর্ম্মণ্য ও বাবু; তাঁহারা ক্ষীরের দ্রব্য নারিকেল রচিত ফুল ফল চিড়া প্রভৃতি নানা সুদৃশ্য ও সুস্বাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আনেন না—সুতরাং তাহাও যামিনী বিক্রয় করিয়া থাকেন। আর দেখিয়া তাঁহার বিলক্ষণ ভরসা হইয়াছে, যে এভাবে চলিলে খরচ কুলাইয়া হাতেও কিছু টাকা সঞ্চিত হইতে পারে।

যামিনী রামকৃষ্ণকে খুব ভাল বাসেন, এখন আবার সেই ভালবাসার সঙ্গে একটু দয়াও মিশিয়াছে। কিন্তু রামকৃষ্ণের আশ্রয়—রক্ত—ছোটখুঁচে বড় কথা—ছোটপথে লড়া চাল—তাঁহার ভাল লাগে না। যামিনীর আর একটা কথা এখন মনে হয়, উভয়ের শিকাই সমান—তবে রামকৃষ্ণের এত পাণ্ডিত্যভিমান তিনি বিশ্বাস করিবেন কেন—সহিবেনই বা কেন? আর সেই রামকৃষ্ণ

তঁাহাকে ভয়গোষণ করিবে, এ কথাটারও তাঁহার কষ্ট বোধ হয় ও দুগা হয় । তথাপি তাঁহার ইচ্ছা রামকৃষ্ণ ভাল হউক, বড় হউক । তথাপি তঁাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না—তবে এ ভালবাসার ধার নাই—আবর্ত্ত নাই—শ্রোত নাই । এ ভালবাসা ছেলেবেলা হইতে অভ্যস্ত ; যামিনী ভাল বাসেন বলিয়া যে বামকৃষ্ণ তাঁহার স্বামী হইতে পারিবেন, একথা যামিনী মনেও কখন স্থল দেন নাই । এই জন্তই যামিনী যখন রামকৃষ্ণের সহিত কথা কহেন, তখন মনে করেন, হয় তিনি পুরুষ, নয়, রামকৃষ্ণ স্ত্রীলোক । এই জন্তই রামকৃষ্ণ এখনও নিজের মুখে তঁাহাকে বিবাহের কথা বলিতে সাহস করেন নাই । শুণে মোহিত করিয়া যামিনীকে বিবাহ করিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ।

৯ম অধ্যায় ।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে আর এক মাস চলিয়া গেল । রামকৃষ্ণ সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া হাতেব টাকা ফুরাইয়াছেন, তথাপি সে পত্রের একজনও গ্রাহক হইল না—বা কোন পত্র তাঁহার সুখ্যাতি করিল না—কাগজ তিন সপ্তাহ পর অচল হইল ।

নাটক সম্বন্ধেও ঐরূপ ফল ফলিত হইল । নাট্যালালার কোন অধ্যক্ষই তাহা অভিনয় জন্ত গ্রহণ করিল না । ইহাতে রামকৃষ্ণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত প্রায় হইলেন । রামকৃষ্ণের ভ্রায়প্রতিভা সম্পন্ন লোক কলিকাতায় আরো অনেক আছে । সংবাদপত্র উপলক্ষে—এবং নাট্যালালার অধ্যক্ষগণের নিকট অনেকবার গমন করায়, বামকৃষ্ণ তাঁহার ভ্রায় আবার অনেক নিরাশ কবি বন্ধু পাইয়াছেন । রামকৃষ্ণ সেই কবিবন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন—“ভাতৃ-গণ, তোমাদিগের প্রতি আমার বিশেষ সহানুভূতি—তাই বলি, এস একত্র মিলিত হইয়া নাট্যালালার অধ্যক্ষ ও সংবাদপত্রের মূখ ও অস্থকারী সম্পাদক-গণের দর্শ চূর্ণ করা যাউক । আমাদের ভ্রায় উপযুক্ত ব্যক্তিগণ একত্রিত হইলে অসাধ্যও সাধন করা যাইতে পারে । আমি অনিচ্ছা—জনসন্যাসীদের একটী সাহিত্যসভা ছিল—সেই সভা পণ্ডিতকে মূখ ও মূখকে পণ্ডিত বলিয়াও গ্রাহ্য হইত । সকল ভ্রূণীর লেখক ও গ্রন্থকার সেই সভার সমসাগণের নিকট হাতধোড় করিয়া থাকিতেন । এস ভাতৃগণ আমরাও ঐরূপ এক সাহিত্য সমালোচনী সভা করি ।”

এ প্রস্তাব সাদবে গৃহীত হইল, রামকৃষ্ণ স্বয়ং সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন—
আব “মরাল” নামে একজন নূতন কবি—সকলের অপরিচিত হইলেও
সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতিরূপে নির্বাচিত হইলেন ।

আগামী পরশ সভার প্রথম অধিবেশন হইবে—সুতরাং সকলেই উৎসাহ-
সহকারে সভার কার্যে মনোযোগ দিল । কে কে নিমন্ত্রণপত্র লিখিবেন, কে
কে একটি বড় হলের চেষ্টা দেখিবেন, কে কে আসবাদ আদি ভাড়া কবিবা
আনিবেন—কে কে আগন্তুকগণকে অভ্যর্থনা করিবেন—এবং কে কে বক্তৃতা
প্রদান করিবেন, সকলই স্থির হইয়া গেল । সুতরাং সকলেই গৃহের দিকে
চলিলেন । রামকৃষ্ণও প্রায় দশ দিন পবে, আজ বজ্রনী নয় ঘটিকাব সময়
বাসার উপস্থিত হইলেন ।

যামিনী বাতি আলিয়া শিল্পকার্য্য করিতেছিলেন, আব দেবদাসী বসিয়া
তাহা দেখিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ রামকৃষ্ণ হাস্যমুখে “মা কোথা” বলিয়া
গৃহে প্রবেশ করিলেন ।

দেবদাসী তাঁহাকে বসিতে বলিয়া খাবাব প্রস্তুত করিতে গেলেন । যামিনী
আপনার কাজ করিতে লাগিলেন । দেবদাসী অন্তহিত হইলে রামকৃষ্ণ বল-
লেন,—“যামিনী, আমার উপর রাগ করিবাছ—বাগ করিতে পাব—আমি
তোমার চিত্তবিনোদন করিতে পারিতেছি না—কিন্তু ভাই জান না, আমি
কেমন এক মহৎ কাজে ত্রুটি হইয়াছি—কিছুদিন অপেক্ষা কর, বুঝিতে
পারিবে আমি তোমার অসোগ্য দাস নহে ।”

যামিনী কিছু বলিলেন না, মাথা তুলিয়া একটু হাসিলেন—আবার কাজ
করিতে লাগিলেন । রামকৃষ্ণ পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—“এক বিবাহেব
সাজী প্রস্তুত হইতেছে নাকি—বটে ?”

যামিনী গম্ভীর বদনে বলিলেন—“গ্রাম ভূমি জান না—ভূমি কে—আব
আমি কে,—আমার শোক নির্ঝাল হইবার আশা গোণ আছে; নির্ঝাল হইলে
তখন, আমোদ করিও ।”

রামকৃষ্ণ দেখিলেন, যামিনীর গণ্ড বহিয়া অশ্রুধার বহিতেছে । লজ্জিত ও
দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “যামিনী, মাপ কর—প্রসন্ন হও, বিরক্ত করিব না ।
কিন্তু যামিনী একবার মনে করিয়া দেখ, আমি কাব জন্ত সন্ন্যাসী না হইয়া,
সন্ন্যাস, বশ ও অর্থজীবের উন্নতশিবে আবেহণ কাবতেছি ?”

বামিনী এখানে হাসিলেন—শিল্প পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ শ্রমুটিত নয়নে
বামকৃষ্ণের দিকে চাহিলেন—এবং কিছু পরে বলিলেন—“বেশ বলিরাছ, যে
দিন বশ ও অর্থের উচ্চশিখরে আরোহণ করিবে—সেইদিন তোমাকে উপপতি
করিব—কেমন সন্তুষ্ট হইলে ?” ।

“উপপতি—সে কি ?”

“তবে কি বলিব ?”

“পতি ।”

“আমি যে বিবাহিতা ।”

“তুমি বিধবা ।”

“পবলোক, পাপ পুণ্য বিশ্বাস কর ?”

“কবি”

“তবে স্বীকার কর আমি সধবা ।”

কিরূপে ?

“আমার স্বামী পবলোকগত,—পবলোকে তিনি আমাকে পাইবেন—তাই
আমি সধবা ।”

“এ হিন্দু কথা, খৃষ্টান বা ব্রাহ্মের কথা নহে ।”

“আমরা ত হিন্দু ।”

“ব্রাহ্ম বা খৃষ্টানের মতে বিবাহ করিব ।”

“পবলোকে যদি বিচাৰ হয়, তুমি ও পূৰ্ণস্বামী উভয়েই যদি আমার দাওয়া
কর, তবে কে আমার পাইবে ?”

“দিক বলিতে পারি না ।”

“তুমি পত্নী ঘবে বাথিয়া দূবদেশে গিয়াছ, আব একজন তাহাকে অধি-
কার কবিল—তুমি আসিয়া বিবাদ কবিল, পবে উভয়েই মালিশ কবিলে,
পত্নী কে পাইবে ?”

“আমি পাইব ।”

“তবে ত পবকালে তুমি হাবিবে, আমার স্বামী জিতিবেন ?”

বামকৃষ্ণ নীরব হইলেন—অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, “আচ্ছা উপপতিই
হইব ।” বামিনী হাসিয়া কহিলেন,—“পরকালের বিচারের ভরে যদি তোমাকে
গ্রহণ করিতে না পারি ?”

“আমি আশ্বস্ততা করিব ।” এই বলিয়া বামকৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন ।

খামিনী হা, হা, করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আজ্ঞহতা বড় বীরস্বৈর কাজ, তুমি পাবিবে না।”

এমন সময় দেবদাসী খাবার আনিয়া দিলেন, বামরুক্ষ আহারে বসিলেন।

১০ম অধ্যায়।

আজ বামরুক্ষের বড় স্নেহের দিন, আজ তাঁহার সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠা হইবে। বড় বড় লোকে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবে, সংবাদপত্রে তাঁহার প্রশংসা ঘোষিত হইবে। তাই নয়টার সময় আহার করিয়া চাপকান চোগা গায় দিয়া মাথায় ঠাকুব-পাগড়ি পবিয়া, রামবাবু তাঙ্গের গ্রেট মোগলের স্থান চলিলেন।

কলুটোলাব কোন ভগ্ন প্রাসাদ সভার স্বল্প নির্দিষ্ট হইয়াছে। উদ্যোগী মহাপুরুষদের চাঁদার টাকায় আসবাবাদি ভাড়া করা হইয়াছে। সুসজ্জিত সদস্ত ও দর্শকপ্রধান স্থলের ছাত্রবৃন্দও উপস্থিত হইয়াছে, কেবল বামরুক্ষের অপেক্ষায় সভার কার্য্য আবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। সভায় যে সকল মান্ত-গণ্য ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে রামরুক্ষের আপীসেব বড় বাবুও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বামরুক্ষেব উদ্বেগ,—মূর্খ বড় বাবুটা দেখিয়া ষাউক--রামরুক্ষ কি দরের লোক। বলা বাহুল্য, বড় বাবুও অস্তান্ত মান্তগণ্য ব্যক্তির ন্যায় অমুপস্থিত। স্থলের মহামান্য ছাত্রবৃন্দ সভার কার্য্যে গোণ দেখিয়া শৃগাল গর্দভ প্রভৃতি সুসভ্য জন্তুর সুস্ববলহবি তুলিয়া সভাগৃহের গোরব রক্ষা করিতেছে। এমন সময় রামরুক্ষ বাবুব “অমনি বদ্” ছুই পক্ষীবাজ টানিতে টানিতে আনিয়া, গেটে থামিল।

রামরুক্ষ হাস্যবদনে গাভী হইতে অবতরণ করিয়া বেমন শিঁড়িতে পা দিয়াছেন, অমনি তাঁহার পরিচিত এক জন চাপরাশি মাথা নত করিয়া বলিল, “বাবু সাহাব্ সেলাম”। প্রতি সেলাম দিবার পূর্বেই একজন পুলিশের লোক ওয়ারেন্ট দেখাইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।

—কর হার! একি হইল, দলপতি ধৃত হইলেন। সাহসী সভাগণ ও দর্শক-গণ মনে করিলেন, না জানি সভার কোন গুরুতর উদ্বেগ মনে করিয়া পুলিশের লোক দলপতিকে ধরিয়াছে স্তবরীং তাঁহারা প্রাণপণে কেহ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, কেহ নবদাসী দিয়া, কেহ পনজাভের জীর্ণ ঘাে ভাঙ্গিয়া

শলাঘন করিতে লাগিলেন । বামরুক্ষ ও পুলিশের লোক বিস্মিত হইলেন । বামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার নামে কি জনা ওয়ারেন্ট জারী হইয়াছে ?” পুলিশের লোক উত্তর দিল, “তহবিল ত্তরুপ” বামরুক্ষ প্রকৃতপক্ষে নিদোষী স্তুত্যাং মনে করিলেন, এ বড় বাবুর কাৰ্য্য ।

* * * * *

বামরুক্ষের আপিসের হিসাব বহিতে এক হাজাব টাকা এক ব্যক্তির নামে বেশী লেখা । অথচ হিসাব বহির মোট টাকার সহিত খাজাঞ্চির তহবিলের বেশ মিল আছে । এক ব্যক্তি ৫০০০ টাকা পাইবে, তন্মধ্যে ৪০০০ পাই- যাছে, সে আজ চারি মাস পবে অবশিষ্ট হাজাব টাকা লইতে আসিয়াছে কিন্তু তাহাব নামের ঘরে লেখা পাঁচ হাজাব, কিন্তু সংলগ্ন বসিদে চাবি হাজাব লেখা । বাকি হাজাব টাকা কি হইল ?

বামরুক্ষ বিচাবালয়ে উপস্থিত হইয়া জামিনীতে থালাস পাইল । ছয় দিন পরে বিচার হইবে । বামরুক্ষ থালাস পাইয়া আপিসে যাইয়া কান্দিতে কান্দিতে বড় বাবুকে কহিলেন “মহাশয়, আমি সম্পূর্ণ নিবপবাধী—আমি এ টাকার কিছুই জানি না ।”

বড় বাবু খাতা দেখাইয়া বলিলেন “এই দেখ ? আমার বিশ্বাস তুমি যথার্থই নিদোষী, কিন্তু আমি কি করিব ? সাহেব হোমাকে পুলিশে দিয়া- ছেন । ইহাতে পারে তুমি ভ্রমে ও অনামনস্ক হেতু একের টাকা অপরের নামে লিখিয়াছ । পূৰ্ণ খাজাঞ্চীর মৃত্যু না হইলে, এরূপ গোল সহজে ধরা পড়িত । তুমি তাহাব অল্পপস্থিতিতে কয়দিন কাজ করিয়াছিলে, তাহাতেই এরূপ হইয়াছে ।”

বামরুক্ষ বলিলেন, “আমি মনোযোগপূৰ্ণক খাতা দেখিয়া এ গোল বাহির করিতে পারিব ।” বড় বাবু তাহাকে দেখিবার আদেশ দিলেন ।

বামরুক্ষ রোজ আপিসে আসিয়া তন্নতন্ন করিয়া খাতা দেখেন কিন্তু টাকার ভুল কিছুতেই বাহিব করিতে পাবেন না । অবশেষে একবারে বিষয় হইয়া পড়িলেন । জেলে যাওয়া জন্য তিনি তত বিষয় নহেন, যামিনী এ কথা শুনিবে বলিমাট তিনি অধিকতর বিষয় । এই জন্যই আব বাজী ঘান নাই ।

এদিকে দেখিতে দেখিতে বিচারের দিন আসিল, বিচার হইতে লাগিল । বামরুক্ষের পয়সা নাই, স্তুত্যাং ভাণ্ড উকীল দিতে পারাবলেন না, তথাপি বামরুক্ষকে দেখিয়া ও খা ত্রাপ্তেব অবস্থা দেখিয়া বিচাবকের বিশ্বাস হইল—

যে ভ্রমে একেব টাকা অপব্যয় নামে লেখা হইয়া থাকিবে, তাহা না হইলে ৫০০০ টাকা লেখা অথচ তৎসংলগ্ন বিনিদে ৪০০০ টাকা কেন থাকিবে, অথবা মন্দ লোক অবশ্য বিনিদেব টাকার অল্প জাল কবিতা তৎস্থানে ৫০০০ টাকা লিখিবাবই চেষ্টা কবিত।

বিচাবকের বিশ্বাস হইলে কি হয়, তিনি আইনে বাধ্য, তথাপি এদিক ওদিক করিয়া তিনি বিচাব কাহো গোণ করিতে লাগিলেন।

* * * * *

কথা গোপন থাকে না, দৈনিকপত্রের পৃথিবী বিশেষ্টে উহা প্রচার হয়। যে পাটের মেয়েবা যামিনীকে বড় ভাল বাসে, সেই পাটীতে একখানি দৈনিক সংবাদপত্র আসিয়া থাকে, যামিনী তাহা চাহিয়া আনিয়া পড়েন। সুতরাং বামরক্ষের এই সামাজিক সংবাদ পাটীয়া তাঁহাব কোমল হৃদয়ে দয়া হইলু, তিনি একখানি গাড়ী ভাড়া কাঁচকা মার্ক সঙ্গে লইয়া আপিস চালালেন।

আপিসব নিকট উপস্থিত হইয়া বড় বাবুরকে খবর পাঠাইলেন, ছুটিয়া বসন্ত বড়বাবু নাট, তাঁহাব আস্তত্ব হইয়াছে। যামিনী তথাপি সাহসে নিভব কবিতা সাহেবব নিকট খবর পাঠাইলেন, সাহেব উপর বসন্তে বলিলেন। যামিনী উপর যাহবা দেখিতে পাঠিলেন সাহেব ও বিব বসিয়া অল্পক্ষণ লোক নাট। বিব দেখিয়া তাঁহাব ভাসা হুশ, তিনি ঘাঁই ঘাঁইে অগ্রসব হইয়া নিকটস্থ বাবু লাললেন,—

“বামরক্ষ বাবুরকে মাপ কবিত হইব।”

সাহেব ও মেম্ব বিস্মিত হইলেন। বিধ যামিনীকে নিকলক ও সাহস পূর্ণ শব্দব বদন দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন। মেম্ব বলিলেন “তুমি তাব। ক?”

যামিনী নিজ ভূখ বণন কবিতা সকল কথা শুলিখা বলিলেন। সাহেব বিব উভয়েবই ককণাব সম্ভাব হইল। বিব তাঁহাব হাত বসিয়া একখানি আসনে বসাইলেন। সাহেব কহিলেন “আমি কি কাঁচকা এখন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ছাড়িলেন না।”

যামিনী বলিলেন “তবে আমার দয়া কবিতা সেই পাতাখানি দেখিত কেন?” সাহেব হাসিয়া বলিলেন “খাতাব হিসাব পত্র বৃদ্ধিত পারিবে?”

যামিনী সাহস কবিতা কহিলেন “পারিবে।”

অল্পক্ষণ মধ্যেই কথানা খাতা আসিল। সাহেব হাসিয়া বলিলেন “কি, এত খাতা দেখিতে পারবে?”

যামিনী বলিলেন “যদি সন্ধ্যা নাহি হইত, তবে সমস্ত বাত, জামিনা দেখিতে পারি।” সাহেব কি জবাব দিবেন তাহা ভাবিতে ছিলেন, ইতিমধ্যে মধ্যাহ্ন ভাঙ্গিয়া বলিলেন “লটীয়া যাইবার পয়োজন কি ? এখানে বসিয়া দেখ, আমিও সঙ্গে সঙ্গে দাখল।”

যামিনী স্মৃতি হঠাৎ থাকা দেখিলে অবস্থ কবিলেন। হঠাৎ মা গাড়ী লটীয়া বাড়ী গমন করিলেন।

১১শ অধ্যায় ।

আকস্মিক হঠাৎ গৃহে কেমন ব্যস্ত পড়িলে, গৃহ কোণে পিঞ্জিরাবদ্ধ কেন্দ্রাধিপতি শিশু দেখিল। টেবিলে এখনও বাস্প জ্বলিতেছে, যামিনী বাহ্য জগতের কিছুই জানেন না, যে ভাবে হিসাব দেখিতে ছিলেন সেই ভাবেই দেখিতেছেন। আগবণে তাহার নয়ন বন্ধবর্ণ, স্নীত হইয়াছে, চুল চুলু করিতেছে, মুখ মালিন এবং শুষ্ক।

বিবি গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন “কান্থ হও অমুখ হইবে।” যামিনী মুখ তুলিলেন সে মুখ শুষ্ক, চিহ্নিত ও বিবর্ণ দেখিয়া বিবির মনে তাৎ হইল। তিনি বলিলেন “আব কতটা বাক ?” যামিনী বলিলেন “একবার সমস্ত দেখিয়াছি—আবার ভাল করিয়া দেখিতে আবস্থ করিয়াছি—দেখিতেছি ১/২ ছেল অনিবাহ্য।”

বিব হাঁসিয়া বলিলেন, “অনায়াব, জাগরণ, বাড়ী যাও—ভব নাট—এক হাজার টাকা আনি দিয়া থাণ্ডা করিয়া দিও।” বিবির এত দবা দেখিয়া যামিনী বিস্মিত ভাবে তাহার মুখপানে চাহিলেন—

বিবি সে মুখমণ্ডল অভিমান ও উত্তেজিত করিয়া শিহরিলেন।

যামিনী বলিলেন—“যদি যথার্থই এক ব্যক্তি চোব হয়, তবে অসংপায়ে আপনাব টাকা যাউন কেন ?”

“টাকা তোমাব জন্ত—তাব জন্ত নহে।”

“আমি টাকাব জন্ত আসি নাই।”

“তবে কেন আসিয়াছ ?”

“নিশ্চয়ই কি না, —কাজটি দ্রুত।”

“এখনও কি তাহা বুঝিবাব বাকি আছে ?”

“একটু আছে ।”

“কি ?”

“তাব লিখিবাব ডেক্সে কি আছে দেখিব ?”

বিবি হাদিয়া বলিলেন “আচ্ছা, চল তবে কেবাণীখানায় যাই ?”

উভয়ে কেবাণীখানায় চলিলেন, কিন্তু এখনও আপিস খোলে নাই।
বিবি হুকুম দিয়া চাবিব অভাবে রামকৃষ্ণেব ডেক্স ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।
যামিনী সাবধানে উহার ভিতরেব কাগজপত্র ভাল কবিয়া দেখিতে লাগিলেন।
কতি ক্ষুদ্র অতি সামান্য কাগজখানিও দেখিতে ত্রুটি কবিলেন না। এক
টুকরা কাগজে লাল কালিব অক্ষরে কবিতা লেখা, ঐ কাগজখানি দেখা
হয় নাই—কাগজপত্র বাহিব কবিতা দেখেব নীচে পড়িয়া গিয়াছিল—
যামিনী যখন, সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়া অবশেষে নিবশ লোচনে বিবির মুখ
পানে চাহিলেন—তখন বিবি সেই কাগজখানি অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া বলিলেন
“এখানি কি কাগজ ?”

যামিনী কাগজ তুলিয়া তাহাব অপব পৃষ্ঠ দেখিলেন—মনে আশা হইল,
সহসা তাহাব মুখ উজ্জ্বল হইল। বলিলেন “এ খানি হাজার টাকার বসিদ
হব ত এই ব্যক্তিব টাকা তাহাব নামে জমা না হইয়া অন্য ব্যক্তিব নামে
প্রথমত জমা করা হইয়া থাকিবে।”

বিবি তখনই বসিদখানি লইয়া উপবে চলিলেন। খাতা খুলিয়া নাম
বাহিব কবিলেন। যপার্থ ই সে নামে টাকা জমা নাই, বসিদও তাহাব পাশে
সংলগ্ন নাই। অল্পক্ষণ মাধ্য ইহা সাহেবেব কণে গেল সাহেব দেখিলেন—
বসিদখাতা কলিকাতাব লোক—তখনই টেলিগ্রাম কবিলেন। টেলিগ্রামেব
উত্তর আসিল “হাজার টাকা পাইয়াছি।”

সাহেব উচ্চস্ববে বলিলেন “রামকৃষ্ণ নির্দোষী” শুনিয়া যামিনী অত্যন্ত
সন্তুষ্ট হইলেন। বিবি তাব চেয়ে বেশী সন্তুষ্ট হইলেন বলিলেন—“যামিনী
তোমার পবিশ্রম সাধক, তোমার প্রশ্ন উচ্চ—বল, আমবা তোমাব কি
কবিতা পাবি ?”

যামিনী একটু চিন্তা কবিয়া বলিলেন “রামকৃষ্ণেব অসাবধানতাব দোষ
জবা কবিয়া সাক্ষ্যনা কবিবেন। তাহাকে একটী চাকরী দিবেন, তবেই
সন্তুষ্ট হইব।”

সাহেব ও বিবি উভয়েই তাহার পানে বিষ্ময়েব লোচনে চাহিয়া বলিলেন
—“তাঁহা হইবে ।”

১২শ অধ্যায় ।

বামরুক্ষ মুক্তি পাইয়াছেন—মুক্তির বিবরণও শুনিয়াছেন । শুনিয়া
স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছেন—এইবার তিনি প্রথম বৃত্তিতে পারিলেন,
তার চেয়ে যামিনী কত উচ্চ । তাঁহার মস্তক নীতল হইল, হৃদয় ভক্তিশূর্ণ ও
কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইল—মনে মনে বলিলেন “দেবি,—আমি তোমার দাসেব
যোগ্য—আমি স্বামীর যোগ্য নহি” ।

* * * * *

বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে—আফিস পূর্ণ লোক—তদ্ব্যযো উচ্চাসনে
বড় বাবু বসিয়া আছেন, এমন সময় সাহেব আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—
“আমি বামরুক্ষকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি, আসিলে তাহাকে পূর্ব কাজ
সাবধানে করিতে বলিবে ।”

বড় বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন “সে এক প্রকাব আপনি কাজ ছাড়িয়া
গিবাছে ।”

সাহেব বলিলেন “তাকে বুঝাইয়া বলিবে সে যেন কাজ ছাড়ে না, ভবিষ্যতে
তাঁহাব ভাল হইবে ।”

সাহেব স্বস্থানে গমন করিলে কিছু পরে বামরুক্ষ বাবুব নিকট আসিয়া
বলিলেন “আমাকে সাহেব কেন ডাকিয়াছেন ?”

“পূর্ব কাজ করিতে ।”

“আর কাজ কারিব না ।”

“তবে কি করিবে ?”

“তাঁ কি জানেন না ?”

“জানি, কিন্তু তুমি তাহা পাবিবে না ।”

“কেন মহাশয় ?”

“কবি-জনোচিত প্রতিভা বা ক্ষমতা তোমার নাই ।”

“আপনি কিসে বুঝিলেন ?”

“তুমি পাগল ।”

“আপনি তবে দেখাত্ত কবি “মবাল” কেও পাগল বসিবেন।”

“কোন “মবাল” তোমাদেব মনোনীত সভাপতি ?”

“হাঁ।”

“তাহাকে দেখিয়াছ।”

“না।”

“তাহাকে জান ?”

“না।”

“তবে কিরূপে তাহাকে পাইবে ?”

“খুঁজিয়া লইব।”

“মবাল কিরূপ কবি ?”

“চমৎকার।”

“মবাল যদি কেবাণীগিবি কনে, তবে তুমি তাহা কবিত্তে অপমান বোধ কবিলে না ত ?”

“এত বড় কবি, কেবাণি হইতে পারে না ?

“যদি তাই হয় ?”

“আমি তাহাব অধস্থ কেবাণীবও পদসেবা কবিব।”

“ঠিক ত ?”

“ঠিক মহাশয়।”

“আমিই মবাল স্বাক্ষর কবিতা লিখিয়া থাকি।” রামকৃষ্ণ শুনিয়া অবাধ হইলেন, নিজের ব্যবহারে, লজ্জার ম্বিত্তে ইচ্ছা হইল মাথা হেট করিয়া বলিলেন, “আশ্চর্য্য।”

বড় বাবু বলিলেন, “কিছুই আশ্চর্য্য নহে—এদেশের লেখকদের লেখার পরসূ হয় না। দেখ হেম বাবু, রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতি কি কবিত্তেছেন ? তবে যাচাধিগের লিপিকমতা এতাদিক যে ইচ্ছা না থাকিলে একবাব তোমাকে তাহাদেব বহি পড়িত্তেই হইবে, না পড়িলে উপায় নাই, না পড়িলে মূৰ্খ হইয়া থাকিত্তে হইবে, তাহাবাই কেবল লেখনী লইয়া অহঙ্কার ও লেখনীর উপব সংসাব নিষ্ঠর করিত্তে পারেন। উহা তোমাব বা আমাব কর্ণ নহে। এখন হইতে সাবধানে কর্ণ কব, এ পথে অর্থ ও উন্নতি সহজে হইবে।”

রামকৃষ্ণের মন ফিরিল, রামকৃষ্ণ আব এক রামকৃষ্ণ হইয়া কার্ণো প্রবেশ কবিলেন। অবশেষ বড় বাবু পদাঙ্কবে উন্নীত হইলে, রামকৃষ্ণ কোটা বেতনে বড় বাবু হইলেন।

উপসংহার ।

রামকৃষ্ণের খুব জাঁকাল অবস্থা দেখিয়া দেবদাসী একদিন, যামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, “আব কেন—বিহাট্টা এখন হ’য়ে যাক ।” রামকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাব বদন প্রসন্ন হইল—ভাবিলেন, “যামিনী আমার না হউক অস্ত্রত এখন আমার অবস্থার দাসী হইতে সম্মত হইবে—”

যামিনী সেই সময় বদন গম্ভীর করিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “মা একটু অপেক্ষা কর, রামকৃষ্ণ তুমিও একটু অপেক্ষা কর ।” রামকৃষ্ণের বদন আরও উজ্জ্বল আবও প্রফুল্ল হইল ।

সহসা যামিনীর শয়নকক্ষ হইতে এক সন্ন্যাসিনী নিজস্ব হইলেন । সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন, “মা দেখ ।—রামকৃষ্ণ দেখ ।—আমার বিবাহের পরিচ্ছদ কেমন হইয়াছে ।” দেবদাসী নির্ভীক—রামকৃষ্ণ বিস্মিত ।

* * * * *

দেবদাসী বলিলেন, “এ বেশ কেন ?” যামিনী বলিলেন, “যামিনী দেবী চিবদিনই দেবী থাকিবে, দাসী হইবে না ।

দেবদাসী বলিলেন, “তবে কি করিবে ?” যামিনী বলিলেন, “চল বন্দাবনে ভিক্ষা মাগিয়া থাইব, আব ব্রজের ধূলি গায়ে মাখিব ।”

কপালকুণ্ডলা ।

কপালকুণ্ডলা কবির একটা অতি অপূর্ণ সৃষ্টি । এই সৃষ্টি মাধুর্য্য অল্পভবেব জিনিস, বর্ণনার জিনিস নহে । কারণ, কপালকুণ্ডলা ভাবময়ী, অথবা তাহা হইলেও একরূপ বৃক্সন বাইত—কপালকুণ্ডলা ছায়াময়ী । সত্য বটে, কবি ইহাকে ভাষাময়ী কবিয়াই আবাদিগেব সম্বন্ধে স্থাপিত কবিয়াছেন, কিন্তু কোন ভাষাই কপালকুণ্ডলার পূর্বাবয়ব প্রদর্শন কবিত্তে সমর্থ নহে । কলাবিত্ত যেমন সঙ্গীতকালে স্বীয় স্ববেব অপরূপতা বা স্ব-বিচ্ছেদ কোন এক অবিরাম-ধ্বনিত যন্ত্র সাহায্যে পূরণ করিয়া থাকেন, আবাদিগেব কবিরও সেইকপ তাঁহাব এ বনোহব সঙ্গীতটি ভাষায় গঠিত কবিয়া ও ইহাব অপরূপতা ও বিচ্ছেদ

পাঠকবর্ণেব মানসযন্ত্র ধ্বনিত কবিতা পূৰ্ণ কবিবাব চেষ্টা করিয়াছেন। এ বস্তু বাহার ধ্বনিত হইবার জন্ত শিকা প্রাপ্ত হয় নাই, বাহার এ বস্তু সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে মিশিতে অসমর্থ, কপালকুণ্ডলা তাহার নিকট সম্যক্ অপূর্ণ। ভ্রমর, সূৰ্য্যমুখী, তাহার জন্ত হইতে পাবে, কিন্তু কপালকুণ্ডলা নিশ্চয়ই তাহার জন্ত নহে। কপালকুণ্ডলা চিত্র নহে- চিত্রের ছায়া। প্রতিচিত্র গ্রহণকারীরা যেরূপ চিত্রিতব্য পদার্থের ছায়ামাত্র গ্রহণ করিয়া পরিশেষে তাহাই বখাবিধ বর্ণে প্রতিভাসিত করিয়া, ত্রিক সেই পদার্থের অমুস্মৃতি রচনা করে, পাঠকবর্ণকেও সেইরূপ এই ছায়া লইয়া মনোমধ্যে কপালকুণ্ডলাকে অঙ্কিত করিয়া লইতে হইবে। ছায়াটি একটী বস্তু সাহায্যে উঠিয়াছে, সে বাহ্যদ্রব্য যন্ত্রের; কিন্তু মূর্তি-গঠনে বাহ্যদ্রব্য পাঠকবর্ণেব। তাই চিত্রনিপুণ পাঠকবর্ণেব নিকটে পূর্ণ মূর্তি অপেক্ষা—এই ছায়ারই আদর অধিক।

পাঠক, কখনও কোন চিত্রগৃহে বর্ণ গুচ্ছের (বস্ত্রের আবরণ) ছবি দেখিয়াছ? এখানে এক ধাবড়া রঙ, ওখানে এক ধাবড়া বঙ, বহু বস্তু বিস্তৃত অথচ অস্বল্প বিস্তৃতের জ্ঞান পবিত্রমান রঙের আবরণ ছবি কখন দেখিয়াছ? কপালকুণ্ডলা সেইরূপ চিত্র। ইহাতে কোনও সূক্ষ্ম কারুকার্য নাই—অথচ চিত্রটি বড়ই মনোহর। যে চিত্রে সূক্ষ্ম কারুকার্য থাকে, তাহা হঠাৎ কেহ না বুঝিলে, বুঝাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু এরূপ চিত্র না বুঝিলে, বুঝান দুষ্কর। ইহাব বিশ্লেষণ হয় না—অথবা বিশ্লেষণে উহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। তবে বুঝান যায়,—উহাব সেই এক একটি বর্ণ গুচ্ছের (বস্ত্রের আবরণ) সৌন্দর্য্য। তাহাই আমবা চেষ্টা কবিতাে পাবি কিন্তু সেই সমগ্র চিত্রের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়।

ঐ দেখ সেই বকম পংক্তিবর্ণে ঐ কি লিখিত হইবাছে,—দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি—মধ্যাহ্ন মার্গগেব প্রচণ্ড তেজ বক্ষে করিয়া অনলশিখার জ্ঞান জলিত-তেছে। চতুর্দিকে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, মানব নাই, তথায় পশু চরে না, পাখী ডাকে না, সমীরণও যেন বহে না। এহেন ভীষণ মরুভূমির মধ্যদেশে ঐ তেজ একটি পথিক ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিতেছে। পথিক পথহারা—তাহার বদনমণ্ডলে বিষম আশঙ্কাব চিহ্ন, গমনে বিষম ভ্রান্তির চিহ্ন। নরনয়নগল ভীতিব্যঞ্জক, সমুদ্রে পতিতের জ্ঞান নিরাশায় হাবুডুৰু করিতেছে। তৃষ্ণায় ছাঁতি কাটিয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় জঠর ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। পথিক বিষম বিপদগ্রস্ত। আহুতা হইয়া পথিক কি ভাবিতেছেন—সহসা এ কি পরি-

কেব চতুর্দিক বেঠন কবিয়া ধপ্ করিয়া এ কি জলিয়া উঠিল। এ যে প্রদীপ্ত অনলশিখা—আগুণের মধ্যে আগুণ। পথিক জীবনে নিরাশ হইলেন—হা ভগবান বলিয়া সেই ভীষণ মরুভূমে, সেই ভীষণ অনলবাশি মধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। এমন সময়ে সহসা তাঁহার চতুর্দিকে আবার এ কি এ উথিত হইল। সেই ভীষণ মরুভূমি ভেদ কবিয়া আবার এ কি বেঠন কবিল। সলিলের উৎস। শুভ্র, নিশ্চল, স্নানীতল, বাবিপুঞ্জ! আহা মবি মবি, কি স্নন্দব চিত্র বে।—সেই ভীষণ মরুভূমিতে, সেই ভীষণ অনলবাশি মধ্যে আহা মবি মবি এ কি এ স্নন্দব দয়াব উৎস বে! ঝব, ঝব, ঝব, ঝব রবে কি ঐ মধুব ধনি বে! স্বজন-পবিত্রাঙ্ক বিজন প্রদেশে কাপালিক কর্তৃক বধার্থ আনীত শ্মশানক্ষেত্রে নিবীহ নবকুমারের পার্শ্বে, ঐ কি মধুব দয়াব উৎস বে! সেই মহাকাণ্ডের ক্রীড়াভূমি ভীষণ মরুক্ষেত্রে শবশয্যাশাষিত ভীষ্মখে অর্জুন-শরপ্রোভিন্ন ধবিত্রীভেদী সলিলধাবাও এত অমৃতমবী নহে।

ঐ দেখ আর এক স্থানে ধাবড়া রঙ্গে ঐ কি লিখিত হইয়াছে,—মাতৃকোড়ে একটা যুবতী বালিকা। মায়েব আব সন্তান নাই, মায়েব পুত্রও ঐ, কন্তাও ঐ, তাই কল্যাণী যুবতী হইলেও বালিকাব গ্রাঘ এখনও লাগিত। এখনও সে বনে বনে ছুটা ছুটি কবিয়া বেড়ায, এখনও সে মায়েব কাছে বালিকার গ্রাঘ আবদাব কবে। গাত্রে অভরণ নাই, দবিদ্রা মাতা কোথায় পাইবে? অথবা সে পাগলা মেয়েকে অভরণ পবান যাইতই না। কেশরাশি সর্কাজ আচ্ছাদন কবিয়া বাঁধিয়াছে। নবনে বালকনয় প্রতিভাসিত, তেমতি সবল, তেমতি স্নেহ-পূর্ণ। আবাব যুবতীব গ্রাঘ তাহাতে গাভীর্গ্যও প্রকটিত রহিয়াছে। বালিকার মাধুর্য ও যুবতা গাভীর্গ্য মধুর ভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে। বালিকাটি মাতৃকোড়ে বসিয়া মায়েব মুখপানে চাহিয়া আছে, এমন সময়ে হঠাৎ কে আসিয়া তাহাকে মাতৃকোড়চ্যুত কবিয়া লইয়া গেল। বালিকা কাদিল না, অথবা কাদিল কিন্তু আত্মনাদ কবিল না। সে কিছুই বুঝিল না—অথবা বুঝিল, কিন্তু নিকপায় ভাবিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ব্যতীত আব কিছুই করিল না। ঐ দেখ, ঐ সেই মাতৃকোড়চ্যুতা যুবতী বালিকা আজি বিবাহিতা হইয়াছে। আজ সংসাররূপিনী বিমাতা তাহাকে কত আদর করিতেছে। সর্কাজ অভরণে ভবা, কেশপাশ স্নানিবদ্ধ। মাতা নাই বলিয়া, মাতৃকোড়চ্যুত বলিয়া, সকলে তাহাকে কত আদর কবিতেছে। স্বামী অপরিমিত স্নেহ করিতেছে, ননদী প্রাণের অধিক যত্ন কবিতেছে, কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার

মন উঠিতাছ না। সেখানে সে যে মাঘের কোলে ছিল, এখানে যে এ বিমাতা।
মাতৃহাৰা শিশু যখন মা মা বলিয়া বোদন কৰে, তখন তোমরা তাহাব নিকটে
যতই কেন মনোহর দ্রব্য ধব না, সে তদিকে ক্ৰক্ষেপ কৰিব না, ববং অহ
সমসে বাহা সে আদৰ কৰিয়া বকে কবিত, সে সমসে সে তাহা বাগ কৰিয়া
দুবে নিক্ষেপ কৰিব। যবতী আজ ঠিক তাহাই কবিতছে। কাঁদিতে
কাঁদিতে যেন তাহাব চক্ষু দুইটি ফুলিয়া পড়িয়াছে, মুখখানি যেন বাহুগ্ৰস্ত
বিমলিন চক্ৰমাব হ্রায শোভা পাইতেছে। দেখ দেখি, চিত্রকৰেব কি অদ্ভুত
শিল্পচাতুৰ্য্য। সে মুখখানি কেমন ফুটিয়াছে—সে মনোভাবটি কেমন খুলি-
য়াছে। প্রকৃতি চহিতা ঘোড়ী বালিকা কপালকুণ্ডলাকে সংসার ক্ৰোড়ে
আজ কেমন দেখিতেছ ? আব কখন কোন বন্তু বিহঙ্গিনীকে খাঁচান পুৰিয়া
বাধিতে সাধ হইবে ? কোন বন্তু এততীকে বন হইতে তুলিয়া টবে বসাইতে
সাধ হইবে ?

এই দেখ আব এক ধাবড়া বড়ে এই কি লিপিত হইয়াছে। প্রকৃতিব
সহিত সমাজেব সংগ্রামেব প বণাম। কাণো, উতিহাসে, দশনে,
শ্রবণে, যে সকল অস্তিম দৃশ্যেব কথা পড়িয়াছ, যে সকল অশানক্ষেত্র দেখি-
য়াছ, যে সকল লোক সঙ্গীত শ্রবণ কৰিয়াছ, সব একত্রিত কৰিয়া ভাবিয়া
একবার এ দিকে চাহিয়া দেখ দেখি—ঐ অগানভূমিব প্রান্তভাগে উচ্ছাসময়ী
ভাগীবতীব তটদেশেব ঐ যুগল মূৰ্ত্তি নিবীক্ষণ কব দেখি—ঐ প্রকৃতি আব
ঐ সমাজেব দিকে তাকাও দেখি—একপ আব কখন কি দেখিয়াছ ? একপ
হৃদযভেদী গান্ধীৰ্য্যমব মধুবদন্ত আব কখন কি দেখিয়াছ ? ঐ দেখ ঐ
সামাজিক প্রেমিক নবকুমাব—ঐ দেখ ঐ স্বভাব প্রেমিকা কপালকুণ্ডলা।
উভয়েবই চবমোচ্ছাস দেখ—উভয়েবই আদর্শভাগ দেখ। আবও দেখিতে
চাও। তাহা হইলে তোমাদিগেব নিকটে আমবা বিদায় গ্রহণ কবিলাম।
কপালকুণ্ডলা যে আমাদিগেব প্রিয়তমা দুহিতা—তাহাকে অগানহ
দেখাইলাম—তাহাব ভাবাবেশ দেখাইতে পাণিব না।

কিন্তু এ সকল বাষ্টিব সৌন্দৰ্য্য—সমষ্টিব সৌন্দৰ্য্য বুঝান যায় না। এ
বাষ্টিব সৌন্দৰ্য্য নিকটে আসিয়া দেখা যায়—কিন্তু সমষ্টিব সৌন্দৰ্য্য নিকটে
আসিয়া দেখা যায় না। তাহা দেখিতে হইলে, নবকুমাবেব মত আঙ্গুঠ
সক্কালোকে গম্ভীবনাদী বাবিকুলে উচ্ছসিত মনোভাব লইয়া দেখিতে হইবে।
সংসাবীৰ্ব কাছে অমন প্রকৃতি তনয়া ছায়াময়ী ভিন্ন ত উচ্ছল চহিতা পার

না—ছায়ায়ই ভাবেই তাহাকে দেখিতে হইবে—কল্পনার স্বপ্নে তাহাকে দেখিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, কপালকুণ্ডলা অমুভবের জিনিষ, বর্ণনার জিনিষ নহে। ভাব বর্ণনা কবা যায়, কিন্তু ভাবের ছায়া বর্ণনা কবা যায় না। কল্পনা বর্ণনা কবা যায় কিন্তু কল্পনার স্বপ্ন বর্ণনা কবা যায় না।

কপালকুণ্ডলা আদর্শ বমনী নহে, কিন্তু তবু চিত্র বিমোহিনী। ইহাব কতক কাবণ, এক প্রকাব বলা হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা বিজন মকভূমে বিমল সলিলধারা, কপালকুণ্ডলা বিমাতৃক্রোড়ে আদ্যবপাতিতা মাতৃহারা শিশু, কপালকুণ্ডলা প্রিয়তমা তনয়াব বিমালন মুখচ্ছবি। কপালকুণ্ডলা আমাদিগের নিকটে অতীতের স্মৃতি—বোঙ্গীর তন্ত্রা, নিদায়েব মলয় যারুত। এই স্বার্থময় কপটতা-ভাঙিত সংসাবে থাকিয়া থাকিয়া আমবা একান্ত ক্লিষ্ট হইবা পড়িয়াছি—সবলতামণী পবনমণী কপালকুণ্ডলা তাই আমাদিগের এত ভাল লাগে। কপালকুণ্ডলা যে সম্পূর্ণ সংসাব ছাড়া—তাই সংসারী আমবা, কপালকুণ্ডলা আমাদিগের নিকটে বড় অপূৰ্ণ, বড় মধুৰ। অমন ছবি ত আব কোথায়ও নাই। এমন সংসাব ছাড়া জীব আব কোথাও ত দেখিতে পাই না। কপালকুণ্ডলাকে যে আমবা এক সময়েও সংসারী বলিয়া আপনাব বোধ কবিতো পাবিলাম না। আব এ প্রকাব,—যত ছবি দেখিয়াছি, সকল গুণিই এক সময়ে না এক সময়ে আমবা আপনাব বলিয়া বোধ কবিতো পাবিয়াছি। রমণীর চিত্রে স্বামী প্রেমই জীবন স্বরূপ। এই জীবনটা আমবা প্রায় সকল ছাঁবতেই এই সংসাবেব বলিয়া চিনিতে পাবিয়াছি। অল্প সময়ে সংসাব ছাড়া ভাবিতে পারিলেও, এ সময়ে যেন তাহাৰা সম্পূর্ণ আমাদিগের বোধ হইয়াছে। সম্পূর্ণ সাংসারিক বোধ হইয়াছে। তাই, নিবন্দা, শকুন্তলা হইতে কপালকুণ্ডলাব অপূৰ্ণত্ব অধিক। কপালকুণ্ডলাব এই জীবনটি একবাৰ দেখে দেখি—এখানেও দেখিবে আমাদিগের সংসাবেব কিছু নাই। নবকুমাবেব প্রতি কপালকুণ্ডলাব অনুবাগ বা মনোভাব কপালকুণ্ডলাব এক অদ্ভুত বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বটুকু এত অপূৰ্ণ ও এত মধুৰ, যে শুদ্ধ এই টুকু যেন কপালকুণ্ডলাকে আমাদিগের হইতে এক পৃথক জীব করিয়া তুলিয়াছে। কপালকুণ্ডলাব প্রকৃতি মানবেব মৌলিক প্রকৃতি—ঈশ্বৰ পরিবৰ্ত্তিত বটে, কিন্তু তবু সামাজিক মানবেব প্রকৃতি হইতে তাহা কত অন্তর! কবির আমাদিগকে এই প্রকৃতিটি দূরে রাখিয়া একবাৰ দেখাইয়াছেন—আবার কাছে আনিয়া, তুলনাৰ আর একবাৰ দেখাইয়াছেন। এই মৌলিক প্রকৃতিব সহিত আমাদিগের সাম্য-

জিক প্রকৃতি তুলনা কবিলে, আমাদিগের হৃদয় বিশ্বয় বসে পরিপ্লুত হয়। সমাজ আমাদিগকে এখন এত দূরে আনিয়াছে? কোথায় কপালকুণ্ডলা—আব কোথায় আমরা—এই বিশ্বয়টিও কপালকুণ্ডলাব আব একাট সৌন্দর্য্য। সকল জড়াইয়া কপালকুণ্ডলা এত মনোহাবিণী। এত একবকম বলা গেল, কিন্তু স্বপ্নময়ী কপালকুণ্ডলাকে কিছুতেই বুঝাইতে পাবিলাম না। সে বিনা স্তার হাব, আকাশেব প্রতিমা ধবিতে গেলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ভোলাদাদার ব্রাহ্মণভোজন।

ভোলাদাদার ব্রাহ্মণভোজন বর্ণনা করার পূর্বে—ভোলাদাদা আমার কে? কি বকমের মানুষ ছিলেন? তাহা আপনাদিগের নিকট না বলিলে চলিবে কেন? অতএব শুনুন।

ভোলাদাদা পূর্ববঙ্গেব লোক এবং সকল পূর্ববঙ্গেব অধিবাসীৰ ছায় তিনিও স্বদেশবৎসল ছিলেন কিন্তু তাঁহার দেশবাৎসল্য অনেকেব অপেক্ষা কিছু বেশী মাত্রায় প্রবল ছিল। তিনি জানিতেন যে ঢাকাব মতন সহর নাই, গনী মিক্রা সাহেবেব ছায় বড় মানুষ নাই, বিক্রমপুরের লোকেব ছায় বিদ্বান নাই, পদ্মানদীৰ ছায় বড় নদী নাই এবং তাঁহার নিজেব ছায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও নাই। যে দিবস সংবাদপত্রে পাঠ করিলেন যে, আনন্দমোহন বসু ইংলণ্ডের কোম্বিউন বিশ্ববিদ্যালয়েব বেঙ্গলার হইয়াছেন, সেই দিবস ভোলাদাদা ছই হস্ত উত্তোলন কবিয়া নৃত্য কবিলেন এবং অর্ধ পয়সাব বাতাসা কিনিয়া সন্ধ্যার সময় গ্রামের বালকদিগকে ডাকিয়া হরিণুঠ দিলেন এবং বলিলেন, যে “এখন কল্‌কাতার বেটারা যা'য়া গলায় দরী দিয়া মরুক।” এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, আনন্দমোহন বাবু পূর্ববঙ্গে জন্মিয়াছেন। কিন্তু ভোলাদাদার নিজেব বিদ্যা সাধা ঢাকা কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে শেষ হয়, তথাপি তাঁহার

অহঙ্কার এবং সাহসের সীমা ছিল না। গবর্ণমেন্টের অধীনে এমন চাকরী নাই, যাহার জন্য তিনি দবখাস্ত করেন নাই।

ভোলাদাদা তাঁহাব পিতৃ অস্থি গঙ্গায় দেওয়ার জন্য একবার কলিকাতায় গিয়া কয়েক দিবস কালীঘাটের বাল্ললপাড়ায় থাকিয়া আসিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে তিনি গড়ের মাঠ, মন্সফোর্ট, লার্ট সাহেবের কুঠী, যাহুবর এবং গুপ্তশালা প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিয়াছিলেন এবং দুই একবার সেখানে গাড়ীতে কলিকাতায় দুই এক জন লোকের সহিত কথাবার্তাও করিয়াছিলেন, ইহাতেই তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ করিলেন যে, তিনি কলিকাতার সব দেখিয়াছেন, সব জানেন এবং সকল বড় বড় লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছেন। সেই কথা প্রমাণার্থ তিনি সর্বদা কলিকাতায়াসীব গায় 'গেলুম থেলুম' শব্দ ব্যবহার করিতেন এবং বলিতেন যে উক্ত নগরের সভ্যসমাজে প্রতিনিয়ত থাকিতে তাঁহাব কথা ফিরাই গিয়াছে। কথার কথায় কেশব সেন, দেবেন্দ্র ঠাকুর, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ও কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেন যে, এই সকল মহোদয়েরা তাঁহাকে পাইয়া বড় সম্মান ও সমাদর করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সুপারিসে তিনি ছোট লার্টের দ্বারা এক ডেপুটী মাজিষ্ট্রী লইতে পাবিতেন কিন্তু লবণায় স্থানের জলবায়ু তাঁহাব সহ্য না হওয়াতে, তিনি কলিকাতার দীর্ঘকাল থাকিতে ও এই চাকরী হস্তগত করিতে পাবিলেন না।

ভোলাদাদাব রূপের ব্যাখ্যা কত কবি ৭ শরীর যদি তাঁহাব কিঞ্চিৎ হৃষ্ট-পুষ্ট না হইত এবং সঙ্গে ভদ্রলোকের পবন পবিচ্ছদ না থাকিত, তাহা হইলে কাওয়া বাগদীবাও তাঁহাকে সজাতির ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিত না; কিন্তু ভোলাদাদাব মনে উন্টা ধারণা ছিল, তিনি আপনাকে আপনি বড় ত্রী-যুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন এবং কিসে রূপের আধিক্য হইবে, তৎপ্রতি তাঁহাব সর্বদা দৃষ্টি ছিল। প্রত্যহ প্রাতে স্নানের পরে কোশাকুশী পুষ্পপাত্র প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম গইয়া তাঁহাব পৈতৃক দীঘীর ঘাটের আধখানা জুড়িয়া বসিতেন কিন্তু পূজাতে যত সময় কয় লা হইত, তাহার অধিক সময়, তিনি একখানা চাবি পরসার টিনের পুতাত আয়না সম্মুখে রাখিয়া তাহাতে বাড় গুঁড়িয়া আপনার মুখ দেখিতে ও ফোঁটা কাটিতে এবং একখানা কাঠের চিরণী দ্বারা কেশবিভাশ করিতে কয় করিতেন। ঈশ্বর তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণ করিয়াছেন বলিয়া ভোলাদাদা সকল ক্ষুদ্র ও

গৌরবর্ণ ব্যক্তিকে হিংসা ও ঘেঁষ কবিতেন। এই জন্ত তিনি গৌরানন্দদেবকে অবতাব স্বীকার কবিতেন না, বলিতেন যে, “গোবা ব্যাটা তপাব কিসেব দেবতা” কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেব রং কাল ছিল বলিযা তাঁহাকে তিনি পূর্ণাবতাব বলিযা মানিতেন এবং বলিতেন যে, “অবতাব ত কৃষ্ণাবতাব এবং দেবী ত মা কালী, আর সকল বুট।”

পূর্ববঙ্গের সাধারণ নিয়মানুসারে ভোলাদাদাও অত্যন্ত পরিমিত ব্যয়ী ছিলেন এবং মুদ্রা তাঁহাব এমনই প্রিয় এবং যত্নেব দ্রব্য ছিল, যে তাঁহাকে কেহ কখনও গোটা টাকা ভান্ধাইতে দেখে নাই এবং তাহা বাঁচাইবাব জন্ত এমন কৰ্ম ছিল না যাহা তিনি না কবিতেন পাবিতেন। তাঁহাব হিসাবেব একটা দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা কবি, কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ অকচিকব ঘটনাব গন্ধ আছে, ক্রটিধ্বজী পাঠক তজ্জন্ত আমাকে কৃপাপূর্বক মার্জনা করিবেন। ভোলাদাদার পবিত্রাবাব মধ্যে কেবল স্ত্রী ও একটা পুত্র। পুত্রটা বড় হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ভোলাদাদা ব্যয়েব ভয়ে তাহাব এ পর্য্যন্ত বিবাহ দিতে পাবেন নাই। পুত্রের গুণাগুণ পিতাব শ্রায়, অতএব যৌবনের দোষ দমন কবিতেন তাহাব ক্ষমতা হয় নাই। ২২২৩ বৎসাবর সময় সে একটা জ্বীলোককে টাকা অভাবে তাহাব পিতাব গৃহেব দ্রব্য সকল চুৰি কবিয়া দিয়া সন্তুষ্ট কবিতেন চেষ্টা কবিতেন লাগিল। ভোলাদাদা দেখিলেন যে, আজ বাস্তাটা, কাল পিঠ-লেব কলসীটা, পবণ তাঁহাব স্ত্রীব এক জোড়া নূতন বস্ত্র অন্তর্ধান হইতে লাগিল এবং ভবিষ্যতে আবও ঐরূপ হইবে। পুত্রকে ধমকাইয়া নিবারণ কবাব সাধ্য নাই—বিশেষ লোকে শুনিলে পুত্রকে কেহ দোষী কবিলে না, পিতাকেই দোষী সাব্যস্ত কবিলে, কাবণ তিনি পুত্রের এখনও বিবাহ দিলেন না এবং সকলে ভোলাদাদাকে পুত্রের বিবাহ দিতে অল্পবেশ কবিলে, বিবাহ দিতে হইলে অন্যান্য ৭৮ শত টাকা ব্যয় হইবে কিন্তু ভোলাদাদা প্রাণ থাকিতে এত টাকা ব্যয় করিতে পাবিবেন না। এমন সঙ্কটে তিনি উভয়কূল বজায় রাখাব জন্ত এক মতলব আঁটিয়া এক দিবস পুত্রের অসাম্রাজ্যে সেই জ্বীলোকের বাড়ীতে যাইয়া তাহাকে বলিলেন যে, “বাহা পচা, (ভোলাদাদার পুত্রের আদবের নাম) ছোঁড়া দেখিতেছি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পাবে না এবং তুমিও শুনিলাম তাহাকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাক, লুকাচুবি কবিয়া তোমরা আর এইরূপে কত দিন কষ্ট পাউবে? আইস তুমি আমার বাড়ীতে যাইয়া থাকিলে চল, স্বামী জ্বর শ্রায় থাকিলে, কোনও কষ্ট হইবে না।”

স্ত্রীলোকটা সামান্য চাকরানী শ্রেণীর স্ত্রীলোক। সে ভোলাদাদার কথা শুনিয়া হাত বাড়াইয়া চাঁদ পাইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাব বিছানাপত্র লইয়া ভোলাদাদার সঙ্গে ভোলাদাদার গৃহে যাইয়া সংস্থাপিত হইল। ভোলাদাদার একটি বেতনভোগী চাকরানী ছিল—কিন্তু এই স্ত্রীলোকটা আসিবামাত্র ভোলাদাদা চাকরানীকে জবাব দিয়া স্ত্রীলোকটাকে বলিলেন যে, “বাহা তুমি যেখানে ছিলে, সেখানে ত আপনাব কাজ কর্ম কবিয়া থাইতে—এই বাড়ীও এইক্ষণে তোমাব বাড়ী হইল, অতএব গহস্থালী সকল কর্ম কাজ তোমারই নিকাহ কবিত্তে হইবে।” এইকপে ভোলাদাদা তাহাব চাকরানীর বেতন-গুলি বাচাইলেন, এবং পুত্রকে গৃহেব দ্রব্য সকল অশচর কবার বোণ হইতে মুক্ত কবিলেন। পুত্রের কিনা অপব লোকের চক্ষে এই কার্যটি যেভাবেই পবিগৃহীত হউক, কিন্তু ভোলাদাদাব চক্ষে ইহা একজন বেতনভোগী চাকরানীর পবিসংকে আব এক জন অবৈতনিক চাকরানী আনিয়া নিযুক্ত কবা ভিন্ন আব কিছুই নহে। এখন ত আপনাবা বুঝিলেন যে, আমার ভোলাদাদা কেমন স্তবুদ্ধি লোক, তবে আর আমি ব্রাহ্মণভোজনের বিলম্ব কবিব না। শুনুন।

পূর্ববঙ্গের এক জেলাব সদর স্থানে ভোলাদাদা এক চাকরী উপলক্ষ করিয়া সপরিবার বাস কবিতেন এবং সেই স্থানেই উপবি উক্ত ঘটনা হয়। ভোলাদাদা কেবল তাহাব বেতনের উপবে নিভব কবিতেন এমন নহে, তাহাব স্ত্রীব নামে তিনি অনেক টাকাব মহাজনীও কবিতেন এবং তাহাতে বেতন অপেক্ষা তাহাব বিলক্ষণ দণ টাকা আয় ছিল। ইতিমধ্যে এক দিবস সংবাদ আসিল যে তাহাব স্বত্ত্বের মৃত্যু হইয়াছে। কি করেন এক দিকে স্ত্রীব অমুখোপ আর এক দিকে লোক নিন্দা এড়াইতে না পাবিয়া অনেক ধনস্তা; ধনস্তাব পবে ভোলাদাদা একটা ঘোড়াশ কবিত্তে ও দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন কবাইতে সম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ক দিবসে আশাকে ডাকিবা বলিলেন যে “ভাই আমি ত এই সকল কার্য কখনও কবি নাই, অতএব এখানে আসিয়া কাল ব্রাহ্মণগুলিকে খাওয়াইতে হইবে।” তাহাতে আমি কহিলাম যে “তবে কি ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য একটা ফর্দে কবিত্তে হইবে?” তিনি উত্তর কবিলেন যে কেবল “শাস্ত্র বক্ষার জন্য দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ খাওয়াইতে হইবে, তাহাব আবার ফর্দের প্রয়োজন কি, আয়োজন যাহা করিতে হইবে তাহা আমি নিজেই করিব, ভোজনের সময় কেবল তুমি

আসিয়া পবিত্রেশন কবিলেই যথেষ্ট উপকার হইবে।” আচ্ছা বলিয়া আমি সম্মত হইলাম এবং পরদিবস যথাকালে ভোলা দাদার গৃহে গমন কবিলাম— দেখিলাম যে ঘবেব এক কোণে একখানা ডালাতে আন্দাজ এক সেব মোটা লাল চিড়া ও চোট এক মালসা দধি, এক সেব ক্ষীর, এক সেব কদর্যা শুড় ও এক সেব অপকৃত্ত চিনি, কয়েক খানা কলা পাতা ও কয়েক খানা কুশাসন সংগৃহীত হইয়া বহিয়াছে। এইরূপ আয়োজনেব স্বল্পতা দেখিয়া ইহাব দ্বাৰা ১২ জন ব্রাহ্মণের ভোজন কার্য্য নিৰ্ব্বাহিত হওয়া কঠিন বলিয়া, আমি প্রকাশ করিতে, ভোলা দাদা বলিলেন যে “না হয় আবও জিনিস বাড়ীৰ মধ্যে আছে আবশ্যক হইলে আনাইয়া কার্য্য সমাধা কৰা যাইবে।” ইহা শুনিয়া আমি নিমন্ত্ৰিত ব্রাহ্মণদিগেব প্রতীক্ষায় বসিয়া বহিলাম, ক্ষণ কাল বাদে দেখিলাম যে একটা লাঠীতে ভব দিয়া একটা ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভোলা দাদা তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম কবিলেন এবং মুখ্য্য মহাশয় বলিয়া আহ্বান কবিলেন। মুখ্য্য মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে অনেক কষ্টে আসনের উপব বসিলেন, দেখিলাম যে তাঁহাব হস্ত পদ মাংস শূন্য, উদবটি ক্ষীত এবং সেই উদবেব বাম ভাগের উপবে তিন চাবিটা ক্ষত স্থানে তৈলাক্ত, তলায় পটি বসান আছে, মুখের বং পাণ্ডুবর্ণ এবং শবীবে বিন্দুমাত্র রক্তেব চিহ্ন নাই। জামিলাম যে ব্রাহ্মণটি প্লীহা অগ্রমাস ও যকৃত্ত বোগে আক্রান্ত এবং তাঁহাব যে অবস্থা, তাহাতে যে তিনি আব দীর্ঘ কাল এইরূপ নিমন্ত্ৰণ থাইতে আসিতে পারিবেন, এমন বোধ হইল না। তাঁহাব পবে দুই ব্যক্তি ‘ক্ষক ক্ষক’ কবিয়া কাশিতে কাশিতে ঘবেব মধ্যে প্রবেশ কবিল, ইহাবা উভয়েই অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ, পঞ্জবেব অস্থি সকল বাহিব হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা এক একটা কবিয়া গুণিতে পাৰা ঘাষ, প্রত্যেকেব গলার্ধ কয়েকটি মাদুলী এবং বুকে পুৰাতন ঘৃত লেপিত ছিল, ইহাদের এক জনেব যক্ষ্মা ও আব এক জনেব ইপানী কাশী। এই দুই ব্রাহ্মণ বসিতে না বসিতে চতুর্থ নিমন্ত্ৰিত ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার উদরী বোগে পেট ফুলিয়া ঢাক হইয়াছে এবং তাহাব উপরে সবুজ বর্ণেব শিরগুলি ভূগোলেব মানচিত্রেব নদীৰ জায় অঙ্কিত হইয়া বহিয়াছে। কিঞ্চিৎ বিলম্বে পঞ্চম ব্রাহ্মণটি কর্ণেব উপবে পৈতা উঠাইয়া “ভোলা বাবু ঘটি কৈ? জলপাত্র কৈ?” বলিয়া দ্রুতবেগে ঘরের মধ্য হইতে একা গাড়ু লইয়া বাহিবে গেলেন, বুঝিলাম যে ইনি বহুমুত্র রোগে ভুগিতেছেন। ষষ্ঠ ব্যক্তি যিনি আসিলেন তাঁহার পাংয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ

হৰে ভেড়াৰ বোমৰ এক একটা অঙ্কুৰী এবং বাম কৰ্ণে হুত্ৰ দ্বাৰা এক কড়া কানা কড়ী ঝুলিতেছে। সপ্তম ব্যক্তি অতিশয় দুৰ্বল, দুই বাহুতে দুইটা গুল বসান আছে এবং দন্তগুলি মিসী দ্বাৰা ক্ৰম বৰ্ণ হইয়া গিয়াছে, তিনি বলিলেন যে বস-বাতে কয়েক বৎসর ধৰিয়া তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। অষ্টম ব্যক্তিৰ আধ কপালে শিরঃশীড়া। নবম ব্যক্তিৰ অন্ন শূল বোগ; আহাৰ করিলেই বমন হইয়া সকল উষ্ণিয়া যায়, কখন কিছুমাত্র ক্ষুধা হয় না। দশম ব্যক্তিৰ বিন্ধুচিকা বোগে জীৰ্ণ কবিবার শক্তি এককালেই লোপ পাইয়া গিয়াছে, এবং আহাৰে কিছুমাত্র অনিয়ম হইলেই পীড়ার আধিক্য হয়; এই যে দুই গ্ৰহৰ বেলা হইয়াছে তথাপি তিনি যেন সদ্য আহাৰ কৰিয়াছেন এইরূপে দেখু বুলিতেছেন। একাদশ ব্যক্তিৰ যদিও যথার্থ এবং দ্ৰষ্টব্য কোন পীড়া ছিল না, তথাপি তিনি মনে মনে আপনাকে সৰ্ব্বদাই অত্যন্ত পীড়িত বিবেচনা কৰিতেন এবং নিযমিত আহাৰ্য্য লঘু দ্ৰব্য ভিন্ন নূতন কোন দ্ৰব্য খাইতে হইলেই তাহাব যৎপরোনাস্তি আগ্ৰহ হইত। দ্বাদশ ব্ৰাহ্মণটী বুবা এবং বলিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে তাহাব বড় ওলাউঠা হইয়াছিল, এবং সেই পর্যান্ত তিনি অত্যন্ত বাছিয়া গুছিয়া এবং সাবধান হইয়া আহাৰ কৰেন। এই দ্বাদশটা মুষ্টি সমবেত হইলে পৰে ভোলাদাদা আমাকে তাহাদেব শুনাইয়া বলিলেন যে, “দেখ ভায়া, ইহঁদা সকলে বড় সম্ভ্রান্ত এবং মহামান্য ব্ৰাহ্মণ, অশূদ্ৰ-পরিগ্রাহক, কাহারও বাডীতে আহাৰ করেন না, কেবল আমাকে শ্রদ্ধা করিয়া আমার নিমন্ত্রণ গ্ৰহণ কৰিয়াছেন, তুমি ঠাকুৰদেৱ খুব কৰিয়া থাওয়াইবা যেন কোন বিষয়ে ক্রটি হয় না।” কিন্তু আমি দেখিলাম যে, তাহাদেব মৰ্যে কেহই খুব কৰিয়া থাইবার লোক নাই, অধিকাংশেব একথানা বাতাসা থাইয়া হজম করা দুৰ্বল, তবে বলিতে পাবি না, নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তিরা ব্ৰাহ্মণ; ব্ৰাহ্মণ না পাবেন এমন কৰ্ম নাই; সহস্ৰ পীড়িত হইলেও ব্ৰাহ্মণ ফলাবে মজবুত। সে যাহা হউক, পরন্তু আমি পরিবেশন কৰিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে বিন্ধুচিকা রোগগ্ৰস্ত ব্ৰাহ্মণের পাতায় চিড়া দিতে উদ্যত হওয়ার, তিনি পাতাব উপরে দুই হস্ত বিস্তীৰ্ণ কৰিয়া চিড়া দিতে নিষেধ কৰিলেন। ব্ৰাহ্মণ ততই নিষেধ কৰেন, ভোলাদাদা ততই “দেও দেও” বলিয়া জ্ঞানামাকে উত্তেজিত করেন। ব্ৰাহ্মণ অবশেষে উপুড় হইয়া পড়িয়া চীৎকার শব্দে বলিতে লাগিল যে, “ভোলা বাবু রক্ষা কর, আমাকে চিড়া দিও না, চিড়া থাইলে অম্বাই ওলাউঠা হইয়া মৰিব, আমি কোথাও নিমন্ত্ৰণ থাইতে যাই না, কেবল

ভোমাব কবেকটা টাকা ধারি বলিয়া সেই খাতিরে ভোমার নিমন্ত্রণে আসি-
 বাছি, নচেৎ আমার এখন নিমন্ত্রণ খাওয়ার সময় নহে, রক্ষা কর চিড়া দিও না”
 ভথ্যাপ ভোলাদাদার “দেও দেও” শব্দ থামে না। এইরূপ আরও কয়েক
 জনে চিড়া লইলেন না, যাহারা লইলেন, তাহারা কেহ একমুষ্টি কেহ অর্দ্ধমুষ্টি
 লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। তামাসা দেখিলাম যে, যাহারা নিবেদন করেন, তাঁহাদের
 বেলাই ভোলাদাদা বারম্বার “দেও দেও” বলিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহারা লই-
 লেন, তাঁহাদের সময় তিনি একটা কথাও বলিলেন না। পবিত্র দধি দেওয়ার
 সময়ও ঐরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল। এক বহুমুত্র বোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন
 আর সকলেই দধি দেওয়ার সময় হস্তদ্বারা পাতা ঢাকিয়া বহিল—বিশেষ
 যাহাদের কাশী ও বসবাত, তাহারা আমি তাঁহাদের নিকট দধি লইয়া উপ-
 স্থিত হইবামাত্র “না না আমাদের দৈ দিও না, দৈ আমাদের বিষ, দৈ খাইলে
 মরিয়া যাইব” বলিয়া নিবেদন কবিলেন। ক্ষীর সম্বন্ধেও তদ্রূপ কেহ ছই
 ফোঁটা কেহ এক ফোটা মাত্র লইলেন। বস্ত্ত অধিকাংশ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি
 এক কালেই কিছু খাইলেন না, কেবল নিমন্ত্রণ বক্ষা কবার জন্ত এক চিমটি
 গুড় কিম্বা চিনি মুখে দিয়া এক ঢোক জল পান কবিলেন। এবস্ত্রকালে
 ভোলা দাদার ঋণেব শ্রদ্ধে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজনের কার্য সমাধা হইল।
 পবে জানিলাম যে উইঁবা সকলেই ভোলা দাদার খাতক এবং সেইজন্ত
 ঔঁহা। ভোলা দাদাকে সন্তুষ্ট বাখিব নিমিত্ত আসিয়াছিলেন ; প্রকৃত পক্ষে
 তাঁহাদের কেহই নিমন্ত্রণ খাইবার ব্যক্তি নহেন। দেখিলাম যে আহাবের যে
 সকল দ্রব্য দেখিয়া আমি অতি স্বল্প বিবেচনা কবিয়াছিলাম, ফলে তাহা প্রচুর
 অপেক্ষাও অধিক হইল কারণ সকল দ্রব্যই কিছু উদ্ভূত হইয়া বহিল।
 ব্রাহ্মণেরা চলিবা যাওয়ার পবে ভোলা দাদা হস্ত বদনে আমাকে বলিলেন
 “দেখলে ভায়া কেমন ব্রাহ্মণ ভোজন কবাইলাম, শাস্ত্রও বক্ষা হইল এবং
 পদ্মনাও অধিক খবচ হইল না, এইরূপ না কবিলে গৃহস্থলি চলে না।” আমি
 ভোলা দাদার পদধূলী লইয়া প্রস্থান কবিলাম।

শ্রীমতী রাধিকা নিকুঞ্জে ।

*
 তপন-তনয়া-তটে, মধু-কুঞ্জ-কাননে
 মদল-মলয়ানিলে, কুমুম-কামিনী ছ'লে
 মধুকব-কবে ধবি, হাসি, 'ও কি বলিছে !—
 —বাধিকাবরণে মোব তবে বুঝি দেখেছে !
 মাধব মাধব-কথা, অথবা এনেছে তথা
 কি বলে উড়াবা যাই চূপে চূপে শুনিগে,—
 —বাধিকা-হৃদয়-নিধি পাই যদি দেখিগে !
 ওহে শ্যাম শশধব রাধিকাব প্রীতি-কব,
 স্মৃথব কৌমুদীবাণি তোমা সনে গিয়াছে,—
 —ধোব-তব অঙ্ক-কাবে ব্রজ ধাম ডুবেছে !
 না জুনি মূবলী ধরনি, না উজ্জ্বলে সে তটিনী,
 শিখিনী ছথিনী এবে নৃত্য করা ভুগেছে !—
 —তমাল-কদম্ব-তল শোভাহীন হয়েছে !
 আহা মবি একি একি, পত্রের মাঝারে থাকি'
 “কুহ—কুহ” ববে ওই কে সহসা ডাকিল।—
 —নিকুঞ্জ-বিহারী মোব নিকুঞ্জে কি আসিল ?
 হৃদয়-উজ্জল মণি, এসেছ এসেছ তুমি !
 মুবলী সুরবে নাথ দাসী তোমা চিনেছে !—
 —শ্রবণ-বজ্রন-ধ্বনি জ্ঞান-হারা করেছে !
 যাই যাই ভবা কবি, হেরিগে প্রাণেব হবি,
 সূচাক-বদন-পদ্ম কত শোভা ধরেছে !—
 —না হেরি'এ অভাগীবে বুঝি লান হয়েছে !
 সখী-গণ কোথা এবে, আর লো আর লো সবে,
 হৃদয়-পিঞ্জর পাখী চূপে চূপে ধবিবে !—
 —জানিলে রাখালগণ কাড়ি' লয়ে পলাবে !
 এই যে এই যে পাখী, পত্রের মাঝারে থাকি,
 “কুহ কুহ” ববে এই জগতে মাতায় লো !—
 বেগুর সুরব হেন, মন মনে ভাব গো !

কপটতা করি' কালা, ছলিতে ব্রজের বালা,
 বুকেছি বুকেছি নাথ, বিহঙ্গিনী হয়েছে!—
 —“কৃষ্ণ-কালী-রূপ” ধরি' মোরে রক্ষা করেছে!
 দাঁড়ায়ে তমাল তলে, ডাকি “নাথ—নাথ” বলে
 অশ্রুবাণি দরদরি কপোলে ভাষায় হে,
 —শবত সুধাংগু মুখে চুষিতে যাহায় হে!
 নবজলধব-রূপ, ব্রজ-বধু-কাম-কূপ
 আহা মবি সহচরি স্ববাকরি আয় লো!
 —এবাব ধবিলে শ্রামে কেবা লয়ে যায় লো!
 মোব তবে বুবি বুবি, আঁখি ছুটা অ'হা মবি,
 তরুণ-অরুণ-ভাতি দেখ দেখ হয়েছে।—
 সখি সখি কৃষ্ণ-পাখী, এ নহে লো কৃষ্ণ পাখী,
 “কুকু—কুকু—কুকু” বলি ওই দেখ উড়িল।—
 —কোকিলা সবলা বালা জুড়ে বাজ তানিল।
 উড়িল মাধব-ঘোষা, অধীনা মাধব-ঘোষা,
 “হায় নাথ কোথা তুমি” বলি ভূমে পড়িল।
 —গলিত-কববী মবি ধুলি মাখা হইল।

মাক্বেথ ও হাম্লেট ।

৬

শঙ্করদত্ত প্রান্তবভূমিতে ডাকিনীবা বিচরণ কবিত্তেছে। এবাব তাহা-
 দেব সঙ্গে তাহাদেব পরিচালিকা হিকেট আছে। ছবাকাজ্জার পরিচালিকা
 আর কি? পৈশাচিকী মায়া। মায়া বলিয়া দিল ‘এবার মাক্বেথকে এমনই
 করিয়া ভেল্‌কি দেখাইতে হইবে, যেন—

কুহকের কুহেলিতে হয়ে সে আচ্ছন্ন,
 একেবারে হয় তাতে পুবা মতিচ্ছন্ন।
 অদৃষ্ট ঠেলিবে পায়ে, না ডবিবে মরণে,
 দ্ব্যধম ভয়শূন্য আশাব ছলনে।

আত্মবলে কবিরে সে অটল বিশ্বাস,
আত্মস্তর (ই) মানুষের কবে সর্বনাশ ।*

বাস্তবিক আত্মনির্ভবে আপনাকে নিরাপদ মনে করাই মানুষের বিষম ভ্রম, ঐ বিশ্বাসই মানুষের প্রধান শত্রু, উহাতেই সর্বনাশ হয়। স্বাধীন চিন্তা, স্বাবলম্বন, স্বানুবর্তিতা, সহজ জ্ঞান, বিবেক—* বলিয়া যতগুলি ভাব জাহাজে আমদানি হইয়াছে—এ সকলই আত্মস্তরবিতাব নামমাত্র। ঐ গুলাই আমাদের প্রধান শত্রু। বালককালে পিতামাতা—উপাধ্যায়, আচার্য্য,—উপদেষ্টা ও দৃষ্টান্তদাতার উপর ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, নির্ভর কবিতো হয়। গৃহস্থ হইলে, ধর্মশাস্ত্রে ও ব্যবহাবশাস্ত্রে (আইনে) নির্ভর করিতে হয়। যে গৃহস্থ-শ্রমেব উর্দ্ধে যাইতে পারে—সে জগদীশ্বরে নির্ভর কবে। আত্মনির্ভবেব স্থল নাই—যে মাথাগোহে ভ্রান্ত, সেই আপনাতে নির্ভর কবিতা নিরাপদ মনে কবে। কিন্তু যে মহাপাপী, সে ত নীতি মানে না, ধর্ম মানে না—মাকবেথ নিজেরই বলিয়াছেন, † সে প্রাণ ভরিয়া একবার বলিতে পারে না, যে ভগবান আমাকে বক্ষা কব। স্মৃতবাং তাহার ত আব নির্ভর কবিতাব কিছু নাই—কাজেই সে আত্মনির্ভর কবে স্মৃতবাং সর্বনাশের পথে সহজেই যায়, মাকবেথ যাইতে বসিয়াছে।

ষষ্ঠ দৃশ্বে দুই জন ওমবা ডক্কান্ ও বাক্কোর হত্যার কথা ভাবিতেছেন—চর্কিত মাকবেথের হস্তে দেশের ছরবস্ত্রাব কথা চিন্তা কবিতোছেন ; মাকডফ ইংলণ্ডে পলায়ন কবিতোছে, তিনি যেন ডক্কানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাল্‌কোমকে লইয়া সত্বর দেশে ফিরিয়া আসিয়া, অভাগা মাকবেথের হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধার কবেন তাহাবই জন্ত প্রার্থনা কবিতোছেন। ইহাতেই তৃতীয় অঙ্কের শেষ হইল।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্বে এক গিবিগুহাব অভ্যন্তরে বৃহৎ কটাহ টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। সেই তিনটা ডাক্কিনী ধিবিদ্য দাঁড়াইয়া আছে। গুহা-মুখে বাহিরে নজ্জ গর্জ্জন কবিতোছে।

* বিলাতী আমদানি ছাড়া দেশী বিবেকও আছে, তাহার অর্থ—এমন শক্তি যাহার দ্বারা একটু হইতে অন্তর্ভুক্ত পৃথক করা যায়—শক্তির নাম বিবেক—কাজের নাম বিবেচনা। মন্দ কাজ করিতে গেলে, তিতরে যে মিট্‌মিট্‌নি হয় তাহা আত্মগ্রাসি, ভাল কাজে যে শক্তি হয়, তাহা আত্মতৃষ্টি। উভয়ই আত্মার ভাব মাত্র। † ২১০ পৃষ্ঠা দেখ।

ডাকিনীরা জলন্ত কটাছে নানা প্রকার টোটকা টাটকা বেলিতেছে—ও সেই কড়া ঘিঘিয়া ঘিঘিয়া গান করিতেছে। এবার সে সাবেক ধূম্র বদলাইয়াছে। এখন আর বলে না—

সুন্দরকে মন্দ ভাবি, মন্দকে সুন্দর।

ওত পাপীর প্রথম অবস্থাব মনের ভাব ; এখন কি বলিতেছে শুন,—

ঘুরিবে, ফিবিবে,—খাটিবে, খুটিবে,—
আগুণ জ্বলিবে,—কড়া ফুটিবে।

এই কথাই ঠিক। এখন হইতে দেখিবে মাক্বেথে পাপের ছটফটানি ঘরিয়াছে ; মাক্বেথ যতই ঘুবিতেছেন, ফিবিতেছেন, শাসন কবিতেছেন, সংগ্রাম কবিতেছেন, তাঁহাব মনের আগুণ ততই জ্বলিয়া উঠিতেছে—স্বদগ্ধ কটাহ ততই টগবগ্ কবিয়া ফুটিতেছে। মহাপাপের ঐ আব এক সাজা ! সৎপথে থাকিলেও নানারূপ শোক-দুঃখ জালা-ময়না আছে—কিন্তু পাঁচ কালে তাহাব অনেকটা ভুলিয়া থাকা যায়। কিন্তু মহাপাপী—

যতই—ঘুবিবে, ফিবিবে,—খাটিবে, খুটিবে।

ততই—আগুণ জ্বলিবে,—কড়া ফুটিবে ॥

হিকেট আসিয়া দেখিল, ডাকিনীবা বড়ই যোগাডযন্ত্র করিয়াছে—হিকেট বড় খুসী হইল। গান জুড়িয়া দিল—এমন সময় মাক্বেথ আসিল। সে বার ডাকিনীবা স্তবোধগ বুঝিয়া মাক্বেথকে দেখা দিয়াছিল, এবার মাক্বেথ স্বয়ং অভিসার কবিয়াছে।

মাক্বেথ বলিলেন, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তোমাদিগকে তাহার উত্তর দিতে হইবে। ডাকিনীরা জিজ্ঞাসা কবিল, আমাদের মুখে উত্তর শুনিবে, না আমাদের পরিচালক উপদেবতাগণের স্থানে শুনিবে ? মাক্বেথ বলিলেন, ‘তাহাদের নিকটেই শুনিব।’ তখন ডাকিনীরা সকলে মিলিয়া প্রেতবোনিদের আহ্বান করিতে লাগিল।

বজ্রধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই এক সশস্ত্র মূর্তি দেখা দিল। মাক্বেথ প্রশ্ন কবিতে যাইতেছিলেন, ডাকিনীরা বলিল, “প্রেতমূর্তি তোমার মনের কথা বুঝিয়া নিজেই বলিবে, তোমাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না”

প্রেতমূর্তি বলিল—“মাক্বেথ সাবধান ! মাক্‌ডুফ্‌কে অবধান করিও।”
মূর্তি অন্তর্হিত হইল।

আবার বজ্রগর্জন হইল । রক্তাক্ত এক বালক হইল । বলিল, “মাক্বেথ মাঠে নারী জঠর-প্রসূত কেহ তোমার কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না” বলিয়া অন্তর্হিত হইল ।

আবার বজ্রের হুঙ্কার । মুকুটমস্তক এক বালক, হস্তে একটি বৃক্ষ ধূরিয়া আছে ; এই মূর্তিতে তৃতীয় প্রেত আবির্ভূত হইল ; বলিল, “মাক্বেথ কিছুতে ক্রক্ষেপ করিও না যতক্ষণ বর্ণান বন ডন্সিনেন পক্ষিতে না আসিবে, ততক্ষণ তোমাব পরাজয় নাই ।” মূর্তি অন্তর্হিত হইল, মাক্বেথ মহা আনন্দিত হইলেন ! বলিলেন, “তোমরা পাব যদি আর একটি বিষয়ে আমরা কোতূহল পবিতৃষ্ণ কব । বল বাস্তব বংশ এই রাজ্যে বাজা হইবে কি না ?” ডাকিনীরা দৃশ্যপটে দেখাইতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে আট জন রাজা দেখা গেল, শেষের হস্তে একখানি দর্পণ আছে—সেই দর্পণে আব কত রাজার মূর্তি রহিয়াছে—পশ্চাতে রক্তাক্ত বাস্কা মাক্বেথের পানে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে যাইতেছেন । ঈর্ষায় মাক্বেথের হৃদয় শুক হইয়া গেল, ডাকিনীরা তাহার উপর নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল ; মাক্বেথ ঈর্ষায় ক্রোড়ে বিহ্বল—একটু পবে চাহিয়া দেখেন ডাকিনীবা অন্তর্হিত হইয়াছে । ‘গুহাব বাহিরে কে আছে ?’ বলিয়া মাক্বেথ জিজ্ঞাসা কবিলেন । বাজসহচর লেনক্স আসিলেন বলিলেন “ডাকিনীদের দেখিয়াছ ?” লেনক্স বলিলেন “না ।” “তোমার ঐ দিক দিয়া তাহা আসে নাই ?” লেনক্স আবার বলিলেন “না ।” তখন মাক্বেথ দস্ত কডমড়ি কবিয়া বলিলেন, “তবে দেখিতেছি, তাহা বায়ুপথে যাতায়াত কবে—তাহাদের গম্য পথেব বায়ু উচ্ছিন্ন যাউক ও তাহাদের কথায় যে বিশ্বাস করে সেও উচ্ছিন্ন যাউক ।”

মাক্বেথ ! এখন যাই ডাকিনীদের প্রদর্শিত পরিণামে বিশ্বাস করিতে তোমার কষ্ট হইতেছে, তাই তুমি শাপাতাপা করিতেছ—কিন্তু ঐ ডাকিনীরা যখন তোমাকে ভাবি নবপতি বলিয়া সম্বোধন কবে, তখন বড় আনন্দে বিশ্বাস করিয়াছিলে ! ‘যে ডাকিনীদের কথায় বিশ্বাস করে, সে উচ্ছিন্ন যাউক, একথা তুমি আর কাহাকে বলিতেছ ? তুমিত তোমার নিজের কথারই বলবন্ত প্রমাণ !

মাক্বেথ লেনক্সকে জিজ্ঞাসা কবিলেন “অন্ধুর ধনি শুনিতে ছিলাম—কে আসিয়াছে ?” “দুই তিন জন দূত আসিয়াছে—তাহাদের সংবাদ এই যে মাক্‌ডক ইংলণ্ডে পলায়ন কবিয়াছে ।” তখন মাক্বেথ ভাবিতে লাগিলেন

‘দেখ মাক্‌ডকে হত্যা কবির মনে কবিয়াছিলাম, বিলম্ব কবাতেই কার্যাসিদ্ধি হইল না এখন হইতে হৃদয়ে যখন বাহা স্থির করিব কার্যে তখনই তাহা করিব। মাক্‌ডফ্ পলাইয়াছে, আচ্ছা! তাহাব জ্ঞী-পুত্র ত আছে, সকলকে প্রাণে নষ্ট কবিব। মিথ্যা নিকোঁধেব মত কতকগুলো সাহস্কাব সংকল্প করিয়া ফল কি? সদ্যোজাত সংকল্প সদ্য সদ্যই কার্যে সুসিদ্ধ করা আবশ্যক।’ এই বলিয়া আগন্তুক দূতদেব সহিত সাক্ষাৎ কবণার্থ—লেনক্সেব সহিত প্রস্থান করিলেন। চতুর্থ অঙ্কেব প্রথম দৃশ্য শেষ হইল। পাঠক এই সময়ে একবাব মাক্‌বেথ নাটকেব মূল কথা শ্রবণ কবিবেন—ভূতান্ত্রিক শীঘ্রঃ।

দ্বিতীয় দৃশ্য মাক্‌ডফ্ ভবনে। গৃহিণীকে না বলিয়াই মাক্‌ডফ্ ইংলেণ্ডে পলায়ন কবিয়াছেন। গৃহিণী আপনাব শিশু সন্তানেব সহিত সেই বিষয়ে কথাবার্তা কহিতেছেন। ছেলেটি বড ঢালাক চতুৰ, মায়ের সঙ্গে কেমন কথায় কাটাকাটি কবিতোছে—মাক্‌বেথেব প্রেবিত ষাটুকগণ প্রবেশ করিল—মাতৃ-সমক্ষে সেই অপোগণ্ড শিশুকে হত্যা কবিল, লেডি মাক্‌ডফ্ পালাইয়া গেলেন, ষাটুকরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মাক্‌বেথ যে বলিয়াছিলেন, মাক্‌ডফেব পুত্রী সগোষ্ঠী নষ্ট কবিবেন, তাহাই হইতে লাগিল। নবহত্যা মায়াচরী সহস্র কবণ মুষ্টিতে ঝটলঙেব গৃহে গৃহে বিচরণ কবিতো লাগিল।

তৃতীয় দৃশ্য ইংলেণ্ডে বাজভবনে। মালকাম্ মাক্‌ডফেব সহিত পরীক্ষা কবিতোছেন। দেখিলেন সেই হৃদয় দেশভক্তি পবিপূর্ণ, দয়া মায়ায আশ্রুত। উভয়ে কথাবার্তা হইতোছে, লর্ড বস আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, মাক্‌বেথেব আদেশে মাক্‌ডফেব জ্ঞী-পুত্র কত্যা দাসদাসী সকরাই হত হইয়াছে। ‘হা ভগবান’ বলিয়া মালকোম শিহবিয়া উঠিলেন। মর্য়াহত মাক্‌ডফ্ মুখ নত কবিয়া চক্ষু আবরণ কবিবাব চেষ্টা কবিতো লাগিলেন। একবাব জিজ্ঞাসা কবিলেন—“সন্তানগুলি সব গিবাছে?” ক্ষণপবে আবার জিজ্ঞাসা কবিলেন, “আমাব জ্ঞীও গিয়াছেন?” বস্ বলিলেন—আমি ত বলিয়াছি—কিছুই নাই,” তখন দীর্ঘ নিশ্বাস তাগ কবিয়া বলিলেন—“মাক্‌বেথেব সন্তান নাই। হাব হাব, একবারে কচিকাটা ছেলেগুলি—তাদেব প্রস্থতি শুদ্ধ সব গেল!” তখন মাক্‌ডফ্ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি একবাব সন্মুখযুদ্ধে মাক্‌বেথেব হৃদয়ে আপনাব অস্ত্র পরীক্ষা কবিবেন। এক অভিমুখ্যবে ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা গুনিয়াছেন, এখন সর্বস্ব খোয়ায়ে মাক্‌ডফেব প্রতিজ্ঞা দেখিলেন। এই প্রতিজ্ঞায় চতুর্থ অঙ্ক শেষ।

পঞ্চম অঙ্ক বাজপ্রাসাদে । রাজমহিষী লেডি মাক্বেথ অসুস্থ হইয়াছেন ।
 রাত্রিকালে তাঁহাকে ‘নিশিতে পায়,’ তিনি গাঢ় নিদ্রিতাবস্থায় বিচরণ করেন,
 কথা কহেন—কত কি কবেন । এইরূপ বোগের সময় বোগিণীকে দেখিবাব
 নিমিত্ত একজন চিকিৎসক প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন ; প্রথম দৃষ্টে রাজ্ঞীর
 একজন পবিচারিকাব সহিত তাঁহার ঐ বিষয়েই কথোপকথন হইতেছে ।
 এমন সময়ে জলন্ত বাতি হাতে লইয়া লেডি মাক্বেথ শনৈঃ শনৈঃ আসিতেছেন ।
 লেডি মাক্বেথ সংজ্ঞাশূন্য, অথচ চক্ষু চাহিয়া আছেন ; কিন্তু আপনার খেপালে
 যাহা কিছু দেখিতেছেন, তাহা ছাড়া আব কিছুই দেখিতেছেন না । চিকিৎসক
 দেখিতে লাগিলেন, লেডি মাক্বেথ বাতি রাখিয়া হাত ধুইবাব মত ভাবে হাত
 কচলাইতেছেন । পবিচারিকা বলিল, যখনই নিশিতে পায়, তখনই ঐরূপ করিয়া
 থাকেন । তাহাব পব ঐভিত্তে শুনিতে লাগিলেন, লেডি মাক্বেথ আপনা
 আপনি বলিতেছেন ;—

এই যে আব একটা দাগ বহিয়াছে ।

দূব ছাই ! পোড়া দাগ ধুলেও যায় না ।

(যেন ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া)

এক—চুই—এইত কাজেব সময় ;

নরকেব কি আঁধাব ! ছি ছি—প্রভু

তুমি যোদ্ধা—তুমি বীর !—তুমি ভীত হবে ?

কে জানিল, না জানিল, তাহাতে ক্ষতি কি ?

আমাদেব বাজশক্তিব প্রতিযোগ ত নাই ।

—কে জানিত বুক দেহে অত রক্ত ছিল ?

চিকিৎসক পবিচারিকাকে ইঙ্গিত করিলেন ।

লেডি মাক্বেথ বলিতে লাগিলেন ;—

মাক্ডফেব গৃহিণী—কোথায় এখন তিনি ?

না—এই হাত ছটা হবে না পরিষ্কার !

আর কেন প্রভু ? ওসব কথা আর কেন ?

ওরূপে চমকি তুমি সব নষ্ট করিবে !

(হস্তের জ্ঞাপ লইয়া)

রক্তেব দুর্গন্ধ হস্তে এখনো রয়েছে,

আরবেব গন্ধদ্রব্যো, হবে না সুগন্ধ !

ওহ !

চিকিৎসক । কি বিষয় খ্যাস ! ক্ষত বন্ধে কি যত্নণা !

পবিচারিকা । বাহ্যিক মর্যাদা সঙ্গে চাহিনা কখন

অস্তরের ঐ ভার করিতে ধারণ !

লেডী মাক্বেথ বলিতে লাগিলেন,—

ভীত কেন ? হাত ধোও, পব রাত্রিবাস—

বাব বাব বলিতেছি বাক্তো কববেতে,

কবর হইতে কেহ আসিতে পাবে না ।

শোও গিয়া—শোও গিয়া—দ্বারে শব্দ হয়—

এসো, হাত ধবো—যা হবাব তা হয়েছে

ফিবে পাওয়া যাবে না—শোও গিয়া—শোও গিয়া ।

মাক্বেথ গৃহিণী ও গিয়া শয়ন কবিলেন ।

চিকিৎসক বলিলেন ;—

“দৈব বল আবশ্যক—ঔষধে হবে না ।” এই স্থলেই প্রথম দৃষ্টের শেষ হইল । বস্তুবিক পাপের পবিণাম রূপ মহাব্যাধির জড ঔষধ নাই ।

ইহাব পব তৃতীয় দৃষ্টে মাক্বেথ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা কবিতেন,—

জান না কি বৈদ্যবাজ শুক্রা করিতে

পীড়িত মনেন ? উপাডিতে স্থতি ক্ষেত্র

হতে বজ্রমূল শোক তরু ? মুছিবাবে

মস্তিষ্কে অঙ্কিত যত কলঙ্ক কালিমা ?

দুর্ভাব রুদয়েব ভাব খসাইয়া,

পাব না কি বিস্মৃতিব স্নিগ্ধ তৈল দানে

জুড়াইতে জীবনের জলন যন্ত্রণা ?

চিকিৎসক উত্তর দিলেন,—

আমাদেব হাত নাই—অই সব স্থলে,

আপন চিকিৎসা রোগী আপনি কববে ।

পূর্বেব কথাব সহিত এই কথাটি গ্রহণ করিতে হইবে ;—

“দৈববল আবশ্যক—ঔষধে হবে না ;”

“আপন চিকিৎসা বোগী আপনি কববে ।”

মহাপাপের পবিণামে যে সকল মহাব্যাধির উৎপত্তি হয়—এক মাত্র দৈব-বলেব আশ্রয় লইয়া বোগীই কেবল সেই রোগেব চিকিৎসা করিতে পারে ।

একপ বোগী যদি আপনাব বোগ বৃদ্ধিতে পারে—যদি বৃদ্ধিতে পারে, যে পাপের পবিণামে তাহাব মানসিক পীড়া হইয়াছে, যদি তাহাতে ক্রমে তাহার মনে অনুশোচনাব উদয় হয়—ক্রমে ধোবতব আত্মশ্রান্তিতে আক্রান্ত হয়—ক্রমে অগাধ নিরাশে নিমজ্জিত হয়,—যদি সেই অনন্ত নিরাশার মধ্য হইতে একবাব অনন্ত মঙ্গলকে স্মরণ করিয়া বলিতে পারে—

মাধব মন্তু পরিণাম নিরাশা !

তুহ জগতারণ, দীন-দরাসর,

অতরে তোহাবি বিশোদাসা ।

তবেই রোগী সেই দৈববলে বলীয়ান হইয়া, আপনাব চিকিৎসা আপনি কবিতে পারে । সকল দেশেই একই রূপ ব্যবস্থা ।

দ্বিতীয় দৃষ্ট, ডনসিগেন্‌ নিকটস্থ পল্লীপ্রদেশ। লেন্সন স্বভূতি চারিজন প্রধান সর্দার বহুতর সেনা-সম্মেলন মাক্বেথ হস্ত হইতে দেশোদ্ধারার্থ আগত-প্রায় মালকোমের সহিত যোগ দান করিতে বাইতেছেন। অল্পদূর ক্রমে মাক্বেথের মনের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। মাক্বেথ হুঃসাহসে উন্নত প্রায় হইয়াছে, কিন্তু সিংহবৎ গর্জন করিতেছে, বাজ্য আধিপত্য নাই, সেনা মধ্যে স্নান্য নাই। মাক্বেথ গুপ্ত বিদ্রোহী—নক্ষ লক্ষ প্রকাশ্য বিদ্রোহী তাহার বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছে।

তৃতীয় দৃষ্ট, ডনসিনেনস্থ রাজভবনের মধ্যে মাক্বেথ চিকিৎসক এবং অমৃতবর্গ। হিবণ্য কণ্ঠি পু আপন মৃত্যু-সাধন দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে ব্রহ্মাবব পাইয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয় ছিল, মাক্বেথ কিন্তু ডাকিনীদেব ভবিষ্যদগণনার বিশ্বাস কবিত্যাগ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। বাব বাব সেই কথা দুইটার জল্পনা কবিতোছে—বলিতেছে বর্ণাম বল ডনসিনেনে না আসিলে, আমাব আব ভর কি ? আব মালকোমকেই বা ভর কি ? সেত নাবীগর্ভজাত ”। একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল, দশ হাজার ইংবেজ কোজ আসিতেছে মাক্বেথ দূতকে দূর করিয়া দিল। আপনাব বিষয় পবিণাম একবার চিন্তা কবিল ভাবিল এ বয়সে কোথায় মান সন্নিব—স্নেহ ভালবাসা—বন্ধ বান্ধব থাকিবে—না চারি দিকেই শত্রু—শত্রু—বিসম্বাদ এবং অতিসম্পাং। মাক্বেথ ছটফট কবিতোছে—কি কবিবে কিছুই স্থির কবিতো পারিতেছেন না—ভৃত্যকে টাকিয়া সম্ব-সাজ আনিতে বলিল। চিকিৎসককে একবার গৃহিণীর কথা জিজ্ঞাসা করিল—যখন চিকিৎসক বলিল—‘আপন চিকিৎসা বোগ্য আপনি কবিবে।’ তখন চিকিৎসককে ভৎসনা করিল, বলিল—‘কুকুরে ঔষধ তব কব প্রক্ষেপণ।’ তাহাব পর মাক্বেথ একবার চক্ষু বন্দ ধাবণ কবে, আনাব খুলিয়া ফেলে, আনাব পবাইতে বলে, অন্তর্দাহে মাক্বেথ অস্থির, ডাকিনীবা শেষ ধ্যায় তাহা বলিয়া দিয়াছে।

ঘুরিবে, ফিরিবে,—খাটিবে, খুটিবে—

আগুণ জলিবে—কড়া ফুটিবে।

মাক্বেথের হৃদয়ে আগুণ জলিতেছে, বাহিরে তাহার টগবগানি দেখা যাইতেছে, মাক্বেথের অস্থির অবস্থা প্রদর্শনে তৃতীয় দৃষ্টের শেষ।

চতুর্থ দৃষ্ট, বর্ণাম কাননেব নিকট দিয়া সটেন্ড মালকোম যুদ্ধ সজ্জার অগ্রসর হইতেছেন; মালকোম আদেশ দিলেন প্রত্যেক সৈনিক বর্ণাম বন হইতে এক একটি বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া হস্তে লইয়া অগ্রসব হোক। তাহাতে শত্রু পক্ষে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে পারিবে না এবং রোদ্র নিবারণিত হইবে। সৈন্যরা তাহাই করিতে লাগিল।

মাক্বেথ ! যে মুষ্টি তোমাকে ভবিষ্যৎ ভাষায় বলিয়া বার, ‘বর্ণাম জঙ্গল ডনসিনেনে না আসিলে, তোমাব পরাজয় হইবে না’—তাহাব হস্তে একটি বৃক্ষ শাখা ছিল মনে পড়ে কি ? তাহাব হস্তে বৃক্ষ শাখা কেন ? তাহা গৃহিণীর

চেষ্টা করিয়াছিল কি ? তখন বুঝ নাই, এখন বুঝ । ঐ দেখ বর্ণাম্ জঙ্গল জঙ্গম হইয়াছে—তোমার কাল উপস্থিত !—কিন্তু মাক্বেথ কোথা ? ইহার পরের দৃশ্যেই তাহাকে দেখিতে পাইব ।

পঞ্চম দৃশ্যে, সেই ডনসিনেন রাজভবন প্রকোষ্ঠে সঠিস্ত মাক্বেথ অবস্থান করিতেছেন ; দুর্গের বহির্ভাগে সমর সজ্জার পতাকা সকল উড়ীন কবিত্তে আদেশ দিতেছেন ; বলিতেছেন “বিদ্রোহীবা শত্রুপক্ষে যোগদান না কবিলে, দুর্গ হইতে অগ্রসব হইয়া উহাদিগকে তাড়িত কবিতাম্ ।” এমন সময়ে প্রকোষ্ঠান্তরে পুৰবাসিনীবা ক্রন্দনেব বোল তুলিল । মাক্বেথ ভাবিতে লাগিলেন—“এক সময়ে একটি পেচকেব ধ্বনি শুনিলে ভয়ে আমার অঙ্গ নীতল, কেশ কণ্টকিত হইত, কিন্তু ক্রমে অহরহ সন্মানে যাপন করিবা এখন এমনই অভ্যস্ত হইয়াছি—এখন মহা বিতীৰিকাতেও আব আমার চমক হয় না” ; প্রতীহাবীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—“কিসেব জন্ত ক্রন্দনেব বোল উঠিতেছে ?” প্রতীহাবী উত্তর কবিল—“প্রভো, মহারাণীর মৃত্যু হইল ।” মাক্বেথ বলিতে লাগিলেন ;—

মৃত্যু তাব—কিছু পবে,—হলে’ ভাল হতো ;

যথা কালে—অই কপা—শুনিতাম সুখে ।—

অদ্য কলা—অদ্য কলা—অদ্য কলা কবি—

শনৈঃ শনৈঃ মহাকাল—প্রলয় যাবৎ

বীবে কালসর্প বৎ—হয় অগ্রসব ;

দিন যায়,—দিন যায়—দেখাইয়া পথ

মূর্ত্তিময় মৃত্যুভেদে—নির্দোষ পথিকে ।

নিভে যা বে ক্ষুদ্র প্রাণ—নিভে যা—নিভে যা,

এ জীবন চলছায়া—মায়’ মাত্র সাব ।

মাংসুষ যাত্রাব সঙ্ক—বঙ্গ ভঙ্গ কবি,

নেচে কুঙ্গে—গান গেয়ে—কালীচূর্ণ মেখে—

যায় সাজ ঘবে—কেহ না লয় থবর ।

মানব জীবন শুদ্ধ—বাতুল প্রলাপ

ঘোর ঘটা শব্দ কিহু—ভিতবেতে কঙ্কা ।

দ্রুত আসিয়া সংবাদ দিল বর্ণাম্ জঙ্গল অগ্রসর হইয়া আসিতেছে । তখন মাক্বেথ একটু একটু করিয়া বুঝিতে লাগিল—কাল আগত ।

পাপে ধস্তে—সমভাবে—নব-নাবীৰ দাম্পত্য বন্ধন । সংসারে, ধার্মিকের ধর্মপথে প্রধান সহায়—তাহার সহধর্মিণী স্ত্রী । পাপিষ্ঠের পাপ পথেব সহায়ও সেই সহপাপিনী স্ত্রী । মাক্বেথ গৃহিণী কেবল যে মাক্বেথের সহায় ছিলেন এমন নহে—তিনি যেমন আবস্তে প্রবৃত্তিক্রপা—তাহাব সমস্ত জীবনে সেইরূপ শক্তি স্বরূপাও ছিলেন । ‘কিসে স্বামীকে সামান্য দান কবিবেন, কিসে তাহাব অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিবেন, কিসে তাহাকে

চক্ষুর্ধ্বব দারুণ স্মৃতি হইতে ভুলাইয়া রাখিবেন,—অহরহ কেবল সেই চিন্তা, সেই চেষ্টাই করিতেন। পাপের অন্তর্দাহেব তুযানলে তাঁহার নিজ হৃদয় ক্ষাক হইতেছিল, এক দিনের তবে স্বামীকে তাহা মুখ ফুটিয়া বলেন নাই—পাছে তাহাতে স্বামীব শাস্তি ভঙ্গ হয়। স্বামীর সান্বনার্থ সমস্ত দিন মনের আগুণ চাপিয়া রাখিতেন—বাক্রিতে স্বপ্নাবস্থায়—সেই আগুণ অলিয়া উঠিত; তিনি বিষম নিশিযোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন—তবু সেই বোগের খেয়ালে, মাক্বেথকে সান্বনা কবিতেন—শোও গিয়া—শোও গিয়া—বারবার বলিয়া যখন খেয়াল দেখিতেন, যে স্বামী স্নহ হইয়া শয়ন করিলেন, তখন নিজে শয়ন কবিতেন।

এই মাক্বেথ গৃহিণী যখন স্বামীকে মহাপাপে লওয়াইতেছিল, তখন আমবা স্রুণা মিশ্রিত ভয়ে প্রবৃত্তি-রূপাদেব পদে নমস্কার কবিযাছিলাম—কিন্তু মাক্বেথ গৃহিণী যে, মহা রোগে আক্রান্ত হইয়াও স্বামী শুশ্রূষায় বিভ্রত—ইহা ভাবিলে কি—সাক্ষাৎ সেবারূপিণীদের ভক্তিভরে আবার নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয় না?—হয় বৈ কি।

তাঁহাতেই বলিতেছিলাম পাপে ধর্মে, নব-নাবীর দাম্পত্য বন্ধন—বড় বিচিত্র বন্ধন। মাক্বেথ মহাপাপী—তাঁহাব গৃহিণী পাপিষ্ঠা—তবু গৃহিণী মাক্বেথের সাক্ষাৎ সেবা কপিণী—হৃদয়স্থ শক্তিকপা ছিলেন। তাহাতেই তাঁহাব মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মাক্বেথ বলিতেছিলেন—‘মৃত্যুতীব—কিছু পবে—হলে ভাল হতো। শক্তিব এখন আমাব বিশেষ আবশ্যক—এমন সময়ে আমি শক্তি হারা হইলাম!’ শক্তি হাবা হইয়াছে বলিয়াই মাক্বেথ এত কাল পরে মহাকালের নিঃশব্দ পদ সঞ্চাব বুঝিতে পারিয়াছে। বঝিয়াছে—মামুষেব জীবন শলিতাব আঘা—একটুতেই নিভিয়া যায়—বুঝিয়াছে মামুষ্য জীবন ছায়াময়—বুঝিয়াছে মামুষ্য যাত্রার সঙ্ক—বুঝিয়াছে—মামুষের জীবন কেবল পাগলের প্রলাপ।

লেডি মাক্বেথেব মৃত্যু সংবাদে যখন মাক্বেথ এক দিকে শক্তি হাবা হইয়া—আপনাব ভাব আপনি আব বহন কবিতো পারিতেছে না, যখন—অগ্র দিকে সংসারের একমাত্র বন্ধন ছিন্ন হওয়াতে শিথিল গ্রন্থি হইয়া এলাইয়া পড়িতেছে—তখনই তিতিক্ষায় বলিতেছে ‘নিভে যা রে ক্ষুদ্র প্রাণ—নিভে যা—নিভে যা।’ সেই তিতিক্ষার ঘোব ঘোহাবস্থায় দূত আসিয়া সংবাদ দিল—‘বর্ণাম ক্রঙ্গল অগ্রসর হইতেছে।’ কাজেই সেই-শক্তি শূন্য, গ্রন্থি-শূন্য, তিতিক্ষা-পূর্ণ মাক্বেথ বুঝিতে পারিল—যে মহাকাল আগত প্রায়। তখন আপনাব প্রকৃতিগত সাহসেব শেষাংশ সঞ্চয় কবিয়া সমব সজ্জায় প্রস্তুত হইল—বলিল;—

বহ বাবু, ধব মুষ্টি—মহালয়-কণী

মৃত্যু মুখে মাক্বেথ—যায় সজ্জা কবি।

এই সংকল্পে পঞ্চম দৃশ্যেব শেষ। আব তিনটি দৃশ্য আছে।

নাটক ।

নাটকের উপযোগী গল্প ।

২। পূর্ণচন্দ্র ।

শালিবান রাজা পঞ্জাব প্রদেশস্থ শিয়ালকোটের রাজা । ইচ্ছা তাঁহার মহিষী । অনেক যোগযজ্ঞেও দম্পতিব সন্তান হয় নাই । সিদ্ধহোগী গোরক্ষনাথ সদয় হইয়া বাজবাণীকে দেখা দিলেন,—বলিলেন শিববাহির উপবাস করিলে সন্তান হইবে । রাজবাণী ক্রমে তিনবর্ষ সেইরূপ করেন,—সন্তান হয় না ; তাঁহাদের বিশ্বাস টলিল, পববর্ষে ত্রয়োদশীতে তাঁহারা সংযম করিলেন না । গোরক্ষনাথ আবার দর্শন দিলেন—বলিলেন, “তোমরা অবিশ্বাসী—তোমাদের সন্তান হইবে কেন ?” দম্পতি অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন । যোগীবার রাজাকে বলিলেন, “সন্তান পাইবে—তবে তুমি ষোড়শ বৎসর তাহার মুখ দেখিও না—ঐ কালের মধ্যে দেখিলে, অমঙ্গল হইবে ।” মহিষীকে বলিলেন “তুমি সন্তানের লালন পালন করিতে পাইবে, দেখো—যেন সন্তান সর্বমঙ্গলালয়ের সর্বমঙ্গলো বিশ্বাসবান হয় ; হইলে, তাহার মঙ্গল হইবে—তামারও মঙ্গল হইবে ।”

সময়ে স্থলক্ষণাক্রান্ত সন্তান জন্মিল ; বাজী পৃথক ভবনে তাহার লালন-পালন করিতে লাগিলেন । বাজীতে বাজীতে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না । পুত্রের নাম পূর্ণচন্দ্র ।

শালিবান একজন চক্ষুকাণ্ড দৃষ্টিভার রপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ কবিলেন । তাহাব নাম লুণা । ইহাব পূর্বে লুণার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া গোরক্ষনাথের একজন শিষ্য সেবাদাস তাহার পাণিগ্রহণ কারিয়াছিল । যোতুকস্বরূপ লুণার পিতা জম্বুকে সেবাদাস মহাবিশ্ব প্রদান করিয়াছিল । সন্ন্যাসীব আবও কত ওষধ পত্র আছে মনে কবিয়া লুণা সেবাদাসের তলুপি চুবি করিয়া ধরা পড়িয়াছিল । সেবাদাস তাহার পৃষ্ঠে তপ্ত লোহে ‘চোর’ চিহ্ন করিয়া দিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল । সেই অল্পপুর্বা, চোব-চিহ্নে-চিহ্নিতা চর্মকারকত্যা লুণা শিয়ালকোটের দ্বিতীয়া মহিষী । কিন্তু রাজা এখন্ড এ বিবাহের কথা লোকলজ্জায় প্রকাশ করেন নাই ।

পঞ্চদশ আর একটি বাজ্যে রাজা নাই । রাজকুমারী সূক্ষবা বড় রূপবতী—বড় শুণবতী ও বড় সাহসশালিনী, স্বয়ং সেনানায়িকা হইয়া যুদ্ধ কারিয়া স্বরাজ্য স্বাধীন করিয়াছেন । তিনি মনোমত যোগ্য পতি পান নাই বলিয়া বিবাহ করেন নাই । সূক্ষবা যন্ত্রী হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ছদ্মবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করেন ।

কাল পূর্ণ হইলে রাজকুমার পিতৃসকাশে আগমন করিলেন । সেই দিনই লুণা পিতৃ পরামর্শে বিব প্রদানের উদ্দেশে পূর্ণচন্দ্রকে দেখিতে চাহিলেন । রাজা অগত্যা প্রধানা মহিষীর নিকট লুণাকে বিবাহের কথা—লুণার অভি-

লাসেব কথা বলিলেন। রাজ্ঞী ইচ্ছা বলিলেন “তা মহাবাজ একথা লুকাই-
বার কি প্রয়োজন ছিল—বাজাদের এমন ত শত মহিষী থাকে।” রাজ্ঞী
বলিলেন “তা সে যে চর্যকা হুঁত।” রাজ্ঞী বলিলেন “তা হলই বা; যেমন
আমি আপনাব চরণ স্পর্শে বাজবাণী হইয়াছি, সেও তেমনি হইবে।” রাজ্ঞী
বলিলেন “কুমারকে দেখিতে চায়, তাব কি?” মহিষী বলিলেন “আমি যেমন,
সেও ত তেমনি,—পূর্ণচন্দ্রের মা—দেখিতে চাবেই ত; কুমারকে তাহার নিকট
পাঠাইয়া দিউন।” বাজা হিন্দু নারীর উদ্যতায় মুগ্ধ হইলেন। কুমার
বিমাতার সহিত দেখা করিতে গেলেন।

চুটা লুণা যুববাজেব কপে মুগ্ধা হইবা তাঁহার সঙ্গ কাজিনী হইল।
যুববাজ সংসার প্রবেশের প্রথম দিনে—সংসারের এই দারুণ দৌবাণ্ড্য
বাখিত হইয়া চলিয়া আসিলেন। প্রত্যাখ্যাতা বিমাতা প্রতিহিংসার ভীষণ
প্রতিজ্ঞা কবিল।

লুণা যথাবীতি বৃদ্ধ বাজাকে ব্যাখ্যাইল যে, যুববাজ তাঁহার উপর লাগলসাহিত
হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ তবণী ভাণ্ডা,—বাজা তাহাই বুঝিলেন। লুণার ইচ্ছামত
কুমারকে মরুভূমি মধ্যস্থ কূপে ফেলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। মহিষী ইচ্ছার
আবাব বিশ্বাস টলিল। তিনি বাজার ও লুণাব কত লাধা সাধনা কবিলেন—
তাঁহাবা গুনিলেন না। কুমাবেব কিস্ত ঈশবেব সর্ব মাজল্যে অটল বিশ্বাস।
তিনি মঙ্গলময়কে ডাকিতে ডাকিতে কূপে ঝপ্প প্রদান করিলেন। ইচ্ছা
পাগলিনী প্রায় হইলেন—লুণা তাঁহাকে বাতুলালয়ে রাখিবার আদেশ দিলেন।
ইচ্ছা পূর্ণচন্দ্রের জন্ত কাঁদিবা কাঁদিবা অন্ধ প্রায় হইল।

পূর্ণবিহঙ্গী পূর্ণচন্দ্রকে গোবন্ধনাথ উদ্ধার কবিলেন। তাঁহাকে সংসারে
ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, বাজা দিচ্চ চাইলেন—পূর্ণচন্দ্রের প্রকৃত বৈরাগ্য
হইয়াছে; তিনি গোরন্ধনাথের সেবাব কামনা প্রকাশ কবিলেন। গোবন্ধ-
নাথ অমুমতি দিলেন—কিস্ত পবীক্স করিতে লাগিলেন।

গোবন্ধনাথ স্তম্ভার অতিথিখালা চইতে পূর্ণচন্দ্রকে ডিঙ্কা আনিতে
পাঠাইলেন। ঘোণীকে দেখিয়া স্তম্ভা তাঁহাতে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল।
গোরন্ধনাথের সমীপে পূর্ণচন্দ্র ডিঙ্কা মাগিল। গোরন্ধনাথ—পূর্ণচন্দ্রকে
স্তম্ভার ভবনে, স্তম্ভাবা বতকাল বলে, বাস করিতে আদেশ কবিলেন।

স্তম্ভার ভবনে পূর্ণচন্দ্র নিত্য পূজাদি করেন—স্তম্ভার পরিচর্যা করেন।
একদিন আপনাব আত্মসমর্পণ বৃত্তান্ত পূর্ণচন্দ্রে নিবেদন করিল। কাতম্বাক্য
বলিল, “আপনি একবার পত্নী সখোবনে ডাকুন—এইমাত্র। আমি আপনার
যোগভ্রংশ করিব না।” পূর্ণচন্দ্র বলিলেন “স্তম্ভা! যোগিদের সংসার
আশ্রম নিষিদ্ধ। তুমি কেন ঐহিক পতি-পত্নীভাবের জন্ত লাগলসাহিত হই-
তেছ? শঙ্কর গোরন্ধনাথের সেবায় নিষ্ঠাবতী হও—তোমার আমার পরকালে
সমসেবার এক আত্ম হইব।” স্তম্ভা বুঝিল,—বলিল, “আর আমি আপনার
প্রভু-সেবাব হস্তারিকা হইব না, আপনি প্রভুর সকাশে গমন করুন।”

স্তম্ভা বুক বাখিল, ইহকালে স্বামীসেবা অদৃষ্টে নাই বুঝিল, কাতরা

ঋক্ষঠাকুরাণীর সেবা করিতে সংকল্প করিল। তোমরা ইচ্ছা! মহিষীতে হিন্দু পত্নী দেখিয়াছিলে, সুন্দর বাবু হিন্দু বধু দেখ। সুন্দর মনে মনে মাত্র বিবাহ কবিয়া আপনাব রাজ্য ঐশ্বর্য—আশা ভরসা ত্যাগ কবিয়া এখন ঋক্ষঠাকুরাণীর সেবা করিতে যাইতেছে!

সুন্দর রণসজ্জা করিয়া শিষালকোট শালিবানকে আক্রমণ কবিল,— পরাস্ত করিল,—সন্ধি কবিল, প্রধানা মহিষীকে বাতুলালয় হইতে মুক্ত কবিল। যে ভবনে তিনি সম্ভান পালন কবিয়াছিলেন, সেই ভবনে তাঁহাকে রাখিয়া দিল, আপনি ছদ্মবেশে দিবাবাত্রি তাঁহাব পরিচর্যা করিতে লাগিল।

এদিকে লুণা শালিবানকে বিষ খাওয়াইয়াছে।—সেই বিষ। রাজা রোগে শীর্ণ হইতেছেন। কোন সম্রাসীর ঔষধ সেবন কবিবেন স্থির কবিলেন। পূর্ণচন্দ্র সুন্দর নিকট হইতে নিকৃতি পাইয়া—অগ্নি পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোবন্ধনাথের সমীপে আগমন কবিয়াছেন। গোবন্ধনাথ মহাবাজকে ঔষধ দিতে পূর্ণচন্দ্রকে আদেশ করিলেন।

নবীন সম্রাসী পূর্ণচন্দ্র বোগজীর্ণ বৃদ্ধ পিতাকে ঔষধ দিলেন। সেবাদাস সঙ্গে দিছিলেন—লুণার পূর্বচবিত্র ধরা পড়িল—আপনার মুখে পানীয়সী কুমাবেব উপর মিথ্যাপবাদ দেওয়াব কথা স্বীকার কবিল। রাজা তখন আপনাব পুত্রহত্যাব কথা স্মরণ কবিয়া, সেই পুত্রশোকে মহা কাতর হইলেন। পূর্ণচন্দ্র আত্মপরিচয় প্রদান কবিয়া রাজাকে সময়ে সাঙ্ঘনা দিলেন। মাতার ছিন্নমতি নষ্টদৃষ্টি ঘুচিল—তিনি আবার তাঁহাব পূর্ণচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। পানীয়সী লুণা পিতাব সহিত জালামুখীতে প্রায়শ্চিত্ত কবিত্তে প্রেরিত হইল।

দেবাদিদেব মহাদেব নিজ মূর্তিতে কৈলাসশিখবে, বৃষভ বাহনে, বামে মহাশক্তি লইয়া আবির্ভূত হইলেন, বলিলেন—“রাজা, রাণী তোমরা ক্ষুণ্ণ হইও না। পূর্ণচন্দ্র জড় সিংহাসনে বসিবে না, তিনি দেশে দেশে ‘বিশ্বাসে মঙ্গল’—এই ধর্ম প্রচার কবিবেন—কৈলাসে সুন্দরার সহিত মিলিত হইবেন। এই স্থলে গোরক্ষনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিও।”

তখন চাবিদিকে শব্দ হইতে লাগিল—“জয় পার্বতীনাথ কি জয়—জয় গোবন্ধনাথ কি জয়।”

আবাব জিজ্ঞাসা করি,—কিরূপ গল্প নাটক হয়—তাহা বুঝিলে কি? না বুঝিয়া থাক—আবও ছুই চারিটি গল্প বলিব।

নবজীবন ।

৪র্থ ভাগ । } জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ । } ১১শ সংখ্যা ।

পাতঞ্জল যোগসূত্র ।

৮ ।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোহপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

পদচ্ছেদঃ । মৃদু-মধ্য-অধিমাত্রত্বাৎ-ততঃ অপি বিশেষঃ ।

পদার্থঃ । স্পষ্টম্ ।

অর্থঃ । তীত্রস্ত মৃদু-মধ্য-অধিমাত্রত্বাৎ ততঃ আসন্নাদপি বিশেষঃ সমাধি-
লাভ ইতি শেষঃ ।

ভাবার্থঃ । পূর্বসূত্রোক্তবিশিষ্টান্তর্গতস্ত তীত্রস্ত মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বেন
মৃদুতীব্রোমধ্যতীব্রোহধিমাত্রতীত্র ইতি ত্রৈবিধ্যাত্ত আসন্নাদপি বিশেষঃ তর-
তমরূপ ইতি তথাহি মৃদুতীত্রসংবেগস্ত আসন্নঃ, ততো মধ্যতীত্রসংবেগস্ত
আসন্নতবঃ তন্মাৎ অধিমাত্র তীত্রসংবেগস্তাধিমাত্রোপারস্তাপ্যাসন্নতম সমাধি
লাভ ইতি শেষঃ ।

অনুবাদ । পূর্ব সূত্রে যে সংবেগের তীত্র এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে
সেই তীত্রত্ব ও আবার মৃদু, মধ্য এবং অধিমাত্র এই প্রকার হওয়ায় তীত্র
সংবেগশালী যোগীদিগের সমাধি লাভে বিশেষ অর্থাৎ নীত্রতার তায়তম্য লক্ষিত
হয় ।

সমালোচন । তীত্র সংবেগ শব্দের অর্থ ভাব্যকার, চরম সীমা প্রাপ্ত বৈরাগ্য
বলিয়াছেন কিন্তু সেই চরমসীমা প্রাপ্ত বৈরাগ্য সকলের একরূপ হয় না,
কাহারও বা মৃদু অর্থাৎ ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়, কাহারও বা মধ্যগতিতে উৎপন্ন
হয় আর কাহারও অতি নীত্র উৎপন্ন হয়, কাহেই তীত্র সংবেগশালী যোগীদের

সমাধি লাভের শীঘ্রতাব তারতম্য স্বীকার্য, বাহার তীব্র সংবেগ বৃদ্ধ তাহার শীঘ্র সমাধি লাভ হয়, বাহার মধ্য তাহার তদপেক্ষা শীঘ্র সমাধি সিদ্ধি হয় আর বাহার অধিমাত্র তাহার সর্কাপেক্ষা শীঘ্র সমাধি লাভ হয়। ভাষ্যকার বলেন কেবল সমাধি নয়, তাহার ফল মোক্ষও উহার সহিত একই ক্রম অনুসারে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥

পদচ্ছেদঃ । ঈশ্বর-প্রণিধানাং-বা ।

পদার্থঃ । ঈশ্বরঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ পুরুষবিশেষঃ প্রণিধানং ভক্তিবিশেষঃ বিশিষ্টমুপাসনাং সর্কাস্থিগাণামপি তত্রার্পণং, বিষয়ানুষ্ঠানিকং ফলং অনিচ্ছন্ সর্কাস্থি ক্রিয়ান্তয়িন্ পরমগুরুং বর্ষয়তি তং প্রণিধানং ইতি নিকর্ষঃ তস্মাৎবা অথবা ।

অন্বয়ঃ । অথবা ঈশ্বরে প্রণিধানাং ভক্তি বিশেষবাৎ অসংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধি লাভোভবতীতি শেষঃ ।

ভাবার্থঃ । প্রণিধানাং ভক্তি বিশেষাদাবজ্ঞিতঃ ঈশ্বর স্তম্ভগৃহাত্যাভিধান মাত্রেন তদভিধানমাত্রেনাপি যোগিনঃ আসন্নতরঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ মোক্ষশ্চ ভবতীতি ভাবঃ ।

অনুবাদ । ঈশ্বরে বিশেষ ভক্তি করিলেও অতি শীঘ্র সমাধিলাভ হইতে পারে ।

সমালোচন । পূর্বে সমাধি সিদ্ধির এক প্রকার উপায়, তাহার ভেদ, ও তাবতম্য ইত্যাদি নির্দেশ করিয়া এই সূত্র দ্বারা অল্প প্রকার উপায় নির্দেশ কবিতোছেন। কেননা জগতেব লোক মাত্রেই কেবল ভিন্ন রুচি নয়, তাহা দেব শক্তিও বিভিন্ন। একজনেব বাহা ভাল লাগে অত্রের তাহা ভাল লাগে না এবং একজনেব বাহা সাধ্যাত্ত অপবেব পক্ষে তাহা হয় ত অতিশয় দুঃখ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই নিমিত্ত পবম দয়াবান্ মহর্ষিগণ এক একটা দিবসে সিদ্ধি লাভের প্রতি প্রায়ই বিভিন্ন উপায় কল্পনা করিয়া থাকেন। তাত্পর্যা এই যে বাহা ভাল বুঝিবে, যে বাহা স্বীয় সাধ্যাত্ত বলিয়া বিবেচনা কবিবে, সে সেই উপায় অবলম্বন কবিয়া কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিবে। এই নিমিত্ত আজ মহর্ষি পাতঞ্জল সমাধিলাভের প্রতি দুইটি উপায় নির্দেশ কবিলেন। পূর্ক কথিত উপায় পূর্কেই বিবৃত করা হইয়াছে। একগে দ্বিতীয় উপায়টি ভাল কবিয়া বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় উপায়টি ভাল কবে বুঝিতে হইলে, ঈশ্বর এবং প্রণিধান এই দুইটি কথা বুঝা চাই। তাহার মধ্যে সূত্রকার পর সূত্রে নিজেই ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল ‘প্রণিধান’ শব্দটি বুঝিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। প্রণিধান শব্দের অর্থ বিশেষ ভক্তি, অথবা চরমগামী প্রাপ্ত ভক্তি। যে ভক্তিব উদয় হইলে কর্মের ফল অনুসন্ধান না করিয়া, ঐহিক বা পারত্রিক সুখ ভোগাদি তুচ্ছ করিয়া নিজেব কার্য্য অপকার্য্য সমুদয় অথবা এক কথায় আত্মাকে ঈশ্ববে সমর্পণ কবে, সেই ভক্তির নাম প্রণিধান। সেইরূপ ভক্তিব উদয় হইলে ঈশ্বর ঐ তত্ত্বজনকে অনুগ্রহ করিয়া ঐকান্তিক ভাব প্রদান করেন, তাহাতে সমাধি ও তাহার ফল মুক্তি অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়। এ উপায়ের মূহ, মধ্য অধিমাত্রতা নাই; ইহাতে তীব্র সংবেগ ও তাহার মূহ, মধ্য ও অধিমাত্রত্ব ধর্ম্মভেদে ফল সিদ্ধির শীঘ্রতার তারতম্য নাই। ইহাতে কেবল “যৎকরোষি, যদদাসি, বদদাসি, জুহোষি যৎ—তৎ কুরুষ মদর্পণং” ইহাই আবশ্যক। কামনা শূন্য হইয়া কর্ম্ম ফলেব অনুসন্ধান না রাখিয়া অথবা আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চিরকালের মত মত বিস্মৃত হইয়া ঈশ্ববে আপনার সমুদয় কার্য্য সমর্পণ করিতে পারিলেই এ পথের পথিক হওয়া যায়।

মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধিলাভেব যে দুইটি উপায় নির্দেশ করিলেন তাহার মধ্যে প্রথমটিকে জ্ঞানমার্গ এবং দ্বিতীয়টিকে ভক্তিমার্গ বলা যায়। ইহার মধ্যে প্রথমটি দ্বারা আত্মজ্ঞান কেন্দ্র করিয়া ক্রমশ জগৎকে বিস্মৃত হইয়া মনকে স্থির করিতে শিখিতে হয়। দ্বিতীয়টি দ্বারা আত্মাকে বিস্মৃত হইয়া মনেব বৃত্তি সকল বিলোপ করিতে হয়। প্রথম পথে ফল সিদ্ধির তারতম্যে বিলম্বতা ও শীঘ্রতা আছে। দ্বিতীয় পথে সে সব কিছুই নাই; এ পথের পথিকেরা সকলেই সমানভাবে সিদ্ধি লাভ করে। তবে ইহাদেব মধ্যে কোন পথ সূর্যম তাহা নির্ধারণ করা আমাদের অসাধ্য। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যেমন দুষ্কর, যথার্থ ভক্ত হওয়াও যে তাহা অপেক্ষা সহজ নয়, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বরং আমরা বলি আত্মার স্বরূপ জানা বেক্স দুষ্কর, আত্ম বিস্মৃত হওয়া তাহা অপেক্ষা অসিদ্ধ।

ঈশ্বর কে? তাহার কিরূপ স্বরূপ? প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়বিধ মৌলিক তত্ত্বের মধ্যে উহা কোন তত্ত্বের অন্তর্গত? এই সকল প্রশ্নকার নিবা-
রণের নিষ্ক্লিষ্ট সূত্রকার ঈশ্বরের পরিচায়কসূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

ক্লেশকন্ম বিপাকশ্যৈরপরাযুষ্ঠৈঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ ॥২৪॥

পদচ্ছেদঃ। ক্লেশ-কন্ম-বিপাক-আশয়ৈঃ অপরাযুষ্ঠৈঃ পুরুষবিশেষ, ঈশ্বরঃ।

পদার্থঃ। ক্লিষ্টাঙ্কি ধর্মী সাংসারিকং পুরুষং বিবিধভুৎপ্রহারেণেতি ক্লেশাঃ অবিদ্যাদয়ো বক্ষ্যমাণাঃ বিহিত, অতিবিহিত, ব্যামিশ্ররূপাণি বৈদিক লৌকিকানি ত্রিবিধানি কন্মাণি ধর্মাদর্শ ইত্যেকৈচিৎ। বিপচ্যন্তে ইতি বিপাকাঃ কন্মকলানি জাতীয়ভোগাঃ, আকলবিপাকাৎ চিত্তভূমৌ শেরত ইতি আশয়া বাসনাধ্যাঃ সংস্কারাঃ। তৈঃ অপরাযুষ্ঠৈঃ ত্রিষপি কালেষু ন সংসৃষ্টৈঃ, পুরুষবিশেষ অস্ত্রোভ্যাঃ পুরুষেভ্যাঃ বিশিষাতে ইতি পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ ঈশন শীলঃ ইচ্ছা-মাত্রেণ সকলজগদুচ্চরণ কন্ম ইত্যর্থঃ।

অর্থঃ। ক্লেশ অপরাযুষ্ঠৈঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ কথাত ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। ঈশ্বরস্ত ন তত্ত্বান্তবং পুরুষ—তত্ত্ব এব তত্ত্বান্তর্ভাবঃ। তত্র বিশেষস্ত অস্ত্রে পুরুষাঃ ক্লেশাদিভিঃ পরামুচ্যন্তে ঈশ্বরস্ত তৈঃ কদাপি ন পরা-মুচ্যত ইতি। নহু ক্লেশাদয়ো বুদ্ধিধর্ম্যাঃ, কস্ত চিদপি পুরুষস্ত বস্তগত্যা ক্লেশাদি সম্পর্শো নাস্ত্যেব তৎ ঈশবে কিং বৈশিষ্ট্যমিতি চেৎ সত্যং ক্লেশাদয়ো বুদ্ধিধর্ম্যা অপি সর্বত্র সাংসারিকে পুরুষে ব্যপদিষ্টন্তে বথা বোধেষু বর্তমানো জয়ঃ পরাজয়ো বা স্বামিনি। ঈশ্ববস্তু ত্রিষপি কালেষু তথাবিধঃ ক্লেশাদি পরা-পরামর্শো নাস্তীত্যতঃ স বিলক্ষণ এব ভগবানীশ্বরঃ।

অনুবাদ। ক্লেশ, কন্ম, বিপাক এবং আশয় এই সকলের সম্পর্ক রহিত কোন বিলক্ষণ চৈতন্ত বা আত্মাকে ঈশ্বর বলে।

সমালোচন। ঈশ্বর কি ? ইহার উত্তবে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিলেন, ঈশ্বর একটা বিলক্ষণ পুরুষ বা চৈতন্তশক্তি। যে জড় ও চৈতন্ত লইয়া এই বিশ্ব-ত্রকাণ্ড, ঈশ্বর তাহা ছাড়া নয়। ঈশ্বরও তাহারই অন্তর্গত চৈতন্তস্বরূপ, ঈশ্বর চৈতন্তস্বরূপ কিন্তু সংসাবে সম্বদ্ধ যে সকল চৈতন্ত, ঈশ্বর তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্বভাবের। সাংসারিক চৈতন্ত বা পুরুষগণ ক্লেশ, কন্ম, বিপাক এবং আশয় দ্বারা সংসৃষ্ট, ঈশ্বর চৈতন্ত সেরূপ নয়; এই ভেদ। এক্ষণে ক্লেশাদি কাহাকে বলে তাহাই প্রথমে বুঝান আবশ্যক। ভাষ্যকার বলেন যাহা সাংসা-বিক পুরুষদিগকে ক্লিষ্ট অর্থাৎ হুঃখিত করে তাহার নাম ক্লেশ, উহা আর কি ? অবিদ্যা আদি পাঁচটি। পরে উহাদের স্বরূপ নির্দেশ কবা হইবে। বিহিত ও নিবিহিত ধর্ম এবং অধর্মের জনক ক্রিয়া সকলের নাম কন্ম। বিপাক বলিতে কর্মের ফল—জ্ঞান ও আয়ুর ভোগ। আশয় বলিতে বাসনা কর্ম জন্ত চিত্তস্থিত

সংস্কার সকল । সাংসারিক জীব সকল এই ক্লেশাদি কর্তৃক আক্রান্ত । তাহার কর্মের গতি শাস্ত্রে এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । মনুষ্যের কর্ম সকল দুই প্রকার প্রথম প্রারম্ভ, দ্বিতীয় উপাদান ; প্রারম্ভ কর্ম বলিতে মনুষ্যের প্রথম ক্রিয়া, অর্থাৎ যে কার্য্যের প্রতি ইচ্ছা প্রভৃতি কোন কারণ লক্ষিত হয় না যেমন, উৎপত্তি প্রভৃতি, যে সকল কর্ম ঐ প্রারম্ভ ক্রিয়ায় ফলস্বরূপ তাহাদিগকে উপাদান কর্ম বলে । এই দুই প্রকার কর্ম হইতেই মনের বাসনা বা সংস্কার সকল উৎপন্ন হয় । ঐ বাসনা হইতে আবার সুখ-দুঃখাদির ভোগ হয় । সেই ভোগ হইতে পুনর্য্যার বাসনার উদয় হয় । বাসনা হইতে আবার কর্মের উৎপত্তি হয় । এইরূপ কর্মের গতিকে কর্মচক্র বা কর্মবন্ধন বলে । সাংসারিক চৈতন্ত্যমাত্রেই এই কর্মবন্ধনে আবদ্ধ । কিন্তু ঈশ্বর চৈতন্ত্য সেরূপ নয়, ইহঁাব কর্মবন্ধন নাই ।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, তোমাদেব মতে চৈতন্ত্যমাত্রেই বন্ধন নাই, তবে ঈশ্বরের সহিত অন্তর্য্য বৈশিষ্ট্য কি হইল ? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলেন, চৈতন্ত্যের সহিত ক্লেশাদিব সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু সাংসারিক চৈতন্ত্য সকলের প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকায় প্রকৃতির কার্য্য বুদ্ধিব সহিত তাহাদের একটা স্ব-স্বামীভাব সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায় । সেই সম্বন্ধবলে বুদ্ধিকে তাহা বা আপনার বলিয়া বিবেচনা কবে । পূর্বোক্ত ক্লেশাদি বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ অবস্থান করে । সাংসারিক চৈতন্ত্য বা পুরুষগণ বুদ্ধিতে আত্মীয় বোধ থাকায় বুদ্ধিই বাবৎ বস্ত-তেও আত্মীয় বোধ কবে । যেমন নিজের অধীনস্থ সৈন্তকৃত জয় বা পবাজয়ে রাজাগণের আত্মীয় বুদ্ধি হয় । যে চৈতন্ত্যের সহিত যেকোন সম্বন্ধ নাই, সেই চৈতন্ত্যই ঈশ্বর ।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল মুক্ত পুরুষ বা প্রকৃতিগীন প্রভৃতি যোগীগণের বর্ত্তমান ক্লেশাদি সম্বন্ধ না থাকায় তাহাদিগের উপর ঈশ্বরের লক্ষণ যায় না কেন ? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “স তু সর্দৈবমুক্তঃ সর্দৈব ঈশ্বর ইতি ।” মুক্ত পুরুষ বা যোগীদিগের বর্ত্তমান ক্লেশাদি সম্পর্ক না থাকিলেও পূর্বে ক্লেশাদিব সম্পর্ক ছিল এবং যোগীদিগের যোগভ্রংশের পবেও ক্লেশাদির সম্পর্ক হইবার সম্ভাবনা কিন্তু ঈশ্বর চৈতন্ত্যের কোন কালেই ক্লেশাদির সম্পর্ক হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনাও নাই, তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই মুক্ত অর্থাৎ ক্লেশাদির সম্পর্ক রহিত এবং তিন কালেই তাহার ঈশ্বর্য্য অব্যাহত, তিনি কোন কালেই কিছুই অধীন নয় ।

ঈশ্বর কেবল চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহাতে স্রষ্টা-স্রষ্টব্য ভোগাদি সম্বন্ধাদিগুণের কার্য নাই, এ কথা—

“তত্র যঃ পরমাত্মাহি অনিত্যং নিঃশুণঃ স্মৃতঃ

কৰ্ম্মাত্মা পুরুষো যোহসৌ যোক্ষ বন্ধৈঃ সমুজ্জাতে ।” (১)

ইত্যাদি অসংখ্য ঋষিবচন দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। ভগবান্ নাশ্বদও বলিয়াছেন—

“পরন্তু নিঃশুণঃ প্রোক্তোহংকারস্থ যুতোহপরঃ ।” (২)

যোগাচার্যাদিগের মতে ঈশ্বর পুরুষোক্ত ক্লেশাদি বন্ধন শূন্য হইলেও তিনি নিত্যজ্ঞানী, এবং অপ্রতিহত ইচ্ছাবিশিষ্ট। কেহ আপত্তি কবিরাজিল, ঈশ্বর নিরুপাধি অতএব তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব ভাব কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্স বলেন, “বাধকং বিনা দৃষ্টাভূতাব ত্যাগানোচিত্যাত্” নিরুপাধির যে জ্ঞাতৃত্ব হইতে পাবে না এরূপ কোন বাধক কারণ নাই বরং শ্রুতি, স্মৃতি পুৰাণাদি শাস্ত্রে ঈশ্বর জ্ঞানবান তাহা বাবদ্যাব নির্দিষ্ট হইয়াছে অতএব বিনা বাধকে চিবপ্রসিদ্ধ বচন সমূহের প্রতি উপেক্ষা করা দ্বার কিরূপে?

এই ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রভাবেই সৃষ্টির আদিতে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিলোড়িত হইয়া গুণের বৈষম্য হওয়ার নানাবিধ বিচিত্র সৃষ্টির উদয় হয়। তদ্বিধরে

“প্রকৃতিং পুরুষং চৈব প্রবিষ্টায়ে চ্ছয়াহরিঃ ।

কোভর্যামাস সংপ্রাপ্ত সর্গকালে ব্যাব্যায়ৌ ॥” (৩)

ঈশ্বর অবিদ্যাদি উপাধিশূন্য হইলেও একেবারে নিরুপাধিক নহেন, তাঁহাতে সর্বোৎকৃষ্ট সমুদ্র নিয়ত বিদ্যমান থাকায় ঐ প্রকৃষ্ট সমুদ্র তাঁহার উপাধি। ভাব্যকার বলেন, তাঁহার ঐশ্বর্যের সাদৃশ্য বা তাঁহার ঐশ্বর্য্যাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যও আর কাহাতে বিদ্যমান নাই। অর্থাৎ ঈশ্বর একটি মাত্র দুইটি নয়। দুইজন ঈশ্বর হইলে দুইজনের ইচ্ছা সমানভাবে অপ্রতিহত; এমন স্থলে একজন ইচ্ছা করিলেন জগতের সৃষ্টি কার্যের আরম্ভ হোক, অপর সৃষ্টি

(১)। যিনি পরমাত্মা তিনি নিত্যনিঃশুণ, জীবাত্মা বা পুরুষই বন্ধ এবং মোক্ষমুক্ত।

(২) পরমাত্মা নিঃশুণ এবং জীবাত্মা অভিমানী অর্থাৎ সত্ত্বপ।

(৩) সত্ত্ব রজঃ এবং এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নাশই প্রকৃতি। ঈশ্বর আপনায় ইচ্ছানুসারে সৃষ্টির আদিতে ঐ সাম্যাবস্থা নষ্ট কবিরাজ ঈশ্বরম্বা উপাদান করেন ।

আবস্ত হইল, তাহাব পরই আব একজন বলিলেন, না সৃষ্টি হইয়া কাব নাই, অমনিই সৃষ্টি বন্দ হইতে লাগিল। এক্ষণে বিবেচনা করে দেখে ছই জন ঈশ্বর হইলে জগতের প্রত্যেক কার্যে কিরূপ বিসংকুল হইত। এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া, বোধ হয় অস্বাভাবিক নয়। আমাদের গ্রামে কানীনাত এবং শঙ্কুনাত নামে দুই জন সহোদর বাস করিত। দুই জন পাঠশালা উভয়েব বয়সেব অধিক নানাধিক্য ছিল না, কায়েই কাহার উপর কাহার বড় একটা প্রভুতা ছিল না, সংসারে দুই জনই সমান প্রবল। কিন্তু দুই জনই বন্ধু পাগল। ইহাদেব মধ্য মধ্যে ক্রিয়াকর্ম—ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করানও ছিল। কিন্তু সংসারে উভয়ের সমান পাগলামি থাকায় মধ্যে মধ্যে ঐ সকল কার্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খল হইত। কোন দিন প্রাতঃকালে একজন গ্রামস্থ সমুদয় আত্মীয় স্বজনকে একটা কর্মের উপলক্ষ্য করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহাব কিছুক্ষণ পরেই আর একজন বাহির হইয়া প্রতি বাড়ী বাড়ী বলিয়া আসিলেন ‘আমাব ভাতা উন্নত, উহার কথা আপনাব গুনিবেন না, অদ্য আমাদেব গৃহে কোন কর্মই নাই।’ সে দিবস বাস্তবিক ঐ ত একটা কার্য ছিল এবং ব্রাহ্মণ ভোজনেরও প্রচুর আয়োজনও ছিল কিন্তু নিমন্ত্রণ রদ করায় কোন ভ্রমলোকেই বাইতে সাহসী হইলেন না, সমুদয় আয়োজন বিনষ্ট হইল, রাশি রাশি ভোজ্য দ্রব্য পচিয়া গেল। আবার কোন দিন হয় ত বাড়ীতে কিছুই আয়োজন নাই, গ্রামস্থ লোক মধ্যাহ্নকালে অনাহাবে আসিয়া উপস্থিত। দালানে দেব প্রতিমা প্রস্তুত, জোঠ—পুরোহিত স্থির করিয়া আসিলেন। কনিষ্ঠ তাহার পরই পুরোহিতের বাটীতে গিয়া বলিল “মহাশয় দাদা পাগল জানেনত, কোথায় বা পূজা কোথায় বা কি সকলই মিথ্যা।” “কায়েই পুরোহিত আর বাইতে সাহস করিলেন; মাটীব ঠাকুর অমনি অমনিই মাটী হইলেন। জগতে যদি সমান ক্ষমতালী এবং অপ্রতিহত শক্তি দুইটি ঈশ্বর হইতেন, তাহলে জগতের কার্য সকল ঠিক ঐরূপ হইত, তদ্বিবয় কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য ভাব্যকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন ঈশ্বর অদ্বিতীয় এবং কি মুক্ত কি অমুক্ত ব্যবতীয় পুরুষ অপেক্ষা তাঁহাব ঐশ্বর্য অনেক অধিক; তাঁহা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য আর কাহারও নাই।

ভক্তি সাধন ।

যে ভগবানের পদপ্রাপ্ত হইতে ভক্তি-রূপিণী অমৃত নিঃস্রাবিনী নির্ঝাবিণী প্রবাহিতা হইয়া পাপরূপ সূর্য্য-ময়ূখ-প্রোক্তপ্ত অবিস্বাস-বালুকাপূর্ণ নাস্তিক-হৃদয়কেও সূক্ষ্মীতল করিয়া অনন্তকাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে, সেই চিরন্তন নির্ঝিকল্প পুরুষ নিজ মুখেই ভক্তির শ্রেষ্ঠতা স্বীয় প্রাণোপম প্রিয় শিষ্য অর্জুনের নিকট কীর্তন করিয়া বলিয়াছেন—

তপস্বিতোহধিকো যোগী জ্ঞানিতোহপি মতোধিকঃ ।

কর্ম্মিত্যোশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবাক্ষুণ্ণ ।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাম্ মদগতেনাস্তবাস্থনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্তোত্তমোমত ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬ অঃ ৪৬৪৭ ।

উক্ত শ্লোক দ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে তপোনিষ্ঠ, জ্ঞানী এবং কর্ম্মনিষ্ঠ অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। প্রথম শ্লোকটি বলিয়া ভগবানের তৃপ্তি জন্মিল না, অপিচ কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইল। যোগ সাধক-ভেদে ১৮১২ প্রকার, তবে প্রিয় শিষ্য কোন যোগ অভ্যাস করিবেন এই সন্দেহেই পরোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করিবেন, তাহার তাৎপর্য্য অর্থ এই যে “যোগীদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্তবাস্তা আঘাতেই সমর্পণ করিয়া ভজনা করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।”

এই দুই শ্লোক দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগের প্রাধান্ত স্পষ্টত বুঝাইয়া ছিলেন। ইহার কারণ এই যে ভক্তিযোগ * সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। ভক্তি

* যদিও ভগবান ভক্তিযোগের প্রাধান্ত স্পষ্টত স্বীকার করিলেন, তথাপি পতঞ্জলি মুনি অনুশাসিত যোগের বিদ্যা করা হইল না। ভক্তিযোগ কিছু সরল, কিন্তু “চিন্তাহৃদি বিরোধঃ” যোগ বহুকাল ও বহু পরিশ্রম সাপেক্ষ। তাহার কারণ এই যে, পতঞ্জলি প্রথমতঃ যোগকে ৮ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। তাহার পর যম আবার দশ প্রকার, নিয়ম দশ প্রকার, আসন আট প্রকার, প্রাণায়াম তিন প্রকার, প্রত্যাহার পাঁচ প্রকার, ধারণা পাঁচ প্রকার, ধ্যান ছয় প্রকার, এবং সমাধি এক প্রকার, এবং কাহার কাহার মতে নানা প্রকার। একবার ভাবিয়া দেখুন এক যম অভ্যাস করিতে কত কাল লাগে, তার পর নিয়ম ইত্যাদি। যোগের কল প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু সাধক এক ক্রমে কল পায় কি না সন্দেহ।

সাধনেচ্ছ ব্যক্তিব ধন, মান, কুল, শীল, কিছুই অপেক্ষা করে না—কেবল আবশ্যক একমাত্র সবল বিশ্বাস। * শাস্ত্রকাবগণ বলিয়াছেন এই বিশ্বাসই ধর্মের মূল “বিশ্বাসঃ ধর্ম মূলং হি।” কি বাহু জগতে কি অন্তর্জগতে, উভয় জগতের কার্যের জন্তই বিশ্বাসের আবশ্যক। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে বিশ্বাস না হইলে লৌকিক জগতের কোন কার্যই সুশৃঙ্খলরূপে চলিত না। পিতা পুত্রে সন্তান, স্বামী স্ত্রীতে ভালবাসা, বন্ধু বন্ধুতে প্রণয়; এক এই বিশ্বাস না থাকিলে,—জগতে কিছুই দেখা যাইত না। এই বিশ্বাসই ভালবাসার মূল। ভালবাসার অন্ততম নাম অনুরাগ। ঈশ্বরের প্রতি এই অনুবাগকেই শাস্ত্রকাবগণ ভক্তি নামে অভিহিত কবিয়াছেন যথা “সাপরাভু-রক্তিবীষবে”। শাণ্ডিল্য সূঃ ১ম অঃ ২ সূত্র।

এ পর্যান্ত কেবল ভক্তিব শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইল, এবং ভক্তি কাহাকে বলে তাহাই বলা হইল। এখন কি উপায়ে ভক্তি সাধন কবিতে হয় তাহাই বলিতে হইবে। যদিও বস্তুতপক্ষে বলিতে গেলে ভক্তি সাধাণের সাধনের বস্তু নহে অর্থাৎ যে সে ব্যক্তিই সাধন কবিতে আরম্ভ কবিলে যে সকল-মনোরথ হইবেন তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, তবে ভক্তি সাধন সম্বন্ধে যে সমস্ত অনুষ্ঠান অনুকূল তাহাই মাত্র আমরা বলিব। আর এক কথা—যে ভক্তি জ্ঞানের অভ্যাস সাপেক্ষ, তাহাব কথা আমরা বলিব না, কারণ সে প্রকার ভক্তি সাধন বড় সহজ ব্যাপার নহে, এবং তৎসম্বন্ধে অনেক গোল-যোগও আছে। এখন স্বয়ং ভগবান ও বহুদর্শী আচার্য্যগণ ভক্তিসাধন সম্বন্ধে যে সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান অনুশাসন কবিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত কবিব।

মযোব মন আধংস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিষ্যসি মযোব অতঃ উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্যেতি ময়ি স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততঃ মামিচ্ছাপুং ধনঞ্জয় ॥

অভ্যাসেহংস্যসমর্থোহসি মৎকর্ম পদ্যমান্তব ।

মদর্থান্তপি কস্মাপি কুর্কন্ সিদ্ধিং অবাপ্তসি ॥

অথৈতন্নপাশক্লেসি কঠুং মদযোগমাস্রিতঃ ।

সর্বকর্ম ফলত্যাগং ততঃ কুরু যথাশ্রবান্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২ অঃ ৮৯১০১১ শ্লোক ।

* এই স্থলের সহিত পাণ্ডুলিপি যোগসূত্রের ব্যাখ্যায় ৩৪৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যায়-
আক্ষেব মন্তব্য মিলাইয়া দেখিবেন। [নবজীবন সম্পাদক।]

উক্ত শ্রোত সমূহেব তাৎপর্য ব্যাখ্যা এই যে—(হে অর্জুন) তুমি আমাতে মন অবধান কর এবং বাবসারিস্বিকা বুদ্ধিকেও আমাতে স্থিৰ কব, তাহা হইলেই তুমি দেহান্তে আমাতে বাস কবিত্তে পারিবে এ বিষয়ে কিছুই সন্দেহ নাই ।

যদি এইরূপ আমাতে চিত্তসমাধান কবিত্তে না পাব, তাহা হইলে ইতস্তত বিক্ষিপ্তচিত্তকে * পুনঃ পুনঃ মৎস্মরণ রূপ কার্য্য দ্বাৰা সংযত কবিত্তে অভ্যাস কব ।

আর যদি অভ্যাস দ্বাৰা একরূপ কবিত্তেও অক্ষম হও—তাহা হইলে আমাব প্রীত্যর্থ্যে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান কব, † এবং এইরূপ কার্য্য কবিত্তে কবিত্তেই সিক্কিলভ কবিত্তে । আর যদি একরূপ কবিত্তেও অক্ষম হও, তাহা হইলে ভগবান বলিত্তেছেন সমস্ত মুখ্য ও নিত্য কৰ্ম্মাদি আচরণ কবিত্তে ; কিন্তু স্মরণ থাকে যেন সমস্ত কৰ্ম্ম কবিত্তে ফলপ্রত্যাশা একরূপে বর্জন কবিত্তে ।

স্বয়ং ভগবান ভক্তিসাধন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উক্ত কবিত্তে দেখান হইল । এখন ভক্তিপথেব পথিক স্মরণ যাহা বলিয়াছেন তাহাই এক্ষণে উক্ত কবিত্তে হইবে ।

“ভক্তিসাধন—বিষয় ত্যাগ ও সঙ্গ ত্যাগ দ্বাৰা সাধিত হইয়া থাকে ।”

“সৰ্ব্বদা ভগবদ্ভজন দ্বাৰা ।—”

“লোকেশ্ব নিকট ভগবদ্গুণেব কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বাৰা ।”

“ভগবানেব রূপাদৃষ্টি, ও মহাত্মাগুণের অল্পগ্রহই ভক্তি সাধন সম্বন্ধে মুখ্য , অল্পকুল ।” ‡

* পাভঞ্জল দর্শন মতে চিত্তেব পাঁচটা অবস্থা যথা—ক্ষিপ্ত, যুত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ । যখন চিত্ত ক্ষণেক এক বস্তুতে, পবক্ষণেই অস্ত্র বস্তুতে নিবিষ্ট হব, অর্থাৎ যখন এক বস্তুতে অধিকক্ষণ নিবিষ্ট থাকিত্তে পাবে না, সেই অবস্থাকেই বিক্ষিপ্ত অবস্থা বলে ।

† উক্ত দর্শন প্রণেতা ক্রিয়াযোগ সম্বন্ধে এই ভাবে বলিয়াছেন “তপঃস্বধ্যাসেমশব প্রণি-
ধানানি ক্রিয়াযোগ ।”—তপস্কা, বেদাধ্যয়ন এবং ঈশ্বর প্রণিধান দ্বাৰা ক্রিয়াযোগ অভ্যাস কবিত্তে হব । কিন্তু ভগবান এ হলে (ভক্তি-যোগ সাধকেব প্রতি) কিছু বিস্তৃত ভাবে আদেশ কবিত্তেছেন যথা—হরিনাম সংকীর্ত্তন, পূজা, যাগ, যজ্ঞ, একাদশীর উপবাস, হরি কথা শ্রবণ, ব্রাহ্মণাদিৰ সেবা গুরুবা আদি ।

‡ “ও” ভক্ত বিধয় ত্যাগঃ সঙ্গ ত্যাগঃ চ ।”

“ও” অব্যাকৃত ভজনাৎ ।”

“ও” লোকেশ্ব নিকট ভগবদ্গুণ শ্রবণ কীর্ত্তনাৎ ।”

ও মুখ্যন্ত মহৎ রূপযাঐব ভগবৎরূপালেশাৎ বা ।”

‘নারদ সূত্র ৫ অনুঃ ৩৭।৩৮।৩৯ বৃত্ত ।

বিষয় ত্যাগ দ্বারা ভক্তিসাধন অতি দুষ্কর কার্য্য সন্দেহ নাই। সংসারে থাকিয়া বিষয় ত্যাগ করা সামান্য লোকেব সাধ্য নহে। ইন্দ্রিয় পাঁচটি, এবং তাহাব বিষয়ও পাঁচটি যথা—রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। এই পাঁচটি হইয়া জগতেব যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি। ইহাদেব মোহিনী শক্তি অতি আশ্চর্য্য, যে কোনটিতেই লোককে মাতোয়ারা কবিয়া তুলিতে পাবে। মনে করুন অনতিদূৰে বীণাব মধুব নিকুন শুনিতে পাইলাম। কর্ণেব ধর্ম্মই এই যে, তাহা প্রতিধ্বনিত কবিবে এবং মন তাহা গ্রহণ পূৰ্ণক বসাম্বাদ কবিবে। নাবদ ঋষি মতে চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়েব সাধাবণ ধর্ম্মেব বিলোপ কবিতে পাবিলে ভক্তিসাধন হইয়াছে ও হইতেছে জানা যাইবে। একটু স্পষ্ট কবিয়া বলিলে বোধ হয় সহজেই ইহা বুঝা যাইবে। ইন্দ্রিয়বর্গেব সহিত মন মিলিত হইয়া কার্য্য না কবিলে ইন্দ্রিয়সম্মিকর্ষ-প্ৰসৃত বিষয়জ্ঞান আমাদিগেব কখনই জন্মিতে পাবে না। সূতরাং মন যদি ভগবৎপ্রেম বস পানে মত্ত থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বর্গেব সহিত মিলিত হইয়া বস্তুবিষয়ক জ্ঞান উৎপাদনে আব তাহাব কোথায় অবসর বহিল ?

সঙ্গ ত্যাগের গুণ অতি আশ্চর্য্য। সঙ্গ ত্যাগেব অর্থ এখানে অসং সঙ্গ ত্যাগ—সংসঙ্গ ত্যাগ নহে, কাবণ, ইহাব পবেই নাবদ ঋষি বলিতেছেন “মহৎ সঙ্গ দুর্লভোংগমো চ হমোবশচ” অর্থাৎ মহৎ সঙ্গ দুর্লভ, অগম্য, এবং ভক্তিসাধন বিষয়ে অমোঘ।

ভগবদ্ভজন, তাঁহার নাম কীর্ত্তন, এবং শ্রবণ দ্বাবা অনুবাগ * বৃদ্ধি হয় ও মনোমালিগ্ন দূব হয়, এবং অনুবাগ জন্মিলেই কি এক অপূৰ্ণ অনির্কচনীয মূল ভাবেব উদয় হইয়া থাকে। এই ভাবই ভক্তিব অঙ্কুর। এ পর্য্যন্ত সাধারণত ভক্তি নামেই যাহা কিছু বলা হইল। এক্ষণে ভক্তিব বিভাগ কবিয়া বিস্তৃতরূপে কিছু বলিতে হইবে। ভক্তিসাধক ভেদে দুই প্রকাব—পব ভক্তি ও গোণী ভক্তি। গোণী ভক্তিই সাধকেব সাধনানুকুল, এবং এই ভক্তিই পবভক্তিব ভিত্তিস্বরূপ। শান্তিল্য ঋষি মতে এই গোণীভক্তি দ্বারাই চিত্তের পবিত্রতা জন্মে যথা “তাভ্যঃ পাবিত্ৰ্য্যমুপক্রমাৎ” (শাঃ সূঃ ৫৯)। এই

* “রাগার্থ প্রকীৰ্ত্তি সাহচর্য্যাকেতুরেবাম্” (শাঃ সূঃ ৫৩)—নমস্কার, নাম কীর্ত্তনাদি কল কেবল অনুবাগ। ভীৰ্পর্য্যটন, ভগবদ্ সৃষ্টির পূজা, নাম কীর্ত্তন, সাষ্টাঙ্গ শ্রমিপাত ইত্যাদি কার্য্য কেবল অনুবাগ বশত এবং অনুবাগ বৃদ্ধিব নিধিও।

শক্তিলা ঋষিই আবার গোণী ভক্তিকে তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন । ক্রমে ক্রমে তাহা বলা যাইতেছে ।

ভগবদ্ভীত্য ভক্তিকে সাধারণত চারি ভাগে বিভক্ত কবিয়াছেন যথা—
 আৰ্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী । যে ব্যক্তিবিপদে পড়িয়া কাতব কৰুণ-
 কণ্ঠে, এক মন প্রাণ হইয়া ভক্তিপূৰ্ব্বক মধুসূদনেব নাম লইয়া থাকে তাহাকে
 আৰ্ত্ত ভক্ত কহে । যে ব্যক্তি ভগবন্তর জানিবাব জন্ত ঈশ্ববে, শাক্তে, গুরুবাকো,
 এবং ব্রাহ্মণে ভক্তি কবিয়া থাকে, তাহাকে জিজ্ঞাসু ভক্ত বলা যায় । যে ব্যক্তি
 স্বীয় কামনাসিদ্ধিব নিমিত্ত ভগবানকে ভক্তি কবিয়া থাকে, তাহাকে অর্থার্থী
 ভক্ত বলা যায় । এবং জ্ঞানবান্ ভক্তকে জ্ঞানী ভক্তি বলা যায় । প্রথম
 তিন প্রকার লক্ষণোপেত ভক্তব ভক্তিকে গোণীভক্তি কহে, জ্ঞানীভক্তি
 নিকাম, সূতবাং গোণীভক্তিব মালিষ্ঠ ইহাকে স্পর্শ কবিতে পাবে না । এখন
 এইরূপ একটি প্রশ্ন হইতে পাবে যে “অজ্ঞ কাল তৃতীয় প্রকার ভক্তেব
 সংখ্যাব নূনতা নাই, কিন্তু তাহাদিগেব কামনা সিদ্ধি হয় না? চিত্তের
 উৎকর্ষতাও তো কিছু বৃদ্ধিতে পাবা যায় ন’, ইহাব কাবণ কি?” আশা-
 দিগেব বোধ হয় যে, ঈশ্ববেব প্রতি ভক্তি কবিবাব জন্ত যে একটু চিত্তেব
 একাগ্রতা ও স্থিৰতাৰ আবশ্যক, তাহা তাহাদেব আদৌ হয় না, সূতবাং
 বাহিত ফল লাভেব বা চিত্তেব উন্নতি সাধনেব আশা কোথা হইতে সম্ভবে?
 শুদ্ধ শুদ্ধ সংস্কৃত ঈশ্বব স্তোত্র পড়িয়া শেষে “দাও ভক্তি, দাও প্রেম”
 বলিলে ঈশ্বব ভক্তি বা প্রেম দেন না—ভক্তি কি প্রেমেব প্রার্থী হইলে, সেই
 প্রকাবের আয়োজনেব আবশ্যক, এবং তাহার অধিকারী হইতে হইবে ।
 আধুনিক নব্য-ভক্ত-সম্প্রদায় দলবল্লেব সহিত একাসনস্থ থাকিয়া, গদগদ-
 স্ববে (বিকৃত কণ্ঠে) ঈশ্ববেব আরাধনা ছলে যে কতকগুলি স্ততিবাদ
 কবিয়া থাকে, তাহাতে চিত্তের সবলতা ও নিশ্চলতা হওয়া দূরে থাকুক
 বং তাহাবা তাহাতে দিন দিন কপটাচারী হইতে থাকে । ভক্তের চিত্তের
 প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে সকল বাহ্যিক ভাব (অজ্ঞ বিবৃতি, রোমাঞ্চ, অশ্রুপাত,
 শব্দভঙ্গ, সময়ে সময়ে বেপথু) দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা যত্ন কৃত বা লোক
 দেখাইবার জন্ত নহে, তাহা স্বাভাবিক এবং অন্তরের অবস্থাব বাহ্য ক্ষুরণ
 মাত্র । কিন্তু ছুঃখের বিষয় নব্য-ভক্ত-সম্প্রদায় উক্ত লক্ষণ গুলি অভ্যাস কবিয়া
 ভক্তিব ভাণ করেন মাত্র । ভক্তের সঙ্গে প্রাণ্ডক ভাবগুলি শোভা পায় কিন্তু
 মূঢ় কৃত-ভাবগুলি শোভা পাওয়া দূরে থাকুক বং বিষবৎ বলিয়া বোধ হয় ।

এইবার আমাদিগের পূজাদি বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে। পূজাব প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?—উপাস্ত্র দেবতার শ্রীতি সাধন। কি হইলে তাঁহাদিগের শ্রীতি সম্পাদন হয়?—হৃদয়ের ভক্তি। এক্ষণে বিবোধী নব্য-ভক্ত-সম্প্রদায় প্রশ্ন করিতে পাবেন “তবে যে হিন্দুদিগের দেব দেবীর পূজায় ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ফুল ইত্যাদি আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাব প্রয়োজন কি?” আমবা বলিতেছি,—আছে বৈ কি? যদি বাহু বস্ত্রব সহিত জ্ঞানব প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে আছে বৈ কি? যদি বিষ্ঠা ও চন্দনে মনুষ্য হৃদয়ে দুই সম্পূর্ণ বিবোধী ভাবে উদ্রেক কবিবাব ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে আছে বৈ কি? একবার পুতি গন্ধময় স্থানে ভ্রমণ কবিয়া দেখুন, এবং তৎ পৰ্য্যক্ণেই বেলা যুঁই, মালতী, গন্ধবাজ প্রভৃতি প্রক্ষুটিত উদ্যানে ভ্রমণ কবিয়া দেখুন—যদি হৃদয়ে কিছু বিষম ভাবের উদয় অসুভব কবিত পাবেন, তাহা হইলে জানিবেন—পুষ্প, ধূপ, দীপাদিব প্রয়োজন সহজ বোধ্য। ভক্ত! তুমিই জ্ঞান পূজাব সময় তোমাব অন্তরে ভাব কিরূপ হয়। বাজনাব তালে তালে কি তোমাব হৃদয়ও নাচিতে থাকে না? পুষ্প চন্দন এবং ধূপাদিব গন্ধে কিহু তোমাব প্রাণ প্রকৃত হয় না? কি এক নির্মল, অনির্কচনীয় মধু ভাবে প্রাণ মন বিভোব হয় না?

যে ব্যক্তি ভক্তি কি তাহা জানে না, অথবা কখন ঈশ্ববে ভক্তি কবে নাই, সে কি সহসা বিক্রম কবিয়া বলিতে পাবে আমি অদ্ব্য হইতে ভক্ত হইলাম—আব ইহাই কি কখন সম্ভব পব? ভক্তি বিক্রমেব বস্তু নহে—ভগবানের রূপা সাপেক্ষ—এবং তাঁহাব আদেশ বিহিত কৰ্ম্ম-কাণ্ড-সাপেক্ষ। কিন্তু এ সমস্তই গোণী ভক্তি। পূজাদি দ্বাবা যে ভক্তিব অভ্যাস কামনা কবা যায়, তাহা কেবল গোণী ভক্তি। ঈশ্ববের বিশেষ অমুগ্রহ না হইলে, পবা ভক্তি লাভ হয় না। আজন্ম যাহাবা ভক্ত, তাহাবাই ভগবানের বিশেষ অন্তর্গত—এবং তাহাদের ভক্তিই পরা ভক্তি। গুন গুন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাব ভক্ত-দিগকে কি অন্তর দ্বিতেছেন—

“সক্রে নশ্রুস্তি ব্রহ্মাণ্ডে প্রভবন্তি পুনঃ পুনঃ।

ন যে ভক্ত প্রণশ্রুস্তি নিঃশ্বাস নিবাপদাঃ ॥”

সেবার্জনা ভক্তিলিপ্সু ব্যক্তিব একটি স্মরণ পদ্য—চরিত্রাং সংকীৰ্ত্তন অপব একটি; তীর্থ পর্য্যটন আব একটি; ব্রাহ্মণাদিব সেবা-শুশ্রূষা অপব একটি; ইত্যাদি। এইরূপ কবিত কবিত চিত্তে প্রসন্নতা ও নির্মলতা জন্মে—

ইহাষ্ট ভক্তির অঙ্গুর মাত্র । ইহাব পব যত রস ঢালিবে ততই সতেজ হইয়া
বৃদ্ধি পাইবে । পবে যদি তাঁহাকে প্রীতি কবিতো , কবিতো তাঁহার রূপাকনা
লাভ কবিতো পাবা যায়, তাহা হইলে ভক্তির চরম পুষ্টিসাধন হইল—এবং সেই
ভক্তি হইতেই অস্ত্রে মুক্তির দ্বাব উদঘাটিত হইল । এই ভক্তি সবল বিশ্বাদীপ
সুখসাধা—তাকিকেব নহে । ভাই ভক্ত ! প্রাণান্তেও যেন তর্ক কবিও
না—তর্ক তোমাব অগ্র নহে, জ্ঞানীষ জগ্র , তুমি যেন এই কথা সর্বদা মনে
রাখিও—

“ভক্তিতে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূব ।”

কুমারীর শিব-পূজা ।

অজ্ঞানে পিতামাতার মেহে শৈশবকাল অতিবাহিত হইল, ধূলা খেলায়
বালাকালও দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল ; এই বাব কৈশোবে সংসার-
শিক্ষার সময় আসিল । বমণী-হৃদয়ই প্রেম-পযোধি, অনন্ত বিশ্ব-প্রেম
শিখাইবার সামগ্রী ; সুতবাং প্রথমে প্রেমই বালিকা-হৃদয়ের শিক্ষাব পদার্থ ।
ধূলি কদম লইয়া বালিকা বন্ধন কবিল, পাঁচ জন সম বয়স্ক বালক বালিকাকে
তাহা ভোজন কবিতো দিল, বালিকাব হৃদয় আপন হৃদ হৃদয়ে প্রেম জ্বলিত
আনন্দ অহুভব করিয়া পবম সুখী হইল । গ্রামা উৎসব দেখিতে গিয়া
বালিকা দুই চাবিটা পুত্তলিকা ক্রয় কবিয়া আনি ল, তাহাদিগকে পান ভোজন
কবিতো দিল, ছিন্ন বস্ত্রে সজ্জিত কবিল এবং তাহাদিগকে উপলক্ষ্য কবিয়া
আর পাঁচটি বালক বালিকাব সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া প্রেমের
সংসার বচনা কবিল । এইরূপে বালাকাল কাটিল বটে ; কিন্তু বালিকাব
বালাকালের সংসার-বন্ধন স্থায়ী হইল না ; প্রত্যহ প্রেম পরিবাব গঠন
করে, আবার প্রত্যহ তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় । “সুতবাং সে এখন এমন
একটি সংসারের সহিত হৃদয়কে বাধিতে চায়, যাহার সহিত ইহ জগতে

বিচ্ছিন্ন হইতে না হয় এবং ঘটনা-বিড়ম্বনায় নৈসর্গিক নিয়মে ইহ জগতের সম্বন্ধ ভাঙ্গিলেও পবকালে বা জন্মজন্মান্তরে সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে। যখন এই চেষ্টায় বালিকা-হৃদয় ব্যাকুল হইল, তখন তাহার বাল্যকাল অতীত হইয়া কৈশোর উপস্থিত হইল এবং তৎসহ হৃদয়ের ক্ষুণ্ণি আবিস্কৃত হইল। হৃদয় এত দিন ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, তাহাতে অহুগু হইয়া—বিস্তৃত ক্ষেত্রের অল্প-সম্মানে ফিবিতে আরম্ভ করিল। বালিকার শিক্ষার উপযোগী বিস্তার সহজ সহজ ব্রত নিয়ম ও কার্য্য-প্রণালী বালিকার চক্ষে পড়িল। কেবল জ্ঞানোপার্জনে শিক্ষা হয় না, তাহার সহিত কৰ্ম্মে আবশ্যক; এই জন্ত গীতা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যেমন সহজ জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও তেমনই সামান্য; কিন্তু ইহাতে যে শিক্ষা নিহিত আছে, তাহা অল্পত্বে বৃহৎকৰ্ম্মপূর্ণাণেও আছে কি না সন্দেহ। অতি সহজ উপায়ে জ্ঞান, ধৰ্ম্ম ও কৰ্ম্ম একত্র মিলিত হইয়া জগতের ভিত্তিরূপিণী বালিকাদিগের শিক্ষা ও হৃদয় গঠনের সামগ্রী হইয়াছে।

মানুষের পশুতাব এতই প্রবল, মানুষ এমনই স্বার্থপর যে, স্বার্থের ভিতর দিয়া বাতাবেকে পথার্থপরতা শিক্ষা হয় না। সূত্রবৎ বালিকার সংসার-শিক্ষাও পথমে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া আবিস্কৃত হয় এবং ক্রমে অলক্ষিত ভাবে আপনাকে অতিক্রম করিয়া সংসারময় পবিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যে কোন ব্রত বা পূজাই হউক না, তাহার ফল সংসার ব্যাপী; জগৎ সংসারবৎ জন্ত যাহা করিবে, তাহাই স্থায়ী ও কার্য্যকর হইবে; কেবল আপনি ফলভাগী হইবে, এই আশায় কৰ্ম্ম করিলে, তাহা বিড়ম্বনা হইয়া উঠিবে। এই জন্ত গীতা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণে কৰ্ম্মফল অর্পণ করিবাব শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। বালিকা শিব-পূজা কবে, মনোমত পতি পাইবাব জন্ত; কিন্তু তাহার ফল বর্ত্তে সমস্ত জগৎ সংসারবৎ উপব। বিবাহে কেবল যে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভিত হয়, এমন নহে, বালিকা যাহাকে বিবাহ করে তাহাকে, তাহার আত্মীয় স্বজনকে এবং অবশেষে সমগ্র সমাজকে জগৎ প্রণয়ে অল্প-প্রাণিত কবে।

মনোমত পতি পাইবার জন্ত শিবপূজার বিধি কেন? “কত্মা ববয়তি রূপং”—মহাদেবের রূপের সীমা কি! মন্তকে জটাজূট, বিষপানে ঢুলু ঢুলু চক্ষু, অঙ্গে চিত্তাভয়, পবিত্রের ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম, কর্ণে ধুতুরা, গলে হাড়মালা, সর্কাজে ফণিকণা। যাহা যাহা বিকট, যাহা যাহা উৎকট মহাদেবে

তৎসমস্তই আছে, তথাপি তিনি মনোমত পতির আদর্শ। পবিত্র স্তন্যবী
গিবিস্তা পার্শ্বতী আর পাত্র পাইলেন না ; তাই উমেদারী করিয়া মহাদেবকে
তপে তুষ্ট করিয়া তাঁহার গলায় ববমালা দিলেন ! ইহাব তাৎপর্য এই যে,
হিন্দু বমণী বাহ্যিক চাকচাক্যে বিমোহিত না হইয়া, গুণের দাসী হইতে শিক্ষা
করিবেন, স্তন্যবী বালিকার চক্ষে সুরূপে প্রয়োজন নাই। অনন্ত প্রেম
শিক্ষাই বালিকার উদ্দেশ্য ; সেই জন্ত দিগম্বর তাহার আদর্শ পতি। অতি
কুরূপও তাহার হৃদয়েব আদরের সামগ্রী হইতেছে। যে অলঙ্কার ও ধনেব জন্ত
জীজাতি একেবারে উন্নতপ্রায়, এমন কি স্নাতা সর্বদা যাহাতে জামাতাকে
অধিকারী দেখিতে চাহেন, মহাদেবে তাহার বিমুখতা না থাকিলেও তিনি
আদর্শ জামাতা।

“মাতা বিভং”—মাতা চাহেন কন্যার স্বামী ধনশালী হইবে ; কিন্তু
মহাদেবেব এক কড়া কাণা কড়িবও সম্বল নাই। যাহাব একখানা লজ্জা-
নিবারণ জন্ত বস্ত্র যুটে না, যে পেটের দ্বায়ে ভাং ধুতুবা খায়, গৃহাভাবে অশ্রু-
মশানে ভ্রমণ কবে, বাহন অভাবে দাগা ষাড চড়িয়া বেড়ায়, অলঙ্কারভাবে
হাড়ের মালা গলায় পরে, সে যদি ধনবান তবে আব নির্ধন কে ? তথাপি
তিনি আদর্শ জামাতা। কেন না তিনি প্রেমিক, প্রেমের নিকট পার্থিব ধন যে
অতি অপদার্থ, মহাদেবকে আদর্শ পতি করিয়া বালিকা তাহাই শিক্ষা কবে।
“পিতা শ্রুতম্”—পিতাব ইচ্ছা পণ্ডিত জামাতা ; কিন্তু মহাদেবে পাণ্ডি-
তোর কিছুই লক্ষিত হয় না। যে জীবন-নাশক হলাহল পান কবে সে যদি
বিজ্ঞ, তবে অস্ত্র কে ? যাহাব কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম জ্ঞান নাই, যে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম জ্ঞানবিবর্জিত,
সে যদি শাস্ত্রপাণ্ডগ, তবে নিরক্ষর কে ? তথাপি মহাদেব আদর্শ পতি।
ইহাব কাবণ এই যে, বিশ্বপ্রেমের নিকট কি রূপ, কি ধন, কি বিদ্যা
কিছুবই আদর নাই। যদি বিশ্বপ্রেম, রূপ বা ধন বা বিদ্যা সাপেক্ষ হইত,
তাহা হইলে অনন্ত প্রেমের পথে বাধা পড়িত, কাবণ সকলেই যে এই সকল
গুণবিশিষ্ট হইবে, তাহা কখনই সম্ভব নহে। অবশেষে বিশ্বপ্রেম কুল, জাতি
কিছুই অপেক্ষা কবে না। স্তন্যবী যে সকল “বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি” তাঁহাবাও
মহাদেবকে পতির আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মহাদেব স্বযন্তু,
স্তন্যবী তাঁহার পিতামাতা, জাতি কুল কিছুই নাই। বিশ্বপ্রেম এ সকল
কিছুবই অপেক্ষা করে না—যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই প্রেমপ্রাপনে
প্রাবিত করিয়া ধাবিত হয়। এই সকল কাবণে মহাদেবই প্রকৃত আদর্শ

তুমি রূপা, তুমি ভক্তি,
 স্থিতি-স্থিতি-লয় শক্তি,
 প্রেমিকের তুমি প্রেম, তুমি সে বিরহ ।
 তুমি মান, অভিমান,
 তুমি দান, প্রতিদান,
 তাই ব্রজবালা তোমা ভাবে অহবহ ।
 অভাগিনী মোরা নারী,
 তুমি নয়নের বারি,
 হৃদয়ে বসতি কর হৃদয়ের ধন ।
 বড় বাধা হ'লে পবে,
 দেখি তোমা প্রাণভবে,
 ধবিরে হৃদয়ে রাখি কবি আলিঙ্গন ।
 তুমি দীপ্তি, তুমি রূপ—
 তুমি রস, বস কূপ—
 নীবস বদিক হয় লভিলে তোমায় ।
 তুমি ধাবা যমুনাধি,
 বাশরী মাধুরী ধার,
 তুমি হে অমৃত-সিঞ্চ এ মরু ধবায় ।
 তুলি মলয়ের বার,
 মধুমাস এ ধবায়,
 তুমি তমালের পাখে কোকিল : কুজন ।
 মনভেব স্বর্গ তুমি,
 বিকচ নলিন তুমি,
 তুমি মধু, তুমি অলি, তুমি হে গুজন ।
 সূর্য্য'চন্দ্র গ্রহ তারা,
 সকলি তোমার ধারা,
 স্বলেহ ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব তোমার কণায় ।
 তুমি দ্বাধা, তুমি জাঘ,
 শুধু ভিন্ন ভিন্ন নাম,
 একরূপে দুইরূপ অতেন আত্মায় ।

নারীজীবন ।

গোপ নারী মোবা নাথ ।
 প্রেম অংশ তব সাথ,
 এত কি পুণের বল অবলা বালাব ।
 তব অংশ বলে ডাই ।
 যদি কিছু জানে বাই ,
 তুমি প্রেমচাঁদ, সে যে জোৎস্না তোমাব ।
 নাহি তব আশ্র পব,
 তাই ওহে নটবব ।
 ভবসায় ভাসে প্রাণ পদ লভিবাবে ।
 দেখ দেখ চেয়ে দেখ ।
 বাথ বাথ মান রাখ ।
 অকুলে এসেছি বাল সব তিববাবে ।”

দেবশর্ম্মা ।

নারীজীবন ।

“বিদ্যাবতী ধর্ম পরা কুলদ্বী লোকে নবাবাং বমণীং বহুং
 তংশোভতে যন্ত গৃহে সন্নিব ধর্ম্মার্থ কামং লভতে স যন্তঃ ।

বিদ্যাবতী ও ধর্ম-পরা কুলনারী এক মনোহর বহু , এই বহু বাহার গৃহে
 সর্বদা শোভা পায়, তিনি যন্ত ও তাঁহার ধর্ম অর্থ কাম লাভ হয়। এক্ষণে
 যদিও তাদৃশী নারী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পূর্বকালে এইরূপ
 নারীর দ্বর্জ ছিল না। পূর্বকালে যে সকল ধর্ম্মী নারী ছিলেন, তাঁহাদের
 নাম লইলে স্বর্গের দেবী বলিয়াই পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহারা বাস্তবিকই
 এক একটি রত্ন। অর্ধদ্রোণী, গার্গী প্রভৃতি প্রাচীন মহিলাগণ অতি উচ্চধর্ম্মমণ

পতি। বালিকা হৃদয়ে একবার এই আদর্শপতির মূর্তি অঙ্কিত হইলে, তাহা আর এ জন্মে মিশার না—বিশ্ব-সংসারের সহিত এক হ্রে প্রাণিত হইয়া থাকে। শুভ বিবাহে কত্তা ও তাহার পিতা এবং বন্ধুবান্ধব ভিন্ন অপর লোকে মিষ্টানের আশা করিয়া থাকেন। মহাদেবের বিবাহে তাহা মিলিবার সম্ভাবনা নাই বটে; কিন্তু যে বিবাহেব বীজময় বিশ্বপ্রেম, তাহাতে আপামর সাধারণ প্রেমে বদ্ধ হইলে, অপর মিষ্টানে প্রয়োজন কি? যে বিবাহে জগৎ সংসার এক অনন্ত প্রেম প্রবাহে পবিত্র হইয়া, তাহাতে মিষ্টানের অভাব নাই। সুতরাং যাহাদিগের সহিত সাংসার সঙ্ঘর্ষ, এ বিবাহে তাহারা যেমন লাভের ভাগী, অপরও তাহা অপেক্ষা নূন নহে। এই সুকল কারণে কুমারীগণ সংসার ক্ষেত্রে পদার্পণ কবিবার সময় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাব তুল্য পতির কামনা করিয়া থাকে। এ ত্রুত রমণী জীবনের মহাত্ম্য এবং অতি কোমল সময়ে কুমারীগণ এ ত্রুত দীক্ষিত হইয়া বালিকা, আজীবন ইহার সাধনা করিয়া হিন্দু পরিবারকে অমরাবতী করিয়া তুলে। ইহাতে ঐহিক পাবত্রিক সকল প্রকার সুখের সম্ভাবনা এবং নিতান্ত সংস্রব-বিহীন লোক ও ইহার সুফল ভাগী হইয়া থাকে। অতএব হিন্দু গৃহে যত কুমারী আছে, সকলেই যেন এই মহাত্ম্য গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্মের পবিত্রতা ও হিন্দু বর্মণী কুলের গোবব বুদ্ধি করে।

সেই বৃন্দাবন ।

(যমুনাটট—সময় সন্ধ্যা।)

চেতন যমুনা কুলে,

চেতন ভ্রমাল-মূলে,

দাঁড়ারে কালিয়ে নট পীতবাস পরা।

চুড়ায় কুসুম দাম,

লেখা তাঁহে রাধা নাম,

গলে দোলে টাঁদ মালা সদা সুখা ভরা।

গ

সেই বৃন্দাবন ।

সেই স্থা লজ্জিবাবে
 ফেরে আলি চারিধারে,
 সেও গুন্ গুন্ স্বরে রাখা নাম পায় ।
 অলকা তিলকা গায়,
 রতন হুপুয় পায়,
 কোটা ববি শশী তাহে লুটোগুটি থায় ।
 ললাটে চন্দন-চাঁদ,
 রমণী-মোহন-ফাঁদ ;
 ফুলধনু লয়ে তথা বসে আছে কাম ;
 ব্রজ-কুল-বালা কুল
 শ্রামে মঁপে দেয় কুল,
 হেবে সেই সুকুমার ত্রিভঙ্গিম ঠাম ।
 শ্রামেব বাশরী বোলে
 ব্রজবালা হিয়া দোলে,
 চলে দেয় শ্রাম পদে যৌবন নিছনী ;
 যবে সে বাশরী ভাবে,
 নবন ঢুলিয়া আসে,
 অবল অলস অস সুখির চাহনো ।
 থিৰ বিজুব্বব মালা—
 কবে থাকে যেন আলা,
 প্রেমিকা ব্রজের বালা যমুনাৰ তীবে ।
 বহু মুগ্ধ ফণি প্রায়
 আপনায় পাণরায়,
 হৃদয় ভাসিয়ে যায় নয়নের নীবে ।
 যবে ঘোব ভেঙে যায়,
 পড়িয়ে শ্রামেব পাণ,
 কেঁদে কেঁদে কহে সবে আকুল পবাণে,—
 “গুন শ্রাম গুণধাম !
 তুমি শান্তি, তুমি কাম,
 জপি মোবা তব নাম দেখানে গেয়ানে ।

অনেকে সাংসারিক জীবনকে বিরক্তিকর বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু ধর্মভাবে চালিত হইয়া চলিতে পারিলে ইহাতেই পরম সুখ। তাহাদের ধর্ম আছে, জীবনে সাধন ভজন আছে, তাহারা স্বীয় ধর্মবলে কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করেন না। নারী সধবাই হউন আর বিধবাই হউন, যদি তিনি ধর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া কার্যমনোবাক্যে ভগবানে আত্মা সমর্পণ করেন, তাহা হইলে আর তাঁহার ভয় কি ? ঈশ্বর তাঁহার সকল দুঃখ খণ্ডন করেন। আমরা যে, যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, জীবনে ধর্ম থাকিলে সুখের অভাব থাকিবে না। সংসারে লোক ধনের জজ্ঞ, মানের জন্য, যত ব্যস্ত থাকে, ধর্মের জন্য তদ্রূপ হইলে ইহ জীবনেই স্বর্গসুখভোগ কবিতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে কুমারী, সধবা, বিধবা সকলেব জন্যই ঈশ্বর এক এক অবস্থার সুখ বাধিয়াছেন। কুমারী বিদ্যা শিখিয়া, সধবা পতিসেবা করিয়া, বিধবা দেবী ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিয়া অপূর্ণ ধর্ম সাধন করিতে অধিকারিণী। পূর্বকালে এইরূপ প্রথাই প্রচলিত ছিল। আহা ! ধর্মের কি অপূর্ণ মহিমা। যে সকল মনুষ্য সর্বদা কুসংসর্গ এবং পাপ কার্যে রত থাকে, তাহাদের জীবনেও যদি ধর্মের ছায়া পতিত হইতে পারে, তবে সেই দুর্গন্ধ কলুষিত জীবনও কেমন অপূর্ণ হইয়া উঠে। আমার নিকট একখানা পুস্তক আছে, তাহার নাম “পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা।” ইহা পাঠ করিলে মনে কি সুখ হয় ; রামায়ণে একটি হীনজাতীয়া তাপসীর বৃত্তান্ত আছে, তাহাও কি মিষ্ট, পাঠ করিলে মনে কি অপূর্ণ ভক্তির সঞ্চার হয়। দুঃখের বিষয় এই, ইদানীন্তন কালে নারীগণ মধ্যে তাদৃশ ধর্মজীবন দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ কাল পুরুষের মধ্যে যদিও ধার্মিক দুই একটি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ধার্মিকা নারী বড়ই দুর্লভ। পূর্বকালে এ রত্নের অভাব ছিল না। প্রতি তপস্বীর আশ্রমেই দুই একটা রত্ন শোভা পাইতেন। আহা ! কবে আবার এমন দিন আসিবে, যখন প্রতি গৃহস্থের ঘরে রমণীগণ পবিত্র নারীজীবন লাভ করিয়া জগৎকে স্বর্গভূত্যা করিবেন। যদি আমরা সকলেই ধার্মিকা ও শুদ্ধাচারিণী হই, তবে অচিবে ইহাজীবনেই স্বর্গ দর্শন কবিতে পারি। হে ঈশ্বর ! আমরা অবলা রমণী, আমাদের জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, ধর্মবল নাই। হে প্রভো ! তুমি জ্ঞান দেও, বুদ্ধি দেও, আমাদের হৃদয়ে ধর্মবল প্রদান কর। আমরা যেন চিব দিন তোমার চরণের দাসী হইয়া থাকি। তুমি জ্ঞান, তুমি বুদ্ধি এবং তুমিই ধর্ম, তোমার চরণ হইতে আমরাগিকে পৃথক রাখিও না। প্রভো

দয়াময়! চির দিন যেন তোমার পাদপদ্মে আমাদের মতি র্তি থাকে। দয়াল! আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর। তুমি পাপহাবী হরি, আমরা অজ্ঞান, কিরূপে তোমাকে ডাকিতে হয় এবং কিরূপেই বা তোমার পূজা করিতে হয়, কিছুই জানি না। প্রভো! আশীর্বাদ কব, যেন এই দাসীরা তোমার গুণ কীর্তন করিয়া তোমার পাদপদ্মে ভক্তি করিয়া কৃতার্থ হইতে পাবে।

শ্রীমুক্তকেশী দেবী।

[শ্রীযুক্ত শবচন্দ্র চৌধুরী, বি এ, হেডমাষ্টার, পুটিয়া হায়ার ইংবাজি স্কুল, ডাক—নাটোব—আমাদিগকে লিখিয়াছেন, লেখিকা “ঘোড়শ বর্ষিয়া”— “ইংবাজি জানেন না, অন্তঃপূবে থাকিয়া বামায়াণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন কবিতেন। বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখনে এই তাঁহার প্রথম উদ্যম।”

নবজীবন সম্পাদক।]

প্রাচীন কলিকাতার দুই একটা চিত্র।

আজ যে কলিকাতার এত নাম ডাক, এত সৌন্দর্য্য, এত গোবব, দেড় শত বৎসর পূর্বে, ইংবাজ অধিকারের প্রথম অবস্থায়, ইহার কিরূপ ভাব ছিল, তখন কলিকাতার কোথায় কি ছিল, তাহা জানিতে অনেকের আগ্রহ থাকিতে পারে, আমবা এ সম্বন্ধে যত টুকু বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, অন্য তাহার একটু পরিচয় দিব।

পলাশীর যুদ্ধের পরও কলিকাতা অরণ্যে পূর্ণ ছিল। এখন যে গঙ্গাতীর বাণিজ্য ও বায়ু সেবনের সুন্দর স্থান হইয়াছে সে সময় তাহা বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। চৌবঙ্গীর তখন নাম গন্ধ হয় নাই, কেবল ইংবেজের গোবব ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সবে মাত্র তখন নির্মিত হইতেছে। এক্ষণে যে স্থানে পমিট বা কষ্টম হাউস, ঐ স্থানে ইংরাজদিগের পুৰাতন দুর্গ ও তাহার সন্নিকটে একটা ছোট খাট ডক ছিল, সেই ডকে কোম্পানীর বোট প্রভৃতি মোরামত হইত। তখন কলিকাতায় এত জীয়াব ছিল না, জাহাজ কদাচিত্ দেখা যাইত।

মানবজীবন গঠন কবিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম অদ্যাপি প্রাচীনতম হইয়া বহিয়াছে। তাঁহারা পতিব্রতা ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহারা আশ্রমে থাকিয়া পুরুষের গ্রাম তপস্যা কবিতেন। অরুন্ধতী, অদিতি প্রভৃতি নারীগণ পতিসহ যোগাচাবে রত থাকিতেন। স্ত্রীদিগেব পৃথক যজ্ঞব্রত বা ধর্মচরণ নাই। স্ত্রীধর্মার্থ কাম বিষয়ে পতিবই সহচাৰিণী ও অনন্ত জীবনের সঙ্গিনী। ইহাতেই তিনি নবলোকে ধন্য ও সুবলোকে প্রশংসিতা হন। গৃহহাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিবেকে সম্পন্ন হয় না, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, হিন্দুবিবাহেব উদ্দেশ্যই ধর্মচর্যা। হিন্দু ভিন্ন অল্প কোন জাতি ধর্মসাধনের নিমিত্ত স্ত্রী গ্রহণ করে না। বাস্তবিক হিন্দুদিগেব এ নিয়মটী অতি উৎকৃষ্ট। ধর্ম নব নারী উভয়েবই অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। মনুষ্য হইলেই জ্ঞানেব প্রয়োজন। জ্ঞান ধর্মেব জন্মই আবশ্যকীয়। ধর্ম বিনা জীবন নিবর্থ, ধর্মহীন জীবনের কোন অর্থই নাই। মানবজীবনে যদি ধর্মেব চর্চা বা সাধন ভঞ্জন না থাকে, তবে ইহার যে কি প্রয়োজন তাহা আমরা মনেও কল্পনা করিতে পাবি না।

“আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতং পশুভির্নবাগং

ধর্মোহি তেষা মধিকো বিশেষো ধর্মেণ হোনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

মনুষ্যেরা যেমন আহাবাদি করিয়া থাকে, পশুবাও সেইরূপ করে, কিন্তু পশুতে এবং মানুষেতে বিশেষ এই যে, মানুষের ধর্মবোধ আছে, পশুর তাহা নাই। ধর্মহীন হইলে মানুষ পশুব সমান। কিন্তু হৃৎকের বিষয়, অবলা নারীগণ অধুনা প্রায়ই সন্দাচাব ও ধর্মবর্জিত। যাহাদের জীবনে ধর্মেব জ্যোৎস্না পতিত হয় নাই, তাহারা জ্ঞেয়ব কি, ধর্ম কি, কিছুমাত্র জানে না, তাহাদের জীবন ঘোর অন্ধকারময় নরক।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পুরুষই স্ত্রীলোকেব জ্ঞানধর্মেব প্রতিবন্ধক, পুরুষের দ্বায়েই নারী জাতিব এত হীনতা! কিন্তু আমাব বিবেচনায় ইহা ছলমাত্র। স্ত্রীই হউন আং পুরুষই হউন, সকলেবই উন্নতির জন্মনিজ্বেদ্যব কবা কর্তব্য। “আত্মেব হ্যাশ্বনো বহু রাশ্বেব রিপুয়াশ্বনঃ।” আপনিই আপনার বহু ও আপনিই আপনার শত্রু।

আবার অনেকেব দাবী। এই যে, পুরুষের গ্রাম স্ত্রীদিগেব জ্ঞান ধর্ম লাভ করিবার শক্তিই নাই,—এটিও নিতান্ত ভ্রমাত্মক কথা। কেননা, সকলেই জ্ঞেয়েব সন্তান, জ্ঞান জ্ঞান ধর্ম সম্বন্ধে সকলকেই সমান অধিকার দিয়াছেন।

স্ত্রীলোকদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবেন কেন ? আত্মেরী, গার্গী, গৌতমী, অরুন্ধতী প্রভৃতি যে সকল মহিলার নাম পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি এবং ধর্ম পুরুষের জায় উন্নত ছিলেন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মন অধিক কোমল, অতএব ধর্মসাধনে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শক্তি অধিক বলিতে হইবে। তবে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্ত্রী-পুরুষের যদি বিদ্যা এবং ধর্ম সমান অধিকার হয়, তবে পুরুষ অপেক্ষা বিদ্যাবতী এবং ধর্মপবায়ণা স্ত্রীর সংখ্যা এত অল্প কেন ? উত্তর এই যে, স্ত্রীলোকদিগের নিজের উদ্যোগ ও উৎসাহ নাই। তাই তাহাদের এত হৃদশা। স্ত্রীলোকেরা নিজের দোষেই নিজের জ্ঞান ধর্ম শূন্য হইয়া আছেন। “উদ্যমেন হি সিদ্ধান্তি কার্যানি ন মনোরথৈঃ। নহি স্পৃহন্ত সিংহস্ত প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।” সিংহ নিদ্রিত থাকিলে যেমন তাহার মুখে মৃগ প্রবেশ করে না, সেইরূপ উদ্যোগ বিনা লোকের মনোবশ সিদ্ধ হয় না। স্ত্রীলোকের নিজের উদ্যোগ নাই বলিয়াই তাঁহাদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের এরূপ হীন অবস্থা লক্ষিত হয়। অবশ্য পুরুষের সাহায্য ব্যতীত বমণীর পক্ষে বিদ্যালাত ছকর বটে, কিন্তু ধর্মসাধন সেরূপ ছকর নহে। আব বিদ্যালাতভেই বা পুরুষকে অন্তবায় বলিব কেন ? রমণী বিদ্যার জন্ত প্রকৃত বাগ্মতা দেখাইতেছেন, অথচ পুরুষ তাহার সাহায্য করিতেছেন না, এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল, অন্তত আমি এরূপ দৃষ্টান্ত কোথাও দেখি নাই। পূর্বকালে ঋষিগণ তাঁহাদের রমণীদিগকে দেবী মনে করিতেন। তাঁহাদের আচরণও ঠিক দেবীর মতই ছিল। সেই প্রাচীনতার সহিত আধুনিক ভাবের অনেক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বকালের রমণীগণ গুরুজনদিগের সেবাশুক্রবাকে পবন ধর্ম মনে কবিতেন। আধুনিক নবাগণ গুরুজনদিগের সেবা না কবিয়া সেবা পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে সেবা করাতেই অধিক সুখ। শবীর দ্বাৰা এবং আত্ম দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিলেই জীবের জীবন সার্থক হয়। মহিলাগণ যদি উৎসাহিত হইয়া কায়-মনোবাক্যে সদাচার ও ধর্মাচারে রত থাকেন, তাহা হইলে আর সুখসৌভাগ্যের সীমা থাকে না। সংসারে স্ত্রী-পুরুষ যদি এক হইয়া ধর্মপথে অগ্রসর হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্যক সাধিত হয়। ধর্মময় জীবন বড়ই সুন্দর, ইহা সুগন্ধি ফুলের মত লোকের মনে আনন্দ দেয়। কর্তব্যকার্যে অটল ও সর্ব জীবে দয়া এবং ঈশ্বরে ভক্তি থাকিলেই জীব ধর্মময় ও সুন্দর হয়। বিশেষত নারীজীবন ধর্মময় হইলে আবে সুন্দর দেখায়।

নানা প্রকার বড় বড় দেশী নৌকার তখন কোম্পানীর কাজ চলিত। আব এখানকার জাহাজ তখন কলিকাতায় এত ঘাটও ছিল না, পুরাতন কেয়ার সম্মুখে একটি এবং আরও দুই একটি সামান্য ঘাটে মাত্র ছিল। কেয়ার ঘাটে কোম্পানীর লোকজন নামা উঠা করিত।

১৭৫৬ অব্দে নবাব সিরাজ উদৌল্লাহ কলিকাতা আক্রমণে কলিকাতা-বাসীদের কিছু লাভ হইয়াছিল। নবাবের কলিকাতা আক্রমণে কলিকাতা-বাসীদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে বলিয়া তিনি সকল শ্রেণীর লোককেই সেই ক্ষতি পূরণের জন্য বিস্তৃত টাকা ধরিয়া দেন, সেই টাকায়, ইংরেজদের ত কথাই নাই, অনেক বাঙ্গালী নূতন ঘর বাড়ী প্রস্তুত করেন, অনেকের জবাঞ্জীর্ণ আবাস ও কুঁড়ে ঘর এই দুই সিঁহাজ উদৌল্লাহ আক্রমণের ফলে নূতন আকার ধারণ কবে। আব এই ঊনবিংশতি শতাব্দীতে ইংরাজ বাহা-
দুরের কল্যাণে মিসরেব আলেকজান্দ্রিয়া সহর আর একরূপ অপূর্ণ শ্রী ধারণ কবিয়াছে। যাহা হউক, নবাব সিরাজ উদৌল্লাহ আক্রমণ ফলে কলিকাতার শ্রী একটু ফিবিয়া যায়, ও বর্তমান ইংরাজ টোলাব এই উপলক্ষে প্রথম সূত্রপাত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি তখন চোরঙ্গীব নাম গন্ধ ছিল না; ইংরাজ দোকানদারেরা বাধাবাজার, চীনেবাজার, মুবঙ্গীহাটা ও আখ্যানি গির্জার নিকট দোকান পত্র করিত, এখন ইংরাজেরা লালদিঘি, চৌবঙ্গী ও ও ধর্মতলা অধিকার করায় বাঙ্গালীরা এই সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। তখন লালবাজার এখনকার চোরঙ্গীর সম্মান উপভোগ কবিত, কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীরা তখন লালবাজারবাণী ছিলেন। এই স্থান তখন কলিকাতার মধ্যে 'ভদ্রপল্লী' বলিয়া সম্মান লাভ করিত।

পুরাতন চুর্নগড় উত্তরাংশে কোম্পানীর কাপড়ের গুদাম ও অপরাপর অংশে কর্মচারী লোকজনের বাস কবিত। চোরঙ্গী তখন বন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, কেবল কলিকাতায় একটি ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। গড়ের মাঠের কতকটায় বন জঙ্গল আর কতকটা আবাদী জমি ছিল, তাহার মধ্যে দুই চারিখান কুঁড়ে ঘর দৃষ্ট হইত। এই সকলের মধ্য দিয়া একটি মাত্র রাস্তা গিয়াছিল, এই রাস্তা দিয়া তখন আলিপুর ও খিদিরপুরে যাইতে হইত। আলিপুর খিদিরপুর তখন বৎ সামান্য গ্রাম মাত্র, উপনগরের সম্মান লাভ তখন ঘটে নাই। এখন আদি গঙ্গা পার হইয়া এই দুই গ্রামে বাইবার নিমিত্ত যেকোন কয়েকটি রূহং সুবিস্তৃত লোহ সেতু রহিয়াছে, তখন দুইটি অপ্রশস্ত কাঠের

সেতু ইহাদিগেব স্থান অধিকার করিয়াছিল মাত্র। কলিকাতার এখনকার মত তখন যেখানে সেখানে ক্রম, বগী, কিটনের ছড়াছড়ি ছিল না; ভাল গাড়ীর মধ্যে ক্লাইবেব একখানি এবং ওয়াট সাহেবের একখানি সবে মাত্র দুই খানি ছিল, তবে অন্নদিনের মধ্যেই সংখ্যা বাড়িতে লাগিল বটে। বান্ধালী-দিগের মধ্যে বড় একটা কেহ গাড়ী ঘোড়ার ধার ধারিত না। বড় লোকেরা পাল্‌কিতে কবিরাই প্রায় সকল স্থানে যাতায়াত করিতেন, আব বান্ধালী টোলায় তখন গাড়ি চড়িবাবও বড় সুরিধা ছিল না। পাড়ায় পাড়ায় বন জঙ্গল আর পুকুর, বড় বাস্তার মধ্যে সবে চিংপূব বোড, সুরবাং বাবুবা ভাল গাড়ী চড়ে, কি কববেন। কলিকাতার উত্তর পল্লী কয়টিব বা বান্ধালী টোলাব এখনকার তুলনায় তখন লোক সংখ্যা সামান্য হইলেও অধিবাসীব সংখ্যা বড় মন্দ ছিল না। কোম্পানীর চাকরীতে বোজগার থাকায়, কলিকাতাব লোক সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল।

যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে সে সময় কলিকাতাব স্বাস্থ্য বড় মন্দ ছিল। অব, পালাজব, পিলে, উদবাময় প্রভৃতি বোগগুলি তখন কি ইংবাজ কি বান্ধালী সকলেব নিত্য সহচর ছিল। এখন যেমন একজন ইংবাজ আপন অত্যাচাবেব ভোগে ভুগিয়া মবিলেও তাহার খবর পার্লামেন্ট পর্যন্ত যায়, ও কথায় কথায় মিউনিসিপালিটী ও গ্যাস কোম্পানীকে তাহার জবাব দিহি কবিতে হয়, তখন এত ঝগড়া কাহাকেও পোহাইতে হইত না, অথচ প্রতি বৎসর আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর মাসেব মধ্যে (অর্থাৎ বর্ষা ও শীতকালে) বাব ঘণ্টাব মধ্যেই অনেককে ইংবাজ লীলা সম্বরণ কবিতে হইত। নবাব সিবাজ উদ্দৌলা যে বৎসর কলিকাতা আক্রমণ কবেন, সে বৎসর মেজব ফিলিপেট্রিক দুই শত চল্লিশ জন ইংবাজ-সৈনিক লইয়া ফলতায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ কবেন, সেখানে এই কয় মাসের মধ্যে দুই শত দশ জন সংক্রামক জবে প্রাণত্যাগ করে।

১৬৮৯ সালের সংক্রামক জরে আগষ্ট হইতে জানুয়ারী মাসের মধ্যে বাব শত ইংবাজ অধিবাসীব মধ্যে ৫৮৮ শত বাট জনকে কবরস্থ কবিতে হয়। ১৭৬২, ১৭৬৮ এবং ১৭৭০ সালে কলিকাতায় জবেব অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে শেষোক্ত বৎসর জব ও আশাশয় বোগে আলী হাজার বান্ধালী ও দেড় হাজার ইংবাজের কলিকাতা প্রাপ্তি হইয়াছিল। মনে করুন, এখনকার তুলনায় তখন ইংবাজের সংখ্যা কত অল্প ছিল। কেবল কলিকাতাতেই

যে ইংবান্দিগকে এঁহরূপ বিনা বাক্য বায়ে প্রাণ হাবাইতে হইত তাহা নহে, জলপথেও প্রভুদের পরিভ্রমণ ছিল না; ভাল বৎসবেই প্রত্যেক জাহাজেব প্রায় সিকি লোককে ডায়মণ্ড হারবাবে গঙ্গালাভ করিতে হইত। কলিকাতার মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হইয়া এই মৃত্যু সংখ্যা কমিয়াছে, তাই সাহেবদিগের মিউনিসিপালিটিকে লইয়া আক্রমণ এত আবদার বাড়িয়াছে ও কথায় কথায় মিউনিসিপালিটির উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া তাঁহাবা কাল বাড়িয়া থাকেন।

মৃত্যু সংখ্যাব হ্রাস তখনকার কলিকাতায় আশুপুণ লাগাব সংখ্যাবও বড় বাড়াবাড়ি ছিল। প্রতি বৎসবই বিস্তর গৃহ অগ্নিতে ছাব খাব হইয়া যাইত। তন্মধ্যে ১৭৮০ সালের ২৪শে মার্চ শুক্রবার দিবসে কলিকাতায় বেকুপ অগ্নি কাণ্ড হয়, সেরূপ অগ্নিকাণ্ড সমস্ত বান্ধালায় পরবর্তী শত বর্ষেব মধ্যে হইয়াছে কি না সন্দেহ। উক্ত দিবস বহুবাজাবে প্রথম আশুপুণ লাগিয়া জান বাজার ও কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অর্ধ ক্রোশাধিক পথে হাজাব গৃহ ধ্বংস করে। এই অগ্নিকাণ্ডে কত লোক পুড়িয়া মবে তাহার সংখ্যা নাই, তবে এই আশুপুণেব ধূঁয়াতে এক শত নব্বই জন লোককে শ্বাসবদ্ধ হইয়া মবিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। এই বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে কলিকাতায় বিস্তর লোক নিবাশ্রয় হইয়া পড়ে, আনাব এই অগ্নিকাণ্ডেব কথা শেষ হইতে না হইতেই এপ্রেল মাসে উহাব নিকট পুনবায় এক ভয়ানক আশুপুণ লাগে। এই সকলের দ্বাবা স্পষ্ট বুঝিতে পাবা যাইতেছে, প্রাচীন কলিকাতাব অধিবাসীগণ কতদূর নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস কবিতেন।

ইংবান্দিগের কলিকাতায় উপনিবেশ সংস্থাপনের প্রথম অবস্থায় পুলিশ আদালত ছিল না। তখন মেয়র কোর্ট বলিয়া এক রকম আদালত ছিল। ১৭২১ সালে জেট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীবা এই আদালত সংস্থাপন করেন। জজ ম্যাজিস্ট্রেটের পরিবর্তে মেয়র ও অল্ডারম্যানেরা তখন বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। এই সকল বিচার কার্য্য বড় চমৎকাব ছিল, “জোর বার মূলুক তার” “টাকা যার জয় তার” এই প্রণালীতে তখন বিচার কার্য্য সম্পন্ন হইত।

প্রাচীন কলিকাতায় হিন্দুধর্মের বিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা লিখিতে গেলে বড় গোলে পড়িতে হয়। সাহেববাই আমাছের দেশের সকল সময়েব ইতিহাস লেখক, বাঙ্গালী বাবুবা এ সকল ব্যক্তির কাজের ধার ধাবেন না, আনাব সাহেব-

দ্বিগেব মধ্যে বাহাবা প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বেশী কবিবা লিখিয়াছেন, তাঁহার সকলেই মিশনরি, সুতরাং তাঁহাদের লেখায় নিন্দা ভিন্ন প্রশংসা খুঁজিয়া বাহির করিবাব যো নাই ; তবে আমবা এই নিন্দার মধ্য, হইতে এইটুকু ছাঁকিয়া লইতে পারি যে, তখনকার হিন্দুধানীতে ভেল চড়ে নাই, ভণ্ডামী, দোকানদারী কবিবার লোক তখনও জন্মায় নাই, আব হিন্দুধর্মের মুখপত্র বলিয়া তখন কেহ দাবী দাওয়া কবিত না, সকলে সবল বিশ্বাসের সহিত হিন্দুধর্মের নিয়ম বন্ধা ও ক্রিয়া কাণ্ড পালন কবিত । কারনওয়ার সাহেবেব লেখায় বোধ হয় বৈষ্ণব অপেক্ষা শাক্তের প্রাচুর্য্যাব তখন যেন কিছু বেশী ছিল ; তাঁহার লেখাব মধ্যে চিত্রপুরে ও কালি-ঘাটে নরবলির কথা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই নর বলির সংখ্যাও যে বড় মন্দ ছিল না,—তাঁহাও তিনি উল্লেখ কবিবা গিয়াছেন । এই সকল বলি গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইত । সতী দাহ, শিশু সন্তান গঙ্গায় নিক্ষেপ ও অন্তর্জ্বলির তখন বড় ধুম ছিল । দশহবা এবং পৌষ সংক্রান্তিৰ দিন গঙ্গায় শিশু সন্তান নিক্ষেপেব প্রশস্ত দিন ছিল । আমবা চিবকাল সতী “দাহের” কথাই শুনিয়া আসিয়াছি, অনেককেই যে জোব কবিয়া নিষ্ঠুরভাবে ‘দাহ’ কবা হইত,—আমবা ববাবব সাহেবদেব মুখে ইহাই শুনিয়া আশ্বিতেছি, কিন্তু কাযবণ্ডাব সাহেবেব লেখাব আমরা দেখিতে পাইলাম, কোন কোন বিধবা স্ত্রী স্বামীৰ অলুগমন না কবিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গঙ্গাতীরে যাইয়া বসিয়া থাকিত, পবে জোমাবের শ্রোতে তাঁহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত । বোধ হয়, যাহাদের স্বামীব বিদেশে মৃত্যু হইত তাহাবা এই প্রকার কবিত । বাহা হউক, সতীদাহব মধ্যে নিষ্ঠুরতা থাকিলেও সাহেববা সতীদাহ প্রথাটাকে হিন্দু বর্মণীৰ অববোধ প্রথাব ছায় তীষণভাবে বর্ণনা দ্বারা হিন্দু কদমের ষতটা নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা ও পিশাচ ভাবেৰ পবিচয় দিয়া থাকেন, হিন্দু পুরুষেবা যে ঠিক সেই ভাবে পবিচালিত হইয়া কাজ করিতেন, শেযোক্ত ঘটনাৰ দ্বাৰা ঠিক তাহা বোধ হয় না, ববং অনেক সতী স্ত্রীলোক যে স্বামীৰ মৃত্যুতে ইচ্ছাপূৰ্ব্বক আত্ম বিসর্জন কবিতেন—গঙ্গাতীরে বসিয়া দেহ ত্যাগ করাব ঘটনার তাহাই বিশেষ প্রমাণ হইতেছে ।

।কালীপ্রসন্ন দত্ত ।

বনিবে না ।

তোমাদেব সঙ্গে আমার বনিবে না । কেমন কবিরাই বা বনিবে বল,
তোমাদের সঙ্গে আমার প্রকৃতিব আকাশ পাতাল প্রভেদ ।

তোমবা স্নেহের কোলে লালিত পালিত হইয়া, পবিত্রনে বেষ্টিত হইয়া,
কৌমুদী-স্নাত সৌধোপরি বসিয়া, আশাব মোহন মূৰ্ত্তি হৃদয়ে আঁকিতে
আঁকিতে যে স্নেহভোগ কব, আমি গাঢ় অন্ধকারাবৃত, প্রাবৃটধারায় দিক্ত,
পবিত্রন-চ্যুত, একাকী এবং নির্জনে অবস্থিত, লোক ভয়ঙ্কর অশানকেন্দ্রে
উপনীত—হইয়া তোমাদেব চেয়েও স্নেহ পাই । এ ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুতে স্নেহের
আবেগে, বড় বড় তরঙ্গ ছুটিতে থাকে, তাই বলি তোমাদেব সঙ্গে আমার
বনিবে না ।

তোমবা স্নেহ চাও, আমি কেবল দুঃখ চাই ; তোমবা সৰ্ব্বদা হাসিলে স্নেহ
পাও, আমি এই নির্জনে স্থানে বসিয়া যদি দু ফোটা চক্কেব জল ফেলিতে
পাবি, তাহা হইলে আমার বড়ই স্নেহ হয় । তোমবা স্নেহ খুঁজিয়া খুঁজিয়া
শাবা হও, কাঁদ ; আমি তোমাদেব এই বহুত দেখিয়া বড়ই স্নেহ পাই, আমার
খুব হাসি আসে । তোমবা স্নেহেব পেছনে পেছনে ছুটিয়া যে স্নেহ পাও, আমি
কেবল তোমাদেব স্নেহেব কথা ভাবিয়া তাহা হইতেও আমোদ পাই । মোট
কথায় তোমাদেব স্নেহ এক বকম, আমার স্নেহ অন্য বকম । তবে বনিবে কি
কবিয়া ?

মানুষ মবিলে তোমবা ‘বিচ্ছেদেব’ জন্ম কাঁদ, কিন্তু আমি কেবল ‘তাহা-
দেব’ জন্ম কাঁদি । তোমরা বল যে “তাহাকে আব দেখিতে পাইব না ; সে
যে একেবাবে গেল ; সে তো আর আসিবে না ,” আমি বলি তাহাকে
দেখিতে পাইব, কিন্তু চিনিতে পাবিব না । সে গেল আবার আসিবে, কিন্তু
অন্ত কপে । তাহাকে দেখিব, তাহাৰ কথা শুনিব, তাহাকে আবার পাইব
কিন্তু চিনিতে পাবিব না । তোমরা তাহাৰ অন্তিম লোপ হইল বলিয়া কাঁদ,
আমি তাহাৰ অন্তিম বহিল বলিয়া কাঁদি । সুতরাং তোমাদেব চেয়ে আমার
কষ্ট বেশী ।

অশানকেন্দ্রে স্নেহ আমার মন । অশানকেন্দ্রে যদি তোমবা স্থগা কব, তবে
আমি তোমাদেব স্থগা । বাবেবে চিঠিব স্নেহ আমার মন সৰ্ব্বদা ধু ধু

ফরিতছে। তাহাতে পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, মোহ-মায়া, প্রণয়-স্নেহ, মমতা-ভাল-বাস, ভক্তি-প্রীতি, দয়া-দাক্ষিণ্য, পূজা-যোগ, ভালমন্দ, মান অপমান, জ্ঞান অজ্ঞান, বুদ্ধি-বৃদ্ধি, স্বার্থ-পরার্থ, কাম নিকাম, আলোক অন্ধকার, ধর্ম অধর্ম, আস্থা অনাস্থা,—এই সকলই পুড়িতেছে। মনের যে গুণটা সোণাব মত, তাহা এই আগুনে পুড়িয়া বিসৃত হইতেছে; যেটা অতি অকিঞ্চিৎকর, সেটা পুড়িয়া লয়প্রাপ্ত হইতেছে। স্বীকার কবিলাম তোমাদের মনও চিতার মত। কিন্তু তবু তোমাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে প্রভেদ বিস্তার। চিতার্পিত দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে চিতা নির্কারণ হয়। তোমাদের ঠিক সেইরূপ দশা। তোমাদের মন জলিয়া উঠিল, যে জিনিষটা তোমাদের মনে ছিল, তাহা সেই সঙ্গে পুড়িয়া গেল। অবশেষে কোঁস কোঁস কবিয়া কোঁটা কত তপ্ত অশ্রু পড়াতে তোমাদের মনের চিতা সম্পূর্ণরূপে নির্কারণপ্রাপ্ত হইল—সব ফুরাইল। তাব পব অন্ত্র দ্রব্য আসিয়া সেই স্থান অধিকার কবিল, পূর্বের চিত্র মাত্রও রহিল না। কিন্তু আমার মনে যখন চিতা জলিয়া উঠে, তখন সেই চিতাধূম মনের সর্বাংশ একে-বারে ব্যাপ্ত কবিয়া কেলে। চিতাও যত নিবিতে থাকে, সেই ধূমও তত আমার মনের অন্ত্রান্ত্র দ্রব্যের সহিত বিজড়িত হইতে থাকে। চিতা নির্কারণ হইলে যে সকল অস্থিও পড়িয়া থাকে সেগুলিও আমার মনের ভিতর স্তরে স্তরে চাপা পড়িয়া যায়। তোমাদের মন সমতল, আমার মন তদ্বিপবীত। আমার মনে ‘পাড়’ রহিয়াছে। সেই ‘পাড়েব’ এক পার্শ্বে তোমরা যদি দাঁড়াইতে পারিতে, তবে দেখিতে যে স্তবে স্তবে কত অসংখ্য চিতাব স্তর রহিয়াছে। কত অস্থিখণ্ড, কত অঙ্গাবখণ্ড, কত চিলুপ দাগ—আরো কত কি! তাই বলি, আমার মনে যে আগুণ জলিতেছে, তাহাব কাছে পৃথিবীর আগুণ অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ, অতি হেয়।

আজি এক বৎসর পূর্বে আমি একটা ‘পোর্টমেন্টেম’ অর্থাৎ শব-বাবছেদ দেখি। সে একটা কিশোরীর শব। বয়স ১৪।১৫ বৎসর। যখন তাহাব জুৎপিণ্ড উদঘাটিত হইল, তখন একটা কথা আমার মনে পড়িল। সে কথাটা এই যে, লোকে বলে—

“আমায় হৃদয় যদি দেখাবার হ’তো,
বুক চিরে দেখাতাম ভাল্যাসি কত।”

কিন্তু কৈ? জুৎপিণ্ডে যে কিছুই অস্তিত থাকে না। তাই আমি আমার জুৎপিণ্ডে কিছু মানসিক আশান দেখাবার ভাণ কবিল না। তবে এই মাত্র

বলিতে পারি যে, যদি কেহ তোমরা যাহাকে বিনা কাবণে বল, সেই বিনা কাবণে শ্রমশান ভ্রমণ, নির্জন-রোদন, সংসারে বৈরাগ্য, অতর্কিত অশ্রুফোটা, শূণ্যদৃষ্টি, জীবনে নিশ্চিন্তা, প্রকৃতির পূজা, অন্তরের ধ্যান, অসতর্কতা এইগুলির অথ প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তবে তিনি আমার মানসিক অবস্থা কিঞ্চিৎ ধাবণা করিতে পারেন। নচেৎ অন্তের কি সাধ্য যে আমাব মনের কথা জানিতে পাবে ?

তোমরা যাহাকে বীভৎস বল,—তাহাই আমাব রম্য। তোমাদের যাহা ভাল লাগে না, তাহা আমার বড় আদর। তোমাদের সঙ্গে আমার প্রকৃতিগত প্রভেদ বিস্তর। তাই বলি তোমাদের সঙ্গে আমার বনিবে না।

তোমরা সংসারী, আমি বৈরাগী। তোমাদের চিন্তাব অন্ত আছে, আমার চিন্তাব অন্ত নাই। তাই আমি সদা অনন্তে ডুবিয়া থাকি। আমি ‘অনন্তের’ বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যে স্থখ পাই, তাহাব বিন্দুমাত্রও বোধ করি তোমরা পাও না। সেই জন্ত—

“Alone and pensive, the deserted strand
I wonder o’er with slow and measured pace,
And shun with eager eye the lightest trace
Of human foot, imprinted on the sand.

I find alas ! no other resting—place
From the keen eye of man, for in the show
Of joys gone by, it reads upon my face
The traces of the flame that burns be low.

And thus, at length, each leafy mount and plain,
Each wondering stream and shady forest know,
What others know not—all my life of pain.”

জনশূন্য গঙ্গাতীরে, ভাবিতে ভাবিতে ধীবে,
একা একা আমি পায় পায় গণে,
বালুব উপবে লেখা, মানবের পদবেথ,
দেখিলে দূবেতে যাই চকিত নয়নে।

মানবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ছেয়েছে সংসারসৃষ্টি,
 জুড়াবাব স্থান মম আব কোথা জুটে ?
 অন্তবের দাবানল, মানবের লক্ষ্যস্থল,
 বতই ছাপাতে যাই তত কুটে উঠে।

তাইত,—

প্রাস্তব, পর্কতগণ, ছায়া-আচ্ছাদিত বন,
 ধীর প্রবাহিনী নদী জানে মম ব্যথা,
 জীবনের এ যন্ত্রণা, আব কেহ জানিল না,
 মবমে বহিল মম মরমেব কথা।

এক দিন তোমাদের সঙ্গে আমার বনিত। যে দিন যুহ পবনের যুহ যুহ
 হিলোলে ছোট ছোট ঢেউগুলি, অন্তাচলচুড়াবগ্নী সূর্য্যোব যুহবন্ধি সংস্পর্শে
 মগ্নিত হইয়া, ছলিতে ছলিতে আমার হৃদয় হুকুলে আসিয়া ধীরে ধীরে প্রতি-
 ষাত করিত, সেই দিন তোমাদের সঙ্গে আমার বনিত। হায়। সে দিন
 এখন আব আমার নাই,—সে দিন কখন আব আসিবে না। তবে আর
 তোমাদের সঙ্গে বনিবে কি কবিয়া ?

সে দিনও আর নাই, সেই ঢেউগুলিও আব নাই। তাহাব পরিবর্তে,
 হৃদয় এখন একটা মহাসমুদ্রের আধার। যদি সাহস হয়, সেই সমুদ্রের বেলা
 ভূমির উপর অবস্থান করিয়া দেখ, অনন্ত ব্যাপিয়া, নিম্নদেশে কি পড়িয়া
 রহিয়াছে! কি শান্ত, কি গভীর, কি প্রাণোন্মাদকর। ইহাতে ‘উত্তমাশা
 অন্তরীপের’ আবর্ভ নাই, ‘কুম্বসাগরের’ কাটকা সঙ্কলতা নাই। বহুবায়
 ইহার জল ছুটে না; খরশ্রোতার মত ইহাত ডাক নাই। ইহাব জল বড়ই
 প্রশান্ত, বড়ই স্বচ্ছ, এবং অনন্তবিস্তৃত। নিবীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে,
 ফলত নদীর প্রায় ইহা অনেক স্থলেই অন্তঃসলিলা। অনেক জলবিন্দু সমষ্টিতে
 ইহা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু কার সাধ্য এখন ইহার গতিবোধ করে ?—
 স্মৃতরাং তোমাদের সঙ্গে আমার বনিবে না।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মিলিবে না ।

তোমার আমার কিরূপে মিলিবে গোবান্দ ? তুমি নন্দনোদ্যানবিহারী,
আমি পথের ভিখারী । সুপ্রশস্ত সুবাসিত সুশীতল সুবমা হস্ত্য তোমার
বাস,—বাত্যোৎক্ষিপ্ত বর্ষা-সলিল-সিক্ত কর্দমময় কুটীবতলে আমার খাসপ্রখাস ।
বরুণ তোমাব ভয়ে তটস্থ,—জমিয়া বরফ, সে বরফ-মিথ্য বিহার-বাকলী
তোমার পানীয় । আর আমার পেয়—সকর্দম কূপোদক, সমল সরোবর
সলিল, অথবা ভগীবেগেব কঠোবতম তপোলক্ক এখনকাব এই জ্বাকুহুম-সর্দাপ
জাহ্নবী জল । তোমাব সহধর্মিণী—দিব্য বসন ভূষিতা চারুচন্দ্রপ্রভাননী
গৌরী ! আব

“মন্দোদরী যে শয়নে বিলগ্না

স বাবেগোহং দিকপাল হীনঃ ।”

এমন উত্তম ও এমন অধমে কিরূপে মিলিবে, গৌর ?

তুমি আছ, অমরাবতীতে—স্বর্গে । আর আমি, পাতালে—পুতিগন্ধময়
অন্ধকাব বিবর মধ্যে । দেখ, কেলো ভুলো আমার চাকব ; তাহাও সকল
সময়ে ঠিক বুঝিতে পারি না যে, তাহাবা আমার ভৃত্য, কি আমি তাহাদের
ভৃত্য । কিন্তু তোমাব পবিচারিকা—স্বয়ং চপলা । কি বণীকরণ তুমি
জান জানি না—যাহাব প্রভাবে তুমি অত্যন্ত চঞ্চল, চঞ্চলতার আদর্শ
সৌদামিনীকেও স্থির অচঞ্চল কবিয়া গৃহে বাধিয়া রাখিয়াছ ; আব সেও
‘বিনা ওজর আপত্তিতে’ তোমার ভৃত্যকে আত্মান কবিতেছে, তোমার
সংবাদ দেশ দেশান্তরে বহন কবিতেছে, আবশ্যক মত সুবিমল স্তব্র আলোক
রানিতে তোমার গৃহ ও উদ্যান উদ্ভাসিত করিতেছে,—আর কত কি করি-
তেছে, তাহার ঠিকানা নাই । ধন্ত তোমার মহিমা ! তোমার প্রভাপে
কণপ্রভা স্থিরপ্রভা হইয়া তোমার গৃহে নিত্য বিরাজমানা । তুমি স্বর্গের
দেবতা, আর আমি মর্ত্যের মানব । কত অসাধ্য, কত অকৃত কার্য তোমার
দ্বারা সাধিত হইতেছে । আর আমার দ্বারা কি হইতেছে ? আমি কি ?
আমি তোমার পদলেহী ভৃত্য মাত্র । তোমাতে দেবত্ব, আর আমাতে
নিগাবত্ব । এমন উত্তমে ও এমন অধমে কেমনে মিলিবে, দেব ?

ব্রহ্মতেজ এখন তোমারি । শুনিতে পাই, সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ ফুৎকারে

অপ্যুৎপাদন কবিতাে পাৰিতেন। সত্য মিথ্যা সেই সৰ্বজ্ঞ দেবই জানেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাই, তোমার সঙ্গে আমি সৰ্বদা বিদ্যমান। তোমার বাক্যে অনল বাহিব হ'ব, তোমাব বুটাঘাতে অনল নিকলে, তোমাব বেজে ত আমি বিদ্যমান আছেনই, তোমাব পকেটেও বহুদেব সৰ্বদা বিৰাজমান। স্মৃতবাং তুমিই একগুণে এই প্ৰবল কলিযুগে নিষ্ঠাবান বব-ব্রাহ্মণ, তাহাব সন্দেহ নাই। আর তাহা না হইলে ইংলণ্ডে বসিয়া মোক্ষ মূলব সাহেব হিন্দুব প্ৰায়ে ব্ৰাহ্মণপণ্ডিতব 'বিদ্যায়' পাইলেন কিৰূপে? ব্ৰাহ্মণেব বাক্যই বেদ। সে বেদবাক্যে এখন আমাদেব অটল বিশ্বাস। তাইত বলি, সামুগ্ৰযজ্ঞঃ কেবল কৃষকদেব ভয়গীতি মাত্ৰ বই ত নয়। যোগ, এখন কেবল তোমাৰি সাধা। প্ৰমাণ—অল্কট সাহেব। 'যজন যাজনের' কথা কেহ জিজ্ঞাসা কৰিবে না। কেন না তুমি ব্ৰহ্মদেশ হইতে আফগানিস্থান পৰ্য্যন্ত সমগ্ৰ দেশটা যেকুপ যজাইযাছে, তাহা লোক-বিশ্ৰুত। 'অধ্যয়ন অধ্যাপন'—শিক্ষাবিভাগেব বিবৰণীতেই প্ৰকাশ। আব দান প্ৰতিগ্ৰহণে তোমাব সৰ্বাপেক্ষা বেশী বাহাদুৰী। দুই চাবিটা ফাঁকা আওযাজ 'দান কবিয়া তুমি দেশীয় ভাৰত ভাণ্ডাবস্থ অমূল্য বদ্র সকল যে অতুলনীয় অমুকম্পায় সহিত 'প্ৰতিগ্ৰহণ' কৰিতেছ—তাহা বাস্তবিক প্ৰশংসনীয়। বালকে যেকুপ "গোপ্তাথেকে" গুড়ীতে "কান্নে" অথবা "নেজুড" লাগাইয়া দিয়া আকাশ কোলে উড়াইতে পাবে, তুমিও সেইকুপ বডলোকদিগেৰ নামে এক আনটু নেজুড যুড়িয়া দিয়া বিশেষ দক্ষতাৰ সহিত অত্যাচে উড়াইতে পাৰ; এবং বায়বেগে তাহাবা ছিন্ন ভিন্ন হইযা গেলে তুমি সেই বালকদেবই মত নিৰ্ম্মম ও দ্বিধাশূন্য চিত্তে তাহাদিগকে অক্লেশে পবিত্যাগ কবিতাে পাব, —স্মৃতবাং তুমি বালকেব হাথ সবলচিত্ত তাহাতে আব সন্দেহ কি? পূৰ্বে ব্ৰাহ্মণদেব কোথায়ও যাইতে নিষেধ ছিল না, এখন তোমাৰি সৰ্বত্ৰ অব্যবহাৰ। আমবা যেখানে গেলে গলা ধাক্কা খাইয়া "হাত মুখ" লেহন কৰিতে কবিতাে স্মৃতাহাটাৰ চোবেৰ মত ফিৰিয়া আসি, তুমি সেখানে সগৰ্বে অব্যবহাৰে প্ৰবেশ কবিতাে পাব। পুলিষ প্ৰতিকৃতি দ্বাবী মহাশয় তখন সশক্কে আভূমি সেলাম কবিয়া তোমাকে দ্বাব ছাড়িয়া দিয়া সবিয়া দাঁড়ায়। এমন প্ৰতাপাশ্বিত—এমন প্ৰবলেব সহিত এমন দুৰ্ব্বলেব মিলন কি কখন সম্ভব?

অকৃতি অধম আমি তোমাব বিচাবেও আমাব অধিকাৰ নাই। তবুও আমি তোমাব স্বৰূপকীৰ্ত্তনে প্ৰবৃত্ত হইতেছি, তবু আমি তোমাব সহিত

মিলিবার—তোমার সমান হইবার স্পৰ্শ করিতে বাইতেছি, আমার ধৃষ্টতা কম নয়! কিন্তু দেব! আমার এ অপরাধেব মূল তুমি। “জয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।” তুমিই আমাকে ‘Struggle for existence’ কি, বুঝাইয়া দিয়াছ। আর যখন Struggle for existence পদার্থটা বুঝাইয়াছ, তখন ‘Survival of the fittest’ কি, তাহা কি আমাকে বুঝাইবে না? অবশ্যই বুঝাইবে। তাই ত তোমার গুণকীর্তন কবিতে বসিয়াছি—
তাই ত তোমাব অমুগ্রহ লাভে এত যত্ন। তোমাব অমুগ্রহ ব্যতীত কিছুতেই ত রুতকার্য্য হইতে পাবি না। নিজ ভুজবীর্য্যবলে পবাজয় আটকাইয়া বাধিতে পাবি না। তোমাব প্রতি ভক্তি না দেখাইগে পরিভ্রাণ পাই না। যে দিনই শুভ্র বজ্রত পুষ্পে নিকুন্তিলা যজ্ঞে তোমায় পবিতুষ্ট করিতে পাবিয়াছি, সে দিনকার যুদ্ধে, দেখিয়াছি, জয় আমাকেই আশ্রয় কবিয়াছে। তাই ত তোমাব পূজার জন্ত আমাব এত আকিঞ্চন। তোমায় আমাঃ কখন মিলিবে না বলিয়াই আমি তোমাব এত পূজা কবি। তাইতে বলিতেছি,—

আমাব এ সঙ্কীৰ্ত্তনেব মাঝে একবার

এস, হে গৌব!

তোমায় দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে

এস, হে গৌব!

যদি ‘বিলাত’ ছেড়ে রইতে নাব,

আমাব এই ‘ভারত’ মাঝে বিলাত কব।

তুমি হৃৎপদ্মে অধিষ্ঠান কব, আমি তোমায় ষোড়শোপচারে পূজা করি।

লীলা।

১ম অধ্যায়।

বামদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং হুগলিত। তাঁহার একটা পুত্র ও একটা কন্যা। পুত্র হৃদয়রাজ কলেজে পড়েন। কন্যা লীলা, সে বাগিকা।

রামদয়ালের বড় সাধ পুত্রটিকে মনের মত সুশিক্ষা দেন। কিন্তু বিধাতা ক'জনকে মনের সাধ পূর্ণ করিতে দেন! হৃদয়াল পৃথিবীর মায়া—পিতাব মায়ার পরিত্যাগ করিলেন।

পুত্র শোকে রামদয়ালের জী চিবরুগ্না হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। রামদয়ালের আর পুত্র হইবাব আশা বহিল না। কিন্তু তিনি মনে মনে আবার প্রতিক্ষা করিলেন “লীলাকে সবস্বতী করিব।”

রামদয়ালের যে স্বাবব অস্থাবব সম্পত্তি ছিল—তাহাতে একটি ক্ষুদ্র পবিবাব বেশ সম্ভমে থাকিতে পাবে। সুতবাং তিনি চাকরী ও বিদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে আসিলেন। লোকে তাঁহাব শোকে শোক মিশাইয়া হৃদয়ালের অভাববাতনা বৃদ্ধি করিবাব চেষ্টা করিল—তিনি লীলাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদিগকে সাস্তুনা করিলেন, “লীলা জামাব শত হৃদয়াল।”

বাড়ী আসিয়া রামদয়াল এক নূতন চাকরী লইলেন—চাকরী অবৈতনিক কিন্তু রামদয়াল শিমলা শিখবে বসিয়া বিশ হাজাব টাকা পাওয়াব চেয়েও তাহা অতি বেশী সুখেব বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি লীলাব শিক্ষক হইলেন। তাঁহাব বিশ্বাস এইকপ শিক্ষক হইলে নাবীব উচ্চ শিক্ষাব ফল যৌবন শ্রোতে বিবেব সাগবে ভাসিয়া যাইতে পাবে না।

২য় অধ্যায় ।

রামদয়াল লীলাকে অতি সাবধানে লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন। লীলা শিক্ষাব এক পদ অগ্রসর হইলেই তিনি বেশ বুকিতে পাবিলেন—উহাকে সবস্বতী করিতে পারিবেন।

লীলার বয়স যখন নয় বৎসর হইল তখনই লীলা বামায়াণ মহাভারত পড়িয়া পিতাকে শুনাইত এবং ধর্মনীতি, চারুপাঠ, সীতাব বনবাস, বাহু বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ও নব নারী প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থ বাধ্যা করিয়া পড়িতে পারিত। আর অতি পবিকার অক্ষরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও কবিতা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পাবিত।

রামদয়াল দেখিলেন কত্ভার বাঙ্গালা ভাষার সাধারণ জ্ঞান সুন্দর জন্মি-
য়াছে, সুতরাং আর এখন উহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া একযোগে

সংস্কৃত ও ইংরেজী পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। লীলা খেলাব আনন্দে তাহা নিখিতে লাগিল।

তেব বৎসর বয়সেব সময় লীলা একদিন পিতাব শিষরে বসিয়া পড়িতেছে। একখানি পুথি বাম হস্তে ধরিয়া ক্রোড়ে বাধিয়াছে—আর এক খানি ডান হাতে ধরিয়া মুহূৰ্ত্তবে পড়িতেছে। এই সময়ে বামদয়ালেব এক জন প্রাচীন বন্ধু উপস্থিত হইয়া বসিলেন। লীলাব কোমল মাধুরীতে তাঁহাকে বিম্বিত ও মোহিত কবিল। তিনি জিজ্ঞাসা—কবিলেন—“মাতুমি ও খানি কি পড়িতেছ,” লীলা ধীবে ও সল্পমে কহিল “গীতা।”

বন্ধু অবাক হইয়া বামদয়ালেব মুখপানে চাহিলেন। রমদবাল হাসিয়া বলিলেন, “গীতা উহার কৰ্ণাগ্রে—নিজে ব্যাখ্যা কবিয়া ও বুঝিয়া পড়িতে পাবে।” বন্ধু পুনরায় লীলাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন “তোমাব বাঁ হাতে ও খানি কি বই মা?” এবাবে লাজ-লীলা লীলা একটু হাসিয়া বলিল “জন বুনিয়ানেব পিল গ্রিমস্ প্রোগ্রেস” বন্ধু নিৰ্কাব—নিষ্পন্দ !

৩য় অধ্যায় ।

লীলাব পনের বৎসব বয়স হইল। গ্রামেব লোক ছি-ছি করিতে লাগিল—আব এ দিকেও কত সম্বন্ধ আসিয়া ফিবিয়া যাইতে লাগিল।

লীলা কুলীন কন্তা বটে, কিন্তু সে জন্ত যে উহাব বয়স বেশী হইয়াছে তাহা নহে। রামদবাল কন্তা চক্ষুর অন্তরাল করিতে পাবেন না। স্ততরাং তিনিই দোষী।

লীলা পনের বৎসবেব হইয়াছে এবং ইংবেজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বেশ শিখিয়াছে বটে—কিন্তু এখনও তাহাব বালিকা ভাব যায় নাই—এখনও পৃথিবীর দ্বিত ব'য়ু তাহাব গাত্র স্পর্শ কবিতে পায় নাই। লীলা কেবল বহি পড়িয়াছে, পীড়িতা মাতার সেবা কবিয়াছে, এবং পিতার উজ্জল বদন নিয়ত দেখিয়াছে। ইহা বৈ লীলা নূতন কিছু জানে না, নূতন কিছুই শিখে নাই।

একদিন বামদবাল কন্তাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—“লীলা এখন তোমার বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, এখন আর রাখিতে পারি না, স্বামীগৃহে সকলের প্রিয় হইয়া থাকিতে গেলে অনেক কষ্ট সহিতে হইবে”—

লীলা দেখিল পিতৃদেবের দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে—মেহময়ী কি উত্তর দিবে,—তবে অশ্রুপাতের প্রতিদান যদি অশ্রুপাত হইতে পারে তবে লীলার নয়ননির্ববই তাহাব যথেষ্ট উত্তর । লীলা কাদিল—

“মা কাদিতেছ কেন ?”

“তুমি কাদিলে কেন বাবা ?”

“তোমার বিবাহের কথা”

“বিবাহ ?”

“হা—মা”

“তবে বিবাহে কাজ কি ?

রামদয়াল হাসিলেন—হাসিয়া বলিলেন, ‘বিবাহে কাজ না থাকিলেও বিবাহ কবিতো হয় । নাবীর স্বামী বহু গতি নাই । স্বামী পিতা মাতা হইতে উচ্চ—স্বামী দেবতা । নাবীর বিবাহের অর্থ—নাবীর দেবসেবায় বৃত্ত হওয়া । এখন তোমাব বয়স হইয়াছে—এখন কঠোর ব্রত ধারণ কবিতো পাবিবে, দেব-সেবা কবিতো সক্ষম হইবে—এখন তোমাকে গৃহে বাথিলে আমাদের পাপ হইবে ।’

লীলা শুনিল, কিছু বলিল না । রামদয়াল পুনৰায় বলিলেন “লীলা, তুমি জ্ঞানশিক্ষিতা, এবং তোমাব ভাল মন্দ বুঝিবার উপযুক্ত বয়সও হইয়াছে, তুমি যদি লজ্জা না করিয়া আমার কথাব সহ্যতব দাও, তবে আমাকে বড় খুসী কবিবে ।”

লীলা বলিল, “কি জিজ্ঞাসা করিবে, কর ।”

রামদয়াল হাসিয়া কহিলেন “সিদ্ধকে দেখিয়াছ ?”

“যিনি সংস্কৃত কবিতা লিখিয়াছিলেন ?”

“হা ।”

“দেখিয়াছি ।”

“তাহার সহিত তোমাব বিবাহ দিতে চাহি ।”

লীলা ইহার কোন উত্তর দিল না—ধীবে ধীরে পিতাব নিকট হইতে উঠিয়া মাতার শয্যাপ্রান্তে যাইয়া বসিল ।

রামদয়াল লীলাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা বোধ করিলেন না । লীলার ফুল বদন এবং নৃত্যশীল নয়নই তাহার প্রশ্নের পরিষ্কৃত উত্তরদান করিল ।

৪র্থ অধ্যায় ।

লীলার বিবাহ হইল। লীলা সুখী হইল—ভাবিল, “নবজীবন পাইয়াছি—পতিসেবা নহে—স্বার্থই দেবসেবা করিতে পাইয়াছি—ইহার পরেই বুঝি স্বৰ্গ—সে স্বৰ্গ, কত দূবে, কত উচে” ?

চাঁদে কলঙ্ক না থাকিলে চন্দ্র-মাধুরী পবিস্ফুট হইত না। কমলদলে কণ্টক না থাকিলে কমলের গোবব বাড়িত না, সুখ-দুঃখ মিশ্রিত না থাকিলে সুখ সুখেব হইত না। তাই সহসা লীলা চন্দ্রে কলঙ্কপাত হইল,—লীলার সুখেব হাসি—না ফুবাইতেই দুঃখ আসিয়া তাহাকে বিবিল।

বিবাহেব ছয় মাস পবে লীলাব মা মবিল ; আব ছয় মাস পবে বাপ মবিল—তাহাব তিন মাস পবে স্বামী শয্যাগত বোগে মৃতপ্রায়। ধর্ম-বল—যোগ-বল—ঐশী-বল কি সৌভাগ্য-বল—যে বলেই বল—লীলা বিধবা হইল না। লীলা স্বামীকে কলিকাতা নিয়া বহু অর্থ ব্যয় কবিয়া চিকিৎসা কবাইল। স্বামী মৃতদেহে জীবন পাইল—কিন্তু তাহাব পৌরুষ শক্তি নষ্ট হইল।

লীলা রুগ্না নহে, লীলা আমেরিকা বা ইউরোপীয় ললনা নহে, লীলা নারীসমাজ-সংস্কারিনী বলিয়া আপনাকে গোববারিতাও মনে কবে না; স্মৃতবাং স্বামীব পুৰুষ শক্তি ধ্বংশাধ্বংশেব জন্ত সে কিছু মাত্র বিষন্ন নহে। স্বামী মৃত্যু-মুখ হইতে বাঁচিয়াছেন এই তাহাব আনন্দ, স্বামীপদসেবা তাহাব সুখ। পতিসেবা—দেবসেবা—ইহা হইতে সে বঞ্চিত হয় নাই, ইহাই তাহাব শান্তি। যে কাজ সে জীবনেব লক্ষ্য মনে কবিয়াছে, তাহা তাহাব বজায় রহিয়াছে স্মৃতবাং—আব সে কিছুই চাহে না।

লীলার জন্ত লীলাব স্বামী বিষন্ন। লীলাব কপ গুণ যুগ্ম পরিচিতা রমণীগণ বিষন্ন, কিন্তু লীলা বিষন্ন নহে। তাহাব সুখ ও প্রফুল্লতা এখনও হৃদয়ে আতট পূর্ণ। তন্মধ্যে কেবল একটু চিন্তা, পাছে স্বামী মনে করেন ইন্দ্রিয় সেবনে অসমর্থ হইয়া সে কষ্ট পাইতেছে বা অসুখে আছে।—গুরু এই ভয়ে বা ভাবনায় লীলা সর্ব কৰ্ম ত্যাগ কবিয়া স্বামীকে সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল বাধিতে প্রাণপণে চেষ্টা কবে। লীলা অধিকতব স্বামী সেবা প্রিয়—এবং অধিকতর আনন্দিতা ও সৰ্বদা হাস্যমুখী, ইহা দেখিয়া তাহার স্বামীর আর বিষয়ের পাষ বহিল না।

এ হেন জীবন্ত তাহাব সহবাসে বনকুসুমের জায বিগুঢ় হইবে ইহা

ভাবিয়া তিনি অস্থির। লীলা, কোমলকবে যখন তাঁহার পদ সেবা কবে তখন তিনি লীলার হৃৎথে ক্রন্দন করেন—লীলা অঞ্চলে তাঁহার আশ্রয় মুছাইয়া সাস্তনা কবে।

একদিন পদ সেবা তাঁহার অসম্ভব হইল—বীবে কোমল বন্ধন হইতে পদ মুক্ত কবিয়া বসিলেন—কি ভাবিলেন—পবে বলিলেন—“লীলে, সিদ্ধনাথ মুখোপাধ্যায় তোমাব কে?” লীলা হাসিয়া বলিল “আমার কে?—আমার স্বামী—আমার দেবতা।” এবাবে সিদ্ধ কান্দিয়া বলিলেন—“তোমাব সিদ্ধ মরিয়াছে, সে ক্লীব, ধর্ম্মমতে তুমি পুনর্বার বিবাহ কবিতে পাব—তাহা কবিতে হইবে।”

লীলা তাঁহার পদদ্বয় বক্ষে ধারণ কবিয়া কান্দিতে লাগিল।—কান্দিয়া বলিল “কি অপবাধে দাসীকে এ নিষ্ঠুর কথা কহিতেছ, তোমাব একটা পিস্তল আছে, যদি অপবোধিনী হইয়া থাকি তাহা দিয়া আমাকে গুলি করিয়া মাঝিয়া ফেল—একপ কথা শুনাইয়া কষ্ট দিও না।” সিদ্ধ নীববে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

৫ম অধ্যায় ।

সিদ্ধনাথ মুখোপাধ্যায় যুগপেক্ষ, স্নন্দব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। সংসাৰে পিতা মাতা, ভাই ভগিনী কেহই নাই, স্বয়ং বিপুল পৈত্রিক বিষয়েব এক মাত্র অধিকারী। তাঁহার পীড়া না হইলে লীলাব ভ্রাতৃ সর্কগুণান্বিতা ও পবমা স্নন্দবী স্ত্রী লইয়া তিনি পৃথিবীর সম্রাটকেও এক দিন তুচ্ছ করিতে পারিতেন—কিন্তু কি বিষম বিড়ম্বনা।

সিদ্ধ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন কলিকাতা থাকিবেন, যে কোন উপায়ে হয়, লীলাকে বিবাহ দিয়া স্থখী করিবেন। ইহা করিতে যাইয়া সমাজে ঘৃণিত হইতে হয়, জাতি কুল হাবাইতে হয়,—তাহাতেও স্বীকার। তিনি ভাবিলেন নামে মাত্র বিবাহ করিয়া এহেন স্নন্দবী লীলার চিরস্থখের কণ্টক হইয়া থাকিবেন না।

সিদ্ধ বিবাহে রাজি করিবার জন্ত লীলাকে কত অহুন্নয় বিনয়, কত প্রয়োচনা, কত অশ্রুবোধ, কত উপদেশ, কত তিরস্কার করিলেন; কিন্তু লীলার হৃদয় অটল। একপ অটলতা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে

লজ্জাবশতই লীলা বিবাহে একপ অস্বীকৃত হইতেছে । সুতরাং আরি মুখে কিছু না বলিয়া কোশল অবলম্বন করাই শ্রেয় ।

প্রথম কোশল—সিদ্ধু তাঁহার তিনটা অবিবাহিত বন্ধুকে লীলার নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন, ইহার এক জন ব্রাহ্ম, দুই জন খৃষ্টান—তিন জনই সুশিক্ষিত স্ত্রমর ও যুবক । সিদ্ধু নিজ উদ্দেশ্য ও তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—একপ সুবিধা কোন্ রসিক যুবা অবহেলা করিতে পারে—সুতরাং তাহার প্রতিনিয়ত লীলার সহিত কথোপকথন করিতে আসিতে লাগিল । কিন্তু লীলা স্বামীর অস্বস্তি উপেক্ষা করা পাপ মনে করিয়া, অতি কষ্টে তাহাদেব সহিত কথাবার্তা কহেন । অবশেষ সিদ্ধুর বন্ধুত্রয় ক্লান্ত হইয়া হারি মানিলেন, একে একে সকলেই সিদ্ধুকে বলিলেন “লীলা সাধাবণ নাবী নহে—দেবী, ছলে বলে বা কোশলে কিছুতেই তাহার চিন্তাকর্ষণ কবা তাঁহাদেব সাধ্যায়ত্ত নহে ।”

কোশল বার্থ হইল দেখিয়া সিদ্ধু মনে মনে সিক্ত কবিলেন, অজ্ঞে বিবাহ করিলে তাঁহার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইবে বলিয়া হয় ত লীলা বিবাহে স্বীকৃতা নহে । সুতরাং উকিলবাড়ী যাইয়া লীলার নামে সমস্ত বিষয় সম্পত্তির দামপত্র প্রস্তুত কবিলেন, এবং বথাবীতি বেজেঠবি কবিয়া আনিয়া লীলার হাতে দিলেন ।

এক মাস পর লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“দামপত্রখানি যত্নে রাখিয়াছ ?”

“দামপত্র কি ?”

“আমার সমস্ত বিষয় যে তোমার হইয়াছে সেই দলিল ?” লীলা হাসিয়া বলিল “তোমার হইলেই আমার হইল, তাব আবাব দলিল কি ?”

সিদ্ধু বলিলেন “এক মাস হইল তোমাকে একখানি কাগজ দিয়াছি, তাকি তুমি পড় নাই ?”

“না”

“পড় নাই ?”

“না—তুমিত পড়িতে বল নাই ?”

“তবে কি করিয়াছ ?”

“বাক্সে রাখিয়াছি ।”

সিদ্ধু আশ্চর্য্য হইলেন—বলিলেন “দলিলখানি লইয়া আইস ।”

লীলা তিলমাত্র গোপ না কবিতা দালিল আনিয়া স্বামীব হাতে দিল । সিদ্ধ বিষয়গুলি পাঠ কবিলেন ।

লীলা বিস্মিত হইয়া বলিল “আমাব নামে কেন ?” সিদ্ধ বলিলেন “এখন হইতে সকল বিষয়ই তোমাবই হইল, যাহা খুসি করিতে পাবিবে—আমার কিছুতেই অধিকার থাকিল না ।”

লীলা কান্দিয়া বলিল—“নির্দিষ্ট হইলে কেন, আমি ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করিব, তুমিই আমাব একমাত্র ঐশ্বর্য্য ।”

সিদ্ধ বলিলেন “প্রশ্ন কবিও না, এখানি বাখিয়া দাও ?” লীলা আদেশমত উহা গ্রহণ করিল ।

সিদ্ধ এবারে খুলিয়া বলিলেন, “লীলে, আমাব জন্ত কেন কষ্ট পাইবে, নিবাহ কবিয়া সুখী হও । এখন আমাব সকল ঐশ্বর্য্যই তোমাব—লোভে অতি কপবান এবং গুণবান পুরুষ তোমাকে বিবাহ কবিতে চাহিবে এবং বিবাহ কবিলে কোন কষ্টই পাইবে না । কলিকাতা, কাশী বা বৃন্দাবন যেখানে খুসী বাজবাজেশ্বরী হইয়া থাকিতে পাবিবে । আব—”

সিদ্ধুব বাক্য শেষ না হইতেই লীলা মুচ্ছিত হইয়া তাঁহার পদতলে লুটাইল । তিনি গুরুশ্রম কাবয়া তাহার চৈতন্ত সম্পাদন কবিলে, সে কান্দিয়া তাঁহার পা ধবিতা বলিল “একপ নিষ্ঠুর কথা আব বলিও না, তা হলে আমি আব এক মুহূর্ত্তও বাঁচিব না ।”

সিদ্ধ কিছুকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিলেন “লীলে যদি বিবাহের কথায় এত কষ্ট পাত, আব বালব ন্না, এই দলিলখানি সম্প্রতি তোমার কাছে রাখিয়া দাও ।”

লীলা কান্দিতে কান্দিতে স্বামীব আজ্ঞা পালন কবিতা বলিল “আব আমাদ্ধ কান্দাইও না ।”

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

লালার অটলতা দেখিয়া সিদ্ধুব মনে কেমন এক প্রকার ভয় জন্মিল । তিনি একেবাবে হতাশ হইয়া চিন্তায় দগ্ন হইতে লাগিলেন, ভাবিলেন “যদি আমি মরিবলে, লীলা বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পাবিবে ।” সুতরাং এখন তাঁহার চিন্তা এবং চেষ্টা হইল,—কিভাবে সহজে মবিতে পারা যায় । উদ্ভব

বা তীব্র বিষ পানে মরিলে, লীলা বিপন্নগ্রস্ত হইবে, তিনি পীড়িত হইয়া মরিয়াছেন—সাধারণে নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পাবে,—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ।

এখন আর লীলাব শুশ্রূষা—লীলাব রূপ—লীলার হাসি মুখ—লীলার ভালবাসা—তাঁহার ভাল লাগে না । এখন লীলা তাঁহাকে শত্রু মনে করিলে, অথবা সহজে তিনি মরিতে পারিলেই কেবল সুখী হইতে পাবেন ।

একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল ডাক্তার পলিডোবি কিরূপে ধীব-বিষ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার প্রভু পত্নীর যোগে প্রভুকে বধ করিয়াছিল । তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল, মনে শাস্তি হইল—এক লক্ষ শয্যা হইতে উঠিলেন—তাঁতাতাড়ি বস্ত্র লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন । ঘাইবার কালে লীলা জিজ্ঞাসা করিল “কোথা যাও ?”

সিদ্ধু অনেক দিন পবে আজ হাসিয়া বলিলেন “নিমন্ত্রণ থাইতে ।” স্বামীর বদনে হাসি দেখিয়া লীলাব প্রাণ ক্ষীতল হইল ।

* * * * *

বাত্ এগাবটাৰ সময় সিদ্ধু গৃহে আসিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন । লীলাকে বলিলেন—“বড অসুখ হইয়াছে ।” লীলা সাবা বাত্ জাগিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিল । প্রাতে, জিজ্ঞাসা করিল—“ডাক্তার আনাইব ?”

যে হতভাগা ডাক্তারকে টাকা দিয়া বন্ধোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন—সিদ্ধু তাহাকেই আনিতে কহিলেন ।—ডাক্তার আসিতে বিলম্ব হইল না ।

ডাক্তার যথাবীতি বোগী দেখিয়া বলিয়া গেল “আমার ঔষধালয়ে লোক পাঠাইয়া ঔষধ আনাইও ।”

ঔষধ আসিল, রোগী তাহা যথাবীতি সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

৭ম অধ্যায় ।

একদিন, দুই দিন কবিয়া ক্রমে দশ দিন গত হইল, কিন্তু সিদ্ধু ক্রমেই বেশী পীড়িত হইয়া পড়িলেন । লীলা দেখিলেন ঔষধে তাঁহার স্বামীর উপকার না হইয়া অপকার হইতেছে—তিনি দিন দিন ক্রীণ হইতে ক্রীণতর হইতেছেন ।

লীলার আহার নাই, নিদ্রা নাই, দেখিলে বোধ হয়—এক রোগী আব এক রোগীর গুশ্রাব্য করিতেছে। লীলা দশ দিনের দিন সিদ্ধকে ডাকিয়া বলিলেন—“এ চিকিৎসক ভাল নহে—আব একজনকে আনা বাক্য।” সিদ্ধ—অতি কষ্টে বলিলেন “আবস্তক নাই।” লীলা তাঁহার কথা না শুনিয়া চুপে চুপে সহরের প্রধান ডাক্তার সাহেবকে—আনিতে পাঠাইলেন।

অল্পকণ্ঠে মধ্যাহ্নে সিদ্ধর অবস্থা আবো মন্দ হইল। এত মন্দ হইল যে লীলা কান্নিতে লাগিল। সিদ্ধ লীলাব মুখপানে চাহিয়া অতি কষ্টে বলিলেন, “লীলা—আমি যাই—স্বামী-বাক্য পালন করো—আমি মন্দিরে বিবাহ করিবে বল—প্রতিজ্ঞা কব।”

লীলা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—“কখনো যদি সহায়রূপ যাইবাব বল মা থাকে—সর্বস্ব দিয়া যদি তোমাব জীবন বক্ষা কবিতে না পারি—প্রতিজ্ঞা কবিতেছি—তোমাব আজ্ঞা পালন কবিব।” সিদ্ধর বদন প্রসন্ন হইল—সিদ্ধব নিদ্রা হইল।

একাদশ দিনে পূর্ব চিকিৎসক প্রেরিত ঔষধ লীলা সিদ্ধকে সেবন না করাইয়া, নূতন চিকিৎসকের অপেক্ষায় রহিলেন। সিদ্ধ যখন ঔষধ চাহেন, লীলা তখন ঔষধ বলিয়া জল পান কবিতে দেন।

এই সময়ে নূতন চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন—লীলা লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাঁহার পা ধবিয়া কান্নিয়া বলিল—“আপনি যত টাকা চান—আপনি যাহা চান, আমাব যাহা কিছু আছে সকলই আপনাকে দিব—আপনি দয়া করিয়া আমার স্বামীকে ভাল কবিয়া দিন।”

চিকিৎসক আশ্বাস দিয়া বোগীব অবস্থা দেখিলেন—দেখিয়া বলিলেন—

“এরূপ অজ্ঞানাবস্থা কতক্ষণ?”

“এই যাত্রা।”

“পীড়া কত দিন হইতে?”

“এগাব দিন।”

“পূর্ব চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র দেখাও?”

“ব্যবস্থা পত্র তিনি দেন না।”

“তবে ঔষধ পাঠান?”

“হুঁ।”

“মিত্রের ডিম্পেন্সরির?”

“আজ্ঞে হাঁ।”

“ঐষধেব শিশি কোথা ?”

লীলা কান্দিতে কান্দিতে শিশি আনিয়া দিল—ডাক্তার শিশি-সহ পত্র লিখিয়া বিশ্লেষণ করিবার জন্ত পাঠাইলেন—লোক আর একখানি চিঠি লইয়া শীঘ্র ফিবিয়া আসিল—সাহেব তাহা পাঠ কবিয়া হাসিয়া বলিলেন—
“আপনার স্বামী ভাল হইবেন চিন্তা নাই”—এই বলিয়া ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিয়া কহিলেন—“এই ঐষধ সেবন করাইবেন—আমি কাল আসিবা দেখিব।”

বাইবার কালে লীলা পুনবার সাহেবেব পা ধরিয়া কান্দিতে লাগিল—সাহেব তাঁহাব হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন—“আমি নিশ্চয় ভাল করিয়া দিব।”

* * * * *

লীলাব শুক্রবাণে এবং সূচিকিৎসকেব চিকিৎসাগুণ—সিদ্ধ এক মাসেব মধ্যে গুরু আৰোগ্য হইলেন না, সবল এবং সুস্থও হইলেন। এ সবলতা—এ স্বাস্থ্য—সিদ্ধ অনেক দিন হাবাইয়াছিলেন। বিধাতাব কি অনন্ত লীলা, বিষ পান—অমৃত পান হইল। এ লীলা—লীলাব সতীত্বেব পুনরুত্থান।

উপসংহার ।

একদিন সিদ্ধ প্রফুল্ল মনে নিজ হাতে লীলাকে নুতন আভরণে সাজাইত্বে ছেন—লীলা হাসিতে হাসিতে বলিল—“কনে ত সাজাইলে, এখন আমার বব কোথায়—বিবাহেব কি কবিলে ?”—সিদ্ধ তাঁহার গণ্ড নাসাগ্রে স্পর্শ কবিয়া বলিলেন “এইত বিবাহেব আয়োজন কবিতৈছি।” একটা শুক পাখী এক পাশে ছিল—সেও বলিল—“এইত বিয়ের আয়োজন কছি।” সিদ্ধ ও লীলা হাসিয়া উঠিলেন।

লীলা আবার বলিল—“এখন তোমাব সকল বিষয় সম্পত্তির মালিক হইতে যাজি আছি, আবার জেবে লখল করিবে না ত ?

সিদ্ধ হাসিয়া বলিলেন “যদি তাহাই-করি,” লীলা বলিল “তাহা করিবার আগে আমার সকল বিষয় ছাবখার কবিয়া কেলিব।”

“কি কপে ছারখার করিবে ?”

“দেখিবে ?”

“দেখিব ।”

“তবে এই দেখ” বলিয়া লীলা দোড়িয়া একটা ছোট বাক্স লইয়া আসিল এবং উহা হইতে একখানি কাগজ বাহিব কবিয়া দেশলাই জালিয়া ধবাইয়া দিল ।

সিদ্ধ হাসিয়া বলিলেন “পুরুষ হইয়া সতীন দেখিবাব সাধ এত দিনে পুড়িয়া ছাই হইল ।”

মাক্বেথ ও হাম্লেট ।

৭ ।

ষষ্ঠ দৃশ্যে মাক্বেথেব প্রাসাদ সম্মুখস্থ ডনসিনেনেব নিকট সিওয়ার্ড, মাক্‌ডফ প্রভৃতি সৈন্তাধ্যক্ষ সম্মতিব্যাহাবে, বণবাদ্য সহকাৰে মালকোম্ সমর সজ্জায় অগ্রসব হইতেছেন । কে কোন দিকে যুদ্ধ কবিবেন, মালকোম্ তাহারই বন্দোবস্ত কবিয়া দিলেন ।

সপ্তম দৃশ্যে সমরক্ষেত্রের অন্ত স্থলে শত্রু সৈন্ত বেষ্টিত মাক্বেথ তর্জ্জন গর্জ্জন কবিতেছে । মাক্বেথ এখন সূক্ষ্ম আশা সূত্রে জীবন ধারণ কবিয়া আছে । সেই সূত্রটি বার বার পরীক্ষা করিতেছে, বলিতেছে “বমগীর জঠর-প্রস্থত নহে—এমন কি কেহ কখন হইতে পারে ? তা কখনই হইতে পারে না—তবে আমি আবাব কাহাকে ভয় করিব ?” মাক্বেথ ভয় ভবসার এইরূপ তোলাপাড় কবিতেছে—এমন সময় সৈন্তাধ্যক্ষ সিওয়ার্ডেব পুত্র যুবক সিওয়ার্ড যুদ্ধার্থ মাক্বেথেব সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল ।

यूवा निप्रयार्त्त ।

कह—तोमावि कि नाथ ?

মাক্বেথ :

তুলিলে পাইবে ত্রাস । ১৫

युवा ।

ଜାନବ ଦାକ୍ଷମ ଯକ୍ଷ—ଭୟକ୍ଷବ ନାମେ,

আবো ভয়কব হ'লে—না ডবিব আমি ।

মাক্বেথ ।

মাক্বেথ নাম মম—

यूवा ।

সম্মতান্ কোন নাম না পাবে বলিতে,

তব নাম হ'তে আবো অধিক ঘুণেয ।

माकुटवथ ।

—କିଷ୍ଟା ଅନିକ ଭସାମ ।

युवः ।

ମିଥ୍ୟା କହ ତୁ—ବୀଭଞ୍ଛ ବାସିନୀ ।

সাক্ষী এই কববাল—মিথ্যা कह তুমি ।

‘‘দ্বন্দ্ব কববাল যুদ্ধে—মাক্বেথ কর্তৃক যুবা সিওয়ার্ড হত হইল।’’

माकुदेवथ ।

ନାବୀ ଗର୍ଭ-ସୂତ ତୁହି ।

নাবী গর্ভস্থাত বাক্তি ধবিলে আযুধ—

খড়ো হাসি, অন্য অস্ত্রে উপহাসি আমি ।

(निष्क्रान्त)

মাক্বেথ ডাকিনীদের ভাবিস্বাধীন সেই শেষ সূত্র এখনও ধবিষা আছে। যুবা সিওয়ার্ডের সহিত দ্বন্দ্ব সংগ্রামে সেই সূত্রেব পৰীক্ষা করিল। সিওয়ার্ড যুবক, নির্ভীক, উৎসাহী, সাহসী ছিল, কিন্তু হইঃ নীক হয় ? মাক্বেথ ষতক্ষণ সূত্র ধবিষা আছে, তখন কে তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিত পাবে ? তবধে তুণের মত দুবা নষ্ট হইল—মাক্বেথ উপহাসে বীভৎস হাসি হাসিতে লাগিল।

রণ-বন্ধ-স্থলের অগ্রত—সমুদ্র সৈন্তসহ পাণ্ডব-শিশু-পঞ্চকের হত্যাকারী
অশ্বখামাব অহুসন্ধানে উন্মুখ, ব্রহ্মাস্ত্র বিক্ষেপে উন্মুক্ত, অর্জুনেব মত-মাক্‌ডক্
অকাল-নষ্ট আত্মীয়গণেব শোক স্মৃতিতে উত্তেজিত হইয়া, দারুণ প্রীতি
বিধিংসার প্রেবিত হইয়া, গভীর গর্জনে মাক্‌বেথেব অব্বেষণ, ইত্যন্ত বিচরণ
কবিতেছেন। এখন তাঁহাব একমাত্র ভাবনা, পাছে মাক্‌বেথকে অগ্র কেহ বধ
কবে ; তাহা হইলে তাঁহাব পুত্র কলত্রের প্রেতাশ্মাগণ চিবদিন তাহাকে ধিক্কার
দিবে! মাক্‌ডক্ প্রীতিজ্ঞা করিয়াছেন—মাক্‌বেথ ভিন্ন অগ্র কাহারও উপর
তিনি অস্ত্র চালানা করিবেন না। এখন অদৃষ্টেব নিকট মাক্‌ডক্ কেবল
এই মাত্র ভিক্ষা চাহিতেছেন যে তিনি যেন জীবন্ত মাক্‌বেথকে একবার
তাঁহাব সম্মুখে পান, তাঁহাব অগ্র প্রার্থনা নাই।

এ দিকে মাক্বেথের প্রাসাদ দূর হার উন্মুক্ত হইয়াছে, মাক্বেথের অহুচরেরা অনেকে তাঁহাব্যবস্থাকে অস্থধ্যবণ করিয়াছে। জন্ম যে মালকোমকে আশ্রয় কবিনেন, তাহাও একরূপ নিশ্চয়। সৈন্যাদ্যক্ষ বৃদ্ধ সিওয়ার্ডের পরামর্শ মত। মালকোম প্রাসাদ ভূর্গে প্রবেশ করিলেন। সপ্তম দৃশ্য শেষ হইল।

মাক্বেথ নাটকের শেষ দৃশ্য—বর্ণক্ষেত্রের অন্তর। মাক্বেথ বিশ্বাস্যাহে যে, এ সংগ্রামে তাহার আর জয়ের আশা নাই, তবু মাক্বেথ আত্মহত্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল, ভাবিল,—আপন শরীরে আঘাত কবা অপেক্ষা পবদেহে অন্ত্রাঘাত ভাল। প্রতিবিধিঃসায় প্রতিজ্ঞাত মাক্‌ডফ্ সন্মুখে আসিলেন। বলিলেন—

“আয় ! নরক-কুকুৰ। আয় তোবে দেখি” মাক্বেথ বলিলেন—“মাক্‌ডফ্ বিশ্বাস্য উদাম তব, আমি বর পাহিয়াছি—বমণী ব জঠব-প্রহৃত ব্যক্তিগণ আমায় কেহ কিছু কবিত্তে পারিবে না।” মাক্‌ডফ্ বলিলেন, “বর্ষর ! তাহাতে তোর অব্যাহতি নাই। মাতৃকুক্ষি বিদীর্ণ কবিয়া অকালে আমাকে নিকশিত করা হয়, আমি প্রহৃত হই নাই।”

তখন মাক্বেথ, মাক্‌ডফ্‌কে অভিসম্পাত করিলেন, ডাকিনীগণের উপর গালি পাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, ‘কেহ যেন ঐ সকল প্রতারিকা প্রেতিনীদের বিশ্বাস না কবে—উহারা দ্বার্থ-বাচক প্রহেলিকায় আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে—তাহাদের প্রতিজ্ঞাব স্রব আমাদের কাণে লাগিয়া থাকে, কিন্তু পরিণামে আশায় নিবাস হইতে হয়।’

ভাল—মাক্বেথ তুমি সত্যসত্যই কি প্রেতিনীদের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলে ? যদি সত্যসত্যই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলে যে তুমি ভাগ্যবলে স্কটলণ্ডের রাজা হইবে, তবে ডক্টরকে হত্যা করিবার তোমার কি প্রয়োজন হইয়াছিল ? যদি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিয়াছিলে যে, তোমার পরে বাকো বংশীয়েরা স্কটলণ্ডের রাজা হইবেন, তবে ফ্লিয়ার্কে বধ করিবার জন্ত বাতুক নিযুক্ত করিয়াছিলে কেন ? না, মাক্বেথ তুমি আসন্ন-কালো আপনাকে আপনি প্রতারিত কবিত্তেছ। মানুষ আপনায় প্রকৃতি প্রকৃতি অর্জুণ্যে বিশ্বাস অবিবাস কবে। প্রেতিনীবা—বাকো এবং তুমি—তোমাদের উভয়ের সহিতই লাক্ষ্য করিয়াছিল ; কিন্তু তুমি স্বীয় হরণ-ক-আমণী প্রকৃতির বশে আর তোমার তরুণ হরণাকাজামণী প্রকৃতির উত্তেজ-

মাংস, অতি গুরুতব মহা মহা পাপে পাপী হইয়াছে—আব সেই বাকো নিশাপ শরীরে তোমারই প্রেরিত বাতুকগণের হস্তে পরলোকগত হইয়াছে। তুমি ছরাকাজী বলিয়াই ছরাকাজী-ক্লিপী প্রেতিনীরা তোমার উপর বল করিতে পারিয়াছে। কিন্তু বিশ্বাস—বিশ্বাস ত তুমি তাহাদের কর নাই। বিশ্বাস করিলে—তুমি নরঘাতী, গুপ্তঘাতী, রাজদ্রোহী, নাবীঘাতী, শিশুঘাতী হইবে কেন? মানুষ আপনার প্রকৃতি প্রবৃত্তি অনুসারে, আপনার গরজের মত করিয়া, অনেক বিষয়েই খানিক বিশ্বাস, খানিক অবিশ্বাস করে। সেই অর্দ্ধ বিশ্বাসই অনেক অনর্থের মূল। ঐ যে বর্ষীয়ান্ এখন মাথার হাত দিয়া কাঁদিতেছেন ও বলিতেছেন “হায়! হায়! আমার সহোদরকে বিশ্বাস করিয়াই আমার সর্বনাশ হইল।” আমার বিনীত জেরা সওয়ালের উনি সরল উত্তব দিলে, আমি দেখাইতে পাবি যে, উনি স্বীয় সহোদরকে পুবা বিশ্বাস একদিনের তরেও কবেন নাই—অর্দ্ধ বিশ্বাস কবিয়াছিলেন মাত্র। মাক্বেথ তুমিও বিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্বাস পুবিয়াছিলে। পাপের ধর্ম্মই এই যে, পাপ কখন কাহাকেও পুবা বিশ্বাস করিতে পারে না। যে প্রেতিনীদের ভবিষ্যদ্বচনে তোমার ছরাকাজী ইচ্ছন পাইল, কৈ তুমি তাহাদিগকে ত পুবা বিশ্বাস কবিতো পারিলে না?—যে পিশাচীর প্ররোচনার রাজহত্যায় লিপ্ত হইলে, কৈ বাকো ফিরাঙ্গের হত্যাব্যাপারে—তাহাকেই বা বিশ্বাস করিতে পারিলে কৈ? পাপী—দেব দৈত্য পুত্র কলত্র—কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না। পাপে অবিশ্বাসের পরিমাণ বুঝা যায়, অবিশ্বাসে পাপের পরিমাণ জানা যায়; ও হুটায় বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

পাপে বিশ্বাসের যেমন সঙ্কোচ হয়, বিশ্বাস যেমন খণ্ডীকৃত হয়, তেমনই পাপের ভরে বুদ্ধিবৃত্তিরও ক্ষুণ্ণ হয় না। যে মূর্ত্তি মাক্বেথকে বলে যে, “বর্ণাম জঙ্গল ডন্সিনেনে না আসিলে তোমার পরাজয় নাই,” সেই মূর্ত্তির হস্তে একটি বুদ্ধ-শাখা ছিল। মাক্বেথ কেবল তাহার কথাই কাণে লইল, তাহার ভাব-ভঙ্গি বুঝিবার চেষ্টা করিল না। চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিত যে, জঙ্গল চলিয়া আসা অসম্ভব নহে। তাহার পর যে মূর্ত্তি তাহাকে বলিল, যে “নারী-স্বঠর-প্রসূত কেহ তোমার কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না”—সে মূর্ত্তি রক্তাক্ত বালক মূর্ত্তি। মাক্বেথ তাহারও আকার ইঙ্গিত বুঝিল না। বুঝিল না, যে বালক প্রসূত না হইয়াও অন্তরূপে নিকশিত হইতে পারে। বুঝিবে কে? যে পাপভরে বিভোর তাহার বুদ্ধির ক্ষুণ্ণ হয় না। পাপী কেবল

আপনাব ভালর দিকই দেখিতে পায়—আপনাব মনের দিক দেখিবাব বুদ্ধি তাহাব ক্রমেই লোপ পায় ; শেষে একেবারে মনের মধ্যস্থলে আসিয়া ডুবিয়া যায় । ঐ দেখে ব্রঙ্কবাক্স বাবণেব দশমুণ্ড লঙ্কার বেলাভূমিতে লুটাইতেছে ; ঐ দেখে ভীম-শিশুর মস্তক হস্তে মান-ধন ছর্যোধনেব হর্ষ-বিবাদে মুছা হইল, ঐ দেখে সেন্টহেলেনাব পাতালপূবে ক্ষিপ্ত সিংহ কি ভয়ানক অথচ হৃদয়ভেদী মৃত্যু-গর্জন কবিত্তেছে—আব ঐ দেখে যে মাক্বেথ এক দিন স্বীয় অতুল সাহসে অসীম প্রতাপে নবওয়েব অযত যোধ নষ্ট কবিয়াছিল, আজি সেই মাক্বেথ মাক্‌ডফেব ‘জন্মরক্তান্ত’ শুনিয়া, সম্মুখ-যুদ্ধার্থী সেই মাক্‌ডফকে সঙ্কল্পে বলিতেছে—“আমি তোমাব সহিত যুদ্ধ কবিব না ।”

মাক্‌ডফ । “কাপুরুষ । যুদ্ধ কবিবি না, ত আত্মসমর্পণ কর । মোটা খোঁটার উপব পিজবায় পুবিয়া তোকে বাখিয়া দিব, শোককে দেখাইব, নীচে লিখিয়া বাখিব, ‘এইখানে ছবস্ত ছবৃত্তকে দেখিতে পাইবে ।’

তখন মাক্বেথ বলিল ‘আমি আত্মসমর্পণ কবিব না—আর তোমাকে অস্ত্র সম্বরণ কবিত্তেও বলিব না ।’ তখন যুদ্ধ কবিত্তে কবিত্তে দুই জনে নিষ্ফান্ত হইল ।

ওদিকে জয়বাদ্য বাজাইয়া বিজয়-নিশান উড়াইয়া মাগকোম্ বুদ্ধ সিওয়ার্ড, রস্ প্রভৃতি আসিতেছেন—সিওয়ার্ডকে বস্ ধীবে ধীরে বলিলেন—তাঁহাব পুত্র সম্মুখ সমবে হত হইয়াছেন—তাঁহাব শরীবাব পূর্বোভাগ শত্রুঅস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত কিন্তু পশ্চাদেশ অক্ষুণ্ণ ছিল । বুদ্ধ শোকে আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—‘তবে ভগবান তাহাকে নিজ সেনা করিয়া লউন—যদি আমাব সহস্র পুত্র থাকিত, এবং সকলেই ঐরূপে হত হইত তা হইলেও আমি আনন্দিত হইতাম ।’

মালকোমে বুদ্ধ সিওয়ার্ডে কথোপকথন হইতেছে এমন সময় মাক্বেথেব ছিন্নমুণ্ড সঙ্গীনে গাঁথিয়া লইয়া মাক্‌ডফ প্রবেশ কবিলেন । বলিলেন, “জয় মহারাজকি জয় ! এখন আপনিই মহাবাজ, এই দেখুন রাজ্যাপহারীরব মস্তক কোথায় রহিয়াছে ।”

‘তা ত দেখিতেছি, মাক্বেথেব জড়-মুণ্ড তোমার সঙ্গীন-বিন্ধ হইয়া নিশ্চল ব্রহ্ম চক্ষুতে চাহিয়া বাহিয়াছে, তা ত বেশ দেখিতেছি—কিন্তু তাহার চক্ষু কর্ণ মুখবিবর,—হস্তপদ, অস্থি পঞ্জর—ছাড়া যদি আবও কিছু থাকে, তবে সেই আবও কিছুব কি গতি হইবে—মাক্‌ডফ তুমি তাহা বলিতে পার কি ? এরূপ

আশ্রিত হুপ্তের গুপ্ত হত্যাকারী মানবের, এরূপ উপকারী আত্মীয় রাজার হত্যাকারী প্রজার, এরূপ বন্ধু-বধ-কারী বান্ধবের এবং এরূপ নিরাশ্রয় শিশু নাবী হত্যাকারী রাজাব,—হস্তপদ, অস্থি-পঙ্কজ বাতীত যদি ভিত্তবে আরো কিছু থাকে—তবে তোমবা কেহ বলিতে পাব—যে, সেই আবো-কিছুর কি গতি হইবে? অচ্ছা বলিতে পাব আব নাই পাব—ভাবিতে ত পার, আপাতত ভাবিলেই যথেষ্ট ।

তখন মাক্বেথেব সেই ছিন্নমুণ্ড হস্তে লইয়া মাক্‌ডফ্ মাল্‌কোম্‌কে উচ্চ স্বরে অভিবাদন করিলেন, “জয় স্কটলাণ্ড-রাজকি জয়!” সকলে বলিয়া উঠিল—“জয় স্কটলাণ্ড-রাজকি জয়।” তখন মাল্‌কোম্‌ অধিবাজ রূপে সকলের সম্মান বর্দ্ধন করিলেন । উপস্থিত সৈন্য সামন্ত সকলকে নতশিবে অভিবাদন করিলেন এবং অভিষেক স্থলে সকলকে নিমন্ত্রণ কবিয়া নিম্নোক্ত হইয়া নাটক সমাপ্তি করিলেন ।

আমবাও এই সমালোচনার শেষাঙ্গীক্ষ স্বরূপ হামলেট সমালোচনায় সকলকে নিমন্ত্রণ কবিতোহি এবং দবিদ্র বাঙ্গালা ভাষায় লক্ষ্মীমন্ত ইংবাজিব একখানি মহানাটকের একপ বিস্তৃত সমালোচনা ঘাঁহাব পাঠ কবিতোহেন, তাঁহাদিগকে নতশিবে বডই আফ্লাদে আজি অভিবাদন কবিতোহি ।

নাটকের গল্প ।

৩।

চন্দ্রহাস ।

চন্দ্রহাস কেবল দেশের বাজপুত্র । তাঁহাব জন্মেব অতি অল্পকাল পবেই, শত্রু পক্ষ কেবল রাজ্য আক্রমণ করে । রাজা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন ; রাজ্ঞী সহযুতা হইলেন ; রাজ্য শত্রু হস্তগত হইল । একজন দাসী চন্দ্রহাসকে লইয়া পলায়ন কবিল, কুতলক রাজপুরে আশ্রিয়া দাসীবৃত্তি অবলম্বন করত চন্দ্রহাসকে লালনপালন করিতে লাগিল । চন্দ্রহাসেব তিন বৎসর

বয়সেব সমগ্র ধাত্রীব মৃত্যু হইল, পুরবাসীরা চন্দ্রহাসকে বড় ভাল বাসিত, এখন লালনপালন করিতে লাগিল । চন্দ্রহাসের পাঁচ বৎসর বয়সের সময়, কুতলক রাজ মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির যজ্ঞে সমাহৃত বহুতর ঋষি মুনি চন্দ্রহাসকে দেখিয়া, ধৃষ্টবুদ্ধিকে বলেন, “এই বালক অতি সুলক্ষণাক্রান্ত, তবে ইহার বাজপদ প্রাপ্তি না হইতে পারে, কিন্তু বহু সম্মানিত বাজমন্ত্রী নিশ্চয়ই লাভ করিবে । ইহাকে ভালরূপে প্রতিপালন কবিও ।”

হিতে বিপরীত হইল ; মন্ত্রী কোথায় চন্দ্রহাসকে সুপালন কবিতো আদিষ্ট হইল, কোথায় সে ধৃষ্টবুদ্ধি, এ ‘আমাব পদলাভ’ কবিরে, অতএব এ আমাব শত্রু, এইরূপ বিবেচনা কবিতো চন্দ্রহাসেব বিনাশার্থ চণ্ডালদিগকে আদেশ করিল । চণ্ডালগণ স্নেহ পববশ হইয়া, চন্দ্রহাসের একটি অতিবিক্ত অঙ্গুলী ছিল, সেইটো মাত্র ছেদন কবিতো লইয়া চন্দ্রহাসকে বনে পবিত্যাগ করিয়া গেল । চন্দ্রহাসেব অতিরিক্ত অঙ্গুলি থাকিলে, বিক্রতান্ত বলিয়া, কখন বাজপদে বসিতে পাইতেন না, এখন অঙ্গুলি ছেদনে সে অন্তবায় দ্বীকৃত হইল । অহিতে হিত হইল ।

ধৃষ্টবুদ্ধি কর্তৃক নিযুক্ত সেই বন প্রদেশের অধ্যক্ষ—কুলিন্দ যুগয়ার্থ সেই বনে আসিয়াছিলেন, বোরুদ্যমান চন্দ্রহাসকে অশ্বপৃষ্ঠে কবিতো লইয়া গেলেন । আপনার সৎধর্ম্মিণী মেধাবিনী হস্তে সমর্পণ কবিলেন ; দম্পতি অপূত্রক—চন্দ্রহাসকে অপত্য নির্কিংশে প্রতাপালন কবিতো লাগিলেন । চন্দ্রহাস সুপণ্ডিত, মহাবীর এবং হাি পবায়ণ হইলেন । যথাকালে কুলিন্দ তাঁহাকে স্বীয় নগবী চন্দনাবতীতে রাজ-পদে অভিষিক্ত কবিলেন । চন্দ্রহাস স্বীয় রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন, কেহ যেন একাদশী দিনে উপবাস ভঙ্গ না করে ।

কুলিন্দকে কুতলক রাজসকাশে নির্দিষ্ট কর প্রদান করিতে হইত । চন্দ্রহাস সেই কব ও অত্যাশ্র উপহার সম্ভার মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির নিকট পাঠাইয়া দিলেন । দুতেরা একাদশী দিনে কুতলক পূবে উপনীত হইল ; ধৃষ্টবুদ্ধি দ্রব্যজাত গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া কুলিন্দ কিত্তরগণকে স্চাকর অন্ন পানাদি প্রদান করিতে আদেশ করিলেন । তাহারা একাদশীতে আহার করিতে ‘অসম্মত হইল । ধৃষ্ট বুদ্ধি অরমাননা বোধ করত মনে মনে রোষাবিষ্ট হইল ।

আবার হিতে বিপরীত । কুলিন্দেব উপহার আরোজনে কোথায় সম্ভষ্ট হইবে,—না ধৃষ্টবুদ্ধি তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল ; কিত্তরগণের হরি বাসর-ব্রত-পরায়ণতায় কোথায় প্রীত হইবে, “না সে রোষাবিষ্ট

হইয়াছিল—সুতরাং ধুটবুদ্ধি বৃগপৎ রোষ হিংসা পরবশ হইয়া কুলিন্দকে নির্ঘাতন মানসে স্বয়ং রাজ্যাব আদেশ লইয়া চক্রবাবতী বাত্মা করিল। স্বীয় পুত্র মদনকে কার্যভার দিয়া গেল। কুলিন্দের মুখে তাহার বন মধ্যে চক্রহাস প্রাপ্তির কথা শুনিয়া ধুটবুদ্ধির সন্ত্রাস হইল; মনে ভাবিল, এই সেই বালকই হইবে; অতএব ইহার নিধন সাধন কবা অচিরাৎ কর্তব্য।

‘অতি গুঢ় বিষয়ের সংবাদ বিশেষ বিশ্বস্ত দূত দ্বারা আমার পুত্রের নিকট প্রেরণ করার প্রয়োজন হইয়াছে’ এই বলিয়া চক্রহাসকে মদনেব নিকট প্রেরণ করিল। ●চক্রহাসেব হস্তে মদনেব নামে এক পত্র দিল—তাহাতে লিখিয়া দিল—‘এই চক্রহাসই আমার বিষয় ধনের ভাবি অধিকারী হইবার কথা। অতএব ইহার রূপ, গুণ, বয়স, কুল, শীল পবাক্রম—কোন বিষয়েই দৃষ্টি না করিয়া, কোন বিধা না কবিয়া, ইহাকে বিষ প্রদান করিবে। তাহা হইলে আমবা উভয়েই কৃতার্থ হইব।’

চক্রহাস পত্নী লইয়া অতি দ্বারায় কুতলপুবে আগমন কবিলেন; অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিলেন, ক্রীড়া সরোবর তীবে শয়ান হইয়া বিশ্রাম কবিতে লাগিলেন; ক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ধুটবুদ্ধিব কত্যা বিষয়া সেই স্থলে আসিয়া চক্রহাসের রূপে মুগ্ধা হইলেন; বসন-অলিত পত্নী পাঠে বিষয়া হইলেন—শেষে পত্র মধ্যে দুইটি অতিরিক্ত অক্ষর সংযোজিত করিয়া ‘বিষয় ধন’ স্থলে ‘বিষয়া-ধন’ এবং ‘বিষ প্রদান’ স্থলে ‘বিষয়া প্রদান’ করিয়া দিয়া—পত্র পূর্ষাবস্থ ভাবে বাখিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন শুভলগ্নে মদন স্বীয় ভাগিনী বিষয়াকে চক্রহাস করে বখা-শাস্ত্র-রীতি সমর্পণ করিলেন।

ওদিকে ধুটবুদ্ধি কুলিন্দকে নিগড় নিবদ্ধ করিয়া, অতি দ্রুতঘানে কৌতুক পুরে প্রত্যাগমন করিলেন; দেখিলেন, পুতী উৎসবময়ী, শুনিলেন মদন চক্রহাসের সহিত বিষয়ার বিবাহ দিয়াছে, পুত্রকে বলিলেন, ‘বর্ষর কি করিয়াছ?’ মদনউৎসবের কিছু ক্রটি হইয়াছে বোধে বলিলেন “সময়ের স্বল্পতা-নিবন্ধন সমাটরাহের আয়োজন করিতে পারি নাই, তবে বতদূর সম্ভব তাহাই করিয়াছি”—ধুটবুদ্ধি আপনার পত্র আনয়ন কবিতে বলিলেন, পত্রে বিষয়া প্রদানের কথা সুস্পষ্ট দেখিলেন; আপনারই ভ্রম হইয়াছে মনে করিয়া নীরবে রহিলেন। বিষয়া বিধবা হয় হোক, তথাপি চক্রহাসকে নষ্ট করিতে হইবে ইহাই স্থির কবিলেন।

মনে মনে একটা কৌশল স্থির হইল। নগরের বাহিরে বনমধ্যে চণ্ডিকার মন্দির ছিল, সেইখানে দুইজন ঘাতুকে বিশেষ ধনলোভ দেখাইয়া এই বলিয়া পাঠাইয়াদিলেন, “অদ্য সন্ধ্যাব পৰ কেহ প্রণামার্থ চণ্ডীমণ্ডপে সমাগত হইলে, তোমরা তাহার শিরচ্ছেদ করিও, ইত্যন্ত কবিও না।” তাহাবা আদেশমত চণ্ডীমন্দির মধ্যে গিয়া লুকাইয়া বহিল।

পরে ধৃষ্টবুদ্ধি চন্দ্রহাসকে বুঝাইয়া দিল যে, “কুলপ্রথানুসারে নবজামাতার চণ্ডী বন্দনা একান্ত আবশ্যক। অদ্যই বনচণ্ডীকে সন্ধ্যাব পর বন্দনা কবিয়া আসিবে।” চন্দ্রহাস শব্দের আদেশমত একাকী পুষ্পচন্দনাদি লইয়া সন্ধ্যার সময় চণ্ডীপূজায় ঘাটতেছিলেন, পথিমধ্যে মদনের সহিত সাক্ষাৎ হইল; মদন বলিলেন, “আমি পুষ্পচন্দনাদি লইয়া দেবীমন্দিরে যাইতেছি, আপনি মহাবাজের সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া আছেন, আপনাকে তিনি আহ্বান করিয়াছেন।” মদন দেবীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রণাম কবিরামাত্র ঘাতুকেবা তাঁহাব শিরচ্ছেদন কবিল।

এদিকে চন্দ্রহাস বাজ-সকাশে অভূতপূর্বরূপে সম্মানিত ও পূজিত হইয়া গজপৃষ্ঠে মন্ত্রীকে প্রণাম কবিতো গেলেন। মন্ত্রী প্রথমেই জিজ্ঞাসা কবিলেন “কৈ তুমি বন-চণ্ডীকে প্রণাম কবিতো যাও নাই?” চন্দ্রহাস বলিলেন “আমি আপনাব আদেশমত যাইতেছিলাম, মদন বলিলেন ‘মহাবাজ আহ্বান কবিয়াছেন, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া আছেন, আমি পুষ্পচন্দন লইয়া অগ্রসব হইতেছি।’” মন্ত্রী ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন “তবে কি মদন দেবীমন্দিরে গমন কবিয়াছে?” চন্দ্রহাস বলিলেন, “হাঁ গিয়াছেন।” তখন মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন—“যে পরেব জন্ত গর্ত খনন করে, সে নিজেই তাহাতে পতিত হয়।”

মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি ঐ কথা বলিতে বলিতে বনাভ্যন্তরে দেবীমন্দিরে উপনীত হইলেন—দেখিলেন, ছিন্ন-পশু-বলিবৎ তাঁহাব পুত্র মদন দ্বিখণ্ডীকৃত দেখে পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি শোকে তঃখে স্বর্গ্যব স্তম্ভে মগ্নক আফালন করিতে লাগিলেন; তাহাতেই তাঁহাব প্রাণ বহির্গত হইল।

* * * * *

‘চন্দ্রহাস কুললকপূৰ্ব্ব রাজা হইলেন। তিনি অতীব হরিপরায়ণ ছিলেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন, অশ্বমেধের অশ্ববক্ষার্থ দ্বিখিজয়ে বহির্গত হইলে, তাঁহাব সহিত অর্জুনের সাক্ষাৎ হয়। মহাভারতে এই গল্প আছে; কাশীবাম দাস তাহাব মর্শ্বানুবাদ করেন। জৈমিনি ভারতে এই গল্পের বিস্তৃত বাদ আছে।

হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থে এবং তাহাব বঙ্গানুবাদেও এই গল্প আছে—বীণা-রঙ্গভূমির জন্তু শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় এই গল্প নাট্যকাব্যে গ্রন্থিত করিয়াছেন। আমরা জৈমিনি ভাবতের বঙ্গানুবাদ হইতে গল্পটি প্রধানত লইলাম; কাশী-দাসে ও ভক্তমালে এই গল্পের বিভিন্ন আকার আছে; কিন্তু মূল কথা এক—হৃজ্ঞনের হিতে বিপরীত—সজ্ঞনেব বিপরীতে হিত।

ভক্তমাল গ্রন্থোক্ত চন্দ্রহাসের বিবরণ ।

এক বাজপুত্র, তাব চন্দ্রহাস নাম ।
 বিপদ কালেতে লইয়া বাথে অশ্রু ধাম ॥
 অশ্রু সেই দেশাধিপ রাজ্যাব দেওয়ান ।
 শিশু লইয়া ভেট দিল নৃপতিব স্থান ॥
 পালন কবিয়া বাজা রাখে নিজ ঘবে ।
 দাসী পুত্র ছায় থাকে, নাহি সমাদবে ॥
 এক দিন রাজপুবে ব্রাহ্মণ ভোজম ।
 সেইখানে গেলা শিশু সঙ্গে শিশুগণ ॥
 সর্কজ ব্রাহ্মণগণ দেখি শিশুবর ।
 বাজাব জামাতা হবে কহে পরস্পর ॥
 রাজা তাহা শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মনে ।
 মোর কথা যোগ্য এই দাসীর নন্দনে ?
 এত ভাবি বিচারিল বালকে মারিতে ।
 নীচগণে আজ্ঞা দিল মশানে লইতে ॥
 স্বাভাবিক বালকেব কৃষ্ণপদে মতি ।
 অচ্ছেদ্য অভেদ্য হয় বেদের সম্মতি ॥
 শিশুরে লইয়া গেল কাটিতে মশানে ।
 কৃষ্ণে যার মতি, তাব কি কবিরে আনে ?
 চন্দ্রহাস কহে নোবে দইবে মাঝবে ।
 কিন্তু এক কথা মোর নেহারা রাখিবে ॥
 আঁখি মুদি মুহুর্তেক বসিয়া থাকিব ।
 খড়গ হানিবে, যবে শির তেলাইব ॥
 ইহা বলি কৃষ্ণপদে মন নিয়োজিল ।
 শিব হেলাইরা খজা হানিতে কহিল ॥

কৃষেব করুণা মহা বলবান হয় ।
 আর্জ হইল নীচ গণের হৃদয় ॥
 কেহ বলে ছাড়ি দেহ, যাউক অজ্ঞাতবে ।
 মারিছু করিয়া ছল কহিব বাজারে ॥
 কেহ বলে কিছু চিহ্ন লহ দেখাইতে ।
 অঙ্গুলী কাটিয়া লহ প্রতীত করিতে ॥
 বাগকের এক হস্তে ছয় অঙ্গুলী ছিল ।
 বৃদ্ধ দুই অঙ্গুলীর এক কাটি নিল ॥
 জৈশ্বরের রূপা দেখ হয় গুচুতর ।
 বাজা যোগ্য নাহি হয় ছয় অঙ্গুলী নর ॥
 এই ছেড়ু এক অঙ্গুলী তার কাটাইল ।
 পবে নৃপাসন যোগ্য ছলে করাইল ॥
 নীচগণ লইয়া অঙ্গুলী দেখাইল ।
 চক্রহাস"বাইয়া অরণ্যে প্রবেশিল ॥
 ঐ রাজার প্রতিযোগী কোন রাজা অভ্য ।
 মৃগয়া করিতে গিয়া বেবিল অরণ্য ॥
 তাব মধ্যে দেখে এক অপূর্ব বালক ।
 আনিয়া রাখিল ঘরে বৎসর কতক ॥
 পুন সেই রাজা স্থানে ঐ যে বালক ।
 আব কত দাস দাসী ধনাদি যতেক ॥
 আপোসেতে ভেট দিল প্রণয় পূর্বক ।
 চমকিয়া নৃপতি চাহিয়া রৈল মুগ্ধ ॥
 এই বালকের পূর্বে কাটে মোর দূত ।
 পুন কোথা হইতে আইল একি অভূত ॥
 বাজা বুদ্ধিমান মনে বিচার করিলা ।
 দূতগণ ছাড়ি যোরে প্রবকনা কৈলা ।
 বালক কৃষ্ণভক্ত, আর বিবাহ নির্ভঙ্ক ।
 তখাচ না বুঝে রাজা মূঢ়মতি বন্দ ॥
 পুন মারিবারে চেষ্টা কয়ে নৃপতি ।
 কিছু দূরে উপবনে পুত্র আছে তখি ॥

সেইত রাজার কন্ডা নাশ তার রিখে ।
 জাতার মিকটে থাকে বেহেতে অধিকে ॥
 বিব খাওরাইয়া চন্দ্রহাসে মারিবারে ।
 উপায় চিন্তিলা উপবনে পুত্র ধারে ॥
 পত্র লিখে পুত্রে, 'ইহ যে দণ্ডে বাইবে ।
 সেই কপে বালকেরে বিধু সমর্পিবে ॥'
 পত্নী চন্দ্রহাসে দিয়া কহয়ে নৃপতি ।
 উপবনে পুত্র স্থানে ষাই শীঘ্র গতি ॥
 পত্নী নিয়া শীঘ্র দিলা রাজপুত্র স্থানে ।
 পত্নী পড়ি বালক দেখিয়া হর্ষ মনে ॥
 নন্দর কুমার দেখি বিচারয়ে মনে ।
 রাজা পাঠাইলা রিখে কন্ডার কারণে ॥
 ইহা বুঝি রাজপুত্র সেই কপ মাতে ।
 ভগিনীব বিবাহ দিলেক সেই পাতে ॥
 হরিভক্ত মহিমা ব কর্ম কে জানয় ?
 বিব দিতে রিখে মলে এ বড় বিষয় ॥
 বর কন্ডা গৃহে আইল মঙ্গলাচরণে ।
 বৃজাস্ত শুনিয়া বাজা নিশ্চয়ে আপনে ॥
 ছিছি ধিক ধিক মোর এ ছার জীবনে ।
 এত অপমান মোর না সহে পরাণে ॥
 মোর কন্ডা হেন বরে বিধি ঘটাইল ।
 গর্ভবাসে মোর কেন মৃত্যু না হইল ॥
 শিশু কৃষ্ণভক্ত, আর বিবাহ নির্বন্ধ ।
 তখাচ না বুঝে রাজা মৃত্যুমতি বন্দ ॥
 পুন মারিবারে তবু উপায় চিন্তয় ।
 কন্ডা রাড় হর হউক, স্বীকার করয় ॥
 বিবাহের পরে দেবীপূজা কুল ধর্ম ।
 করিবারে শ্রোণা বর লইয়া ভক্ত কর্ম ॥'
 রাণীগণ রাজপুত্র গণ হবে সেলা ।
 চন্দ্রহাসে মারিবারে দূত পাঠাইলা ॥

ভাল বন্দ চন্দ্রহাস কিছুই না জানে ।
 মন বুজি সদা মাত্র কৃষ্ণের চরণে ॥
 দেবীরে প্রণাম করিতে সবে কাছে ।
 সেই তর্কে রাজদূত খড়্গ হস্তে রহে ॥
 কৃষ্ণভক্ত হিংসা দেবী সহিতে নাহয় ।
 প্রতিমা কাটিয়া উজ্জরপে বাহিরয় ॥
 খড়্গাঘাতে রাজপুত্র আদি নীচগণে ।
 মস্তক কাটিয়া করে কন্দুক ক্রীড়নে ॥
 রাজা শোকাকুলি হয়ে যাই দেবী স্থানে ।
 আশ্রমভাত কবি ভেষ্যগয় নিজ প্রাণে ॥
 কৃষ্ণেব স্বত্ত্ব ইচ্ছা অবলম্ব সম্মান ।
 চন্দ্রহাস বৈসে সেই রাজসিংহাসনে ॥
 অতএব বিজ্ঞেব বিজ্ঞ হবির তকত ।
 তাঁর পক্ষে যাব মতি, সেহ এই মত ॥
 চন্দ্রহাস বাজ সিংহাসনেতে বসিযা ।
 শাসন করিল রাজ্য কৃষ্ণভক্তি দিয়া ॥
 এ ছার জনমে মোর প্রার্থনীয় এই ।
 সেই রাজ্যে প্রজা হৈয়া যেন জন্ম লই ॥

মোগলের দরবারে বিদেশী ভ্রমণকারী ।

মোগলসম্রাট আওরঙ্গজীব যে সময়ে দিল্লীতে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, মোগলসাম্রাজ্যের গৌরব ও ক্ষমতা যে সময়ে উন্নতির চরমসীমায় উপস্থিত হয়, সে সময়ে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ একে একে ভারতে উপনীত হইতে থাকেন। ইহাব পূর্বেও অনেকে ভাবতে আসিয়া আপন আপন ভ্রমণ বিবরণ লিখিয়া স্বদেশীয়দিগকে চমকিত করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই কর্তব্য-সম্পাদনে অনলস, একাগ্রতার তৎপর, বর্ণনার বৈচিত্র্য সম্পাদনে অগ্রসর ও

কন্নড় চাকুরী প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে যে সকল ইউরোপীয় প্রাচ্য ভূখণ্ডে আসিয়া আপনাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা করে, তাহাদের প্রকৃতি অন্তরূপ ছিল। তাহারা আপনাদের সাহস ও আপনাদিগের বাহুবলের উপর নির্ভর কবিতা অনেক স্থলেই অনেক দুঃস্থ কার্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহারা এক হস্তে তববারি, অন্য হস্তে কুশচিহ্ন ধারণ করিয়া অসঙ্কোচে অবলীল্য আপনাদিগের কার্যসিদ্ধির পথ প্রশস্ততর করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের উদ্যম, তাহাদের একাগ্রতা ও তাহাদের জিগীষা কোন স্থলেই প্রতিহত হয় নাই। তাহারা নানা বিপত্তিপূর্ণ, অজ্ঞাতপূর্ণ, সমুদ্রপথে কৃতকার্যতার পবিচয় দিয়াছে। সমৃদ্ধ নগর সকল অধিকাংশ কবিগণ, এবং বলশালী ভূপতিব সহিত ভূলাবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। তাহাদের ধর্মমন্দির, তাহাদের আশ্রমগৃহ, মুসলমানের মসজিদ ও হিন্দু দেবমন্দিরের পার্শ্বে থাকিয়া তাহাদের বিজয়িনী শক্তিব মহিমা বিস্তার কবিগণ। তাহারা অনেককেই আপনাদের ধর্মে দীক্ষিত কবিগণ এবং অনেককে আপনাদের সৈনিকদলে নিবেশিত কবিগণ তাহাদিগকে রণবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে। অনেক ভ্রমণকাব্যী তাহাদের দুর্গে আশ্রমগ্রহণ কবিগণ আসন্ন বিপদ হইতে পরিভ্রাণ পাইয়াছে। অনেক গুবাদাব তাহাদের ক্ষমতার পরাজিত হইয়াছে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বন্দর প্রতিষ্ঠা কবিগণ, অধিপতিদিগের নিকট হইতে সনন্দলাভ করিয়াছে, এবং নানা স্থানে কর সংগ্রহের জন্য কর্মচারী পাঠাইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও তাহাদের ক্ষমতা ও গৌরবের কাহিনী লোকের স্মৃতিতে জাগরুক ছিল। কথিত আছে, এই সময়ে একজন মোল্লা যুবক আওরঙ্গজীবকে একজন প্রধান পর্ভুগিজ ভূপতির গল্প বলিয়া আমোদিত করিতেন। বিনেশীয়দিগের এই গৌরবকাহিনী ভারতের এই শেষ গৌরবান্বিত যোগল সম্রাটের স্মৃতি হইতে কখন স্থলিত হয় নাই।

ভারতে পর্ভুগিজ জাতির এইরূপ গৌরব কাহিনী শুনিয়া অন্তান্ত ইউরোপীয় জাতি প্রাচ্য ভূখণ্ডে আসিতে উদ্যত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেকে আপনাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধির বা ভূয়োধর্মন লাভের আশায় ভারতের উপকূলে পদাধী করিতে থাকে। এই সকল ভ্রমণকারীদিগকে দুই প্রেক্ষণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। স্বভাবে ও কার্যে এই উভয় প্রেক্ষণী সম্পূর্ণরূপে উভয়ের বিপরীত ধর্মাক্রান্ত। এক দল ইউরোপীয়—সমাজের অতি স্থগাব পাত্র ও

মানব জাতির অতি অপকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে পরিগণিত ছিল। বাহারা সমাজে নানা প্রকার অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, বিবি ব্যবস্থার অবমাননা করিয়া নানা অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, অবশেষে কাঁসি কাঠ বা কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের শোচনীয় জীবনে আপনাই পরিতপ্ত হইয়াছে, তাহারাই দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া মোগলের দরবারে বা আয়াকানের ভূপতির আশ্রয়ে থাকিয়া আপনাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধির উপায় দেখিত। ইহাদের উদ্যম ও ইহাদের অধ্যবসায় একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। ইহাবা সাহসী, উৎসাহপূর্ণ ও কার্য্য কুশল ছিল। যদি ইহারা অঞ্চালনার দক্ষতা প্রকাশ কবিতো পারিত, কামান সকল সজ্জীভূত করিতে সক্ষম হইত, বন্দুকের গুলি লক্ষ্যে পাতিত কবিতো কৌশল দেখাইতে পারিত, বা অন্য কোনরূপে আপনাদের সমর কৌশলের পরিচয় দিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে সম্রাটের দরবারে ইহাদের কখন অবমাননা হইত না। ইহাদের পরিচর্য্যাব জ্ঞাত অনেক অমুচব নিযুক্ত হইত, আবাসের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গৃহ সকল সজ্জীভূত করা হইত। ইহারা বহু সংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া সম্রাটের দরবাবে বিশেষ স্নেহ ও সম্মানেব সহিত কালতিপাত কবিত। ইহাবা যে এক সময়ে আপনাদিগের জন্মভূমিতে উদ্যম প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল, বিনুষ্ঠনে, বিধ্বংসে বা বিপ্লবে আপনাদের বলবতী জিহাংসার পরিতর্পণে সাহসী হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া ইহারা এখন পরিতপ্ত হইত না। ফরাসী, পর্তুগীজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজ নাবিক, দস্তা, ও নব্বাতকেরা এইরূপে ভাবচর মোগল দরবারে আসিয়া আপনাদের জীবিতকালের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিল। স্বদেশে ইহাদের ছরাচারের কাহিনী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, বিদেশেও ইহাদের কার্য্য কলাপের কোন চিহ্ন থাকে নাই। ইহাদের হৃদয় প্রকৃতির কথা লিপিবদ্ধ হইয়া ইতিহাসে স্থান পরিগ্রহ করে নাই; উহা ইহাদের দেহের সহিত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই শ্রেণী ব্যতীত আর এক দল লোক বাণিজ্য ব্যবসারের শ্রীবৃদ্ধি, গবেষণার চরিতার্থতা এবং আপনাদের কৌতুহল পরিকল্পিত জ্ঞান ভারতে সমাগত হইয়াছিলেন। ইংরেজ ও ফরাসিরাও অবিকাংশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা সুশিক্ষিত সুব্যবহিত ও সৌম্য প্রকৃতি ছিলেন। ইউরোপের অনেক পণ্ডিত ও তত্ত্ব ব্যক্তি ইহাদের সম্মান করিতেন। এই

সকল পণ্ডিত ইহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্যের সহিত পড়িতেন। কিন্তু ইহাদের যেমন ভূগোলশিলা ছিল, বিচার শক্তি তেমন ক্ষুদ্র ছিল না। কোকুইলপার লোকে ইহাদের নিকট বাহা কিছু বলিয়াছে, ইহারা তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। সুতরাং ইহাদের বর্ণনা অবিকারিত্ব লেই অতিরোক্তিতে কলঙ্কিত হইয়াছে। ইহারা অনেক স্থলে একপক্ষ অতি-রজন-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন যে, ইহাদের লিখিত বিষয় কোন কোন স্থলে জৈসপের গল্প-মালাকেও অধঃকৃত করিয়াছে। অধিকতর ইহারা ঘটনাবলীর তারিখ স্বল্পরূপে নির্দেশ করিতে পারেন নাই। স্থানের দূরত্বও স্বল্পরূপে অবধারণে সমর্থ হন নাই। ইহারা প্রাচ্য ভূখণ্ডে স্থানের ও ব্যক্তির-নাম একরূপ লিখিয়াছেন যে তাহাতে সার উইলিয়ম জোন্স এবং মাইন্ট ট্রাউট এলকিনস্টোনও বিস্মিত ও বিভ্রত হইতে পারেন। তাঁহাদের বর্ণনা চিত্রকরের চাতুরীতে বা ঐতিহাসিকের যথার্থ-প্রিয়তায মনোহারিণী হয় নাই! তাঁহারা এভাবে ভারতের মানচিত্র আঁকিয়াছেন, যে উহাতে হুগলি একটা দ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং রাজমহল বঙ্গ অখাতের উপকূলে শোভা পাইতেছে।

ভ্রমণকাব্যীরা এইরূপে আপনাদের কল্পনাপ্রিয়তা বা অতিরজন-শক্তির পরিচয় দিলেও আমরা তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে অনেক স্থলে অনেক বিবরণ জানিতে পারি। তাঁহারা অনেক সময়েই অনেক ঘটনা যথার্থরূপে বর্ণনা করিতে ক্রটি করেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল ইউরোপীয় ভ্রমণকারী মোগলের দরবারে উপনীত হইলেন, আমরা এ স্থলে তাঁহাদের পরিচয় দিতেছি। প্রথমে সর টমাস রো ভারতে উপনীত হইলেন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে সর টমাস ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম জেমসের দূত হইয়া জাহাজীবের দরবারে আইলেন। ইনি, ভ্রমণ-নীতন সম্বন্ধে ঘটনা স্বল্পরূপে লিখিতে যথোচিত প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সর্বোপায়ে সফল হয় নাই। ইনি স্বয়ং যে ভ্রমণগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সে তার বহনে তাঁহার তানু কমতা ছিল না। অপরিচিত স্থানে আমরা অপরিচিত বিষয়ের বর্ণনা করিতে হইলে বিশেষ স্বল্পদর্শিতার আবশ্যক। প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত বনিষ্ঠতা করিয়া অনেক বিষয় জানিয়া শুনিয়া নিজের ভূগোলশিলা বৃদ্ধি করা উচিত। কিন্তু সর টমাসের একরূপ স্বল্পদর্শিতা ও একরূপ ভূগোলশিলা ছিল না। দরবারের প্রধান

প্রধান ওমরাহের সহিত ইহাঁর ভাষণ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সুতরাং পূর্বে কি ঘটনা থাকে, তাহা ইনি সুস্বরূপে জানিতে পারেন নাই। সম্রাট আপনার সিংহাসনের উপরিভাগে প্রাচীরে ইংলণ্ডের রাজা ও রানীর, সেভী এলিজাবেথের এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর জেনারলের প্রতিকৃতি রাখিয়াছিলেন। সম্ভবত সার টমাস রো এই সকল প্রতিকৃতি সম্রাটকে উপহার দেন। রো আপনার ভ্রমণবৃত্তান্তে এই বিষয় বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভাবতে যে ইংলণ্ডের আধিপত্য বহুমূল হইবে, তাহা আওরঙ্গজেবের এই কার্য্য হইতে বোধ হয় স্মৃতি হইয়াছিল।

এডওয়ার্ড টেরি ও কাপ্তেন ফকেন্স বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইহাঁর সার টমাস রোর সমকালে ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করেন। রো অপেক্ষা ইহাঁদের কর্মক্ষমতা অধিকতর ছিল। কিন্তু শেষোক্ত ভ্রমণকারী আপনাব ভ্রমণবৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে লিখিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে প্রথম জনের লিখিত বিবরণ উক্তরূপ সংক্ষিপ্ত নহে। ইহাব বর্ণনা মনোহর ও বিষয়গুলি সুপ্রণালীতে বিভক্ত। এই সকল বিষয় জানিয়া বিশেষ আয়োজিত হওয়া যায়।

চতুর্থ ভ্রমণকারী জন আলবর্ট মন্বেল্‌সো একটি প্রসিদ্ধ বংশ মাকবেলবর্ক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। দেশভ্রমণে প্রগাঢ় অজ্ঞাবাগ বশত ইনি সুখ ও সম্পত্তি উভয়ই জলাঞ্জলি দেন। পারস্য, আরব প্রভৃতি স্থান হইতে এত ভ্রমণকারী স্মরণে পদার্পণ করেন। ইহাঁর সাহস ও উদ্যম কোথাও পর্য্যদন্ত হয় নাই। ইনি স্মরণ হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত গমন করেন। ইহাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সমকালে যে তিন জন ভ্রমণকারী ভাবতে সমাগত হন, তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনেক জ্ঞাতব্য ও আমোদকর বিষয়ে পরিপূর্ণ। এ অংশে অত্যাশ্চর্য্য ভ্রমণকারীরা ইহাঁদের জ্ঞান যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ইহাঁদের এক জনের নাম জন বাপজ্জি টেবারলিয়া। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারিসে জন্মগ্রহণ করেন। কুড়ি বৎসর বয়সে ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশে যাইয়া অত্রা রীতিনীতি ও ভাষা অবগত হন। স্বয়ং রত্নব্যবসায়ী হওয়াতে ইনি তুরস্ক, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থলে বাইরা রত্নাদি বিক্রয় করিতেন, ভারতের নবাবদিগের মধ্যে ইনি কিরূপে সহস্র সহস্র মুদ্রা উপহার দিয়াছেন, সম্রাট হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত কিরূপে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, বর্ষিয়ারের সহিত বঙ্গের সমতল ক্ষেত্র ও জলাভূমি সকল কিরূপে অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার

ব্যবসাবাণিজ্যে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, তিনি কিরূপে রত্নাদি বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ইহাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে বিশদরূপে জানিতে পারা যায় ।

অন্ত ব্যক্তি ইউরোপের দক্ষিণাংশস্থিত তপন-কর-বিভাসিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় ভূখণ্ডের অধিবাসী । ডাক্তার জন্ ফ্রান্সিস্ গেমেলিকাবিরে এই ভূখণ্ডের যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা আলেখ্যাবৎ রমণীয়তার জন্য চির প্রসিদ্ধ । ইতালীয়গণ প্রকৃতির এই প্রিয় নিকেতনের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন । কোতূহলের পরিভূষ্টি সাধন ও পারিবারিক ছুৰ্ঘটনার জন্য গেমেলিকাবিরে দেশদ্রমণে বহির্গত হন । তিন জনেব মধ্যে ইহাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তই অধিকতর বৈচিত্র্য-পূর্ণ । ইনি সরলভাবে সকল কথাই অতি সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । দেখিয়া শুনিয়া বহুশ্রীতা উপার্জন ভিন্ন ইহাঁর ভ্রমণের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না । সুতরাং তিনি যাহা দেখিয়াছেন বা যাহা শুনিয়াছেন, তাহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের ক্ষেত্র করেন নাই । ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য পশু পক্ষীর বিবরণ, অধিবাসীদিগের রীতিনীতি, হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্র, রাজ্যের শাসনপ্রণালী, পশুগিজরিগেব উন্নতি ও যে সকল ছুৰ্ঘটনা ঘটয়াছে, তৎসমুদয়ের কথা—সমস্তই তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তে অতি বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে । এই চিত্র অনেক স্থলে যেমন স্বাভাবিক, তেমনি হৃদয়াকর্ষক । কিন্তু তিনি বোধ হয়, সাতিশর উগ্রপ্রকৃতি ও ধর্ম্মী ছিলেন । তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, ইনি যখন সন্ধ্যোগ পাইয়াছেন, তখনই দেবমূর্ত্তি বিনষ্ট করিতে বিবৃথ হন নাই । ১৬৯৫ অব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হয় । ইনি গোয়া হইতে দক্ষিণ আমেরিকা পর্য্যন্ত যাইয়া পৃথিবী পবিত্রমণ কার্য সম্পন্ন করেন ।

সর্বশেষ ভ্রমণকারী বর্ণিয়ার । এই ফরাসী ভ্রমণকারীর যেমন উৎসাহ ও একাগ্রতা, তেমনি সূক্ষ্মদর্শিতা, রহস্তপটুতা ও লোকরঞ্জন শক্তি ছিল । ইনি সাধারণের একরূপ অধিগম্য ছিলেন যে, নিম্ন হইতে উচ্চ প্রণী পৰ্য্যন্ত অনেকে ইহাঁর বচনমধ্যে পরিগণিত ছিলেন । যাহা কিছু ইহাঁর সম্মুখে পতিত হইয়াছে, তাহারই সূক্ষ্ম বিবরণ সংগ্রহ করিতে ইনি কষ্ট স্বীকার করিতে বাঁ অর্থব্যয়ে কাতর হন নাই । আওরঙ্গজেবের এক জন প্রধান পারিষদের অগ্রগৃহ-ভাজন হইয়া ইনি দরবারের সমস্ত ঘটনাই জানিতে পারিয়াছিলেন । পৃথিবীর কোন দরবারের কোন ব্যক্তি নিগূঢ় তত্ত্ব সংগ্রহে ইহাঁর স্থান সন্ধ্যোগ পাইয়া

ছিলেন কি না সন্দেহ। ইনি অনর্গল উচ্চ বলিতে পারিতেন। পারস্ত ভাষা হইতে অনুবাদ করিতে জানিতেন, এবং গোলেস্তার পদাবলী মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। ইহার উদ্যম কোথাও প্রতিহত হয় নাই; মনের স্থিরতা কোথাও বিচলিত হয় নাই এবং বিচারশক্তি কোথাও অবনত হইয়া পড়ে নাই। ইতি বাল্যেই হইতে কাস্মীর পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়াছেন, তাহারই চিত্র যথাযথ ভাবে পাঠকেব সমক্ষে উপস্থিত করিতে উদ্যোগী হন নাই। ঘটনাব স্মৃতিস্মরণরূপে বর্ণনায় ইনি বসুণ্বেলের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য। গিবন্ ইহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং এল্‌ফিনষ্টন ইহার উপর নির্ভর করিয়া ভারতের ইতিহাসের অন্ধকারময় দুর্গম পথ অনেকাংশে আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই তিন জন ভ্রমণকাবীর ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতের শেষ প্রতাপাশ্রিত মোগল সম্রাটের অনেক কথা বিশদরূপে জানিতে পাওয়া যায়।

কর্ণেল অলকট।

১

সুখীল আকাশে খেত মেঘ মত,
নীল পারাবারে মাতা খেতাজিনী,
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা, গৌরবে-গর্জিনী,
মার্কিনের অঙ্গে বসি ধ্যান রত,
হে খেতর্ষি! তুমি দেখিলে কি, হায়!
আমাদের মাতা পতিতা ভারত
পাশ্চাত্য-সভ্যতা-দর্শন ধুয়ার
যাইছে ছুটিয়া নিপাতের পথ!
শান্তি-সিদ্ধতীরে খেতাজ ঈশান
বিবাহ বন্ধারে কহিলে সভাবি,—
“হায় মা! কিরিয়া দেখ রাশি রাশি
“তাগামর তব অতীত বিমান।

“যোগীন্দ্র মহাত্মা, অমবেন্দ্রগণ
“হিমাত্রি শেখরে ওই অগণন।

২

“দাড়াইয়া ওই নর-নাবায়ণ,—
“পাঞ্চজন্তু রবে পুবিয়া গগণ,
“কহিছে—তাজিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম, নয়!
লও একমাত্র আমার শরণ!”
কিরিয়া জননী; দেখিলা চাহিয়া
নকত্র-খচিত আকাশ তাঁহার।
তব কণ্ঠ তাহে উঠিছে ভাসিয়া
ডুবায়ে পাশ্চাত্য ক্লিন্ন বন্ধার।
মৃত্যু ভারভরে দিলে কুমি প্রাণ!
লও পায় অর্থ ধ্বংস আনুমান।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

নবজীবন ।

৪র্থ ভাগ ।

আষাঢ়, ১২৯৫ ।

১২শ সংখ্যা ।

পাতঞ্জল যোগসূত্র ।

তত্র নিরতিশয়ং সৰ্ব্বজ্ঞ বীজম্ ॥ ২৫ ।

পদ্যেদঃ । তত্র, নিরতিশয়ং, সৰ্ব্বজ্ঞ, বীজম্ ।

পদার্থঃ । তত্র—তস্মিন্ ভগবতি, নিরতিশয়ং—নির্নাতি অতিশয়ঃ স্বাৎ তৎ কাষ্ঠাপ্রাপ্তমিতি যাবৎ, সৰ্ব্বজ্ঞবীজং সৰ্ব্বজ্ঞস্ত সৰ্ব্বজ্ঞস্ত অতীতান-গতাদিগ্রহণস্ত বীজং লিঙ্গং অহুতাপকোহেতুরিতি যাবৎ । কারণমিতি কেচিৎ ।

অর্থঃ । তত্র সৰ্ব্বজ্ঞবীজং নিরতিশয়মতীতি শেষঃ ।

ভাবার্থঃ । দৃষ্টান্তে হি অগ্নুত্মহত্বাদীনাং ধৰ্ম্মাণাং সাত্তিশয়ানাং কাষ্ঠা-প্রাপ্তিঃ, যথা পরমাণাবগৃহ্যত্বাকাশে চ পরমমহত্বস্ত । এবং জ্ঞানাদয়োপি চিত্ত-ধৰ্ম্মা স্তরভম্যেন পরিদৃষ্টমানাঃ কচিরিতিশয়তামাপন্নয়ন্তি যত্র জ্ঞানস্ত কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ স সৰ্ব্বজ্ঞঃ পুরুষবিশেষ ইত্বর ইতি ভাবঃ ।

অহুত্বাদ । বে চৈতজ্ঞরূপ পুরুষে সৰ্ব্বজ্ঞতার অহুত্বাপক জ্ঞান চরমসীমা-প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত সেই পুরুষ ইত্বর ।

সমালোচন । পূৰ্ণ পুত্র জ্ঞান আশু বচনাত্মকাবে ইত্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে অহুত্ব-রূপ প্রমাণ দ্বারা ইত্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছেন । আমরা এখানে দর্শন শাস্ত্রের একটি রহস্য দেখিতেছি ।

আমরা দেখিতেছি, ইত্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধি বিষয়ে পতঞ্জলির মতন নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা ঋষিগণও অহুত্ব-রূপ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া-ছেন । ইহাদের মধ্যে নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকের মত পরস্পর ঐক্য হইলেও

পতঞ্জলিৰ অহুমানৈব রীতি তাঁহাদেব অহুমানৈব রীতি ইহঁতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদিগের মতে ঈশ্বর সত্ত্বগুণ; জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রোধ, যত্ প্রভৃতি অনেক গুণ তাঁহাতে বৰ্দ্ধমান ; কাৰ্যেই তিনি স্বৰং কৰ্ত্তা, আপনাব ইচ্ছামত সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করিতে সক্ষম । পতঞ্জলিৰ যোগশাস্ত্র মতে ঈশ্বর নিগুণ বিগুণ চৈতন্যস্বরূপ । জগৎ কার্যের প্রতি তাঁহার নিজের কোন কক্ষতা নাই, তিনি উদাসীন ভাবে উহার দ্রষ্টামাত্র । একুপ স্থলে এই উভয়ের অহুমানৈব পদ্ধতি যে ভিন্ন হইবে, তাহা বড় বিচিত্র নয় ।

নৈয়ায়িকেরা বলেন—কার্য্য মায়েবই কৰ্ত্তা আছে ; এই জগৎ যখন কার্য্য—তখন ইহারও অবশ্য একজন কৰ্ত্তা মানিতে হইবে ;—সেই কৰ্ত্তাই ঈশ্বর । পতঞ্জলিৰ পক্ষে এই অহুমানটি খাটে না । কাৰণ যোগশাস্ত্র সাংখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যোই নিষিদ্ধ ; এই সাংখ্য সম্প্রদায়ে এত দিন ধরিয়া যে নিবিশ্ববতা দোষ ছিল, পতঞ্জলি এই ঈশ্ববাসিত্ব নিরূপক সূত্র দ্বাৰা তাহা নিবারণ কবিসাছেন মাত্র ; এই নিমিত্তই যোগশাস্ত্র সেশ্বব সাংখ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ । সাংখ্যেরা বলেন, কার্য্য মায়েবই এক একটি কৰ্ত্তা আছে সত্য এবং সেই জন্ত এই জগৎ কার্য্যেবও একটি কৰ্ত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য ; কিন্তু সে কৰ্ত্তা প্রকৃতি । জগৎ কার্য্যেব উপর একমাত্র প্রকৃতিবই যে কৰ্ত্তৃত্ব, তাহা সাংখ্যাচার্য্যগণ বিশেষ যুক্তি ও প্রমাণ দ্বাৰা সিদ্ধ কবিসাছেন । তাঁহাদের মতের সাব মৰ্ম্ম এই “প্রকৃতিঃ ক্রিয়মাণা গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ । অহঙ্কাৰ বিমুক্তায়া কৰ্ত্তাহমিতি মজ্ঞতে ॥” প্রকৃতিই জগতে যাবদীৰ্ব কার্য্যেব কৰ্ত্তা । তত্ত্বে আত্মা কেবল অহঙ্কাৰে মুক্ত হইবা ঐ সকল কার্য্যকে নিজের বলিয়া বিবেচনা করেন । এই নিমিত্তই মহর্ষি কপিল মুক্তকণ্ঠে বলিসাছেন যে, যদি জগৎ-কার্য্যেব কৰ্ত্তৃত্বের জন্ত ঈশ্বব মানিতে হয়, তবে “ঈশ্ববাসিদ্ধেঃ ।” সেরূপ ঈশ্বব না মানিলে কোন ক্ষতি নাই, যে হেতু প্রকৃতিই জগৎ কার্য্যেব কৰ্ত্তা ।

মহর্ষি পতঞ্জলি নিজের সাংখ্য সাম্প্রদায়িকতা বজায় রাখিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছেন অথবা কপিলের “ঈশ্ববাসিদ্ধেঃ” এই বাক্য যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে একেবারে লোপ করিতেছে না, তাহাই বুঝাইতেছেন । তিনি বলেন জগৎ কার্য্যের উপর কৰ্ত্তৃত্ব নাই বলিয়াই যে ঈশ্বব নাই এমন কথা বলিও না, কাৰণ আমব’ অন্ত প্রকাৰেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের অহুমান করিতে পারি । তাহা এই—“তত্ত্ব নিবতিশয়ং সৰ্ব্বজ্ঞ বীজম্ ॥” এই অহুমান বা তর্কটিকে বিশদ কবিসা বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথমে আর একটি অহুমান

বা ভর্তুকির অবতারণা করিতে হইবে। যথা—সামান্য ইহ জগতে যে সকল বস্তুর ভারতম্য অর্থাৎ স্থল সিন্ধুরে আধিক্য বা নূন্যতা দেখিতে পাই, তাহার। যে এক স্থলে চরম উৎকর্ষ বা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেমন অগ্নি-পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমিতে কমিতে পরমাণুতে চরম উৎকর্ষ বা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কারণ পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র আর কিছুই নাই। এইরূপ মহৎ পরিমাণ ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে আকাশে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; কারণ আকাশ হইতে মহৎ আর কিছুই নাই। এক্ষণে দেখ সর্বজ্ঞতা অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান জ্ঞান একটি ভারতম্যভাবিশিষ্ট বস্তু বা ধর্ম; কেননা পুরুষ মায়েরই কিছু না কিছু পরিমাণে সর্বজ্ঞতা লক্ষিত হয়; কিন্তু সকলের সমান নয়, রায় অপেক্ষা শ্রামের জ্ঞান কিছু বেশি। আবার শ্রাম অপেক্ষা যাদবেব আনও অধিক; কেবল তা নয়, একা রামেরই বাল্যকালের জ্ঞান একরূপ অক্ষুট, যৌবনে তাহা অপেক্ষা ক্ষুট, আবার বৃদ্ধাবস্থায় তদপেক্ষাও পরিণত হয়, অতএব এই জ্ঞান যে কোন স্থানে চরম উৎকর্ষ বা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে,—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। যে স্থানে এই জ্ঞান সর্বতোভাবে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে তিনিই ঈশ্বর।

পাঠকগণ বিবেচনা করে দেখ, মহর্ষি পতঞ্জলি কিরূপ অনাধাবণ পাণ্ডিত্য-বলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধিবিষয়ে এই নূতন অমুমানের আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাতে সাংখ্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তিত প্রকৃতির জগৎকর্তৃৎ সম্পূর্ণরূপে বজায় রহিল অথচ তাঁহাদেব নিরাক্ষরতাপবাদ দূর করা হইল; ইহাই যথার্থ চাতুর্য। ভাব্যকার বলেন, অজ্ঞান অন্ধকালে আচ্ছন্ন জগতে জ্ঞানধর্মের উপদেশ দ্বারা সংসারপতিত ভূতগণের উদ্ধারের পথ দেখাইবার জন্য সেইরূপ সম্পূর্ণরূপ সর্বজ্ঞতা পূর্ণ পুরুষের স্থিতি আবশ্যক।

এই নিমিত্তই—ব্রহ্মাবিন্দু শিবাঙ্গীনাং যঃ পবঃ স মহেশ্বরঃ ।

ব্রহ্মাদিরও সম্পূর্ণ সর্বজ্ঞতা নাই, কাহেই তাঁহারা ঈশ্বর হইতে পারেন না।

স এক পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ । ২৬

পদার্থঃ । পূর্বেষাং, অপি, গুরুঃ, কালেন, অনবচ্ছেদাৎ ।

পদার্থঃ । স পূর্বেগুরুঃ, এষ ঈশ্বরঃ পূর্বেষাং পূর্ববর্জিনাং সর্গীহাং পরান্নাং অপি ব্রহ্মবিন্দুমহেশ্বরাদীনাং গুরুঃ । অন্তর্ধ্যাতী বিদ্যা জ্ঞানচক্ৰঃ প্রদত্ত

উপদেষ্টা, কালেন, সময়েন ন অবজিহ্যতে ইত্যনবজ্ঞেয়ঃ তস্মাৎ অনাদিস্বা-
দিতার্থঃ ।

অর্থঃ । কালেন অনবজ্ঞেয়াং স পূর্বেবারপি গুণভবতীতি শেষঃ ।

তাবার্থঃ । স কালাতীতঃ অনাদিস্ততশ্চ সৃষ্টে রাদৌউৎপন্নানং ব্রহ্মাদীনাম্
দেবানামুদীনাঞ্চ উপদেষ্টা তাদৃশং কালানবজ্ঞিরং গুরুং ব্রহ্মাদীনাম্ জ্ঞাতৃক্কা সত্ত্বব
ইতি ভাবঃ । কচিংসৃষ্টে এব ইতি পাঠোনাতি ।

অনুবাদ । সেই পরমেশ্বর কালাতীত অর্থাৎ কোনরূপ কাল প্রবিমাণ
দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি প্রভৃতির ইয়ত্তা করা যায় না, অতএব তিনি সৃষ্টির
প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মহর্ষিগণের জ্ঞান উপদেষ্টা গুরু ।

সমালোচন । সেই ঈশ্বর অমুক সময়ে এত বস্তু বেলায় সময় উৎপন্ন
হইয়াছেন, এত কাল অবস্থিতি করিবেন এবং অমুক সময়ে তাঁহার স্বয়ং
হইবে । ইত্যাদি প্রকার কাল কৃত ইয়ত্তা তাঁহাতে নাই । অর্থাৎ তিনি
অনাদি অনন্ত স্তরায় সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বাহাবা
আমাদের নিকট প্রেষ্ঠদেব বলিয়া বিখ্যাত তাঁহাদেবও জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেষ্টা
গুরুরূপ । ভাষ্যকার বলেন, কেবল যে বর্তমান সর্গের প্রথমে উৎপন্নদিগের
গুরু তাহা নহে, যে সকল অনন্ত সর্গ হইয়া গিয়াছে এবং যে সকল অনন্ত
সর্গ উৎপন্ন হইবে, সে সকলের প্রথমোৎপন্ন দিগেরও তিনি জ্ঞানোপদেষ্টা ।

তস্ত বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ।

পদজ্ঞেয়ঃ । স্পষ্টঃ ।

পদার্থঃ । তস্ত ঈশ্বরস্ত, বাচকঃ অভিধায়কঃ প্রণবঃ প্রকর্ষণে নৃত্যে
স্মৃতেহনেনেতি প্রণবঃ ওক্তাবঃ ।

অর্থঃ । প্রণবঃ তস্ত বাচকো ভবতীতি শেষঃ ।

তাবার্থঃ । ঈশ্বরস্ত বাচকঃ, প্রণবঃ, প্রণবস্ত তু বাচ্য ঈশ্বরঃ । তয়ো
শ্চ বাচ্যবাচকভাবলক্ষণ সম্বন্ধো নিত্যঃ সঙ্কেতেন প্রেকাশ্যতে, নতু কেন
চিৎ ক্রিয়তে । যথা পিতৃপুত্রয়ো বিদ্যমানঃ সম্বন্ধেহস্তায়ঃ পিতা, অন্তায়ঃ পুত্র
ইতি কেন চিৎ প্রেকাশ্যতে । অভএবাহ বোদিবাঙ্কব্যঃ—

“অদৃষ্ট বিগ্রহোদেবো ভাবগ্রাহ্যো নোময়ঃ ।

ততোজানঃ স্মৃতোনার তেনাহুতঃ প্রসীদতি ॥”

অদৃষ্টবিগ্রহোহদ্ব্যুত শরীরো দেবঃ পরমাত্মা, ভাবগ্রাহ্যো ভক্তিমাত্রগ্রাহ্যো,

মনোমযমনস্তস্য কারণোপাধিশবলঃ, তস্ত নাম ওঙ্কারঃ স্তুত ওঙ্কারেণ সহ তস্ত বাচ্যবাচকতাবো নিত্য ইত্যর্থঃ, তেন ওঙ্কারেণ আহৃতঃ সন প্রসীদতি কর্তব্য ষিচারোপাধিশিমর্থঃ পূরয়তীত্যর্থঃ ।

অনুবাদ । সেই ঈশ্বরের বাচক বা নাম প্রণবঃ ।

সমাগোচন । এই জগতে যতগুলি বস্তু বা পদার্থ দৃষ্ট ক্রত বা অনুভূত হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি বাচক বা প্রতিপাদক বিশেষ্য শব্দ আছে, যাহা উচ্চারণ কবিরামাত্র সেই সেই পদার্থের বোধ হয় । যেমন গোকৃ এই শব্দটি উচ্চারণে এক প্রকার জ্ঞানস্বারেব বোধ হয় । সেই জ্ঞানস্বারেব বাচক গোকৃ । সেই বাচক শব্দগুলি দুই প্রকার, গুণবাচক এবং বস্তুবাচক । গুণবাচক শব্দগুলির নাম বিশেষণ এবং বস্তুবাচক শব্দগুলির নাম বিশেষ্য । এই উভয়বিধ শব্দই কালক্রমে বস্তুব বাচকরূপে ব্যবহৃত হওয়ার আমবা এক একটি বস্তুর অনেকগুলি নাম বা বাচক শব্দ দেখিতে পাই । এমন কি, এক একটি বস্তুর নামের মধ্যে গুণবাচক বা বিশেষণ শব্দ এত প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে উহাব মধ্য ইহঁতে প্রকৃত বস্তুবাচক বা বিশেষ্য শব্দটি খুঁজিয়া লওবা দুর্ঘট হইয়াছে, অনেক স্থলে প্রকৃত বিশেষ্য শব্দটি হয় ত লোপ প্রাপ্ত হয় ; অন্ত্যন্ত বস্তুর মত এক্ষণে ঈশ্বরের বাচক অনেকগুলি শব্দ দৃষ্ট হয় । যথা—ঈশ্বর, পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাতা ইত্যাদি । কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ সকল গুণবাচক মাত্র, উহাবা ঈশ্বরের এক একটি গুণ বা ধর্ম অনুসারে কল্পিত হইয়াছে । ঈশ্বরের বাচক প্রকৃত বিশেষ্য শব্দ একমাত্র প্রণব বা ওঙ্কার । এই ওঙ্কারের সহিত ঈশ্বরের বাচ্য বাচক সম্বন্ধ নিত্য বা স্বতঃসিদ্ধ, কোন গুণ বা ধর্ম অনুসারে কল্পিত হয় নাই । যেমন শিশু পুত্রের মধ্যে পবম্পরের সহিত পরম্পরের নিত্য সম্বন্ধ—লোক দ্বারা অমুক পিতা অমুক পুত্র এইরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরও ওঙ্কারের মধ্যে বাচ্য বাচক সম্বন্ধও নিত্য ; বেদাদি দ্বারা ঈশ্বর বাচ্য এবং ওঙ্কার বাচক, এইরূপে প্রকাশিত হয় মাত্র । এই নিমিত্তই ধোণী স্বাক্ষবক্য বলিয়াছেন,—

“অদৃষ্ট বিগ্রহোদেবো ভাবগ্রাহো মনোময়ঃ ।

ততোঙ্কারঃ স্বতোনাম তেনাহৃত প্রসীদতি ॥”

ঈশ্বরের শরীর প্রত্যক হইয়া, তিনি ভক্তির বস্ত্র এবং মনের মত স্বাভাবিক সম্বন্ধ সম্পন্ন । ওঙ্কারই তাঁহার নাম ; এই নাম দ্বারা আহৃত হইয়া ভক্তের উপর প্রণয় হন । এই নিমিত্তই বোধ হয় ঐ ওঙ্কারের অ, উ, ঈ,

এই অবস্থার মধ্যে কোন না কোনটির সহিত যোগ করিয়া তত্ত্বের মূল ময় সকল আবির্ভূত হইয়াছে ।

এই স্থলে ইংরাজী দর্শনাভিজ্ঞ, মিলের বাদশাস্ত্রের দুইটি কথা স্মরণ করিলেই বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিবেন । কথা দুইটি Denotation এবং Connotation. বিধাতা বলিলে তাহার denotation কেবল বিধান-কর্তা, কিন্তু connotation অর্থ দৈবের বটে । সেই রূপ ভগবান বলিলে বৈভবখ্য যুক্ত পুরুষ মাত্র denote করে, Connotation অর্থে দৈবের বটেন । ইংরাজিতে যে সকলকে Proper Noun বলে, সেই সকল সংজ্ঞার Denotation এবং Connotation একই । দৈবের সেইরূপ proper name বাচক নাম 'ও' । 'ও' বলিলে কাল শাস্তা, ভাল মন্দ, ধারণ কর্তা সৃষ্টি কর্তা,—এ সকল কিছুই বুঝায় না—বুঝায় কেবল দৈবের । ঐ ওকার মাত্র দৈবের স্বরূপ বাচক, খাতা বিধাতাদি পদ তাহার গুণবাচক মাত্র ।

তজ্জপ স্তদর্থ ভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

পদচ্ছেদঃ । তৎ-জপঃ, তৎ-অর্থ-ভাবনম্ ।

পদার্থঃ । তত্ত্ব সাক্ষি ত্রিমাত্রস্ত প্রণবস্ত 'জপঃ' যথাবহুচ্চারণং, তচ্ছাচাচ্ছেদস্ত 'ভাবনং' পুনঃপুনঃ চেতসি বিনিবেশনম্ ।

অর্থঃ । স্পষ্টম্ ।

ভাবার্থঃ । দৈবের প্রণিধানব্রতি হস্তেণ সমাধি সিদ্ধৌ যো দ্বিতীয় উপায় উক্তঃ, ইদানীং তমেবোপায়ং বিবৃণোতি-তজ্জপ ইতি । প্রণিধানং নাম দৈবরূপ ভাবনং তচ্ছি ওকারস্ত যথাবহুচ্চারণাৎ নাম্নং । অতএব সমাধি সিদ্ধয়ে যোগিনা প্রণবো জপঃ, তদর্থচ ভাবনীয়ঃ । তথা চোক্তং—পদব্যাখ্যানলোপমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায় মামনং । স্বাধ্যায়যোগ সম্প্রত্যাগমাস্মা প্রকাশতে ।

অন্তর্ভাঃ । স্বাধ্যায়াৎ প্রণবার্থ ভাবনাং যোগং আদীত প্রাপ্তুয়াৎ প্রণবার্থ-ভাবনা চিত্তলৈকাপ্রতা সম্প্রত্যা যোগস্ত সিদ্ধির্ভবতি, তথা যোগাদপি স্বাধ্যায়ং আমনং যোগস্ত সিদ্ধাবপি প্রণবার্থে চিত্তয়েদেব । যতঃ স্তুধ্যায়স্ত যোগস্ত চ সম্প্রত্যা সন্মেলনেন পরমাস্মা পদং ব্রহ্ম প্রকাশতে জ্ঞাতো ভবতীত্যর্থঃ ।

অনুবাদ । সেই ওকারের ব্যথানিরমে উক্তাংশই দৈবরাহুল্যলন ।

সমাধোচন । সমাধি লাভের প্রীতি দৈবের প্রণিধানরূপ বে উপায়াভ্যাস কথিত হইয়াছে এই হস্তে সেই প্রণিধানেরই স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে

মাত্র। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাধিকান আব কিছুই নয়, কেবল ওকারের বথানিয়মে উচ্চারণ এবং মনে মনে তাহার অর্থ পরিচিন্তন। উক্তরূপ ওকারের প্রতি-
নয়ত অপ দ্বারা, চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়, চিত্তের একাগ্রতাই যে
সমাধি সিদ্ধির কারণ, ইহা পূর্বে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়াতাবশ্চ ॥২১॥

পদার্থঃ। ততঃ, ততঃ, প্রত্যক্, চেতনা, অধিগমঃ, অপি, অন্তরায় অভাবঃ, চ।

পদার্থঃ। ততঃ ততঃ অপাৎ, তদর্থ ভাবনাং চ, প্রত্যক্ চেতনাধিগমঃ
প্রতি অকতি বিষয় প্রাপ্তিক্রমেণ স্বাস্তঃকরণাভিমুখং গচ্ছতীতি প্রত্যক্ তাদৃশী
যা চেতনা দৃশ্যবস্তুঃ জীবঃ তত্চা অধিগমঃ জ্ঞানং অন্তবাহাঃ বক্ষ্যমাণাঃ ব্যাধি-
প্রভৃতিরঃ সমাধিসিদ্ধৌ প্রতিবন্ধকীভূতাঃ তেবাঃ অভাবঃ শক্তিপ্রতিবন্ধঃ, চকার
সমুচ্চয়ার্থঃ।

অর্থঃ। ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমো ভবতি অন্তরায়াতাবশ্চ ভবতি।

ভাবার্থঃ। তত ঈশ্বরপ্রাধিকানং তদুপেক্ষিত জীবাশ্রয়জ্ঞানং বিষয়ভাগ-
শক্তিচ্চ চেতসি জায়েতে। তাত্ম্যমীশ্বর সাক্ষাৎকারো ভবতি। তেন
সাক্ষাৎকারেণ চিত্তৈকাগ্রতা তয়া অসংপ্রজ্ঞাতসিদ্ধিঃ। বক্ষ্যমাণানাং ব্যাধি-
প্রভৃতীনা মন্তরাগাণাং হানিচ্চ ভবতি।

অনুবাদ। সেই ওকারের রূপ এবং তাহার অর্থচিন্তন-রূপ ঈশ্বর প্রাধিকান
অভ্যাস কবিত্তে কবিত্তে জীবতত্ত্বের জ্ঞান এবং বক্ষ্যমাণ ব্যাধি প্রভৃতি অন্ত-
বাহ্যের বিনাশ হয়।

সমালোচন। ওকারের অপ এবং তাহার বাচ্য ঈশ্বর বিষয়ে চিন্তন
করিতে কবিত্তে ঈশ্বরের সহিত তুলনার দ্বারা জীবাশ্রয় ব্রহ্মরূপজ্ঞাত হওয়া দ্বারা
অর্থাৎ ঈশ্বর পুরুষ, জীবাশ্রয় পুরুষ, অতএব ঈশ্বর যেমন নির্মল, সর্বময়,
অন্ত সংশ্লেশ রহিত এবং সর্ব প্রকার উপসর্গ রহিত আমাদের জীবাশ্রয় ত
সেইরূপ; কেননা উভয়ই পুরুষ, উভয়েরই এক প্রকার স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ, এইরূপ
জ্ঞানের উদয় হয়। এইরূপ জীবতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে আপনা আপনিই মনে
উদয় হয় যে, আমরা যে এই সাংসারিক অনন্ত দুঃখভোগ, ইহা কেবল বিরুদ্ধের
সংস্রবে হইয়াছে। অতএব বিষয়বাগনা একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত।
বিষয়বাগনা পরিত্যাগ করিলেই চিত্ত স্থিরভাবে অবলম্বন করে এবং চিত্তবৈধীর
বিরকারী ব্যাধি প্রভৃতি আর তাদৃশ স্থির চিত্তকে বিচলিত করিতে সক্ষম হয়
না, তাহাদের বিরকারী শক্তির বিলোপ হয়। এইরূপ ক্রমে অসংপ্রজ্ঞাত

সমাধি সিদ্ধ হয় । কেহ কেহ বলেন, কেবল জ্ঞানের প্রণিধান দ্বারা নয়, পুরুষের উপায় অনুশীলন দ্বারাও চিত্তের একাগ্রতা হইলে এইরূপ ফল লাভ হয় । সেই চিত্তের বিক্ষেপকারী অন্তরাগুণগুলির নাম কি এবং তাহারা কত প্রকার ? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি নিম্নলিখিত সূত্রের উপস্থাপন করিয়াছেন ।

ব্যাধিস্ত্যান সংশয় প্রমাদালম্ব্যাবিরতি ভ্রান্তিদর্শনালকভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপান্তে হস্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

পদচ্ছেদঃ । ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলম্ব্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলক ভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাঃ, তে, হস্তরায়াঃ ।

পদার্থঃ । ব্যাধিঃ ধাতুবৈষম্যানিমিত্তো অরাদিঃ, স্ত্যানং চিত্তস্ত অকর্ষণাতা, সংশয়ঃ সন্দেহ উভযকোট্যাগমনং জ্ঞানং, যথা যোগ সাধোনবেত্তীতোবাং রূপং, প্রমাদঃ অননুষ্ঠানশীলতা সমাধি সাধনে ঔদাসীন্ত্য মিত্তি বাবৎ । আলম্ব্যং কায়-চিন্তায়োগরূপং, যোগবিষয়ে প্রবৃত্ত্যাবহেতুঃ । অবিরতিঃ বিষয়তৃষ্ণা, ভ্রান্তিদর্শনং শুদ্ধিকার্য্যং বজ্রতত্ত্ববদিত্তি বিপর্যায় জ্ঞানং, অলকভূমিকত্বং কূতচিন্তা নিমিত্তাং স সমাধিভূমেরলাভোহসম্প্রাপ্তিঃ, অনবস্থিতত্বং লক্কাবস্থায়ামপি সমাধিভূমৌ চিত্তস্ত তত্রাপ্রতিষ্ঠা । চিত্তং বিক্ষিপ্যতে এভি রিতি চিত্তবিক্ষেপকাঃ, তে এতে, সমাধেবেকাগ্রতবাঃ যথাযোগং প্রতিপক্ষত্বাং অন্তরায়া ঠেতি উচ্যন্তে ।

অর্থঃ । ব্যাধিস্ত্যান—অনবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপা ভবন্তি, তে অন্তরায়া ইতি চ উচ্যন্তে ।

ভাবার্থঃ । এতে হি ব্যাধি প্রভৃতিযো রজস্তমোবলাং প্রবর্তমানাশ্চিত্তং বিক্ষিপন্তি অস্থিরং কুরুন্তি ততশ্চ তে সমাধেবন্তরায়াঃ কথ্যন্তে । ইতি ভাবঃ ।

অনুবাদ । ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলম্ব্য, অবিরতি, ভ্রান্তি দর্শন, অলক ভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব এই নয়টিচিত্তের বিক্ষেপক অর্থাৎ চিত্তের স্থিরতা বিনষ্ট করে বলিয়া ইহাদিগকে সমাধি লাভের অন্তরায় বিঘ্নকারী বলা হয় ।

সমালোচন । ব্যাধি প্রভৃতিব অর্থ অবগত হইলেই এই সূত্রের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে । ব্যাধি—শরীরস্থ বাত পিত্তাদি ধাতু ও ইন্দ্রিয়ের বৈষম্য জনিত অরাদি রোগ ; স্ত্যান, চিত্তের অকর্ষণ্যাবস্থা ; সংশয় সন্দেহ, উভয় কোটি স্পর্শী জ্ঞান—উহা এই রূপ, কি এই রূপ ? এই উপায়ে সমাধি লাভ করা যাইবে কি না ? এই প্রকাব আন্দোলনের নাম সংশয়, প্রমাদ অনবধান, সমাধি

লাভের উপায় অমুঠানে অমনোযোগিতা বা হতশ্রদ্ধ ভাবে উপায়ের অমুঠান করা। আলম্ভ,—দেহ বা চিত্তের গুরুত্ব (ভার) নিবন্ধন সমাধি সাধনে অপ্ৰবৃত্তি। অবিরতি,—অবিশ্রান্ত বিবরণ তৃষ্ণা; ভ্রান্তি বর্ণন,—মিথ্যা জ্ঞান; যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে সেই রূপ ভাবে জ্ঞান—যেমন রজ্জ্বকে সর্প বলিয়া জ্ঞান, শুক্তিকে বজ্রত বলিয়া জ্ঞান, এবং যে বস্তুর সহিত আত্মার কোন সঙ্ঘর্ষ নাই তাহাকে আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান। অলব্ধ ভূমিকত্ব,—সমাধি ভূমির অপ্ৰাপ্তি অর্থাৎ বিস্তার যে অবস্থায় সমাধিলাভ হয় সেই অবস্থা পর্য্যন্ত না পৌছান। অনবস্থিতত্ব—সমাধি ভূমি লাভ করিয়াও তাহাতে স্থিতি হইয়া থাকিতে না পারা। এই নয়টি বজ্র-ও তম গুণ প্রভাবে প্রবৃত্ত হইয়া চিত্তেব স্থিতি সম্পাদনে বিঘ্ন করে বলিয়া ইহাদিগকে সমাধি লাভের অন্তরায় বলা হয়।

হুংখ দৌর্মনস্ত্রাজমেজয়ত্ব শ্বাস প্রশ্বাসাঃ

বিক্ষেপ সহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

পদচ্ছেদঃ। হুংখ, দৌর্মনস্ত্র, অজমেজয়ত্ব, শ্বাস, প্রশ্বাসাঃ, বিক্ষেপ-সহভুবঃ।

পদার্থঃ। হুংখঃ চিত্তস্ত রাগজঃ পরিণামঃ বাধনা লক্ষণঃ, যদ্বাধাৎ প্রাণিনি স্তমপঘাতায় প্রবর্ত্তন্তে, দৌর্মনস্ত্রঃ বাহ্যভক্তিরৈঃ কারণৈর্মনশোভুত্বা, অজমেজয়ত্বঃ—সর্বাঙ্গানাং বেপথুঃ, আসনস্থৈর্য্যবোধকঃ। প্রাণোয়দ্বাং বায়ুমাচাষতি সঃ শ্বাসঃ। যৎ কোষ্ঠ্যং বায়ুং নিঃসারয়তি স প্রশ্বাসঃ। ত এতে বিক্ষেপৈঃ সহ ভবন্তীতি বিক্ষেপ সহ ভুবঃ।

অন্বয়ঃ। স্পষ্টম্।

ভাবার্থঃ। পুরোক্তৈর্ব্যাধিপ্ৰভৃতি চিত্তস্ত বিক্ষেপে সতি হুংখাদীশ্চপি সমুত্তবন্তীত্যর্থঃ।

অনুবাদ। হুংখ, দৌর্মনস্ত্র, অজমেজয়ত্ব, শ্বাস এবং প্রশ্বাস এই কয়টি চিত্ত বিক্ষেপের সহিত সমুৎপন্ন হয়।

সমালোচন। হুংখ কি ইহা বোধ হয় সংসারী ব্যক্তিকে বুঝাইবাব আবশ্যক নাই, কারণ তাঁহারা প্রতিপদেই উহার অনুভব করিয়া থাকেন; দৌর্মনস্ত্র বলিতে মনের অন্তঃস্থতা, অজমেজয়ত্ব বলিতে শরীরের কাঁপনি, শ্বাস বাহ্য বায়ুর গ্রহণ, প্রশ্বাস আভ্যন্তরীণ বায়ুর নিঃসারণ। এই কয়টি চিত্তের বিক্ষেপের সহিত উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ পুরোক্ত ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা যে কেবল

চিত্ত অস্থিৰ ইব মাত্র তাহা নহে, চিত্তের অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে হঃখাদিও উৎপন্ন হয় ।

তৎ প্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ।

পদার্থঃ । তৎ-প্রতিষেধ-অর্থঃ একতত্ত্ব-অভ্যাসঃ ।

পদার্থঃ । ১. তেষাং (পূৰ্ব্বোক্তানাং বিক্ষেপাণাং) প্রতিষেধার্থং নিষেধার্থং একতত্ত্বাভ্যাসঃ একস্মিন্ (যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ) তত্ত্বে অভ্যাসঃ চিত্তস্ত পুনঃ পুনর্নিবেশনম্ ।

অন্বয়ঃ । ক্রিয়ৈতেতিশেষঃ ।

ভাবার্থঃ । যৎকিঞ্চিদভিমতং বস্তু ধ্যায়ঃ চিত্তং তান্ বিক্ষেপান্ প্রতি-
রুদ্ধাৎ ।

অনুবাদ । চিত্ত কোন এক অভিমত বস্তুর পুন পুন ধ্যান করত ঐ পূৰ্ব্বোক্ত বিক্ষেপকাণীদিগের কান্যকাবিতা শক্তিব বোধ করিবে ।

সমালোচন । যোগচাধ্যায়িগেব মতে চিত্ত একই কিন্তু অনেক বস্তুগামী । চিত্ত অনেক বস্তুগত হয় বলিয়া ইহা চঞ্চল । চিত্তের এই চাঞ্চল্যই আমাদের হঃখাদিব কারণ । সূত্রবাং অনর্থের মূল চিত্তের এই চাঞ্চল্য দ্বাৰা কে কোন মতে ঘূচাইতে পারিলে আমবা হঃখাদিব হাত হইতে মুক্ত হইতে পারি । এই সূত্রে সেই চাঞ্চল্য দ্বাৰা দূর কবিবাব উপায়ই বলা হইয়াছে । উহা এক তত্ত্বাভ্যাস—যে কোন একটি তত্ত্বে চিত্তের সংযোগ করিয়া প্রতিনিয়ত অনুশীলন দ্বাৰা ঐ সংযোগেব দৃঢ়তা স্থাপন । ইহা আমবা পূৰ্বেই বলিয়াছি যে, চিত্তের সম্মুখে যে বস্তু আসিয়া উপস্থিত হয়, চিত্ত সেই বস্তুর আকারে পরিণত হয় । অতএব চিত্তেব সহিত কোন এক বস্তুব সংযোগকে দৃঢ় করিয়া রাখিতে পারিলে চিত্ত সেই একই প্রকাৰ আকাৰে অবস্থান কবে । কাথ্যেই উহার চাঞ্চল্য ভাব দূরীভূত হয়, কাবল নানা আকাৰে পরিণত হওয়াই চিত্তের চাঞ্চল্য । এই চাঞ্চল্য ভাব দূরীভূত হইলে ইহা একাগ্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন আর কিছুতেই বিচলিত হয় না । শরীবের ধর্ম ব্যাধি প্রভৃতি সময়ে সময়ে উৎপন্ন হইলেও তজ্জন্ম হঃখাদির অনুভব না হওয়ায় চিত্ত স্থির অবস্থাতেই অবস্থিত হয় ।

এই-সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যাকার “চিত্ত কণিক এবং অনেক” ইত্যাদি বোধ মত খণ্ডন কবিয়া চিত্তেব একত্ব নিদ্ধ করিয়াছেন । আমবা এ স্থলে সে সকল বিচ্যেবের বিশেষ উপযোগিতা বোধ কবিলাম না বলিয়া পরিত্যাগ কবিলাম ।

গঙ্গা ।

“মা গো, কি হ’বে আমার ।”

গভীর নিশীথকাল স্তব্ধ চাৰিধাব,
জগতের জীব জন্তু স্তব্ধ নিদ্রাকোলে,
স্বমুদ্র গভীর বাজে ‘প্রণব ওঙ্কার,’
বিশাল সংসার ভাসে শান্তিৰ হিল্লোলে ।

হেন কালে যুবা এক ভাগীবথী তীবে,
জুড়াইতে সন্তাপিত হৃদয়-অনল,
‘আকাশ পাতাল’ ভাবে ভাসি আঁখি নীবে,
অহুতাপ তাহে মিশি ঢালে চলাহল ।

ভয়-ক্রমে অভাগাব রশ্মিক দংশন,
দীর্ঘ শ্বাস পলে পলে শোষিত শোণিত,
কিপ্ত সম শূন্য দৃষ্টি, শূন্য চ’নমন,
লক্ষ্য ভ্রষ্ট, দিশে হানা, আপনা বঞ্চিত ।

ভূত ভাবী বর্তমান স্রবি’ মনে মনে,
ভাববহ জীবনেব ভীষণ বিকাব,
সহসা পাবাণ ভেদী করুণ-ক্রন্দনে,
জানাইলা মহামায়ে—“কি হ’বে আমার !”

“মাগো, কি হ’বে আমার ।”

মজলময়ী মা তুমি অতি মৃদু হীন আমি
পাপ অবতাব হেয় খল ছবাচাব,
তাই তব হিতবাণী মনে কি হু নাহি মানি,
অসীম পাপ অর্গবে দিগেহি সা তাব ।

বর্গ স্বথ আশে মাতি অসার আমোদে নিতি
হৃদয় নরক-কুণ্ডে দি’হি অঙ্গ ঢেণে,

অস্তব-যামিনী মাত কিবা তব অবিদিত
কি না জান তুমি—তবে কি ফল লুকা'লে ?

কুল—সীমা বিবর্জিত স্মদূর এ মহা শ্রোত
কেমনে হ'ব মা পাব ব'লে দে উপায়,
দিক্ হাবা পথিকের *লক্ষ্য ভ্রষ্ট বিহঙ্গের
নিদারুণ ছুঃখ-বাণী না মিলে ভাষায়,
তেমতি এ অভাজন মা গো নিকপায় ।

নিত্য জ্ঞানে অনিত্যেবে কবিয়া আশ্রয়,
আমাব আমাব ব'লে সংসারের গণ্ডগোলে
মত্ত ছিহ্ন দিবা নিশি ঐহিক-চিন্তায়,
বিশাল সংসার মাঝে কেন এহু কিবা' কাজে,
না ভাবিহু একবার মজিষে মায়ায় ।

এবে ঘোব তমোজাল ঘিবিয়াছে মহাকাল
বুঝেছি মা এত দিনে তোমাবি রূপায়,
সংসার এ পাবাবাব কেমনে মা হ'ব পাব
বিনে তব রূপা তবি ত্রিপদ-সহায়,—
তুমি না বক্ষিলে মাগো কে বাথিবে হায় !

ওই গুন ভীমববে গর্জিছে জলধি,—
চপলা বিকট হাসি' উজলিছে দশদিশি,
মুহূর্হ বজ্রনাদে কাঁপিছে হৃদয়,
তরঙ্গ হিল্লোল উঠে স্মদূর আকাশে ছোটে
চক্রে সূর্য্য গ্রহ তাবা একাকাব মথ ।

কালের করাল-ছায়া —না, ওই ভীষণ কাষা
ক্রমে আসে আগুসবি গ্রাসিতে আমায়,
'মাইভ মাইভ' ববে সাঙ্ঘনা কব মা সবে
প্রকৃতিবে প্রকৃতিহু কব এ সময় ।

(নচে) দেহ-তবী ডুবে বাথ আয়ু-বায়ু হয় ক্ষয়,
 'ভেলায় ভরসা' বল থাকে কতক্ষণ,
 কোথা যাব কি কবির (এ) অকুলে কি কুল পা'ব
 অনন্ত অপাব এ যে দ্বিধিদিক হীক,—
 নাবকীর পরিণাম ! কি তীষণ দিন !
 ইহ পব উভলোক গভীর আঁধার,
 তবে কোথা যা'ব, মাগো, কি হ'বে আমাব ?

সহসা হৃদয়-যন্ত্র হইল নীবর,—
 জীবন্ত-উচ্ছ্বাস-গাথা প্রকাশি' অন্তর বাথা
 উদ্বেগিত হৃদয়েব অধীর আবেগে,
 পূত-ভাগীবথী জলে আশ্র বসজ্জন কালে
 জাহ্নবী ভক্বেব হাত ধবিলেন বেগে ।

সহসা উজ্জল-জ্যোতি প্রকাশি' অপূর্ণ ভাতি,
 উজলিল দশদিশি অপূর্ণ শোভায়,
 স্নগন্ধে পূবিল স্থান মাষেব মধুব তান
 সঞ্জীবিল অক্লমৃত অভাগা যুবায,—
 কবির কল্পনা-ভেলা তাহে ডুবে যায় ।

"সম্বাদি-হৃদয়-বাথা দেখ চেখে আমি হেথা
 সাম্বনা কবিতে তোবে এসেছি বাছনি,
 আর ভয় নাই তোব, ককণা পেলি বে মোব,
 ভবাবগেব কর্ণধার আমি বে শিবাবী ।

অমৃতাপী যেই জন ডাক মোবে অমুকণ
 তাজি' ভোগবিলাসিত! নম্বর কামনা,
 প্রায়শ্চিত্ত অবসানে কঠোর জ্ঞাপস্তাওনে
 অবশ্রাই লভে সেই আমাব করুণা ।

জ্ঞান-চক্ষু লও এবে তিতিক্ষা বিবেক,—
 বিশাল এ কার্যক্ষেত্রে যেন নাহি কোন হত্রে,

শ্লিষ্ট-চরণ হও কর্তব্য তুলিয়ে,
মোহিনী মোহেব রশে পৈশাচিক রক্তরসে
মজনা মজনা আর আপনা হাবারে ।
হির-লক্ষ্যে ধীর মনে আপনাব পথপানে
যাও চলি—অবহেলি' মায়া প্রলোভন,—
বিবেক-রূপাণে কাটি সংসার-বন্ধন ।

সাস্বনা অভয়-বাণী দিতেছি তোমার আরি
যাও বৎস যাও গৃহে নাহি কোন ভয়,
নব-জীবন-প্রভাবে ললিত মধুব বাবে
তোন তান—ভক্তিগান মাতাও সবার,
অক্ষয়-সুকীর্তি লভ বিশাল-ধবায় ।”

বীণা বিনিমিত-বাণী কহিতে কহিতে,
জাহ্নবী মিশায়ে গেলা জাহ্নবীজীবনে,
চিত্রাপিত স্থবনেয়ে সবিস্ময়চিত্তে—
দাঁড়ায়ে রহিল। যুবা আপনাব মনে ।

শ্রীহাবণচন্দ্র যক্ষিত ।

গঙ্গা স্তব ।

গঙ্গিনী বেহাগ—ভাল একডালা ।

- ১ । গঙ্গে । চলেছ মা কোথায় ।
থাক থাক থাক থাক অগণকাল নিবেদিব কিছু তব পায় ॥
- ২ । হেরিলে তোমার মুরতি সুন্দর,
নিরমল জল, অতি মনোহর,
পরিলে পাপী তাপী নারী নর, ব্রহ্ম পদ পায় ।

৩।

শ্রীশ পাদ রজ্জো বিহারিনী,
সতীশ কামিনী, শৈলেশ নন্দিনী,
সুরেশ বাবণ-পার্বিনী,
কত হুগম নগর তীরে খাড়া হল,
তোমারই প্রেতাপে গেল রসাতল,
কার সাধ্য বল, কাব্‌ এত বল,
রাখে চিহ্ন তব গায় ॥

৪। নগেন্দ্র পাদ ধুইয়া ধুইয়া, প্রসন্ন মনেতে চলিছ ধাইয়া,
আপন ভাবে আশনি মাতিয়া, উন্মাদিনী ;
দর্পিত ভরে অঙ্গ হেলাইয়া, তবঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া চলিয়া,
ছুটিছ নাচিয়া, হাসিয়া খেলিয়া,
দুঃপাত নাহি কার ।

৫।

কোণাঘ কংসারি দাবকাধিপতি,
কোথা বামচন্দ্র বীর-মহামতি,
কোথা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সন্ততি, কোথা পৃথুবার ;
অনমিল কত আমীর বাদসাহ,
ভূমে কীর্তি রাখি তেয়াগিল দেহ,
তোমারে শাসিতে নিবাবিতে কেহ, নারিল ধবার ॥

৬।

হাস্তব কুস্তাব কচ্ছপ মকর,
মৎস্ত আদি কত শত জলচর,
আশ্রয় লইয়া তোমাব ভিতর, সুখে ভাসি যার ;
কত নদনদী তোমাতে মিশিল,
পরশিয়া অঙ্গ পবিত্র করিল,
আহা কি মধুর বিগুজ সলিল, তুলনা নাহিক তার ।

৭।

পতিব্রতা সাধবী কতই সুন্দরী,
ভারতের কোটি কোটি নর নারী,
পান করি তব সুবিমল বারি, কত সুখ পায় ;
অবগাহ করি তোমাব সলিলে,
মাতর্গঙ্গে বলি তোমাব মঞ্জিলে,
পতিত পাবনী পাপ নাশিলে, নবীন জীবন পায় ॥

৮।

প্রবোধ সুধীর-পাপিষ্ঠ দুৰ্জ্জন,
 পুণ্যধারা সবে কর বিতরণ,
 রাজায় প্রজায় সম আচরণ, ক্ষীবোধ স্তম্ভকারিণী ;
 তব তীরে যতি যোগেতে মগন,
 সমীরণ করে চামর-বাজন,
 তবঙ্গ কি রব করে অহুঙ্কণ, বুঝি হরিগুণ গায় ।

৯।

বরষায় ধর ফলিত কলেবর,
 ভাবে গদ গদ প্রফুল্ল অস্তব,
 শবতের বেলা দেখি ভাবাস্তব, শীতে মাগো শীর্ণ কায় ;
 গ্রীষ্মে দেখি অস্থি চন্দ্রসার ময়,
 কেন মাত ক্রমে হইতেছ ক্ষয়,
 প্রবোধ না মানে ব্যাকুল হৃদয়, দুঃখে বুক ফেটে যায় ॥

১০।

প্রবল ভূজপাতি তোমার উপর,
 নিরমিল সেতু এতকাল পর,
 বসাইল স্তম্ভ বৃক্কেব ভিতব, তাই বুঝি অভিমানে ;
 অশান নিবাসী পতির সঙ্কানে,
 চলিয়াছ দেবি তবঙ্গ তুফানে ;
 ভাবত অশান তবে বল কেন, ছাড়িয়া যাইবে হায় ॥

শ্রীশরচ্ছন্দ মঞ্জুদার ।

পশুপতি ।

“মৃণালিনীতে” পশুপতিব বৈ জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহা মোটামুটি চারি ভাগে বিভাগ করা যায় । প্রথম ভাগে পশুপতিব সংক্ষিপ্ত পূৰ্ব পৰিচয়, দ্বিতীয় ভাগে পশুপতিব ছবাকাজ্ঞা, সদ্ভূতির সহিত সেই ছবাকাজ্ঞার বিবোধ এবং পৰিণামে ছবাকাজ্ঞাব জয় ; তৃতীয় ভাগে সেই ছবাকাজ্ঞা পৰিতৃষ্টি জন্ত পশুপতিব কাৰ্য্যক্ষেত্রে অবতরণ ও কাৰ্য্যের পরিণাম এবং চতুর্থ ভাগে পশুপতির পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে ।

প্রথমভাগ ।

পূৰ্ব পৰিচয় ।

পশুপতির পূৰ্ব পৰিচয় অতি সংক্ষিপ্ত । গ্রন্থকার ৩৪ ছত্রে তাহা পাঠক-বৰ্গকে জ্ঞাত করাইয়াছেন । কিন্তু তবু তাহা জানা আবশ্যক । সেই ৩৪ ছত্রেব মধ্যেই একটি কাব্য-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে । পরিচয়টি এইরূপ :—

“পশুপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথা, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না । কথিত ছিল যে, তাঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন । পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধি বিদ্যার প্রভাবে গৌড় রাজ্যের প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।”

পশুপতির আকৃতি বর্ণনাও এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

“পশুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে । তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ । তাঁহার শরীর দীর্ঘ, বক্ষ বিশাল, সর্কাজ অস্থি মাংসের সংযোগে সুন্দর । তাঁহার বর্ণ তপ্তকাক্ষন সন্নিভ ; ললাট অতি বিস্তৃত, মানসিক শক্তির মন্দির স্বরূপ । নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত, চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু অসাধারণ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন । মুখকান্তি জ্ঞান গাভীর্য্য ব্যঞ্জক এবং অমুদিত বিদ্যামুদানজনিত চিন্তার গুণে কিছু পুরুষতাব ব্যঞ্জক ।”

ইহার পরে পশুপতির বিবাহের কথা যোগ করিলেই পূৰ্ব পরিচয়টি শেষ হয় ! সে কথা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে । এ স্থলে এখন ইহাই বলা আবশ্যক যে এই পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত পশুপতি পত্নীসহবাসে বঞ্চিত ।

এইরূপ পূৰ্ণ পরিচয়টি পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম—পশুপতি প্রথমে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় লোক ছিলেন। উন্নতির পরে উন্নতিতেই তিনি ধর্মাদিকার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কথাটি পড়িয়াই মনে হইল, গ্রন্থকার অনর্থক এ পরিচয়টি প্রদান করেন নাই। এরূপ পূৰ্ণ পরিচয়ে তাঁহার যথেষ্ট কৌশল প্রকাশিত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা পশুপতিব. গুণগরিমা পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই স্থির কুরিয়া, তৎপরবর্তী পশুপতিব আকৃতি বর্ণনা পাঠ করিলাম। দেখিলাম সুন্দর একটি রাজনৈতিকের আকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। রাজনৈতিকের কথা মনে হইলেই তৎসঙ্গে আরও দুই একটি কথা মনে হয়। ভরসা করি, ঊনবিংশতাব্দীর পাঠকবর্গ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। একে রাজনৈতিক, তাহে চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, মনে মনে পশুপতির সন্মুখিত্রে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। পূর্বের তথ্যটিও এই সন্দেহ নিরাকরণ না করিয়া বরং পরিবর্দ্ধিত করিল। আমরা সন্দেহটিতে পশুপতির কার্যাবলী পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেকক্ষণ পরীক্ষা কবিতো হইল না। অল্প পরেই সব বুঝিলাম—বুঝিলাম যে, বিশ্বাসঘাতক, শরণাগত অতিথির প্রাণগ্রহণে প্রস্তুত, প্রতাপালক প্রভুর রাজ্যাপহরণাভিলাষী, কূটবুদ্ধি, সূচতুর পশুপতি সম্বন্ধে কথাগুলি বড়ই সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। চাবিদিকে দৃষ্টি পড়িল—কত জীবন্ত ঘটনা স্থিতি পথে উদ্ভিক্ত হইল; দেখিলাম, এইরূপ নীচাবস্থা হইতে যাহাবা ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া থাকে, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা ফলবতী করিয়া, যাহাবা ক্রমে বড় হইয়া উঠে, এরূপ কুমতি তাহাদের পক্ষে হওয়া অসম্ভবপর নহে। অনেক স্থলেই এরূপ ব্যক্তিকে শেষে আশার স্বর্কশেষ সোপানে অধিরূঢ় দেখিতে পাওয়া যায়—উন্নতিপ্রদাতা প্রভুর সর্কনাশে প্রবৃত্ত দেখা যায়। ইতিহাসও এইরূপ। এইস্থলে মাক্বেথ-কাহিনী মনে পড়িল—সেখানেও প্রায় এই কথা। মাক্বেথে সেই ডাকিনীগুলার অবতারণে ও ক্রমিক পদোন্নতিতে মাক্বেথেব হুশাশা পবিবর্দ্ধিত; ঘটনাগুলি কিছু জাঁকাল, এখানে এই তিন চারি ছত্রে পশুপতির হুশাশা ক্রমশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা—কৌশলে ও সংক্ষেপে পরিব্যক্ত। আমাদেরিগের কবি এতদূর মেই হুশাশা সঞ্চারের কারণ বর্ণন জন্ত কোন ঘটনাও সৃষ্টি করেন নাই, কোন বিশেষ কথাও বলিয়া দেন নাই। ইচ্ছিতে কার্য শেষ করিয়াছেন। মাক্বেথের সহিত ইহাব তুলনা কবিতোছি না, কারণ এখানে মাক্বেথের কবিত্ব যাহা চেষ্টা, আমাদেরিগের কবির ঠিক সেইরূপ চেষ্টা নহে—আমরা কবিত্ব

কৌশল মাত্র প্রদর্শন করিলাম। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল, না জানি একরূপ কত সারগর্ভ হুন্সর কথা আমরা উপেক্ষা করিয়া বাইয়া থাকি। বাহারী এত ভাবিয়া লেখেন, তাঁহাদের গ্রন্থ জ্ঞামরা ভাবিয়া পড়ি না কেন ?

পশুপতির বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চত্রিংশ বৎসব। পূর্ণ যৌবন। কিন্তু এই পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত পশুপতি পত্নী সহবাসে বঞ্চিত। ব্রাহ্মচর্য্য প্রতিপালনে একরূপ হয় নাই—বাল্যকালেই পশুপতির বিবাহ হইয়াছিল। ‘ধন’ মর্য্যাদার অভাবে একরূপ ঘটে নাই, পশুপতি গোড়ের সর্ব্বপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত। বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত ও পাপ প্রণয়াসক্ত বলিয়া পশুপতি এ কাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। পশুপতি হিন্দু সন্তান, জাতিতে ব্রাহ্মণ—মনোরমা নাম্নী বিধবা বলিয়া পরিচিতা একটি কামিনী তাঁহার প্রণয়ভাগিনী। কবি এখানেও পশুপতিকে পাপমতিপরায়ণ এবং কুটুবুদ্ধিপ্ররত করিয়া পাঠক-বর্গ সমীপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এখনকার অবশিষ্ট বক্তব্য এই যে, একরূপ লোকের সুপত্নী হইলে (মাক্বেথেব মত পত্নী নহে) যেটুকু হুন্সল প্রত্যাশা করা যায়, তাহাও আমরা আশা করিতে পারিলাম না। চূর্ত্যাগ-ক্রমে পশুপতি সেকরূপ সুপত্নী হইতে বঞ্চিত—সুপত্নী থাকিয়াও তাঁহার পক্ষে ছিল না। হায় বে হুসদৃষ্ট !

দ্বিতীয় ভাগ।

হুশাশার সঞ্চার—সম্ভূতির সহিত হুশাশাব বিরোধ—

আত্মপ্রতারণা—হুশাশার জয় লাভ।

এই দ্বিতীয় ভাগে পশুপতি একটি ভয়ঙ্করী হুশাশা লইয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই হুশাশার প্রথম সঞ্চারের কথা বা তাহার ক্রমবিকাশের কথা, আমরা গ্রন্থ মধ্যে বড় একটা দেখিতে পাই না। বাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। কিন্তু সেটা ইঙ্গিতে সম্ভাবনা ব্যক্তি মাত্র—বিশেষ কোন কথা নহে। আর যাহা কিছু আছে, পরে প্রসঙ্গ-ক্রমে বলা যাইবে।

“যবন সহযোগে বৃদ্ধ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইব,”—এই আকাঙ্ক্ষা লইয়াই পশুপতি এখন আমাদিগের সমীপে উপস্থিত। মুসলমান চরের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন শেষ হইয়া গিয়াছে—ষড়বসন্তও একরূপ

সুস্থির হইয়া গিয়াছে। এ তাবৎ পশুপতির হৃদয়ে কোনরূপ সংঘর্ষের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পাইলাম না। কিছু যে পাইলাম না, এমত নহে—মহম্মদ আলীর সহিত কথোপকথনে পশুপতির ইতস্তত ভাবটা স্পন্দরূপেই পৰিস্ফুট আছে—কিন্তু ইহার পরে যাহা দেখিতে চাইলাম, তাহা পাইলাম না। মনের কথা গোপন করা রাজনীতিজ্ঞের একটি প্রধান গুণ। তাই কবি প্রথমে এটা খুলিয়া দেখান নাই। কিন্তু ইহার পরে দেখ—পশুপতি মুসলমান চবকে বিদায় দিয়া, স্বীয় স্থাপিত অষ্টভূজা প্রতিমাগ্রে যুক্ত করে ত্ততি কবিতা কহিতেছেন।—

“জননি! বিশ্বপালিনি! আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—দেখিও যা!
উদ্ধার করিও। আমি জননীস্বরূপা। জন্মভূমি দেবদেবী যবনকে বিক্রয় করিব না। কেলবমাত্র এই আমার পাপাভিসন্ধি যে, “অক্ষয় প্রাচীন রাজার স্থানে আমি রাজা হইব। যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধাব করিয়া উভয় কণ্টকে দূরে ফেলিয়া দেয়, তেমনি আমি যবন-সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্য সহায়তায় যবনকে নিপাত করিব। ইহাতে পাপ কি মা! যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজাব মুখামুঠান কবিতা সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। জগৎ প্রসবিনি! প্রসন্ন হইয়া আমার কামনা সিদ্ধ কর।”

ইহাই পশুপতির দ্বাশাব সহিত সঙ্ঘটিত সংগ্রাম। বাজনৈতিক অনেক কথা কহে না—তাই কথাগুলি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু কত অর্থ যুক্ত। কথাগুলি হৃদয়ের দুই দিকই কেমন স্পন্দর দেখাইতেছে। পশুপতির উপযুক্ত কথা বটে। -

আমরা যে সকল কথা বৃহদাকারে মুদ্রিত করিয়াছি, তাহা বিশেষ অর্থযুক্ত। সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায় না, তবু দুই একটি কথা বলিব।

পশুপতি স্বদেশভক্ত—জন্মভূমি তাঁহার নিকট মাতৃস্বরূপ। পশুপতি দেবভক্ত—স্বয়ং অষ্টভূজার মূর্তি স্থাপন করিয়া নিত্য তাঁহার অর্চনা করিতেন। যবনের বিশেষণে তিনি ‘দেবদেবী’ বিশেষণটিই প্রয়োগ করিতেছেন। এ সকল কথা দ্বাশাব সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। আবার অঙ্কুরোৎপাদন একটা চাপা কথা আছে। রাজা অক্ষয়, প্রাচীন। যে রাজ্যরক্ষণে অশক্ত, বিপ্লব সময়ে তাহাকে রাজা রাখা ঠিক স্বদেশভক্তের সমস্ত কার্য্য নহে। তিনি রাজ্যরক্ষণে পটু, তবে তাঁহার রাজ্য হওয়াতে দোষ কি? কথাটি বলিয়া পবকণ্ঠেই আবার পশুপতি

দোষ বৃত্তিতে পারিলেন। যবনের সাহায্যে রাজালাভ—যবনের অধীনে মাতৃভূমি রাখা! আবার তাহা দূর হইল। বেকরূপ কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলে, পশুপতি সেইরূপ যবন সহায়তায় রাজালাভ কবিত্তা রাজ্য সহায়তায় যবন দূর করিবেন। ইহাতে পাপ কি? কিন্তু তবু যেন পশুপতির মনে হয়, এতে পাপ আছে। তাই পশুপতি বলিতেছেন, যদি ইহাতে পাপ হয়, সে পাপ তিনি প্রজাবল্লভ করিয়া ক্ষয় করিবেন।

পাঠক এখন দেখ দেখি, এই কয় ছন্দে পশুপতি কত কথা বলিয়াছেন। রাজনৈতিকের উপযুক্ত বাক্য নয় কি? সাবধানতা ও কৌশল দেখ!

আরও একটি কথা। পাঠক, সেক্ষপীয়রের মাক্বেথকে দেখিয়াছ, একবার এই হিন্দু পাণ্ডাকে দেখ! গোড়াতে মাক্বেথকে আমরা ভাল লোকই দেখিয়াছি, কিন্তু কই, তাহার পাপাচরণের সময়ে বা প্রাবল্লে এরূপ ত কিছু শুনিতে পাইলাম না। কারণ পবিত্রাব—মাক্বেথ হাজার হউক স্নেহ—আব পশুপতি হিন্দু।

হিন্দুপানী প্রায়ই ধর্মের নিকট একটা জবাব না দিয়া পাপে প্রবৃত্ত হইতে পাবে না। হিন্দুর ডাঁকুত কালী পূজা না কবিত্তা ডাঁকুত কবিত্তে যাব না। হিন্দুর হিংস্রক পরের অবনতিব জন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। এত ধর্মভর ত অজ্ঞ জাতিতে দেখিতে পাই না। ইহাব কি কোন কারণ নাই? আছে বই কি। হিন্দুর ধর্মচর্চা এক দিন উন্নতিব চরমসীমায় উঠিয়াছিল—হিন্দুর ধর্ম এক দিন হিন্দুব রক্তমাংসে জড়িত হইয়াছিল, তাই পড়িতে পড়িতেও হিন্দুর ধর্মভাব রহিয়া গিয়াছে। হিন্দুব ধর্মভাব এখন দূষিত হইয়াছে সভ্যতা, কিন্তু সে ভাব এখনও বিদূষিত হয় নাই। এখনও হিন্দু পাপকার্য্য ধর্মের ভাণে করে—এখনও হিন্দু পাণ্ডী পাপাচরণেও ভগবানকে ডাকে। এটি ভাল কি মন্দ—কে বলিবে। আব তাহা বলিবাব স্থানও স্বতন্ত্র, লোকও স্বতন্ত্র। আমরা এখন এই মান দেবাইব যে, পশুপতিব এই ধর্মের ভাণ বা আশ্রয় প্রত্যারণের চেষ্ঠা, কই কাত্যাবিক। দেহবশে পশুপতিকে কবি এইরূপ চিত্তাধিকারী করে নাই—যাহা হইয়া থাকে, বাঙ্গালীর চিত্তে বেকরূপ দেখিয়া থাকি—রোহিণী রূপ-প্রমত্ত রোহিণীভোগাকাজ্ঞা গোবিন্দলালের অধঃপতনের পূর্বে যাহা দেখিয়াছি, বিধবা কুন্দনন্দিনী বিবাহেচ্ছ নগেন্দ্রনাথকে বিবাহের পূর্বে বেকরূপ দেখিয়াছি, এও সেইরূপই দেখিলাম। “পাণের প্রথম সোপানে পদার্থগণ কবিত্তা, পূর্ণাঙ্গাও এইরূপ করে।” এইরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি,

বর্ষাদর্শ, স্মৃতি কুমতি, সংগ্রামে অনেক স্থলে প্রকৃতি স্মৃতিও জয়লাভ করে না, প্রকৃত কুমতিও জয়লাভ করে না,—জয়লাভ করে স্মৃতিরূপা কুমতি ।

“যদি ইহাতে পাপ হয়, ব্যবজীবন প্রকার স্থানান্তর করিয়া ত্রৈলোক্যে প্রারম্ভ করিব ।” এ কথাটাও হিন্দুপাণীর কথা । শত সহস্র হিন্দু পাণী আজ এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া পাপাচরণ করিতে যাইতেছে । শিক্ষিতের প্রবোধ একরূপ, অশিক্ষিতের অরূপ । অশিক্ষিত “গঙ্গানানে পাপ যাইবে” স্থির করিয়া পাপাচরণ করে, শিক্ষিত ঐক্য আর কোন একটা সুখিত অবলম্বন করিয়া পাপান্তরানে রত হয় । হায়, কে কবে এই ভ্রান্তির রহস্য সমুদঘাটন করিবে ? চুরি করিয়া টাকা আনিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে কি অপহরণ দোষ নষ্ট হয় ? পশুপতি এইটি বুঝিতে পারিলেন না । তিনি বুঝিমান, কিন্তু এখানে বড়ই ভুল বুঝিলেন ।

এখন সব জড়াইয়া একবার ভাবিয়া দেখেদেখি, হুবাশা প্রেতিনী গর্ভিত স্নেহে এখানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে কিনা—

“সুন্দরকে মন্দ ভাবি, মন্দকে সুন্দর

বদ্‌ হাওয়া কুয়া দিয়া ফিরি নিরন্তর ।”

মহম্মদ আলীব নিকটে যখন পশুপতি ঐরূপ ষড়যন্ত্রের কারণ ব্যাখ্যা করিলেন, তখন দেখিলাম, পশুপতি সমাজকেও বিলক্ষণ ভয় করিয়া ফলেন । যেমন ধর্মের জন্ত একটা ব্যবস্থা করিতে হইল, সমাজের জন্তও তাহাকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইল ।

তৃতীয় ভাগ ।

সঙ্কল্পস্থির—কার্য্যারম্ভ—নূতন প্রতিবন্ধক (মনোরমা)—প্রতিবন্ধক তিরোহিত—কার্য্যের পরিণাম (অতঃপতন) ।

পাপে পাপ বৃদ্ধি করে । একটা মিথ্যা কথার দশটি মিথ্যা কথা কহায় । আমাদিগের কবি অল্পের লিখিয়া গিয়াছেন—যে রূপ জড়জগতে, মাধ্যাকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতিবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ অন্তর্জগতে পাপাকর্ষণে প্রতি পাপে পাপীশ্বর, পাপকামনা পরিবর্দ্ধিত হয় । সঙ্কল্প সম্যক স্থস্থির হইতে না হইতেই পশুপতি শরণাগত, উপচিকীর্ষু, অতিথি রাজকুমার, হেমচন্দ্রকে গোপনে হত্যা কবিবাব জন্ত স্বীয় অশুচর শাস্ত্রশীলকে অশুভ্রা প্রদান করিলেন ।

সকল স্থির হইলে, আবার এক নূতন প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইল । সে প্রতিবন্ধক—মনোরমা ।

আমরা এই স্থলে পশুপতি-মনোরমা সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা বলিয়া লইব ।

পশুপতি-মনোরমা সম্বাদ কবির আশ্চর্য কাব্যচাতুর্য প্রকাশিত করিতেছে । মনোরমা ফুটিয়াছে পশুপতির জন্ত, আবার পশুপতিও খানিকটা ফুটিয়াছে মনোরমার জন্ত । পশুপতি-মনোরমা উভয়ই ফুটিয়াছে, মনোরমার পূর্ণশরির জন্ত । পশুপতি-মনোরমার সেইরূপ বিবাহের পরিণাম, মনোরমার বিধবাবেশে অবস্থিতি, ও বিধবাভাবে তৎপ্রতি পশুপতির আসক্তি ইহাতেই সব ফুটিয়াছে । পশুপতির দ্রুদৃষ্ট, তাই পত্নী প্রতি তাহার আশক্তিতেও পাপ হইল প্রসব করিল । পাপটা মনে কি না—তাই ।

মনোরমার প্রতি পশুপতির অত্যাশ্রয় কিরূপ প্রবল, কবি তাহা স্বয়ং না বলিয়া একটি কোশলে ব্যক্ত করিয়াছেন । যখন সব স্থির হইয়াছে, যখন পশুপতি ইষ্টদেবীকেও সাস্থনা করিয়াছেন ভাবিয়া মনের সকল স্ফূট করিয়াছেন, তখন পশুপতি শয্যাগৃহস্থারে দেখিলেন—“অপূর্বদর্শন—সমুখে দ্বারদেশে ব্যাপিত করিয়া, জীবনময়ী প্রতিমারূপিনী তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । পশুপতি প্রথমে চমকিত হইলেন—শিহরিয়া উঠিলেন । পরক্ষণেই উচ্ছ্বাসোদ্ভূত সমুদ্রবারিবেগ আনন্দে ক্ষীত হইলেন ।”

রমণী—যজ্ঞ তোমাদেব মহিমা । পশুপতির কি অপূর্ব পরিবর্তনই সাধিলে ! একেবারে তাহাকে নরক হইতে স্বর্গে তুলিলে ? কোথায় প্রভু প্রতিপালক বৃদ্ধ রাজাকে রাজ্যচ্যুতের, শবণাগত অতিথির হত্যার, মরণা—আর কোথায় এ অপূর্ব প্রেমোচ্ছ্বাস । মাত্রার দুইই সমান—একটি স্নকঠিন কঠোরতা—অন্যটি স্নকোমল কোমলতা । পরিবর্তনকারিণী একটি রমণী-মূর্তি । রমণীগণ এ সংসারে যথার্থই দেবী ।

এই উচ্ছ্বাসের সময় পশুপতিব সহিত মনোবমাব বেরূপ কথোপকথন হইল, তাহা সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই । এখানে আমরা অল্প একটি কথা পাড়িব ।

মনোরমা পশুপতিকে কহিতেছেন—“তুমি আমার আশ্রয় করিবে ?”

“পশুপতি । কেন মনোরমে ? তোমার জন্তই আমি এ যন্ত্রণা করিয়াছি । আমি এক্ষণে রাজভৃত্য ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি না । আমি বিধবা বিবাহ কবিলে জনশমাজে পণ্ডিত্যুক্ত হইব, কিন্তু যখন আমি স্বয়ং

রাজা হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে ? যেমন বল্লান সেন কোলিত্রুব নতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব ।

এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে, আমবা দেখিতে পাই একমাত্র মনোরমা-প্রাপ্তিই পশুপতির রাজ্যাকাঙ্ক্ষার কাবণ । কারণটি সাধাবণ নহে, স্বীকার করিতে হইবে । এ জগতে রমণী প্রণয় না করিতে পারে এমন কাগাই নাই । লোককে স্বর্ণেও তুলিতে পারে, নরকেও ডুবাইতে পারে । পশুপতির এই কথাটি দ্বারা যেমন এক দিকে তাহাব প্রণয়-বলটি সূচিত হইয়াছে, অজ্ঞানিকে তেমন প্রণয়ের স্বকীয় মাহাত্ম্যও প্রকটিত হইয়াছে ।

কিন্তু আমবা ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি । মনোবমা-প্রাপ্তি-আশা যে রাজ্যাকাঙ্ক্ষার একমাত্র কারণ, তাহা আমবা বলিতে প্রস্তুত নহি । পশুপতি যখন স্বীয় ইষ্টদেবীর নিকটে মনোবাসনা বক্ত করিতেছেন, তখন এ কথা প্রকাশিত নাই কেন ? তোমবা বলিবে—মনোরমার জন্তই ত রাজ্যাকাঙ্ক্ষা—সেই রাজ্যাকাঙ্ক্ষার জন্ত যখন পশুপতি ঐরূপ বলিয়াছেন, তখন আবার পৃথক করিয়া সে রাজ্যাকাঙ্ক্ষার কাবণ না বলিলেও ত চলিতে পারে । তাহা পারে না । মনোবমাব জন্ত রাজ্যাকাঙ্ক্ষা হইলে, সে কথাটা তখন একবারও মুখে না আনা সম্ভবপব নহে । ফলকথা—রাজ্যাকাঙ্ক্ষা, রাজ্য ও মনোরমা উভয়েরই জন্ত । দুইই একত্র মনে উদ্ভিত হয়, তাই পশুপতি দুইটিকে সম্যক্ মিশাইয়া এক স্থলে রাজ্য ও এক স্থলে মনোবমাকে প্রাধান্ত দিতেছেন । প্রণয়পাত্রেব নিকট অজ্ঞাত কপটতা জগৎপ্রসিদ্ধ । এই দুই ভাব যে পর্যাস্ত মিশিয়া রহিল, সে পর্যাস্ত ইহাব কোনটি প্রধান বুঝা গেল না । কিন্তু কবি ছাড়িবার পাত্র নহেন—কথাটি আবও খুলিলেন । যখন মনোবমা পশুপতিকে প্রারদ্ধ কার্যে বাধা দিতে লাগিল, অনেক প্রকারে বুঝাইয়া বলিল “পশুপতি-আমি মিনতি করিতেছি, এই দুর্ভিক্ষ ত্যাগ কর”—কবি কহিতেছেন—

“পশুপতি পূর্ববৎ অধোবদনে রহিলেন, তাহাব রাজ্যাকাঙ্ক্ষা এবং মনো-রমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা উভয়ই গুরুতর । কিন্তু রাজ্যলাভের যত্ন করিলে, মনোরমার প্রণয় হারাইতে হয়, সেও অত্যজ্ঞা । উভয় সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তামধ্যে গুরুতর চাঞ্চল্য জন্মিল । তাহার মতির বিরতা দূব হইতে লাগিল । ‘যদি মনোরমাকে পাই, ভিক্ষাও ভাল, রাজ্যে কাজ কি ?’ এই রূপ পুনঃ পুনঃ মনে ইচ্ছা হইতে লাগিল । কিন্তু তখনই আবার ভাবিতে

লাগিলেন, ‘কিন্তু তাহা হইলে লোকসম্মান জনসমাজে কলঙ্ক, জাতিমাশ হইবে, সকলের ঘৃণিত হইবে। তাহা কি প্রকারে সহিব ?’ পশুপতি নীরবে রহিলেন ; কোন উত্তর দিতে পারিলেন না ।”

কবি দেখাইলেন যে, ছুইটির কোনটিই কম নহে। পশুপতি একবার ভাবিতেছেন মনোবশা, আর একবার ভাবিতেছেন, স্বীয় মামস্বত্ব। পশুপতির ছায় লোকের উভয়ই অভ্যঙ্গ।

এইখানে আর একটি অতি সুন্দর কাব্যকৌশল প্রকাশিত হইল। কবি দ্বার পড়িয়াছিলেন—কৌশলে মুগ্ধ হইলেন। কথাটি এই—

পশুপতি কিরূপ লোক ও তাঁহার পবিণাম কি হইবে, তাহা পাঠকবর্গ একপ্রকার বুঝিয়াছেন। এই পশুপতির প্রণয়বল দেখাইতে হইবে। সে প্রণয় মনোরমার প্রতি। প্রণয়বল দেখাইতে হইবে হৃদয়ের প্রণয় ভিন্ন অগ্র যে তুষ্ণবল থাকে, তাহার বিরোধে।—কবি তাহাই করিলেন। রাজ্যাকাঙ্ক্ষার সহিত মনোরমার বিবোধ ঘটাইলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে বড়ই দারে পড়িতে হইল, পশুপতি রাজ্যাকাঙ্ক্ষাও ছাড়িতে পারে না—তাহা হইলে পশুপতি চরিত্রের উদ্বেগই বিনষ্ট হয় ; (সে উদ্বেগের কথা আমরা উপসংহাবে বলিব) আবার মনোরমাও ইহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না—তাহা হইলে কবির সাধের মনোরমা বিকৃত হইয়া দাঁড়ায়। আবার পশুপতির প্রণয়বলটিও পরিষ্কার দেখান চাই। এখন উপায় কি ?

অগ্র কবি হইলে, এইখানেই গ্রন্থ মাটি করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু এইখানে আমাদের কবি যে রূপে বিপদোত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়।

কবি কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন—গ্রন্থ হইতে সেই অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

“মনোরমা উত্তর না পাইয়া কহিতে লাগিলেন, ‘তুন পশুপতি, তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে সাক্ষাৎ হইবে না।’

“এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিলেন ; পশুপতি রোদন করিয়া উঠিলেন। অমনি মনোরমা আবার ফিরিলেন। আসিয়া, পশুপতির হস্তধারণ করিলেন। পশুপতি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন।’ দেখিলেন, বোম্ব-গর্ক-বিশিষ্টা, কুক্ষিত-জ-বীচি-বিক্ষেপ-কারিণী সম্বস্তী মুর্তি আব লাই ;

কুম্ভকুমারী বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোমন করিতেছে।”

“মনোরমা কহিলেন ‘পশুপতি কাদিতেছ কেন?’ পশুপতি চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন, ‘তোমার কথায়।’”

“ম। কেন আমি কি বলিয়াছি ?

প। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।

ম। আর আমি এমন করিব না।

প। তুমি আমার রাজমহিষী হইবে ?

ম। হইব।

“পশুপতির আনন্দমাগর উছলিয়া উঠিল।”

আহা মরি মরি, কি অপূর্ণ কবিত্ব রে—কি চমৎকার কৌশল রে।

এ কৌশলে হিন্দুরমণী মনোরমা খুলিল—পশুপতি খুলিল—গ্রন্থকাবের কার্য শেষ হইল। প্রথমটির কথা আমরা মনোরমা-ব্যাখ্যা স্থলে বলিব। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। পশুপতিকে রাজ্য ছাড়িতে হইল না—মনোরমাও ছাড়িতে হইল না। আর—আর—গ্রন্থকার এই পকারে পশুপতির সর্বনাশ সাধন করিলেন। ফোঁটা কয়েক চক্ষের জলেই না এতটা কাণ্ড করিল। বলিহারি যাই বাক্য—সাধে কি তোমাকে এত পূজা করি!—আমাদের নিকটে যে তুমি পৃথিবীস্থ সর্বোৎকৃষ্ট স্ত্রের উপাদান। স্নেহ কবি আমরা বুঝি না।

এই চক্ষের জলে বাঙ্গালার সর্বনাশ হইল। কারণ যে ব্যক্তি দেশ রাখিলেও রাখিতে পারিত, সে এতদ্বারা সম্যক্ বিনষ্ট হইল। পশুপতিকে যে রাখিলেও রাখিতে পাবিত, সেই মনোরমা আজ চক্ষের জলে মোহিতা হইয়া হাঁস ছাড়িয়া দিল। ঈশ্বরের ইচ্ছা এইরূপেই সম্পূর্ণ হইয়া থাকে—কিন্তু সে কথা আমাদের বক্তব্য নহে।

মনোরমার প্রতি পশুপতির অমুরাগ সম্বন্ধে অবশিষ্ট কথা অল্প বলিব।
—এ স্থানে আবও একটুকু কথা বলিতে হইবে সেটি এই—পশুপতির এই প্রণয়, পাপজ।

পাপ-প্রণয়ে সফল ফলিতে পারে না, তাই অমন মনোরমার স্বামী এক প্রকাব মনোরমাব জন্তই বিনাশপ্রাপ্ত হইল। পশুপতি জানেন, মনোরমা বিধবা—পশুপতি হিন্দুস্তান, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু পূর্বে জাত। ; বিধবা-

বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত, মনোরমাকে ভালবাসিবার পূর্বে এ কথা তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন না। মনোরমাকে ভালবাসিয়াই তাঁহাব এই ধারণা হইল। নগেন্দ্রনাথেরও এইরূপ এক দিন ধারণা হইয়াছিল। এখানেও পাপে আত্ম-বুদ্ধি প্রদান করিয়া পশুপতিকে পাপাচরণে প্রবৃত্ত করাইল। অহো—পাপীর আত্মপ্রত্যাহার কি ভয়ানক ব্যাপার।

এইরূপে বাতপ্রতিবাতেব অবস্থা নূর হইয়া পশুপতির সঙ্কল্প স্থিতি হইল। পশুপতি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। অতঃপর বাহা বাহা ঘটিল, তদ্বর্ণনে আবশ্যক নাই। পশুপতি উর্ধ্বনাভের মত জ্ঞান পাতিয়াছিলেন, জ্ঞান ছিঁড়িয়া গেল। বিশ্বাসঘাতক পশুপতি বিশ্বাসঘাতকেব হস্তে পাপেব ফলভোগ করিলেন। বড়ই সুন্দর রহস্তের কথা! পশুপতি নিজে বিশ্বাসঘাতকতাব কার্য্য করিতে গিয়া বাজ্যলোকী বিধর্ম্মী মুসলমানকে বিশ্বাস করিলেন! বুদ্ধিমান পশুপতি পাপাতিশয্যে নির্কুজিতার একশেষ দৃষ্টান্ত প্রদান করিলেন! এইটিও বিধাতার নিয়ম। চোবের ধন বাটপাড়ে লয়।

চতুর্থ ভাগ।

পশুপতি ও মনোবমাব শেষ কথা—পশুপতির চৈতন্য লাভ

—পশুপতির শাস্তি ও পবিণাম।

সে দিনকার মনোরমা-সম্বন্ধীয় ঘটনার পরে পশুপতি নির্বিরোধে স্বীয় কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছিলেন। এ সকল কথা আমাদের পূর্বে ভাগেরই বর্ণিতব্য বিষয়—কিন্তু মনোরমা সম্বন্ধীয় যে কয়টি কথা অবশিষ্ট ছিল, তাই বলিবার জন্ত ছই একটি পূর্বের কথাও বলিতে হইবে। শাস্ত্রশীল পশুপতির মন্ত্রণা অল্পসারে রাজাকে কৌশলে পলায়নপর করিয়া পশুপতিকে সংবাদ দিয়াছেন! পশুপতির মনোবাহা পূর্ণ হইবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। তখন মনোরমা-চিন্তা পশুপতির প্রবল হইয়া উঠিল। ঘটনাধীন মনোরমাও তখন পশুপতির গৃহে উপস্থিত। পশুপতির আনন্দ হৃদয়ে ধরে না। কিন্তু এখনও মনোরমা-প্রাপ্তি-পক্ষে ছই একটি অন্তরায় রহিয়া গিয়াছে। মনোরমা বিধবা—সে পশুপতিকে বিবাহ করিতে চাহিবে কেন? এই অন্ত-

রায়টি তিরোহিত কবিবাব জন্ত পশুপতি মনোবমাকে বিবিধ প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন । মনোরমা সে কথার বড় একটা কর্ণপাত করিলেন না—তিনি তখন অজ্ঞ মনে মালা গাঁথিতেছিলেন, সম্মুখে একটা কৃষ্ণবর্ণ মার্জার ছিল, মালা গাঁথিয়া তাহাকে পবাইবাব চেষ্টা করিতেছিলেন । “পশুপতি অধিকতর বিরক্ত হইয়া বিড়ালকে এক চপেটাঘাত করিলেন—বিড়াল উর্ধ্ব লাফুল হইয়া দূরে পলায়ন করিল । মনোবমা সেইরূপ দংশিতাধবে হাসিতে হাসিতে কবছ মালা পশুপতিবই মস্তকে পবাইয়া দিল । মার্জার-প্রসাদ মস্তকে পাইয়া রাজপ্রসাদভোগী ধর্ম্মাধিকার হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন । অল্প ক্রোধ হইল—কিন্তু দংশিতাধর তান্ত্রময়ীর তৎকালেব অমুপম রূপমাদুরী দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল । তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত বাহু প্রসারণ করিলেন—অমনি মনোবমা লক্ষ দিয়া দূরে দাঁড়াইল—পথিমধ্যে উল্লতফণা কালসর্প দেখিয়া পথিক যেমন দূবে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইল । পশুপতি অপ্রতিভ হইলেন, কণেক মনোবমাব মুখের প্রতি চাহিতে পারিলেন না—পবে চাহিয়া দেখিলেন—মনোবমা প্রৌঢ় বরদী মহিমাময়ী স্তম্ভবী । পশুপতি কহিলেন ‘মনোবমে, দোষ ভাবিও না । তুমি আমার পত্নী—আমাকে বিবাহ কর’ ।” সময় উপস্থিত হইল । শুশু কথা সকল প্রকাশিত হইয়া পড়িল । পশুপতি জানিতে পারিলেন যে, মনোবমা বাস্তবিকই তাঁহাব পত্নী । পশুপতি বিস্ময়ে ও আনন্দে চিত্ত হাবাইলেন । একটু অমুতাপেবও কথা ছিল—কিন্তু আনন্দেব বেগে তাহা তখন মনে আসিতে পারিল না । মনোবমা এখন আবাব পশুপতিকে পূর্ব সঙ্কল্প ছাড়িতে পুনঃ পুনঃ অমুবোধ করিতে লাগিলেন । উত্তবে পশুপতি কহিলেন—

‘—মনোরমে, আমি যে পথে পদ্যর্পণ কবিয়াছি, সে পথ হইতে ফিবিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম—তোমাকে লইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া কাশী যাত্রা করিতাম । কিন্তু অনেক দূর গিয়াছি । আর ফিবিবার উপায় নাই—যে শ্রমি বাধিয়াছি, তাহা আর খুলিতে পারি না—স্রোতে ভেলা ভাসা-ইয়া আর ফিরাইতে পারি না । যাহা ঘটিবাব তাহা ঘটয়াছে ।—’

সত্যই কি তাই ? কতকাংশে সত্য বটে । তখন প্রায় সব স্থির হইয়া গিয়াছিল । তখন পশুপতি ফিরিতে পারিলেও রাজ্য রক্ষা কবিতে পারিতেন না ।

আবও এক কথা । তখন আব পশুপতি ফিরিবেন কেন । মনোরমা

যদি তাঁহাব পবিত্রীভা পক্ষীই হইল, তবে ত কোন গোলই রহিল না, রাজ্য-
লাভের সঙ্গে তাহার ত বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ কথা বঝ পূর্বে
জানিতে পারিলে, রাজ্যাকাঙ্ক্ষাটা অত প্রবল না হইলেও হইতে পাবিত ;
কিন্তু এখন যে এ রহস্যভেদে পশুপতির মনের গতি পরিবর্তিত হইতে পাবে
না। হিন্দুগণী আবার স্বামীকে তাগ কবিরে কিরূপে ?

এইরূপে আমরা দেখিতে পাইলাম, পশুপতিব সব দিকেই হিতে বিপ-
বীত হইতে লাগিল। দুর্ভেদ্য, হয়ই এইরূপ।

অভিলষিত পাপপথে অলভ্যা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে, পাপী প্রাণই
চৈতন্যলাভ হইয়া থাকে। পশুপতিবও তাহাই হইল। মুসলমানদিগেব
ষড়ম্বর বৃষ্টিতে পারিয়া যখন পশুপতি দেখিলেন, তাঁহার সব কুবাইবাচে,
তখন পশুপতিব চৈতন্য হইল। এ চৈতন্যের সঞ্চাব হয়, শাস্তিভোগের জন্ম।

এই চৈতন্য সঞ্চাবেব পরেই পশুপতিব শাস্তি আবস্ত। আমরা গ্রহ
হইতে সেই স্থানটী সন্নিহিতবে পাঠকবর্গকে উদ্ধৃত্ত কবিয়া দিতেছি।

“মহম্মদআলির নিকট বিদায় হইয়া, রাজপথ অতিবাহিত করিয়া পশু-
পতি ধীরে ধীরে চলিলেন। ধীরে ধীরে চলিলেন—যবনের কাবাগাব
হইতে বিমুক্ত হইয়াও দ্রুতগমনক্ষেপণে তাঁহাব প্ররতি জন্মিল না। বাজপথে
যাত্রা দেখিলেন, তাহাতে আপনার মনোমধ্যে আপনি মরিলেন। তাঁহাব
প্রতিপদে মৃতনাগবিকের দেহ চরণে বাজিতে লাগিল ; প্রতিপদে শোণিত
সিক্ত কর্দমে চবণ আঁধ হইতে লাগিল। পথেব দুই পার্শ্বে গৃহাবলী জন-
শূন্য,—বহু গৃহ ভস্মীভূত, কোথাও বা তপ্ত অঙ্গাব এখনও জলিতেছিল।
গৃহান্তবে দ্বার ভগ্ন—গবাক ভগ্ন—প্রকোষ্ঠ ভগ্ন—চতুর্পবি মৃত দেহ ! এখ-
নও কোন হীতভাগ্য মবণমস্ত্রণায় অমাহুবি কাতবস্থবে শব্দ কবিত্তে-
ছিল। এ সকলের মূলই তিনি। দারুণ লোভের বশবর্তী হইয়া তিনি এই
বাজধানীকে অশানভূমি কবিয়াছেন। পশুপতি মনে মনে স্বীকার করি-
লেন যে, তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্যপাত্র বটে,—কেন মহম্মদআলিকে কল-
কিত করিম্ব কাবাগাব হইতে পলারন করিলেন ? যবন তাঁহাকে ধৃত
করুক,—অভিপ্রেত শাস্তি প্রদান করুক,—মনে করিলেন, ফিত্রিয়া ঘাইবেন।
মনে মনে তখন ইষ্ট দেবীকে স্মরণ করিলেন—কিন্তু কি কামনা করিলেন ?
কামনার বিষয় আর কিছুই নাই। আকাশ প্রতি চাহিলেন। গগনেব
নক্ষত্র-চন্দ্র-গ্রহ-মণ্ডলী-বিভূষিত সহস্র পবিত্র শোভা তাঁহার চক্ষে স্হিল না—

তীব্র জ্যোতিঃসম্পীড়িতের ছায় চক্ষু মুদ্রিত কবিলেন। সহসা অনৈসর্গিক ভয় আসিয়া তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল—অকারণ ভয়ে তিনি আর পদ-ক্ষেপ করিতে পারিলেন না। সহসা বলহীন হইলেন। বিশ্রাম করিবার জন্ত পথিমধ্যে উপবেশন করিতে গিয়া দেখিলেন,—এক শবাসনে উপবেশন করিতেছিলেন। শবনিঃসৃত রক্ত তাঁহার বসনে এবং অঙ্গে লাগিল। তিনি কণ্টকিত কলেববে পুনরুত্থান করিলেন। আর দাঁড়াইলেন না। দ্রুতপদে চলিলেন। সহসা আব এক কথা মনে পড়িল—তাঁহার নিজ বাটা ? তাহা কি যখন হস্তে বক্ষা পাইয়াছে ? আব সে বাটাতে যে কুসুম-ময়ী প্রাণপুত্তলীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাব কি হইয়াছে ? মনো-বমাব কি দশা হইয়াছে ? তাঁহার প্রাণাধিকা, তাঁহাকে পাপপথ হইতে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিয়াছিল, সেও বুঝি তাঁহার পাপসাগরের তরঙ্গে ডুবিয়াছে। এ যখনসেনাপ্রবাহে সে কুসুমকলিকা না জানি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। পশুপতি উন্মত্তের ছায় আপন ভবনাভিমুখে ছুটিলেন। আপনার ভবনসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যাহা ভাবিয়া ছিলেন, তাহাই ঘটয়াছে,—জলন্ত পর্বতের ছায় তাঁহার উচ্চচূড় অট্টালিকা অগ্নি-ময় হইয়া জলিতেছে। দৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পশুপতির প্রতীতি হইল, যবনেবা তাঁহাব পৌরজনসহ মনোরমাকে বধ করিয়া গৃহে অগ্নি দিয়া গিয়াছে। মনোরমা যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। নিকটে কেহই ছিল না যে, তাঁহাকে এ সন্বাদ প্রদান করে। আপন বিকলচিত্তের সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করিলেন। হলাহল কলস' পরিপূর্ণ হইল,—হৃদয়ের শেষ তন্ত্রী ছিঁড়িল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিক্ষারিত-নয়নে দৃষ্টি-মান অট্টালিকা প্রতি চাহিয়া রহিলেন,—মরণোন্মুখ পতঙ্গোবৎ অল্পক্ষণ বিচল শরীরে এক স্থানে অবস্থিতি করিলেন,—শেষে মহাবেগে সেই অনল-তরঙ্গ মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। সজ্জের গ্রহরী চমকিত হইয়া রহিল।

“মহাবেগে পশুপতি জলন্ত দ্বারপথে পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চরণ দগ্ধ হইল,—অঙ্গ দগ্ধ হইল,—কিন্তু পশুপতি ফিরিলেন না। কৃষ্ণিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া আপন শয়নকক্ষে গমন করিলেন—কাহাকেও দেখিলেন না। দগ্ধ শরীরে কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর মধ্যে হরন্ত অগ্নি জলিতেছিল—তাহাতে তিনি বাহ্যিক দাহযজ্ঞণ অহুভূত করিতে পারিলেন না। ক্ষণে ক্ষণে গৃহেব নতন নতন খণ্ড সকল অগ্নিকণ্টক

আক্রান্ত হইতেছিল। আক্রান্ত প্রকোষ্ঠ বিষম শিখা আকাশপথে উখিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ গৃহাংশ সকল অশনি-সম্পাত শব্দে ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিল। ধূম, ধূলি, তৎসঙ্গে লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আকাশ অদৃশ্য হইতে লাগিল। দাবানল-সম্বোধিত আরণ্য গজের শ্রায় পশুপতি অগ্নিমধ্যে ইতস্তত দাস দাসী স্বজন ও মনোরমার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কাহারও কোন চিহ্ন পাঠিলেন না।—হতাশ হইলেন। তখন দেবীর মন্দির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। দেখিলেন, দেবী অষ্টভুজার মন্দির অগ্নিকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জলিতেছে। পশুপতি পতঙ্গবৎ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অনলমণ্ডলমধ্যে দগ্ধ স্বর্ণপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে। পশুপতি উন্নতের শ্রায় কহিলেন,—

“মা জগদম্ব! আর তোমাকে জগদম্বা বলিব না। আর তোমায় পূজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব না। আশৈশব আমি কাম-মনোবাক্যে তোমার সেবা করিলাম—ঐ পদধ্যান ইহজন্মে সার করিয়া-ছিলাম—এখন মা এক দিনের পাপে সর্বস্ব হাবাইলাম। তবে কি জগৎ তোমার পূজা কবিয়াছিলাম? কেনই বা তুমি আমার পাপমতি অপনীত না করিলে?”

‘মন্দিরদহন অগ্নি অধিকতর প্রবল হইয়া গর্জিয়া উঠিল। পশুপতি তথাপি প্রতিমা সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

‘ঐ দেখ! ধাতুমূর্তি!—তুমি ধাতুমূর্তি মাত্র। দেবী নহ—ঐ দেখ অগ্নি গর্জিতেছে। যে পথে আমার প্রাণাধিকা গিয়াছে—সেই পথে তোমাকেও প্রেরণ করিব। কিন্তু আমি অগ্নিকে এ কীৰ্ত্তি রাখিতে দিব না—আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়াছিলাম—আমিই তোমাকে বিসর্জন করিব। চল। ইষ্টদেবি! তোমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জন করিব।’

“এই বলিয়া পশুপতি প্রতিমা উত্তোলনের আকাঙ্ক্ষায় উভয় হস্তে যেমন তাহা ধারণ করিলেন, অমনি সেই সময়ে আবার অগ্নি গর্জিয়া উঠিল। তখনই পরীত বিদ্যারামরূপ প্রবল শব্দ হইল,—দগ্ধ মন্দির আকাশ-পথে ধূলি-ধূম-ভস্ম সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রাশি রাশি প্রেরণ করিয়া, চূর্ণ হইয়া পরিয়া গেল। তন্মধ্যে প্রতিম্ব সহিত পশুপতির সজীবনে সমাধি হইল।”

পাঠক, তুমি কখন অর্থলোভে নরবলি প্রদায়ী তান্ত্রিকের নিকট সম্মান-বিক্রয়কাবীর শেখাবস্থা নিবীক্ষণ কবিয়াছ—সেই ছিন্নমুণ্ড প্রিয়তম তনয়-

সমীপে পিতাব, সেই গভীর শোকাচ্ছাদিত পর্যবেক্ষণ করিয়াছ, তাহা হইলে তুমি পশুপতির এই গভীর শোক-মগ্ন অস্থব করিতে পারিবে। পশুপতি হাতে করিয়া যে বঙ্গদেশকে এত দিন প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই সমস্তানতুল্য বঙ্গদেশের মৃত শরীর তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। এ অবস্থার কারণে আবার তিনি—এ কি সহজ কষ্ট! যেমন পাপ, তেমনই শাস্তি। কবিব এই শাস্তি-প্রকরণে বিশেষ দক্ষতা পরিদৃষ্ট হয়! শৈবলিনীর শাস্তিতেও এই রূপ দেখিয়াছি। এতদপেক্ষা যদি পশুপতিব শবাবথানি চিরিয়া চিরিয়া তত্তৎ প্রদেশে লবণ মাখাইয়া মৃত্তিকা প্রোথিত কবিবা কুঙ্কর-ভুক্ত করান হইত, তাহা হইলেও তাহাব এত কষ্ট হইত না। এ শাস্তি-বর্ণনার—আর কি ব্যাখ্যা করিব?

পশুপতর হৃদয়ে যখন এইরূপ প্রলয়াগ্নি সমুদীপিত হইতেছিল; ভীষণ গর্জনে পশুপতিব হৃদয়, মর্ম্ম, অন্তঃস্থল সব একে একে ভষ্মীভূত করিতেছিল, তখন প্রকৃতিপ্রিয় কবি পশুপতির অট্টালিকায় আব এক প্রকারের অগ্নি পাঠকবর্গকে দেখাইয়া দিলেন। কি স্থলর জ্বল মিলিল—ঐ পশুপতি, আব ঐ তাহার হৃদয়াগ্নি—ঐ অট্টালিকা!—আব তাঁহার অভ্যন্তরস্থ আগুন—কেমন এক স্থরে গীতা। দুইই ভাষণ—দুইই তিল তিল করিয়া পশুপতিকে পোড়াইতে লাগিল। তোমরা এক আগুনে মানুষ পোড়াইতে পার, কবি একদেহ-বিশিষ্ট পশুপতিকে একবারে দুই আগুনে পোড়াইতেছেন। এদিকে পুড়িতেছে পশুপতির হৃদয়—ওদিকে পুড়িতেছে কি শুধু অট্টালিকা? তাহা নয়, ওদিকেও পুড়িতেছে পশুপতির আর একটি হৃদয়! পশুপতি জানিতেন, মনোবমা ঐ অট্টালিকা মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। আঃ মরি মরি কি স্থলব কবিত্ব বে! জালাও কবিবর, এই আগুনে স্বদেশ-ব্রাহ্মী পানিষ্ট কুমস্তানদিগকে এইরূপে জালাও।—জালাও কবিবর, বাহার লোভী, দ্বাশাপরায়ণ, বিশ্বাসঘাতক, তাহাদিগকে এইরূপে জালাও।—জালাও কবিবর, বাহাব প্রভুহস্তা, শরণাগত অতিথির প্রাণবধে উদাত, তাহাদিগকে এইরূপে জালাও।—জালাও! ইহাতে কতক লোক পুড়িয়া মরুক, কতক দূরে থাকিয়া সেই বহুলা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুক। তেঁমাদের এই ত কাজ—এই জন্তই ত তেঁমাদিগকে জ্বল এত ক্ষমতা দিয়াছেন, তবে জালাইবে না কেন? জালাও, সমস্ত বঙ্গদেশ এই আগুনে জালাও। ভয় নাই, দেশ নষ্ট হইবে না—সোণাক কলঙ্ক দূব হইবে মাত্র—আগুনে কি সোণা নষ্ট হয়?

পশুপতি জলিল। প্রলয়েব আগুনে পশুপতি জলিল। মনোরমার জন্ত পশুপতি জলিল। পাপীষ নিকটে ভাল জিনিসও মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। নহিলে, অমন মনোবদ্য কি পশুপতির কাল হইয়া দাঁড়াইতে পারে?

আব গুনিয়াছ, পশুপতি জলিবার আগে কি বলিয়া জলিল! উন্মত্ত পাপী পশুপতি ভগবানের প্রতি দোষারোপ করিতে করিতে জলিল! পশুপতি, পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক পশুপতি—তুমি এই মুমূর্ষু অবস্থাতেও ভগবানকে তোমার পক্ষপাতের জন্ত দায়ী মনে কবিতোছ? ঐ শুন আগুন পজিয়া তোমাকে এ জন্ত তিরস্কার কবিতোছে—অনিষ্ঠে পাইতেছ কি?—

পাঠক, এখনত পশুপতিকে জ্বালাইলাম—এখন একবার কাদিবে না? স্বদেশবৎসল, পশুপতিব একদিনকাব পাপের জন্ত সর্বনাশ দেখিয়া কাদিবে না? প্রণয়ী পশুপতিব মনোরমার জন্ত সর্বনাশ দেখিয়া কাদিবে না? দেবীভক্ত পশুপতিব অস্তিমেষে সেই মর্ম্মভেদী তিবন্ধার বাক্য শুনিয়া কাদিবে না? আব, আব সেই পশুপতিকে সেই আগুনে দগ্ধ হইতে দেখিয়া কাদিবে না? কাদিবে বই কি? সত্য বটে, পশুপতি বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী, প্রভুহস্তা ও অতিথিহস্তা; সত্য বটে, পশুপতির সেইদিনকাব কর্ম্মের ফল এখনও তোমরা ভোগ কবিতোছ, কিন্তু তবু কাদিতে হয়। মাহুষের পতন দেখিলেই কাদিতে হয়। একটু কাদিবে না কি—

উপসংহার।

যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার নিন্দা সহ করিতে পারে না—একথা সকলেই জানেন। প্রণয়ী নিকট প্রণয় পাত্রের প্রকৃত দোষগুলি বলিলেও তাহা অসহনীয়। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহের পাত্র সম্বন্ধেও ঐ কথা। এই রূপ অপবাদ কালনার্থই পশুপতিব সৃষ্টি।

বঙ্কিমবাবু স্বদেশাছুরাগই আমাদের পশুপতির স্রষ্টা। যে মনোবৃত্তি হইতে বঙ্গদেশের “ভারত কলঙ্ক,” প্রচাবের “বাঙ্গালার কলঙ্ক” শীর্ষক প্রস্তাববহু সর্বপ্রথমে উক্ত পত্রদ্বয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল—ঠিক সেই মনোবৃত্তি হইতেই পশুপতি উদ্ভূত। প্রভেদ এই যে, উক্ত প্রস্তাব হইটুকু পরিষ্কার, পশুপতি প্রস্তাবটি কিছু চাপা দেওয়া। বঙ্গদেশের ভীকৃতাপবাদ যে অমূলক, বঙ্গদেশ যে কেবলমাত্র সপ্তদশ অস্বারোহী কর্তৃক বিজিত

হয় নাই, গ্রন্থকাব এই কথাটি যেন বঙ্গের আবাসবুদ্ধবানিতা সকলের
হৃদয়েই গাঁথা রাখিবার জন্য, পশুপতি-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বদেশা-
মুরাগের ইহা একটি প্রধান লক্ষণ। যেরূপ “বন্দে মাতরং” সঙ্গীতটী সঙ্ক-
লের নিকটেই কবির দেশামুরাগ প্রকটিত করিতেছে, আমরা বোধ কবি,
বুকিয়া দেখিলে, পশুপতির সৃষ্টিও সেইরূপই তাঁহার স্বদেশভক্তি প্রকাশিত
কবিত্তে সমর্থ।

সপ্তদশ অশ্বাবোহী কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছে, এই অপবাদটি
স্বদেশবৎসল বঙ্গীয় কবির নিকট, বড়ই অসহ্য বোধ হইল। কথাটি অসহ-
নীয়ও বটে। সেই অসহ্য অপবাদে মর্ম্মপীড়িত হইয়া কবির মৃণালিনীতে
ইহার প্রতিকারের চেষ্টা পাইলেন। বিদেশীয় লোকে যাহাই ভাবুক, তাহাতে
তাঁহাব বিশেষ ক্রক্ষেপ নাই, বাঙ্গালার লোকই যে এইরূপ বিশ্বাস করি-
তেছে, ইহাই তাঁহাব প্রধান দুঃখ। তিনি দেখিলেন, এ দুঃখ ঘূচাইবার
তখনকার এক মাত্র উপায়—উপভ্রাস লিখিয়া লোকেব মনে অশ্রুভাব জন্মা-
ইয়া দেওয়া। তাঁহাব কর্তব্য তিনি করিলেন—মৃণালিনীতে পশুপতি সৃষ্টি
হইল। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইল কি? কিয়ৎপরিমাণে হইল বই কি।
উপভ্রাসের প্রভূত শক্তি লভ্যন করে কাহার সাধ্য? যাহারা মৃণালিনী পড়ি-
য়াছেন, তাঁহাদের মনে অজ্ঞাতসারে একটি সংস্কারের ছায়া পড়িল। উপ-
ভ্রাসকাব কৃতার্থ হইলেন।

অপবাদটিতে সম্যক্ অবিশ্বাস করিয়া গ্রন্থকাব ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটনে সচেষ্ট
হইলেন। বিশ্বাসঘাতকতা দোষেই বাঙ্গালা মুসলমান হস্তগত হইয়াছে;
সহজেই এ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইলেন। ভাবতবর্ষের প্রাচীন ইতি-
হাস, বাঙ্গালার পরবর্তী ইতিহাস, তাঁহার বিশ্বাস বদ্ধমূল কবিল। জগ-
তের ইতিহাসও কোনরূপ প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারিল না—সিদ্ধান্ত
স্থির বিশ্বাসে পরিণত হইয়া, কবির অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িল—সেই অস্থি-
মজ্জাগত বিশ্বাস কল্পনাগর্ভে কাব্যরূপে প্রকাশিত হইল। এইরূপে রাজ্য-
লোভী পশুপতি জন্মগ্রহণ করিল।

কিন্তু বাঙ্গালার কবি, বঙ্গের সন্তানকে এত ভালবাসেন যে, কেবল
মাত্র রাজ্যলোভে বিশ্বাসঘাতকতা দোষে কাহাকে দোষী করিতে তাঁহার
কোটি জন্মিল না,—তিনি ঐক্য কাণ্ডের, ঐক্য কারণ অপ্রচুব মনে কবি-
লেন। বাঙ্গালীব যথাসর্ব্বশ্ব, বঙ্গীয় কবির চিবস্নেহপাত্র প্রণয়নিত সাহা-

যার্থ অগ্রসর হইল,—কবি যুগপৎ ভাসিষা কান্দিয়া সে সাহায্য গ্রহণ করিলেন—মনোরমার প্রণয়ে, বিশ্বাসঘাতক পশুপতি সৃষ্ট হইল।

এইরূপে পশুপতির নাটকীয় ঘটাপ্রতিঘাতের অবস্থা সৃষ্টি হইল—পাঠক তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পশুপতিতে কবিরেব প্রবল স্বদেশ-দুরাগ জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

• এখন আমবা পশুপতিব জীবনচরিত হইতে যাহা শিখিলাম, তাহাই উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। কথাগুলি এই—

১। পাপে যখন মন বড় আসক্ত হয়, লোকের কুমতি স্ফুটরূপ ধারণ করিতে চেষ্টা করে। যেক্ষণেই হউক, পাপের বিষয়টিকে তখন একরূপ ধর্মের সজ্জা প্রদান করিতে বড়ই ইচ্ছা জন্মে। এই সময়ে কত নূতন (Original theory) মত মনোমধ্যে উদ্ভিত হয়—কিন্তু তাহা হইতে বিশেষ সাবধানে আত্মরক্ষা কবা কর্তব্য। ২। কোন লক্ষ্য বিশেষ স্থির করিয়া লোকে পাপাচরণ আবৃত্ত করিলে শেষে সেই লক্ষ্য সংসাধনের উপায় বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যে উপায়ে সেই লক্ষ্য সম্পন্ন হইতে পারে, সেই উপায়ই তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। অতএব আরম্ভেই এ সকল কথা ভাবিয়া দেখা কর্তব্য। ৩। ‘আজ একটি পাপ করিলাম—আর কখন এরূপ করিব না—অন্ত সম্বন্ধে ভাল থাকিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব’ এরূপ হৃদ্যুক্তি শত সহস্র পাপের প্রসূতি। ৪। অসং বুদ্ধির জোবে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার কামনা ত্যাগ করিতে হইবে। ধর্মামুদিত না হইলে, বুদ্ধি অনেক সময়েই পাপযুক্ত হইয়া বিশ্বাসঘাতকের ত্রায় আচরণ করে। ৫। সংসারী হইয়া, অস্ত্র কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে, লক্ষ্মী ছাড়া থাকিলে, লক্ষ্মী-ছাড়া হইতে হয়। ৬। জগতের যেটা প্রধান ধর্ম—ভালবাসা, তাহাও পাপ সংযুক্ত হইলে কুফল প্রসব করে। ৭। পরের অনিষ্ট করিয়া আমার ইষ্টসাধনের জন্য ভগবানকে ডাকা বড়ই গর্হিত কার্য। ইহা দ্বারা ভগবানকে ঘৃণিত চক্ষে দেখা হয়! আরও কত শিখিলাম—কিন্তু তাহা না বলিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই।

শিখিলাম এই, কিন্তু মনে রহিল আর একটি কথা। সে কথাটি দেখিয়াছি অল্পত, কিন্তু তখন তাহা মনে বহে নাই—এখন বড়ই মনে সংগীত হইয়া রাহল।

কথাটি সেক্ষণীরেব সেই (দ্রাণা) ডাকিনী কথ।

“Fair is foul, and foul is fair,
Hover through the fog and filthy air.”

“সুন্দরকে মন্দ ভাবি, মন্দকে সুন্দর,
বদ হাওয়া কুয়া দিয়া কিবি নিবস্তুর ।”

উপন্যাস ।

মুদ্রায়ত্ত্ব বড় কল্যাণ-কর । মুদ্রায়ত্ত্ব সহস্র সহস্র শয়তানকে দশটা পাচটার গোলামিতে আবদ্ধ কবিয়া বাখিয়াছে, নহিলে এই সকল শয়তান হাতে বাজাবে ছড়াইয়া পড়িত; দেশে মহা বিব্রাট হইত । মুদ্রায়ত্ত্বে যাহা কিছু পাঠাইয়া দিবে, শয়তানিতে ঐ সকল তখনই ধাতুময় হইবে, প্রফ পণ্ডিত তখনই তাহা শোধিত কবিবে, পীত-বস্ত্র তখনই শাদাব উপর কালি পাকিতে থাকিবে, তাহাব পব উপচার-পুস্তকেব অবলম্বে হোক, মাসিক পত্রের প্রবন্ধে হোক, বা সংবাদপত্রের প্রেবিত স্তম্ভে হোক, সেই যাহা-কিছু, দিবা হুন্নি দীর্ঘিব নিশান উড়াইয়া, বফলা-হুন্সুব লাঙ্গল ছড়াইয়া, বেৎকব সঙ্গীন ঝাঁকাইয়া ধবিয়া, বঙ্গসাহিত্যেব অনন্ত আসবে, উজ্জল-কজল বেশে বিবাজ করিবে । মুদ্রায়ত্ত্বের মত কল্যাণকর আব কিছু আছে কি? মুদ্রায়ত্ত্বের কল্যাণে যাহা কিছু সমস্তই—

সমানি সম-শীর্ষাণি

ঘনানি বিবলানি চ ।

সুদীর্ঘাং সুলিখিত । এমন সুবিধা সুযোগের সময়ে যে হতভাগ্যাবা সুলেপক, অর্থাৎ মুদ্রায়ত্ত্বের উপাসক—হইল না, তাহাদেব গর্ভধাবিনীরা বন্ধা হইল নী কেন? কেন—তাহা জানিনা, এই মান জ্ঞানি, তাহাব বন্ধা নহেন,

এবং বাক্সালার অবক্ষা-পুত্রগণ নির্দোষ নহেন, সুবিধা সুযোগ ছাড়িবাব পাঠ নহেন। শরন গৃহে অন্ধকাবে চোব প্রবেশ কবিলে, তখন খটাতলে নিঃশব্দে বিবাজ কবাই সুবিধা—বাক্সালি তাহা কবেন না কি ? আর হৃদ্রে কথ-কথ চক্কাব কবিলে, তখন দেশভক্তি বাজভক্তি দেখাইবার জন্ত সখের সৈনিক হইবাব জন্ত দবখাস্ত কবাই সুবিধা—বাক্সালি একপ সুযোগ কল্পন ছাড়িয়াছেন কি ? অতএব মুদ্রাঘস্টেব কল্যাণে সুলেখক হইবাব সুযোগও বাক্সালি ছাড়েন নাই—বাক্সালি সকলেই সুলেখক। কিন্তু লিখিবার যন্ত্র আছে—পড়িবার যন্ত্র কৈ ? হতভাগা ইংবেজ ! একজিবিশন্ বুলিবি ত আগে হাতে পরসা গঠাইয়া দিলি না কেন ? শুধু কি জিনিসপত্র দেখিয়াই তুস্ত হইব ? লেখা পড়া শিখাইবি ত ভাল চাকরী দিবি না কেন ? লেখাপড়া কি ধুইয়া ধাইব ? চাকরি দিবি ত মোটা মাহিরানা দিবি না কেন ? পুরুষাঙ্কমেই কি চাকরি কবিব ? মদেব আমদানিই যদি কবিবি, তবে আবার টেক্স নিবি কেন ? অ্যাম্পিন্ কি কেবল তোবাই খাবি, আমবা কি দেশের কেহ নই ? ছাপি-বাব যন্ত্র কবিলি ত, পড়িবাব যন্ত্র কবিলি না কেন ? হতভাগারা তোমাদের সকল কাজেই আধা আধি ?

বক-চরণ বিক্ষেপে, কুঞ্চিত কটাক্ষে প্রবিষ্ট গ্রহকার বাব। তাঁহার অঙ্গরঙ্গ কক্ষ মধ্য হইতে নব-মুদ্রিত পুস্তকেব বড় বড় দুই একটি নামাকর—নবোচা বধুব ত্রাজুলী-বিদীর্ণ অবশুষ্ঠনেব মধ্যস্থ চক্ষুব মত—উঁকি মারি-তেছে। “আমুন, বসুন, ভাল হয়ে বসুন, আপনার শিবানের পরকেটে ওধানি কি ?” “আজ্ঞে, একখানি নতন পুস্তক—মায় ‘বিষম সমস্তা,’ আপনাকে উপহাব দিতে আনিয়াছি।” হস্তে প্রদান। গৃহীতা উপটোয়ী পাশটাইয়া—“এখানে সেখানে দেখিয়া—“এ সকল সমস্তাব অনেকগুলির উত্তর ‘পুস্পাঞ্জলি’তে আছে।” “আজ্ঞে কুসুমাজলি শ্রায়শাস্ত্র—তত বিদ্যা আমাদের নাই।” “আমি ভূদেব বাবুর পুস্পাঞ্জলিৰ কথা বলিতেছি।” “আজ্ঞে তাহাও পড়ি নাই।” তখন বাবুকে শিষ্টাচাবে মিষ্টালাপে বিদায় দিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এ দেশে ছাপিবাব কল আছে—অথচ পড়িবার কল নাই, তাহাতেই এই বিড়ম্বনা হইয়াছে। আমাদের দেশেব জর, দেহেব জৰী, নদীর চড়া, নদেব ভাঙ্গান, চিনির গবাসিকতা, ঘিরেব ভেজালতা, যুকের বাজালতা, বতীর চপলতা—এ সকলের জন্ত ইংবেজ/যখন দাবী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তখন এই লিখিবার যন্ত্র থাকা, অথচ পড়িবার যন্ত্র না থাকাব জন্ত ইংবেজ যে দাবী তাহা

কি আবার বলিতে হইবে? ইংরাজ দোষী স্মৃতরা আমবা খালাস; কাজে কাজেই আমরা নির্দোষ, অতএব নিশ্চিত্ত।

যন্ত্র আছে বলিয়া আমরা সকলেই সুলেখক—যন্ত্র নাই বলিয়া আমরা সকলেই অপাঠক। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাউক, যে বাঙ্গালার পুস্তক লিখিত হয়, পঠিত হয় না—

সিলক্ষণ। সে কথা কে বলিবে? গোড়াতেই অশুদ্ধ হইয়াছে—তাইতে মীমাংসায়ও গোল পড়িতেছে। ইংরেজ আমাদের উপর যতই কেন, দ্রোহিতার আচরণ করুন না, ভগবান্ ত আছেন। ইংবেজ এই যে, ভাত রাঁধিবার, মাড় গালিবার, অরে ভুগিবার, মড়া পোড়াইবার কল আনে নাই—তা বলিয়া কি আমরা ভাত খাই না, না জবে ভুগি না—না মরিলে পুড়ি না—সকলই ত আমরা করি। তোমরা ইংরেজের গোড়া,—তাই ইংবেজের কঁলেব গোরব কর—আবার ইংবেজকেই গালি পাড়—ইংরেজ বিক্রম হইলই বা—ভগবান্ ত স্বরূপে স্বপ্রকাশ আছেন।

ভগবানের যে অপার করণাবলে, বাঙ্গালি সন্তানের জন্মদাতা হইয়া নিশ্চিত্ত, পালনের ভার গৃহিণীর উপর, সেই করণাবলেই বাঙ্গালী লিখিয়া নিশ্চিত্ত, পাঠ করিবার ভার সেই গৃহিণীদের উপরেই আছে; বলিহারি—সামঞ্জস্য সাধন! আর বলিহারি শ্রম বিভাগ! এমন নৈলে কি সংসার চলিত গা? সকল বিষয়েরই যেমন ছোক, একটা ভাগ বাটোয়ারা চাই—এই আমরা টেক্স দিই, ইংরেজেরা বৃত্তি ভোগ করেন; আমরা দক্ষিণা দি, পুরোহিত ঠাকুর ধর্ম কর্ম কবেন—সেইরূপ আমরা লিখি, উঁহারা পাঠ করেন।

অতএব বাঙ্গালার পুস্তক লিখিতও হয়, পঠিতও হয়; তবে

যারা লেখে তারা পড়ে না;

যারা পড়ে তারা লেখে না।

লেখক পাঠকের এইরূপ অদ্ভুত বিড়ম্বনা অদ্ভুতপূর্বরূপে সমঞ্জসোভূত হওয়াতে—বাঙ্গালার প্রতিনিয়তই একরূপ গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, সে গুলির নাম—উপন্যাস। উপ-সর্গে একটু রঙ্গদারি আছেই আছে; উপন্যাস অথৈ রঙ্গদারি কেতাব—সার্থু ভাষায় রঞ্জন-কর পুস্তক।

প্রকৃতি রঞ্জেই রাজার রাজত্ব—পুরুষের পুরুষার্থ। সেই প্রকৃতিপুঞ্জই যখন আমাদের লেখনের লক্ষ্য, তখন, রঞ্জন করাই শ্রেয়ঃ। অতএব বঙ্গ ভাষায় ননোরঞ্জক গ্রন্থের বা উপন্যাসেরই প্রাধান্য।

রঞ্জন-নীতি ব্যতীত বাঙ্গালায় আর কিছুই কি নাই? আছে বৈকি—
ধর্মনীতি, রাজনীতি সমাজনীতি—সকলই আছে। কিন্তু সকলই ঐ মূল
নীতি—রঞ্জন নীতিতে ওত-প্রোত। বাঙ্গালার ধর্মনীতির অমৃত, রাজনীতির
গরল, গার্হস্থ্য নীতিব মধু—এবং শিক্ষানীতির নিষ—সকলই সমভাবে উপ-
ভ্রাসে উপভ্রান্ত হইতেছে। প্রতিভা-সম্পন্ন লেখকাগ্রগণ্য স্বীকৃত স্বীকারোক্তি
কলমবন্দী করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার বক্তব্য যাঁহা কিছু প্রায়ই উপভ্রাসে
প্রকাশিত করেন; আর মুদ্রা-বিভ্রাট-গ্রস্ত মুদ্রাব্যস্ত্রের অধিকারীগণও অনবরত
উপভ্রাস বিভ্রাস করিয়া প্রমাদীকৃত কবিতাছেন, যে বাঙ্গালার উপভ্রাস
ভিন্ন গত্যন্তর নাই। [এই স্থলে পাঠকগণকে—শ্রীবিষ্ণু, আপনার কথা আপ-
নিই ভুলিতেছিলাম—পাঠিকাগণকে অম্লবোধ, তাঁহারা যেন বঙ্গ নাটক
নামে প্রচারিত গ্রন্থ গুলিকেও উপভ্রাসের মধ্যে গ্রহণ করেন, কেননা সে
গুলিতে কেবল উপভ্রান্ত বিবরণ আছে—নাটকই কিছুই নাই।]

হুই আর ছয়ে চাবি, যদি এই গণিততত্ত্ব দেশে বুঝাইতে হয়—‘তোমার
দেশকে তুমি ভাল বাসিত’—এ কথা যে দেশে দিব্যরাত্র শিখাইতে পড়াইতে
হইতেছে, সে দেশে যে গণিতের ঐ গভীর তত্ত্বও অচির কাল মধ্যে বুঝাইতে
হইবে, এমন ভরসা আমাদের সম্পূর্ণই আছে—যদি তেমনই স্মৃতি, আর তেমনই
সুযোগই হয়—যদি হুই আর ছয়ে চারি এই কথা বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে
লিখিতে হইবে—

“সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। বিজয়পুরের বিজ্ঞান গঙ্গাভীরের কুল কুল ধ্বনিতে
তটস্থ ঝিল্লীরবের সুর সন্নিহন হইতেছে, অষ্ট বর্ষ বয়স্ক বিপিন চারি বৎসরের
ললিতার গলা জড়াইয়া বেড়াইতেছে; ধূসারাকাশে একটি তারা টাপু করিয়া
দেখা গেল।” বিপিন বলিল “ললিতে—তোমার আমার কয় চক্ষু?”
ললিতা বিপিন দাদার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকে হাসিল—বলিল ‘জানি না।’
—তখন বিপিন ললিতার হস্ত লইয়া একে একে আপনার চক্ষু ছুটি ও ললি-
তা ব চক্ষু ছুটিতে স্পর্শ করিতে লাগিল—আর সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল—
‘এক, দুই, তিন, চারি—তাঁহার পর জিজ্ঞাসা করিল—“এখন বল—তোমার
আমার কয় চক্ষু?” ললিতা হাসিয়া বলিল ‘চাবি চক্ষু?’—বিপিন বলিল
দেখ ভুলিও না—হুই আর ছয়ে চারি হয়, তখন আবার সেই চাবি চক্ষু
মিলিত হইল—মরি মরি! বালগ্রন্থের কি মাধুরি!”—ইত্যাদি—ইত্যাদি—

ললিতা বিপিনের উপভ্রাস—উভয়ের বিবাহে অর্থাৎ চারি চক্ষু বৃত্ত

সম্মিলনে সমাপ্ত । একপ মনোহর উপন্যাস পাঠের পব ছই আর হয়ে যে চাবি হয়—তাহা তোমরা কি আর কখন ভুলিতে পারিবে? যদি তোমরা তবু ভুলিয়া যাও—তবে কাজেই আমাদিগকে বলিতে হইবে—তোমাদের উদ্ধাবের অত্র উপায় নাই—যদি উপন্যাস পাঠ করিয়াও ধর্ম বিজ্ঞান প্রভৃতি তোমরা না শিখিতে পার—তবে তোমাদের জন্ত আমরা হুঁশ্চিত ।

আমরা—অর্থাৎ ছোট বড় মাঝারি গ্রন্থকাবেরা—এবং ছোট বড় মাঝারি সমালোচকেরা—হুঁশ্চিত—অর্থাৎ বিভূষিত । যদি পাঠকের প্রবৃত্তি দোষে উদ্দেশ্য উপলক্ষিত না হয়, তাহা হইলে তাহাতে, গ্রন্থকার মহা বিভূষিত হন ।

বঙ্গের সাধারণ পাঠকের কেবল বাল-স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ কৌতূহল নিবৃত্তি কবিবার এবং মজা দেখিবার প্রবৃত্তি চবিতার্থ কবিবার ইচ্ছা বলবতী থাকাতাই, তাঁহারা নাবী জাতিব অন্তর্গত এবং পাঠকের একপ অগতীৰ প্রবৃত্তি হওয়াতেই—সকল শ্রেণীর গ্রন্থকার অগত্যা তাঁহাদের মনোবঞ্জনার্থ বাগ্র । ফল এই হইতেছে—পুস্তক পাঠে পাঠকের কণিক বঞ্জন হইলেই, পাঠক একটু মজা পাইলেই, আপনাকে চরিতার্থ মনে কবেন । সকল সদগ্রন্থেবই উদ্দেশ্য-লোক শিক্ষা । লোকে কিন্তু বঞ্জন অবঞ্জনই বুঝে, বঞ্জন হইলেই চরিতার্থ হয় । স্মৃতবাং বাঙ্গালার অধিকাংশ সদগ্রন্থই অধিকাংশ স্থলে বিভূষিত ।

ও দিকে আবাব অনেক গ্রন্থকার গ্রন্থ মাত্রেব আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া বাজে উদ্দেশ্য লইয়া ব্যস্ত হন । পালা ভুলিয়া গিয়া সঙের পর সঙ দিয়া বাজা শেষ কবেন । পূর্বে প্রতি পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণভোজন হইত, হুধ দয়ে মুখ দিবে বলিয়া সকাল হইতে বিড়াল বাঁধা হইত ; এখন ব্রাহ্মণভোজন আর হয় না, হুধ দয়ের সম্পর্ক নাই—কিন্তু পূর্ণিমায় বিড়াল বেচাবা বাঁধা পড়ে ; অনেক গ্রন্থেবও ঠিক এই দশা—হুধ দয়ের সম্পর্ক নাই—কিন্তু বিড়াল বাঁধা । আছে—সাবা দিন তার মেও মেওয়ানি—গল্প ত কেবল গল্প—হাঁক ছাড়িতে পাওয়া যায় না ।

সম্প্রতি ছইখানি উপন্যাস গ্রন্থ পাঠ কবা গেল ; ছইখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির । এই দুখানি তুলনা কবিলে, আমরা উপন্যাস গ্রন্থের গ্রন্থন-বহন্ত বোধ হয় অনেক বুঝিতে পারিব ।

একখানির নাম চন্দ্রা, অত্র খানির নাম জলাঞ্জলি ।*

* চন্দ্রা—উপন্যাস । কলিকাতা—বন্দ্যো ও মুখার্জি প্রকাশক । ১২০৪ ।

জলাঞ্জলি—নবজ্ঞান, এল এম দাস এও কোং দ্বারা প্রকাশিত । ঢাকা ।

গ্ৰন্থকাবের নাম বা কোনরূপ পৰিচয় নাই। অল্প মাত্ৰ পাঠ করিলেই বুঝিতে পাৰা যায়—যে চন্দ্ৰাৰ গ্ৰন্থকাৰ পাকা লেখক ও তুখড়ু গ্ৰন্থকাৰ এবং জলাঞ্জলি-কাৰ চিন্তাশীল লোক হইয়াও এখনও মল্ল কবিতােছেন। অথচ এটিও দেখিতে পাওয়া যায়, প্ৰবীণ নবীন উভয় গ্ৰন্থকাৰই চির-প্ৰাণাৰ্থায়ী পূৰ্ব লেখকগণেব উপব একটু সাহকাৰ, একটু স্নেহেব ক্ৰকুটি কবিতােছেন। চন্দ্ৰা-কাৰ বলিতােছেন—“আমবা এত কথা বলিতােছি, কাৰণ এমনি কতকগুলি বলিতাে হয়” (৩৬ পৃষ্ঠা)। ভাবটা, যেন পূৰ্ববৰ্ত্তী উপ-জ্ঞাস লেখকগণ বড় বাজে কথাব তত্ত্ব! জলাঞ্জলি দাতা প্ৰায় প্ৰথমেই বলিয়াছেন,—“আমবা স্বকপোল কল্পিত কিছুই বলি নাই, লোকেৰ যাহা বিশ্বাস ছিল ও যাহা জনশ্ৰুতি ছিল, তাহাই যথাযথ বৰ্ণন কাৰিয়াছি।” ভাবটা, যেন পূৰ্ব লেখকগণেব স্বকপোল-কল্পনা বড়ই নিন্দনীয়। উভয় গ্ৰন্থকাৰেবই যখন পূৰ্ব লেখকগণেব উপব ঐরূপ স্নেহ কটাক্ষ, তখন উভয়েই যে উপজ্ঞাস রচনে নূতন প্ৰণালী অবলম্বনেব চেষ্টা কবিয়াছেন, তাহা কিছু বিচিত্ৰ নহে। নূতন পন্থা খুঁজিতে গিয়া দুই জনে দুই বিভিন্ন দিকে গিয়াছেন। চন্দ্ৰা কাৰেৰ চেষ্টা—ভাষাব চুটকিতে চটক দেখাইব, ঘটনাৰ পব ঘটনা জুটাইয়া স্তম্ভিত কৰিব; পাঠকে হাঁফ ছাড়িতে দিব না; মনেব কথা ইঙ্গিতে বলিব, তোমবা আপন মনে পবেব মনেব ইচ্ছামত বিশ্লেষণ কবিও। জলাঞ্জলি-কাৰেব নবীনত্ব ভাষাব অকাপটে এবং কাষদাহীনতা; ২৫০ পৃষ্ঠাব উৰ্দ্ধ গ্ৰন্থে ঘটনা মোটে তিনটি। :স গুলি আবাব বঙ্গে নিত্য লক্ষিত,—বিবাহ, বৈৰাগ্য ও মৃত্যু। কিন্তু লোকেব মনেৰ ভাব তিনি বিশ্লেষণেব উপৰ বিশ্লেষণ কৰিয়াও পবিত্ৰত্ব হন নাই।

চন্দ্ৰাব গ্ৰন্থে তারতেব সেই অধিতীয় ঘটনা—সাতান্ন সালেব সিপাহী সমব; অভিনায়কগণ—ইংবেজ দ্বেষ্টা সিপাহী সকল—মহাকোশলী সন্ন্যাসী-কুল,—উম্মাদিনী তেজস্বিনী ভিখাবিণী—ইংরেজ শালিতা পাঞ্জাবী কুমারী চন্দ্ৰা—নানা সাহেব প্ৰমুখ বিদ্ৰোহীদল ও লৰ্ড ক্যানিং প্ৰত্ৰুতি ইংবেজের উচ্চ কৰ্ম্মচাৰী। চন্দ্ৰায় আছে—পুত্ৰতাগ, কন্যাতাগ, জীতাগ, স্বামীতাগ, গৃহতাগ; সমাজতাগ—ডাকাতি, দস্যুতা,—যুদ্ধ, বিদ্ৰোহ—সন্ধি বিগ্ৰহ—ক্ষমা নিগ্ৰহ—সঙ্গীন কাণ্ড, তুমুল ব্যাপার ও বিভীষণ বীভৎস দৃশ্য। জলাঞ্জলিৰ রঙ্গভূমি—অধিকাংশ বঙ্গ লেখকেৰ তুচ্ছীকৃত, ‘নগণ্য’ পূৰ্ব বঙ্গেৰ সামান্য দুইটি পন্নী—অভিনায়ক ও অভিনায়িকা—এতদঞ্চলীষ অবিকাংশেৰ উপহাস ভূমি—

‘বাস্তব’ নব-নাবী, আব ঘটনা—পূর্বেই বলিযাছি—বাস্তব নিত্য কল্প, দৃশ্য গৃহস্থের গৃহস্থালি, সামাজিকের সভাস্থল, কুলবধু পল্লিবেষ্টিত বিবাহ-বাসর এবং ভক্তি-সেবিত দেবী মন্দির। চন্দ্রা পড়িয়া, ঘটনাব ও মানুষের খতিয়ান কবিতাও জমা খরচ মিলাইতে পারি নাই, জলাঞ্জলিতে লেন দেন বড় সামান্য, জমা খরচ মিলাইলেও যা—না মিলাইলেও তাই। চন্দ্রাব বীর ভয়ানক বোদ্র অদ্ভুত বসে আমবা চকিত, স্তম্ভিত, বিস্মিত হইয়াছি, জলাঞ্জলির সামান্য, শাস্ত-করণে, নিঃশব্দ শাস্ত-করণে, অনাড়ম্বর শাস্ত-করণে, শাস্তিপ্রদ শাস্ত-করণে—আমবা মুগ্ধ হইয়াছি, চোখের জল ফেলিয়াছি। চন্দ্রার সকলই অদ্ভুত—রামচাঁদের পর-পুত্রে মেহ অদ্ভুত—নবীন সন্ন্যাসীর স্বদেশ-বাৎসল্য-বাক্যক গান অদ্ভুত, তাঁহাব কথা বাক্তি অদ্ভুত—প্রিথাবিরীষ স্বামী ভক্তি অদ্ভুত—চন্দ্রাব অভিমান অদ্ভুত—সকলই অদ্ভুত,—

কিন্তু চন্দ্রা নিশ্বাস ফেলিতে দেয় না, হাঁফ ছাড়িতে দেয় না, কাঁদিতে দেয় না—গ্রন্থ সমাপ্ত কবিতা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া একটু শোয়াস্তি হয়। বেল গাডিতে ত আমবা কত কি দেখিতে থাকি,—ঐ পাহাবাওয়ালা গলা ধাক্কা দিল—ইস, মানুষটা পড়ে ছিল একটু হলে, ঐ জল্ জল্ কবিতা কবিতা গাডী ছাড়িয়া দিল। ঐ এক জন সাহেব চলন্ত গাডীতে দৌড়িয়া উঠিল—সেই পাহাবাওয়ালাই সেলাম কবিতাছে, ঐ কয়লাব খনিতে আগুন লাগিয়াছে—কি ভাষণ ধুম।—আহা বুড় মিন্‌সে আচাতে এসে পড়ে গেল গা—হুব মাগী, শীগ্‌গিব তুল্‌সে, হাসিস্ কেন ? বা। কাজি পাডায় দম্-মাদার বাহির হইয়াছে—বাঁশটা পড়িল পড়িল, খুব সাম্‌লেছে, সাম্‌লেছে কৈ ? এ পাড়ায় এদেব ছেলে মবেছে। ঐ মেয়ে মানুষটিবই ছেলে হবে—দুব খাশী আব জলে ডুবে মরে না—কেবল বামে জমা কবিতা শিখিয়াহিস, এখন ডাহিনে খরচ লিখিতে শেখ—ত্রিশ বিঘা ধবিল না—ঐ হুগলি—কত কি অদ্ভুত দেখিতে-ছিলাম বটে, তবু বাড়িতে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া শোয়াস্তি হয়। চন্দ্রাব পর জলাঞ্জলি পাঠ কবিতা কবিতা আমাদেব ঠিক সেই রূপ মনের অবস্থা হয়। সেই ঘর্ষবারি ঝড়ঝড়ানি এড়াইয়া, সেই চলৎ চলৎ চলৎ ভাব ছাড়াইয়া, নিবেট মাটির উপর বসিয়া একরূপ অপূর্ব আনন্দ পাইলাম। এককণ নাশা ভাবে কেবল হা কবিতা দেখিতেছিলাম, এখন ঘবে আসিয়া ক্রমে ক্রমে কাঁদিতে পারিলেও আরাম আছে। চন্দ্রা বিপ্লব—জলাঞ্জলি আবার।

চন্দ্রা ও জলাঞ্জলিৰ আৰও একটু তুলনা আবশ্যক। আৰ্জি কালি
বাঙ্গালিৰ প্ৰায় সকল গ্ৰন্থেই দেশভক্তিৰ ভাব—কোন না কোনৰূপে দেখিতে
পাওঁয়া যায়। এই দুই গ্ৰন্থেও আছে। কিন্তু বড় ভিন্ন মূৰ্ত্তিতে। সাতাল্ল
মালেৰ সিপাহী সময়ৰ কথা যে গ্ৰন্থেৰ উপজীব্য, তাহাতে দেশভক্তি অবশ্য
প্ৰসঙ্গতই থাকিব, চন্দ্রাতে সেই ভাবেই আছে; তবে চন্দ্রা উপজ্ঞাসেব
সুকল দেশভক্তিৰ মূলেই সংসাৰ বিবাগ আছে। একজন্মক অতি শিশু
কালে তাহাব মা পাগল হইয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া গেল; যে দয়া পৰবশ
হইয়া কুড়াইয়া লইয়া প্ৰতিপালন কৰিতে লাগিল, ঘটনাক্ৰমে তাহাব জেল
হইল। তাহাব স্ত্ৰী দাসী বৃত্তি অবলম্বন কৰিয়া ছেলেটিকে মানুষ কৰিতে
লাগিল বটে, কিন্তু ছেলেটিব বড় মানুষেব বাড়ীতে লাঞ্ছনাৰ শেষ হইল,
মিছামিছি চোঁব বদনাম পৰ্য্যন্ত দিলে—ছেলেটি প্ৰাণেৰ ভয়ে সংসাৰত্যাগী
হইল—সেই সোমনাথ একজন দেশভক্ত। আবাব সোমনাথকে যিনি
দেশভক্তিতে দীক্ষিত কৰিয়াছেন, তাহাব সমাচাৰও বলি। এক ব্যক্তিকে
বিনা অপবাধে কাবাগাবে হত্যা কৰা হয়। জনাৰ্দন নামে তাহাব একটি
পালিত পুত্ৰ ছিল, সে সেই পালক পিতাব অপঘাত মূহূৰ প্ৰতিশোধ লইতে
প্ৰতিজ্ঞা বদ্ধ হইল। হঠাৎ প্ৰেমেব ফাঁদে বাঁধিয়া গেল। একটি কুমাৰীকে
বিবাহ কৰিয়া ঘৰকল্ল কৰিতে লাগিল। অযোধ্যায় একটি তালুক কিনিয়াছিল,
ইংবেজেরা তাহা কাড়িয়া লইতে চান—সে বাগান হইয়া একজন ইংরেজ কৰ্ম-
চাৰীকে বধ কৰিল। স্মৃতবাং গা-ঢাকা দিয়া বাস কৰে। এক দিন ব্যক্তিৰে ঘৰে
আসিয়া দেখে, যে তাহাব স্ত্ৰীৰ কাছে একজন সাহেব বসিয়া আছে। আবাব
সন্ন্যাসী হইল, ইংবেজেব শত্ৰু হইল, স্মৃতবাং দেশভক্ত হইল। আৰ একজনেৰ
কথা বলি। বমানাথ কলিকাতাৰ একজন বড় মানুষেব অতি বয়সে ছেলে;
সহৰে নুতন আমদানী বিবিয়ানা চালেব একটি বমণীৰ উপৰ বমানাথেব
শুভ দৃষ্টি পড়িল। বমানাথ দেখেন সেই বমণীকে একজন সন্ন্যাসী গাড়ী
কৰিয়া আনিল—এ কথায় সে কথায় সন্ন্যাসীকে মাৰিতে গেলেন, স্বয়ং
মাব খাইলেন। কতকগুলো গুণ্ডায় ধৰিয়া লইয়া গেল; পঞ্চাশ হাজাৰ
টাকা দিয়া মুক্তি পান। সন্ন্যাসী বেশে সেই বমণীৰ ব্যাভীতে গেলেন, চোৰ
বলিয়া বৃত্ত হইলেন, কাৰাগাবে বন্দী হইলেন। শেষে প্ৰণয় বৈৰাগ্যেৰ
সন্ন্যাসী হইলেন। ইনিও একজন স্মৃতবাং দেশভক্ত। তাহাতেই বলিতেছিলাম
চন্দ্রাৰ দেশভক্তি—সংসাৰ বিবক্তিৰ বল। একেই যেন তাড়া খাইবা, সোজা

পথে কাঁটা দেখিয়া, দেশভক্তির বাক। পথে প্রবেশ কবিয়াছেন। স্বয়ং নামা সাহেব বাজ্যলালসায় উন্নত ; তাঁহার সহচর আজিম উল্লা খেত-রমণী-সন্তোগ লালসায় ততোধিক উন্নত। অর্ন্তএব দেখা দাইতেছে যে, চন্দ্রা উপন্যাসেব দেশভক্তি—কোথাও জন্মিতেছে সংসার জালায়, কোথাও লালিত হইতেছে—ভোগ লালসায়। এইকপ দেশভক্তি লইয়াই কি সাতার সালের বিপ্লব? ঠিক জানি না, কিন্তু বিশ্বাস কবি অন্তরূপ।

জলাঞ্জলি দেশভক্তি সম্পূর্ণ অন্তরূপ, হিন্দুব সংসার ধর্ম্মেই ইহাব উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি। এ দেশভক্তির বড় মুহূর্ত্ত মুক্তি। এ দেশভক্তিতে চন্দ্রার বিপ্লব ত নাইই—এখনকাব দিনেব মত বজ্রতা, বলশ্টিয়াব, ভারতোদ্ধাব, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি ধৈর্যবত নিখাদেব কিছুই ইহাতে নাই ; সহজ স্রবেব সঙ্গে কেবল কড়িমধ্যমেব একটু যোগ আছে। নমুনা দিতেছি ;—

“সিকদার। দূব পাগল। সাহেবেব স্ত্রীকে যেম বলে তাই, জান না?

জয়চন্দ্র। স্ত্রী! তা স্ত্রীপুরুষে এক সঙ্গে এ বকম কবে বাহিব হয়।

সিকদার। এবা মানুষ নয়। দেবতা। দেবতাদেব মধ্যে স্ত্রীপুরুষে লজ্জা নাই। * * * * [স্রবেব সঙ্গে লুকান কড়িমধ্যম বহিল যে, উপদেবতা হইলেও হইতে পাবে।]

জয়চন্দ্র। হবে। আচ্ছা, ওবা এই গবমেব দিনে ঐ বনাতেব কাপড়গুলি গায়ে দিয়া বহিয়াছে কেন? মেঘ নাই, বোজ্র নাই, ছজনেই একটা ‘মাতলা’ মাথায় দিয়া দাইতেছে কেন?

সিকদার। কে জানে বাবা, আমি তোমাব এ বিটকেলে কথার উত্তর দিতে পারি না। ওবা ঐকপ কাপড় পড়ে।”

বিটকেলে কথা বলাতেই আচরণটি বিটকেল বলা হইল—ইহাতেও “কড়ি মধ্যম লাগিয়াছে। অত স্থানে আব একটু চড়া স্রব আছে—শুনাইতেছি।

কালুসর্দার অপূর্ণ খেল দেখাইল। “লক্ষণ বায় মহাশয় সাবাস্ সাবাস্ বলিয়া কালুকে দশ টাকা বকসীস্ দিলেন ও চৌধুরী মহাশয়কে বলিলেন, “তোমবা নিজেবাই পূর্কপব লাঠিয়াল, মানুষ মাবা কত বকম কল জান। তোমাদেব লোক জন আব এ বিষয়ে দক্ষ হইবে না কেন?” চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, “লাঠিয়াল একটা গালি নয়, আমাদেব মত পূর্কপব সকলিই লাঠিয়াল হইলে বিপুল সুসভ্য হিন্দু জাতি যবনেব পদানত হইয়া আত্মকুলে কালি দিত না। নোঁয়নাথ দেবমন্দিরের চন্দন কাঠেব কবাট শ্লেচ্ছ

অসুজ্জিমে স্থূলিত না। বোগ, জ্যোতিষ, দর্শন, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি স্বল্প-
শক্তি যবনায়িতে ভস্মীভূত হইত না। ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন ভুলিয়া যাইতেন
না। হিন্দুব গুল আচাৰে যবনাচারেব কালিয়া পড়িত না, কুলাস্বাব হিন্দু
কুল এক যবনের নিধন দেখিয়া অবদর পাইয়াও অল্প যবনকে ডাকিয়া
আনিয়া সিংহাসনে বসাইত না। 'খাল কাটিয়া কুমৌর আনিত না। হিন্দু
শিরোভূষণ কোহিনূর অহিন্দুব শিরে আলোক প্রদান কবিত না, মুসেবেব
নিকট গঙ্গা বঙ্গভীচর বক্ষে ধারণ কবিয়া অসাব হিন্দুগণকে দেখাইতেন
না।" লক্ষণ বায় মহাশয় দেখিলেন চৌধুরী মহাশয়েব চক্ষু হইতে জ্যোতি
বাহিব হইতেছে এবং তাঁহাব সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। তিনি বলিলেন, "তাই,
তুমি যাহা যাহা বলিলে, সকলই সত্য কিন্তু সময় গিয়াছে; এত আব-
জ্ঞনা পড়িয়াছে যে, তোমাব আমাব মত ছই জন বৃদ্ধ মেথবেব এ আব-
জ্ঞনা পবিধার কবিবার কাজ নষ।" চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "সময়
কখন যায় না।"

এই রূপ স্বব চড়াইতে গিয়া, তানেব উপব গিটিকির দিতে গিয়া, জলা-
ঞ্জলিকাব জলাঞ্জলিব পূর্ণাবাম ভঙ্গ কবিয়াছেন। যেখানে প্রদর্শন, সেই
খানেই বিড়ম্বনা—কাজেই একপ স্থলে গ্রন্থকাব বিড়ম্বিত হইয়াছেন। কিন্তু
একপ স্থলে চন্দ্রাব উচ্চাস বডই ক্ষুণ্ণিয়। পূর্বেই বলিয়াছি চন্দ্রাব গ্রন্থকাব
রস বচনে বিশেষ পটু, প্রদর্শনের প্রদর্শনা লুকায়িতে বিশেষ পারদর্শী, একটু
নমুনা দিতেছি,—

"কাদিতে সাহস হয় না," সিপাহীবা একথা বুলিতে পারিব না।

যুবা বলিতে লাগিল—“আপ্না সাহেবেব মৃত্যুর পর যখন দেখ পোষা-
পুল্ল বহিত কবিয়া মৃত রাজাব স্বর্গপথ রোধ কবিল, যখন সেতাবা বাজ্য
বলপূরক অধিকার কবিল, অট্টালিকা লুণ্ঠন কবিয়া নিলামে ধবিল, অনা-
ধিনী রাণীগণেব বোদন যখন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, কে কাদিতে
সাহস কবিয়াছিল? সর্বগ্রামী যেত রাজ্য যখন নাগপুর গ্রাণ কবিল,
হিন্দুব চির প্রচলিত প্রথা ধ্বংস হইল, রাজপুত্রদিগকে ভিখারী কবিল? কেহ কি
কাদিত সাহস কবিয়াছিল? কেরোনি যখন শ্রীকৃষ্ণ চাবিল, ঝানাসখন পদতলে
দলিল, প্রজাব হাহাকাৰে গগন বিদার হইল, সমস্তপুবেব কথার কাহিনী স্বদন
না বিদীর্ণ হয়, কিন্তু সাহস কবিয়া কেহ কি কাদিতে পারিব না? স্নেহ
নীড়নে বাসিরাও পেশওয়া যখন রাজ্য হার হন, কার প্রাণ না কাদিয়াছিল?

কিন্তু কাদিতে কে সাহস করিয়াছে ? কুবেরপুরী অযোধ্যা ভিক্ষুকাগাব হইল, ওয়াজানালি বন্দী, দিগুমগুল হাহাকারপূর্ণ—কাব হৃদয় না বিদৌৰ্ণ হয় ? কিন্তু কাদিতে কি কেহ সাহস করিয়াছিল ? যখন স্নেহ ভরে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দণ্ডে ‘কাহুঁজ’ কাটিবে, কাদিতে কে সাহস করিবে ?

সকলেই স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিল ।”

সন্ন্যাসীর মূখে এ সকল কথা শুনিলে যে সিপাহী সকলে স্তম্ভিত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? পড়িতে পড়িতে আমাদিগকেই স্তম্ভিত হইতে হয়—সত্য সত্যই মনে হয়—যেন কান্না আসিতেছে অথচ কাদিতে পারিতেছি না। চন্দ্রা গ্রন্থের ইহাই উৎকৃষ্ট গুণ। পূর্বেই বলিয়াছি ইহাব দোষ—চটক চমকেব অনববত প্রদর্শন, অঘটন ঘটনাব নিযত ঘটঘটানি, ইহাতে ঘটনাব বিপ্লবে মানসিক বিপ্লব ঢাকিয়া বাখিয়াছে। গ্রন্থকাব প্রদর্শন পটু বলিধা অনববত দৃশ্যের পব দৃশ্য পরিবর্তন কবিযাছেন, দেশভক্তির বীজ সংসাব বৈবাগ্যে বপন করিয়া নিঃস্বার্থ দেশভক্তিব অহুপপত্তিব অসাধু সঙ্কেত কবিযাছেন এবং চন্দ্রাব প্রগাঢ় প্রণয়ে দাকণ অভিমান আবোপ কবিয়া চন্দ্রাব হিন্দু-বয়সীত্ব নষ্ট কবিযাছেন। হিন্দু নাবী ক্রমা, চন্দ্রা নহে।

জলাঞ্জলি-কাবের লেখা কাঁচা—হৃদয় পোক্ত। তিনি প্রদর্শনের পন্থা সাধাবণত পবিত্যাগ করিয়া ভালই কবিযাছেন। তিনি মনোরঞ্জে লক্ষ্য না কবিয়া আবাব উপন্যাস আকাবে তাঁহাব হিন্দুতাব ব্যক্ত ককন, ইহাই আমাদেব অহুরোধ। লেখা লিখিতে লিখিতেই পাকিবে। চন্দ্রাব উপন্যাস-কর্তাকে অহুরোধ, তিনি ঘটনাব আবর্জনা কিছু কমাইয়া, তাঁহাব জমাট লেখায় জমাট ভাষায় একখানি চমক চটক বিবর্জিত উপন্যাস বঙ্গীয় পাঠককে এবার যেন উপহার দেন।

সেকালের দারোগার কাহিনী ।

পরিচয়ে সমালোচনা ।

নবজীবনের তৃতীয় বৎসরের আবেশে, ১২৯৩ সালের শ্রাবণ হইতে। সেকালের দারোগার কাহিনী প্রকাশিত হইতে থাকে, চতুর্থ বৎসরের শেষে ১২৯৫ সা.লর আষাঢ়ে কাহিনীগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে। কাহিনীগুলির খণ্ডশ প্রচারে আমবা কিঞ্চিৎ উদ্যোগা ছিলাম, এক্ষণে এই পুস্তক প্রচাবেব অবসবে, দারোগা মহাশয় এবং দাবোগা মহাশয়ের কথিত কাহিনীগুলি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসব হইল, গিবিশবাবু নবদ্বীপের দাবোগা হন। গিবিশবাবু ঢাকা জেলাব বিক্রমপুর পবগণাব অন্তর্গত মালখা নগরেব বস্তু গোষ্ঠী গম্বুত। এই বস্তু গোষ্ঠী অতি প্রাচীন। মালখা নগরেব সে-ষবেব ইষ্টকালকে বঙ্গাব্দেব খোদিত বিববণে জানিতে পাবা যায় যে, ইহাবা ঔরঙ্গজেব বাদশাহের আমল হইতে ঐ নগরে বাস করিতেছেন। এই বংশ যেমন প্রাচীন, তেমনি সম্ভ্রান্ত এবং পূর্বাঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহাব পব, গিবিশবাবু হিন্দু কলেজেব সীনিয়ার স্কলাব, ইংরাজিতে সু-পাণ্ডিত এবং বিশেষ ব্যুৎপন্ন। যখন গিবিশ বাবু চাকরিতে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত লাল মোহন ঘোষেব পিতা এবং গিবিশবাবুেব মাতুল বায় বামলোচন ঘোষ বাহাদুর কৃষ্ণনগরেব সদব আলা। তাঁহাব নাম ডাকে তখন কৃষ্ণনগর অঞ্চল প্রতীধ্বনিত হইত। স্মৃতবাং গিবিশ বাবু বড় লোকেব ভাগিনা, বড় ঘরেব ঘবানা, এবং ইংবাজি শিক্ষায় বড় মর্দানা ছিলেন, তাঁহার মত উচ্চ বংশোদ্ভব, উচ্চ সম্বন্ধে পবিচিত, এবং উচ্চ শিক্ষায় উন্নত লোক তখনকার দিনে দারোগাগবিতে অতি অল্পই প্রবেশ কবিষাছিলেন। আর তখনকাব দিনেই বা বুলি কেন? এখনকার দিনেও,—এই বিশ্ববিদ্যালয়েব বিদ্যা ছড়াছড়িব দিনে—গিবিশবাবুেব মত লোক সবইনস্পেক্টরি বা ইনস্পেক্টবিতে কয়জন আছেন? ভাল লোক প্রায়ই পুলিশের ঝঞ্ঝে বান না—ইহা কতকটা আমাদেরব অর্থাৎ লোকেদেব দোষ, আব কতকটা

লোক শিক্ষক, লোক-প্রতিপালক সরকার বাহাদুরের দোষ । বড় নিষ্ঠুর না হইলে, পুলিশের কার্যে সফলতা হয় না, গিৰিশবাবু স্বয়ং বলিয়াছেন,

“আমিও তাহাকে বরকন্দাজের গাবদে একদিন একবার সম্পূর্ণরূপে উপ-
হাসী রাখিলাম, কত ছিদং করিলাম, এবং তাহাব প্রতি আব যে সকল ব্যব-
হাব করিলাম, তাহা এখানে লিখিতে লজ্জা বোধ হয় । হা! পবমেশ্বর এই
সকল নিষ্ঠুরাচরণের নিমিত্ত বুঝি আমি এই বৃদ্ধ বয়সে তাহাব ফল ভোগ
করিতেছি।”

“বরমেব ভিক্ষা, তরুতলে বাস—তথাপি যেন ভদ্র সন্তা-
নেরা পুলীশের চাকরি না কবেন !!”

গুণধর গিৰিশবাবু দাবোগাগিবিতে প্রবেশ করিয়া কৃত্তিক দেখাইয়া-
ছিলেন, কি অকৃতি হইয়াছিলেন, সে কথাব বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি, সে
পরিচয় নবজীবনের পাঠকেবা পাইয়াছেন ও পুস্তকেব পাঠকেবা পাইবেন,
পুস্তকেব সম্যক পরিচয়ার্থ গিৰিশ বাবুব যতটুকু চৌহদ্দী জানা আবশ্যক আমরা
তাহাই দিলাম । আমাদের কথাটা এই দাবোগাব কাহিনী—হবিদাসের
শুশ্রূষা অথবা বামদাসের ব্যক্ত কথা নহে, দাবোগাব কাহিনী—সত্য সত্যই
দাবোগা গিৰিশচন্দ্র বসুর লিখিত আপন জীবনের আংশিক কাহিনী ।

দারোগাব কাহিনীর উদ্দেশ্য গিৰিশবাবু স্বয়ং সবল ভাষায় সবল ভাবে
ব্যক্ত করিয়াছেন । “আজকাল কতজন কত রূপক, কত নাটক, কত কবিতা
লিখিতেছেন ; কিন্তু কেহই দেশের অব্যবহিত পুন্যকালের বৃত্তান্ত সমস্ত আপন
আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে বিবৃত করিতে লেখনী ধারণ করেন নাই । অনেকে
অনেক বিষয় লেখা অযোগ্য বলিয়া তুচ্ছ কবিত্তে পাবেন, কিন্তু যিনি ভবি-
কালে বঙ্গ দেশের ইতিহাস লিখিবেন তিনি দেখিবেন যে, অনেক তুচ্ছ সংবাদ
অভাবে সম্পূর্ণ ইতিহাস অঙ্গহীন থাকিবে । এই বিবেচনার কেবল বর্তমান
পাঠক গণেব মনোবল্লভেব নিমিত্ত নহে, কিন্তু ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদিগের
সাহায্য উদ্দেশে, এই দেশেব দল্লাদিগেব কীর্তি কলাপেব এবং সেই সঙ্গে ভূত
পূৰ্ব্ব পুলিশের বাধ্যপ্রাণীবি যতদূর পাবি বর্ণনা কবিত্তে প্রবৃত্ত হইলাম ।”
সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন ইংরেজ নীলকবদিগেব ও বাঙ্গালী জমীদারদিগেব
প্রাণ প্রতাপ ও ততোধিক বিস্ময়কর পতনেব বিবরণও দাবোগাব কাহিনীতে
আছে । অসুস্থ তখনকার সাহেব শুভাব আচাৰ ব্যবহার, গবীবি চঃখী

বীতি নীতি এবং সাধারণত দেশের লোকের আদর্শ আক্ষিপের এবং সুখ দুঃখের অনেক কথা আছে।

কথায় বলে,—বলে,—আসলের কাছে আবাব নকল? Truth is stranger, stranger than fiction. সত্যাহি ঘটনা চিত্রা কল্পনাতে ইতিবিজতে। সত্য যদি বৃত্তিতে জান, দেখিতে জান, বলিতে জান, লিখিতে জান—তবে সত্যের অপেক্ষা অদ্ভুত আর নাই। গিরিশ বাবুর বলিবাব, লিখিবাব শুধে দাবোগাব সত্যকাহিনী বড় অদ্ভুত বৃত্তান্ত। অনেক উপন্যাস হইতে এই অনু-ভাস বড়ই অদ্ভুত। গিরিশ বাবুর বর্ণনাব রসময়ী বহিম ভঙ্গিয়া দেখিয়া কল্পনা বহুদূরে দিলীকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আসবে জগৎ মন-মোহিনী কীৰ্ত্তন গাহিতেছে দেখিয়া বামা আব পা ধুইল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিয়া চলিয়া গেল।

গিরিশ বাবু মনোহরকে বর্ণন কবিত্তেছেন,—“মনোহর আসিয়া আমাকে নতশিরে দণ্ডবৎ কবিল। দেখিলাম তাহার উজ্জল শ্রামবা; আবও স্ব-সচ্ছন্দে অবস্থায় তাহা গোবর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারিত। দেহ মধ্যম ছন্দ, কিন্তু গঠনে প্রচুর বলেব আকাব দৃষ্ট হইল। অতি প্রশস্ত বক্ষঃস্থল; গুহ বাহুগুণল, কোমব চিকণ; উরু ও তাল্লম্বস্থ অঙ্গদ্বয়ও বলেব লক্ষণ বিশিষ্ট, গলদেশ মোটা ও খাটো—যাহাকে পাবনী ভাবার কোতাগর্দন বলে। চক্ষু ছোট, পিট পিট কবিয়া তাকায় এবং আমার বোধ হইল তাহা কিঞ্চিৎ দূরবর্ণ—কিন্তু চক্ষু ভিন্ন মুখেব অত্র কোন অঙ্গ নিশ্চিনীয় নহে। * * * মনোহরের পরণ পরিচ্ছদে এবং ভাব ভঙ্গিতে বোধ হইল, যে ভদ্রলোক বলিয়া পবিচিত হওয়া তাহার সম্পূর্ণ অভিলাষ ছিল এবং প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে ভদ্রলোক বিন্ধাও অনেকের ভ্রম হওয়া অসম্ভব ছিল না, কিন্তু ব্যাটা চুলে ধবা পড়িত; কেননা গোয়ালারিগেব সাধারণ প্রথাঙ্গুসারে তাহাব চুল শুষ্কার ছিল।”

দেখ, কেমন একটা আদর্শ গোয়ালার মন খাড়া হইয়াছে—আর কল্পনা কি করিবে বল? তাহাতেই বলিতেছিলাম—আসলের কাছে কি নকল?

গিরিশ বাবুর ভাবার কথা পরে বলিতেছি, এইস্থলে ভাবার একটা বিচিত্র কাহিনীর কথা বলা আবশ্যিক। “কিন্তু ব্যাটা চুলে ধবা পড়িত।” হঠাৎ এই ব্যাটা কথাটি ব্যবহার করিতে গ্রহকার—মনোহরকে আশনার সম্মুখে আনি-য়াছেন, সে যে হীন জাতীয় তাহা বলিয়া দিয়াছেন এবং অবজ্ঞা হটনায় তা-র অতি ঘৃণা দেখাইয়াছেন। ঐ ক্ষুদ্র কাহিনীর শুধে আমরা মনোহরকে বেন

চোখের উপব দেখিতে পাই—আব সে যেন অপদস্থ হইয়াছে—আব গিৰিশ বাবু টপি টপি হাসিতেছেন—এমনই মনে হয়। গিৰিশ বাবুর বর্ণনা কল্পনাব সাহায্য লয় না, কিন্তু নিজে কল্পনাব সাহায্য কবিয়া থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি গিৰিশ বাবু ইংবাজিতে সুশিক্ষিত এবং গ্রন্থেই প্রকাশ তিনি দারোগাবিতে দীক্ষিত। এই শিক্ষায়, দীক্ষায় গিৰিশ বাবুর ভাষা সাধারণত ইংরাজির পরিভ্রুতি ও ভাব-ব্যঞ্জকতা এবং দাবোগা মহাশয়ের রিপোর্টের জটিলতা ও দীর্ঘচ্ছন্দতা পাইয়াছে। গিৰিশ বাবুর ভাষায় ঘনঘটাব ঘোরতর গভীর গর্জন নাই, কুসুম সুসমার মুহুমন্দ হাসিও নাই কিন্তু তথাপি ভাবের পবিপোষণে একরূপ দীর্ঘচ্ছন্দতা আছে, বিপোর্টেব মত একটি বাক্যেব (Sentence) মধ্যে দুইটা গর্ভ বাকা আছে—কিন্তু ভাবের ধুমবিমা কোথাও নাই; শরতের আকাশের মত সর্বত্রই পরিদ্রাব, সর্বত্রই জল্ জল্ করিতেছে। তাঁহার ভাব তাঁহার ভাষার কাছে কোথাও কিছুমাত্র ধার করে নাই—তাঁহার ভাষা সর্বত্রই তাঁহার ভাবের কাছে ঋণী—এই ঋণ আর একটু শুধিতে পাবি-লেই ভাল হইত।

দাবোগার কাহিনীৰ আর একটি গুণ, ইহাতে গ্রন্থকার প্রায়ই কোন পক্ষ অবলম্বন কবেন নাই—নীলকব, জমীদার,—ধনী, হুখী—পোলিস প্রহরী—সকলেবই দোষ গুণ তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। নিজের দোষ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তবে তাঁহার উপরওয়ালাদের সমস্ত দোষের কথা তিনি যে বিবৃত করিয়াছেন—একথা বলিতে আমবা পাবিব না। নাই পারি, তথাপি বলিব যে, দাবোগাব কাহিনী, এক চোখো—এক ঘেয়ে—একপক্ষপাতের লেখা নহে।

গ্রন্থকাব ছোট কথা তুচ্ছ করেন ন'। মনোহর যখন টেকিতে বাধা তখন থোষ্টা জমাদার আসিয়া একজন চোকীদারের বস্ত্র দিয়া সেই টেকীৰ ধূলা পরিষ্কার কবিয়া, সেই টেকীতে বসিল। এ সকল অতি ক্ষুদ্র কথা—দাবোগা মহাশয় তখন লক্ষ্য কবিয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত ভুলেন নাই এবং আমাদের কাছে বলিতেও ভুলেন নাই। যে ছোটকে ভুলে না, সেইত ভাল; সেইজন্ত আমরা বলি,—যথা কঁথা বর্ণনায় গিৰিশ বাবু একজন ভাল লেখক। আর তাঁহার কাহিনী, অরঞ্জিত ঘটনাব নিবপেক্ষ, ধীর, বিখন্দ বর্ণনায়, আমাদের বাঙ্গালী ভাষায় সর্ব প্রথম অখচ সর্ব-জন-বজন উপাদেয় গ্রন্থ।

মূৰ্খ ।

(সমাজ বহুত)

প্রথম অধ্যায় ।

“মূৰ্খ”—অনেকেব মুখে শুনিয়াছি, আমাকেও লোকে বলিয়াছে, আমিও হয়ত ছ একজনকে বলিয়া থাকিব,—কিন্তু হৃৎপের বিষয় এই, উহার সূত্র অবগত নহি। লেখা পড়া না জানিলে যদি মূৰ্খ হয়, তবেত জগতের বেশী লোকই মূৰ্খ। “দশ জনের মত হওয়া চাই”; এই কথাৰ যদি কোন সার্থকতা থাকে, তবে মূৰ্খ হইলেই বা ক্ষতি কি? আর যদি লেখা পড়া শিখি-য়াও মূৰ্খ হইতে পাবা যায়, বা অন্য লোকের তাহাকে মূৰ্খ বলিবার অধিকার থাকে, তবে একজনকে মূৰ্খ বলিলে সে চটে কেন? মূৰ্খ শব্দের সহিত ইংবেজী “ডনস্” শব্দের যদি সাদৃশ্য থাকে, তবেত মূৰ্খ অর্থ—ঘোর তार्কিক পণ্ডিত, কেননা “ডনস্-স্কোটস্” একজন কুট তार्কিক পণ্ডিত ছিলেন। ডনস্ স্কোটস্ ইংবেজদেব, এবং যণ্ডামার্ক আমাদের,—উভয়ই পণ্ডিত, কিন্তু দশজনেব জিহ্বার বলে ইহারা মূৰ্খের আদর্শ শ্রেণীভুক্ত।

আমাদের ভূতনাথকে এইকপ মূৰ্খের শ্রেণীভুক্ত বলিতে পারি না। কেননা ভূতনাথ পণ্ডিত নহেন, বা তार्কিকও নহেন। তথাপি তাহার দেশের লোকে তাহাকে বলে “মূৰ্খ”!

বাল্যকালে লেখা পড়া শিখিবার অগ্রে সকলেই মূৰ্খ। কিন্তু তখন হই-তঁই ভূতনাথ মূৰ্খ এবং তাহার সমবয়সীগণ পণ্ডিত। কেননা ভূতনাথ পিতৃহীন, অনাথিনী দুখিনীর সন্তান, বঙ্গহীন, তৈলহীন, আদব হীন, অকহীন, ধুলিতে লুটাইয়া ভূতের মত থাকিত। আব তাহার সমবয়সীরা নিকর-বৃকর পরিয়া, জরির টুপি জবিব পাড়কা পরিয়া, দাস দাসীর কক্ষে বক্ষে স্কন্ধে শিরে গহনার ঝাঙ্ক শোভা পাইত। সূতরাং তাহারা পণ্ডিত, ভূতনাথ মূৰ্খ।

ভূতনাথ স্কুলে যাইতে শিখিল। তাহার সমবয়সীবাঁও যার। ভূতনাথের পড়া হইতেছে কি না, গ্রাম্য শিক্ষক দেখিয়াও দেখেন না। আর তাহার সম-বয়সী বাহারা,—তাহাদিগকে ক্রোড়ে করেন, চুম্বন, একবারেক বায়ুগায় দশবার পড়া বলিয়া দেন। আর ভূতনাথ কিছু জিজ্ঞাসা কবিলে, নালিকা

কুণ্ঠিত কবিতা স্বৰ্ণাব ভাবে “ধাং ছোঁড়া, এটা মূৰ্খ হইবে” বলিয়া চলিয়া যান।
তখন হইতেই গ্রামেব লোকে টেব পাইল, ভূতনাথ মূৰ্খ হইবে।

এই ভাবে পড়া শুনা চলিতে লাগিল। গ্রামেব ছেলেরা ইংরেজী তিন
চানিখানা বহি সাঙ্গ করিল, ভূতনাথও নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহা
ধরিল। তবে ঘোষেব মধ্যে এই স্কুলেব ডিপুটী হাকিম আসিলে সকলে যাহা
পারে না, সে তাহা কহিতে পাবে, আব সকলেব আগে অঙ্ক কষিয়া দেয়।
সুতরাং ভূতনাথ মূৰ্খ আব তাহার সহপাঠীগণ পণ্ডিত। ক্রমে বয়সেব সঙ্গে সঙ্গে
সকলেই স্কুলে পড়িয়া পণ্ডিত হইতে লাগিল, কেবল ভূতনাথেরই মূৰ্খতা বাড়িতে
লাগিল। পূৰ্বেই বলিয়াছি—ভূতনাথ গৰীব। সুতরাং তাহার আব পড়া চলে
না, সে কেতাব কিনিতে পাবে না, স্কুলেব মাছিয়ানা যোগাইতে পাবে না।
গ্রামে দশ ঘর অবস্তাপন্ন লোক আছে, জমীদার ধনকুবের জ্ঞাতিও আছেন,
কিন্তু কেহ কিছু সাহায্য কবে না। সাহায্যেব মধ্যে ভূতব মা জ্ঞাতি বাড়া
রীতিয়া ছুটী নিজে যায়, পাতে যাহা থাকে, ভূতো যায়। ভূতনাথের মা দ্বিত্য-
মানা হইয়া কাহারো কাছে ভূতব মাছিয়ানা বলিয়া, কি কেতাবের দাম
বলিয়া কিছু সাহায্য চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ এই বলিয়া আপত্তি কবেন,
“ও ছোঁড়া মূৰ্খ হইবে, ওব আব পড়িয়া দবকাব কি।”—ভূতব মা কাদিয়া
কিবিয়া আসেন।

ভূত এখন ছোট নয়, তেব বৎসরেব হইয়াছে। লোকেব চক্ষু দেখিয়া
হৃদয় বৃত্তিতে পাবে। লোকেব কথা বিশ্লেষণ কবিতা উহাতে কতটুকু মধু
কতটুকু নিম্ববস আছে বৃত্তিতে পাবে। মায়েব কণ্ঠ—নিজেব হীনভাব—বৃত্তিতে
পাবে। এক দিন বাটীব উঠানে দাঁড়াইয়া উত্তর দক্ষিণ পূৰ্ব পশ্চিম ও স্বৰ্ণ
পানে চাহিয়া দেখিল। দেখিল সব অন্ধকার। পৃথিবী অন্ধকার। দয়া
মায়ী স্নেহ সহানুভূতি কিছুই নাই। শূন্যে বিহগ, বনে শূগাল, পথে কুকুর
বিজ্ঞান, মাঠে গরু মহিষ গাধা, গৃহে মানুষ, সকলই চিত্রপট, সকলই সমান।
দেখিল—সকলই বুধা, সকলই—রূপ-রস-গন্ধ-বিশীন। মনে বিরাগ জন্মিল,—
ভাবিল পশু হইলাম বু! কেন, সকলই পশু হইল না কেন? পশু যদি
মানুষেব অধম হয়, তবে মানুষের এত বন্ধাট কেন? টাকা নাই, কাপড় নাই,
খাবাব নাই তাই বলিয়া কি সংসারে মিষ্ট মুখও নাই। মিষ্ট কথাব দাম নাই;
উহা ত অকাতরে সকলকেই বিলাইতে পাৰা যায়—তবে লোকে তাহাতে
কুণ্ঠিত কেন? কেতাবে পড়িয়াছি, “দীন হেথিয়া দান কবিও”—কিন্তু সকলেই

ইহার বিপরীত আচরণ করে, যাহার আছে তাহাকেই আরো দেয় । জেগে যাহা কেতাবে লিখিবে পড়িবে, কার্যকালে তাহার বিপরীত করিবে এই কি তবে নিয়ম ? তবে চুরি করিলে জেলে ধের কেন ? নিয়ম—নিয়মত কিছুই দেখিতেছি না । নিয়ম—তবে মাছঘের নিয়ম বুঝি—নিষ্ঠুরতা, রক্ত কণ্ঠ, রূপগতা । যদি কখন বড় হই, টাকা হয়, বড় লোক হই, বড় বাড়ীর বড় বাবু ছবি যেমন একজন চিত্রকর আসিয়া আঁকিয়াছে—আমার ছবি আঁকিতে আসিলে বলিব “একটা ভালুক আঁকিয়া নীচে আমাব নাম লিখিয়া রাখ নতুবা পয়সা দিব না ।”

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

আজি পৌষ সংক্রান্তি—গ্রামে উৎসব । কার বাড়ী কতগুলি পীঠে হইবে, আপন আপন বাড়ীতে সকলে তাহাবই বনোবস্ত করিতেছে । বেলা নয় দশটা হইয়াছে । তবু কুশায় জগত আঁধার করিয়া রাখিয়াছে । ভূতনাথের মা আপন ক্ষুদ্র গৃহে মাত বৎসরের বালিকা কত্তা নীলাকে কোড়ে কবিতা বসিয়া কান্দিতেছেন । নীলা বুঝিতে পারিয়াছে, যে মা মনোহুখে কান্দিতেছেন, বালিকা ক্ষুদ্রহস্তে তাহার অশ্রু মুছাইয়া ক্ষুদ্র কথায় তাহাকে শাস্তনা করিতেছে ।

“মা কান্দিও না, দাদা চাকরী করিতে শিখিলে আমাদের স্বখ হইবে । দাদা পিঠা ভালবাসে না, আমিও ভালবাসি না । আজ পরবের দিন—যদি পিঠা না করিতে পারিলে দোষ হয়, দেবতারা বাণ করে, আমি না হয় ধূলীয় পিঠা গড়িব, তুমি দেবতাব নামে নিবেদন করিয়া দিও । দেবতাবাত আব পিঠা খায় না,—দেবতারা বেজার হইবে না, আমাদের যা আছে তাই দেবতাকে দিব ।—দাদা সে দিন রামায়ণ পড়িতে ছিল,—রামায়ণে লেখা আছে, রামচন্দ্র ধূলী দিয়া বাপের পিণ্ড দিয়াছিলেন ।”

মাতা বলিতেছেন “না মা, সে জল্প কান্দিতেছি না,—সে দিন তুই বলিছিস মা ভুধের স্বাদ যে কেমন মধে নাই”—তাই ও বাড়ীস্থ বড় দিদির কাছে একটু দুধ চাহিয়াছিলাম, তিনি বলেছিলেন পৌষ পার্বণের দিন তাঁর পিঠা করিয়া দিলে, দিবেন । তাই বড় আশা করিয়া আজ তাঁর কাছ

গিয়াছিল; ছুত ত দিলেনই না, উপরন্তু কত গাল দিলেন; বলিলেন, 'এত বেলায় কি বেড়াইতে আসিয়াছি, আব তোকে দরকাব নাই, আর আমার বাড়ী কিছু চাইতে আসিলে এক কুল ছাই দিব,' তাই মনের হুঃখে কান্দিতেছি।' নীলা কিছু অপ্রস্তুত হইল, মায়ের হুঃখ দেখিয়া হৃদয়ে বেদনা পাইল, কি করিবে, মাব মুখপানে চাহিয়া পাবত্র জাহ্নবী বধারা ছাড়িয়া দিল। কবিশ্রেষ্ঠ গৈর্যাত্ত বথার্থই বলিয়াছেন

শিশু দেহ পুণ্য তীর্থ;

মহা পুত তার অঞ্জননী

পর ভঃখে উদ্বেলিত যবে।

কৃত শিরে ঘাও ঢালি নর।

যদি নীরোগ হইবে; ঐত

ঐত স্বর্গের দেবতা ঐত,

ঐত স্বর্গ মন্দিরিনী"

• • • • •

পশ্চাতে পদ ধল হইল। মা, মেয়ে, ফিবিয়া চাহিল। সম্মুখে ভূতনাথ। ভূতনাথের মুখ শুক ও চিন্তিত। নীলা সহর্ষে দাঁড়াইয়া বলিল, "দাদা কোথা গিয়াছিলে।" যে ভূতনাথ সমস্ত জগত আঁধার দেখিয়াছিল, মানব পাষণ্ডময় দেখিয়াছিল, এখন সে সমস্ত জগত আলোকমালায় সজ্জিত দেখিল, মানবকে কুহুমদায় তুলা দেখিল, মাতা ভগিনী ববিত্র ব্বেহপূর্ণ বদনমণ্ডল দেখিয়া হৃদয় কণেকের কৃত শান্তিরসে পূর্ণ করিল। নয়নকোণে দুর্কোটা ক্ষটিক কুটিল। ধীবে নীলাকে তুলিয়া ক্রোড়ে লইল, এবং মাকে মধুব-বচনে বলিল, "মা, শরত কাকা মকর্দমায় সাক্ষী দিতেঢাকা যাইতোছম, আমি তাঁর সঙ্গে যাব, এভাবে বাড়ীতে থাকিলে যথার্থই মুখ হইব, শুনিয়াছি ঢাকায় অনেক বড় মাহুয আছে, চেষ্টা কবিলে সেখানে থাকিয়া লেখা "পড়া করিতে পাবিব।"

ভূতনাথের মায়েই হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; যুহুর্ন্তকাল চক্রে আঁধার দেখিলেন, পরে বলিলেন, "বাবা! দেশে, লোকে মারিতে দাঁড়াইলে কেহ চাতিয়া দেখে না, তাই বলি, বিদেশের লোকে তোমার খরচ ষোগাইবে?" "চেষ্টা করিয়া দেখিব, হুবিধা না হয় চলিয়া আসিব।" "শরত কবে যাইবে," "পায়ত্ত প্রাতে।"

ভূতনাথের মা, চমকিয়া বলিলেন, “পরশুই, হুথানি কাপড়, তারও একখানি ধোপা বাড়ী, কি লয়ে যাবি,—হাতে একটি পরসো নাই সঙ্গেই বা কি দিই ?”

ভূতনাথ বলিল, “মা তোমার হাতের ও গলার কি গয়না বিত্তবাবুদের বাড়ী আছে, তাবই একখানি বাধা রাখিয়া কিছু টাকা প্লান, তুমি কিছু বাথ, আমায় কিছু দেও ।”

ভূতনাথের মাতা বলিলেন, “তা হ’লে ত ভালই হইত, গয়না তাঁর মায়ের কাছে রাখিবাছি তিনি গঙ্গা স্নানে কলিকাতা গিয়াছেন, এখন আমার এক ট হাতের আংটি আছে যদি তাই রাখিয়া কিছু আনিতে পারি ।”

আজি একাদশী স্মৃতবাং ভূতনাথের মাতার আহাবের আয়োজন কবিত্তে হইবে না এবং একাদশী বলিয়া আজ তাঁহাকে যে বাড়ী রাখিয়া দিতে হয়, তাঁহাদের বাড়ীতেও রাখিতে হইবে না, কেননা বিত্তবাবুর পিতামহী বিত্তবাবুর স্ত্রীকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, “ভূতর মা ছেলে বয়সে বিধবা হইরাছে, তোবা তাকে একদশীর দিন রান্না করিতে দিও না ।” বলা আবশ্যক, যে ভূতনাথের মা বিত্তবাবুর বাড়ীর (অনরাধি) সম্মানিতা পাচিকা । বিত্তবাবু ধনকুবের জমীদার এবং ভূতনাথের জ্ঞাতি খুড়া । এখানে বলিয়া রাখা উচিত, বিত্তবাবু বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ।

* * * * *

ভূতনাথ ও নীলার আজ নিমন্ত্রণ আছে । তাহারা নিমন্ত্রণে চলিয়া গেলে ভূতনাথের মা আংটি লইয়া বিত্তবাবুর বাটী চলিলেন ; যাইবার কালে দুই বিল্লু অশ্রুপাত হইল ।

অশ্রুপাত কেন হইল, মূল্যবান জিনিষ বলিয়া কি ? তাহা নহে, ভূতনাথের মাতা ভূতনাথের জন্ত বিনা অশ্রুপাতে, সহস্র সাদ্রাজ্যত্যাগ করিতে পাবেন, কিন্তু এই অশ্রুধী তাহা হইতেও অধিক মূল্যবান । ইটু, স্বামি-চিহ্ন, স্বামীর অঙ্গুলীতে চিহ্নিত ছিল, তাই বদ্ধ কবিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, আমরণ রাখিবেন ; মাঝে মাঝে দেখিবেন ; শ্রুতমীর দেবমুক্তি মনে পড়িবে, আজ-সেই চিহ্ন লুপ্ত হইবে ।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনুৰূপে এক খণ্ড হীরক সংলগ্ন ছিল, স্বামীৰ নিকট গুনিয়া ছিলেন উহাৰ মূল্য একশত টাকার ন্যূন নহে। স্বামী অক্ষয় লোক ছিলেন না, ভাল চাকবী করিতেন, গবৰ্ণমেণ্টের কোন আইন বহিৰ্ভূত প্রদেগেব বন্দোবস্তেব ভীৰ্ব তাঁহাৰই হাতে ছিল। উপার্জন যথেষ্ট কৰিয়াছিলেন, কিন্তু পরোপকাৰেই তিনি একেবাবে নিঃস্ব হইয়া প্রাণভাগ কবেন। গ্রামের অনেকেরই অবস্থা তিনিই ভাল কৰিয়া দিয়াছেন, নিজেব জন্ত অনেকগুলি জমীদারি বেনামিতে নিলামে কিনিয়া ছিলেন, অল্প হইলেও তাহাৰ বার্ষিক আয় প্রায় সহস্র টাকা হইবে। দুৰ্ভাগ্যবশত বিত্ত বাবুর নামে ঐ সকল সম্পত্তি কেনা হয়। মনে কৰিয়াছিলেন নগদ সম্পত্তি না থাকিলেও, স্ত্রী পুত্র কষ্ট পাইবে না। কিন্তু তিনি সরকারী কার্যা ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিতে না আসিতেই বিত্তবাবুৰ সহিত বিবাদ আবস্ত হয়। বিত্তবাবু সম্পত্তিৰ লোভ সৰ্ব্বণ কৰিতে না পাৰিয়া সমস্ত বিষয় স্বামী-কার কৰিয়া বসিলেন। এই সাংঘাতিক ব্যাপারে তাঁহার পৰমাণু নিঃশেষিত হইল, বিষাদেব প্রাণ যাতনায় তাঁহার মৃত্যু হয়। মনে কৰিয়াছিলেন জীবনের অবশিষ্টকাল স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরমাত্মীয় ও স্বজনবৰ্গ পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে দেশে কাটাইবেন। বিধাতা তাহাতে বৈবী হইলেন। মৃত্যু সময়ে বিত্তবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, “বিশ্বনাথ, যাহা মনে ছিল, তাহাই কৰিয়াছ, কিন্তু আমার শেষ ভিক্ষা এই, আমার নিঃসহায় স্ত্রী পুত্র কত্কা ধেন অনাহারে মারা যায় না।”

যাহা হউক ভূতনাথের মাঠা অনুৰূপে লইয়া বিত্তবাবুর স্ত্রীর হাতে হস্তে দিয়া কহিলেন, “সম্পত্তি এই জিনিষটি রাখিয়া আমাকে দশটি টাকা দাও; পরে যদি পানি, খালাস করিয়া লইব, নহা বিক্রী করিব।”

বিত্তবাবুর স্ত্রী বলিলেন, “ইহাৰ এত দব কি হইবে?”

ভূতনাথের মা বলিলেন, “ইহাতে হীরা আছে, গুনিয়াছি, একশত টাকায় এই আকটী কেনা হইয়াছিল।” বিত্তবাবুর স্ত্রী, পরীক্ষার জন্ত দরজার কাছে দাগিয়া দেখিলেন, কল কাটিয়া গেল; পরে আপন অনুৰূপে পরিধান কৰিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা আমি রাখিব,” এই বলিয়া পাঁচটি টাকা হাতে দিয়া বলিলেন, “আমার হাতে আর টাকা নাই, আর

কিছু পরে তিনি (বিশ্বাব্যাস) আসিলে, আপনাকে আর পাঁচ টাকা দিয়া আনিয়া ।”

ভূতনাথের মা বাড়ী আসিয়া দেখে, ভূতনাথ, নীলা খাইয়া বাড়ী আসিয়াছে। ভূতনাথ বলিল, “মা আমি নিমন্ত্রণ খাইয়া আট আনার দক্ষিণা পাইয়াছি। ইহাতেই আমাব হইবে, আশ্রমের জন্ত তোমাব চক্রে কল পড়িয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি ; এখন আশ্রম কোথাও রাখিবার দরকার নাই।” তাহার মা বলিলেন, “আমি ও বাড়ীর বড় দোকান কাছে আশ্রম রাখিয়া পাঁচটা টাকা আনিয়াছি।” ভূতনাথ বলিল, “টাকা দিয়া আশ্রম লইয়া আসুন।”

এমন সময় বিশ্বাব্যাস জী আসিয়া বলিলেন, “আশ্রম আমি রাখিব না, আমাব টাকা পাঁচটা দিন।” ভূতনাথের মা একটু খুসী হইয়াই টাকা পাঁচটা তাঁর হাতে দিলেন, তিনি টাকা লইয়াই চলিয়া গেলেন।

ভূতনাথের মা, তাহাব পাছে পাছে যাইয়া বলিলেন, “আমাব আশ্রম ?

বিশ্বাব্যাস জী বলিলেন, “কর আশ্রম, ও আমাদের আশ্রম অনেক দূর হইল চোরা গিয়াছিল, আশ্রম নিতে হয় ত তাঁর কাছে যান, তিনিই আপনাকে পুলিশের হাতেই দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি কেবল বলিয়া কহিয়া বারণ কবিয়াছি।”

এই কথা শুনিয়া ভূতনাথের মা, মাথায় হাত দিয়া রাত্তির মাঝখানে বসিয়া পড়িলেন। একটা কথা তাঁহার মূখে ফুটল না। কিছুকাল পরে একটা মাত্র অক্ষুট চিন্তার করিয়া অজান হইয়া ভূমিতে পড়িলেন।

বিশ্বাব্যাস জী আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন, সেখানে কেবল নীলা মারের সঙ্গে ছিল। নীলা মাঝে মাঝে শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কাদিয়া “দাদা মা বলে” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ভূতনাথ বাড়ীতে ছিল দোকান আসিয়া কান্নিতে লাগিল।

তাহাদের উচ্চস্বরে ক্রন্দন শুনিয়া পাড়ার দুই তিনটা জীলোক ও পুরুষ মানুষ আসিল ; ধরা ধবি কবিয়া ভূতনাথের মাকে বাড়ীতে আসিয়া শয়ন করাইয়া, কেহ বলিতে লাগিল, ভূতে পাইয়াছে, কেহ বলিতে লাগিল, “মুণী হইয়াছে।” গায়ে এক মূর্থ কবিরাজ ছিল, সে স্থির করিল, “প্রেমোন্মাদ” হইয়াছে এবং তদনুসারে কিছু নস্ত ও কিছু বটিকাও দিল।

নত্ন ও বটিকাৰ প্ৰয়োজন হইল না। ভূতনাথৰ মা স্বপ্নৰ্থ স্বপ্ন হইতে জাগ্ৰিত হইলেন। জাগিয়া কিছু কান্দিয়া মনকে এই বলিয়া প্ৰবোধ দিলেন, “যথা সৰ্ব্বস্য যে লইয়া আমাকে ভিত্তিবিধী কবিল, সে অল্প-বীৰ্য্য আত্মসাৎ কবিবাব জন্ত আমাকে চোব অপবাদ দিবে আশ্চৰ্য্য কি?”

ভূতনাথ জিজ্ঞাসা কবিল, “মা তোমাব কি হইয়াছিল?” পাছে ছেলেৰ মনোকই হয় একজ্ঞ গোপন কবিসা বলিলেন, “একাদশীৰ উপ-বাস লাগিয়াছিল, তাই ঘুবিয়া পড়িয়াছিল।” ভূতনাথ আৰ . কথা কহিয়া মাতাকে বিবস্ত্ৰ কৰিল না।

* * * * *

পৰ দিন, শেষ রজনীতে ভূতনাথ স্বপ্ন দেখিয়া জাগিল। স্বপ্ন দেখিতে ছিল, —সে এক নূতন দেশে গিয়াছে, সেখানে ক্ষুদ্ৰ পুকুৰ নাই, বড় নদী, কুটীর নাই, শাদা শাদা বড় বড় ইটের বাড়ী। নদীর স্রোত চলিতেছে, পথে মানুষের স্রোত চলিতেছে, পিপাসা লাগিল, জল খাইতে নদীতে নামিল, নদী কাচের জায় কঠিন হইল। পিপাসায় প্ৰাণ যায়, উঠিয়া এক বাড়ী গেল, কত লোক হাসিতেছে আমোদ কবিতেছে;—জল চাহিলে, সকলের মুখ বিষন্ন হইল, নিকটে বাইয়া দেখিল উহারা পাবাণ হইয়াছে। এইরূপ ভূতনাথের স্পর্শে সকলই পাবাণ হইতে লাগিল। পিপাসায় দণ্ড হৃদয় হইয়া প্ৰাণ ত্ৰাহি ত্ৰাহি কবিতে লাগিল, হঠাৎ কে করুণস্বরে বলিল, ভূতনাথ আমি জল আনিয়াছি, চাহিয়া দেখিল আনন্দ-ঘরীর মূৰ্ত্তি,—জননী। ভূতনাথের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূৰ হইল, কত আহ্বান হইল। মনে ভাবিল একি স্বপ্ন? অমনি জাগ্ৰিত হইল। প্ৰাণ স্নঃ হইল; প্ৰাণী জাগিয়া অনিমিষ লোচনে মায়ের স্নেহপূৰ্ণ মুখ দেখিতে লাগিল। “আজ চাকা ঘাইব—কত দিন আর এই মুখ দেখিব না”—এই ভাবিয়া চিন্তায় সহিত দর দর অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায় ।

চন্দ্র সূর্য্য স্নেহের সূর্য্য হৃৎসেব হৃৎসী ; কি ধনী কি নির্ধন সকলের বাড়ীতেই সমভাবে উদয়াস্ত হয় । দিনও সেইরূপ, কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে না । বিত্ত বাবু দিনও যাইতেছে, ভূতনাথের মায়েব দিনও যাইতেছে । তবে বিত্ত পরের মাখায় বসিয়া, হৃৎ ভাত খাটনা রাত্রি প্রভাত করিতেছে, আর ভূতনাথের মা দ্বিনাস্তে আধ পেটা খাইয়া দিন রাত্র কাটাই-তেছেন ।

এক মাস দু মাস করিয়া ক্রমে বহু মাস কাটিয়া গেল । ভূতনাথ ঢাকা হইতে বাড়ী আসে না, তবে মাঝে মাঝে পত্র লেখে ।

ভূতনাথের বাড়ী হইতে যাওয়া অবধি নীলা এক দিনের তবেও স্নহ নহে, আজ অন্ন, কাল পেটের পীড়া লাগিয়াই আছে । নীলা ভূতনাথকে বড় ভাল বাসে । ভূতনাথের চিঠি আসিলে প্রফুল্ল হয় ; তাহার পরেও ছু চাবি দিন বেশ থাকে, আবার পীড়িতা হয় । বালা প্রেমের ভালবাসার কথা অনেক শুনিয়াছি । ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসার কথাও অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু নীলাব ভালবাসার মত ভালবাসাব কথা কোথাও শুনি নাই । নীলা জানিত, মা দাদা আব সে, এ তিন জনের এক প্রাণ । একজনের অভাবে আব, দুইজন বাঁচিতে পারে না । তাই দাদার কথা সদ্ধাই ভাবিতে ভাবিতে তাহার আব অস্ব্থ সাবে না । এক দিন ডাকিয়া বলিল “মা আমি বুঝি বাঁচিব না ; দাদাকে আর দশ পনং দিনের মধ্যে না দেখিলে প্রাণটা আমার ছট ফট করে বেরিয়ে যাবে ।” ভূতনাথের মা বলিলেন, “বালাই, এইত তোমাব দাদা আশ্বিন মাসেই আসবে ।”

নীলা বলিল, “মা চল না, দাদার কাছে যাই, ঢাকার দাদা তুমি আমি তিনজনই একত্রে থাকব ।”

এমন সময়ে একটি দীর্ঘাকার পুরুষ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল । সন্ধ্যার সময় ঘরের বাবান্দার বসিয়া, মাতা ও কন্ডা কথা কহিতেছিলেন,—নীলা ভীতা হইয়া মায়েব পৃষ্ঠ ধরিয়া বসিল, মাও শিহরিয়া উঠিলেন । দীর্ঘাকার পুরুষ বলিল “বিনোদ”—বিনোদ কথাটি পরিচিত স্ববে উচ্চারিত হইল ।

বিনোদ ভূতনাথের মায়েব নাম ; এখন হইতে—আমিও বিনোদকে বিনোদই বলিব ।

বিনোদ বলিল,—“কে ভূবন দাঁড়া, তুমি না বুকে গিয়া ছিলে, এস, ইতে এসেচো,”—এই বলিয়া দাঁড়াইলেন। দীৰ্ঘাকার পুরুষ সেই স্থানে স্থানবোধ দাঁড়াইয়া বলিল, “যুদ্ধে নহে, মরিতে।”

“বোলাই! কি হুঃধে মবিবে?”

“তুমি কি তা জান না?”

“আমি মবি মাই কেন?”

“তুমি নিষ্ঠূৰ।”

“তুমি মূৰ্খ।”

“তুমি মূৰ্খ” বিনোদ এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে অঞ্চল দিবা অশ্রু জ্বলিতে লাগিল,—আব বলিতে লাগিল, “দেখ আমি জীলোক হইয়াও কত লহিতে পাবি, মরাত সহজ কথা, মবিব কেন? সহিব। দেখিব মাগুণের শরীরে কত সহিতে পারে, সহাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে সহিব না কেন? কষ্টের সীমা থাকিতে পাবে, পূৰ্ণকাল থাকিতে পাবে, আমি সেই সীমা অপেক্ষা কবিতেছি।”

দীৰ্ঘাকার পুরুষ ক্রকুটি কবিয়া বলিল—

“আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ?”

“প্রায়।”

“সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাও।”

“কি সম্পূর্ণ?—সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়াছি।”

“শেষ, একটি ভিক্ষা।”

“কি বল?”

“তোমাব চিহ্ন স্বরূপ নীলাকে আমার দাও।”

“বিবাহ করিবে?”

“দ্বিবে কি না, তাই বল?”

“বার বৎসব বয়েস হইলে দ্বিব।”

“তবে দ্বিবে ঠিক?”

“ঠিক।”

“তবে শুন,—নীলাকে বিবাহ করিবার—আমাব ও
 ঘের দেশে বিবাহ নাই, পীড়া নাই, শোক নাই,

গর, সেহ সব—এক, নর নারী তেহ নাই, ইচ্ছা নাই, অজ্ঞান
চ. ম নাই—নীলা যাবে ত?”

বলিয়া দীর্ঘাকার পুরুষ হাত বাড়াইল। নীলা তরে শাকে যাপটাই
ল। বিনোদ চাহিয়া দেখিল দীর্ঘাকার পুরুষের মুখ শুষ্ক, নরন শুষ্ক ও
তি; তাহার শরীরে যে চাঁদের আলো পড়িয়াছে, কাচে আবৃত তাহাতে
লোকের মত তীব্র জ্যোতি ক্ষবিত হইতেছে; বিনোদ ভীতি বিহীন চিত্তে
কিল, “ভুবন,” “ভুবন” “ভুবন।” ভুবন আব কথা কহিল না, একই
সিদ্ধা চলিয়া গেল।

বিনোদ অবাক হইলেন; ভাবিলেন, “একি—এই কি সেই ভুবন,—একি
মুখ!”

• • • • •

সেই রজনীতে বিনোদ শুইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, “ভুবন প্রলয় অগ্নিকুণ্ডে
স্থরভাবে বলিয়া ইঁসিতেছে; তাহার ক্রোড়ে বিনোদ বসিয়া বহিয়াছে”—
নোদ একবার আপনার দিকে, আর বাব অগ্নি নিমজ্জিতা বিনোদের দিকে
হিলেন; তাহার আপনার অস্তিত্বে ভ্রম হইল; আবার চাহিয়া দেখিলেন,
বিনোদ বিধবা নহে, কুমারী, জানিয়া তরে গোবিন্দ নাম স্মরণ করিতে
গিলেন। নীলা তখন কাঁপিতে ছিল, বলিল “মা আমার গায়ে আর এক
গনি লেপ চাপিয়া দাও, বড় জ্বর আসিয়াছে।”

বা।১০৭ পৃ.

ছট ফট করে

পঞ্চম অধ্যায়।

তোমার দাদা আশ্বিন ম

নীলা বলিল, “মা চলে ১৮কের মনে উদয় হইতে পারে, স্তব্ধতা ভুবনের
তিনজনই একত্রে বলে অসঙ্গত না হইতে পারে। যদি কেহ অসঙ্গত মনে
এমন সময়ে অধ্যায়টী বাধ দিয়া এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন। তাহাতেও
না।

সময় ঘরের বারা

১৮ দশ বৎসর, তখন হইতে বিনোদ ভুবনকে জ্ঞান
ভীতা হইয়া মায়ের ভাল বাসে,—এই ভালবাসা ক্রমে বয়েসের সঙ্গে
পুরুষ বলিল “বিনোদ”

ব তেব বৎসব বয়স কালে বিনোদে ভুবনে গোপনে
বিনোদ ভূতনাথে কেহই অস্ত্রকে বিবাহ করিবে না। ভুবন বেটা

ছেলে স্তব্ধতা চুক্তি বন্ধ করিতে পারিল। কি বিনোদ তাহা পারিল না।

বিনোদের শিখা বাঁতা ছিল না, মাঝা মাঝি, ভাল চাকুরে দেখিয়া অত্যন্ত হইয়া বিনোদকে বল পূর্বক বিবাহ দিল। সেই অবধি পরস্পর সম্বন্ধ বিহীন হইল। বিনোদ বিবাহের রাতে মামার অধিকেনের কোটা হইতে অধিকেন সেবন করিয়াছিল—ভুবন ডাক্তারী শিখিত, স্ততরাং ভুবন উপস্থিত ছিল বলিয়া, বিনোদ মরিতে পারে নাই।

বিবাহ হইয়া গেলে এক বৎসরের মধ্যে, বিনোদ ভুবনকে ভুলিবার চেষ্টা করিল, এবং দশ বাব বৎসরের মধ্যে তাহার হৃদয়ে যে ভুবনের ছবি অঙ্কিত ছিল, তাহার বর্ণ একবারে উঠাইয়া ফেলিল কেবল অক্ষুট দাগ মাটিয়া গেল। বিনোদ এ দাগ ভুলিবার চেষ্টাও কম চেষ্টা করেন নাই। তাহা করিতে গিয়া তাহার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ভুবন, বিনোদের বিবাহ হইলেও আশা ছাড়েন নাই। একদিন বিনোদকে জনশূন্য স্থানে পাইয়া বলিয়াছিলেন, “বিনোদ, ছই জীব কি আশা দেয় দেশে এক স্বামী থাকে না, এক জীব ছই স্বামীও ত সে হিসাবে থাকিতে পারে,—ইহ জীবনে আমি আর বিবাহ করিব না, তুমি শুদ্ধ মনে ভাবিও, আমি তোমার স্বামী, ইহা বই আর পার্থিব কোন স্তরের আশা আমি তোমার নিকট করি না।”

বিনোদ নিষ্ঠুর হইয়া বলিলেন, “দেখ ভুবন, তোমার এই যুক্তি, এই পবিত্র প্রশ্ন—বিভীষিকা; ব্রাহ্ম ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল ধর্ম অনুবর্ত্ত করিয়াছে। আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়াছি; তুমিও আমাকে ভুলিয়া যাও।” ভুবন কাদিয়া বলিলেন,—“আমি ভুলিতে পারিব না।”

বিনোদ অধিকতর রুদ্ধভাবে বলিলেন, “মবিবার পথ অপ্রশস্ত নহে, তুমি মব, তাহা হইলে আমার পাপের একটি সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িবে।”

ভুবন প্রতিজ্ঞা করিলেন, “বিনোদ তবে যাই, তোমার সহিত আর একবার দেখা করিব,—কিন্তু এ শব্দে নহে।”

এই ঘটনার অব্যবহিত পবেই ভুবন—ডাক্তার হইয়া কি রসদেয় কর্তব্য করক হইয়া, ঠিক বলিতে পারি না, মিসরে সময়ে গমন করেন।

ঘোমটা ।

বমগীৰ চাকুচল্ল পবিত্ৰ আনন,
 কেন তুমি আববিয়া রয়েছ ঘোমটা ;
 দেখিতে না দেও তাৰ লাবণ্য কেমন,
 ভুবন মোহন সেই নবৰূপ ছটা !
 দিবানিশি একাকী সে দেখ চাঁদমুখ,
 তথাপি আকাজ্জা নাহি পূৰে একটুক ?

তুমি হিংস্ৰকেব শেষ বড়ই নিষ্ঠূৰ,
 পৰে যে দেখিবে তব নাহি সন্মুখাণে !
 তুহি হে রাহব চেয়ে ভয়ানক ক্ৰূৰ,
 রাহ ত গিলিয়া পুন উগাৰিতে জানে !
 গিলিলে নারীৰ মুখ তুমি হুৱাচাৰ,
 যোবন থাকিতে তাহা নাহি ছাড় আৰ !

দেও হে দেখিব আছে বড় সাধ মনে,
 ও নলিন ৰূপবাশি অমলিন কাচ !
 ভয় কৰ কি জানি কি যদি দৰলনে,
 নবনে তুলিয়া তাব নিৰে ঘাই হাঁচ !
 নিব না, দেখিব শুধু আমাব এ লাগে,
 তোমাব ও মুখখানি লাগে কি না লাগে !

হাবা'য়ে গিৱেছি তা'য়ে বহু দিন গত,
 পৰাগ আকুল বড় দেখিতে তান্ধাৰে,
 টলমল সে কমল নবন আনত,
 মুইয়া পড়েছে বেন মেহ লাজ ভাবে !
 দেখিলেই ঢাকা মুখ মনে কৰি এই,
 লক্ষ্যে বয়েছে বুখি সেই

সনেহ ভাঙ্গিয়া দেও, ভেঙ্গে দেও, লভ
 অপবিত্র হইবে না দেখিলে কখন,
 পৃথিবীর পাণী ভাঙ্গী কত দেখে ফুল,
 যেখে রবি, দেখে শশী, গ্রহ তাবাগণ !
 সেই জ্যোতিঃ সেই কান্তি নব পরিমল,
 সকলি তেমনি থাকে পবিত্র উজ্জল !

একটু সব না তুমি আমি দেখে যাই,
 এত দেখ নিশিদিন পুরে না কি আশা ?
 অথবা তোমাতে মিছা দোষ দেই ভাই,
 রমণীর মুখে জন্মে জীষেব পিপাসা !
 রাখ রে চাঁদেরে ছাড়ে শুধু চাঁদ ব'লে,
 সেও না ছাড়িত্ত বুঝি চাঁদ মুখ হ'লে ।
জীগোবিন্দো

